শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Pic★ + design (full page)

গীতোপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা যথাযথ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

Bhagavad-Gita As It Is (Bengali)

প্রকাশকঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত
প্রথম সংস্করণঃ ১০,০০০ কপি, ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণঃ ৫,০০০ কপি, ২০০১
তৃতীয় সংস্করণঃ ১০,০০০ কপি, ২০০১
চতুর্থ সংস্করণঃ ৫,০০০ কপি, ২০০২
পঞ্চম সংস্করণঃ ৫,০০০ কপি, ২০০৩
ষষ্ঠ সংস্করণঃ ৫,০০০ কপি, ২০০৪
সপ্তম সংস্করণঃ ১০,০০০ কপি, ২০০৫
অষ্টম সংস্করণঃ ১০,০০০ কপি, ২০০৬

মুদ্রণঃ
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
প্রেস শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

গীতোপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা যথাযথ

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত

প্রথম সংস্করণ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য কর্তৃক
মূল সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ ও বিশদ তাৎপর্য সহ ইংরেজী

Bhagavad-Gita As It Is-এর বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক: শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী:

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
গীতার গান
গীতার রহস্য
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
দেবহূতি নন্দন শ্রীকপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
শ্রীঈশোপনিষদ
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
পুনরাগমন
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ঈশ্বরের সন্ধানে
পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণনামের প্রচার
কৃষ্ণ বড় দয়াময়
পরম পিতা
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
বুদ্ধিযোগ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
পরলোকে সুগম যাত্রা
প্রকৃতির নিয়ম: যেমন কর্ম তেমন ফল
জীবন জিজ্ঞাসা
বৈষ্ণব কে?

বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন
পঞ্চরাত্র প্রদীপ (শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি)
শ্রীল প্রভুপাদ
ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী
প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি (রঙীন)
পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য
শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য
শ্রীমায়াপুর দর্শন
গৃহে বসে কৃষ্ণভজন
যুগধর্ম
ভক্তবৎসল ভগবান
মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধামাধব
ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব
মহাজন উপদেশ
ধ্রুব চরিত
শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা
জগতে আমরা কোথায়?
শ্রীবৃন্দাবন দর্শন
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
১০ গুরুসদয় রোড
অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, দোতলা
ফ্ল্যাট-১বি, কলকাতা-৭০০০১৯
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সমর্পণ

বেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব-প্রকাশক
'গোবিন্দ-ভাষ্যের' প্রণেতা
বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের
করকমলে

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

যুগে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ গুরুর সান্নিধ্য লাভের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস-যোগ

কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম

বহির্বিচারে সকল কর্তব্যকর্ম সাধন করলেও সেগুলির কর্মফল পরিত্যাগ করার মাধ্যমে, জ্ঞানবান ব্যক্তি পারমার্থিক জ্ঞানতত্ত্বের অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধি লাভ করে থাকেন, ফলে শান্তি, নিরাসক্তি, সহনশীলতা, চিন্ময় অন্তর্দৃষ্টি এবং শুদ্ধ আনন্দ লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

নিয়মতান্ত্রিক ধ্যানচর্চার মাধ্যমে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন মন ও ইন্দ্রিয় আদি দমন করে এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট রাখে। এই অনুশীলনের পরিণামে পরমেশ্বরের পূর্ণ ভাবনারূপ সমাধি অর্জিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ

পরমতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, সর্বকারণের পরম কারণ এবং জড় ও চিন্ময় সর্ববিষয়ের প্রাণশক্তি। উন্নত জীবাত্মাগণ ভক্তি ভরে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন, পক্ষান্তরে অধার্মিক জীবাত্মারা অন্যান্য বিষয়ের ভজনায় তাদের মন বিক্ষিপ্ত করে থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

পরমতত্ত্ব লাভ

আজীবন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার মাধ্যমে এবং বিশেষ করে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করে, মানুষ জড় জগতের ঊর্ধ্বে ভগবানের পরম ধাম লাভ করতে পারে।

নবম অধ্যায়

রাজগুহ্য-যোগ

গূঢ়তম জ্ঞান

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং পরমারাধ্য বিষয়। অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে জীবাত্মা মাত্রই তাঁর সাথে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। মানুষের শুদ্ধ ভক্তি পুনরুজ্জীবিত করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব।

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য

জড় জগতের বা চিন্ময় জগতের শৌর্য, শ্রী, আড়ম্বর, উৎকর্ষ-সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শক্তি ও পরম ঐশ্বর্যাবলীর আংশিক প্রকাশ মাত্র অভিব্যক্ত হয়ে আছে। সর্বকারণের পরম কারণ, সর্ববিষয়ের আশ্রয় ও সারাতিসার রূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বজীবেরই পরমারাধ্য বিষয়।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক তাঁর অনন্ত বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। এভাবেই তিনি তাঁর দিব্যতত্ত্ব অবিসংবাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে, তাঁর স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্যময় মানবরূপী আকৃতিই ভগবানের আদিরূপ। একমাত্র শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার মাধ্যমেই মানুষ এই রূপের উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

চিন্ময় জগতের সর্বোত্তম প্রাপ্তি বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভের পক্ষে ভক্তিযোগ বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী পন্থা। যাঁরা এই পরম পন্থার বিকাশ সাধনে নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা দিব্য গুণাবলীর অধিকারী হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

দেহ, আত্মা এবং উভয়েরও ঊর্ধ্বে পরমাত্মার পার্থক্য যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হন।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ বৈশিষ্ট্য

সমস্ত দেহধারী জীবাত্মা মাত্রই সত্ত্ব, রজ ও তম-জড়া প্রকৃতির এই ত্রিগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিগুণাবলীর স্বরূপ, আমাদের ওপর সেগুলির ক্রিয়াকলাপ, মানুষ কিভাবে সেগুলিকে অতিক্রম করে এবং যে-মানুষ অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত তার লক্ষণাবলী ব্যাখ্যা করেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

পরম পুরুষের যোগতত্ত্ব

বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে, সে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ

দৈব ও আসুরিক প্রকৃতিগুলির পরিচয়
যারা আসুরিক গুণগুলি অর্জন করে এবং শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করে থাকে, তারা হীনজন্ম ও ক্রমশ জাগতিক বন্ধনদশা লাভ করে। কিন্তু যাঁরা দিব্য গুণাবলীর অধিকারী এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন আদি মেনে বিধিবদ্ধ জীবন যাপন করেন, তাঁরা ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণাবলী থেকে উদ্ভূত এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রদ্ধা তিন ধরনের হয়ে থাকে। যাদের শ্রদ্ধা রাজসিক ও তামসিক, তারা নিতান্তই অনিত্য জড়-জাগতিক ফল উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন আদি মতে অনুষ্ঠিত সত্ত্বগুণময় কার্যাবলী হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে এবং পরিণামে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি-শ্রদ্ধার পথে মানুষকে পরিচালিত করে ভক্তিভাবে জাগ্রত করে তোলে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

ত্যাগ সাধনার সার্থক উপলব্ধি
শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন ত্যাগের অর্থ এবং মানুষের ভাবনা ও কার্যকলাপের উপর প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতিক্রিয়াগুলি কেমন হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ব্রহ্ম উপলব্ধি, ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য ও গীতার চরম উপসংহার-ধর্মের সর্বোচ্চ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, যার ফলে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ হয়, সম্যক জ্ঞান-উপলব্ধি অর্জিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত চিন্ময় পরম ধামে প্রত্যাবর্তন করা যায়।

অনুক্রমণিকা

বর্তমান সংস্করণ সম্পর্কে টীকা

দৃশ্যপটের অবতারণা

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

গীতা-মাহাত্ম্য

উদ্ধৃতি-সূত্র

গ্রন্থকারের পরিচিতি

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হন ১৮৯৬ সালে কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম মিলন হয় কলকাতায়

১৯২২ সালে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং সর্বাগ্রগণ্য ভগবদ্ভক্ত। তিনি গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমস্ত ভারত জুড়ে ৬৪টি মন্দির স্থাপন করেন। এই শিক্ষিত যুবক অভয়চরণকে তাঁর খুব ভাল লাগে এবং বৈদিক জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে তিনি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং ১১ বছর পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯২২ সালে যখন তাঁদের প্রথম মিলন হয়, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের কার্যে সাহায্য করতে থাকেন এবং বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৪৪ সালে এককভাবে তিনি Back to Godhead নামক একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপিগুলি টাইপ করতেন, সম্পাদনা করতেন, প্রুফ দেখতেন, সেই পত্রিকাগুলি বিতরণ করতেন এবং সেই প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতেন। একবার শুরু হওয়ার পর, সেই পত্রিকা আর বন্ধ হয়নি; এখনও পর্যন্ত সেই পত্রিকাটি ৩০টি ভাষায় তাঁর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ১৯৪৭ সালে তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার ৪ বছর পরে অধ্যয়ন ও রচনার কাজে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করবার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেন এবং তার কিছুদিন পরে তিনি বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। সেখানে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরের একটি ঘরে তিনি কয়েক বছর ধরে অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার কাজে গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান-আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সার শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনার কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে Easy Journey to the Other Planets নামক

গ্রন্থটিও রচনা করেন।
শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুমহারাজের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সার সমন্বিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণিক অনুবাদ, ভাষ্য ও মূল ভাব সহ ৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন।
একটি মালবাহী জাহাজে করে যখন তিনি প্রথম নিউ ইয়র্ক শহরে আসেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য। কিন্তু প্রায় এক বছর কঠোর সংগ্রাম করার পর, তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর অপ্রকট লীলাবিলাস করা পর্যন্ত তিনি নিজেই এই সংস্থাটির পরিচালনা করেন এবং একশটিরও অধিক মন্দির, আশ্রম, স্কুল ও ফার্ম কমিউনিটি সমন্বিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে যান।
১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে নব বৃন্দাবন নামক একটি পরীক্ষামূলক বৈদিক সমাজ গড়ে তোলেন। প্রায় ২০০০ একর জমির ওপর এই নব বৃন্দাবনের সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর শিষ্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেক দেশে এই রকম আরও কয়েকটি সমাজ গড়ে তুলেছে।
এ ছাড়া ১৯৭২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ ডালাস ও টেক্সাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য জগৎকে বৈদিক প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা দান করে গেছেন। তারপর, তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর শিষ্যরা ভারতবর্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থাপিত প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের আদর্শ অনুসরণে আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিশুদের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।
১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব সুন্দর 'কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির' এবং আন্তর্জাতিক অতিথিশালার উদ্বোধন হয়। তা ছাড়া সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের কারুকার্য-খচিত স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়াম বিরাজ করছে। ১৯৭৮ সালে জুহুতে বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে চার একর জমির ওপর অপূর্ব শ্রীশ্রীরাধা-রাসবিহারীর মন্দির, আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, অপূর্ব সুন্দর অতিথিশালা ও নিরামিষ ভোজনশালা সমন্বিত একটি বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের সব

চাইতে উচ্চাভিলাষপূর্ণ পরিকল্পনা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মায়াপুরে ৫০ হাজার কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে বৈদিক শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈদিক জীবনধারার দৃষ্টান্তরূপে সমস্ত পৃথিবীর কাছে আদর্শরূপে প্রতীয়মান হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থসম্ভার। বিদ্বৎ-সমাজ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা, গভীরতা ও প্রাঞ্জলতা এক বাক্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রভুপাদের লেখা বইগুলি প্রায় ৫০টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, যা প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বৃহত্তম গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট এখন ১টি খণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য সমন্বিত বাংলা শাস্ত্রীয়গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রকাশ করেছে, যা শ্রীল প্রভুপাদ কেবল ১৮ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

কেবলমাত্র ১২ বছরের মধ্যে, এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীল প্রভুপাদ ছয়টি মহাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভাষণ দেওয়ার জন্য ১৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। এই রকম কঠোর কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ প্রবলভাবে তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বৈদিক দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি প্রামাণ্য গ্রন্থাগার।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর অপ্রকট লীলাবিলাস করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী-"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" সার্থক করার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে সমস্ত জগৎকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার অমৃতময় পথ প্রদর্শন করে গেছেন। পৃথিবীর মানুষ যে, দিন বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে পারমার্থিক জীবনে ব্রতী হবেন, সেই দিন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান উপলব্ধি করতে পারবেন এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর চরণারবিন্দে প্রণতি জানাবেন। ১৯৭৭ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি অপ্রকট হয়েছেন, কিন্তু আজও তিনি তাঁর অমৃতময় গ্রন্থের মধ্যে, ভগবানের বাণীর মধ্যে

মূর্ত হয়ে আছেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য তিনি চিরকাল- তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।
+16 pages photo

ভূমিকা

এই সংস্করণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেটিই আমার মূল রচনা। এই গ্রন্থটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দুর্ভাগ্যবশত মূল পাণ্ডুলিপিটিকে সংক্ষিপ্ত করে চারশরও কম পৃষ্ঠায় দাঁড় করানো হয় এবং তাতে কোন ছবি ছিল না' এবং ভগবদ্গীতার অধিকাংশ শ্লোকেরই কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীঈশোপনিষদ আদি আমার অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থে মূল শ্লোক, তার ইংরেজী বর্ণান্তর, প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ, শ্লোকটির অনুবাদ ও তাৎপর্য দেওয়ার রীতি আছে। তার ফলে গ্রন্থগুলি খুব প্রামাণিক ও পণ্ডিতসুলভ হয় এবং তার অর্থ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। তাই, আমার মূল। পাণ্ডুলিপিটিকে যখন সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল, তখন আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। কিন্তু পরে, যখন ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থের চাহিদা বেশ বাড়তে লাগল, তখন অনেক পণ্ডিত-ও ভক্ত এই গ্রন্থটি পূর্ণ আকারে প্রকাশ করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন এবং মেসার্স ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানিও পূর্ণ আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। তাই গুরু- পরম্পরাক্রমে লব্ধ ভগবদ্গীতার পূর্ণজ্ঞান ও যথার্থ ব্যাখ্যা সহ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত এই মহৎ গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আরও সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি অকৃত্রিম, ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও অপ্রাকৃত আন্দোলন, কারণ তা যথার্থ ভগবদ্গীতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের কাছে। প্রবীণ লোকদের কাছেও এটি ধীরে ধীরে

চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। তাঁরা এর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হচ্ছেন যে, আমার অনেক শিষ্যের বাবা এবং ঠাকুরদারাও আমাদের এই মহৎ সংস্থাটির-আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আজীবন সদস্য হয়ে তাঁদের সহানুভূতি জানাচ্ছেন। লস এঞ্জেলসে আমার অনেক শিষ্যের মা-বাবারা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছি বলে প্রায়ই আমাকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, আমি যে আমেরিকায় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছি, তা আমেরিকাবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের পিতা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই, কারণ বহুদিন পূর্বে তিনিই এই আন্দোলনটি শুরু করেন, কিন্তু গুরু-পরম্পরার ধারায় আজকের মানুষের কাছে তা সুলভ হয়ে নেমে এসেছে। এই সম্পর্কে যদি আমার কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটি আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, তা আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃতিত্ব।

এই বিষয়ে আমার যদি কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটি শুধু এই জন্যই যে, ভগবদ্গীতাকে আমি অবিকৃতভাবে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। আমার এই ভগবদ্গীতা যথাযথ নিবেদন করার আগে ভগবদ্গীতার যতগুলি অনুবাদ হয়েছে, তার প্রায় সব কয়টি সংস্করণই গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ভগবদ্গীতা যথাযথ প্রকাশ করতে আমাদের এই যে প্রচেষ্টা, সেটি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করারই প্রচেষ্টা। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা। জড়বাদী মনোধর্মী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ প্রচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু আদি, তখন তথাকথিত অন্যান্য সমস্ত পণ্ডিতদের মতো আমরা বলি না যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরাত্মা এক নয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি সবই অভিন্ন। গুরু-পরম্পরাসূত্রে কৃষ্ণভক্ত না হতে পারলে, শ্রীকৃষ্ণের এই পরম পদটি উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণত তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও স্বামীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা

সত্ত্বেও যখন ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাসিত করতে চায় বা হত্যা করতে চায়। ভগবদ্গীতার উপর এই ধরনের অপ্রামাণিক ভাষ্যগুলিকে বলা হয় মায়াবাদী ভাষ্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ঐ সমস্ত পাষণ্ডীগুলির সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।" তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, কেউ যদি মায়াবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভগবদ্গীতা বুঝতে চেষ্টা করে, তা হলে তার সর্বনাশ হবে। এই সর্বনাশের ফল হচ্ছে যে, ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত পাঠক অবশ্যই পারমার্থিক জীবনে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে এবং ভগবানের কাছে ফিরে যেতে অক্ষম হবে। যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার, অর্থাৎ প্রতি ৮৬০,০০,০০,০০০ বৎসরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সেই উদ্দেশ্যকে অনুপ্রাণিত করে বদ্ধ জীবদের পথপ্রদর্শন করবার জন্যই এই ভগবদ্গীতা যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের সেই উদ্দেশ্যের কথা ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে এবং তা আমাদের যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে; তা না হলে ভগবদ্গীতা ও তাঁর বক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করা বৃথা। ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন যে, লক্ষ কোটি বৎসর আগে তিনি সূর্যদেবকে সর্বপ্রথম এই জ্ঞান দান করেন। এই সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে এবং এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কদর্থ না করে, ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার কথা উল্লেখ না করে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধ থেকে রক্ষা পেতে হলে, শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে হবে, ঠিক যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য অর্জুন তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জেনে ছিলেন। ভগবদ্গীতাকে এভাবে উপলব্ধি করা যথার্থই লাভজনক এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূরণে সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধনের জন্য অনুমোদিত।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের পক্ষে অপরিহার্য, যেহেতু তা জীবনের সর্বোচ্চ পূর্ণতা প্রদান করে। সেটি কিভাবে সম্ভব তা সম্পূর্ণভাবে ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত জড়াসক্ত তার্কিকেরা ভগবদ্গীতার অজুহাত দেখিয়ে তাদের আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছে এবং মানুষকে বিপথে চালিত করছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের সহজ সরল

উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারছে না। সকলেরই উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা, এবং প্রতিটি জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্য সেবক এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করলে তাকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মায়ার সেবা করতে হবে এবং তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিত্যকাল আবর্তিত হতে হবে; এমন কি তথাকথিত মুক্ত মনোধর্মী মায়াবাদীদেরও এই প্রচণ্ড দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই। ভগবদ্গীতার জ্ঞান হচ্ছে একটি মহৎ বিজ্ঞান এবং নিজের যথার্থ কল্যাণ সাধন করার জন্য এই জ্ঞান আহরণ করা প্রতিটি জীবের পরম কর্তব্য।

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে এই কলিযুগে, শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা মোহিত। বিভ্রান্ত হয়ে তারা মনে করে যে, জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি সাধন করার ফলেই প্রতিটি মানুষ সুখী হতে পারবে। তারা জানে না যে, এই জড়া প্রকৃতি বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি অত্যন্ত প্রবল, যেহেতু প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির কঠিন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে জীব আনন্দময় এবং তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে জীব বিভিন্নভাবে তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করার মাধ্যমে সুখী হবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে, কিন্তু সেভাবে সে কোনদিনই সুখী হতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি সাধনের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করাটাই হচ্ছে তার কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা। ভগবান সেটিই চান এবং তিনি তা দাবি করেন। ভগবদ্গীতার এই মূল ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জগৎ জুড়ে ভগবদ্গীতার এই মূল ভাবটি শিক্ষা দিচ্ছে, এবং আমরা যেহেতু ভগবদ্গীতা যথাযথের মূল ভাবটির কদর্থ করছি না, তাই যে সমস্ত মানুষ ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে ঐকান্তিকভাবে উপকৃত হতে চান, ভগবানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ভগবদ্গীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। তাই আমরা আশা করি যে, এই ভগবদ্গীতা যথাযথ পাঠ করে মানুষ পরম লাভবান হবে এবং যদি একজন মানুষও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে, তা হলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

-এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী

১২মে, ১৯৭১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়

মুখবন্ধ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।
শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভকবে করতে পারব?

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ ॥

আমি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মে ও সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য পার্যদবৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীমতী ললিতা ও বিশাখা সহ শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে ॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ! তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত

জগতের পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ। আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো, যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর ও পতিতপাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

ভগবদ্গীতার আর এক নাম গীতোপনিষদ। এটি বৈদিক দর্শনের সারমর্ম এবং বৈদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপনিষদ। এই গীতোপনিষদ্ বা ভগবদ্গীতার বেশ কয়েকটি ইংরেজী ভাষ্য ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবদ্গীতার আরও একটি ইংরেজী ভাষ্যের কি দরকার? তাই ভগবদ্গীতার এই সংস্করণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আমাকে বলতে হয়। ইদানীং একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভগবদ্গীতার কোন্ ইংরেজী অনুবাদে ভগবদ্গীতার প্রকৃত ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে?" আমেরিকাতে ভগবদ্গীতার বহু ইংরেজী সংস্করণ পাওয়া যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এমন একটি ভগবদ্গীতা পেলাম না যাতে ভগবদ্গীতার যথার্থ ভাবকে বজায় রেখে তাঁর অনুবাদ করা হয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই নয়, ভারতবর্ষেও ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদের সেই একই অবস্থা। তার কারণ হচ্ছে, ভাষ্যকারেরা

ভগবদ্গীতার মূল ভাব বজায় না রেখে তাঁদের নিজেদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা করেছেন।
ভগবদ্গীতাতেই ভগবদ্গীতার মূল ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এটি ঠিক এই রকম-আমরা যখন কোন ঔষধ খাই, তখন যেমন আমরা আমাদের ইচ্ছামতো সেই ঔষধ খেতে পারি না, ডাক্তারের নির্দেশ বা ঔষধের শিশিতে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে সেই ঔষধ খেতে হয়, তেমনই ভগবদ্গীতাকে গ্রহণ করতে হবে ঠিক যেভাবে তার বক্তা তাঁকে গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভগবদ্গীতার বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্গীতার প্রতিটি পাতায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান্ শব্দটি অবশ্য কখনও কখনও কোন শক্তিমান পুরুষ অথবা কোন দেব-দেবীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এখানে ভগবান্ শব্দটির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর তা স্বীকার করেছেন সমস্ত সত্যদ্রষ্টা ও ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা আচার্যেরা-যেমন, শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বাকাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আদি ভারতের প্রতিটি মহাপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবদ্গীতাতে বলে গেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্মসংহিতা ও সব কয়টি পুরাণে, বিশেষ করে ভাগবত-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্)। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমনভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ঠিক তেমনভাবে ভগবদ্গীতাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে (৪/১-৩) ভগবান বলেছেন-

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥

এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, এই যোগ ভগবদ্গীতা প্রথমে তিনি সূর্যদেবকে বলেন, সূর্যদেব তা বলেন মনুকে, মনু ইক্ষাকুকে এবং এভাবে গুরু-পরম্পরাক্রমে গুরুদেব থেকে শিষ্যতে এই জ্ঞান ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল। কিন্তু এক সময় এই পরম্পরা

ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা এই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তাই ভগবান কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে নিজে এসে আবার এই জ্ঞান অর্জুনের মাধ্যমে দান করলেন।
তিনি অর্জুনকে বললেন, "তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তাই রহস্যাবৃত এই পরম জ্ঞান আমি তোমাকে দান করছি।" এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভগবদ্গীতার জ্ঞান কেবল ভগবানের ভক্তই আহরণ করতে পারে। অধ্যাত্মবাদীদের সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা-জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, অথবা নির্বিশেষবাদী, ধ্যানী ও ভক্ত। এখানে ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, পূর্বের পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তিনি তাঁকে দিয়ে পুনরায় সেই পুরাতন যোগের প্রচার করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, অর্জুন এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তার প্রচার করবেন। আর এই কাজের জন্য তিনি অর্জুনকেই কেবল মনোনীত করলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর ভক্ত, তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ও তাঁর প্রিয় শিষ্য। তাই ভগবানের ভক্ত না হলে অর্থাৎ ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে না এলে ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব নয়। তাই অর্জুনের গুণে গুণান্বিত মানুষেরাই কেবল ভগবদ্গীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে প্রেম-মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে, তারই আলোকে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্পর্কের যে কোন একটির দ্বারা যুক্ত থাকেন-
(১) নিষ্ক্রিয়ভাবে ভক্ত হতে পারেন - (শান্ত)
(২) সক্রিয়ভাবে ভক্ত হতে পারেন - (দাস্য)
(৩) বন্ধুভাবে ভক্ত হতে পারেন - (সখ্য)
(৪) অভিভাবক রূপে ভক্ত হতে পারেন - (বাৎসল্য)
(৫) দাম্পত্য প্রেমিকরূপে ভক্ত হতে পারেন - (মাধুর্য)
অর্জুনের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কের রূপ ছিল সখ্য। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তার সঙ্গে পার্থিব জগতের বন্ধুত্বের বিস্তর তফাৎ। এই সম্পর্ক হচ্ছে অপ্রাকৃত এবং জড় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার করা কখনই সম্ভব নয়। যে কোন লোকের পক্ষে এই বন্ধুত্বের আস্বাদন লাভ করা সম্ভব নয়, তবুও প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত এবং এই সম্পর্কের প্রকাশ

হয় ভক্তিযোগের পূর্ণতার মাধ্যমে। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থায়, আমরা কেবল ভগবানকেই ভুলে যাইনি, সেই সঙ্গে ভুলে গেছি তাঁর সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সম্পর্কের কথা। লক্ষ কোটি জীবের মধ্যে প্রতিটি জীবেরই ভগবানের সঙ্গে কোন না কোন রকমের শাশ্বত সম্পর্ক রয়েছে, এবং সেই সম্পর্ক হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই স্বরূপের প্রকাশ হয় এবং তাকে বলা হয় জীবের 'স্বরূপসিদ্ধি'। অর্জুন ছিলেন ভগবানের ভক্ত এবং তাঁর সাথে ভগবানের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

ভগবদ্গীতার মর্মোপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে অর্জুন কিভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে (১০/১২-১৪) তা বর্ণনা করা হয়েছে-

অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥
সর্বমেতদ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥

"অর্জুন বললেন-তুমিই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরব্রহ্ম। তুমিই শাশ্বত, দিব্য, আদি পুরুষ, অজ ও বিভু। নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি সমস্ত মহান ঋষিরাই তোমার এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন, আর এখন তুমি নিজেও তা আমার কাছে ব্যক্ত করছ। হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি আমাকে যা বলেছ তা আমি সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করেছি। হে ভগবান! দেব অথবা দানব কেউই তোমার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ভগবদ্গীতা শোনার পর অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরং ব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম। প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম, কিন্তু পরম জীব অথবা পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরব্রহ্ম। পরং ধাম কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি সব কিছুর পরম আশ্রয় অথবা পরম ধাম। পবিত্রম্ মানে তিনি হচ্ছেন বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড় জগতের কোন রকম কলুষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পুরুষম্ কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনিই পরম ভোক্তা; শাশ্বতম্ অর্থ সনাতন; দিব্যম্ অর্থ অপ্রাকৃত; আদিদেবম্ অর্থ পরম পুরুষ ভগবান; অজম্ অর্থ

জন্মরহিত এবং বিভুম্ শব্দটির অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ।
কেউ মনে করতে পারেন যে, অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি ভাবোচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করেছেন। কিন্তু ভগবদ্গীতার পাঠকের মন থেকে সেই সন্দেহ দূর করার জন্য অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন যে, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসাদি ভগবৎ-তত্ত্ববিদ মহাজনেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে বিতরণকারী এই সমস্ত মহাপুরুষদের আচার্যেরা স্বীকার করেছেন। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন যে, তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাকেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে গ্রহণ করেন। সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে- "তোমার প্রতিটি কথাই আমি পরম সত্য বলে গ্রহণ করি।" অর্জুন আরও বলেছেন যে, ভগবানের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করা খুবই দুষ্কর এবং দেবতারাও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেন না। এর অর্থ হচ্ছে যে, মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত যে দেবতা, তাঁরাও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাই সাধারণ মানুষ ভগবানের ভক্ত না হলে কিভাবে তাঁকে উপলব্ধি করবে?
ভগবদ্গীতাকে তাই ভক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কখনই আমাদের সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করা উচিত নয়, এমন কি তাঁকে একজন মহাপুরুষ বলেও মনে করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। সুতরাং ভগবদ্গীতার বিবৃতি অনুসারে কিংবা অর্জুনের অভিব্যক্তি অনুসরণে যিনি ভগবদ্গীতা বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তা অন্তত তত্ত্বগতভাবে মেনে নিতে হবে এবং সেই রকম বিনম্র মনোভাব নিয়ে ভগবদ্গীতা উপলব্ধি করা সম্ভব। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবদ্গীতা না পড়লে, তা বুঝতে পারা খুবই কঠিন, কারণ এই শাস্ত্রটি চিরকালই বিপুল রহস্যাবৃত।
ভগবদ্গীতা আসলে কি? ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। প্রতিটি মানুষই নানাভাবে দুঃখকষ্ট পাচ্ছে, যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুনও এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তার ফলে তখন ভগবান

তাঁকে গীতার তত্ত্বজ্ঞান দান করে মোহমুক্ত করলেন। এই জড় জগতে কেবল অর্জুনই নন, আমরা প্রত্যেকেই সর্বদাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত। এই জড় জগতের অনিত্য পরিবেশে আমাদের যে অস্তিত্ব, তা অস্তিত্বহীনের মতো। এই জড় অস্তিত্বের অনিত্যতা আমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, কিন্তু তাতে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের অস্তিত্ব হচ্ছে নিত্য। কিন্তু যে-কোন কারণবশত আমরা অসৎ সত্তায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। অসৎ বলতে বোঝায় যার অস্তিত্ব নেই।
এই অনিত্য অস্তিত্বের ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। কিন্তু সে এতই মোহাচ্ছন্ন যে, তার দুঃখকষ্ট সম্পর্কে সে মোটেই অবগত নয়। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দুই-একজন তাদের ক্লেশ-জর্জরিত অনিত্য অবস্থাকে উপলব্ধি করতে পেরে অনুসন্ধান করতে শুরু করে, "আমি কে?" "আমি কোথা থেকে এলাম?" "কেন আমি এই জটিল অবস্থায় পতিত হয়েছি?" মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠে তার দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বুঝতে পারছে যে, সে দুঃখ-দুর্দশা চায় না, ততক্ষণ তাকে যথার্থ মানুষ বলে গণ্য করা চলে না। মানুষের মনুষ্যত্বের সূচনা তখনই হয়, যখন তার মনে এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হতে শুরু করে। ব্রহ্মসূত্রে এই অনুসন্ধানকে বলা হয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। মানব-জীবনে এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা- ব্যতীত আর সমস্ত কর্মকেই ব্যর্থ বা অর্থহীন বলে গণ্য করা হয়। তাই যারা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, "আমি কে?" "আমি কোথা থেকে এলাম?" "আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি?" "মৃত্যুর পরে আমি কোথায় যাব?" তাঁরাই ভগবদ্গীতার প্রকৃত শিক্ষার্থী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই তত্ত্ব যিনি আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করেন, তিনিই ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি অর্জন করেন। অর্জুন ছিলেন এমনই একজন অনুসন্ধানী শিক্ষার্থী।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে দেবার জন্যই এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার তত্ত্বানুসন্ধানী মানুষের মধ্যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি কেবল ভগবৎ-তত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন, এবং এমন মানুষের জন্যই ভগবান ভগবদ্গীতা শুনিয়েছেন। অজ্ঞতারূপ হিংস্র জন্তুটি আমাদের প্রতিনিয়ত গ্রাস করে

চলেছে, কিন্তু ভগবান করুণাময়, বিশেষ করে মানুষের প্রতি তাঁর করুণা অপার। তাই তিনি তাঁর বন্ধু অর্জুনকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে মানুষকে ভগবৎ-তত্ত্ব দান করে গেছেন। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহচর, তাই জড় জগতের অজ্ঞতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছানুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যাতে তিনি তাঁর সেই সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, এবং তাঁর মাধ্যমে ভগবান আগামী দিনের মানুষের উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভগবদ্গীতা বর্ণনা করলেন। অপার করুণাময় ভগবান মানব-জীবনকে সার্থক করে তুলবার জন্য মানুষকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত করলেন, আর তাদের নির্দেশ দিলেন কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা উচিত।
ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তুতে আমরা পাঁচটি মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সর্বপ্রথমে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর জীব প্রতিনিয়তই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যদি কেউ বলে যে, সে কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, সে মুক্ত, তা হলে বুঝতে হবে সে উন্মাদ। জীব সর্বদাই, বিশেষ করে বদ্ধ অবস্থায় সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই ভগবদ্গীতায় পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর ও সর্বদা নিয়ন্ত্রিত জীবের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রকৃতি (জড়া প্রকৃতি), কাল (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও জড়া প্রকৃতির অভিব্যক্তির অস্তিত্বের স্থিতিকাল) এবং কর্মও (কার্যকলাপ) আলোচনা করা হয়েছে। ভৌতিক জগতের প্রকাশ বিভিন্ন কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। সমস্ত জীবেরা বিভিন্ন কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই ভগবদ্গীতা থেকে আমাদের জানতে হবে ভগবান কে? জীব কি? প্রকৃতি কি? ভৌতিক জগৎ কি? আর কিভাবে তা মহাকালের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং জীবের কার্যকলাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
ভগবদ্গীতায় এই পাঁচটি বিষয়বস্তু আলোচনা করার মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম বা পরম নিয়ন্তা বা পরমাত্মা-যে নামেই তাঁকে সম্বোধন করা হোক, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল জীবই পরম নিয়ন্তার মতোই গুণগতভাবে সমান। যেমন, জড়া প্রকৃতিজাত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ভগবান নিয়ন্ত্রণ করছেন, যা ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

জড়া প্রকৃতি স্বাধীন নয়। পরমেশ্বরের নির্দেশে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ "এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় ক্রিয়াশীল।" আমরা যখন ভৌতিক জগতে বিস্ময়কর কোন কিছু ঘটতে দেখি, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে, এর পেছনে একজন নিয়ন্তা রয়েছেন। নিয়ন্ত্রিত না হলে কোন কিছুরই প্রকাশ হতে পারে না। যদি কেউ মনে করে যে, কোন পরিচালক ব্যতীতই প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে, তবে তা শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা। একটি শিশু যেমন একটি মোটর গাড়ি চলতে দেখে মনে করতে পারে যে, কোন ঘোড়া বা পশুর দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মোটর গাড়িটি নিজে নিজে চলছে, কিন্তু পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষই মোটর গাড়ির কারিগরি ব্যবস্থার ব্যাপারটি জানে। সে জানে যে, একজন চালক কলকব্জা নাড়িয়ে সেই গাড়িটিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন এই ভৌতিক জগতের সমস্ত কিছুর পরিচালক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে। জীব হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং ভগবদ্গীতাতে তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এক বিন্দু সমুদ্রের জল যেমন গুণগতভাবে সমস্ত সমুদ্রের জল থেকে অভিন্ন, এক কণা সোনাও যেমন সোনা, ঠিক তেমনই জীব পরম নিয়ন্তা বা ঈশ্বর বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে, ভগবানের সমস্ত গুণই তার মধ্যে অণু পরিমাণে বিদ্যমান, কেন না প্রতিটি জীব ক্ষুদ্র ঈশ্বর, নিয়ন্ত্রণাধীন ঈশ্বর। আমরা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছি, যেমন এখন আমরা অন্তরিক্ষ অথবা অন্যান্য গ্রহ নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছি। এই প্রচেষ্টা স্বাভাবিক, কারণ কর্তৃত্ব করার এই গুণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার বাসনা আমাদের মনে থাকলেও আমাদের বোঝা উচিত যে, আমরা পরম নিয়ন্তা নই। ভগবদ্গীতাতে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জড়া প্রকৃতি কি? গীতায় তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে নিকৃষ্টা প্রকৃতি আর জীবকে বলা হয়েছে উৎকৃষ্টা প্রকৃতি। উৎকৃষ্ট হোক বা নিকৃষ্টই হোক, প্রকৃতি সব সময় নিয়ন্ত্রণাধীন। স্ত্রী যেমন স্বামীর দ্বারা পরিচালিত হয়, নারীস্বরূপা প্রকৃতিও তেমনই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়। জীব ও জড়া প্রকৃতি উভয়কে পরমেশ্বর পরিচালিত করেন। গীতাতে বলা হয়েছে, জীব যদিও ভগবানের অপরিহার্য অংশ, তবুও তাকে প্রকৃতি বলেই স্বীকার করতে হবে। ভগবদ্গীতার সপ্তম

অধ্যায়ে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্/জীবভূতাম্-"এই জড়া প্রকৃতি আমার নিম্নতর প্রকৃতি, এই নিম্নতর প্রকৃতির অতীত আর একটি প্রকৃতি আছে-জীবভূতাম্ অর্থাৎ জীবসত্তা।
জড়া প্রকৃতি গঠিত হয়েছে সত্ত্ব, রজ ও তম-এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে। এই গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে আছে অনন্ত কাল এবং অনন্ত কালের প্রভাবে ও পরিচালনায় এই গুণগুলির সমন্বয় ঘটে এবং তার ফলে প্রকৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে-একে বলা হয় কর্ম। অনন্ত কাল ধরে এই কর্মপ্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। আমরা আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করি। যেমন, মনে করা যাক যে, আমি একজন ব্যবসায়ী, তখন আমি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করি, তবে আমি সেই অর্থ উপভোগ করতে পারি। কিন্তু আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ অপচয় করে ফেলি, তবে আমাকে ক্লেশ স্বীকার করতেই হবে। সেই রকম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ পেয়ে থাকি। ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম-এই সব কিছুরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পাঁচটির মধ্যে ঈশ্বর, জীব, জড়া প্রকৃতি ও কাল হচ্ছে নিত্য। প্রকৃতির অভিপ্রকাশ অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়। কোন কোন দার্শনিক বলে থাকেন যে, জড়া প্রকৃতির প্রকাশ মিথ্যা, কিন্তু ভগবদ্গীতার দর্শন বা বৈষ্ণব দর্শন তা স্বীকার করে না। প্রকৃতির প্রকাশ যদিও সাময়িক, তবুও তা সত্য। তাকে আকাশে ভাসমান মেঘ অথবা শস্যের পুষ্টি সাধনকারী বর্ষা ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। যখন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে যায় এবং মেঘ ভেসে চলে যায়, তখন সমস্ত শস্যকণা যা বৃষ্টির ফলে পুষ্ট হয়েছিল, তা শুকিয়ে যায়। তেমনই কোন এক সময়ে এই জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিছুকালের জন্য তার স্থিতি হয় এবং তারপর তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। প্রকৃতি এভাবে কাজ করে চলে। এভাবে অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির প্রকাশ, স্থিতি ও অন্তর্ধান হয়ে চলেছে। তাই প্রকৃতি নিত্য, প্রকৃতি মিথ্যা নয়। ভগবান তাই একে বলেছেন, "আমার প্রকৃতি।" এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ভিন্না প্রকৃতি। তেমনই জীবও হচ্ছে ভগবানের শক্তি, তবে তারা বিচ্ছিন্ন নয়, ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। তাই ঈশ্বর, জীব, জড়া প্রকৃতি ও কাল একে অপরের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সকলেই নিত্য। কিন্তু অন্য বিষয় কর্ম নিত্য নয়।

বস্তুত কর্মের ফল অতি প্রাচীন হতে পারে। স্মরণাতীত কাল থেকে কর্মের ফলস্বরূপ আমরা সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছি। কিন্তু আমরা আমাদের কর্মফলকে পরিবর্তিত করতে পারি এবং এই পরিবর্তন নির্ভর করে আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতার উপর। আমরা নানা রকমের কর্ম সম্পাদন করি। নিঃসন্দেহে আমরা জানি না, কোন্ কর্ম আমাদের করা উচিত এবং কোন্ কর্ম করা উচিত নয়। বিশেষ করে আমরা জানি না, কোন্ কর্ম করলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় ভগবান তার ব্যাখ্যা করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন কোন্ কর্ম করা আমাদের কর্তব্য।
ঈশ্বর হচ্ছেন পরম চেতনার উৎস। জীব ঈশ্বরের অপরিহার্য অংশ, তাই সেও চেতন। জীব ও জড়া প্রকৃতি উভয়কেই প্রকৃতি বা ভগবানের শক্তি বলা হয়। কিন্তু তার মধ্যে জীবই কেবল চেতন-জড়া প্রকৃতি অচেতন। সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। তাই জীব-প্রকৃতিকে উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি বলা হয়, কেন না জীব ভগবানের মতো চৈতন্যময়। ঈশ্বর কিন্তু পরম চৈতন্যময়, কেউ যদি বলে যে, জীবও পরম চৈতন্যময়, তবে তা ভুল হবে। জীব কোন অবস্থাতেই সমস্ত চেতনার উৎস হতে পারে না। জীব তার সিদ্ধি লাভের কোন অবস্থাতেই পরম চৈতন্যময় হতে পারে না, এবং জীব তা হতে পারে কোন মতবাদে যদি বলে, তবে সেটি বিভ্রান্তিকর মতবাদ। সে চৈতন্যময় বটে, কিন্তু পরম চৈতন্যময় নয়। জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, জীবের মতো ভগবানও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন, তবে জীব কেবল তার নিজের দেহটি সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু ভগবান সমস্ত দেহ সম্বন্ধেই সচেতন। যেহেতু তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাই তিনি সকলের অন্তরতম প্রদেশের কথা জানেন। এই কথা আমাদের ভুললে চলবে না। এই সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরমাত্মারূপে সর্বজীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং জীবের বাসনা অনুসারে তিনিই তাদের পরিচালিত করেন। মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব তার কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়। প্রথমত তার স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে সে কোন কিছু করার সংকল্প করে, এবং তারপর সে নিজের কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে এক দেহ পরিত্যাগ করে আর এক দেহ ধারণ করে-যেমন আমরা পুরাতন কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরি। এভাবে পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ আত্মা এক

দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় এবং তার বিগত কর্ম অনুসারে সে নানা রকম কষ্ট পায়। কিন্তু জীব যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিস্থ হয় এবং তার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখনই সে তার পূর্বকৃত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন আর তাকে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কর্ম নিত্য নয়। তাই ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল হচ্ছে নিত্য, কিন্তু কর্ম অনিত্য।

পরম চৈতন্যময় ঈশ্বর ও জীব গুণগতভাবে এক। ঈশ্বরের পরম চৈতন্য এবং জীবের অণুচেতনা, উভয়েই অপ্রাকৃত। এমন নয় যে, জড় বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে জীবের চেতনার বিকাশ হয়। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কোন বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে জড়ের মধ্য থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, সেই কথা গীতায় স্বীকার করা হয়নি। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে চেতনার বিকৃত প্রতিফলন হতে পারে এবং তা হচ্ছে রঙিন কাঁচের মাধ্যমে প্রতিফলিত রঙিন আলোকের মতো। কিন্তু পরমেশ্বরের চেতনা কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত বা কলুষিত হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ- "আমার দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতি।" তিনি যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর চেতনা জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। তাই যদি হত, তবে তিনি পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করতে পারতেন না। জড়া প্রকৃতির দ্বারা চেতনা যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ব্যক্ত করা যায় না। ভগবান পরম চৈতন্যময় এবং তিনি জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তাই, অপ্রাকৃত জগতের পূর্ণ জ্ঞান কেবল তিনিই দান করতে পারেন। আমাদের চেতনা এখন জড়া প্রকৃতির প্রভাবে, কলুষিত হয়ে আছে। তাই, ভগবদ্গীতার মাধ্যমে ভগবান আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে আমাদের চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হলে আমাদের অন্তর ভগবন্মুখী হয়ে ওঠে এবং তখন আমাদের সমস্ত কর্তব্যকর্মই ভগবানের ইচ্ছানুসারে সাধিত হয়, ফলে আমরা সুখী হতে পারি। এমন নয় যে, কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করতে হবে। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে কর্তব্যকর্মকে পবিত্র করা। এই পবিত্র কর্মেরই নাম ভক্তি। ভক্তির বশবর্তী হয়ে যে কর্ম করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে তাকে সাধারণ কর্ম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই কর্মকে কোন রকম কলুষতা কখনও স্পর্শ

করতে পারে না। ভগবানের ভক্তকে দেখে একজন মূর্খ লোক-মনে করতে পারে যে, তিনি সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করে চলেছেন, কিন্তু সেটি তার নির্বুদ্ধিতা। সে বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্ত অথবা ভগবানের কার্যকলাপ অপবিত্র চেতনা বা জড়ের দ্বারা কলুষিত হয় না। সেই সমস্ত ত্রিগুণাতীত। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের চেতনা এখন কলুষিত এবং তাই ভক্তিযোগ সাধন করার মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে কলুষমুক্ত করতে হবে।

আমরা যখন জড়ের প্রভাবে কলুষিত থাকি, তখন আমাদের সেই অবস্থাকে বলা হয় বদ্ধ অবস্থা। এই বদ্ধ অবস্থায় আমাদের চেতনা বিকৃত হয়ে থাকে এবং তার ফলে আমরা মনে করি যে, জড় পদার্থ থেকে আমরা উদ্ভূত হয়েছি। এরই নাম অহঙ্কার। যে মানুষ তার দেহগত চিন্তায় মগ্ন, সে কখনও তার স্বরূপ জানতে পারে না। ভগবান ভগবদ্গীতায় বলেছিলেন, যাতে মানুষ তার দেহগত ভাবনাকে অতিক্রম করে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করার জন্যই অর্জুন নিজেকে সেই অবস্থায় উপস্থাপিত করেছিলেন। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে অবশ্যই মুক্তিলাভ করতে হবে; অধ্যাত্মবাদীদের সেটিই প্রাথমিক কর্তব্য। এই জড় বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায়, তাকে প্রথমে জানতে হবে যে, তার প্রকৃত স্বরূপ তার জড় দেহটি নয়। মুক্তির অর্থই হচ্ছে জড় চেতনা থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীমদ্ভাগবতেও মুক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, মুক্তির্হিত্বানাথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ-মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগতের কলুষিত চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ চেতনার ভরে অবস্থিত হওয়া।

ভগবদ্গীতার প্রতিটি নির্দেশই এই পবিত্র শুদ্ধ চেতনার স্তরে অবস্থিত হওয়ার কথা বলছে এবং তাই আমরা দেখতে পাই যে, ভগবদ্গীতার শেষ পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তাঁর চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছে কি না। পবিত্র বা বিশুদ্ধ চেতনা বলতে বোঝায় ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা। এই হচ্ছে বিশুদ্ধ চেতনার মর্মার্থ। আমরা যেহেতু ভগবানের অপরিহার্য অংশ, তাই আমরা চেতন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আমাদের চেতনা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভগবান যেহেতু পরমেশ্বর, তাই তিনি কখনই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না। ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জীব ও ভগবানের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য।

এই চেতনা বলতে কি বোঝায়? এই চেতনা হচ্ছে "আমি আছি।" তারপর আমি কি? কলুষিত চেতনায় এই আমি মানে, "আমি হচ্ছি সমস্ত জগতের অধীশ্বর। আমি হচ্ছি ভোক্তা।" এই জগৎ প্রতিনিয়তই আবর্তিত হচ্ছে, কারণ প্রত্যেকটি জীবসত্তা মনে করে যে, সে হচ্ছে এই জড় জগতের স্রষ্টা ও অধীশ্বর। জড় চেতনার দুটি প্রকাশ হয়। তার একটির প্রভাবে জীব মনে করে সে হচ্ছে স্রষ্টা এবং অন্যটির প্রভাবে সে মনে করে সে হচ্ছে ভোক্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা ও ভোক্তা, আর জীব ভগবানের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে সে স্রষ্টাও নয়, ভোক্তাও নয়, সে হচ্ছে সহায়ক। সে হচ্ছে সৃষ্ট ও ভোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি যন্ত্রের একটি অংশ যেমন সমগ্র যন্ত্রটির পরিচালনায় সহযোগিতা করে, ঠিক তেমনই ভগবানের অংশ হবার ফলে জীবের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। হাত, পা, চোখ, মুখ আদি হচ্ছে দেহের অংশ, কিন্তু তারা কখনই ভোক্তা নয়। ভোক্তা হচ্ছে উদর, এগুলি সমষ্টিগতভাবে কাজ করে উদরকে ভোগ করতে সাহায্য করে। যেমন পা দেহকে বহন করে নিয়ে চলে, হাত খাদ্য সংগ্রহ করে, দাঁত চর্বণ করে। এভাবে সমস্ত দেহই উদরকে ভোগ করতে সহযোগিতা করে, কারণ উদর তুষ্ট হলে সমস্ত দেহ পুষ্ট হয়। তাই সব কিছু উদরকে দেওয়া হয় এবং তার ফলে সমস্ত দেহ বলিষ্ঠ ও সক্রিয় হয়। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিকে জল দেওয়া হয়, উদরকে খাদ্য দিলে যেমন দেহকে খাদ্য দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই পরম স্রষ্টা ও পরম ভোক্তা ভগবানের সৃষ্টিকার্যে ও ভোগের কার্যে সহযোগিতা করাই আমাদের কর্তব্য। এভাবে তাঁকে তুষ্ট করার ফলেই আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সফল হয়। যদি হাতের আঙুল মনে করে, উদরকে না দিয়ে সে নিজেই সব কিছু খাবে, তা হলে তাকে নিরাশ হতে হবে। ঠিক তেমনই জীব যদি মনে করে, ভগবানকে বাদ দিয়ে সে নিজেই সুখী হবে, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে। ভগবান সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, আর সমস্ত জীব হচ্ছে তাঁর সহায়ক। ভগবানের সহায়তা করার মাধ্যমে জীব তার অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার ফলেই সে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। প্রভু যদি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়, তবে ভৃত্যও সন্তুষ্ট হয়। সেই রকম, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা

উচিত। যদিও সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রবণতা এবং জড় জগৎ উপভোগের প্রবণতা জীবদের মধ্যেও রয়েছে, কেন না প্রকাশমান জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে সেই একই প্রবণতা বিদ্যমান। সুতরাং, ভগবদ্গীতাতে আমরা দেখতে পাব যে, পরম নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রণাধীন জীবসকল, নিখিল জগৎ, মহাকাল ও কর্ম-এই সব নিয়েই পূর্ণ সত্তা বিরাজিত, এবং সব কিছুরই আলোচনা এখানে ব্যাখ্যা করা আছে। এগুলি এক সাথে নিয়েই পূর্ণ পরম সত্তা গঠিত হয়। এই পূর্ণ সত্তাকে বলা হয় পরমতত্ত্ব। এই পূর্ণ সত্তা ও পূর্ণ পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁরই বিভিন্ন শক্তির ফুলে সমস্ত কিছুরই অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে। তিনিই হচ্ছেন সম্যভাবে পূর্ণ।
গীতাতে এই কথাও বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মও হচ্ছে পূর্ণ পরম পুরুষের অধীন (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্)। নির্বিশেষ ব্রহ্মোর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে ব্রহ্মসূত্রতে বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মা হচ্ছে সূর্যরশ্মির মতো। নির্বিশেষ ব্রহ্মা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের রশ্মিচ্ছটা। তাই, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে পূর্ণ পরম-তত্ত্বের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি এবং পরমাত্মার ধারণাও সেই রকম। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখা যাবে যে, পরমাত্মা উপলব্ধিও ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি নয়। কারণ পরমাত্মা হচ্ছে ভগবানের আংশিক প্রকাশ। ভগবদ্গীতাতে আমরা জানতে পারি যে, পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই ঊর্ধ্বে পরমতত্ত্ব। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ব্রহ্মসংহিতার শুরুতেই বলা হয়েছে ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ/অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্। "পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ, অনাদির আদি গোবিন্দ এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্তবিগ্রহ হচ্ছেন তিনিই।" ব্রহ্মা-উপলব্ধি হচ্ছে তাঁর সৎ (শাশ্বত সনাতন) বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি। পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে সৎ-চিৎ (অনন্ত জ্ঞান) রূপের উপলব্ধি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা হচ্ছে তাঁর সৎ, চিৎ ও আনন্দের অপ্রাকৃত রূপকে পূর্ণভাবে অনুভব করা।
অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ, তাঁর কোন রূপ নেই, কোন আকার নেই, কিন্তু তাদের এই ধারণাটি ভুল। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃত চিন্ময় পুরুষ; সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। (কঠ উপনিষদ ২/২/১৩) যেমন আমরা সকলে

স্বতন্ত্র জীব এবং আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনই পরম-তত্ত্বের সর্বোচ্চ স্তরে যিনি সর্বকারণের কারণ, তাঁরও রূপ আছে। তিনি পুরুষ, তিনি ভগবান এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত কিছুর উৎস হচ্ছেন তিনিই। তাঁকে উপলব্ধি করা হলে তাঁর অপ্রাকৃত রূপের সব কিছুই উপলব্ধি করা হয়ে যায়। যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি কখনই নির্বিশেষ হতে পারেন না। যদি তিনি নির্বিশেষ হন, যদি তিনি কোন কিছু থেকে ন্যূন হন, তবে তিনি পূর্ণ হবেন কেমন করে? আমাদের অভিজ্ঞতায় যা আছে এবং যা আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত, তা সবই ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান। নতুবা তা পূর্ণতত্ত্ব হতে পারে না।

সম্যক্ সম্পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের মধ্যে রয়েছে বিপুল শক্তিরাজি (পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে)। শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ কিভাবে হয়, তাও ভগবদ্গীতাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ অথবা অনিত্য জড় জগৎ, যাতে আমরা অধিষ্ঠিত হয়েছি, এটিও স্বয়ং পূর্ণ, কারণ যে চব্বিশটি উপাদান দ্বারা এই জড় জগৎ অনিত্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সাংখ্য-দর্শন অনুযায়ী, তাদের সম্যক্রূপে সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত হয়েছে পূর্ণ সম্পদ, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য। এর মধ্যে কোন কিছুই অতিরিক্ত নেই, আবার অন্য কিছুর দরকারও নেই। এই অভিপ্রকাশের স্থায়িত্ব পরম পূর্ণের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত নিজস্ব সময়ের উপর নির্ভরশীল। সেই সময় শেষ হয়ে গেলে, পরম পূর্ণের পূর্ণ ব্যবস্থার নির্দেশে এই অস্থায়ী অভিব্যক্তির লয় হয়ে যায়। এখানে জীবও তার ক্ষুদ্র সত্তা নিয়ে পূর্ণ এবং পরম পূর্ণ ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সমস্ত জীবেরই আছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, তাই আমরা সব রকমের অপূর্ণতা অনুভব করি। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে বেদে এবং বৈদিক জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে ভগবদ্গীতাতে।

বেদের সমস্ত জ্ঞানই অভ্রান্ত। হিন্দুরা জানে যে, বেদ পূর্ণ ও অভ্রান্ত। যেমন স্মৃতি, অর্থাৎ বৈদিক অনুশাসন অনুযায়ী পশুর মল অপবিত্র এবং তা স্পর্শ করলে স্নান করে পবিত্র হতে হয়। আবার বৈদিক শাস্ত্রেই বলা হচ্ছে যে, গোময় পশুর মল হলেও তা পবিত্র, এমন কি কোন স্থান যদি অপবিত্র হয়ে থাকে, তবে সেখানে গোময় লেপন করলে তা পবিত্র হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এটি পরস্পরবিরোধী উক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বৈদিক অনুশাসন বলেই এটি গ্রহণ করা

হয়েছে এবং এটি গ্রহণ করে কেউ ভুল করেছে, তা বলা হয় না। পরবর্তী কালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, গোময়ে সব কয়টি জীবাণুনাশক গুণ বর্তমান রয়েছে। সুতরাং বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত এবং তাই বেদকে নিঃশঙ্কচিত্তে অনুসরণ করা যায়। বৈদিক জ্ঞান সব রকম সন্দেহ ও ভ্রান্তির অতীত, এবং ভগবদ্গীতা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ।

বৈদিক জ্ঞান নিয়ে গবেষণা চলে না। গবেষণা বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা ত্রুটিপূর্ণ, কারণ ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ সব গবেষণা হয়ে থাকে। ত্রুটিহীন, অভ্রান্ত জ্ঞান আমাদের ভগবদ্গীতা থেকে গ্রহণ করতে হবে, যার উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং যা গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। অর্জুন যখন শিষ্যরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গীতার জ্ঞান আহরণ করেন, তখন তিনি কোন রকম বাদানুবাদ না করে, ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবদ্গীতাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা চলে না। আমরা বলতে পারি না যে, ভগবদ্গীতার একটি অংশ আমরা গ্রহণ করব, আর বাকিটা গ্রহণ করব না। ভগবদ্গীতার বাণী সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে খেয়ালখুশি মতো বাদ না দিয়ে কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা না করেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে তা বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই ভগবদ্গীতার যথাযথ নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, গীতা হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ। বৈদিক জ্ঞান এই জড় জগতের জ্ঞান নয়, এর প্রবর্তক হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তাই বেদের জ্ঞান হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। অপ্রাকৃত উৎস থেকে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করতে হয় এবং এর প্রথম বাণী নিঃসৃত হয়েছিল স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীকে বলা হয় অপৌরুষেয়, অর্থাৎ ভগবানের কথা সাধারণ মানুষের কথার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, সাধারণ মানুষ চারটি ত্রুটির দ্বারা কলুষিত-১) ভ্রম, ২) প্রমাদ, ৩) বিপ্রলিপ্সা, ৪) করণাপাটব। ভ্রম-সাধারণ মানুষ অবধারিতভাবে ভুল করে; প্রমাদ-সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন বিপ্রলিপ্সা-সে অন্যকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করে এবং করণাপাটব-সে তার ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত। এই সমস্ত ত্রুটি থাকার ফলে মানুষ সর্বপরিব্যাপ্ত পরম জ্ঞান গ্রহণ করতে ও প্রদান করতে অক্ষম। বৈদিক জ্ঞান এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ জীবদের দ্বারা প্রদত্ত হয়নি। প্রথম সৃষ্ট

জীব। ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান সর্বপ্রথমে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তারপর ব্রহ্মা যেভাবে পরমেশ্বরের কাছ থেকে সেই জ্ঞান পেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর সন্তান ও শিষ্যদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা তাঁর কখনই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই যাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন তাঁরা বুঝতে পারেন, ভগবানই হচ্ছেন আদি স্রষ্টা-ব্রহ্মাকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই হচ্ছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর ভোক্তা। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবানকে প্রপিতামহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। এভাবে সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা। তাই আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয়, আমরা কোন কিছুর মালিক। মালিক কেবল তিনিই, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। জীবন ধারণ করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন এবং ভগবান আমাদের জন্য যতটুকু নির্ধারিত করে রেখেছেন, ঠিক ততটুকুই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের জন্য ভগবান যতটুকু নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা কিভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে তার অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণ আছে। ভগবদ্গীতাতেও এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন ঠিক করেন তিনি যুদ্ধ করবেন না। এটি ছিল তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানকে বলেন যে, সেই যুদ্ধে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের হত্যা করে রাজ্যভোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তাঁর দেহ, এবং তাঁর দেহজাত আত্মীয়-পরিজন, ভাই, ভাইপো, ভগ্নীপতি, পিতামহ প্রভৃতিকে তিনি তাঁর আপনজন বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর দেহের দাবিগুলি মেটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঐ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্যই ভগবান ভগবদ্গীতার দিব্যজ্ঞান তাঁকে দান করেন। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারার ফলেই অর্জুন ভগবানের পরিচালনায় যুদ্ধ করতে ব্রতী হন। তখন তিনি বলেন, করিষ্যে বচনং তব "তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

এই পৃথিবীতে মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো ঝগড়া করে দিন কাটাবার জন্য আসেনি। তাকে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং একটি পশুর মতো জীবন যাপন করা বর্জন করতে হবে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র মানব-জীবনের

যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছে, এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ ব্যক্ত হয়েছে ভগবদ্গীতাতে। বৈদিক সাহিত্য মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে মানবজীবন সার্থক করে তোলা। কোন পশু যখন অন্য পশুকে হত্যা করে, তাতে তার পাপ হয় না, কিন্তু মানুষ যদি তার বিকৃত রুচির তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন পশুকে হত্যা করে, তখন সে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয়। ভগবদ্গীতাতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে তিন রকমের কর্ম সাধিত হয়, যথা-সত্ত্বগুণের প্রভাবে কর্ম, রজোগুণের প্রভাবে কর্ম এবং তমোগুণের প্রভাবে কর্ম। তেমনই আহার্য বস্তুও আছে তিন ধরনের-সত্ত্বগুণের আহার, রজোগুণের আহার, আর তমোগুণের আহার। এই সবই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা আছে এবং যদি আমরা ভগবদ্গীতার এই সব নির্দেশ যথার্থভাবে কাজে লাগাই, তা হলে আমাদের সারা জীবন পবিত্র হয়ে উঠবে এবং পরিণামে আমরা এই জড় জগতের আকাশের ঊর্ধ্বে আমাদের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব (যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম')। এই পরম গন্তব্যস্থলের নাম 'সনাতন ধাম'। সেই নিত্য শাশ্বত অপ্রাকৃত জগৎই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত আলয়। এই জড় জগতে আমরা দেখতে পাই সব কিছু অস্থায়ী। তাদের প্রকাশ হয়, কিছুকালের জন্য তারা অবস্থান করে, কিছু ফল প্রসব করে, ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তারপর এক সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে এই জড় জগতের ধর্ম, আমাদের এই দেহ, অথবা এক টুকরো ফল অথবা অন্য যে-কোন কিছুরই দৃষ্টান্ত আমরা দিই না কেন। কিন্তু এই অস্থায়ী জগতের অতীত আর একটি জগৎ আছে, যার কথা আমরা জানতে পারি বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে। সেই জগৎ শাশ্বত, সনাতন। বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি জীবও শাশ্বত, সনাতন। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ভগবান সনাতন এবং সনাতন ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার ফলে জীবাত্মাও সনাতন। ভগবানের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, এবং যেহেতু গুণগতভাবে সনাতন ধাম, সনাতন ভগবান ও সনাতন জীব-সবই এক, তাই ভগবদ্গীতার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সনাতন বৃত্তি অথবা আমাদের সনাতন ধর্মকে পুনর্জাগরিত করা। অস্থায়ীভাবে আমরা নানা ধরনের কর্মে নিয়োজিত হয়ে রয়েছি, কিন্তু এই সমস্ত কর্ম পবিত্রতা অর্জন

করতে পারে, যদি আমরা এই সমস্ত অস্থায়ী কর্ম বর্জন করি আর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ মতো কর্মভার গ্রহণ করি। এরই নাম পবিত্র জীবন।

ভগবান ও তাঁর দিব্যধাম উভয়ই সনাতন। জীবও সনাতন। জীব যখন তার সনাতন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে সনাতন ধামে ভগবানের সান্নিধ্যে আসে, তখনই তার জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। যেহেতু সমস্ত জীব পরমেশ্বরেরই সন্তান, সেই কারণে তাদের সকলেরই প্রতি তিনি পরম করুণাময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে (১৪/৪) বলেছেন, সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ/তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা-"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই তাদের জননী এবং আমিই বীজ প্রদানকারী পিতা।" অবশ্যই বিভিন্ন কর্ম অনুসারে সব রকমের জীব রয়েছে, কিন্তু এখানে ভগবান বলেছেন যে, তিনি সকলেরই পিতা। তাই এই পৃথিবীতে ভগবান অবতরণ করেন এই সমস্ত পতিত, বদ্ধ জীবাত্মাদের উদ্ধার করবার জন্য, যাতে তারা তাদের শাশ্বত সনাতন অবস্থা ফিরে পেয়ে ভগবানের সঙ্গে চিরন্তন সঙ্গ লাভ করে এবং সনাতন শাশ্বত চিদাকাশে আবার অধিষ্ঠিত হতে পারে। ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন অবতাররূপে অবতরণ করেন, কখনও বা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে অথবা তাঁর প্রিয় সন্তানকে পাঠান, কখনও বা তাঁর অনুগামী ভৃত্যকে বা আচার্যকে পাঠান বদ্ধ জীবাত্মাদের উদ্ধার করবার জন্য।

তাই সনাতন ধর্ম বলতে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মপদ্ধতিকে বোঝায় না। এটি হচ্ছে পরম শাশ্বত ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নিত্য শাশ্বত জীবসকলের নিত্য ধর্ম। আগেই বলা হয়েছে, সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবের নিত্য ধর্ম। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য সনাতন শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যার কোন শুরু নেই এবং শেষ নেই।" তাই যখন আমরা সনাতন ধর্মের কথা বলি, শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের নির্দেশানুসারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ধর্মের আদি নেই এবং অন্ত নেই। বর্তমান জগতে ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, সনাতন ধর্ম ঠিক তা নয়। ধর্ম বলতে সাধারণত কোন বিশ্বাসকে বোঝায়, এবং এই বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে পারে। কোন বিশেষ পন্থার প্রতি কারও বিশ্বাস থাকতে পারে, এবং সে এই বিশ্বাসের পরিবর্তন করে অন্য কিছু গ্রহণ করতেও পারে। কিন্তু সনাতন ধর্ম বলতে সেই সব কার্যকলাপকে বোঝায়, যা পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন, জল থেকে

তার তরলতা কখনই বাদ দেওয়া যায় না, আগুন থেকে যেমন তাপ ও আলোককে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনই সনাতন জীবের সনাতন বৃত্তি জীবের থেকে আলাদা করা যায় না। জীবের সঙ্গে তার সনাতন ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং যখন আমরা সনাতন ধর্মের কথা বলি, তখন শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের প্রামাণ্য ভাষ্য মেনে নিতে হবে যে, এর কোন আদি-অন্ত নেই। যার কোন আদি নেই, অন্ত নেই, সেই ধর্ম কখনই সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। এই ধর্ম সমস্ত জীবের ধর্ম, তাই তাকে কখনই কোন সীমার মধ্যে সীমিত রাখা যায় না। একে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধ রাখাও চলে না। কিন্তু তবুও কিছু সাম্প্রদায়িক লোক মনে করে যে, 'সনাতন ধর্মও' একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম, কিন্তু এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃত বুদ্ধিজাত অন্ধতার প্রকাশ। আমরা যখন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন ধর্মের যথার্থতা বিশ্লেষণ করি, তখন দেখি যে এই ধর্ম পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ধর্ম-শুধু তাই নয়, এই ধর্ম সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের ধর্ম।

অসনাতন ধর্মবিশ্বাসের সূত্রপাতের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ষপঞ্জিতে লেখা থাকতে পারে, কিন্তু সনাতন ধর্মের সূত্রপাতের কোন ইতিহাস নেই, কারণ সনাতন ধর্ম সনাতন জীবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থেকে চিরকালই বর্তমান। জীব সম্বন্ধেও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সে জন্ম-মৃত্যুর অতীত। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, জীবের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। সে শাশ্বত ও অবিনশ্বর এবং তার দেহের মৃত্যু হলেও তার কখনই মৃত্যু হয় না। সনাতন ধর্ম বলতে যে ধর্ম বোঝায়, তা আমাদের বুঝতে হবে ধর্ম কথাটির সংস্কৃত অর্থের মাধ্যমে। ধর্ম বলতে বোঝায় যা অপরিহার্য অঙ্গরূপে কোন কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। যেমন, তাপ ও আলোক এই দুটি গুণ আগুনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাপ ও আলোক ছাড়া আগুনের কোন রকম প্রকাশ হতে পারে না। তেমনই, জীবের অপরিহার্য অঙ্গ কি? জীবের অস্তিত্বের প্রকাশ কিভাবে হয়? তার নিত্য সঙ্গীরূপে যা তার সঙ্গে চিরকাল বিদ্যমান তা কি? তার এই নিত্য সঙ্গী হচ্ছে তার শাশ্বত গুণবৈশিষ্ট্য, এবং এই শাশ্বত গুণবৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার সনাতন ধর্ম। সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, "জীবের 'স্বরূপ' হয়-কৃষ্ণের নিত্যদাস।" পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যদাসত্বই হচ্ছে

জীবের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তির বিশ্লেষণ যদি আমরা করি, তা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রতিটি জীবই সর্বক্ষণ কারও না কারও সেবায় ব্যস্ত। এভাবে অপরের সেবা করার মাধ্যমেই জীব জীবনকে উপভোগ করে। নীচুস্তরের পশুরা ভৃত্য যেভাবে প্রভুর সেবা করে, ঠিক সেভাবে মানুষের সেবা করে। মানুষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, 'খ' প্রভুকে 'ক' সেবা করে, 'গ' প্রভুকে 'খ' সেবা করে, আর 'গ' সেবা করে 'ঘ' প্রভুকে। এভাবে সকলেই কারও না কারও দাসত্ব করে চলেছে। এই পরিবেশে আমরা দেখতে পাই, বন্ধু বন্ধুর সেবা করে, মা সন্তানের সেবা করে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, স্বামী স্ত্রীর সেবা করে ইত্যাদি। এভাবে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, জীবকূলের সমাজে সেবামূলক কাজের কোন অন্যথা নেই। রাজনীতিবিদেরা জনগণের কাছে তাদের নানা প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে তাদের সেবার ক্ষমতা বোঝাবার চেষ্টা করে থাকে। ভোটদাতারা তাই মনে করে যে, রাজনীতিবিদেরা সমাজের খুব ভাল সেবা করতে পারবে, তাই তারা তাদের মূল্যবান ভোট তাদের দিয়ে দেয়। দোকানদার খরিদ্দারের সেবা করে এবং শিল্পী ধনিক সম্প্রদায়ের সেবা করে। ধনিক সম্প্রদায় তাদের পরিবারের সেবা করে এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিত্য জীবের নিত্য সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজের সেবা করে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কোন জীবই অপর কোন জীবের সেবা না করে থাকতে পারে না। এর ফলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সেবা হচ্ছে জীবের সর্বকালীন সাথী এবং সেবাকার্যই হচ্ছে জীবের শাশ্বত ধর্ম।

তবুও মানুষ দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়ে। এই ধরনের ধর্মবিশ্বাস কখনই সনাতন ধর্ম নয়। কোন হিন্দু তার বিশ্বাস পরিবর্তন করে মুসলমান হতে পারে অথবা কোন মুসলমান তার ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু হতে পারে, কিংবা কোন খ্রিস্টান তার বিশ্বাস বদলাতে পারে। কিন্তু এই ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন হলেও, অপরকে সেবা করার যে শাশ্বত প্রবৃত্তি মানুষের আছে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, মানুষ প্রতিনিয়তই অপরের সেবা করে চলেছে। তাই যে কোন ধর্ম-বিশ্বাসকে অবলম্বন করা এবং সনাতন ধর্মাচরণ করার অর্থ এক নয়। সেবা করাই হচ্ছে সনাতন ধর্ম।

বাস্তবিকই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে সেবা করার সম্পর্ক। পরমেশ্বর হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং আমরা, জীবেরা হচ্ছি তাঁর সেবক। তাঁরই সন্তোষ বিধানের জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা যদি সর্বদাই তাঁর সেবা করে চলি, তবেই আমরা সুখী হতে পারি। এ ছাড়া আর কোনভাবেই সুখী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উদরকে বাদ দিয়ে শরীরের কোন অঙ্গ যেমন স্বতন্ত্রভাবে সুখী হতে পারে না, আমরাও তেমন ভগবানের সেবা না করে সুখী হতে পারি না।

বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা বা তাঁদের সেবা করা ভগবদ্গীতাতে অনুমোদন করা হয়নি। সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে-

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা তাদের স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী এবং পূজার বিশেষ নিয়মবিধি পালন করে বিভিন্ন দেব-দেবীদের শরণাগত হয়।" এখানে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে যে, যারা কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণ বলতে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি-বিশেষের নাম বোঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ নামের অর্থ হচ্ছে পরম আনন্দ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, সমস্ত আনন্দের আধার। আমরা সকলেই আনন্দের অভিলাষী। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ (বেদান্তসূত্র ১/১/১২)। ভগবানের অংশ হবার ফলে জীব চৈতন্যময় এবং তাই সে সর্বদাই আনন্দের অনুসন্ধান করে। ভগবান সদানন্দময়, তিনি সমস্ত আনন্দের আধার, তাই জীব যখন ভগবন্মুখী হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে আসে, তখন তার চিরবাঞ্ছিত দিব্য আনন্দ সে অনুভব করতে পারে।

ভগবান এই মর্ত্যলোকে অবতরণ করেন তাঁর আনন্দময় বৃন্দাবন-লীলা প্রদর্শন করার জন্য। এই বৃন্দাবন-লীলা হচ্ছে আনন্দের চরম প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে থাকেন, তখন সেখানে রাখাল বালকদের সঙ্গে, গোপ-বালিকাদের সঙ্গে, বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে এবং গাভীদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লীলা হচ্ছে দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ। বৃন্দাবনের প্রতিটি জীবই কৃষ্ণগত প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তাঁরা জানেন না। তিনি যে সব কিছুর পরম ভোক্তা, তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই যে শ্রেষ্ঠ

সমর্পণ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করাটা যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকেও ইন্দ্রের পূজা করা থেকে নিরস্ত করেন। কারণ তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করবার কোন দরকার নেই মানুষের। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাই প্রতিটি মানুষের একমাত্র কর্তব্য, কারণ মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া।

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলয় ভগবৎ-ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে

ন তদ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

"আমার পরম ধাম সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা আলোকিত নয়। সেখানে একবার পৌঁছলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।”

এই শ্লোকে সেই চিরশাশ্বত অপ্রাকৃত আকাশের কথা বলা হয়েছে। আকাশ সম্বন্ধে আমাদের একটি জড়-জাগতিক ধারণা আছে। এই জড় আকাশের কথা যখনই আমরা ভাবি, তখন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আদির কথা আপনা থেকেই মনে আসে। কিন্তু এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, দিব্য আকাশকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অথবা কোন বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই আকাশ দিব্য ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আলোকিত। এই ব্রহ্মাজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। অন্যান্য গ্রহাদিতে পৌঁছানোর জন্য আমরা কঠিন পরিশ্রম করছি, কিন্তু পরমেশ্বরের আলয় সম্বন্ধে ধারণা করা কিছুই কঠিন নয়। ভগবানের দিব্য ধামের নাম গোলোক। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) এই গোলোকের খুব সুন্দর বিবরণ আছে-গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ। ভগবান চিরকালই তাঁর আলয় গোলোকে অবস্থান করেন, তবু এই জগতে থেকেও তাঁর সমীপবর্তী হওয়া যায় এবং এই জগতে ভগবান তাঁর প্রকৃত সচ্চিদানন্দময় রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। তিনি যখন তাঁর এই রূপ নিয়ে প্রকাশিত হন, তখন আর তাঁর রূপ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমাদের থাকে না। এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করবার জন্য তিনি তাঁর স্বরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ প্রদর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তাঁকে চিনতে পারে না

এবং তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে উপহাস করে। ভগবান আমাদের কাছে আমাদেরই মতো একজনের রূপ নিয়ে আসেন এবং আমাদের সঙ্গে লীলাখেলা করেন, কিন্তু তাই বলে তাঁকে আমাদের মতো একজন বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁর অনন্ত শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসেন এবং তাঁর লীলা প্রদর্শন করেন। তাঁর আপন আলয় গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর যে লীলা, এই লীলা তাঁরই প্রতিরূপ।

চিন্ময় আকাশের ব্রহ্মজ্যোতিতে অসংখ্য গ্রহ ভাসছে। এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে পরম ধাম কৃষ্ণলোক থেকে এবং জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত নয় সেই রকম অসংখ্য আনন্দময় চিন্ময় গ্রহ সেই ব্রহ্মজ্যোতিতেই ভাসছে। ভগবান বলেছেন-ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ / যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। যে একবার সেই অপ্রাকৃত আকাশে যায়, তাকে আর এই জড় আকাশে নেমে আসতে হয় না। এই জড়-জাগতিক আকাশে, চাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, যদি মানুষ সবচেয়ে ঊর্ধ্বে যে ব্রহ্মলোক আছে সেখানেও যায়, তবে দেখবে যে, সেখানেও এখানকার মতো জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার নেই। এই জড় জগতের কোন গ্রহলোকের পক্ষেই এই চারটি জড় নিয়মের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়।

জীবসকল এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ভ্রমণ করছে, কিন্তু যে-কোন গ্রহেই আমরা ইচ্ছা করলে যান্ত্রিক উপায়ে যেতে পারি না। অন্যান্য গ্রহে যেতে হলে তার জন্য একটি পদ্ধতি আছে। সেই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে-যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। আমাদের গ্রহান্তরে ভ্রমণের জন্য কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। গীতাতে ভগবান বলেছেন- যান্তি দেবব্রতা দেবান। চন্দ্র, সূর্য আদি উচ্চস্তরের গ্রহদের বলা হয় স্বর্গলোক। গ্রহমণ্ডলীকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে-স্বর্গলোক (উচ্চ), ভূলোক (মধ্য) ও পাতাললোক (নিম্ন)। পৃথিবী ভূলোকের অন্তর্গত। ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি, কিভাবে আমরা দেবলোক বা স্বর্গলোকে অতি সহজ প্রক্রিয়ায় যেতে পারি- যান্তি দেবব্রতা দেবান্। কোন বিশেষ গ্রহের বিশেষ দেবতাকে পূজা করলেই সেই গ্রহে যাওয়া যায়। যেমন সূর্যদেবকে পূজা করলে সূর্যলোকে যাওয়া যায়। চন্দ্রদেবকে পূজা করলে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায়। এভাবে যে-কোন উচ্চতর গ্রহলোকেই যাওয়া

যায়।
কিন্তু ভগবদ্গীতা এই জড় জগতের কোন গ্রহলোকে যেতে উপদেশ দিচ্ছে না, কারণ জড় জগতের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোকে কোন ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে হয়ত চল্লিশ হাজার বছর ভ্রমণ করে (আর ততদিন কেই বা বাঁচবে) গেলেও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে সেখানেও নিস্তার পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি কেউ পরম লোক কৃষ্ণলোকে কিংবা চিন্ময় আকাশের অন্য কোন গ্রহে যেতে চায়, তা হলে তাকে সেখানে এই সব জড়-জাগতিক দুর্দশা ভোগ করতে হবে না। চিন্ময় আকাশে যে সমস্ত গ্রহলোক আছে, তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থাকেন।
ভগবদ্গীতায় এই সব কিছুই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কিভাবে সেই চিন্ময় আকাশে ফিরে গিয়ে প্রকৃতই আনন্দময় জীবন শুরু করা যায়, তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই জড় জগতের প্রকৃত রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশথং 'প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

"ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখাবিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। বৈদিক মন্ত্রগুলি হচ্ছে এর পাতা। যে এই গাছটিকে জানে, সে বেদকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছে।" এখানে জড় জগৎকে বলা হয়েছে ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখাবিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ গাছের মতো। সাধারণত গাছের শাখা থাকে ঊর্ধ্বমুখী এবং তার মূল থাকে নিম্নমুখী। কিন্তু আমরা যখন জলাশয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই জলে গাছের প্রতিবিম্ব দেখি, তখন দেখতে পাই তার মূল ঊর্ধ্বমুখী এবং তার শাখা অধোমুখী। সেই রকম, এই জড় জগৎ হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বের কোন স্থায়িত্ব নেই, সে শুধু একটি ছায়া মাত্র। কিন্তু এই ছায়া থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত বস্তু রয়েছে। মরুভূমিতে জল নেই, কিন্তু মরীচিকার মাধ্যমে আমরা ইঙ্গিত পাই যে, জল বলে একটি পদার্থ আছে। জড় জগতে তেমনই জল নেই, আনন্দ নেই, কিন্তু প্রকৃত আনন্দের, বাস্তবিক জলের সন্ধান রয়েছে অপ্রাকৃত জগতে।

ভগবান ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা চিন্ময় জগৎ লাভকরতে পারি (ভঃ গীঃ ১৫/৫)-

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোযা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ. ॥

সেই পদম্ অব্যয়ম্ বা নিত্য জগতে সে-ই যেতে পারে, যে নির্মানমোহ অর্থাৎ যে মোহমুক্ত হতে পেরেছে। এর অর্থ কি? এই জড় জগতে সকলেই কিছু না কিছু হতে চায়। কেউ চায় রাজা হতে, কেউ চায় প্রধানমন্ত্রী হতে, কেউ চায় ঐশ্বর্যশালী হতে, এভাবে সকলেই কিছু না কিছু হতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই অভিলাষগুলির প্রতি আসক্ত থাকি, ততক্ষণ আমরা আমাদের দেহকে আমাদের স্বরূপ বলে মনে করি, কারণ দেহকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি জন্ম নেয়। আমরা যে আমাদের দেহ নই, এই উপলব্ধিটাই হচ্ছে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির প্রথম সোপান। জড় জগতের যে তিনটি গুণের দ্বারা আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তার থেকে মুক্ত হওয়াটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম কর্তব্য এবং তার উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সেবা করলে এই বন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে। কামনা-বাসনার বশবর্তী হবার ফলে আমরা জড়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করতে চাই এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না আমরা আধিপত্য করার এই বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারছি, ততক্ষণ আমরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আলয় সনাতন ধামে ফিরে যেতে পারব না। সেই ভগবৎ-ধাম, যা সনাতন, সেখানে কেবল তাঁরাই যেতে পারেন, যাঁরা জড় জগতের ভোগ-বাসনার দ্বারা লালায়িত নন, যাঁরা ভগবানের সেবায় নিজেদের সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছেন। কেউ এভাবে অধিষ্ঠিত হলে তিনি অনায়াসে পরম ধামে উপনীত হন।

ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (৮/২১) বলা হয়েছে-

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।

অব্যক্ত মানে অপ্রকাশিত। এমন কি এই জড় জগতের সব কিছু আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় এতই সীমিত যে, জড় আকাশে যে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি আছে, তাও আমাদের

গোচরীভূত হয় না। বৈদিক সাহিত্যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রহ-নক্ষত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা সেই সব বিশ্বাস করতে পারি অথবা বিশ্বাস নাও করতে পারি। বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতে এর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই জড় আকাশের ঊর্ধ্বে যে অপ্রাকৃত লোক আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাকে অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই যে অপ্রাকৃত লোক যা নিত্য, সনাতন, যেখানে প্রতিনিয়ত দিব্য আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়, যেখানে প্রতিনিয়ত ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, সেই যে দিব্য জগৎ, তাই হচ্ছে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য-মানব-জীবনের পরম গন্তব্যস্থল। সেখানে একবার উত্তীর্ণ হলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেই পরম রাজ্যের জন্যই মানুষের বাসনা ও আগ্রহ থাকা উচিত।
এখানে প্রশ্ন হতে পারে-কিভাবে সেই অপ্রাকৃত জগতে যাওয়া যায়? ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্কা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

"মৃত্যুকালে যিনি আমাকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাব প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই।" (ভঃ গীঃ ৮/৫) মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে পারলেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপ স্মরণ করতে হবে; এই রূপ স্মরণ করতে করতে যদি কেউ দেহত্যাগ করে, তা হলে সে অবশ্যই দিব্য ধামে চলে যায়। এখানে মদ্ভাবম্ বলতে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ভাবের কথা বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সৎ-চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ তাঁর রূপ নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। আমাদের এই জড় দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময় নয়। এই দেহ অসৎ, এই দেহের কোন স্থায়িত্ব নেই। এই দেহ বিনাশ হয়ে যাবে। এই দেহ চিৎ বা জ্ঞানময় নয়, পক্ষান্তরে এই দেহ অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ। অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, এমন কি এই জড় জগৎ সম্বন্ধেও আমাদের যে জ্ঞান আছে, তা ভ্রান্ত ও সীমিত। এই দেহ নিরানন্দ; আনন্দময় হবার পরিবর্তে এই দেহ দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এই জগতে যত রকমের দুঃখ-দুর্দশা আমরা পেয়ে থাকি, তা সবই এই দেহটির জন্যই। কিন্তু যখন আমরা এই দেহটিকে ত্যাগ করবার সময় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপটি স্মরণ করি, তখন

আমরা জড় জগতের কলুষমুক্ত সৎ-চিৎ-আনন্দময় দিব্য দেহ প্রাপ্ত হই।
এই জগতে দেহত্যাগ করা এবং অন্য একটি দেহ লাভ করা প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা সুচারুভাবে পরিচালিত হয়। পরবর্তী জীবনে কে কি রকম দেহ প্রাপ্ত হবে, তা নির্ধারিত হবার পরেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে। জীব নিজে নয়, তার থেকে উচ্চস্তরে যে-সমস্ত নির্ভরযোগ্য অধিকারীরা রয়েছেন, যাঁরা ভগবানের আদেশ অনুসারে এই জড় জগতের পরিচালনা করেন, তাঁরাই জীবের কর্ম অনুসারে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন। আমাদের কর্ম অনুসারে আমরা ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হই অথবা নিম্নলোকে পতিত হই। এভাবেই প্রতিটি জীবন তার পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির কর্মক্ষেত্র। এই জীবনে যদি আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, তবে এই দেহত্যাগ করবার পর আমরা অবশ্যই ভগবানের মতো সৎ-চিৎ-আনন্দময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারব।
পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, বিভিন্ন ধরনের পরমার্থবাদী আছেন- ব্রহ্মবাদী, পরমাত্মবাদী ও ভক্ত। আর এই কথাও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মজ্যোতিতে বা চিন্ময় আকাশে অগণিত চিন্ময় গ্রহাদি ভাসছে। এই সব গ্রহের সংখ্যা সমস্ত জড় জগতের গ্রহের থেকে অনেক বেশি। এই জড় জগতের আয়তন সৃষ্টির এক চতুর্থাংশের সমান বলে অনুমিত হয়েছে (একাংশেন স্থিতো জগৎ)। এই জড় জগতের অংশে অগণিত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। কিন্তু। তা সত্ত্বেও এই সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সৃষ্টির অধিকাংশই রয়েছে চিন্ময় আকাশে। পরমার্থবাদীদের মধ্যে যাঁরা নির্বিশেষবাদী, যাঁরা ভগবানের নিরাকার রূপকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁরা ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যান। এভাবে তাঁরা চিদাকাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করতে চান, তাই তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়ে ভগবানের নিত্য সাহচর্য লাভ করেন। অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ-চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গোবিন্দ আদি রূপে তাঁর ভক্তদের সঙ্গদান করেন। তাই জীবনের শেষে পরমার্থবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি, পরমাত্মা কিংবা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে থাকেন। সকলের ক্ষেত্রেই

তাঁরা চিদাকাশে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল ভগবানের ভক্তেরাই বৈকুণ্ঠলোকে অথবা গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ভগবান এই বিষয়ে বলেছেন, "এতে কোনও সন্দেহ নেই।" এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেই হবে। আমাদের কল্পনার অতীত বলে এই কথা অবিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের মনোভাব অর্জুনের মতো হওয়া উচিত- "তুমি যা বলেছ তা আমি সমস্তই বিশ্বাস করি।" তাই ভগবান যখন বলেছেন যে, মৃত্যুর সময় ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপের ধ্যান করলেই তাঁর আলয় অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই কথা ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
মৃত্যুর সময়ে ভগবানের রূপের চিন্তা করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করা যে সম্ভব, তা ভগবদ্গীতায় (৮/৬) বর্ণিত হয়েছে-

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে যেভাবে ভাবিত হয়ে শরীর ত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে সেই রকম ভাবযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়।" এখন, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহু শক্তির মধ্যে একটি শক্তির প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১) ভগবানের শক্তির বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে-

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

ভগবানের শক্তি বিচিত্র ও অনন্তরূপে প্রকাশিত। আমাদের সীমিত অনুভূতি দিয়ে তাঁর সেই শক্তি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু মহাজ্ঞানী মুনি-ঋষিরা, যাঁরা মুক্ত পুরুষ, যাঁরা সত্যদ্রষ্টা, তাঁরা ভগবানের শক্তিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং এই শক্তিকে তাঁরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই সমস্ত শক্তিই হচ্ছে বিষ্ণুশক্তির প্রকাশ, অর্থাৎ তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন শক্তি। সেই প্রথম শক্তিকে বলা হয় পরা শক্তি বা চিৎ-শক্তি। জীবও এই উৎকৃষ্ট শক্তি থেকে উদ্ভূত, সেই কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। ভগবানের এই অন্তরঙ্গা শক্তি ব্যতীত আর যে সমস্ত শক্তি, তাকে বলা হয় জড়া শক্তি। এই সমস্ত শক্তি নিম্নতর শক্তি এবং সেগুলি তামসিক গুণের দ্বারা প্রভাবিত। মৃত্যুর সময় আমরা এই জড় জগতের তামসিক গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত নিম্নতর শক্তিতে থাকতে পারি অথবা চিন্ময় জগতের চিৎ-শক্তিতে উত্তীর্ণ হতে পারি। তাই

ভগবদ্গীতায় (৮/৬) বলা হয়েছে-

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে যেভাবে ভাবিত হয়ে শরীর ত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে সেই রকম ভাবযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়।"

আমাদের জীবনে আমরা হয় জড়া শক্তি নতুবা চিৎ-শক্তির সম্বন্ধে ভাবতে অভ্যস্ত। এখন, আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে জড়া শক্তি থেকে চিৎ-শক্তিতে কিভাবে রূপান্তরিত করতে পারি? খবরের কাগজ, উপন্যাস আদি নানা রকম বই আমাদের মনকে জড়া শক্তির ভাবনার যোগান দেয়। আমাদের চিন্তাধারা এই ধরনের সাহিত্যের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আছে বলেই আমরা উচ্চতর চিৎ-শক্তিকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। আমরা যদি এই চিৎ-শক্তিকে জানতে চাই, বা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে চাই, তবে আমাদের বৈদিক সাহিত্যের শরণ নিতে হবে। মানুষকে অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান দেবার জন্যই ভারতের মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে ভগবান বেদ, পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়েছেন। এই সমস্ত সাহিত্য মানুষের কল্পনাপ্রসূত নয়; এগুলি হচ্ছে সত্য দর্শনের বিশদ ঐতিহাসিক বিবরণ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ২০/১২২) বলা হয়েছে-

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

স্মৃতিভ্রষ্ট জীবেরা ভগবানের সঙ্গে তাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে এবং তাই তারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে আছে। তাদের চিন্তাধারাকে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বহু বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন। প্রথমে তিনি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন। তারপর পুরাণে তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেন এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য তিনি মহাভারত রচনা করেন। এই মহাভারতে তিনি ভগবদ্গীতার বাণী প্রদান করেন। তারপর সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করেন। বেদান্তসূত্রকে সহজবোধ্য করে তিনি তার ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। মনোনিবেশ সহকারে এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। জড় জগতে আবদ্ধ সাংসারিক লোকেরা যেমন খবরের কাগজ, নানা রকমের পত্রিকা, নাটক, নভেল আদি পড়ে থাকে এবং তার ফলে জড় জগতের প্রতি তাদের মোহমুগ্ধ

অনুরাগ গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, তেমনই যারা ভগবানের স্বরূপশক্তিকে উপলব্ধি করে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চায়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে মহামুনি ব্যাসদেবের রচিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করা। বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করার ফলে আমরা জানতে পারি-ভগবান কে, তাঁর স্বরূপ কি, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক। এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মন ভগবম্মুখী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে অন্তকালে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপের ধ্যান করতে করতে আমরা দেহত্যাগ করতে পারি। ভগবদ্গীতাতে ভগবান বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, এটিই হচ্ছে তাঁর কাছে ফিরে যাবার একমাত্র পথ এবং তিনি বলেছেন যে, "এতে কোন সন্দেহ নেই।"

তস্মাৎ সর্বেষু কালেবু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥

"অতএব অর্জুন! সর্বক্ষণ আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ করা উচিত। তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করে কার্য করলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।" (ভঃ গীঃ ৮/৭)।
তিনি অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হয়ে তাঁর ধ্যান করতে আদেশ দেননি। ভগবান কোন অবাস্তব পরামর্শ দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি বলেছেন,
"আমাকে স্মরণ করে তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম করে যাও।" এই জড় জগতে দেহ ধারণ করতে হলে কাজ করতেই হবে। কর্ম অনুসারে মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে ব্রাহ্মণেরা বা সমাজের বুদ্ধিমান লোকেরা এক ধরনের কাজ করছে, ক্ষত্রিয়েরা বা পরিচালক সম্প্রদায় অন্য ধরনের কাজ করছে এবং ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের বিশেষ ধরনের কাজ করছে। মানব-সমাজে প্রত্যেকেই, সে শ্রমিকই হোক, ব্যবসায়ী হোক, যোদ্ধা হোক, চাষী হোক অথবা এমন কি সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বৈজ্ঞানিক কিংবা ধর্মতত্ত্ববিদই হোন না কেন, এদের সকলকেই জীবন ধারণ করবার জন্য তাদের নির্ধারিত কর্ম করতেই হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে, সব সময় সকল কর্মের মাঝে তাঁকে স্মরণ করে, (মামনুস্মর) তাঁর পাদপদ্মে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম করে যেতে। দৈনন্দিন জীবনে জীবন-সংগ্রামের সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ না করা যায়, তবে মৃত্যুর মুহূর্তে

তাঁকে স্মরণ করা সম্ভব হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন যে, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ-সর্বক্ষণ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের অভ্যাস করা উচিত। ভগবানের নাম তাঁর রূপের থেকে ভিন্ন নয়; তাই যখন আমরা তাঁর নাম কীর্তন করি, তখন আমরা তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে থাকি। তাই অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, "সব সময় আমাকে স্মরণ কর" এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ "সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন কর"-এই দুটি একই উপদেশ। ভগবানের দিব্য রূপকে স্মরণ করা এবং তাঁর দিব্য নামের কীর্তন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অপ্রাকৃত স্তরে নাম ও রূপ অভিন্ন। তাই আমাদের সর্বক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করে আমাদের জীবনের কার্যকলাপ এমনভাবে চালিত করতে হবে যাতে আমরা সর্বদাই তাঁকে স্মরণ করতে পারি।

এটি কিভাবে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ আচার্যরা বলেন যে, যখন কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক পর-পুরুষে আসক্ত হয় কিংবা কোন পুরুষ পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তখন সেই আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন সে সারাক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে কিভাবে, কখন সে তার প্রেমিকের সাথে মিলিত হবে, এমন কি যখন তার গৃহকর্মে সে ব্যস্ত থাকে, তখনও তার মন প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় আকুল হয়ে থাকে। সে তখন অতি নিপুণতার সঙ্গে তার গৃহকর্ম সমাধা করে, যাতে তার স্বামী তাকে তার আসক্তির জন্য কোন রকম সন্দেহ না করে। ঠিক তেমনই, আমাদের সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে আমাদের সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হবে। এই জন্য ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগের একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলেই মানুষ জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার সময়েও তাঁকে বিস্মৃত হয় না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ভগবানের প্রতি এই গভীর ভালবাসা আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি। অর্জুন যেমন সব সময়ই ভগবানের কথা চিন্তা করতেন, আমাদেরও তেমন ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত। অর্জুন ছিলেন ভগবানের নিত্যসঙ্গী এবং তিনি ছিলেন যোদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে বনে গিয়ে ধ্যান করতে উপদেশ দেননি। যোগ সম্বন্ধে যখন তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে শোনান, তখন অর্জুন তাঁকে স্পষ্ট বলেন যে, তা

অনুশীলন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জুন বলেছিলেন-

যোহয়ং যোগত্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥

"হে মধুসূদন! যোগ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা বললে তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে, এর অনুশীলন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ও অসহনীয়, কারণ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির।" (ভঃ গীঃ ৬/৩৩)

কিন্তু ভগবান তখন তাঁকে বলেছিলেন,-

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাংস মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যোগীদের মধ্যে যে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গতচিত্তে নিজের অন্তরাত্মায় আমাকে চিন্তা করে এবং আমার অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত থাকে, সে-ই যোগসাধনায় অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই হচ্ছে যোগীশ্রেষ্ঠ এবং সেটিই আমার অভিমত।" (ভঃ গীঃ ৬/৪৭) সুতরাং যিনি সব সময় ভগবদ্ভাবনায় মগ্ন, তিনিই হচ্ছেন যোগীশ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন পরম জ্ঞানী এবং তিনিই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান অর্জুনকে আরও বলেছেন যে, ক্ষত্রিয় হবার ফলে তাঁকে যুদ্ধ করতেই 'হবে, কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে যুদ্ধ করেন, তবে সেই যুদ্ধে জয়লাভতো হবেই, উপরন্তু অন্তকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সমর্থ হবেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই, যিনি ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনিই পারেন ভগবানের কৃপা লাভ করতে।

আমরা সাধারণত আমাদের দেহ দিয়ে কাজ করি না, মন ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করি। তাই, যদি মন ও বুদ্ধি ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে, তা হলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যায়। তখন আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়, কিন্তু মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। ভগবদ্গীতা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে মন ও বুদ্ধিকে ভগবানের ভাবনায় মগ্ন করতে হয়। এভাবে সর্বতোভাবে ভগবানের ভাবনায় মগ্ন হবার ফলেই আমরা ভগবানের আলয়ে প্রবেশ করবার যোগ্যতা অর্জন করি। মন যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, তা হলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে। এটিই হচ্ছে কৌশল এবং এটি ভগবদ্গীতার রহস্যও-শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বতোভাবে নিমগ্ন থাকা।

আধুনিক মানুষ চাঁদে পৌঁছানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করে চলেছে, কিন্তু তার পারমার্থিক উন্নতির জন্য সে কোন রকম চেষ্টাই করেনি। পঞ্চাশ-ষাট বছরের অল্প আয়ু নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে স্মরণ করবার জন্য এই সময়টি পুরোপুরিভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে-

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/২৩)

ভক্তিযোগ সাধনের নয়টি প্রণালীর মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে শ্রবণম্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কাছে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করা এবং এর ফলে মন ভগবন্মুখী হয়ে উঠবে। তখন পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা সহজ হবে এবং এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর চিন্ময় দেহ লাভ করে ভগবানের আলয়ে উন্নীত হয়ে আমরা ভগবানের সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হব।

ভগবান আরও বলেছেন-

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

"অভ্যাসের দ্বারা যে সর্বদা ভগবানরূপে আমার ধ্যানে মগ্ন, বিপথগামী না হয়ে যার মন সর্বদা আমাকে স্মরণ করে, হে পার্থ! সে নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসবে।" (গীঃ ৮/৮)

এই পদ্ধতি মোটেই কঠিন নয়। তবে আসল কথা হচ্ছে, এর অনুশীলনের শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে, যিনি অভিজ্ঞ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ-যিনি ইতিমধ্যেই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁর সমীপবর্তী হতে হবে। মনের কাজই হচ্ছে সর্বদা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো, তাই অভ্যাস করতে হবে মনকে একাগ্র করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও রূপে নিবদ্ধ করতে। মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নামের শব্দতরঙ্গে একে স্থির করা যায়। এভাবে পরব্যোমে চিন্ময় জগতে পরম পুরুষ ভগবানের ধ্যান করে তাঁর করুণা লাভ করা সম্ভব। ভগবদ্গীতায় চরম উপলব্ধির পন্থা ও উপায় বা পরম প্রাপ্তির কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত হয়ে আছে। কাউকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁর সমীপবর্তী হতে পারে, কেন না শ্রীকৃষ্ণের নাম

শ্রবণ ও স্মরণ সকলের পক্ষেই সম্ভব।
ভগবান আরও বলেছেন (ভঃ গীঃ ৯/৩২-৩৩)-

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।।

এভাবে ভগবান বলছেন যে, এমন কি বৈশ্য, পতিতা স্ত্রীলোক অথবা শূদ্র কিংবা নিম্নস্তরের মানুষেরাও পরম গতি লাভ করতে পারে। ভগবানের কৃপা লাভকরতে হলে যে উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আসল কথা হচ্ছে, যদি কেউ ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের সেবায় ব্রতী হন এবং ভগবানকে জীবনের পরম আশ্রয় বলে মনে করেন, তবে তিনি অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হন। কেউ যদি ভগবদ্গীতার উপদেশবাণীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তার অনুশীলন করেন, তবে তিনি তাঁর জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারেন এবং এই জড়া প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলে যে সমস্ত জাগতিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তার সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারেন। এই হচ্ছে ভগবদ্গীতার মূল কথা।
উপসংহারে বলা যায়, ভগবদ্গীতা হচ্ছে এক অপ্রাকৃত সাহিত্য, যা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্-ভগবদ্গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় সত্তা অর্জন করা যায়। (গীতা-মাহাত্ম্য ১)
আরও একটি সুবিধা হচ্ছে-

গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়মপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥

"কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভগবদ্গীতা পাঠ করে, তা হলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে প্রভাবিত করে না।" (গীতা-মাহাত্ম্য ২)
ভগবদ্গীতার শেষ পর্যায়ে (১৮/৬৬) অতি উচ্চস্বরে ভগবান বলেছেন-

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।

"সব রকমের ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও। তা হলে আমি সমস্ত পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি কোন ভয় করো না।" এভাবে ভগবানের পাদপদ্মে যিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই মানুষের সকল পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে তাকে রক্ষা করেন।

মলিনে মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতামৃতস্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥

"প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্গীতার গঙ্গাজলে একটি বারও স্নান করে, তা হলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৩)

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ বিনিঃসৃতা ॥

যেহেতু ভগবদ্গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা শ্রবণ ও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষেরা নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ ভগবদ্গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ ভগবদ্গীতা হচ্ছে বেদের সার এবং এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। (গীতা-মাহাত্ম্য ৪)

আরও বলা হয়েছে-

ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণুবাদ বিনিঃসৃতম্।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।

"গঙ্গাজল পান করলে অবধারিতভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, আর যিনি ভগবদ্গীতার পুণ্য পীযূষ পান করেছেন, তাঁর কথা আর কি বলবার আছে? ভগবদ্গীতা হচ্ছে মহাভারতের অমৃতরস, যা আদি বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গেছেন।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৫) ভগবদ্গীতা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, আর গঙ্গা ভগবানের চরণপদ্ম থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবানের মুখ ও

পায়ের মধ্যে অবশ্য কোন পার্থক্য নেই। তবে আমাদের এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভগবদ্গীতার গুরুত্ব গঙ্গার চেয়েও বেশি।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

"এই গীতোপনিষদ্ ভগবদ্গীতা সমস্ত উপনিষদের সারাতিসার এবং তা ঠিক একটি গাভীর মতো, এবং রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবদ্গীতার সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৬)

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

(গীতা-মাহাত্ম্য ৭)

বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটি শাস্ত্রের, একক ভগবানের, একটি ধর্মের এবং একটি বৃত্তির। তাই, একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্-সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোক ভগবদ্গীতা। একো দেবো দেবকীপুত্র এব-সমগ্র বিশ্বচরাচরের একক ভগবান হোন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। একো মন্ত্রস্তস্য নামানি-একক মন্ত্র, একক প্রার্থনা, একক স্তোত্র হোক তাঁর নাম কীর্তন-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

এবং কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা-সমস্ত মানুষের একটিই বৃত্তি হোক-পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

গুরু-পরম্পরা

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ (ভগবদ্গীতা ৪/২)।
এই ভগবদ্গীতা যথাযথ নিম্নোক্ত গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়েছে:

১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
(২) ব্রহ্মা
(৩) নারদ

(৪) ব্যাসদেব
(৫) মধ্বাচার্য
(৬) পদ্মনাভ
(৭) নৃহরি
(৮) মাধব
(৯) অক্ষোভ্য
(১০) জয়তীর্থ
(১১) জ্ঞানসিন্ধু
(১২) দয়ানিধি
(১৩) বিদ্যানিধি
(১৪) রাজেন্দ্র
(১৫) জয়ধর্ম
(১৬) পুরুষোত্তম
(১৭) ব্রহ্মণ্যতীর্থ
(১৮) ব্যাসতীর্থ
(১৯) লক্ষ্মীপতি
(২০) মাধবেন্দ্রপুরী
(২১) ঈশ্বরপুরী, (নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য প্রভু)
(২২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
(২৩) শ্রীরূপ গোস্বামী, (শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীসনাতন গোস্বামী)
(২৪) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী
(২৫) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
(২৬) শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর
(২৭) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর
(২৮) (শ্রীশ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ), শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
(২৯) শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
(৩০) শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ
(৩১) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
(৩২) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

প্রথম অধ্যায় - বিষাদ-যোগ

শ্লোক ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ৷ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন; ধর্মক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে; কুরুক্ষেত্রে-কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে; সমবেতাঃ-সমবেত হয়ে; যুযুৎসবঃ-যুদ্ধকামী; মামকাঃ-আমার দল (পুত্রেরা); পাণ্ডবাঃ-পাণ্ডুর পুত্রেরা; চ-এবং; এব-অবশ্যই; কিম্-কি; অকুর্বত-করেছিল; সঞ্জয়-হে সঞ্জয়।

গীতার গান

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হইয়া একত্র।
যুদ্ধকামী মমপুত্র পাণ্ডব সর্বত্র ॥
কি করিল তারপর কহত সঞ্জয়।
ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসয়ে সন্দিগ্ধ হৃদয় ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন-হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা হচ্ছে বহুজন-পঠিত ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান, যাঁর মর্ম গীতা-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভগবদ্গীতা পাঠ করতে হয় ভগবৎ-তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণভক্তের তত্ত্বাবধানে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে গীতার বিশ্লেষণ করা কখনই উচিত নয়। গীতার যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করার দৃষ্টান্ত ভগবদ্গীতাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে অর্জুনের মাধ্যমে, যিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে এই গীতার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অর্জুন ঠিক যেভাবে গীতার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন, ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি নিয়ে সকলেরই গীতা পাঠ করা উচিত। তা হলেই গীতার যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব। সৌভাগ্যবশত যদি কেউ গুরুপরম্পরা-সূত্রে ভগবদ্গীতার মনগড়া ব্যাখ্যা ব্যতীত যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তিনি সমস্ত বৈদিক জ্ঞান এবং পৃথিবীর সব রকমের শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। ভগবদ্গীতা পড়ার সময় আমরা দেখি, অন্য সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু আছে, তা সবই ভগবদ্গীতায় আছে, উপরন্তু ভগবদ্গীতায় এমন অনেক তত্ত্ব আছে যা আর কোথাও নেই। এটিই হচ্ছে গীতার মাহাত্ম্য এবং এই জন্যই গীতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। গীতা হচ্ছে পরম তত্ত্বদর্শন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই জ্ঞান দান করে গেছেন।

মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ভগবদ্গীতার মহৎ তত্ত্বদর্শনের মূল উপাদান। এখানে আমরা জানতে পারি যে, এই মহৎ তত্ত্বদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, যা সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই পবিত্র তীর্থস্থানরূপে খ্যাত। ভগবান যখন মানুষের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন এই পবিত্র তীর্থস্থানে তিনি নিজে পরম তত্ত্ব সমন্বিত এই গীতা দান করেন।

এই শ্লোকে ধর্মক্ষেত্র শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। দুর্যোধন আদি কৌরবদের পিতা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের বিজয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত-চিত্তে তাই তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?" তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রেরা কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ ভূমিতে যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর অনুসন্ধানটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি চাননি যে, পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে কোন আপস-মীমাংসা হোক, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন

যুদ্ধে তাঁর পুত্রদের ভাগ্য সুনিশ্চিত হোক। তার কারণ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের পুণ্য তীর্থে এই যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। বেদে বলা হয়েছে, কুরুক্ষেত্র হচ্ছে অতি পবিত্র স্থান, যা দেবতারাও পূজা করে থাকেন। তাই, ধৃতরাষ্ট্র এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর এই পবিত্র স্থানের প্রভাব সম্বন্ধে শঙ্কাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, অর্জুন এবং পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রদের উপর এই পবিত্র স্থানের মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত হবে, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সঞ্জয় ছিলেন ব্যাসদেবের শিষ্য, তাই ব্যাসদেবের আশীর্বাদে তিনি দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হন, যার ফলে তিনি ঘরে বসেও কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।
পাণ্ডবেরা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ছিলেন একই বংশজাত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কেবল তাঁর পুত্রদেরই কৌরব বলে গণ্য করে পাণ্ডুর পুত্রদের বংশগত উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র বা পাণ্ডুর পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমেই ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধানক্ষেতে যেমন আগাছাগুলি তুলে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই ভগবদ্গীতার সূচনা থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ধর্মের প্রবর্তক ভগবান স্বয়ং উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রদের সমূলে উৎপাটিত করে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করেছেন। বৈদিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও সমগ্র গীতার তত্ত্বদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মক্ষেত্রে ও কুরুক্ষেত্রে এই শব্দ দুটি ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়।

শ্লোক ২

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; দৃষ্টা-দর্শন করে; তু-কিন্তু; পাণ্ডবানীকম্-পাণ্ডবদেব সৈন্য; ব্যূঢ়ম্-সামরিক ব্যূহ; দুর্যোধনঃ-রাজা দুর্যোধন; তদা-সেই সময়; আচার্যম্ দ্রোণাচার্য; উপসঙ্গম্য-কাছে গিয়ে; রাজা-রাজা; বচনম্-বাক্য; অব্রবীৎ-বলেছিলেন।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল রাজা শুন মন দিয়া ।
পাণ্ডবের সৈন্যসজ্জা সাজান দেখিয়া ॥
রাজা দুর্যোধন শীঘ্র দ্রোণাচার্য পাশে ।
যাইয়া বৃত্তান্ত সব কহিল সকাশে ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন-হে রাজন! পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দর্শন করে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন-

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি পারমার্থিক তত্ত্বদর্শন থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, ধর্মের ব্যাপারে তাঁর পুত্রেরাও ছিল তাঁরই মতো অন্ধ, এবং

তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পাপিষ্ঠ পুত্রেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন রকম আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হবে না, কারণ পাণ্ডবেরা সকলেই জন্ম থেকে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তবুও তিনি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, এই পবিত্র ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবের ফলে তাঁর সন্তানেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন রকম আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হবে না। সঞ্জয় তখনই ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে, তাঁর পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের মহৎ সৈন্যসজ্জা দর্শন করে, তার বিবরণ দিতে তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দ্রোণাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনকে যদিও রাজা বলা হয়েছে, তবুও সেই সঙ্কটময় অবস্থায় তাঁকে তাঁর সেনাপতির কাছে উপস্থিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, চতুর রাজনীতিবিদ হবার সমস্ত গুণগুলি দুর্যোধনের মধ্যে বর্তমান ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের মহতী সৈন্যসজ্জা দেখে দুর্যোধনের মনে যে মহাভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তা তিনি তাঁর চতুরতার আবরণে ঢেকে রাখতে পারেননি।

শ্লোক ৩

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমুম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

পশ্য-দেখুন; এতাম্-এই; পাণ্ডুপুত্রাণাম্ পাণ্ডুর পুত্রদের; আচার্য-হে আচার্য; মহতীম্-মহান; চম্ম্-সৈন্যবল; ব্যূঢ়াম্-ব্যূহ; দ্রুপদপুত্রেণ-দ্রুপদের পুত্র কর্তৃক; তব-আপনার; শিষ্যেণ-শিষ্যের দ্বারা; ধীমতা-অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

গীতার গান

আচার্য চাহিয়া দেখ মহতী সেনানী।
পাণ্ডুপুত্র রচিয়াছে ব্যূহ নানাস্থানী ॥
তব শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদের পুত্র।
সাজাইল এই সব করি একসূত্র ॥

অনুবাদ

হে আচার্য! পাণ্ডবদের মহান সৈন্যবল দর্শন করুন, যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যূহের আকারে রচনা করেছেন।

তাৎপর্য

চতুর কূটনীতিবিদ দুর্যোধন মহৎ ব্রাহ্মক্ষণ সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদরাজের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের কিছু রাজনৈতিক মনোমালিন্য ছিল। এই মনোমালিন্যের ফলে দ্রুপদ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেই যজ্ঞের ফলে তিনি বর লাভ করেন যে, তিনি এক পুত্র লাভ করবেন, যে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। দ্রোণাচার্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন, কিন্তু দ্রুপদ তাঁর সেই পুত্র ধৃষ্টদুম্নকে যখন অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেন, তখন উদার হৃদয় সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাঁকে সব রকমের অস্ত্রশিক্ষা এবং সমস্ত সামরিক কলা-কৌশলের গুপ্ত তথ্য শিখিয়ে দিতে কোনও দ্বিধা করেননি। এখন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের পক্ষে

যোগদান করেন এবং পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা তিনিই পরিচালনা করেন, যেই শিক্ষা তিনি দ্রোণাচার্যের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। দ্রোণাচার্যের এই ত্রুটির কথা দুর্যোধন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যাতে তিনি পূর্ণ সতর্কতা ও অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দুর্যোধন মহৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে এটিও মনে করিয়ে দিলেন যে, পাণ্ডবদের, বিশেষ করে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তিনি যেন কোন রকম কোমলতা প্রদর্শন না করেন, কারণ তাঁরাও সকলে তাঁর প্রিয় শিষ্য, বিশেষত অর্জুন ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় ও মেধাবী শিষ্য। দুর্যোধন সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন যে, এই ধরনের কোমলতা প্রকাশ পেলে যুদ্ধে অবধারিতভাবে পরাজয় হবে।

শ্লোক ৪-৬

অত্র শূরা মহেষাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অত্র-এখানে; শূরাঃ-বীরগণ; মহেষাসাঃ বলবান ধনুর্ধরগণ; ভীমার্জুন-ভীম ও অর্জুন; সমাঃ-সমকক্ষ; যুধি-যুদ্ধে; যুযুধানঃ-যুযুধান; বিরাটঃ-বিরাট; চ-ও; দ্রুপদঃ-দ্রুপদ; চ-ও; মহারথঃ-মহারথী; ধৃষ্টকেতুঃ-ধৃষ্টকেতু; চেকিতানঃ-চেকিতান; কাশিরাজঃ-কাশিরাজ; চ-ও; বীর্যবান্-অত্যন্ত বলবান; পুরুজিৎ-পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ-কুন্তিভোজ; চ-এবং; শৈব্যঃ-শৈব্য; চ-ও; নরপুঙ্গবঃ -মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ; যুধামন্যুঃ-যুধামন্যু; চ-এবং; বিক্রান্তঃ-বলবান; উত্তমৌজাঃ-উত্তমৌজা; চ-এবং; বীর্যবান্-অত্যন্ত শক্তিশালী; সৌভদ্রঃ-সুভদ্রার পুত্র; দ্রৌপদেয়াঃ-দ্রৌপদীর পুত্রেরা; চ-এবং; সর্বে সকলে; এব-অবশ্যই; মহারথাঃ-মহারথীগণ।

গীতার গান

এইস্থানে বর্তমান বহু যোদ্ধাগণ।
ভীমার্জুনসম তারা ধনুর্ধারী হন ॥
যুযুধান বিরাট দ্রুপদ মহারথী সব।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীর পুঙ্গব ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজ শৈব্যরাজাগণ।
যুধামন্যু বিক্রান্ত নহে সাধারণ ॥
বীর্যবান যে এই সৌভদ্র দ্রৌপদেয়।
সকলেই মহারথী কেহ নহে হেয় ॥

অনুবাদ

সেই সমস্ত সেনাদের মধ্যে অনেকে ভীম ও অর্জুনের মতো বীর ধনুর্ধারী রয়েছেন এবং যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদের মতো মহাযোদ্ধা রয়েছেন। সেখানে ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের মতো অত্যন্ত বলবান যোদ্ধারাও রয়েছেন। সেখানে রয়েছেন অত্যন্ত বলবান যুধামন্যু, প্রবল পরাক্রমশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র

এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ। এই সব যোদ্ধারা সকলেই এক-একজন মহারথী।

তাৎপর্য

যদিও দ্রোণাচার্যের অসীম শৌর্য, বীর্য ও সামরিক কলা-কৌশলের কাছে ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন এক অতি নগণ্য প্রতিবন্ধক এবং তাঁর ভয়ে ভীত হবার কোন কারণই ছিল না দ্রোণাচার্যের পক্ষে, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন ছাড়াও পাণ্ডবপক্ষে অন্য অনেক রথী-মহারথী ছিলেন, যাঁরা সত্যিসত্যিই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্যোধনের পক্ষে সেই যুদ্ধজয়ের পথে তাঁরা ছিলেন এক-একটি দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকের মতো, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন ভীম ও অর্জুনের মতো ভয়ংকর। তাঁদের বীরত্বের কথা দুর্যোধন ভালভাবেই জানতেন, তাই তিনি অন্যান্য রথী-মহারথীদেরও ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৭

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অস্মাকম্-আমাদের; তু-কিন্তু; বিশিষ্টাঃ-বিশেষভাবে শক্তিমান; যে-যাঁরা; তান্-তাঁদের; নিবোধ-জেনে রাখুন; দ্বিজোত্তম-দ্বিজশ্রেষ্ঠ; নায়কাঃ-সেনানায়কগণ; মম-আমার; সৈন্যস্য-সৈন্যদের; সংজ্ঞার্থম্-অবগতির জন্য; তান্-তাঁদের; ব্রবীমি-আমি বলছি; তে-আপনাকে।

গীতার গান

আমাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট মহান।
দ্বিজোত্তম শুন তাহা করিয়া মনন ॥
সেনাপতি যে যে সব মম সৈন্যপাশে।
সংজ্ঞার্থে তোমারে কহি অশেষ বিশেষে ।

অনুবাদ

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট সেনাপতি সামরিক শক্তি পরিচালনার জন্য রয়েছেন, আপনার অবগতির জন্য আমি তাঁদের সম্বন্ধে বলছি।

শ্লোক ৮

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥৮॥

ভবান্-আপনি স্বয়ং; ভীষ্মঃ-পিতামহ ভীষ্ম; চ-ও; কর্ণঃ-কুন্তীপুত্র কর্ণ; চ-এবং; কৃপঃ-কৃপাচার্য; চ-এবং; সমিতিঞ্জয়ঃ-সর্বদা সংগ্রামে বিজয়ী; অশ্বত্থামা-দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা; বিকর্ণঃ-দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ; চ-ও; সৌমদত্তিঃ-সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা; তথা এবং; এব-অবশ্যই; চ-ও।

গীতার গান

আপনি আর পিতামহ ভীষ্মাদিগণ ।

কৃপাচার্য রণজয়ী হয় একত্রে বর্ণন ॥
অশ্বত্থামা বিকর্ণাদি সৌমদত্তি আর।
যথাযথা তথা তথা সৈন্য সে অপার ।

অনুবাদ

সেখানে রয়েছেন আপনার মতোই ব্যক্তিত্বশালী ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, যাঁরা সর্বদা সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব-পক্ষের রথী-মহারথীদের বর্ণনা করবার পর দুর্যোধন তার স্বপক্ষে যে সমস্ত বীরেরা যোগদান করেছেন তাঁদের বর্ণনা করেছে। বিকর্ণ হচ্ছেন দুর্যোধনের ভাই, অশ্বত্থামা হচ্ছেন দ্রোণাচার্যের পুত্র এবং সৌমদত্তি বা ভূরিশ্রবা হচ্ছেন বাহীকের রাজার ছেলে। কর্ণ ছিলেন অর্জুনের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, কেন না রাজা পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ হবার আগে কুন্তীদেবীর কোলে তাঁর জন্ম হয়। কৃপাচার্যের যমজ ভগ্নীদ্বয়ের সাথে দ্রোণাচার্যের বিবাহ হয়।

শ্লোক ৯

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্যে-অন্য অনেকে; চ-ও; বহবঃ-বহু; শূরাঃ-সেনানায়কগণ; মদর্থে-আমার জন্য; ত্যক্তজীবিতাঃ-তাঁদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত, নানা-নানা প্রকার; শস্ত্র-অস্ত্রশস্ত্র; প্রহরণাঃ-সুসজ্জিত; সর্বে-তাঁরা সকলে; যুদ্ধবিশারদাঃ-সামরিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

গীতার গান

আর যে অনেক বীর আমার লাগিয়া ।
আসিয়াছে হেথা সব জীবন ত্যজিয়া ॥
নানা-অস্ত্রপাণি সব যুদ্ধে বিশারদ ।
এরা সব হয় মোর যুদ্ধের সংসদ ॥

অনুবাদ

এ ছাড়া আরও বহু সেনানায়ক রয়েছেন, যাঁরা আমার জন্য তাঁদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাঁরা সকলেই নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং তাঁরা সকলেই সামরিক বিজ্ঞানে বিশারদ।

তাৎপর্য

অন্য আর যে সমস্ত বীরেরা দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন, যেমন-জয়দ্রথ, কৃতবর্মা, শল্য আদি, এঁরা সকলেই দুর্যোধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করার ফলে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এঁদের সকলেরই মৃত্যু অবধারিত ছিল। দুর্যোধনের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সমস্ত বীরপুঙ্গবেরা স্বপক্ষে থাকায় তার জয় অনিবার্য।

শ্লোক ১০-১১

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অপর্যাপ্তম্-অপরিমিত; তৎ-তা; অস্মাকম্-আমাদের; বলম্-বল; ভীষ্ম-পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা; অভিরক্ষিতম্-সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত; পর্যাপ্তম্-সীমিত; তু-কিন্তু; ইদম্-এই সমস্ত; এতেষাম্-পাণ্ডবদের; বলম্বল; ভীম-ভীমের দ্বারা; অভিরক্ষিতম্-সতর্কভাবে রক্ষিত; অয়নেষু-যথাস্থানে; চ-ও; সর্বেষু-সর্বত্র; যথাভাগম্-যথাযথভাবে বিভক্ত হয়ে; অবস্থিতাঃ-অবস্থিত; ভীষ্মম্-পিতামহ ভীষ্মকে; এব-অবশ্যই; অভিরক্ষন্তু রক্ষা করুন; ভবন্তঃ-আপনারা; সর্বে-সকলে; এব হি-নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

অপর্যাপ্ত মম সৈন্য ভীষ্ম সেনাপতি।
পর্যাপ্ত ওদের সৈন্য ভীম যার গতি ॥
যথাস্থানে স্থিত থাকি আপনি সকলে।
রক্ষ ভীষ্ম পিতামহে হেন যুদ্ধস্থলে ॥

অনুবাদ

আমাদের সৈন্যবল অপরিমিত এবং আমরা পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা পূর্ণরূপে সুরক্ষিত, কিন্তু ভীমের দ্বারা সতর্কভাবে সুরক্ষিত পাণ্ডবদের শক্তি সীমিত। এখন আপনারা সকলে সেনাব্যূহের প্রবেশপথে নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সর্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এখানে দুর্যোধন পাণ্ডব-পক্ষ ও কৌরব-পক্ষের সামরিক শক্তির তুলনা করেছে। পিতামহ বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের রক্ষণাবেক্ষণাধীন অমিত শক্তিশালী এক সৈন্যবাহিনী ছিল দুর্যোধনের স্বপক্ষে। অপর পক্ষে, পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনী ছিল সীমিত এবং তার সেনাপতি ছিলেন ভীমসেন, যাঁর শৌর্যবীর্য ও সৈন্য পরিচালনার ক্ষমতা পিতামহ ভীষ্মদেবের তুলনায় ছিল নিতান্তই নগণ্য। দুর্যোধন চিরকালই ভীমের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। কারণ সে জানত যে, যদি তাঁকে কোন দিন মরতে হয়, তবে ভীমের হাতেই তার মৃত্যু হবে। কিন্তু ভীষ্মের মতো বিচক্ষণ ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার পক্ষের সেনাপতি থাকায় সে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল, জয় তার হবেই। দুর্যোধনের প্রতিটি কথাতে বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধজয় সম্বন্ধে তার মনে কোনই সংশয় ছিল না।

ভীষ্মের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করার পরে, দুর্যোধন বিবেচনা করে দেখল, অন্যেরা মনে করতে পারে, তাঁদের শৌর্যবীর্যের গুরুত্ব লাঘব করে হেয় করা হচ্ছে, তাই তার স্বভাবসুলভ কূটনৈতিক চাতুরীর সাহায্যে সেই পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিল। এভাবে সে মনে করিয়ে দিল যে, ভীষ্মদেব যত বড় যোদ্ধাই হন, তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সব দিক থেকে তাই ভীষ্মদেবকে তাঁদের সকলেরই রক্ষা করা উচিত। যুদ্ধ করতে করতে যদি তিনি কোনও একদিকে এগিয়ে যান, তা হলে শত্রুপক্ষ তার সুযোগ নিয়ে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। তাই অন্য বীরপুঙ্গবেরা যাতে নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত থেকে শত্রুসৈন্যকে ব্যূহ ভেদ করতে না দেয়, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন মনে করিয়ে দিয়েছিল। দুর্যোধন স্পষ্টই অনুভব করেছিল যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার জয়লাভ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ভীষ্মদেবের উপর। দুর্যোধনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই যুদ্ধে ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন। কারণ সে আগেই দেখেছিল, যখন হস্তিনাপুরের

রাজসভায় সমস্ত রাজপুরুষের সামনে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা হচ্ছিল, তখন তাঁদের প্রতি অসহায় দ্রৌপদীর আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা একটি কথাও বলেননি। যদিও দুর্যোধন জানত, তার দুই সেনাপতিই পাণ্ডবদের বেশ স্নেহ করতেন, কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল যে, পাশা খেলার নিয়মানুসারে তাঁরা যেমন তাঁদের স্নেহপ্রবণতা বর্জন করেছিলেন, এই যুদ্ধেও তাঁরা তাই করবেন।

শ্লোক ১২

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দখৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ৷

তস্য-তাঁর; সঞ্জনয়ন্-বর্ধিত করে; হর্ষম্ হর্ষ; কুরুবৃদ্ধঃ কুরুবংশের মধ্যে বৃদ্ধ; পিতামহঃ-পিতামহ; সিংহনাদম্-সিংহের মতো গর্জন; বিনদ্য-কম্পিত করে; উচ্চৈঃ-অতি উচ্চনাদে; শঙ্খম্-শঙ্খ; দম্মৌ-বাজালেন; প্রতাপবান্-প্রতাপশালী।

গীতার গান

তবে সেই পিতামহ বৃদ্ধ কুরুপতি।
হর্ষ উৎপাদনে যবে কৈল স্থিরমতি ॥
সিংহনাদে বাজাইল শঙ্খ সেই বীর।
উচ্চরব সেই সব অতীব গম্ভীর ॥

অনুবাদ

তখন কুরুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য সিংহের গর্জনের মতো অতি উচ্চনাদে তাঁর শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

কুরু-রাজবংশের পিতামহ দুর্যোধনের হৃদ্‌কম্প অনুভব করতে পেরে তাঁর স্বভাবসুলভ করুণার বশবর্তী হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য সিংহনাদে তাঁর শঙ্খ বাজালেন। পরোক্ষভাবে, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তিনি তাঁর হতাশাচ্ছন্ন পৌত্র দুর্যোধনকে জানিয়ে দিলেন যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করার কোন আশাই তাঁর নেই, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর বিপক্ষে। তবুও, ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে জয়-পরাজয়ের কথা বিবেচনা না করে যুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য এবং এই ব্যাপারে তিনি কোন রকম অবহেলা করবেন না। সেই কথা তিনি দুর্যোধনকে মনে করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ১৩

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ । ১৩ ॥

ততঃ-তারপর; শঙ্খাঃ-শঙ্খসমূহ; চ-ও; ভের্যঃ-ভেরীসমূহ, চ-এবং; পণব-আনক-পণব ও আনক ঢাক; গোমুখাঃ-গোমুখ শিঙা; সহসা হঠাৎ; এব-অবশ্যই; অভ্যহন্যন্ত-একসঙ্গে বাজতে লাগল; সঃ-সেই; শব্দঃ-মিলিত শব্দ; তুমুলঃ-তুমুল; অভবৎ-হয়েছিল।

গীতার গান

শুনি সেই শত্রুরব যত শঙ্খ ভেরী।
গোমুখ পণবানক বাজিল সত্বরি ॥
সহসা উঠিল সেই রণের ঝঙ্কার।
তুমুল হইল শব্দ বহুল অপার ॥

অনুবাদ

তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, ঢাক ও গোমুখ শিভাসমূহ হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

শ্লোক ১৪

ততঃ শ্বেতৈহয়েযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদক্ষ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ-তখন; শ্বেতৈঃ-শ্বেত; হয়ৈঃ-অশ্বগণ; যুক্তে-যুক্ত হয়ে; মহতি-মহান; স্যন্দনে-রথ; স্থিতৌ-অবস্থিত হয়ে; মাধবঃ-শ্রীকৃষ্ণ (লক্ষ্মীর পতি); পাণ্ডবঃ-অর্জুন (পাণ্ডুর পুত্র); চ-ও; এব-অবশ্যই; দিব্যৌ-অপ্রাকৃত; শঙ্খৌ-শঙ্খগুলি; প্রদধ্মতুঃ-বাজালেন।

গীতার গান

তারপর শ্বেত অশ্ব রথেতে বসিয়া।
আসিল যে মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ॥
মাধব আর পাণ্ডব দিব্য শঙ্খ ধরি।
বাজাইল পরে পরে অপূর্ব মাধুরী ॥

অনুবাদ

অন্য দিকে, শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেবের শঙ্খের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খকে 'দিব্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই দিব্য শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করল যে, কুরুপক্ষের যুদ্ধজয়ের কোন আশাই নেই, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছেন। জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ। পাণ্ডবদের জয় অবধারিত, কারণ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ভগবান যে পক্ষে যোগদান করেন, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও সেই পক্ষেই থাকেন, কারণ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সর্বদাই তাঁর পতির অনুগামী। তাই বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হল যে, অর্জুনের জন্য বিজয় ও সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করছে। তা ছাড়া, যে রথে চড়ে দুই বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা অগ্নিদেব অর্জুনকে দান করেছিলেন এবং সেই দিব্য রথ ছিল সমগ্র ত্রিভুবনে সর্বত্রই অপরাজেয়।

শ্লোক ১৫

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ॥
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥

পাঞ্চজন্যম্ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; হৃষীকেশঃ-হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর ভক্তদের ইন্দ্রিয়ের পরিচালক); দেবদত্তম্-দেবদত্ত নামক শঙ্খ; ধনঞ্জয়ঃ-ধনঞ্জয় (অর্জুন, যিনি ধনসম্পদ জয় করেছেন); পৌণ্ড্রম্-পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ; দধ্মৌ--বাজালেন; মহাশঙ্খম্-ভয়ংকর শঙ্খ; ভীমকর্মা-প্রচণ্ড কর্ম সম্পাদনকারী বৃকোদরঃ-বিপুল ভোজনপ্রিয় (ভীম)।

গীতার গান

হৃষীকেশ ভগবান্ পাঞ্চজন্যরবে।
ধনঞ্জয় বাজাইল দেবদত্ত সবে ॥
ভীমকর্মা ভীমসেন বাজাইল পরে।
পৌণ্ড্রনাম শঙ্খ সেই অতি উচ্চৈঃস্বরে ।।

অনুবাদ

তখন, শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক তাঁর শঙ্খ বাজালেন, অর্জুন বাজালেন, তাঁর দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজনপ্রিয় ও ভীমকর্মা ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক তাঁর ভয়ংকর শঙ্খ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকে হৃষীকেশ বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত হৃষীক বা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। জীবেরা হচ্ছে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই জীবদের ইন্দ্রিয়গুলিও হচ্ছে- তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্বিশেষবাদীরা জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের ও নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করতে তৎপর। সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করে ভগবান মূল উৎস কোথায় তার হদিস খুঁজে পায় না, তাই তারা সমস্ত জীবদের ইন্দ্রিয়বিহীন তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করেন। তবে এটি নির্ভর করে আত্মসমর্পণের মাত্রার উপর এবং শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করেন। এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরিভাবে পরিচালিত করেছেন, তাই এখানে তাঁকে হৃষীকেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভগবানের বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন, মধু নামক দানবকে সংহার করার জন্য তাঁর নাম মধুসুদন; গাভী ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন বলে তাঁর নাম গোবিন্দ; বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম বাসুদেব; দেবকীর সন্তানরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম দেবকীনন্দন; বৃন্দাবনে যশোদার সন্তানরূপে তিনি তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেন বলে তাঁর নাম যশোদানন্দন এবং সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম পার্থসারথি। সেই রকম, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিচালনা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হৃষীকেশ।

এখানে অর্জুনকে ধনঞ্জয় বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করতেন। তেমনই, ভীমকে এখানে বৃকোদর বলা হয়েছে, কারণ যেমন তিনি হিড়িম্ব আদি দানবকে বধ করার মতো দুঃসাধ্য কাজ সাধন করতে পারতেন, তেমনই তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারতেন। সুতরাং পাণ্ডবপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন তাঁদের বিশেষ ধরনের শঙ্খ বাজালেন, সেই দিব্য শঙ্খধ্বনি তাঁদের সৈন্যদের অন্তরে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করল। পক্ষান্তরে, কৌরবপক্ষে আমরা কোন রকম শুভলক্ষণের ইঙ্গিত পাই না, সেই পক্ষে পরম নিয়ন্তা ভগবান নেই, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীও নেই। অতএব, তাঁদের পক্ষে যে যুদ্ধ-জয়ের কোন আশাই ছিল না তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল এবং যুদ্ধের শুরুতেই শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সেই বার্তা ঘোষিত হল।

শ্লোক ১৬-১৮

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেয়াসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দম্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অনন্তবিজয়ম্-অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ; রাজা-রাজা; কুন্তীপুত্রঃ-কুন্তীর পুত্র; যুধিষ্ঠিরঃ-যুধিষ্ঠির; নকুলঃ-নকুল; সহদেবঃ-সহদেব; চ-এবং; সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ-সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ; কাশ্যঃ-কাশীর (বারাণসীর) রাজা; চ-এবং; পরমেযাসঃ-মহান ধনুর্ধর; শিখণ্ডী-শিখণ্ডী; চ-ও; মহারথঃ -সহস্র সহস্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করতে সক্ষম মহারথী; ধৃষ্টদ্যুম্নঃ-(মহারাজ দ্রুপদের পুত্র) ধৃষ্টদ্যুম্ন; বিরাটঃ-বিরাট (যিনি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কালে আশ্রয় দিয়েছিলেন), চ-ও; সাত্যকিঃ-সাত্যকি (শ্রীকৃষ্ণের সারথি যুযুধানের মতো); চ-এবং; অপরাজিতঃ-যিনি কখনও পরাজিত হননি; দ্রুপদঃ-পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ; দ্রৌপদেয়াঃ- দ্রৌপদীর পুত্রগণ; চ-ও; সর্বশঃ-সকলে; পৃথিবী-পতে-হে মহারাজ; সৌভদ্রঃ-সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু; চ-ও; মহাবাহুঃ-মহা বলবান; শঙ্খান্ শঙ্খসমূহ; দম্মুঃ বাজালেন; পৃথক্ পৃথক্-একে একে।

গীতার গান

যুধিষ্ঠির ধরে শঙ্খ রাজা কুন্তীপুত্র।
অনন্তবিজয় সেই ঘোষণা সর্বত্র ॥
নকুল বাজাল শঙ্খ সুঘোষ তার নাম।
সহদেব বাজাল মণিপুষ্পক নাম ॥
তারপর একে একে যত মহারথী।
ধনুর্ধর কাশীরাজ শিখণ্ডী সারথি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি বীর সে সাত্যকি।
মহাযোদ্ধা পারে যারা যুঝিতে একাকী ॥
দ্রুপদ আর দ্রৌপদেয় পৃথিবীপতে।
সৌভদ্র বাজাল শঙ্খ যার যার মতে ॥

অনুবাদ

কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। হে মহারাজ! তখন মহান ধনুর্ধর কাশীরাজ, প্রবল যোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রার মহা বলবান পুত্র এবং অন্য সকলে তাঁদের নিজ নিজ পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

সঞ্জয় সুকৌশলে ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিলেন যে, পাণ্ডুপুত্রদের প্রতারণা করে তাঁর নিজের ছেলেদের সিংহাসনে বসাবার দুরভিসন্ধি করাটা তাঁর পক্ষে মোটেই প্রশংসনীয় কাজ হয়নি। চারদিক থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যচ্ছিল যে, কুরুবংশের সমূলে বিনাশ হবে এবং পিতামহ ভীষ্ম থেকে শুরু করে অভিমন্যু আদি পৌত্রেরা সকলেই যুদ্ধে নিহত হবেন।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উপস্থিত রাজা-মহারাজা ও রথী-মহারথীরা সকলেই নিহত হবেন। এই বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং, কারণ তাঁর পুত্রদের দুষ্কর্মে তিনি কখনও কোন রকম বাধা দেননি, উপরন্তু তাদের সব রকম দুষ্কর্মে তিনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

শ্লোক ১৯

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

সঃ-সেই; ঘোষঃ-শব্দ-স্পন্দন; ধার্তরাষ্ট্রাণাম্ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের; হৃদয়ানি-হৃদয়; ব্যদারয়ৎ-চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল; নভঃ-আকাশ; চ-ও; পৃথিবীম্-পৃথিবীকে; চ-ও; এব-অবশ্যই; তুমুলঃ-প্রচণ্ড; অভ্যনুনাদয়ন্-অনুরণিত হয়ে।

গীতার গান

সে শব্দ ভাঙিল বুক ধার্তরাষ্ট্রগণে।
আকাশ ভেদিল পৃথ্বী কাঁপিল সঘনে ॥

অনুবাদ

শঙ্খ-নিনাদের সেই প্রচণ্ড শব্দ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় বিদারিত করতে লাগল।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেব আদি কৌরব-পক্ষের বীরেরা যখন শঙ্খ বাজিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবদের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠেনি। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা দেখছি যে, পাণ্ডবদের শঙ্খনাদে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় ভয়ে বিদীর্ণ হল। পাণ্ডবদের মনে কোন ভয় ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন সদাচারী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। ভগবানের কাছে যিনি আত্মসর্মপণ করেন, তাঁর মনে কোন ভয় থাকে না, চরম বিপদেও তিনি থাকেন অবিচলিত।

শ্লোক ২০

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ৷ ২০ ॥

অথ-অতঃপর; ব্যবস্থিতান্-অবস্থিত; দৃষ্টা-দেখে; ধার্তরাষ্ট্রান্ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের; কপিধ্বজঃ-যাঁর পতাকায় হনুমান চিহ্ন শোভা পায়; প্রবৃত্তে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়; শস্ত্রসম্পাতে-অস্ত্র নিক্ষেপ করতে; ধনুঃ-ধনুক; উদ্যম্য-তুলে নিয়ে; পাণ্ডবঃ-পাণ্ডুপুত্র (অর্জুন); হৃষীকেশম্-শ্রীকৃষ্ণকে; তদা-তখন; বাক্যম্ বাক্য; ইদম্-এই; আহ বললেন; মহীপতে-হে মহারাজ।

গীতার গান

কপিধ্বজ দেখি ধার্তরাষ্ট্রের গণেরে ।

যুদ্ধের সজ্জায় সেথা মিলিল অচিরে ॥
নিজ অস্ত্র ধনুর্বাণ যথাস্থানে ধরি।
যুদ্ধের লাগিয়া সেথা স্মরিল শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে, তাঁর ধনুক তুলে নিয়ে শর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সমরসজ্জায় বিন্যস্ত দেখে, অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বললেন-

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, পাণ্ডবদের অপ্রত্যাশিত সৈন্যসজ্জা দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থেকে পাণ্ডবদের পরিচালিত করেছিলেন, তাই কৌরবদের এই হৃৎকম্প হওয়াটা স্বাভাবিক। অর্জুনের রথে হনুমান অঙ্কিত ধ্বজাও একটি বিজয়সূচক ইঙ্গিত, কারণ রাম-রাবণের যুদ্ধে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে সহযোগিতা করেছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও অর্জুনকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর রথে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান দুজনকেই উপস্থিত থাকতে দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র এবং যেখানে শ্রীরামচন্দ্র, সেখানেই তাঁর নিত্য সেবক ভক্ত-হনুমান এবং নিত্য সঙ্গিনী সীতা লক্ষ্মীদেবী উপস্থিত থাকেন। তাই, অর্জুনের কোন শত্রুর ভয়েই ভীত হবার কারণ ছিল না, আর' সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরিচালিত করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এভাবে, যুদ্ধজয়ের সমস্ত শুভপরামর্শ অর্জুন পাচ্ছিলেন। তাঁর নিত্যকালের ভক্তের জন্য ভগবানের দ্বারা আয়োজিত এই রকম শুভ পরিস্থিতিতে সুনিশ্চিত জয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।

শ্লোক ২১-২২

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োমধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধকামানবস্থিতান্ ॥ ২১ ॥
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; সেনয়োঃ- সৈন্যদের; উভয়োঃ-উভয়; মধ্যে-মধ্যে; রথম্-রথ; স্থাপয়-স্থাপন কর; মে-আমার; অচ্যুত-হে অচ্যুত; যাবৎ-যাতে; এতান্-এই সমস্ত; নিরীক্ষে-দেখতে পারি; অহম্-আমি; যোদ্ধকামান্-যুদ্ধ করতে অভিলাষী; অবস্থিতান্-যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত; কৈঃ-কাদের সঙ্গে; ময়া-আমাকে; সহ-সঙ্গে; যোদ্ধব্যম্ যুদ্ধ করতে হবে; অস্মিন্-এই; রণ-সংগ্রাম; সমুদ্যমে প্রচেষ্টায়।

গীতার গান

মহীপতে। পাণ্ডুপুত্র কহে হৃষীকেশে।
উভয় সেনার মাঝে রথের প্রবেশে ॥
যাবৎ দেখিব এই যুদ্ধকামীগণে।
তাবৎ রাখিবে রথ অচ্যুত এখানে ॥
দেখিবারে চাহি কেবা আসিয়াছে হেথা।

কাহার সহিত হবে যুঝিবারে সেথা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে অচ্যুত। তুমি উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, যাতে আমি দেখতে পারি যুদ্ধ করার অভিলাষী হয়ে কারা এখানে এসেছে এবং এই মহা সংগ্রামে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়ে তাঁর সেবা করছেন। ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শনে ভগবান কখনও চ্যুত হন না, তাই তাঁকে এখানে অচ্যুত বলে সম্ভাষণ করা হয়েছে। অর্জুনের রথের সারথি হবার ফলে তাঁকে অর্জুনের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছিল এবং যেহেতু তা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি, তাই তাঁকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও তিনি তাঁর ভক্তের রথের সারথি হয়েছেন, তবুও তাঁর পরম পদ কেউ দাবি করতে পারে না। সকল অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশ। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক মধুর ও অপ্রাকৃত। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় উন্মুখ, ঠিক তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তের কোন রকম পরিচর্যা করতে সুযোগের অন্বেষণ করেন। ভগবান যখন তাঁর কোন শুদ্ধ ভক্তের আদেশ অনুসারে তাঁকে পরিচর্যা করার সুযোগ পান, তখন তিনি অসীম আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবান হচ্ছেন সর্বলোক-মহেশ্বর। যেহেতু তিনি হচ্ছেন প্রভু, প্রত্যেকেই তাঁর আদেশের অধীন, এবং তাই তাঁকে আদেশ দেবার মতো তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কোন শুদ্ধ ভক্ত তাঁকে আদেশ করছেন, তখন তিনি দিব্য আনন্দ লাভকরেন, যদিও সকল অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন অভ্রান্ত প্রভু।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে অর্জুন কখনই কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু কোন রকম শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে অনাগ্রহী দুর্যোধনের দুর্দমনীয় মনোভাব তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। তাই, তিনি যুদ্ধের আগে একবার দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে কে কে সেই রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তবুও যুদ্ধের আগে অর্জুন একবার সকলকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তিনি দেখে নিতে চেয়েছিলেন সেই অন্যায় যুদ্ধে কৌরবেরা কতখানি উৎসাহী ছিল।

শ্লোক ২৩

যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

যোৎস্যমানান্-যারা যুদ্ধ করবে; অবেক্ষে-দেখতে চাই; অহম্-আমি; যে-যে; এতে-যারা; অত্র-এখানে; সমাগতাঃ-সমবেত হয়েছে; ধার্তরাষ্ট্রস্য-ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের পক্ষে; দুর্বুদ্ধেঃ-দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন; যুদ্ধে যুদ্ধে; প্রিয়-ভাল; চিকীর্ষবঃ-বাসনা করে।

গীতার গান

যুদ্ধকামীগণে আজ নিরখিব আমি।
দুর্বুদ্ধি ধার্তরাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধকামী ৷৷

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে সন্তুষ্ট করার বাসনা করে যারা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের আমি দেখতে চাই।

তাৎপর্য

এই কথা সকলেরই জানা ছিল যে, দুর্যোধন তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগিতায় অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজত্ব আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করছিল। তাই, যারা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল 'এক গোয়ালের গরু'। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন দেখে নিতে চেয়েছিলেন তারা কারা। কৌরবদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করবার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার ফলেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করা হয়, তাই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কোন রকম বাসনা অর্জুনের ছিল না। অর্জুন যদিও স্থির নিশ্চিতভাবে জানতেন, জয় তাঁর হবেই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশেই বসে আছেন, তবুও যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি শত্রুপক্ষের সৈন্যবল কতটা তা দেখে নিতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োমধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ সঞ্জয় বললেন; এবম্-এভাবে; উক্তঃ-আদিষ্ট হয়ে; হৃষীকেশঃ-শ্রীকৃষ্ণ; গুড়াকেশেন-অর্জুনের দ্বারা; ভারত-হে ভরতবংশীয়; সেনয়োঃ-সৈন্যদের; উভয়োঃ-উভয় পক্ষের; মধ্যে-মধ্যে; স্থাপয়িত্বা-স্থাপন করে; রথ-উত্তমম্-অতি উত্তম রথ।

গীতার গান

সে কথা শুনিয়া হৃষীকেশ ভগবান্ ।
উভয় সেনার দিকে হইল আগুয়ান ॥
উভয় সেনার মধ্যে রাখি রথোত্তম।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ হইয়া সম্ভ্রম ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন-হে ভরত-বংশধর! অর্জুন কর্তৃক এভাবে আদিষ্ট হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ সেই অতি উত্তম রথটি চালিয়ে নিয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। গুড়াকা মানে হচ্ছে নিদ্রা এবং যিনি নিদ্রা জয় করেছেন, তাঁকে বলা হয় গুড়াকেশ। নিদ্রা অর্থে অজ্ঞানতাকেও বোঝায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্ব লাভ করার ফলে অর্জুন নিদ্রা ও অজ্ঞানতা উভয়কেই জয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত অর্জুন এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হতেন না, কারণ এটিই হচ্ছে ভক্তের লক্ষণ। শয়নে অথবা জাগরণে ভক্ত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণে কখনও বিরত হন না। এভাবেই কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থেকে নিদ্রা ও অজ্ঞানতা জয় করতে পারেন। একেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনা বা সমাধি। হৃষীকেশ অথবা সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় ও মনের নিয়ন্তা হবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন, কেন তাঁকে সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করতে বলেছেন।

এভাবে অর্জুনের নির্দেশ পালন করার পর তিনি বললেন।

শ্লোক ২৫

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

ভীষ্ম-পিতামহ ভীষ্ম; দ্রোণ-দ্রোণাচার্য; প্রমুখতঃ-সম্মুখে; সর্বেষাম্-সমস্ত; চ-ও; মহীক্ষিতাম্-নৃপতিদের; উবাচ বললেন; পার্থ-হে পার্থ, পশ্য-দেখ; এতান্-এদের সকলকে; সমবেতান্-সমবেত; কুরূন্-কুরুবংশের সমস্ত সদস্যদের; ইতি-এভাবে।

গীতার গান

দেখ পার্থ সমবেত ধার্তরাষ্ট্রগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখত যত যোদ্ধাগণ ॥

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সমস্ত নৃপতিদের সামনে ভগবান হৃষীকেশ বললেন, হে পার্থ! এখানে সমবেত সমস্ত কৌরবদের দেখ।

তাৎপর্য

সর্বজীবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জানতেন অর্জুনের মনে কি হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁকে হৃষীকেশ বলার মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, তিনি সবই জানতেন, তিনি সর্বজ্ঞ। এখানে অর্জুনকে পার্থ, অর্থাৎ পৃথা বা কুন্তীর পুত্র বলে অভিহিত করাটাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বন্ধু হিসাবে তিনি অর্জুনকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন তাঁর পিতা বসুদেবের ভগ্নী পৃথার পুত্র, তাই তিনি তাঁর রথের সারথি হতে সম্মত হয়েছেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ যখন বললেন, "দেখ পার্থ, সমবেত ধার্তরাষ্ট্রগণ", তখন তিনি কি অর্থ করেছিলেন? সেই জন্যই কি অর্জুন সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, যুদ্ধ করতে অসম্মত হননি? পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃতুল্য আচার্য দ্রোণ, এঁদের দেখে কি অর্জুনের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠেনি? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতৃযুসা কুন্তীদেবীর পুত্র অর্জুনের কাছ থেকে এমন আচরণ কখনই আশা করেননি। অর্জুনের মনের ভাব বুঝতে পেরে পরিহাসছলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন।

শ্লোক ২৬

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

তত্র-সেখানে; অপশ্যৎ-দেখলেন; স্থিতান্-অবস্থিত; পার্থঃ-অর্জুন; পিতৃন্-পিতৃব্যদের; অথ-ও; পিতামহান্ -পিতামহদের; আচার্যান্-শিক্ষকদের; মাতুলান্-মাতুলদের; ভ্রাতুন্-ভ্রাতাদের; পুত্রান্-পুত্রদের; পৌত্রান্-পৌত্রদের; সখীন্ বন্ধুদের; তথা-ও; শ্বশুরান্-শ্বশুরদের; সুহৃদঃ-শুভাকাঙ্ক্ষীদের; চ-ও; এব-অবশ্যই; সেনয়োঃ-সেনাদলের; উভয়োঃ-

উভয়; অপি-অন্তর্ভুক্ত।

গীতার গান

তারপর দেখে পার্থ যোদ্ধৃপিতৃগণ।
আচার্য মাতুল আদি পিতৃসম হন ।
দেখে পুত্র পৌত্রাদিক যত সখাজন।
আর সব বহু লোক আত্মীয়স্বজন ॥
শ্বশুরাদি কুটুম্বীয় নাহি পারাপার।
উভয়পক্ষীয় সৈন্য সে হল অপার ॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পেলেন। তিনি ভূরিশ্রবা আদি পিতৃবন্ধুদের দেখলেন; ভীষ্মদেব, সোমদত্ত আদি পিতামহদের দেখলেন; দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আদি শিক্ষা-গুরুদের দেখলেন; শল্য, শকুনি আদি মাতুলদের দেখলেন; দুর্যোধন আদি ভাইদের দেখলেন; পুত্রতুল্য লক্ষ্মণকে দেখলেন; অশ্বত্থামার মতো বন্ধুকে দেখলেন; কৃতবর্মার মতো শুভাকাঙ্ক্ষীকে দেখলেন। এভাবে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তিনি কেবল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেরই দেখলেন।

শ্লোক ২৭

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ৷ ২৭ ॥

তান্-তাঁদের; সমীক্ষ্য-দেখে; সঃ-তিনি; কৌন্তেয়ঃ কুন্তীপুত্র; সর্বান্-সব রকমের; বন্ধূন্-বন্ধুদের; অবস্থিতান্-অবস্থিত; কৃপয়া-কৃপার দ্বারা; পরয়া-অত্যন্ত, আবিষ্টঃ-অভিভূত হয়ে; বিষীদন্-দুঃখ করতে করতে; ইদম্-এভাবে; অব্রবীৎ-বললেন।

গীতার গান

তাদের দেখিল পার্থ সবই বান্ধব।
কাঁপিল হৃদয় তার বিষণ্ণ বৈভব ।
কৃপাতে কাঁদিল মন অতি দয়াবান।
বিষণ্ণ হইয়া বলে শুন ভগবান্ ॥

অনুবাদ

যখন কুন্তীপুত্র অর্জুন সকল রকমের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হয়ে বললেন।

শ্লোক ২৮

অর্জুন উবাচ

দৃষ্টেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অর্জুনঃ উবাচ অর্জুন বললেন; দৃষ্টা-দেখে; ইমম্-এই সমস্ত; স্বজনম্-আত্মীয়-স্বজনদের; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ, যুযুৎসুম্-যুদ্ধাভিলাষী; সমুপস্থিতম্-সমবেত; 'সীদন্তি-অবসন্ন হচ্ছে; মম-আমার; গাত্রাণি-সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; মুখম্-মুখ; চ-ও; পরিশুষ্যতি শুষ্ক হচ্ছে।

গীতার গান

অর্জুন কহয়ে কৃষ্ণ এরা যে স্বজন।
রণাঙ্গনে আসিয়াছে করিবারে রণ ।
দেখিয়া আমার গাত্রে হয়েছে রোমাঞ্চ ।
মুখমধ্যে রস নাই এ যে মহাবঞ্চ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে প্রিয়বর কৃষ্ণ! আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের এমনভাবে যুদ্ধাভিলাষী হয়ে আমার সামনে অবস্থান করতে দেখে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হচ্ছে এবং মুখ শুষ্ক হয়ে উঠছে।

তাৎপর্য

যিনি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত তাঁর মধ্যে সদ্গুণগুলিই বর্তমান থাকে, যা সাধারণত দেবতা ও দৈবী ভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে কেবল দেখা যায়। পক্ষান্তরে যারা অভক্ত, ভগবৎ-বিমুখ, তারা জাগতিক শিক্ষা-সংস্কৃতির মাপকাঠিতে যতই উন্নত বলে প্রতীত হোক, তাদের মধ্যে এই সমস্ত দৈব গুণগুলির প্রকাশ একেবারেই দেখা যায় না। সেই কারণেই, যে সমস্ত হীন মনোভাবাপন্ন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা অর্জুনকে সব রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, যারা তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য এই যুদ্ধের আয়োজন করেছিল, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরই দেখে অর্জুনের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছিল। তাঁর স্বপক্ষের সৈন্যদের প্রতি অর্জুনের সহানুভূতি ছিল অতি গভীর, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে এমন কি শত্রুপক্ষের সৈন্যদের দেখে এবং তাদের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে অর্জুন শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন। সেই গভীর শোকে তাঁর শরীর কাঁপছিল, মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কুরুপক্ষের এই যুদ্ধলালসা তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল।
বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা এবং অর্জুনের রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাঁর সমস্ত আত্মীয়-• স্বজনেরা কেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে। তাদের এই নিষ্ঠুর মনোভাব অর্জুনের মতো দয়ালু ভগবদ্ভক্তকে অভিভূত করেছিল। এখানে যদিও এই কথার উল্লেখ করা হয়নি, তবু আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, অর্জুনের শরীর কেবল শুষ্ক ও কম্পিতই হয়নি, সেই সঙ্গে অনুকম্পা ও সহানুভূতিতে তাঁর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জলও পড়ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ তাঁর দুর্বলতার প্রকাশ নয়, এ হচ্ছে তাঁর হৃদয়ের কোমলতার প্রকাশ। ভগবানের ভক্ত করুণার সিন্ধু, অপরের দুঃখে তাঁর অন্তর কাঁদে। তাই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অর্জুন বীরশ্রেষ্ঠ হলেও তাঁর অন্তরের কোমলতার পরিচয় আমরা এখানে পাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"ভগবানের প্রতি যাঁর অবিচলিত ভক্তি আছে, তিনি দেবতাদের সব কয়টি মহৎ গুণের

দ্বারা ভূষিত। কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত নয়, তার যা কিছু গুণ সবই জাগতিক এবং সেগুলির কোনই মূল্য নেই। কারণ, সে মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সে অবধারিত ভাবেই চোখ-ধাঁধাঁনো জাগতিক শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পড়ে।"

(ভাগবত ৫/১৮/১২)

শ্লোক ২৯

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

বেপথুঃ-কম্প; চ-ও; শরীরে-দেহে; মে-আমার; রোমহর্ষঃ-রোমাঞ্চ, চ-ও; জায়তে-হচ্ছে; গাণ্ডীবম্ গাণ্ডীব নামক অর্জুনের ধনুক; স্রংসতে-স্খলিত হচ্ছে; হস্তাৎ-হাত থেকে; ত্বক্-ত্বক; চ-ও; এব-অবশ্যই; পরিদহ্যতে-দগ্ধ হচ্ছে।

গীতার গান

কাঁপিছে শরীর মোর সহিতে না পারি।
গাণ্ডীব খসিয়া যায় কি করিয়া ধরি ॥
জ্বলিয়া উঠিছে ত্বক মহাতাপ বাণ।
হইও না হইও না বন্ধু আর আগুয়ান ॥

অনুবাদ

আমার সর্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে, আমার হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে এবং ত্বক যেন জ্বলে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

শরীরে কম্পন দেখা দেওয়ার দুটি কারণ আছে এবং রোমাঞ্চ হওয়ারও দুটি কারণ আছে। তার একটি হচ্ছে চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি এবং অন্যটি হচ্ছে প্রচণ্ড জড়-জাগতিক ভয়। অপ্রাকৃত অনুভূতি হলে কোন ভয় থাকে না। অর্জুনের এই রোমাঞ্চ ও কম্পন অপ্রাকৃত আনন্দের অনুভূতির ফলে নয়, পক্ষান্তরে জড়-জাগতিক ভয়ের ফলে। এই ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের প্রাণহানির আশঙ্কার ফলে। তার অন্যান্য লক্ষণ দেখেও আমরা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

অর্জুন এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর হাত থেকে গাণ্ডীব ধনু খসে পড়েছিল এবং প্রচণ্ড দুঃখে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হবার ফলে, তাঁর ত্বক জ্বলে যাচ্ছিল। এই সমস্ত কিছুরই মূল কারণ হচ্ছে ভয়। অর্জুন এই মনে করে ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা সেই যুদ্ধে হত হবে এবং এই যে হারাবার ভয়, তারই বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছিল তাঁর দেহের কম্পন, রোমাঞ্চ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, গা জ্বালা করা আদির মাধ্যমে। গভীরভাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই, অর্জুনের এই ভয়ের কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর দেহটিকেই তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেছিলেন এবং তাঁর দেহের সম্বন্ধে যারা তথাকথিত আত্মীয়, তাদের হারাবার শোকে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

ন-না; চ-ও; শক্নোমি-সক্ষম হই; অবস্থাতুম্ স্থির থাকতে; ভ্রমতি-বিস্মরণ; ইব-যেন; চ-এবং; মে-আমার; মনঃ-মন; নিমিত্তানি-নিমিত্তসমূহ; চ-ও; পশ্যামি-দেখছি; বিপরীতানি-বিপরীত; কেশব-হে কেশী দানবহন্তা (শ্রীকৃষ্ণ)।

গীতার গান

অস্থির হয়েছি আমি স্থির নহে মন।
সব ভুল হয়ে যায় কি করি এখন ॥
বিপরীত অর্থ দেখি শুনহ কেশব ।
এ যুদ্ধে কাজ নাহি হল পণ্ড সব ॥

অনুবাদ

হে কেশব! আমি এখন আর স্থির থাকতে পারছি না। আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি এবং আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে। হে কেশী দানবহন্তা শ্রীকৃষ্ণ! আমি কেবল অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দর্শন করছি।

তাৎপর্য

অর্জুন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মন এতই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছিলেন। জড় জগতের প্রতি অত্যধিক আসক্তি মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ (ভাগবত ১১/২/৩৭)-এই ধরনের ভীতি ও আত্মবিস্মৃতি তখনই দেখা দেয়, যখন মানুষ জড়া শক্তির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অর্জুন অনুভব করেছিলেন, সেই যুদ্ধের পরিণতি হচ্ছে কেবল স্বজন হত্যা এবং এভাবে শত্রুনিধন করে যুদ্ধে জয়লাভ করার মধ্যে কোন সুখই তিনি পাবেন না। এখানে নিমিত্তানি বিপরীতানি কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ যখন নৈরাশ্য ও হতাশার সম্মুখীন হয়, তখন সে মনে করে, "আমার বেঁচে থাকার তাৎপর্য কি?" সকলেই কেবল তার নিজের সুখ-সুবিধার কথাই চিন্তা করে। ভগবানের বিষয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই অর্জুন তাঁর প্রকৃত স্বার্থ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন। মানুষের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই মাঝে। মায়াবদ্ধ জীবেরা এই কথা ভুলে গেছে, তাই তারা নানাভাবে কষ্ট পায়। এই দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে অর্জুন মনে করেছিলেন, তাঁর পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয় লাভ করাটা হবে গভীর মর্মবেদনার কারণ।

শ্লোক ৩১

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ৷ ৩১ ॥

ন-না; চ-ও; শ্রেয়ঃ-মঙ্গল; অনুপশ্যামি দেখছি; হত্বা-হত্যা করে; স্বজনম্-আত্মীয়-স্বজনদের; আহবে-যুদ্ধে; ন-না; কাঙ্ক্ষে-আকাঙ্ক্ষা করি; বিজয়ম্ যুদ্ধে জয়; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ; ন-না; চ-ও; রাজ্যম্-রাজ্য; সুখানি-সুখ; চ-ও।

গীতার গান

কোন হিত নাহি হেথা স্বজনসংহারে।

যুদ্ধে মোর কাজ নাই ফিরাও আমারে ॥
হে কৃষ্ণ! বিজয় মোর নাহি সে আকাঙ্ক্ষা।
রাজ্য আর সুখ শান্তি সবই আশঙ্কা ।।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাই না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না।

তাৎপর্য

মায়াবদ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না, তার প্রকৃত স্বার্থ নিহিত আছে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের মাঝে। এই কথা বুঝতে না পেরে তারা তাদের দেহজাত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের সাহচর্যে সুখী হতে চায়। জীবনের এই প্রকার অন্ধ-ধারণার বশবর্তী হয়ে, তারা এমন কি জাগতিক সুখের কারণগুলিও ভুলে যায়। এখানে অর্জুনের আচরণে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর ক্ষাত্রধর্মও ভুলে গেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দুই রকমের মানুষ দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত সূর্যলোকে উত্তীর্ণ হন, তাঁরা হচ্ছেন (১) শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যে ক্ষত্রিয় রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি এবং (২) যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অধ্যাত্ম-চিন্তায় গভীরভাবে অনুরক্ত, তিনি। অর্জুনের অন্তঃকরণ এতই কোমল যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ হনন করা তো দূরের কথা, তিনি তাঁর শত্রুকে পর্যন্ত হত্যা করতে নারাজ ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর স্বজনদের হত্যা করে তিনি সুখী হতে পারবেন না। যার ক্ষুধা নেই সে যেমন রান্না করতে চায় না, অর্জুনও তেমন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি স্থির করেছিলেন, অরণ্যের নির্জনতায় নৈরাশ্য-পীড়িত জীবন অতিবাহিত করবেন। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, এই ধর্ম পালন করার জন্য তাঁর রাজত্বের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে পাওয়া সেই রাজত্ব থেকে দুর্যোধন আদি কৌরবেরা তাঁকে বঞ্চিত করার ফলে, সেই রাজ্যে তাঁর অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ করতে এসে তিনি যখন দেখলেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে সেই রাজ্যে তাঁর অধিকারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তখন তিনি গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যে স্থির করলেন যে, তিনি সব কিছু ত্যাগ করে বনবাসী হবেন।

শ্লোক ৩২-৩৫

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ৷ ৩২ ॥
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি তোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥

কিম্-কি প্রয়োজন; নঃ-আমাদের; রাজ্যেন-রাজ্যে; গোবিন্দ-হে কৃষ্ণ; কিম্-কি; ভোগৈঃ-সুখভোগ; জীবিতেন-বেঁচে থেকে; বা-অথবা; যেষাম্-যাদের; অর্থে-জন্য; কাঙ্ক্ষিতম্-

আকাঙ্ক্ষিত; নঃ-আমাদের; রাজ্যম্-রাজ্য; ভোগাঃ-ভোগসমূহ; সুখানি সমস্ত সুখ; চ-ও; তে-তারা সকলে; ইমে-এই; অবস্থিতাঃ-অবস্থিত; যুদ্ধে রণক্ষেত্রে; প্রাণান্-প্রাণ; ত্যক্ত্বা-ত্যাগ করে; ধনানি-ধনসম্পদ; চ-ও; আচার্যাঃ-আচার্যগণ; পিতরঃ-পিতৃব্যগণ; পুত্রাঃ-পুত্রগণ; তথা-এবং এব-অবশ্যই; চ-ও; পিতামহাঃ-পিতামহগণ; মাতুলাঃ-মাতুলগণ; শ্বশুরাঃ-শ্বশুরগণ; পৌত্রাঃ-পৌত্রগণ; শ্যালাঃ-শ্যালকগণ; সম্বন্ধিনঃ -কুটুম্বগণ; তথা-এবং; এতান্-এই সমস্ত; ন-না; হন্তুম্-হত্যা করতে; ইচ্ছামি-ইচ্ছা করি; মৃতঃ-হত হলে; অপি-ও; মধুসূদন-হে মধু দৈত্যহন্তা (শ্রীকৃষ্ণ); অপি-এমন কি; ত্রৈলোক্য-ত্রিভুবনের; রাজ্যস্য-রাজ্যের জন্য; হেতোঃ-বিনিময়ে; কিম্ নু-কি আর কথা; মহীকৃতে-পৃথিবীর জন্য; নিহত্য-বধ করে; ধার্তরাষ্ট্রান্ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের; নঃ-আমাদের; কা-কি; প্রীতিঃ-সুখ; স্যাৎ-হবে; জনার্দন-হে সমস্ত জীবের পালনকর্তা।

গীতার গান

যাদের লাগিয়া চাহি সুখ-ভোগ শান্তি।
তারাই এসেছে হেথা দিতে সে অশান্তি ॥
ধন প্রাণ সব ত্যজি মরিবার তরে ।
সবাই এসেছে হেথা কে জীয়ে কে মরে ॥
এসেছে আচার্য পূজ্য পিতার সমান ।
সঙ্গে আছে পিতামহ আর পুত্রগণ ॥
মাতুল শ্বশুর পৌত্র কত যে কহিব ।
শালা আর সম্বন্ধী সবাই মরিব ।
আমি মরি ক্ষতি নাই এরা যদি মরে।
এদের মরিতে শক্তি নাহি দেখিবারে ।
ত্রিভুবন রাজ্য যদি পাইব জিনিয়া ।
তথাপি না লই তাহা এদের মারিয়া ॥
ধার্তরাষ্ট্রগণে মারি কিবা প্রীতি হবে।
জনার্দন তুমি কৃষ্ণ আপনি কহিবে ।

অনুবাদ

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণেই বা কী প্রয়োজন, যখন দেখছি-যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে আজ উপস্থিত? হে মধুসূদন! যখন আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও আত্মীয়স্বজন, সকলেই প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁরা আমাকে বধ করলেও আমি তাঁদের হত্যা করতে চাইব কেন? হে সমস্ত জীবের প্রতিপালক জনার্দন! পৃথিবীর তো কথাই নেই, এমন কি সমগ্র ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিধন করে কি সন্তোষ আমরা লাভ করতে পারব?

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ নামে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গো অর্থাৎ গরু ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন। এই তাৎপর্যপূর্ণ নামের দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন, কিসে তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হবে। বাস্তবিকপক্ষে, গোবিন্দ নিজে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করেন না, কিন্তু আমরা যদি গোবিন্দের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়। দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিসাধন করতে ব্যস্ত এবং তারা চায়, ভগবান তাদের ইন্দ্রিয়গুলির সব রকম তৃপ্তির যোগান দিয়ে যাবেন। যার যতটা

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রাপ্য, ভগবান তাকে তা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা বলে আমরা যত চাইব, ভগবান ততই দিয়ে যাবেন, মনে করা ভুল। কিন্তু তার বিপরীত পন্থা গ্রহণ করে, অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা না ভেবে গোবিন্দের ইন্দ্রিয়ের সেবায় ব্রতী হই, তখন গোবিন্দের আশীর্বাদে আমাদের সমস্ত বাসনা আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অর্জুনের গভীর মমতা তাঁর স্বভাবজাত করুণার প্রকাশ এবং এই মমতার বশবর্তী হয়ে তিনি যুদ্ধ করতে নারাজ হন। প্রত্যেকেই নিজের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখাতে চায়। কিন্তু অর্জুন যখন বুঝতে পারলেন, যুদ্ধে তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন নিহত হবে এবং যুদ্ধের শেষে সেই যুদ্ধলব্ধ ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য তাঁর সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সাংসারিক মানুষের স্বভাবই হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ধরনের হিসাব-নিকাশ এবং জল্পনা-কল্পনা করা। কিন্তু অপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পন্ন জীবন অবশ্য ভিন্ন ধরনের। তাই ভগবদ্ভক্তের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভগবানকে তৃপ্ত করাটাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্রত, তাই ভগবান যখন চান, তখন তিনি পৃথিবীর সব রকম ঐশ্বর্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন না। আবার ভগবান যখন চান না, তখন তিনি একটি কপর্দকও গ্রহণ করেন না। অর্জুন সেই যুদ্ধে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে চাননি এবং তাঁদের হত্যা করাটা যদি একান্তই প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি চেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বিনাশ করুন। তখনও অবশ্য তিনি জানতেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে আসার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তারা সকলেই হত হয়ে আছে, এবং সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তিনি ছিলেন কেবল একটি উপলক্ষ্য মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অর্জুনের কোন ইচ্ছাই ছিল না তাঁর দুর্বৃত্ত ভাইদের উপর প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু ভগবান চেয়েছিলেন তাদের সকলকে বিনাশ করতে। ভগবানের ভক্ত কখনই কারও প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হন না, অন্যায়ভাবে যে তাঁকে প্রতারণা করে, তার প্রতিও তিনি করুণা বর্ষণ করেন। কিন্তু ভগবানের ভক্তকে যে আঘাত দেয়, ভগবান কখনই তাকে সহ্য করেন না। ভগবানের শ্রীচরণে কোন অপরাধ করলে ভগবান তা ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর ভক্তের প্রতি অন্যায় ভগবান ক্ষমা করেন না। তাই অর্জুন যদিও সেই দুর্বৃত্তদের ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন, তবুও ভগবান তাদের বিনাশ করা থেকে নিরস্ত হননি।

শ্লোক ৩৬

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নাহা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ।। ৩৬ ॥

পাপম্-পাপ; এব-নিশ্চয়ই; আশ্রয়েৎ-আশ্রয় করবে; অস্মান্-আমাদের; হত্বা-বধ করলে; এতান্-এদের সকলকে; আততায়িনঃ-আততায়ীদের; তস্মাৎ-তাই; ন-না; অহা-উচিত; বয়ম্-আমাদের; হন্তম্-হত্যা করা; ধার্তরাষ্ট্রান্ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের; সবান্ধবান্-সবান্ধব; স্বজনম্-স্বজনদের; হি-অবশ্যই; কথম্-কিভাবে; হত্বা-হত্যা করে; সুখিনঃ-সুখী; স্যাম-হব; মাধব-হে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার গান

এদের মারিলে মাত্র পাপ লাভ হবে।
এমন বিপক্ষ শত্রু কে দেখেছে কবে ॥
এই ধার্তরাষ্ট্রগণ সবান্ধব হয়।
উচিত না হয় কার্য তাহাদের ক্ষয় ।
স্বজন মারিয়া বল কেবা কবে সুখী।
সুখলেশ নাহি মাত্র হব শুধু দুঃখী ॥

অনুবাদ

এই ধরনের আততায়ীদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। সুতরাং বন্ধুবান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহার করা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উচিত হবে না। হে মাধব, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে আমাদের কী লাভ হবে? আর তা থেকে আমরা কেমন করে সুখী হব?

তাৎপর্য

বেদের অনুশাসন অনুযায়ী শত্রু ছয় প্রকার-১) যে বিষ প্রয়োগ করে, ২) যে ঘরে আগুন লাগায়, ৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, ৪) যে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে, ৫) যে অন্যের জমি দখল করে এবং ৬) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে। এই ধরনের আততায়ীদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এদের হত্যা করলে কোন রকম পাপ হয় না। এই ধরনের শত্রুকে সমূলে বিনাশ করাটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু অর্জুন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর চরিত্র ছিল সাধুসুলভ, তাই তিনি তাদের সঙ্গে সাধুসুলভ ব্যবহারই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের সাধুসুলভ ব্যবহার ক্ষত্রিয়দের জন্য নয়। যদিও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে সাধুর মতোই ধীর, শান্ত ও সংযত হতে হয়, তাই বলে তাঁকে কাপুরুষ হলে চলবে না। যেমন শ্রীরামচন্দ্র এত সাধু প্রকৃতির ছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে 'রামরাজ্য' শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক হিসাবে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোন রকম কাপুরুষতা আমরা দেখতে পাই না। রাবণ ছিল রামের শত্রু, যেহেতু সে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেছিল এবং সেই জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অর্জুনের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা দেখতে পাই, তাঁর শত্রুরা ছিল অন্য ধরনের। পিতামহ, শিক্ষক, ভাই, বন্ধু, এরা সকলেই তাঁর শত্রু হবার ফলে সাধারণ শত্রুদের প্রতি যে-রকম আচরণ করতে হয়, তা তিনি করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া, সাধু প্রকৃতির লোকেরা সর্বদাই ক্ষমাশীল। শাস্ত্রেও সাধু প্রকৃতির লোককে ক্ষমাপরায়ণ হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাধুদের প্রতি এই ধরনের উপদেশ যে-কোন রাজনৈতিক সঙ্কটকালীন অনুশাসন থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন মনে করেছিলেন, রাজনৈতিক কারণবশত তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করার চেয়ে সাধুসুলভ আচরণ ও ধর্মের ভিত্তিতে তাদের ক্ষমা করাই শ্রেয়। তাই, সাময়িক দেহগত সুখের জন্য এই হত্যাকার্যে লিপ্ত হওয়া তিনি সমীচীন বলে মনে করেননি। তিনি বুঝেছিলেন, রাজ্য ও রাজ্যসুখ অনিত্য। তাই, এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য আত্মীয়স্বজন হত্যার পাপে লিপ্ত হয়ে মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ করার বুঝুঁকি তিনি কেন নেবেন? এখানে অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণকে 'মাধব' অথবা লক্ষ্মীপতি বলে সম্বোধন করেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। এই নামের দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করে অর্জুন বুঝিয়ে দিলেন, তিনি হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি, তাই অর্জুনকে এমন কোন কার্যে প্ররোচিত করা তাঁর কর্তব্য নয়, যার পরিণতি হবে দুর্ভাগ্যজনক। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য কাউকেই দুর্ভাগ্য এনে দেন না, সুতরাং তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে তো সেই কথা ওঠেই না।

শ্লোক ৩৭-৩৮

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দন ।। ৩৮ ॥

যদি-যদি; অপি-এমন কি; এতে-এরা; ন-না; পশ্যন্তি-দেখছে; লোভ-লোভে; উপহত-অভিভূত; চেতসঃ-চিত্ত; কুলক্ষয়-বংশনাশ; কৃতম্-জনিত; দোষম্-দোষ; মিত্রদ্রোহে মিত্রের প্রতি শত্রুতায়; চ-ও; পাতকম্-পাপ; কথম্-কেন; ন-না; জ্ঞেয়ম্ জানবে; অস্মাভিঃ-আমাদের দ্বারা; পাপাৎ-পাপ থেকে; অস্মাৎ-এই; নিবর্তিতুম্-নিবৃত্ত হতে; কুলক্ষয় বংশনাশ; কৃতম্ জনিত; দোষম্-অপরাধ; প্রপশ্যন্তিঃ-দর্শনকারী; জনার্দন-হে কৃষ্ণ।

গীতার গান

যদ্যপি এরা নাহি দেখে লোভীজন।
কুলক্ষয় মিত্রদ্রোহ সব অলক্ষণ ॥
এসব পাপের রাশি কে বহিতে পারে।
বুঝিবে তুমি ত সব বুঝাবে আমারে ।
উচিত কি নহে এই পাপে নিবৃত্তি ।
বুঝা কি উচিত নহে সেই কুপ্রবৃত্তি ॥
কুলক্ষয়ে যেই দোষ জান জনার্দন।
অতএব এই যুদ্ধ কর নিবারণ ।

অনুবাদ

হে জনার্দন! যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ লক্ষ্য করছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ লক্ষ্য করেও এই পাপকর্মে কেন প্রবৃত্ত হব?

তাৎপর্য

যুদ্ধে ও পাশাখেলায় আহ্বান করা হলে কোনও ক্ষত্রিয় বিরোধীপক্ষের সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। দুর্যোধন সেই যুদ্ধে অর্জুনকে আহ্বান করেছিলেন, তাই যুদ্ধ করতে অর্জুন বাধ্য ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় অর্জুন বিবেচনা করে দেখলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের সকলেই এই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হতে পারে, কিন্তু তা বলে তিনি এই যুদ্ধের অমঙ্গলজনক পরিণতি উপলব্ধি করতে পারার পর, সেই যুদ্ধের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন না। এই ধরনের আমন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা তখনই থাকে, যখন তার পরিণতি মঙ্গলজনক হয়, নতুবা এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই সব কথা সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা করে অর্জুন এই যুদ্ধ থেকে নিরস্ত থাকতে মনস্থির করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে-বংশনাশ হলে; প্রণশ্যন্তি-বিনষ্ট হয়; কুলধর্মাঃ-কুলধর্ম, সনাতনাঃ-চিরাচরিত; ধর্মে-ধর্ম; নষ্টে-নষ্ট হলে; কুলম্-বংশকে; কৃৎস্নম্-সমগ্র; অধর্মঃ-অধর্ম; অভিভবতি-অভিভূত করে; উত-বলা হয়।

গীতার গান

কুলক্ষয়ে কলুষিত সনাতন ধর্ম ।
ধর্মনষ্টে প্রাদুর্ভাবে হইবে অধর্ম ॥

অনুবাদ

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং তা হলে সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভূত হয়।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা পরিবারের প্রতিটি লোকের যথাযথ পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যেরা পরিবারভুক্ত অন্য সকলের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত শুদ্ধিকরণ সংস্কার দ্বারা তাদের যথাযথ মঙ্গল সাধন করার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রবীণ লোকদের মৃত্যু হলে, মঙ্গলজনক এই সমস্ত পারিবারিক প্রথাকে রূপ দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। তখন পরিবারের অল্পবয়স্ক সদস্যেরা অমঙ্গলজনক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে এবং তার ফলে তাদের আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই, কোন কারণেই পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অধর্ম-অধর্ম; অভিভবাৎ-প্রাদুর্ভাব হলে; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ; প্রদূষ্যন্তি-ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়; কুলস্ত্রিয়ঃ-কুলবধূগণ; স্ত্রীষু-স্ত্রীলোকেরা; দুষ্টাসু-অসৎ চরিত্রা হলে; বার্ষ্ণেয়-হে বৃষ্ণিবংশজ; জায়তে-উৎপন্ন হয়; বর্ণসঙ্করঃ-অবাঞ্ছিত প্রজাতি।

গীতার গান

অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কুলনারীগণ ।
পতিতা হইবে সব কর অন্বেষণ ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুলবধূগণ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং হে বার্ষ্ণেয়। কুলস্ত্রীগণ অসৎ চরিত্রা হলে অবাঞ্ছিত প্রজাতি উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন সৎ জীবনযাপন করে, তখনই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয় এবং মানুষের জীবন অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্ণাশ্রম প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যার ফলে সমাজের মানুষেরা সৎ জীবনযাপন করে সর্বতোভাবে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এই ধরনের সৎ জনগণ তখনই উৎপন্ন হন, যখন সমাজের স্ত্রীলোকেরা সৎ চরিত্রবর্তী ও সত্যনিষ্ঠ হয়। শিশুদের মধ্যে যেমন অতি সহজেই বিপথগামী হবার প্রবণতা দেখা যায়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও তেমন অতি সহজেই অধঃপতিত হবার প্রবণতা থাকে। তাই, শিশু ও স্ত্রীলোক

উভয়েরই পরিবারের প্রবীণদের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের একান্ত প্রয়োজন। নানা রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করার মাধ্যমে স্ত্রীলোকদের চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র ও নির্মল রাখা হয় এবং এভাবেই তাদের ব্যভিচারী মনোবৃত্তিকে সংযত করা হয়। চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন, স্ত্রীলোকেরা সাধারণত অল্পবুদ্ধিসম্পন্না, তাই তারা নির্ভরযোগ্য অথবা বিশ্বস্ত নয়। সেই জন্য তাদের পূজার্চনা আদি গৃহস্থালির নানা রকম ধর্মানুষ্ঠানে সব সময় নিয়োজিত রাখতে হয় এবং তার ফলে তাদের ধর্মে মতি হয় এবং চরিত্র নির্মল হয়। তারা তখন চরিত্রবান, ধর্মপরায়ণ সন্তানের জন্ম দেয়, যারা হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার উপযুক্ত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন না করলে, স্বভাবতই স্ত্রীলোকেরা অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করে এবং তাদের ব্যভিচারের ফলে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন সমাজে ব্যভিচার প্রকট হয়ে ওঠে এবং অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ছেয়ে যায়, তখন মহামারী ও যুদ্ধ দেখা দিয়ে মানব-সমাজকে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে।

শ্লোক ৪১

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ।৪১ ॥

সঙ্করঃ-এই প্রকার অবাঞ্ছিত সন্তান; নরকায় নারকীয় জীবনের জন্য সৃষ্টি; এব-অবশ্যই; কুলঘ্নানাম্-কুলনাশক; কুলস্য-বংশের; চ-ও; পতন্তি-পতিত হয়; পিতরঃ-পিতৃপুরুষেরা; হি-অবশ্যই; এষাম্-তাদের; লুপ্ত-লুপ্ত; পিণ্ড-পিণ্ডদান; উদক-ক্রিয়াঃ-তর্পণক্রিয়া।

গীতার গান

দুষ্টা স্ত্রী হইলে জন্মে বর্ণসঙ্কর দল।
বর্ণসঙ্কর হলে হবে নরকের ফল ॥
যেই সে কারণ হয় বর্ণসঙ্করের।
কুলক্ষয় কুলমানি যেই অপরের ॥

অনুবাদ

বর্ণসঙ্কর উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কুল ও কুলঘাতকেরা নরকগামী হয়। সেই কুলে পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়া লোপ পাওয়ার ফলে তাদের পিতৃপুরুষেরাও নরকে অধঃ পতিত হয়।

তাৎপর্য

কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে পিতৃপুরুষের আত্মাদের প্রতি পিণ্ডদান ও জল উৎসর্গ করা প্রয়োজন। এই উৎসর্গ সম্পন্ন করা হয় বিষ্ণুকে পূজা করার মাধ্যমে, কারণ বিষ্ণুকে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ সেবন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ হয়। অনেক সময় পিতৃপুরুষেরা নানা রকমের পাপের ফল ভোগ করতে থাকে এবং অনেক সময় তাদের কেউ কেউ জড় দেহ পর্যন্ত ধারণ করতে পারে না। সূক্ষ্ম দেহে প্রেতাত্মারূপে থাকতে বাধ্য করা হয়। যখন বংশের কেউ তার পিতৃপুরুষদের ভগবৎ-প্রসাদ উৎসর্গ করে পিণ্ডদান করে, তখন তাদের আত্মা ভূতের দেহ অথবা অন্যান্য দুঃখময় জীবন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। পিতৃপুরুষের আত্মার সদগতির জন্য এই পিণ্ডদান করাটা বংশানুক্রমিক রীতি। তবে যে সমস্ত লোক ভক্তিযোগ সাধন করেন, তাঁদের এই অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই। ভক্তিযোগ সাধন করার মাধ্যমে ভক্ত শত-সহস্র পূর্বপুরুষের আত্মার মুক্তি সাধন

করতে পারেন।
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণাং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি সব রকম কর্তব্য পরিত্যাগ করে মুক্তি দানকারী মুকুন্দের চরণ-কমলে শরণ নিয়েছেন এবং ঐকান্তিকভাবে পন্থাটি গ্রহণ করেছেন, তাঁর আর দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, পরিবার-পরিজন মানব-সমাজ ও পিতৃপুরুষের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলে এই ধরনের কর্তব্যগুলি আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।"

শ্লোক ৪২

দোষৈরেতৈঃ কুলয়ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

দোষৈঃ-দোষ দ্বারা; এতৈঃ-এই সমস্ত; কুলঘ্নানাম্-কুলনাশকদের; বর্ণসঙ্কর-অবাঞ্ছিত সন্তানাদি; কারকৈঃ-কারক; উৎসাদ্যন্তে-উৎপন্ন হয়; জাতিধর্মাঃ-জাতির ধর্ম; কুলধর্মাঃ-কুলের ধর্ম; চ-ও; শাশ্বতাঃ-সনাতন।

গীতার গান

নরকে পতন হয় লুপ্ত পিণ্ড জন্য।
তরিবার নাহি কোন উপায় যে অন্য ॥
কুলধর্মের নষ্টকারী বর্ণসঙ্কর ফলে।
শাশ্বত জাতি ধর্ম উৎসাদিত হলে ॥

অনুবাদ

যারা বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানাদি সৃষ্টি করে, তাদের কুকর্মজনিত দোষের ফলে সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যাণ-ধর্ম উৎসন্নে যায়।

তাৎপর্য

সনাতন-ধর্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থায় যে চারটি বর্ণের উদ্ভব হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। তাই, সমাজের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নেতাদের পরিচালনায় যদি সনাতন-ধর্মের যথাযথ আচরণ না করা হয়, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষ তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে ভুলে যায়। এই ধরনের সমাজ-নেতাদের বলা হয় অন্ধ এবং যারা এদের অনুসরণ করে, তারা অবধারিতভাবে অন্ধকূপে পতিত হয়।

শ্লোক ৪৩

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

উৎসন্ন-বিনষ্ট; কুলধর্মাণাম্-যাদের কুলধর্ম আছে তাদের; মনুষ্যাপাম্-সেই সমস্ত মানুষের; জনার্দন-হে কৃষ্ণ; নরকে নরকে; নিয়তম্-নিয়ত; বাসঃ-অবস্থিতি; ভবতি-হয়; ইতি-এভাবে; অনুশুক্রম-আমি পরম্পরাক্রমে শ্রবণ করেছি।

গীতার গান

নরকে নিয়ত বাস সে মনুষ্যের হয়।
তুমি জান জনার্দন সে সব বিষয় ॥
আমি শুনিয়াছি তাই সাধুসন্ত মুখে।
নরকের পথে চলি কে রহিবে সুখে ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি যে, যাদের কুলধর্ম বিনষ্ট হয়েছে, তাদের নিয়ত নরকে বাস করতে হয়।

তাৎপর্য

অর্জুনের সমস্ত যুক্তি-তর্ক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পক্ষান্তরে তিনি সাধুসন্ত আদি মহাজনদের কাছ থেকে আহরণ করা জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন যে-মানুষ, তাঁর তত্ত্বাবধানে এই জ্ঞান শিক্ষালাভ না করলে, এই জ্ঞান আহরণ করা যায় না। বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিধি অনুসারে মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত পাপ মোচনের জন্য কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত বিধি পালন করতে হয়। যে সব সময় পাপকার্যে লিপ্ত থেকে জীবন অতিবাহিত করেছে, তার পক্ষে এই বিধি অনুসরণ করে প্রায়শ্চিত্ত করাটা অবশ্য কর্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার পাপের ফলস্বরূপ মানুষ নরকে পতিত হয়ে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

শ্লোক ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং কর্তৃং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো-হায়; বত-কী আশ্চর্য, মহৎ-মহা; পাপম্ পাপ; কর্তুম্ করতে; ব্যবসিতাঃ সংকল্পবদ্ধ; বয়ম্-আমরা; যৎ-যেহেতু; রাজ্য-সুখ-লোভেন-রাজ্য-সুখের লোভে, হন্তুম্ হত্যা করতে; স্বজনম্ আত্মীয়-স্বজনদের; উদ্যতাঃ-উদ্যত।

গীতার গান

হায় হায় মহাপাপ করিতে উদ্যত।
হয়েছি আমরা শুধু হয়ে কলুষিত ॥
রাজ্যের লোভেতে পড়ে এ দুষ্কার্য করি।
স্বজন হনন এই উচিত কি হরি? ॥

অনুবাদ

হায়! কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি।

তাৎপর্য

স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধুকে হত্যা করতে দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অর্জুন সদাসর্বদা নৈতিক কর্তব্য অকর্তব্যের প্রতি সচেতন, তাই তিনি এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

শ্লোক ৪৫

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ । ৪৫ ॥

যদি-যদি; মাম্-আমাকে; অপ্রতীকারম্-প্রতিরোধ রহিত; অশস্ত্রম্-নিরস্ত্র; শস্ত্রপাণয়ঃ-শস্ত্রধারী; ধার্তরাষ্ট্রাঃ-ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা; রণে রণক্ষেত্রে; হন্যুঃ-হত্যা করে; তৎ-তবে; মে-আমার; ক্ষেমতরম্ অধিকতর মঙ্গল; ভবেৎ-হবে।

গীতার গান

যদি ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে মারিয়া।
এই রণে রাজ্য লয় অশস্ত্র বুঝিয়া ॥
সেও ভাল মনে করি যুদ্ধ সে অপেক্ষা।
বিনাযুদ্ধে সেই আমি করিব প্রতীক্ষা ॥

অনুবাদ

প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যুদ্ধে বধ করে, তা হলে আমার অধিকতর মঙ্গলই হবে।

তাৎপর্য

'ক্ষত্রিয় রণনীতি অনুসারে নিয়ম আছে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় অথবা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। কিন্তু অর্জুন স্থির করলেন যে, এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় তাঁর শত্রুরা যদি তাঁকে আক্রমণও করে, তবুও তিনি যুদ্ধ করবেন না। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন না, শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করতে কতটা আগ্রহী ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ ভগবস্তুক্তোচিত কোমল হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক।

শ্লোক ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; এবম্-এভাবে; উক্ত্বা-বলে; অর্জুনঃ-অর্জুন; সংখ্যে-যুদ্ধক্ষেত্রে; রথোপস্থে-রথের উপর; উপাবিশৎ-উপবেশন করলেন; বিসৃজ্য-ত্যাগ করে; সশরম্ শরযুক্ত; চাপম্-ধনুক; শোক-শোক দ্বারা; সংৰিগ্ন-অভিভূত; মানসঃ-চিত্তে।

গীতার গান

একথা বলিয়া পার্থ নিশ্চল বসিল।

রথোপস্থ যুদ্ধ মধ্যে অস্ত্র সে ত্যজিল ॥
শোকেতে উদ্বিগ্নমনা অর্জুন সদয় ।
বিষাদ-যোগ নাম এই গীতার বিষয় ।

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তাঁর ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

শত্রুসৈন্যকে নিরীক্ষণ করতে অর্জুন রথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি শোকে এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তুণ ফেলে দিয়ে, তিনি রথের উপর বসে পড়লেন। এই ধরনের কোমল হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষই কেবল ভগবদ্ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সেনা-পর্যবেক্ষণ বিষয়ক 'বিষাদ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য-যোগ

শ্লোক ১

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; তম্-অর্জুনকে; তথা-এভাবে; কৃপয়া-কৃপায়; আবিষ্টম্-আবিষ্ট হয়ে; অশ্রুপূর্ণ-অশ্রুসিক্ত; আকুল-ব্যাকুল; ঈক্ষণম্ চক্ষু; বিষীদন্তম্-অনুশোচনা করে; ইদম্-এই; বাক্যম্ কথাগুলি; উৰাচ-বললেন; মধুসূদনঃ-মধুহন্তা।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল:

দেখিয়া অর্জুনে কৃষ্ণ সেই অশ্রুজলে।
কৃপায় আবিষ্ট হয়ে ভাবিত বিকলে ॥
কৃপাময় মধুসূদন কহিল তাহারে ।
ইতিবাক্য বন্ধুভাবে অতি মিষ্টস্বরে ।

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন-অর্জুনকে এভাবে অনুতপ্ত, ব্যাকুল ও অশ্রুসিক্ত দেখে, কৃপায় আবিষ্ট হয়ে মধুসূদন বা শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

জাগতিক করুণা, শোক ও চোখের জল হচ্ছে প্রকৃত সত্তার অজ্ঞানতার বহিঃপ্রকাশ। শাশ্বত আত্মার জন্য করুণার অনুভব হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এই শ্লোকে 'মধুসূদন' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মধু নামক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন এবং এখানে অর্জুন চাইছেন, অজ্ঞতারূপ যে দৈত্য তাঁকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত রেখেছে, তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করুন। মানুষকে কিভাবে করুণা প্রদর্শন করতে হয়, তা কেউই জানে না। যে মানুষ ডুবে যাচ্ছে, তার পরনের কাপড়ের প্রতি করুণা প্রদর্শন করাটা নিতান্তই অর্থহীন। তেমনই, যে মানুষ ভবসমুদ্রে পতিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার বাইরের আবরণ জড় দেহটিকে উদ্ধার করলে তাকে উদ্ধার করা হয় না। এই কথা যে জানে না এবং যে জড় দেহটির জন্য শোক করে, তাকে বলা হয় শূদ্র, অর্থাৎ যে অনর্থক শোক করে। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাই তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ আশা করা যায় না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করতে পারেন, তাই তিনি অর্জুনকে ভগবদ্গীতা শোনালেন। গীতার এই অধ্যায়ে জড় দেহ ও চেতন আত্মার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন- আমাদের স্বরূপ কি, আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি। পারমার্থিক তত্ত্বের উপলব্ধি এবং কর্মফলে নিরাসক্তি ছাড়া এই অনুভূতি হয় না।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ৷৷

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; কুতঃ-কোথা থেকে; ত্বা-তোমার; কর্ম্মলম্- কলুষ; ইদম্-এই অনুশোচনা; বিষমে-সঙ্কটকালে, সমুপস্থিতম্-উপস্থিত হয়েছে; অনার্য যে মানুষ জীবনের মূল্য জানে না; জুষ্টম্-উচিত; অস্বর্গাম্-যে কার্য উচ্চতর লোকে নিয়ে যায় না; অকীর্তি-অপকীর্তি; করম্-কারণ; অর্জুন-হে অর্জুন।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:
কিভাবে অর্জুন তুমি ঘোর যুদ্ধস্থলে।
অনার্যের শোকানল প্রদীপ্ত করিলে ॥
অকীর্তি অস্বর্গ লাভ হইবে তোমার ।
ছি ছি বন্ধু ছাড় এই অযোগ্য আচার ॥

অনুবাদ

পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন-প্রিয় অর্জুন, এই ঘোর সঙ্কটময় যুদ্ধস্থলে যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে না, সেই সব অনার্যের মতো শোকানল তোমার হৃদয়ে কিভাবে প্রজ্বলিত হল? এই ধরনের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করবে না, পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশরাশি বিনষ্ট করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অভিন্ন। তাই সমগ্র ভগবদ্গীতায় তাঁকে ভগবান বলে

সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের চরম সীমা। পরমতত্ত্ব উপলব্ধির তিনটি স্তর রয়েছে-ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ সর্বব্যাপ্ত সত্তা, পরমাত্মা অর্থাৎ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বরের প্রকাশ এবং ভগবান অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরম-তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে-

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীরা তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও ভগবান-এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় অভিব্যক্ত হয়।" এই তিনটি চিন্ময় প্রকাশ সূর্যের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। সূর্যেরও তিনটি বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে, যেমন-সূর্যরশ্মি, সূর্যগোলক ও সূর্যমণ্ডল। সূর্যরশ্মি সম্বন্ধে জানাটা প্রাথমিক স্তর, সূর্যগোলক সম্বন্ধে জানাটা আরও উচ্চ স্তরের এবং সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে সূর্য সম্বন্ধে জানাটা হচ্ছে সর্বোচ্চ। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সূর্যকিরণ সম্বন্ধে জেনেই সন্তুষ্ট থাকে-তার সর্বব্যাপকতা এবং তার নির্বিশেষ রশ্মিছটা সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাকে পরম-তত্ত্বের ব্রহ্মা-উপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যাঁরা আরও উন্নত স্তরে রয়েছেন, তাঁরা সূর্যগোলকের সম্বন্ধে অবগত, সেই জ্ঞানকে পরম-তত্ত্বের পরমাত্মা উপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং যাঁরা সূর্যমণ্ডলের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাঁদের জ্ঞান পরম-তত্ত্বের সর্বোত্তম সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাই, ভগবদ্ভক্তবৃন্দ অথবা যে সমস্ত পরমার্থবাদী পরম-তত্ত্বের ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমার্থবাদী, যদিও সমস্ত পরমার্থবাদীরা সেই একই পরম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে রত। সূর্যরশ্মি, সূর্যগোলক ও সূর্যমণ্ডল-এই তিনটি একে অপর থেকে পৃথক হতে পারে না, কিন্তু তবুও তিনটি বিভিন্ন স্তরের অন্বেষণকারীরা সমপর্যায়ভুক্ত নন।

শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি ভগবান্ কথাটির বিশ্লেষণ করেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান। অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা খুব ধনী, অত্যন্ত শক্তিশালী, সুপুরুষ, অত্যন্ত জ্ঞানী ও অত্যন্ত অনাসক্ত, কিন্তু এমন কেউ নেই যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য আদি গুণগুলি পূর্ণরূপে বিরাজমান। কেবল শ্রীকৃষ্ণই তা দাবি করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কোন জীবই, এমন কি ব্রহ্মা, শিব অথবা নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণের মতো পূর্ণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন হতে পারেন না। তাই, ব্রহ্মসংহিতাতে ব্রহ্মা নিজে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ, অথবা গোবিন্দ নামে পরিজ্ঞাত ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ-

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"ভগবানের গুণাবলী ধারণকারী বহু পুরুষ আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, কারণ তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন অনাদির আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

ভাগবতেও পরমেশ্বর ভগবানের অনেক অবতারের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেখানেও বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং তাঁর থেকে বহু বহু অবতার ও ঈশ্বর বিস্তার লাভ করে-

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

"সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা তাঁর অংশের অংশ-প্রকাশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।" (ভাগবত ১/৩/২৮)

তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আদিরূপ, পরমতত্ত্ব এবং পরমাত্মা-ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে আত্মীয়-পরিজনদের জন্য অর্জুনের এই শোক অত্যন্ত অশোভন, তাই ভগবান আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্যক্ত করেছেন, কুতঃ, "কোথা থেকে।" এই ধরনের ভাবপ্রবণতা পুরুষোচিত নয় এবং একজন সুসভ্য আর্যের কাছ থেকে এটি কখনই আশা করা যায় না। আর্য বলে তাঁকেই অভিহিত করা হয়, যিনি জীবনের মূল্য বোঝেন এবং যাঁর সভ্যতা অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত মানুষ তাদের দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা কখনই উপলব্ধি করতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব বিষ্ণু বা ভগবানকে উপলব্ধি করা। তারা জড় জগতের বহিরঙ্গা রূপের দ্বারা মোহিত হয়, তাই তারা জানে না মুক্তি বলতে কি বোঝায়। জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জ্ঞান যাদের নেই, তাদেরকে বলা হয় অনার্য। যদিও অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, তবুও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে তিনি তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছিলেন। এই ধরনের কাপুরুষতা অনার্যের কাছ থেকেই কেবল আশা করা যায়। এভাবে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হলে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না, এমন কি পার্থিব জগতে কাউকে যশস্বী হওয়ার সুযোগও প্রদান করে না। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অর্জুনের এই তথাকথিত সহানুভূতিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করেননি।

শ্লোক ৩

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ক্লৈব্যম্ - ক্লীবত্ব; মা স্ম-করো না; গমঃ গ্রহণ করা; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ন-কখনই নয়; এতৎ-এই; ত্বয়ি-তোমার; উপপদ্যতে-উপযুক্ত; ক্ষুদ্রম্-ক্ষুদ্র; হৃদয়-হৃদয়ের; দৌর্বল্যম্-দুর্বলতা; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; উত্তিষ্ঠ-উঠ; পরন্তপ-শত্রু দমনকারী।

গীতার গান

নপুংসক নহ পার্থ এ কি ব্যবহার।
যোগ্য নহে এ কার্য বন্ধু যে আমার ॥
হৃদয়দৌর্বল্য এই নিশ্চয়ই জানিবে।
ছাড় এই, কর যুদ্ধ যদি শত্রুকে মারিবে ।

অনুবাদ

হে পার্থ। এই সম্মান হানিকর ক্লীবত্বের বশবর্তী হয়ো না। এই ধরনের আচরণ তোমার পক্ষে অনুচিত। হে পরন্তপ। হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী পৃথার পুত্র, তাই তাঁকে এখানে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষত্রিয়ের সন্তান যদি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, তখন বুঝতে হবে, সে কেবল নামেই

ক্ষত্রিয়; তেমনই, ব্রাহ্মণের সন্তান যখন অধার্মিক হয়, তখন বুঝতে হবে, সে কেবল নামেই ব্রাহ্মণ। এই ধরনের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তাদের পিতার অযোগ্য সন্তান। তাই, শ্রীকৃষ্ণ চাননি, অর্জুন অযোগ্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলে কুখ্যাত হোক। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি হয়ে নিজেই তাঁকে পরিচালিত করছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি অর্জুন যুদ্ধ না করে, তবে তা হবে নিতান্ত অখ্যাতির বিষয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, এই রকম আচরণ করা তাঁর পক্ষে অশোভন। অর্জুন যুক্তি দেখিয়েছিলেন, অত্যন্ত সম্মানীয় ভীষ্ম ও নিজের আত্মীয়দের প্রতি উদার মনোভাবহেতু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, এই ধরনের মহানুভবতা হৃদয়ের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। কখনই অনুমোদন করেননি। এই ধরনের ভ্রান্ত মহানুভবতাকে মহাজনেরা. সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় অর্জুনের মতো পুরুষের এই ধরনের মহানুভবতা, অথবা তথাকথিত অহিংসা পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৪

অর্জুন উবাচ
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইমুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজাহাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

'অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; কথম্-কিভাবে; ভীষ্মম্ভীষ্ম; অহম্-আমি; সংখ্যে-যুদ্ধে; দ্রোণম্ দ্রোণাচার্য; চ-ও; মধুসূদন-হে মধুহা; ইমুভিঃ-বাণের দ্বারা; প্রতিযোৎস্যামি-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব; পূজাহৌ-পূজনীয়; অরিসূদন-হে শত্রুহন্তা।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
মধুসূদন! কি আজ্ঞা কর তুমি মোরে।
ভীষ্ম দ্রোণ গুরুজন তারে মারিবারে? ।।
পূজার যোগ্য যে তাঁরা হন নিত্যকাল।
তাঁদের শরীরে বাণ সুতীক্ষ্ণ ধারাল? ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে অরিসূদন। হে মধুসূদন! এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো পরম পূজনীয় ব্যক্তিদের কেমন করে আমি বাণের দ্বারা প্রতিদ্বন্দিতা করব?

তাৎপর্য

পিতামহ ভীষ্ম ও শিক্ষক দ্রোণাচার্যের মতো গুরুজনেরা সর্বদাই পূজনীয়। এমন কি যদি তাঁরা আক্রমণও করেন, তবুও তাঁদের প্রতি-আক্রমণ করা উচিত নয়। সাধারণ শিষ্টাচার হচ্ছে যে, গুরুজনদের প্রতি এমন কি মৌখিক তর্কযুদ্ধ করাও উচিত নয়। এমন কি তাঁদের আচরণ যদি কখনও কখনও রূঢ়ও হয়, তবুও তাঁদের প্রতি রূঢ়ভাবে আচরণ করা উচিত নয়। তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করা অর্জুনের পক্ষে কি করে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ কি কখনও তাঁর পিতামহ উগ্রসেন অথবা তাঁর গুরুদেব সান্দীপনি মুনিকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবেন? অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে এই রকম যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৫

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

গুরূন্-গুরুজনেরা; অহত্বা-হত্যা না করে; হি-অবশ্যই; মহানুভাবান্-মহান আত্মাগণ; শ্রেয়ঃ-শ্রেয়; ভোক্তুম্-ভোগ করা; ভৈক্ষ্যম্-ভিক্ষার দ্বারা; অপি-ও; ইহ-এই জীবনে; লোকে-এই জগতে; হত্বা-হত্যা করে; অর্থ-লাভ; কামান্-কামনা করে; তু-কিন্তু; গুরূন্-গুরুজনদের; ইহ-এই জগতে; এব-অবশ্যই; ভুঞ্জীয়-ভোগ করতে হবে; ভোগান্-ভোগ্যবস্তু; রুধির-রক্ত; প্রদিগ্ধান্-মাখা।

গীতার গান

শুধু গুরু নহে তাঁরা, মহানুভব হয় যাঁরা,
হত্যা করি তাঁদের সবারে।
তদপেক্ষা ভিক্ষা ভাল, কাটিয়ে যাইবে কাল,
মিথ্যা যুদ্ধ করাও আমারে ।
হত্যা এই মহাকাম, বিধি যে হইল বাম,
এই যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে।
সে ভোগ রুধিরমাখা, কেমনে করিব সখা,
সে যুদ্ধ কে করিয়াছে কবে ॥

অনুবাদ

আমার মহানুভব শিক্ষাগুরুদের জীবন হানি করে এই জগৎ ভোগ করার থেকে বরং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ভাল। তাঁরা পার্থিব বস্তুর অভিলাষী হলেও আমার গুরুজন। তাঁদের হত্যা করা হলে, যুদ্ধলব্ধ সমস্ত ভোগ্যবস্তু তাঁদের রক্তমাখা হবে।

তাৎপর্য

শাস্ত্রনীতি অনুসারে, যে গুরু জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছে এবং ভাল-মন্দ বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেছে, তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্যোধনের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য পেতেন বলে ভীষ্ম ও দ্রোণ তার পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্য পাবার ফলে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁদের উচিত হয়নি। এই অনুচিত কার্য করার ফলে, তাঁরা পাণ্ডবদের পরমারাধ্য শিক্ষাগুরুর পদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি অর্জুনের শ্রদ্ধা কোন অংশে হ্রাস পায়নি এবং অর্জুন এই কথা ভেবে মনে মনে শিহরিত হয়েছেন যে, জাগতিক সুখ উপভোগ করার জন্য তাঁদের হত্যা করা হলে, সেই ভোগ হবে তাঁদের রুধিরমাখা।

শ্লোক ৬

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো

যদ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্
তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

ন-না; চ-ও; এতৎ-এই; বিদ্মঃ-আমরা জানি; কতরৎ-যা; নঃ-আমাদের; গরীয়ঃ-শ্রেয়ঃ; যৎ-যা; বা-অথবা; জয়েম-জয় করি; যদি-যদি; বা-অথবা; নঃ-আমাদের; জয়েয়ু-জয় করা হয়; যান্-যারা; এব-অবশ্যই; হত্বা-হত্যা করে; ন-না; জিজীবিষামঃ-জীবন ধারণের ইচ্ছা করি; তে-তারা সকলে; অবস্থিতাঃ-অবস্থিত; প্রমুখে-সম্মুখে; ধার্তরাষ্ট্রাঃ-ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ।

গীতার গান

বুঝিতে পারি না ভাল, কোন কার্য জুয়ায় আমায় ।
কোথায় গরিমা হল,
কিবা আমি জয় করি, কিংবা আমি নিজে মরি,
দুই নৌকা আমারে নাচায় ॥
যাদের মারিয়া রণে, বাঁচিব সে অকারণে,
তারা সব আমার সম্মুখে।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, আর যত বন্ধুজন,
মরিলে সে হবে মোর দুঃখ ॥

অনুবাদ

তাদের জয় করা শ্রেয়, না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করি, তা হলে আমাদের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে না। তবুও এই রণাঙ্গনে তারা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

যুদ্ধ করাটা যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, তবুও অর্জুন স্থির করতে পারছিলেন না যে, সেই অনর্থক হিংসাত্মক যুদ্ধে রত হবেন, না কি ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করবেন। তিনি যদি তাঁর শত্রুদের পরাজিত না করেন, তা হলে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। আর তা ছাড়া, যুদ্ধে যে কোন্ পক্ষের জয় হবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হলেও (কারণ, তাঁদের দাবি ছিল ন্যায়সঙ্গত) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অবর্তমানে জীবন ধারণ করা তাঁদের পক্ষে নিতান্ত দুর্বিষহ হবে বলে অর্জুন মনে করেছিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে সেটিও তাদের পক্ষে এক রকম পরাজয়। অর্জুনের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেচনা অবধারিতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল মহৎ ভগবদ্ভক্তই ছিলেন না, তিনি গভীর তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন। যদিও তিনি রাজকীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতে মনস্থ করেছিলেন। এর মাধ্যমেও আমরা দেখতে পাই যে, অন্তরে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এই সমস্ত সদ্গুণাবলী এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বাক্যের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা, এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলে তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক। আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, মুক্তি লাভের জন্য অর্জুন সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। ইন্দ্রিয় যদি সংযত না হয়, তবে দিব্যজ্ঞান উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। এই দিব্যজ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া জড় জগতের বন্ধন থেকে কোন রকমেই মুক্ত হওয়া যায় না। অর্জুন এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিল জাগতিক সম্পর্কিত অস্বাভাবিক গুণাবলী।

শ্লোক ৭

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাথি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য-কৃপণতা; দোষ-দুর্বলতা; উপহত-প্রভাবিত হয়ে; স্বভাবঃ-স্বভাব; পৃচ্ছামি-আমি জিজ্ঞাসা করছি; ত্বাম্-তোমাকে; ধর্ম-ধর্ম; সম্মূঢ় হতবুদ্ধি; চেতাঃ-চিত্ত; যৎ-যা; শ্রেয়ঃ-শ্রেয়স্কর; স্যাৎ-হয়; নিশ্চিতম্-নিশ্চিতভাবে; বুহি-বল; তৎ-তা; মে-আমাকে; শিষ্যঃ-শিষ্য; তে-তোমার; অহম্-আমি: শাধি-নির্দেশ দাও; মাম্-আমাকে; ত্বাম্-তোমার; প্রপন্নম্-আত্মসমর্পিত।

গীতার গান

কার্পণ্য দোষেতে দূষী, মোহেতে হয়েছি বশী,
স্ব স্বভাব হল অপহত ।
নিজ ধর্ম ছাড়ি মূঢ়, জিজ্ঞাসি তোমারে দৃঢ়,
কৃপা করি করহ সংযত ॥
তুমি জান হিত মোর, হয়েছি মোহেতে ভোর,
ভাল যাতে করহ বিচারে।
হইনু তোমার শিষ্য, দেখুক সকল বিশ্ব,
শিক্ষা দাও এই প্রপন্নরে ।

অনুবাদ

কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

তাৎপর্য

প্রকৃতির প্রভাবে জড়-জাগতিক কর্মচক্রের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অনুভব করি। তাই আমাদের সত্যদ্রষ্টা সদগুরুর শরণ নিতে হয় এবং তিনি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করবার পথে পরিচালিত করেন। আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের জটিল সমস্যাগুলি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হবার উপদেশ সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে। জড়-জাগতিক ক্লেশ হচ্ছে দাবানলের মতো যা আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, এই আগুন কেউ লাগায় না। ঠিক তেমনই, জগতের এমনই অবস্থা যে, জীবনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আপনা থেকেই আবির্ভূত হয়, এই প্রকার বিভ্রান্তি আমরা না চাইলেও। কেউ আগুন চায় না, তবুও আগুন জ্বলতে থাকে এবং তার ফলে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। বৈদিক, সাহিত্য তাই উপদেশ দিচ্ছে যে, জীবনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা সমাধানের জন্য এবং সেই সমাধানের বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন যে সদগুরু, তাঁর শরণাপন্ন হতে হবে। যে ব্যক্তি সদ্‌গুরু তিনি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। তাই, জড় জগতের মোহের দ্বারা আবদ্ধ না থেকে সদগুরুর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এটিই হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য।

জড় জগতের মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন কে? যে মানুষ তার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবগত নয়,

সেই হচ্ছে মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩/৮/১০) মোহাচ্ছন্ন মানুষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে-যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। "যে মানুষ তার মনুষ্য জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে না এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না করে কুকুর-বেড়ালের মতো এই জগৎ থেকে বিদায় নেয়, সেই হচ্ছে কৃপণ।" এই মানবজন্ম হচ্ছে একটি অমূল্য সম্পদ, কারণ, জীব এই জন্মের সদ্ব্যবহার করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে; তাই, যে এই অমূল্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না, সে হচ্ছে কৃপণ। পক্ষান্তরে, যিনি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানব-জন্মের সদ্ব্যবহার করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্খাল্ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
যে কৃপণ সে পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি আদি জড় সম্বন্ধের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে তার সময়ের অপচয় করে। মানুষ প্রায়ই এক ধরনের 'চর্মরোগের' দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন সমন্বিত পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। এই রোগকে 'চর্মরোগ' বলা হয়, কারণ দেহের ভিত্তিতে বা চর্মের ভিত্তিতে এই আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে এবং এই বন্ধনের ফলে জীব অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। কৃপণ মনে করে, সে তার পরিবারের তথাকথিত আত্মীয়দের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে; নয়ত সে মনে করে, তার আত্মীয়স্বজন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে। এই ধরনের পারিবারিক বন্ধন এমন কি পশুদের মধ্যেও দেখা যায়, তারাও তাদের সন্তানদের যত্ন করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন, আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি তাঁর মমতা এবং তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার বাসনাই ছিল তাঁর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণ। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর যুদ্ধ করার কর্তব্য তাঁকে সম্পাদন করতে হবে, কিন্তু তবুও কৃপণতা জনিত দুর্বলতার ফলে তিনি তাঁর সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয় করছেন, তাঁর এই সমস্যার সমাধান করার উপায় প্রদর্শন করতে। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শিষ্যরূপে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি আর বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করছেন না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে কথা হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন অর্জুন তাই গভীর গুরুত্বের সঙ্গে পরম শুরু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরম তত্ত্বদর্শনের আলোচনা করতে চান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবদ্গীতার তত্ত্ববিজ্ঞানের আদি গুরু এবং অর্জুন হচ্ছেন গীতার তত্ত্ব-উপলব্ধিকারী প্রথম শিষ্য। অর্জুন কিভাবে ভগবদ্গীতার জ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা ভগবদ্গীতাতেই করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গর্দভসদৃশ জড় পণ্ডিতেরা গীতার ব্যাখ্যা করে বলে, শ্রীকৃষ্ণ নামক কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃস্থিত অপ্রকাশিত যে-তত্ত্ব, তাকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে গীতার প্রকৃত শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অনাদির আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান। তাঁর অন্তর আর বাইরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তিনি সর্বব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান। কিন্তু এই জ্ঞান যার নেই, সেই মহামূর্খের পক্ষে গীতার মর্ম উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ৮

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

ন-না: হি-অবশ্যই; প্রপশ্যামি দেখছি; মম-আমার; অপনুদ্যাৎ-দূর করতে পারে; যৎ-যা; শোকম্-শোক; উচ্ছোষণম্-শুকিয়ে দিচ্ছে; ইন্দ্রিয়াণাম্-ইন্দ্রিয়গুলিকে; অবাপ্য-প্রাপ্ত হয়ে; ভূমৌ-এই পৃথিবীতে; অসপত্নম্-প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন; ঋদ্ধম্-সমৃদ্ধিশালী; রাজ্যম্-রাজ্য; সুরাণাম্-দেবতাদের; অপি-এমন কি; চ-ও; আধিপত্যম্-আধিপত্য।

গীতার গান

দেখি না আমি যে অন্ধ, তাহে বুদ্ধি অতি মন্দ,
শোকানল নিভিবে কিভাবে।
যে শোক জ্বালায় মোরে, ইন্দ্রিয়াদি সব পোড়ে,
ভবরোগ কিরূপে ঘুচাবে ॥
যদি পাই ত্রিভুবন, রাজ্যলক্ষ্মী সুলোভন,
অসপত্ন রাজ্যের বিকাশ।
দেবলোকে আধিপত্য, তোমাকে কহিনু সত্য,
নাহি হবে এ শোক বিনাশ ॥

অনুবাদ

আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে যে শোক, তা দূর করবার কোন উপায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মতো আধিপত্য নিয়ে সমৃদ্ধিশালী, প্রতিদ্বন্দিতাবিহীন রাজ্য এই পৃথিবীতে লাভ করলেও আমার এই শোকের বিনাশ হবে না।

তাৎপর্য

অর্জুন যদিও তাঁর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসে ধর্মগত ও নীতিগত যুক্তির অবতারণা করছিলেন, কিন্তু তবুও যেন তিনি তাঁর গুরু শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া তাঁর প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যে সমস্যা তাঁর সমস্ত সত্তাকে দগ্ধ করছিল, তাঁর তথাকথিত জ্ঞানের সাহায্যে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। কেতাবী বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, উচ্চপদ আদি জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কখনই করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মতো গুরুর কৃপার ফলেই কেবল সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। তাই, সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে গুরু সর্বতোভাবে কৃষ্ণচেতনার অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সদ্গুরু, কেন না তিনিই কেবল পারেন মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রাহ্মণই হন বা শূদ্রই হন, তিনিই কেবল পারেন গুরু হতে।

কিবা বিপ্ল, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী না হলে সদ্গুরু হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও বলা হয়েছে-

ষটকর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"সমস্ত বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, অথবা যদি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা না হন, তবে তিনি গুরু হবার যোগ্য নন। কিন্তু যদি নীচকুলোদ্ভূত চণ্ডাল কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বৈষ্ণব হন, তবে তিনি গুরু হতে পারেন।" (পদ্ম পুরাণ)

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি-এই চতুর্বিধ সমস্যা জড় অস্তিত্বকে সর্বদাই জর্জরিত করছে এবং ধনৈশ্বর্যের সঞ্চয় অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে কখনই এই সমস্যার সমাধান

করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক দেশ সব রকমের জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত দেশ চরম অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে জড় জীবনের যে সমস্ত সমস্যা তা কোন অংশেই লাঘব হয়নি। নানাভাবে তারা শান্তি পাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা, অর্থাৎ ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ গ্রহণ করা, অথবা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ করা।

যদি অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রমত্ততা জনিত শোক থেকে উদ্ধার করতে পারত, তবে অর্জুন বলতেন না যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন পৃথিবীর সাম্রাজ্য অথবা স্বর্গলোকের আধিপত্য লাভ করলেও তিনি শোকমুক্ত হতে পারবেন না। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনার আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন এবং সুখ ও শান্তি লাভের সেটিই হচ্ছে পন্থা। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য প্রকৃতির অঙ্গুলিহেলনে মুহূর্তের মধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। মানুষের গ্রহান্তরে যাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, যেমন চাঁদে যাবার জন্য অনুসন্ধান করছে, তাও প্রকৃতির এক ঘাতে সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভগবদ্গীতায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে-ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। "সমস্ত পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, চরম সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন থেকে নিতান্তই নিম্নস্তরের জীবনে পতিত হতে হয়।" অনেক রাজনীতিবিদ এভাবেই অধঃপতিত হয়েছে এবং এই ধরনের অধঃপতন কেবল দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই, আমরা যদি আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ববিধ শোকের নিরসন করতে চাই, তবে আমাদের অর্জুনের মতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে হবে। সুতরাং অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে অনুরোধ করেছিলেন, প্রতিটি মানুষেরই উচিত সেভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ৯

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব হ ৷ ৯ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; এবম্-এভাবে; উক্ত্বা-বলে; হৃষীকেশম্ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে; গুড়াকেশঃ-নিদ্রাজয়ী অর্জুন; পরন্তপঃ-শত্রু দমনকারী; ন যোৎস্যে-আমি যুদ্ধ করব না; ইতি-এভাবে; গোবিন্দম্-ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণকে; উক্ত্বা-বলে; তূষ্ণীম্-নীরব; বভূব-হলেন; হ-নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান
সঞ্জয় কহিল:
সে কথা বলিয়া গুড়াকেশ পরতাপী।
হৃষীকেশে নিবেদিল যদিও প্রতাপী ॥
হে গোবিন্দ! মোর দ্বারা যুদ্ধ নাহি হবে।
যুদ্ধ ছাড়ি সেই বীর রহিল নীরবে ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন-এভাবে মনোভাব ব্যক্ত করে গুড়াকেশ অর্জুন তখন হৃষীকেশকে বললেন, "হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না", এই বলে তিনি মৌন হলেন।

তাৎপর্য

গতরাষ্ট্র যখন শুনলেন, অর্জুন যুদ্ধ না করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করবেন, তখন তিনি মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ করার মানসে সঞ্জয় তাঁকে জানিয়ে দিলেন, অর্জুন হচ্ছেন পরন্তপঃ অর্থাৎ শত্রুর বিনাশকারী। যদিও অর্জুন পারিবারিক বন্ধনের মোহের বশবর্তী হয়ে সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার পরই তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, অর্জুন শীঘ্রই পারিবারিক বন্ধনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করবেন এবং ভগবানের নির্দেশে সেই যুদ্ধে রত হয়ে নির্মমভাবে শত্রু সংহার করবেন। এভাবে ক্ষণস্থায়ী যে আশার আনন্দে ধৃতরাষ্ট্রের বুক ভরে উঠেছিল, তা অচিরেই অন্তর্হিত হল।

শ্লোক ১০

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োমধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

তম-তাঁকে; উবাচ বললেন; হৃষীকেশঃ-ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ; প্রহসন্-হেসে; ইব-এভাবে; ভারত-হে ভরতবংশজ ধৃতরাষ্ট্র; সেনয়োঃ-সেনাদের; উভয়োঃ-উভয় পক্ষের; মধ্যে-মাঝখানে; বিষীদন্তম্-বিষাদগ্রস্ত; ইদম্-এই; বচঃ-বাক্য।

গীতার গান

স্নিগ্ধ হাসি মনোহর হৃষীকেশ বলে।
হে ভারত। অর্জুনের শুনিয়া সকলে ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যমধ্যে হাসিয়া হাসিয়া ।
উপদেশ করেন গীতা বিষণ্ণ দেখিয়া ॥

অনুবাদ

হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র! সেই সময় স্মিত হেসে, শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বললেন।

তাৎপর্য

দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হৃষীকেশ ও গুড়াকেশের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। বন্ধু হিসাবে তাঁরা দুজনেই ছিলেন সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাকৃতভাবে অপরের শিষ্যত্ব বরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় হাসছিলেন, কারণ তাঁর বন্ধু তাঁর শিষ্য হতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি পরমেশ্বর, তাই প্রভুরূপে তিনি সকলেরই নিয়ন্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভক্তের বাসনা অনুযায়ী তাঁদের বন্ধু, পুত্র ও প্রেমিক হতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে তাঁকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে গুরুবৎ গাম্ভীর্য সহকারে উপদেশ দেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে দুই সেনানীর মাঝখানে, যার ফলে সেই কথা শ্রবণ করে সকলেই লাভবান হতে

পেরেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভগবদ্গীতার বাণী কোন বিশেষ ব্যক্তি, সমাজ অথবা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এই বাণী সকলের জন্য এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই এর যথার্থ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে ভগবানের চরণে শরণাগতি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসুংশ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ- পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অশোচ্যান্-যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; অন্বশোচঃ-তুমি শোক করছ, ত্বম্-তুমি; প্রজ্ঞাবাদান্-প্রাজ্ঞ বচন; চ-ও; ভাষসে-বলছ; গত-বিগত; অসুন্-জীবন; অগত-যা গত হয়নি; অসুন্-জীবন; চ-ও; ন-না; অনুশোচন্তি-অনুশোচনা করেন; পণ্ডিতাঃ-পণ্ডিতগণ।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
অশোচ্য বিষয়ে শোক কর তুমি বীর।
প্রজ্ঞাবাদ ভাষ্যকার যেন কোন ধীর ॥
পণ্ডিত যে জন হয় শোক নাহি তার ।
মৃত দেহ নিত্য আত্মা সে জানে বিচার ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।

তাৎপর্য

শিষ্যরূপে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা মাত্রই ভগবান আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করে, অর্জুনের ভুল সংশোধন করার জন্য পরোক্ষভাবে তাঁকে মহামূর্খ বলে শাসন করতে লাগলেন। ভগবান তাঁকে বললেন, "তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তোমার নেই। যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন দেহ কি ও আত্মা কি, তাই তিনি জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই দেহের জন্য শোক করেন না। পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান যা জড় দেহ ও চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে এবং পরম নিয়ন্তা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্জুন যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি জানতেন না, বড় পদার্থ, আত্মা ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু তাঁর সেই জ্ঞান ছিল না, তাই তাঁর পক্ষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি দেখানো অনুচিত। যেহেতু তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, তাই তিনি অনর্থক শোক করছিলেন। জড় দেহের জন্ম হয় এবং এক সময় না এক সময় তার বিনাশ হবেই, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর তার কখনই বিনাশ হয় না। তাই, জড় দেহটি আত্মার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই আত্মাই হচ্ছে জীবের প্রকৃত সত্তা, তাই দেহের বিনাশ হবার ভয়ে শোক করা নিতান্তই মূর্খতা। এই সত্য সম্বন্ধে

যিনি অবগত তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানী এবং তিনি কোন অবস্থাতেই জড় দেহের জন্য শোক করেন না।

শ্লোক ১২

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ন-না; তু-কিন্তু; এব-অবশ্যই; অহম্-আমি; জাতু-কোনও সময়; ন-না; আসম্-অস্তিত্ব; ন-এমন নয়; ত্বম্-তুমি; ন-না; ইমে-এই সমস্ত; জনাধিপাঃ -নৃপতিগণ; ন-না; চ-ও; এব-অবশ্যই; ন-তেমন নয়; ভবিষ্যামঃ-অস্তিত্ব থাকবে; সর্বে-সকলের; বয়ম্-আমাদের; অতঃপরম্-তারপর।

গীতার গান
তুমি আমি যত রাজা সম্মুখে তোমার।
এরা সব চিরনিত্য করহ বিচার ॥
পূর্বে এরা নাহি ছিল পরে না থাকিবে।
মূর্খের বিচার এই নিশ্চয়ই জানিবে ॥

অনুবাদ

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি ও এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।

তাৎপর্য

বেদ, কঠ উপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, কৃত কর্ম এবং তার ফল অনুসারে জীব যদিও বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই তাদের পালন করেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। যে সমস্ত মহাত্মা অন্তরে ও বাইরে সেই একই পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে পান, তাঁরাই কেবল পূর্ণতা লাভ করে শাশ্বত শান্তি লাভ করতে পারেন।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥

(কঠ উপনিষদ ২/২/১৩)

"যিনি নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য, চেতনের মধ্যে পরম চেতন এবং যিনি এক হয়েও সকলের কামনা পূর্ণ করেন, যাঁরা ধীর তাঁরা অন্তরের অন্তস্তলে সর্বদাই তাঁকে দর্শন করেন এবং শাশ্বত শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু যারা তাঁর ভজন করে না, তারা কখনই তা লাভ করতে পারে না।"

এই বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান যা ভগবান অর্জুনকে দান করলেন, তা তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে দান করলেন, যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে জাহির করতে চায়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যারা এক-একজন মহামূর্খ। ভগবান স্পষ্টভাবে বলছেন, তিনি, অর্জুন ও সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত রাজারা সকলেই শাশ্বত স্বতন্ত্র জীব এবং ভগবান সমস্ত জীবকে তাদের বন্ধ ও মুক্ত উভয় অবস্থাতেই প্রতিপালন করেন। পরমেশ্বর ভগবান

হচ্ছেন পরম স্বতন্ত্র পুরুষ এবং ভগবানের নিত্য পার্ষদ অর্জুন এবং সেখানে সমবেত সমস্ত রাজারা হচ্ছেন স্বতন্ত্র শাশ্বত ব্যক্তি। এমন নয় যে, পূর্বে তাঁরা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতে থাকবেন না। তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্বে বর্তমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকবে। তাই, কারও জন্য শোক করা নিতান্তই নিরর্থক।

মায়াবাদীরা বলে থাকে যে, মুক্তির পর স্বতন্ত্র আত্মা মায়ার আবরণমুক্ত হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় এবং তখন আর আত্মার নিজস্ব সত্তা থাকে না -এই মতবাদ পরম শাস্ত্রজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনুমোদন করেননি। তা ছাড়া কেবল বদ্ধদশায় আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করি, সেই মতবাদও ভগবান এখানে অনুমোদন করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন, ভগবানের নিজের এবং অন্য সকলের অস্তিত্ব শাশ্বত, কারও স্বতন্ত্র সত্তার বিনাশ কখনই হয় না-এই কথা উপনিষদেও বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই সমস্ত কথা প্রামাণিক, কারণ তিনি কখনই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি সর্ব অবস্থায় বজায় না থাকত, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই বলতেন না যে, ভবিষ্যতেও কখনও এর বিনাশ হবে না। মায়াবাদী তার্কিকেরা বলতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন তা চিন্ময় স্বাতন্ত্র্য নয়, তা হচ্ছে জড় স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, সেটি কি ধরনের স্বাতন্ত্র্য? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি অতীতেও ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তিনি নানাভাবে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করেছেন এবং তিনি ঘোষণা করেছেন, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর অঙ্গকান্তি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য সব সময়ই বজায় রেখে গেছেন; যদি তাঁকেও সীমিত সাধারণ চেতনাবিশিষ্ট বদ্ধ জীবাত্মা বলে মনে করা হয়, তবে ভগবদ্গীতাকে কখনই পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

সীমিত জ্ঞানবিশিষ্ট, ভ্রান্তিপূর্ণ সাধারণ মানুষ কখনই পরম তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দিতে পারে না। ভগবদ্গীতা সাধারণ কাব্যগ্রন্থ নয়। সাধারণ মানুষের লেখা কোন বইয়ের সঙ্গেই ভগবদ্গীতার তুলনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেউ সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তবে তার কাছে ভগবদ্গীতার কোনই তাৎপর্য থাকতে পারে না। মায়াবাদী তার্কিকেরা বলে থাকে, প্রচলিত রীতি অনুসারে এই শ্লোকে বহুবচনের ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা জড় দেহটিকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে জড় দেহগত পরিচয়কে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করার পর, প্রচলিত রীতি অনুসারে সেই জড় দেহগত পরিচয়কেই আবার অনুমোদন করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কি করে সম্ভব? তাই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অপ্রাকৃত স্তরেও জীব স্বতন্ত্র আত্মারূপে বর্তমান থাকে। এই কথা রামানুজাচার্য আদি মহৎ আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন। ভগবদ্গীতাতে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই অপ্রাকৃত স্বাতন্ত্র্য ভগবদ্ভক্তেরা উপলব্ধি করতে পারেন। যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, ভগবদ্গীতার মতো মহৎ শাস্ত্রকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাদের নেই। ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষের ভগবদ্গীতা পাঠ করা মৌমাছির মধুর বোতল চাটার মতোই নিরর্থক। বোতল না খুললে যেমন মধুর স্বাদ পাওয়া যায় না, তেমনই ভগবানের ভক্ত না হলে ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। এই কথা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ভগবানের অস্তিত্বে যে অবিশ্বাস করে, তার পক্ষে ভগবদ্গীতা স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। তাই, মায়াবাদীরা গীতার যে ভাষ্য দিয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং তা মানুষকে বিপথগামী করে। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের ভাষ্য পড়তে অথবা শুনতে নিষেধ করে গেছেন। কারণ, মায়াবাদী-ভাষ্যের দ্বারা একবার প্রভাবিত হলে গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে আর উপলব্ধি করতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উল্লেখ করে, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কোন আবশ্যকতা

থাকে না। স্বতন্ত্র আত্মার বহুবচন ও ভগবান চিরন্তন সত্য এবং তা বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

দেহিনঃ-দেহীর; অস্মিন্ এই; যথা-যেমন; দেহে-দেহে; কৌমারম্-কৌমার; যৌবনম্-যৌবন; জরা-বার্ধক্য; তথা-তেমনই; দেহান্তর-দেহান্তর; প্রাপ্তিঃ-লাভ হয়; ধীরঃ-স্থিরবুদ্ধি; তত্র-তাতে; ন-না; মুহ্যতি-মোহগ্রস্ত হন।

গীতার গান

দেহ দেহী ভেদ দুই নিত্যানিত্য সেই।
কৌমার যৌবন জরা পরিবর্তন যেই ॥
দেহের স্বকার্য হয় দেহী নিত্য রহে।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি পণ্ডিতেরা কহে ॥

অনুবাদ

দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

তাৎপর্য

যেহেতু প্রত্যেকটি জীব হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র আত্মা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেকেই তার দেহ পরিবর্তন করে চলেছে, তার ফলে কখনও সে শিশু, কখনও কিশোর, কখনও যুবক এবং কখনও বৃদ্ধ। এভাবে সে নানা রূপ ধারণ করছে। কিন্তু জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। এক সময় দেহটি যখন অকেজো হয়ে যায়, তখন আত্মা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। মৃত্যুর পর জড় অথবা চিন্ময় আর একটি দেহ প্রাপ্ত হওয়া যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন ভীষ্ম দ্রোণাচার্য আদি আত্মীয়-পরিজনের জন্য শোক করা অর্জুনের পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক। বরং, তাঁদের মৃত্যুর কথা ভেবে শোক করার পরিবর্তে তাঁর আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ মৃত্যু হলে তাঁরা তাঁদের জরাগ্রস্ত বৃদ্ধদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ প্রাপ্ত হবেন এবং নবশক্তি লাভ করবেন। পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে জীব নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং নানা রকম সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। তাই, ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো মহাত্মারা যে দেহত্যাগের পর জড় জগতের বন্ধনমুক্ত হায় ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যাবেন, অথবা স্বর্গলোকে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে নানা রকম সুখভোগ করবেন, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুতে শোক করার কোনই কারণ ছিল না।

যে মানুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাঁকে বলা হয় ধীর। এই প্রকার মানুষ জড় দেহের পরিবর্তনের জন্য কখনও শোক করেন না।

আত্মাকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করা যায় না এই যুক্তিতে, আত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধে মায়াবাদীদের যে মতবাদ, তা গ্রহণযোগ্য নয়। পরমাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করে বিভক্ত

করার ফলে যদি জীবাত্মার উদ্ভব হত, তবে পরমাত্মা হতেন পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পরমাত্মা যে অপরিবর্তনীয় তার পরিপন্থী। গীতাতে ভগবান বলেছেন, পরমেশ্বরের অংশ জীবাত্মা সনাতন এবং তাকে বলা হয় ক্ষর; অর্থাৎ, তার জড়া প্রকৃতিতে পতিত হবার প্রবণতা থাকে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেও সে পরমাত্মার অংশরূপেই বর্তমান থাকে। তবে মুক্ত হবার পর সে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় দেহপ্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে। জলে যখন আকাশের প্রতিফলন দেখা যায়, তখন তাতে সূর্য, চন্দ্র, এমন কি তারাদেরও পর্যন্ত দেখা যায়। তারাগুলিকে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং সূর্য অথবা চন্দ্রকে পরমেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অর্জুন হচ্ছেন স্বতন্ত্র অণুচৈতন্য-বিশিষ্ট জীবাত্মা এবং বিভুচৈতন্য পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমপর্যায়ভুক্ত নয়, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই তা আমরা দেখতে পাব। অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত হতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ঊর্ধ্বতন না হতেন তা হলে তাঁদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠা কখনই সম্ভব হত না। তাঁরা দুজনেই যদি মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হতেন, তা হলে একজন উপদেষ্টা এবং অন্য জন উপদেশ গ্রহণকারী হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই প্রকার উপদেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ মায়ায় কবলিত কেউ প্রামাণিক উপদেষ্টা হতে পারে না। এই অবস্থান আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি জীব থেকে অতি ঊর্ধ্বে অবস্থিত আর অর্জুন হচ্ছে বিস্মরণশীল আত্মা, যে মায়ার দ্বারা মোহিত।

শ্লোক ১৪

মাত্রাস্পর্শাস্ত্র কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ।১৪ ॥

মাত্রাস্পর্শাঃ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি; তু-কেবল; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; শীত-শীত; উষ্ণ-গ্রীষ্ম; সুখ-সুখ, দুঃখদাঃ-দুঃখদায়ক; আগম-আসে; অপায়িনঃ-চলে যায়; অনিত্যাঃ-অস্থায়ী; তান্-সেগুলিকে; তিতিক্ষস্ব-সহ্য করার চেষ্টা কর; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান

শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় বিকার।
ইন্দ্রিয়ের দাস যারা তাহে অধিকার ॥
যে সব অনিত্য বস্তু আসি চলি যায়।
সহিষ্ণুত মাত্র গুণ তাহার উপায় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ! সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

তাৎপর্য

মানব জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মানুষকে সহনশীলতার মাধ্যমে বুঝতে হবে, সুখ ও দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম আসে, তেমনই পর্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ আসে। সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখে ও সুখে অবিচলিত থাকাই মানুষের কর্তব্য। বেদে নির্দেশ দেওয়া আছে, খুব সকালে স্নান করা উচিত। যে শাস্ত্রের

অনুশাসন মেনে চলে, সে মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতেও খুব ভোরে স্নান করতে ইতস্তত করে না। তেমনই, গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমেও গৃহিণীরা রান্না করা থেকে বিরত থাকেন না। আবহাওয়া জনিত অসুবিধা সত্ত্বেও মন্ত্র নুষকে তার কর্তব্যকর্ম করে যেতেই হয়। তেমনই, যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং কর্তব্যের খাতিরে তাকে যদি তার আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তবুও সে তার কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হতে পারে না। শাস্ত্র-নির্ধারিত অনুশাসন মেনে চলাটাই হচ্ছে সভ্য মানুষের লক্ষণ। এই অনুশাসন মেনে চলার ফলে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয় এবং সে তখন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। এই জ্ঞানের প্রভাবে তার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হয় এবং ভগবানের প্রতি তার এই আন্তরিক ভক্তি তাকে মায়ার' বন্ধন থেকে মুক্ত করে।
এই শ্লোকে অর্জুনকে কৌন্তেয় ও ভারত নামে সম্বোধন করাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে কৌন্তেয় নামে সম্বোধন করার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতৃকূলের মহান রক্তের সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং ভারত নামে সম্বোধন করে তাঁর পিতৃকূলের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উভয় দিক থেকে তিনি সুমহান বংশজাত ছিলেন। মহৎ বংশে জাত পুরুষ কখনই তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর বংশ-গৌরবের কথা স্মরণ করে তাঁকে যুদ্ধ করতেই হবে।

শ্লোক ১৫

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

যম্-যে; হি অবশ্যই; ন-না; ব্যথয়ন্তি-বিচলিত হন; এতে-এই সমস্ত; পুরুষম্-ব্যক্তিকে; পুরুষর্ষভ-হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; সম-অপরিবর্তিত; দুঃখ-দুঃখ; সুখম্-সুখ; ধীরম্-সহিষ্ণু, সঃ-তিনি; অমৃতত্বায়-মুক্তি লাভের; কল্পতে-যোগ্য হয়।

গীতার গান

ব্যথা নাহি দেয় যারে অনিত্য এইসব।
সেজন বুঝিল জান পুরুষার্থ বৈভব ॥
সমদুঃখ সুখধীর অনিত্য ব্যাপারে।
অমরত্ব সেই পায় জিতিয়া সংসারে ॥

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)। যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন এবং শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই মুক্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী।

তাৎপর্য

যে মানুষ সুখে-দুঃখে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তিনি অনায়াসে এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের যোগ্য হন। বর্ণাশ্রম-ধর্মের চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ পথ। কিন্তু যে মানুষ তাঁর জীবনকে সার্থক করে তুলতে চান, তিনি সমস্ত রকম অসুবিধা সত্ত্বেও এই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করলে মানুষকে তার সব রকম পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে হয়। স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের এই বন্ধনমুক্ত হওয়া খুবই কষ্টকর। কিন্তু যিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, নিঃসন্দেহে তাঁর পারমার্থিক জীবন

সার্থক হয়ে ওঠে এবং অচিরেই তিনি ভগবৎ-দর্শন লাভকরেন। ঠিক তেমনই, অর্জুনকে তাঁর ক্ষাত্রধর্ম পালন করার উপদেশ দিয়ে ভগবান তাকে বললেন, এই ধর্মযুদ্ধে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যদিও অত্যন্ত দুঃখদায়ক এবং কষ্টসাপেক্ষ, কিন্তু তবুও তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করবার জন্য তাঁর দেহজাত আত্মীয়তার বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত হতে হবে এবং যুদ্ধ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ঘরে তখন তাঁর যুবতী স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মাতা ছিলেন। তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য কেউই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি তাঁদের পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার এই হচ্ছে উপায়।

শ্লোক ১৬

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ন-না; অসতঃ-অনিত্য বস্তুর; বিদ্যতে-হয়; ভাবঃ-স্থায়িত্ব; ননা; অভাবঃ - বিনাশ; বিদ্যতে-হয়; সতঃ-নিত্য বস্তুর; উভয়োঃ-উভয়ের; অপি-যথার্থই; দৃষ্টঃ-দর্শন করে; অন্তঃ-সিদ্ধান্ত; তু-কিন্তু; অনয়োঃ-তাদের; তত্ত্ব-সত্য; দর্শিভিঃ-দ্রষ্টাদের দ্বারা।

গীতার গান

অসৎ শরীর এই সত্তা নাহি তার।
নিত্যসত্য জীব হয় মৃত্যু নাহি যার ॥
উভয় বিচার করি করিল নিশ্চিত।
তত্ত্বদর্শী সেই কহে যেই হয় হিত ॥

অনুবাদ

যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাঁরা উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তাৎপর্য

প্রতি মুহূর্তে এই জড় দেহের পরিবর্তন হচ্ছে-এই দেহের কোনই স্থায়িত্ব নেই। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যেও জানা যায়, বিভিন্ন জীবকোষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তে জীবদেহের অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলে জীবদেহ শিশু অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ যৌবনে বিকশিত হয় এবং অবশেষে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু দেহ ও মনের সব রকম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহ ও সনাতন আত্মার মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। দেহের প্রকৃতিই হচ্ছে চির-পরিবর্তনশীল আর আত্মা হচ্ছে চিরশাশ্বত-সনাতন। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী উভয় শ্রেণীর তত্ত্বদ্রষ্টারা স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু পুরাণে (২/১২/৩৮) বলা হয়েছে, শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর ধামসকল স্বতঃস্ফূর্ত চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত (জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ)। তত্ত্বদর্শী মহাজনেরা যথাক্রমে সৎ, অসৎ-নিত্য ও অনিত্য বলতে চেতন ও জড় বস্তুকেই উল্লেখ করেন।

মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম উপদেশ। জীব হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই সে ভগবানের নিত্যদাস। এই জ্ঞান উপলব্ধি

করা হলেই অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং সে তখন ভগবানের সঙ্গে উপাস্য আর উপাসকের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। পূর্ণের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্ক, ভগবানের সঙ্গে জীবের সেই সম্পর্ক-ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, আর জীব তাঁর অংশ। বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস-সব কিছুই উদ্ভুত হয়েছে ভগবানের থেকে। ভগবানের থেকে উদ্ভূত এই প্রকৃতিতে পরা ও অপরা এই দুটি স্তর আছে। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যদিও কোন ভেদ নেই, তবুও শক্তিমান হচ্ছেন শক্তির নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শক্তিমান এবং শক্তি বা প্রকৃতি সর্ব অবস্থাতেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই, প্রভু ও ভৃত্য অথবা গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের মতো জীবসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। মায়ার অন্ধকারে যখন জীব আচ্ছন্ন থাকে, তখন সে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবান তাই জীবকে মায়ান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে সত্য দর্শন করাবার জন্য এই ভগবদ্গীতার শিক্ষা দান করেছেন।

শ্লোক ১৭

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ।। ১৭ ॥

অবিনাশি-বিনাশ রহিত; তু-কিন্তু; তৎ-তা; বিদ্ধি-জানবে; যেন যার দ্বারা; সর্বম-সমগ্র শরীর; ইদম্-এই; ততম্ ব্যাপ্ত; বিনাশম্-বিনাশ; অব্যয়স্য-অক্ষয়ের; অস্য-এই; ন কশ্চিৎ-কেউ নয়; কর্তুম্ করতে; অর্হতি-সমর্থ।

গীতার গান

অবিনাশী সেই বুঝ সর্বত্র বিস্তার ।
যাহার অভাবে হয় দেহ মহাভার ॥
ক্ষয়ব্যয় নাহি যার কে মারিতে পারে।
অমরের মার কিবা করহ বিচার ॥

অনুবাদ

যা সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। সেই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আত্মা সারা দেহ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। যে-কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, সমগ্র দেহ জুড়ে কি বিস্তৃত হয়ে আছে সেটি হচ্ছে চেতনা। প্রত্যেকেই তার দেহের সুখ ও বেদনা সম্বন্ধে সচেতন। চেতনার এই বিস্তার প্রত্যেকের তার নিজের দেহেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজনের দেহের অনুভূতি অন্য আর কেউ অনুভব করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায়, এক-একটি দেহ হচ্ছে এক-একটি স্বতন্ত্র আত্মার মূর্তরূপ এবং স্বতন্ত্র চেতনার মাধ্যমে আত্মার উপস্থিতির লক্ষণ অনুভূত হয়। এই আত্মার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের একভাগের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫/৯) প্রতিপন্ন করা হয়েছে-

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ1

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

"কেশাগ্রকে শতভাগে ভাগ করে তাকে আবার শতভাগে ভাগ করলে তার যে 'আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি।" সেই রকম অনুরূপ একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

"অসংখ্য যে চিৎকণা রয়েছে, তার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান।"

সুতরাং, এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবাত্মা হচ্ছে এক-একটি চিৎকণা, যার আয়তন পরমাণুর থেকেও অনেক ছোট এবং এই জীবাত্মা বা চিৎকণা সংখ্যাতীত। এই অতি সূক্ষ্ম চিৎকণাগুলি জড় দেহের ও চেতনার মূল তত্ত্ব। কোন ওষুধের প্রভাব যেমন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এই চিৎ-স্ফুলিঙ্গের প্রভাবও তেমনই সারা দেহ জুড়ে বিস্তৃত থাকে। আত্মার এই প্রবাহ চেতনারূপে সমগ্র দেহে অনুভূত হয় এবং সেটিই হচ্ছে আত্মার উপস্থিতির প্রমাণ। সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে, জড় দেহে যখন চেতনা থাকে না, তখন তা মৃত দেহে পরিণত হয় এবং কোন রকম জড় প্রচেষ্টার দ্বারাই আর সেই দেহে চেতনা ফিরিয়ে আনা যায় না। এর থেকে বোঝা যায়, চেতনার উদ্ভব জড় পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে হয় না, তা হয় আত্মার থেকে। চেতনা হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ। আত্মার পারমাণবিক পরিমাপ সম্বন্ধে মুশুক উপনিষদে (৩/১/৯) বলা হয়েছে-

এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা য

"আত্মা পরমাণুসদৃশ এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাকে অনুভব করা যায়। পরমাণুসদৃশ এই আত্মা পঞ্চবিধ বায়ুতে (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান) ভাসমান থেকে হৃদয়ে অবস্থান করে এবং জীবাত্মার সমগ্র দেহে তার প্রভাব বিস্তার করে। আত্মা যখন এই পঞ্চবিধ জড় বায়ুর কলুষিত প্রভাব থেকে পবিত্র হয়, তখন তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রকাশ হয়।"

হঠযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন আসন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে জড় পরিবেশের বন্ধন থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আত্মাকে মুক্ত করার জন্য আত্মার চারদিকে পরিবেষ্টিত পঞ্চবিধ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দেহতত্ত্বের এই অতি উন্নত বিজ্ঞানকে তথাকথিত হঠযোগীরা এক অতি বিকৃত রূপ দান করে জাগতিক সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় প্রয়োগ করছে।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেই বলা হয়েছে, জীবাত্মা পরমাণুসদৃশ। সুস্থ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন যে কোন মানুষই উপলব্ধি করতে পারে যে, আত্মা হচ্ছে পরমাণুসদৃশ চিৎকণা। যারা বলে থাকে যে, জীবাত্মাই হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণুতত্ত্ব, অতি সহজেই বোঝা যায় যে, তারা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন-অপ্রকৃতিস্থ মানুষ।

পরমাণু চৈতন্যবিশিষ্ট জীবাত্মা কোন একটি বিশেষ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা কোন অবস্থাতেই সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণুতত্ত্ব হতে পারে না। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে জীবাত্মা বর্তমান থাকে, কিন্তু এই আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তা দেখা যায় না। বর্তমান যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই অতি সূক্ষ্ম আত্মা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। তাই আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা হঠকারিতা করে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কিন্তু একটু সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা করলেই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়। কারণ জীবের হৃদয়ে আত্মার সঙ্গে একসাথে অধিষ্ঠিত থেকে পরমাত্মাই জীবকে পরিচালিত করেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, জীবদেহের সমস্ত কার্যকলাপ হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। যে সমস্ত

রক্তকণিকা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে, তারা তাদের শক্তি আহরণ করে আত্মা থেকে। আত্মা যখন জড় দেহ ত্যাগ করে চলে যায়, তখন রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস আদি দেহের সমস্ত ক্রিয়াগুলিই বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা রক্তকণিকার এই গুরুত্ব স্বীকার করে থাকে, কিন্তু সমস্ত শক্তির উৎস যে আত্মা, তা তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু তা হলেও তারা স্বীকার করে যে, হৃদয়ই হচ্ছে দেহের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্থল। আত্মার এই পারমাণবিক চিৎ-কণাগুলিকে সূর্যকিরণের অণুর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। সূর্যকিরণের মধ্যে অসংখ্য প্রভাময় অণু আছে। সেই রকম, পরমেশ্বর ভগবানের বিচ্ছুরিত চিৎকণাগুলি পরমেশ্বরের জ্যোতির পারমাণবিক কণাস্বরূপ-যাকে বলা হয় প্রভা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা শক্তি। সুতরাং, বৈদিক তত্ত্ববিজ্ঞান কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান, যা কিছুই অনুসরণ করা যাক, দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আত্মা সম্পর্কিত এই বৈজ্ঞানিক তথ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৮

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত ৷ ১৮ ॥

অন্তবন্তঃ-বিনাশশীল; ইমে-এই সমস্ত; দেহাঃ-জড় দেহসকল; নিত্যস্য-নিত্যস্থায়ী; উক্তাঃ-বলা হয়; শরীরিণঃ-দেহী আত্মার; অনাশিনঃ-অবিনাশী; অপ্রমেয়স্য-অপরিমেয়; তস্মাৎ-অতএব; যুধ্যস্ব-যুদ্ধ কর; ভারত-হে ভরত-বংশীয়।

গীতার গান

নিঃশেষ হইয়া যাবে এই জড় দেহ।
নিত্য আত্মা জান ভাল না মরিবে কেহ ॥
বিনাশি প্রমেয় নহে আত্মা ভাল মতে।
সত্য বুঝি দৃঢ়ব্রত হও ত' যুদ্ধেতে ॥

অনুবাদ

অবিনাশী, অপরিমেয় ও শাশ্বত আত্মার জড় দেহ নিঃসন্দেহে বিনাশশীল। অতএব হে ভারত। তুমি শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

জড় দেহের ধর্মই হচ্ছে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া। জড় দেহ এই মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, নয়তো একশ বছর পরে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন এর ধ্বংস হবেই। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আত্মাকে টিকিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাকে দেখাই যায় না, সুতরাং কোন শত্রুই তাকে হত্যা করতে পারে না। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাকে পরিমাপ করাও অসম্ভব। সুতরাং দেহ ও আত্মা এই দুই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জীবের স্বরূপ বিচার করলে তখন আর কোন অনুশোচনা থাকতে পারে না, কারণ মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা চিরশাশ্বত এবং কোন অবস্থাতেই তার বিনাশ হয় না, আর জড় দেহ হচ্ছে অনিত্য, একদিন না একদিন যখন তার ধ্বংস হবেই, তখন কোনভাবেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য অথবা চিরকালের জন্য দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সমগ্র আত্মার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ

এক-একটি জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়ে জীবাত্মা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বেদান্ত-সূত্রে আত্মাকে আলোক বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ সে হচ্ছে পরম আলোকের অংশ। সূর্যের আলোক যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিপালন করে, তেমনই আত্মার আলোকও জড় দেহকে প্রতিপালন করে। যে মুহূর্তে আত্মা তার দেহটি পরিত্যাগ করে, তখন থেকেই সেই দেহটি পচতে শুরু করে। এর থেকে বোঝা যায়, আত্মাই এই দেহটিকে প্রতিপালন করে। দেহে আত্মা থাকে বলেই দেহটিকে এত সুন্দর বলে মনে হয়, কিন্তু আত্মা ব্যতীত দেহের কোনই গুরুত্ব নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুদ্ধ করতে।

শ্লোক ১৯

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যঃ-যিনি; এনম্-একে; বেত্তি-জানেন; হন্তারম্-হন্তা; যঃ-যিনি; চ-এবং; এনম্-একে; মন্যতে মনে করেন; হতম্-নিহত; উভৌ-উভয়ে; তৌ-তাঁরা; ন-না; বিজানীতঃ-জানেন; ন-না; অয়ম্-এই; হন্তি-হত্যা করেন; ন-না; হন্যতে নিহত হন।

গীতার গান

যে জন বুঝেছে আত্মা মরে যেতে পারে।
অথবা যে জন বুঝে আত্মা অন্যে মারে ॥
উভয়েই ভ্রমাত্মক কিছু নাহি বুঝে।
মরে না মারে না আত্মা জান যুদ্ধ যুঝে ।

অনুবাদ

যিনি জীবাত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন কিংবা যিনি একে নিহত বলে ভাবেন, তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। কারণ আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না।

তাৎপর্য

যখন কোন দেহধারী জীব মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন জানতে হবে যে, দেহের মধ্যে আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা তখন আর সেই দেহে বাস করতে পারে না। বাস করার অনুপযোগী বলে আত্মা তখন সেই দেহটি ত্যাগ করে। যারা মূর্খ, তারা আত্মার এই দেহত্যাগ করাকে আত্মার মৃত্যু বলে মনে করে। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পারব-আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, কোন অস্ত্রের দ্বারাই তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া আত্মা চিরশ্বাশ্বত ও চিন্ময় হবার ফলে, কোন অবস্থাতেই তার বিনাশ হয় না। যার মৃত্যু হয় অথবা মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়, তা হচ্ছে জড় দেহটি মাত্র। অবশ্য তা বলতে এটি বোঝায় না যে, দেহটিকে হত্যা করলে কোন অন্যায় হয় না। বেদে নির্দেশ দেওয়া আছে, মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি-কোন জীবের প্রতি হিংসা করো না। কোনও জীবের আত্মিক সত্তাকে হত্যা করা যায় না, এই উপলব্ধি হওয়ার ফলে প্রাণিহত্যায় উৎসাহ লাভ করা উচিত নয়। বিনা কারণে অন্যায়ভাবে যখন পশু হত্যা করা হয়, তখন তাতে অবশ্যই পাপ

হয়। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে যেমন রাষ্ট্রের আইন অনুসারে হত্যাকারী শাস্তি পায়, ভগবানের আইনেও তেমনই তার জন্য শাস্তি পেতে হয়। সনাতন-ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভগবান অবশ্য অর্জুনকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনি কখনই অর্জুনকে তাঁর খেয়ালখুশি মতো হত্যা করতে আদেশ দেননি।

শ্লোক ২০

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ৷ ২০ ॥

ন-না; জায়তে জন্ম হয়; ম্রিয়তে মৃত্যু হয়; বা-অথবা; কদাচিৎ-কখনও (অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে), ন-না; অয়ম্-এই; ভূত্বা-উৎপন্ন হয়ে; ভবিতা-উৎপন্ন হবে; বা-অথবা; ন-না; ভূয়ঃ-উৎপন্ন হয়েছে; অজঃ-জন্মরহিত; নিত্যঃ-নিত্য; শাশ্বতঃ-চিরস্থায়ী; অয়ম্-এই; পুরাণঃ-পুরাতন; ন-না; হন্যতে-নিহত হয়; হন্যমানে-হত হলেও; শরীরে-দেহ।

গীতার গান

জনম মরণ নাই, হয় নাই, হবে নাই,
হয়েছিল তাহা নহে আত্মা ।
অজ নিত্য শাশ্বত, পুরাতন নিত্যসত্য,
শরীরের নাশ নহে মৃত্যু ॥

অনুবাদ

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

গুণগতভাবে পরমাত্মা ও তাঁর পরমাণুসদৃশ অংশ জীবাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। জড় দেহের যেমন পরিবর্তন হয়, আত্মার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। তাই আত্মাকে বলা হয় কূটস্থ, অর্থাৎ কোন কালে, কোন অবস্থায় তার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহে ছয় রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয়, তার বৃদ্ধি হয়, কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, তা কিছু ফল প্রসব করে, ক্রমে ক্রমে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে তার বিনাশ হয়। আত্মার কিন্তু এই রকম কোন পরিবর্তনই হয় না। আত্মার কখনও জন্ম হয় না, কিন্তু, যেহেতু সে জড় দেহ ধারণ করে, তাই সেই দেংটির জন্ম হয়। যার জন্ম হয়, তার মৃত্যু অবধারিত। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনই আবার, যার জন্ম হয় না তার কখনই মৃত্যু হতে পারে না। আত্মার কখনও জন্ম হয় না, তাই তার মৃত্যুও হয় না, আর সেই জন্য তার অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, অর্থাৎ কবে যে তার উদ্ভব হয়েছিল তার কোনও ইতিহাস নেই। আমরা দেহ-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত, তাই আমরা আত্মার জন্ম-ইতিহাস খুঁজে থাকি। কিন্তু যা নিত্য, শাশ্বত, তার তো কোনও শুরু থাকতে পারে না। দেহের মতো আত্মা কখনও জরাগ্রস্ত হয় না। তাই, বৃদ্ধ অবস্থাতেও মানুষ তার অন্তরে শৈশব অথবা যৌবনের উদ্যমতা অনুভব

করে। দেহের পরিবর্তন কখনই আত্মাকে প্রভাবিত করে না। জড় দেহের মতো আত্মার কখনও ক্ষয় হয় না। দেহের মাধ্যমে যেমন সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হয়, আত্মা কখনও তেমনভাবে অন্য কোনও আত্মা উৎপাদন করে না। দেহজাত সন্তান-সন্ততিরা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা। স্ত্রী-পুরুষের দেহের মিলনের ফলে আত্মা নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় বলে, সেই আত্মাকে কোন বিশেষ স্ত্রী-পুরুষের সন্তান বলে মনে হয়। আত্মার উপস্থিতির ফলে দেহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মার কখনও বৃদ্ধি বা কোন রকম পরিবর্তন হয় না। এভাবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, দেহে যে ছয় রকমের পরির্তন হয়, আত্মা তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

কঠ উপনিষদেও (১/২/১৮) গীতার এই শ্লোকের মতো একটি শ্লোক আছে-

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

এই শ্লোকটির সঙ্গে ভগবদ্গীতার শ্লোকটির পার্থক্য কেবল এখানে বিপশ্চিৎ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী অথবা জ্ঞানের সহিত।

আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, অথবা সে সর্বদাই পূর্ণচেতন। তাই, চেতনাই হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। এমন কি আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখা না গেলেও চেতনার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অনেক সময় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবার ফলে অথবা অন্য কোন কারণে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো সর্বদাই সেখানে রয়েছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখন দিনের বেলা। ভোরের আকাশে যখনই একটু আলোর আভাস দেখতে পাওয়া যায়, তখনই আমরা বুঝতে পারি, আকাশে সূর্যের উদয় হচ্ছে। ঠিক তেমনই, মানুষই হোক বা পশুই হোক, কীট-পতঙ্গই হোক বা উদ্ভিদই হোক, একটুখানি চেতনার বিকাশ দেখতে পেলেই আমরা তাদের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। আত্মার সচেতনতা ও পরমাত্মার সচেতনতার মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য রয়েছে, কারণ পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তিনি সর্ব অবস্থায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত। স্বতন্ত্র জীবের চেতনা বিস্মৃতিপ্রবণ, সে যখন তার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের কথা ভুলে যায়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের পরম উপদেশ থেকে শিক্ষা ও আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিস্মরণশীল জীবের মতো নন। যদি তাই হত, কৃষ্ণের ভগবদ্গীতার উপদেশাবলী অর্থহীন হয়ে পড়ত।

আত্মা দুই রকমের-অণু আত্মা ও পরমাত্মা বা বিভু-আত্মা। কঠ উপনিষদে (১/২/২০) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

"পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই বৃক্ষসদৃশ জীবদেহের হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি সব রকম জড় বাসনা ও সব রকমের শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনি কেবল ভগবানের কৃপার ফলে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মারও উৎস, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। আর অর্জুন হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত জীবাত্মা; তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকে এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয়।

শ্লোক ২১

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ।

বেদ-জানেন; অবিনাশিনম্-অবিনাশী; নিত্যম্ সর্বদা বর্তমান; যঃ-যিনি; এনম্-এই (আত্মাকে); অজম্-জন্মরহিত; অব্যয়ম্-অক্ষয়; কথম্-কিভাবে; সঃ-সেই; পুরুষঃ-ব্যক্তি; পার্থ-হে পার্থ (অর্জুন); কম্ কাকে; ঘাতয়তি-বধ করাতে; হস্তি-হত্যা করতে; কম্-কাউকে।

গীতার গান

যে জেনেছে আত্মা নিত্য অজ অবিনাশী।
অব্যয় অজর আত্মা সর্ব দিবানিশি ।
সে কেন মারিবে অন্যে মূর্খের মতন।
সে জানে নিশ্চিত আত্মা মরে না কখন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, শাশ্বত, জন্মরহিত ও অক্ষয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাউকে হত্যা করতে বা হত্যা করাতে পারেন?

তাৎপর্য

সব কিছুরই যথার্থ উপযোগিতা আছে এবং যিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি জানেন কোন্ জিনিস কোথায় এবং কিভাবে নিয়োগ করলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হবে। আর সব কিছুর মতো হিংসারও যথার্থ উপযোগিতা আছে এবং যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনি জানেন কোথায়, কখন, কিভাবে হিংসার প্রয়োগ করতে হয়। বিচারক যখন আসামীকে খুনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড দেন, তখন হিংসাত্মক কাজ করেছেন বলে বিচারককে কেউ অভিযুক্ত করে না। তার কারণ, তিনি বিচারের রীতি অনুযায়ী এই দণ্ড দেন। মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্র মনুসংহিতাতে খুনীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দেওয়া আছে। কারণ, এই শাস্তি পাবার ফলে সেই খুনির মহাপাপের ভার লাঘব হয়, পরবর্তী জীবনে তাকে আর তার ফলভোগ করতে হয় না। সুতরাং, রাজা যখন খুনীকে প্রাণদণ্ড দেন, তখন তার মঙ্গলের জন্যই তা দেওয়া হয়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধ করবার আদেশ দেন, তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি, চরম বিচারের জন্যই তিনি এই হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাই, অর্জুনের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ পালন করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম করুণাময়, তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কার্যকলাপ হিংসাত্মক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে তাঁর আশীর্বাদ। তেমনই, তাঁর নির্দেশে যখন হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তখন সেই হিংসা আশীর্বাদে পরিণত হয়। আর তা ছাড়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার আত্মা এবং সেই আত্মাকে কখনও হত্যা করা যায় না। সুতরাং, সুবিচারমূলক প্রশাসনের স্বার্থে ঐ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শল্য-চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন রোগ সারাবার জন্য, রোগীকে মেরে ফেলবার জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তাঁর আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করার ফলে অর্জুনের কোনও পাপ হবারই সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু তাতে সমগ্র মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শ্লোক ২২

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ৷৷ ২২ ॥

বাসাংসি-বস্ত্র; জীর্ণানি-জীর্ণ; যথা-যেমন; বিহায়-পরিত্যাগ করে; নবানি-নতুন বস্ত্র; গৃতাতি-গ্রহণ করে; নরঃ-মানুষ; অপরাণি-অন্য; তথা-তেমনই; শরীরাণি-শরীর; বিহায়-ত্যাগ করে; জীর্ণানি-জীর্ণ; অন্যানি-অন্য; সংযাতি-ধারণ করে; নবানি-নতুন দেহ; দেহী-শরীরী।

গীতার গান

পুরাতন বস্ত্র যথা, ভঙ্গুর শরীর তথা,
এক ছাড়ি অন্য বস্ত্র পরে।
পুরাতন বস্ত্র ছাড়ে, নবীন বসন পরে,
নবীন শরীর সেই ধরে ॥
জীর্ণ শরীর ছাড়ি, নবীন শরীর ধরি,
দেহীনব্য হয় পুনর্বার।
দেহ দেহী এই ভেদ, তাহাতে বা কিবা খেদ,
ছাড় দুঃখ যুদ্ধ করিবার ।

অনুবাদ

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

পারমাণবিক জীবাত্মা যে এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহ ধারণ করে, তা সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। তবু আধুনিক যুগের কিছু বৈজ্ঞানিক আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথচ হৃদয় থেকে কেমন করে শক্তি সঞ্চালিত হয় তা বোঝাতে পারে না। কিন্তু তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, প্রতি মুহূর্তে দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের ফলেই দেহে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য দেখা দেয়। বার্ধক্যের পর আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই (২/১৩) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পরমাত্মার কৃপার ফলেই অণু আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। বন্ধু যেমন বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, পরমাত্মাও তেমন অণু আত্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। মুণ্ডক উপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আত্মা ও পরমাত্মাকে একই গাছে বসে থাকা দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি (জীবাত্মা) সেই গাছের ফল খাচ্ছে, অন্য পাখিটি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এই দুটি পাখি গুণগতভাবে যদিও এক, তবুও তাদের একজন সেই জড়-জাগতিক গাছের ফলের আকর্ষণে আবদ্ধ, আর অন্য জন একান্ত সুহৃদের মতো তার কার্যকলাপ কেবল পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষীরূপ পাখি,আর অর্জুন হচ্ছেন ফল আহারে রত পাখি। যদিও তাঁরা একে অপরের বন্ধু, তবুও তাঁদের একজন হচ্ছেন প্রভু এবং অন্য জন হচ্ছেন ভৃত্য। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে তার এই সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই এক গাছ থেকে আর এক গাছে অর্থাৎ এক দেহ থেকে আর এক দেহে সে ঘুরে বেড়ায়। এই জড় দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে অন্য পাখিটিকে পরম গুরুরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়, যেভাবে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ লাভের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ অধীন পাখিটি সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে (৩/১/২) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪/৭) প্রতিপন্ন করে বলা

হয়েছে-

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

"দুটি পাখি একই গাছে বসে আছে, কিন্তু যে পাখিটি ফল আহারে রত সে গাছের ফলের ভোক্তারূপে সর্বদাই শোক, আশঙ্কা ও উদ্বেগের দ্বারা মুহ্যমান। কিন্তু যদি সে একবার তার নিত্যকালের বন্ধু অপর পাখিটির দিকে ফিরে তাকায়, তবে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত শোকের অবসান হয়, কারণ তার বন্ধু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের দ্বারা মহিমান্বিত।" অর্জুন তাঁর নিত্যকালের বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব জানতে পেরেছেন। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে তিনি ভগবানের পরম মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হন।

ভগবান এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ, শিক্ষক আদি আত্মীয়-পরিজনদের জন্য শোক না করতে। পক্ষান্তরে, সেই ধর্মযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার ফলে তাঁদের দেহগত কর্মফল জনিত সমস্ত পাপ থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন বলে, আনন্দিত হওয়া উচিত। যজ্ঞবেদিতে অথবা ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে উচ্চতর জীবন লাভহয়। সুতরাং, অর্জুনের শোক করবার কোনই কারণ ছিল না।

শ্লোক ২৩

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

ন-না; এনম্-এই আত্মাকে; ছিন্দন্তি ছেদন করতে পারে; শস্ত্রাণি-অস্ত্রসমূহ; ন-না; এনম্-এই আত্মাকে; দহতি-দহন করতে পারে; পাবকঃ-অগ্নি; ন-না; চ-ও; এনম্-এই আত্মাকে; ক্লেদয়ন্তি-আর্দ্র করতে পারে; আপঃ-জল; ন-না; শোষয়তি-শুষ্ক করতে পারে; মারুতঃ-বায়ু।

গীতার গান

অস্ত্রাঘাতে নাহি কাটে চিন্ময় শরীর।
অগ্নি না জ্বালায় তাহা শুন বিজ্ঞ বীর ।
জল দ্বারা নাহি ভিজে বায়ু না শুকায়।
ঘাত প্রতিঘাত সব জড়েতে জুয়ায় ॥

অনুবাদ

আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।

তাৎপর্য

তরবারি, আগ্নেয় অস্ত্র, পর্জন্যাস্ত্র, বায়বীয় অস্ত্র আদি কোন রকমের অস্ত্রশস্ত্রই আত্মাকে হত্যা করতে পারে না। এই শ্লোকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে আধুনিক যুগের মতো আগ্নেয়াস্ত্র তো ছিলই, আর তা ছাড়া জল, বায়ু, আকাশ আদির তৈরি অস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রগুলি এক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র, কিন্তু

তথাকথিতভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হলেও জল, বায়ু, আকাশ আদির দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মহাভারতের যুগে জলীয় অস্ত্রের দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো আগ্নেয়াস্ত্রকে খণ্ডন করা হত-যা আজকের বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অতীত। সেই যুগের বীরেরা যে-সমস্ত অদ্ভুত ঝটিকা অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনাও করতে পারে না। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ আদির এত সমস্ত অস্ত্র থাকলেও, কোন বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের দ্বারাই আত্মাকে হত্যা করা যায় না। মায়াবাদীরা বোঝাতে পারেন না কেমন করে জীবাত্মা নিতান্তই অজ্ঞতার ফলে জড় অস্তিত্ব লাভ করে এবং তার ফলে মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আত্মাকে যেমন অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, তেমনই আত্মাকে তার উৎস পরমাত্মার থেকেও কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না; বরং, স্বতন্ত্র জীবাত্মাগুলি পরমাত্মার শাশ্বত ভিন্নাংশ। যেহেতু সনাতন জীবাত্মা পরমাণুসদৃশ, তাই ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং এভাবে তারা ভগবানের সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, যদিও আগুনের সঙ্গে তা গুণগতভাবে এক ও অভিন্ন, কিন্তু আগুনের থেকে বেরিয়ে এলেই তা নিভে যায় এবং তখন আর তার মধ্যে আগুনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় না। তেমনই পরমাণুসদৃশ জীবাত্মা ভগবৎ-বিমুখ হয়ে পড়লে মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে পড়ার ফলে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করতে থাকে। বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে, জীবাত্মা পরমাত্মার বিভিন্নাংশ। ভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই সম্পর্ক নিত্য শাশ্বত। সুতরাং, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরও জীবাত্মা স্বতন্ত্র স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে, যা অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পর অর্জুন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যাননি।

শ্লোক ২৪

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোৎশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অচ্ছেদ্যঃ-অচ্ছেদ্য; অয়ম্-এই আত্মা; অদাহ্যঃ-পোড়ানো যায় না; অয়ম্ এই আত্মাকে; অক্লেদ্যঃ-ভিজানো যায় না; অশোষ্যঃ-শুকানো যায় না; এব-অবশ্যই; চ-এবং; নিত্যঃ-চিরস্থায়ী; সর্বগতঃ-সর্বব্যাপ্ত; স্থাণুঃ-অপরিবর্তনীয়; অচলঃ-নিশ্চল; অয়ম্-এই আত্মা; সনাতনঃ-নিত্য বর্তমান।

গীতার গান

অচ্ছেদ্য যে আত্মা হয় অক্লেদ্য অশোষ্য ।
চিদানন্দ আত্মা নহে জড়ের সে পোষ্য ॥
সর্বত্র আত্মার গতি স্থির সনাতন।
অচল অটল আত্মা নিত্য সে নূতন ॥

অনুবাদ

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন।

তাৎপর্য

পারমাণবিক আত্মার এই সমস্ত গুণাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সে অবশ্যই পরমাত্মার পরমাণুসদৃশ অংশ এবং সে নিত্যকাল অপরিবর্তিত ভাবে একই পরমাণুরূপে চিরকাল বর্তমান থাকে। অদ্বৈতবাদীরা যে বলে থাকেন, মায়ামুক্ত হলে জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত হয়, সেই তত্ত্ব এই শ্লোকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। মায়ামুক্ত হবার পর জীবাত্মা ইচ্ছা করলে ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে চিৎকণারূপে বিরাজ করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবাত্মারা ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে।

এখানে সর্বগত ('সর্বব্যাপ্ত') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির সর্বত্রই আত্মা বিরাজ করছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, এমন কি আগুনেও জীবাত্মা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আগুনে আত্মা নেই, কিন্তু এই শ্লোকে আমরা বুঝতে পারি, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত, কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, আগুন আত্মাকে দহন করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায়, সূর্যলোকেও সেখানকার উপযোগী দেহ ধারণ করে জীবাত্মা রয়েছে। সূর্যলোকে যদি জীব না থাকত, তা হলে সর্বগত, অর্থাৎ 'সর্বত্র আত্মার গতি' কথাটি ব্যবহার করা হত না।

শ্লোক ২৫

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অব্যক্তঃ-ইন্দ্রিয়াদির অগোচর; অয়ম্-এই আত্মা; অচিন্ত্যঃ-চিন্তার অতীত; অয়ম্-এই আত্মা; অবিকার্যঃ-অপরিবর্তনীয়; অয়ম্-এই আত্মা; উচ্যতে বলা হয়; তস্মাৎ-অতএব; এবম্-এভাবে; বিদিত্বা-ভালভাবে জেনে; এনম্-এই আত্মাকে; ন-নয়; অনুশোচিতুম্-শোক করা; অর্হসি-উচিত।

গীতার গান

কাটা জ্বালা ভিজা শুকা জড়ের লক্ষণ।
জড়ের দ্বারা ব্যক্ত নহে অব্যক্ত কখন ॥
মন দ্বারা চিন্ত্য হয় জড়ের লক্ষণ।
আত্মা জড় বস্তু নহে অচিন্ত্য কখন ॥
জড়ের বিকার হয় আত্মা অবিকার।
জড় আত্মা বিভিন্নতা শুন বার বার ॥
যথাযথ আত্মতত্ত্ব করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

অনুবাদ

এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অতএব এই সনাতন স্বরূপ অবগত হয়ে দেহের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে, জড়-জাগতিক বিচারে আত্মার আয়তন এত সূক্ষ্ম যে, সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাকে দেখা যায় না, তাই সে অদৃশ্য। আত্মার অস্তিত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, এর

একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে শ্রুতি-প্রমাণ বা বৈদিক জ্ঞান। আত্মার অস্তিত্ব আমরা সব সময়েই অনুভব করতে পারি। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারও মনেই কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাই এই বৈদিক সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায়েই আত্মার অস্তিত্বের এই নিগূঢ় তত্ত্বকে জানতে পারা যায় না। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে আমাদের অনেক কিছুকেই স্বীকার করতে হয়। আমাদের পিতৃপরিচয় যেমন মায়ের কাছ থেকে জানা ছাড়া আর কোন উপায়েই জানতে পারা যায় না এবং মায়ের প্রদত্ত পিতৃপরিচয়কে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, আত্মা সম্বন্ধেও তেমন বৈদিক জ্ঞান বা শ্রুতি-প্রমাণ ছাড়া আর কোন উপায়েই জানা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, মানুষের সীমিত ইন্দ্রিয়লব্ধ জড় জ্ঞানের দ্বারা কখনই আত্মার তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। বেদে বলা হয়েছে আত্মা হচ্ছে চেতন। আত্মার থেকেই সমস্ত চেতনের প্রকাশ হয়। এই সত্যকে আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। তাই যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা এই বৈদিক সত্যকে স্বীকার করেন। দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। চির-অপরিবর্তনীয় আত্মা চিরকালই বিভুচৈতন্য পরমাত্মার পরমাণুসদৃশ অংশরূপেই বিদ্যমান থাকে। পরমাত্মা অসীম-অনন্ত এবং আত্মা পরমাণুসদৃশ। আত্মার কখনও কোন রকম পরিবর্তন হয় না, তাই সে চিরকালই পরমাণুসদৃশই থাকে। তার পক্ষে বিভূচৈতন্য-বিশিষ্ট পরমাত্মা বা ভগবান হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বেদে নানা রকমভাবে বারবার এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আমরা আত্মার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। কোনও তত্ত্বকে নির্ভুলভাবে ও সম্যক্‌রূপে বুঝতে হলে, সেই জন্য তার পুনরাবৃত্তি দরকার।

শ্লোক ২৬

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অথ-আর যদি; চ-ও; এনম্-এই আত্মাকে; নিত্যজাতম্-সর্বদা জন্মশীল; নিত্যম্-নিত্য; বা-অথবা; মন্যসে-মনে কর; মৃতম্-মৃত; তথাপি-তবুও; ত্বম্-তুমি; মহাবাহো-হে মহাবীর; ন-না; এনম্-এই আত্মার জন্য; শোচিতুম্-শোক করা; অর্হসি-উচিত নয়।

গীতার গান

বিচার করিবে যবে শোক নাহি রবে।
আত্মার নিত্যত্ব জানি নিত্যানন্দ পাবে ॥
যদি তাই মান তুমি দেহই সর্বস্ব।
পরিচয় নাহি কিছু আত্মার নিজস্ব ॥
নিত্যজন্ম নিত্যমৃত্যু দেহ মাত্র হয়।
তবুও তোমার দুঃখ নাহি তবু তায় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো। আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মার বারবার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয়, তা হলেও তোমার শোক করার কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

প্রায় বৌদ্ধদের মতো কিছু দার্শনিক আছে, যারা আত্মার দেহাতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা

মানতে চায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভগবদ্গীতা বলেন, সেই যুগেও এই ধরনের নাস্তিক ছিল, তাদের বলা হত লোকায়তিক ও বৈভাষিক। এই সমস্ত দার্শনিকদের মতবাদ হচ্ছে, জড় পদার্থের সমন্বয়ের কোন এক বিশেষ পরিণত অবস্থায় প্রাণের উদ্ভব হয়। আধুনিক জড় বিজ্ঞানী ও জড়বাদী দার্শনিকেরাও এই মতবাদ পোষণ করে। তাদের মতে, দেহটি হচ্ছে কতকগুলি জড় উপাদানের সমন্বয় মাত্র এবং কোনও এক পর্যায়ে জড় উপাদান ও রাসায়নিক উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাণের লক্ষণ বিকশিত হয়।
এথ্রোপোলজি বা নৃবিজ্ঞান এই মতবাদের ভিত্তিতে প্রচলিত হয়েছে। আধুনিক যুগে, বিশেষ করে আমেরিকাতে এই মতবাদ ও বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদের ভিত্তির উপর অনেক নকল ধর্ম গজিয়ে উঠছে।
বৈভাষিক দার্শনিকদের মতো অর্জুন যদি আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতেন, তা হলেও তাঁর শোক করার কোন কারণ ছিল না। কিছু পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের বিনাশের জন্য কেউ শোক করে না এবং তার কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হয় না। পক্ষান্তরে, আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিগ্রহে শত্রু জয় করার উদ্দেশ্যে কত টন টন রাসায়নিক উপাদান তো নষ্টই হচ্ছে। বৈভাষিক দর্শন অনুসারে, দেহের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত আত্মার বিনাশ হয়। সুতরাং, অর্জুন যদি বৈদিক মতবাদকে অস্বীকার করে আত্মাকে নশ্বর বলে মনে করতেন অর্থাৎ দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলে মনে করতেন, তা হলেও তাঁর অনুশোচনা করার কোনই কারণ ছিল না। এই মতবাদ অনুযায়ী, যেহেতু ঘটনাচক্রে জড় পদার্থ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য জীবের উদ্ভব হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তেই এই রকম অসংখ্য জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে, তাই এর জন্য দুঃখ' করার কোনই কারণ নেই। এই মতবাদের ফলে যেহেতু পুনর্জন্মের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই অর্জুনের পিতামহ, আচার্য আদি আত্মীয়-পরিজনদের হত্যাজনিত পাপের ফল ভোগ করারও কোন ভয় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রূপ সহকারে অর্জুনকে মহাবাহু, অর্থাৎ যাঁর বাহুদ্বয় মহাশক্তি-সম্পন্ন বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ, অন্ততপক্ষে তিনি বৈদিক জ্ঞানের বিরোধী বৈভাষিকদের মতবাদ স্বীকার করেননি এবং তার ফলে তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ক্ষত্রিয়, এই বর্ণ-বিভাগ বৈদিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং যে এই বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম মেনে চলে, সে বৈদিক নির্দেশ অনুযায়ী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

শ্লোক ২৭

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যের্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

জাতস্য-যার জন্ম হয়েছে; হি-যেহেতু; ধ্রুবঃ-নিশ্চিত; মৃত্যুঃ-মৃত্যু; ধ্রুবম্ নিশ্চিত; জন্ম-জন্ম; মৃতস্য-মৃতের; চ-এবং; তস্মাৎ-অতএব; অপরিহার্যে-অবশ্যম্ভাবী; অর্থে-বিষয়ে; ননয়; ত্বম্ তুমি; শোচিতুম্-শোক করা; অর্হসি-উচিত।

গীতার গান

জড় দেহ উপজয় অনিবার্য ক্ষয়।
ক্ষয় হয়ে জড় দ্রব্য পুনঃ উপজয় ॥
জড় দ্রব্য রূপ ছাড়ি অন্য রূপ হয়।

নূতন রূপের জন্য অন্য রূপ কয় ॥
এই জড় বিজ্ঞ যদি করয়ে বিচার ।
তথাপি শোকের কথা নহে তিলধার ॥

অনুবাদ

যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কোন বিশেষ দেহপ্রাপ্ত হয়ে আত্মা জন্মগ্রহণ করে। আর সেই দেহের মাধ্যমে কিছুকাল জড় জগতে অবস্থান করার পর, সেই দেহের বিনাশ হয় এবং তার কর্মের ফল অনুযায়ী সে আবার আর একটি নতুন দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এভাবেই আত্মা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। সে যাই হোক, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র অনর্থক যুদ্ধ, হত্যা ও হিংসাকে কোন প্রকারেই অনুমোদন করে না। কিন্তু তবুও মানব-সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য হিংসা, হত্যা ও যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তা যখন সমাজের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।
ভগবানের ইচ্ছার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছিল বলে তা সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধ করাটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যেহেতু তিনি সঠিকভাবে কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করছিলেন, তাই তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে কেন তিনি ভীত অথবা শোকান্বিত হবেন? কর্তব্যকর্ম থেকে ভ্রষ্ট হলে পাপ হয় এবং অর্জুন যে স্বজন-হত্যার পাপের ভয়ে ভীত হচ্ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই পাপ তাঁর হত যদি তিনি যুদ্ধে বিমুখ হয়ে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করতেন। এই ধর্মযুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেও মৃত্যুর হাত থেকে তিনি তাঁর তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করতে পারতেন না। প্রকৃতির বিধান অনুসারে একদিন না একদিন তাদের মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু অর্জুন যদি তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তেন, তা হলে তাঁর মান, মর্যাদা ধূলিসাৎ হত।

শ্লোক ২৮

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অব্যক্তাদীনি-পূর্বে অপ্রকাশিত; ভূতানি-প্রাণীসমূহ; ব্যক্ত-প্রকাশিত; মধ্যানি-মাঝখানে; ভারত-হে ভরতবংশজ; অব্যক্ত-অপ্রকাশিত; নিধনানি-বিনাশের পর; এব-এমনই; তত্র-সুতরাং; কা-কি; পরিদেবনা-শোক।

গীতার গান

জড়ের রূপাদি নাহি পরেও থাকে না।
মধ্যে মাত্র রূপ গুণ সকলি ভাবনা ॥
অতএব নিরাকার যদি নিরাকার।
তাহাতে তোমার দুঃখ কিসের আবার ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সমস্ত সৃষ্ট জীব উৎপন্ন হওয়ার আগে অপ্রকাশিত ছিল, তাদের স্থিতিকালে

প্রকাশিত থাকে এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং, সেই জন্য শোক করার কি কারণ?

তাৎপর্য

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় মতবাদকে মেনে নিলেও শোকের কোন কারণ নেই। যারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বৈদিক মতাবলম্বীরা তাদের নাস্তিক বলে অভিহিত করে। তবুও এমন কি যদি তর্কের খাতিরে এই নাস্তিক মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলেও অনুশোচনা করার কোনই কারণ নেই। কারণ, জড়ের মধ্য থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়ে যদি তা আবার জড়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়, তবে সেই অনিত্য বস্তুর জন্য শোক করা নিতান্তই নিরর্থক। আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও সৃষ্টির পূর্বে জড় উপাদানগুলি থাকে অব্যক্ত। এই সূক্ষ্ম অব্যক্ত থেকে আকারের প্রকাশ হয়, যেমন আকাশ থেকে বায়ুর উদ্ভব হয়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে মাটির উদ্ভব হয়। এই মাটি থেকে নানা রূপের উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-ইট, সিমেন্ট, চুন, বালি, লোহা আদি সবই মাটি। সেই মাটি থেকে যখন একটি প্রাসাদ তৈরি হয়, তখন তা রূপ ও আকার প্রাপ্ত হয়। তারপর এক সময় সেই প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে মিশে যায়। যে বস্তু দিয়ে প্রাসাদটি গড়া হয়েছিল, তার অণু-পরমাণুগুলির কোন পরিবর্তন হয় না। শক্তি সংরক্ষণের নীতি বর্তমানই থাকে, কেবল সময়ের প্রভাবে তার রূপের প্রকাশ হয় এবং অন্তর্ধান হয়-সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। সুতরাং, এই আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের জন্য শোক করার কি কারণ থাকতে পারে? যে-কোনভাবেই হোক না কেন, এমন কি অব্যক্ত অবস্থাতেও বস্তুর বিনাশ হয় না। আদিতে ও অন্তে জড়ের রূপ থাকে না, কেবল মধ্যে তার রূপ ও গুণের প্রকাশ হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। সুতরাং, এর ফলে কোন জড়-জাগতিক পার্থক্য সূচিত হয় না।

আর আমরা যদি ভগবদ্গীতায় উক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিই, অর্থাৎ অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ-এই জড় দেহটি কালের প্রভাবে বিনষ্ট হবে, নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ-কিন্তু আত্মা চিরশাশ্বত, তা হলে আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেহটি একটি পোশাকের মতো। তাই এই পোশাকটির পরিবর্তনের জন্য কেন আমরা শোক করব? আত্মার নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, জড় দেহের যথার্থই কোন অস্তিত্ব নেই-এটি অনেকটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নে যেমন কখনও আমরা দেখি, আকাশে উড়ছি অথবা রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে আছি, কিন্তু যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন বুঝতে পারি, আমরা আকাশেও উড়িনি অথবা রাজা হয়ে সিংহাসনেও বসিনি। আমাদের জড় অস্তিত্বটিও তেমনই আমাদের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিকার। বৈদিক জ্ঞান আমাদের দেহের অনিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং, কেউ আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করুক অথবা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করুক না কেন, যে-কোন অবস্থাতেই জড় দেহ বিনাশের জন্য শোক করার কারণ নেই।

শ্লোক ২৯

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

আশ্চর্যবৎ-বিস্ময়জনক ভাবে; পশ্যতি দেখেন; কশ্চিৎ-কেউ; এনম্-এই আত্মাকে; আশ্চর্যবৎ-আশ্চর্যভাবে; বদতি বলেন; তথা-সেভাবে; এব-নিশ্চিত; চ-ও; অন্যঃ-অপরে; আশ্চর্যবৎ-তেমনই আশ্চর্যরূপে; চ-ও; এনম্-এই আত্মাকে; অন্যঃ-অন্য কেউ; শৃণোতি-শ্রবণ করেন; শ্রুত্বা শুনেও; অপি-এমন কি; এনম্-এই আত্মাকে; বেদ-জানতে পারেন; ন-না; চ-এবং; এব-নিশ্চিতভাবে; কশ্চিৎ-কেউ।

গীতার গান

আশ্চর্য আত্মার কথা, না বুঝয়ে যথা তথা
আশ্চর্য তাহার দেখাশুনা।
আশ্চর্য কেহবা বলে, আশ্চর্য কেহবা ছলে
আশ্চর্য তাহার অধ্যাপনা ॥
আশ্চর্য হইয়া শুনে, তথাপি বা নাহি মানে
আশ্চর্য যে আশ্চর্যের কথা।
আশ্চর্য হইয়া রহে, আশ্চর্য বুঝিতে নহে
আশ্চর্য অতি দুর্লভতা ॥

অনুবাদ

কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেউ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেউ শুনেও তাকে বুঝতে পারেন না।

তাৎপর্য

উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তির উপর গীতোপনিষদ অধিষ্ঠিত, তাই এই শ্লোকের ভাব কঠ উপনিষদের (১/২/৭) শ্লোকটিতেও দেখা যায়-

শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

সত্য ঘটনা হচ্ছে যে, পারমাণবিক আত্মা বিশালকায় পশুর দেহে, বিশাল বটবৃক্ষে, আবার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যারা লক্ষ কোটি সংখ্যায় মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাতেও থাকতে পারে, তাদের দেহেও অবস্থান করে, এটি অতি আশ্চর্যের কথা। যে সমস্ত মানুষ সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন এবং যাদের চিন্তাধারা সংযম ও তপশ্চর্যার প্রভাবে পবিত্র হয়নি, তারা কখনই পারমাণবিক জীবাত্মার বিস্ময়কর স্ফুলিঙ্গ রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তিনি নিজে এসে সেই জ্ঞান দান করার পরেও তার মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। স্থূল জড় পদার্থের দ্বারা অতি মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ কল্পনা করতে পারে না, পরমাণুর চাইতেও অনেক ছোট যে আত্মা, তা কি করে তিমি মাছের মতো বৃহৎ জন্তুর দেহে, আবার জীবাণুর মতো অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে উপস্থিত থেকে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। তাই, মানুষ আত্মার কথা শুনে অথবা আত্মার কথা অনুমান করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। মায়াশক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে, মানুষ তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করতে এতই ব্যস্ত যে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা করার সময় পর্যন্ত তাদের নেই। এমন কি যদিও এই কথাটি সত্য যে, এই আত্ম-উপলব্ধি ছাড়া জীবন-সংগ্রামে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শোচনীয় পরাজয়ে পর্যবসিত হবে। অনেকেই হয়ত আত্মজ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে জড়-জাগতিক ক্লেশের পীড়নে তারা অহরহ নির্যাতিত হয় এবং তার থেকে মুক্ত হবার কোন উপায় খুঁজে পায় না।

অনেক সময় কিছু মানুষ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রয়াসী হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধুসঙ্গ

বলে মনে করে একদল মূর্খের সঙ্গ লাভ করে ভাবতে শেখে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই-মায়ামুক্ত হলেই জীবাত্মা পরমাত্মাতে পরিণত হয়। এমন মানুষ খুবই বিরল যিনি জীবাত্মা, পরমাত্মা, তাঁদের নিজ নিজ কার্যকলাপ ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং অন্যান্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব বুঝতে পারেন। আরও বিরল হচ্ছে সেই মানুষকে খুঁজে পাওয়া, যিনি এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং যিনি বিভিন্ন রূপের মধ্যে আত্মার অবস্থানের বর্ণনা দিতে সক্ষম। যদি কেউ আত্মার এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তা হলেই তার জন্ম সার্থক হয়।

মানবজন্ম লাভ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করে মায়ামুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়া। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অন্যান্য মতবাদের দ্বারা বিপথগামী না হয়ে মহত্তম প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত ভগবদ্গীতার বাণীর যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করা এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করা। বহু জন্মের পুণ্যের ফলে এবং বহু তপস্যার বলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর রূপে উপলব্ধি করতে পারে এবং তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করতে সমর্থ হয়। অনেক সৌভাগ্যের ফলে মানুষ সদ্গুরুর সন্ধান পায়, যাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে সে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভকরতে পারে।

শ্লোক ৩০

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ৩০ ॥

দেহী-জড় দেহের মালিক; নিত্যম্-নিত্য; অবধ্যঃ-অবধ্য; অয়ম্-এই আত্মা; দেহে-দেহে; সর্বস্য-সকলের; ভারত-হে ভরতবংশীয়; তস্মাৎ-অতএব; সর্বাণি-সমস্ত; ভূতানি-জীবসমূহ (যাদের জন্ম হয়েছে); ন-না; ত্বম্-তুমি; শোচিতুম্-শোক করা; অর্হসি-উচিত।

গীতার গান

সিদ্ধান্ত আত্মার কথা শুন হে ভারত।
বেদান্ত আমার কথা শুন সেই মত ॥
দেহী নিত্য মরে নাহি সকল দেহের।
দেহের বিনাশ তাই নহে ত শোকের ।

অনুবাদ

হে ভারত! প্রাণীদের দেহে অবস্থিত আত্মা সর্বদাই অবধ্য। অতএব কোন জীবের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

আত্মার অবিনশ্বরতার কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান আবার উপসংহারে অর্জুনকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। দেহ অনিত্য, কিন্তু আত্মা নিত্য, তাই দেহের বিনাশ হলে তা নিয়ে শোক করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। অতএব পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ নিহত হবেন বলে ভয়ে ও শোকে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়ে স্বধর্ম পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক উপদেশামৃতের উপর আস্থা রেখে, প্রত্যেকের বিশ্বাস করতে হবে যে, জড় দেহ থেকে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, এই নয় যে, আত্মা বলে কোন বস্তু নেই,

অথবা রাসায়নিক পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে জাগতিক পরিপক্কতার কোন এক বিশেষ অবস্থায় চেতনার লক্ষণগুলির বিকাশ ঘটে। অবিনশ্বর আত্মার মৃত্যু হয় না বলে নিজের ইচ্ছামতো হিংসার আচরণ করাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, কিন্তু যুদ্ধের সময় হিংসার আশ্রয় নেওয়াতে কোন অন্যায় নেই, কারণ সেখানে তার যথার্থ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আমাদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিবেচিত হয় না-তা হয় ভগবানের বিধান অনুসারে।

শ্লোক ৩১

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্মম্-স্বধর্মের প্রতি; অপি চ-আরও; অবেক্ষ্য-বিবেচনা করে; ন-না; বিকম্পিতুম্-দ্বিধা করতে; অর্হসি-উচিত; ধর্ম্যাৎ-ধর্মের জন্য; হি-যেহেতু; যুদ্ধাৎ-যুদ্ধ অপেক্ষা; শ্রেয়ঃ-শ্রেয়স্কর কর্ম; অন্যৎ-অন্য কিছু; ক্ষত্রিয়স্য-ক্ষত্রিয়ের; ন বিদ্যতে নেই।

গীতার গান

নিজ ধর্ম দেখি পুনঃ না হও বিকল।
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা ধর্ম যে সকল ॥

অনুবাদ

ক্ষত্রিয়রূপে তোমার স্বধর্ম বিবেচনা করে তোমার জানা উচিত যে, ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করার থেকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নেই। তাই, তোমার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হয় ক্ষত্রিয়। এদের কাজ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করা। ক্ষৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে আঘাত। আঘাত বা বিপদ থেকে (ত্রায়তে-ত্রাণ করে) যে ত্রাণ করে, সে হচ্ছে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্রচালনা শিক্ষালাভ করে তাতে পারদর্শিতা লাভ করত। তাদের এই শিক্ষার একটি অঙ্গ হচ্ছে, বনে গিয়ে হিংস্র পশু শিকার করা। এভাবে অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে ক্ষত্রিয় সন্তান বনে গিয়ে হিংস্র বাঘকে যুদ্ধে আহ্বান করত এবং শুধু তলোয়ার হাতে সেই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিধন করত। তারপর সেই বাঘকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে সৎকার করা হত। এই প্রথা আজও জয়পুরের ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে প্রচলিত আছে। ক্ষত্রিয়েরা শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার প্রাণ সংহার করতে দ্বিধা করে না। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের জন্য এই প্রথার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই, ক্ষত্রিয়েরা সরাসরিভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার পথ অবলম্বন করা কূটনীতি হতে পারে, কিন্তু তা কখনই নীতিগত পন্থা নয়। নীতিশাস্ত্রে আছে-

আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ
যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাজুখাঃ।
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হন্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ তেহপি স্বর্গমবাপুবন্ ॥

"কোন রাজা অথবা ক্ষত্রিয় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ঈর্ষান্বিত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে রত হন, মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন, তেমনই ব্রাহ্মণ যজ্ঞে পশুবলি দিলে স্বর্গ লাভ করেন।"

তাই, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করা এবং যজ্ঞে পশু বলি দেওয়াকে হিংসাত্মক কার্য বলে গণ্য করা হয় না, কারণ এই ধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে সকলেই লাভবান হয়। যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু জৈব বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর জীব দেহ ধারণ না করে, সরাসরিভাবে মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয় এবং সেই যজ্ঞের ফলে দেবতারা তুষ্ট হয়ে মর্ত্যবাসীদের ধনৈশ্বর্য দান করেন। সুতরাং, ধর্মাচরণ করলে এভাবে সকলেই লাভবান হয়।
স্বধর্ম দুই রকমের। জড় বন্ধনমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবকে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তার দেহের ধর্ম পালন করতে হয় এবং তার ফলে সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মুক্ত অবস্থায় জীব তার অপ্রাকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। তখন আর তার দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না, তাই তখন তাকে জড়-জাগতিক অথবা দেহগত আচার অনুষ্ঠান করতে হয় না। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী, বদ্ধ অবস্থায় দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে জীবের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারটি স্তর থাকে এবং তাদের স্ব-স্ব ধর্ম থাকে এবং এই ধর্ম আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান নিজেই গুণ ও কর্ম অনুসারে এই স্বধর্ম নির্ধারিত করেছেন এবং এই সম্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দেহগত স্বধর্মকে বলা হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অথবা মানুষের পারমার্থিক উন্নতি লাভের উপায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অথবা জড়া প্রকৃতির নির্দিষ্ট গুণ অনুসারে প্রাপ্ত দেহটির দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশেষ কর্তব্যকর্মের স্তর থেকে মানব-সভ্যতা শুরু হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ করার ফলে মানুষ ক্রমে ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩২

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

যদৃচ্ছয়া-আপনা থেকেই; চ-এবং; উপপন্নম্-উপস্থিত হয়েছে; স্বর্গদ্বারম্-স্বর্গদ্বার; অপাবৃতম্-উন্মুক্ত; সুখিনঃ-সুখী; ক্ষত্রিয়াঃ-ক্ষত্রিয়েরা; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; লভন্তে-লাভ করেন; যুদ্ধম্-যুদ্ধ; ঈদৃশম্-এই রকম।

গীতার গান

অনায়াসে পাইয়াছ স্বর্গদ্বার খোলা।
সে যুদ্ধ কার্যেতে নাহি কর অবহেলা ॥
ভাগ্যবান বীর সেই হেন যুদ্ধ পায়।
যুদ্ধ করি যজ্ঞফল ক্ষত্রিয় লভয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী এই প্রকার ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না চাইতেই যে সব ক্ষত্রিয়ের কাছে আসে, তাঁরা সুখী হন।

তাৎপর্য

অর্জুন যখন বলেছিলেন, "এই যুদ্ধে কোন লাভ নেই। এই পাপের ফলে আমাকে অনন্তকাল ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।" তখন সমস্ত জগতের পরম শিক্ষাগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তাঁর এই উক্তি তাঁর মূর্খতার

পরিচায়ক। তাঁর স্বধর্ম-ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করে অহিংস নীতি অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় যদি অহিংস নীতি অবলম্বন করে, তবে তাকে একটি মস্ত বড় মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পরাশর-স্মৃতিতে ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি বর্ণনা করেছেন-

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্।
নির্জিত্য পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্মেণ পালয়েৎ ॥

"সব রকম দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করে প্রজা-পালন করাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং সেই কারণে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য তাঁকে অস্ত্রধারণপূর্বক দণ্ডদান করতে হয়। তাই তাঁকে বিরোধী ভাবাপন্ন রাজার সৈন্যদের বলপূর্বক পরাজিত করতে হয় এবং এভাবেই ধর্মের দ্বারা তাঁর পৃথিবী পালন করা উচিত।"

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায়, অর্জুনের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কোনই কারণ ছিল না। যুদ্ধে যদি তিনি জয়লাভ করতেন, তবে তিনি রাজ্যসুখ ভোগ করতেন, আর যদি যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হত, তবে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হতেন-যেখানে তাঁর জন্য দ্বার ছিল অবারিত। যুদ্ধ করলে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি লাভবান হতেন।

শ্লোক ৩৩

অথ চেতুমিমং ধর্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাল্যসি ॥ ৩৩ ॥

অথ-সুতরাং; চেৎ-যদি; ত্বম্-তুমি; ইমম্-এই; ধর্ম্যম্ ধর্ম; সংগ্রামম্-যুদ্ধ; ন-না; করিষ্যসি-কর; ততঃ-তা হলে; স্বধর্মম্-তোমার স্বীয় ধর্ম; কীর্তিম্-কীর্তি; চ-এবং; হিত্বা-হারিয়ে; পাপম্-পাপ; অবাল্যসি-লাভ করবে।

গীতার গান

অতএব তুমি পার্থ যদি যুদ্ধ ছাড়।
স্বধর্ম স্বকীর্তি সব একত্রে উগার ॥

অনুবাদ

কিন্তু, তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তা হলে তোমার স্বীয় ধর্ম এবং কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাপ ভোগ করবে।

তাৎপর্য

অর্জুনের বীরত্বের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি মহাদেবের মতো দেবতাদেরও যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। কিরাতরূপী মহাদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করলে, সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে পাশুপত নামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র দান করেন। তাঁর অস্ত্রশিক্ষা-গুরু দ্রোণাচার্যও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং এমন একটি অস্ত্র দান করেন, যার দ্বারা তিনি দ্রোণাচার্যকেও পর্যন্ত হত্যা করতে পারতেন। তাঁর ধর্মপিতা দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে তাঁর বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত করেন। এভাবে অর্জুনের বীরত্বের খ্যাতি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুবিদিত ছিল। তাই তিনি যদি যুদ্ধবিমুখ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতেন, তবে তিনি কেবল তাঁর ক্ষাত্রধর্মেরই যে অবহেলা করতেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁর বীরত্বের গৌরবও নষ্ট হত এবং তাঁকে নরকগামী হতে হত। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ করার জন্য অর্জুনকে নরকে যেতে হত না, বরং যুদ্ধ না করার জন্যই তাঁকে নরকে যেতে হত।

শ্লোক ৩৪

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিমরণাদতিরিচ্যতে ।৩৪ ॥

অকীর্তিম্-কীর্তিহীনতা; চ-এবং; অপি-তা ছাড়া; ভূতানি-সমস্ত লোক; কথয়িষ্যন্তি-বলবে; তে-তোমার সম্পর্কে; অব্যয়াম্-চিরকাল; সম্ভাবিতস্য-কোনও মর্যাদাবান লোকের পক্ষে; চ-আরও; অকীর্তিঃ-অসম্মান, মরণাৎ-মৃত্যু অপেক্ষা; অতিরিচ্যতে অধিক হয়।

গীতার গান

তোমার অকীর্তি লোক নিশ্চয়ই গাহিবে।
বাঁচিয়া মরণ তব বিঘোষিত হবে ॥

অনুবাদ

সমস্ত লোক তোমার কীর্তিহীনতার কথা বলবে এবং যে-কোন মর্যাদাবান লোকের পক্ষেই এই অসম্মান মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ।

তাৎপর্য

অর্জুনের বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যুদ্ধ না করলে তার ফলাফল কি হবে। ভগবান বলেছেন, "অর্জুন! যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর, তবে সকলে বলবে-তুমি কাপুরুষ। তোমার মতো যশস্বী ও মহানুভব বীরের পক্ষে এই কুখ্যাতির চাইতে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। তাই, প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার চাইতে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা অনেক ভাল। তার ফলে, তুমি আমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং সমাজে তোমার সুনামও অক্ষুণ্ণ থাকবে।" এভাবেই ভগবান অর্জুনকে বোঝালেন, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার চাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করা অনেক শ্রেয়।

শ্লোক ৩৫

ভয়াদ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ।।

ভয়াৎ-ভয়বশত; রণাৎ-রণক্ষেত্র থেকে; উপরতম্-নিবৃত্ত; মংস্যন্তে-মনে করবে; ত্বাম্-তোমাকে; মহারথাঃ-মহারথীরা; যেষাম্-যাদের কাছে; চ-এবং; ত্বম্-তুমি; বহুমতঃ-অত্যন্ত সম্মানিত; ভূত্বা-হয়ে; যাস্যসি-প্রাপ্ত হবে; লাঘবম্ লঘুতা।

গীতার গান

মহারথ যারা সব নিন্দা যে করিবে।
ভয় পেয়ে ছাড়ে রণ তারা যে বলিবে ॥
যাহাদের গণ্যমান্য তুমি যে এখন।
সকলের চক্ষে ছোট হইবে তখন ॥

অনুবাদ

সমস্ত মহারথীরা মনে করবেন যে, তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছ এবং তুমি

যাদের কাছে সম্মানিত ছিলে, তারাই তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বললেন, "অর্জুন। তুমি মনে করো না যে, দুর্যোধন, কর্ণ আদি রথী-মহারথীরা মনে করবে, তুমি করুণার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়েছ। তারা বলবে, তুমি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছ। ফলে, তোমার প্রতি তাদের যে উচ্চ ধারণা আছে, তা নস্যাৎ হবে।"

শ্লোক ৩৬

অবাচ্যবাদাংশ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অবাচ্য-অকথ্য; বাদান্-বাক্য; চ-এবং; বহুন্ বহু, বদিষ্যন্তি-বলবে; তব-তোমার; অহিতাঃশত্রুরা; নিন্দন্তঃ-নিন্দা করে; তব-তোমার; সামর্থ্যম্-সামর্থ্য; ততঃ-তার চেয়ে; দুঃখতরম্ অধিক দুঃখদায়ক; নু-অবশ্য; কিম্-আর কি আছে।

গীতার গান

কত গালাগালি দিবে অকথ্য কথন ।
ভাবি দেখ তব হিত কি হবে তখন ॥
নিজ নিন্দা শুনি তুমি নীরবে রহিবে।
বল পার্থ সেই নিন্দা কেমনে সহিবে ।

অনুবাদ

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু অকথ্য কথা বলবে। তার চেয়ে অধিকতর দুঃখদায়ক তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভাবনীয় হৃদয়-দৌর্বল্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ধরনের মনোভাব কেবল অনার্যদেরই শোভা পায়। অর্জুনের মতো ক্ষত্রিয়-বীরের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাই তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে বোঝালেন, অর্জুনের মতো ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে এই অনার্যোচিত দৌর্বল্যের কোন স্থান নেই।

শ্লোক ৩৭

হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ।।

হতঃ-নিহত হলে; বা-অথবা; প্রাল্যসি-লাভ করবে; স্বর্গম্-স্বর্গ; জিত্বা-জয় লাভ করলে; বা-অথবা; ভোক্ষ্যসে-ভোগ করবে; মহীম্-পৃথিবী; তস্মাৎ--অতএব; উত্তিষ্ঠ-উত্থিত হও; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; যুদ্ধায়-যুদ্ধের জন্য; কৃত-দৃঢ়সঙ্কল্প; নিশ্চয়ঃ-নিশ্চিত হয়ে।

গীতার গান

মরে যদি স্বর্গ পাও সেও ভাল কথা ।

বাঁচিয়া পাইবে ভোগ নহে সে অন্যথা ॥
বাঁচা মরা দুই ভাল যুদ্ধেতে নিশ্চয় ।
হেন যুদ্ধ ছাড় তুমি আশ্চর্য বিষয় ।
হে কৌন্তেয় উঠ তুমি নাহি কর হেলা।
যুদ্ধ করিবারে নিশ্চয় কর এই বেলা ॥

অনুবাদ

হে কুন্তীপুত্র! এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে, আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উত্থিত হও।

তাৎপর্য

যুদ্ধে যদি অর্জুনের জয় সুনিশ্চিত না-ও হত, তবু সেই যুদ্ধ তাঁকে করতেই হত। কারণ, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেও, তিনি স্বর্গলোকেই উন্নীত হতেন।

শ্লোক ৩৮

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাল্যসি ॥ ৩৮ ॥

সুখ-সুখ; দুঃখে-দুঃখে; সমে-সমানভাবে; কৃত্বা করে; লাভালাভৌ-লাভ ও ক্ষতিকে; জয়াজয়ৌ-জয় ও পরাজয়কে; ততঃ-তারপর; যুদ্ধায়-যুদ্ধার্থে; যুজ্যস্ব-যুদ্ধ কর; ন-না; এবম্ এভাবে; পাপম্-পাপ; অবাল্যসি-লাভ হবে।

গীতার গান

সুখদুঃখ সমকর নাহি লাভ সব ।
জয়াজয় নাহি ভয় কর্তব্য বলিব ॥
যুদ্ধের লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ কর।
নাহি তাতে পাপ ভয় এই সত্য বড় ॥

অনুবাদ

সুখ-দুঃখ, লাভ-স্কৃতি ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, তা হলে তোমাকে পাপভাগী হতে হবে না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন, জয়-পরাজয়ের বিবেচনা না করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। কারণ, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের সময় সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় আদি জাগতিক ফলাফলের বিবেচনা করা নিরর্থক। কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে কর্মই করা হোক না কেন, তা জাগতিক ফলাফলের অতীত-সে সমস্ত কর্মই অপ্রাকৃত কর্ম। যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করবার জন্য কর্ম করে, তার সেই কর্মের জন্য তাকে শুভঅথবা অশুভ ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে মানুষ ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর কারও প্রতি কোন কর্তব্য আর বাকি থাকে না এবং কারও প্রতি তাঁর আর কোন ঋণও থাকে না। স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ তাঁর কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় প্রতিটি কর্মের জন্য মানুষকে কারও না কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের সেবায়

নিজেকে উৎসর্গ করে কর্ম করলে আর সেই সমস্ত বন্ধন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি শ্রীকৃষ্ণ বা মুকুন্দের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করলেও তিনি দেবতা, ঋষি, জনসাধারণ, আত্মীয়স্বজন বা পিতৃপুরুষ, কারও কাছেই ঋণী নন।" (ভাঃ ১১/৫/৪১) কোন রকম ফলাফলের বিচার না করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করাটাই যে মানব-জীবনের পরম কর্তব্য, সেই কথা ভগবান সংক্ষেপে অর্জুনকে জানিয়ে দিলেন। এই শ্লোকে অর্জুনের প্রতি এটিই পরোক্ষ ইঙ্গিত এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবান এই বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

শ্লোক ৩৯

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

এষা-এই সমস্ত; তে-তোমাকে; অভিহিতা-বলা হল; সাংখ্যে-বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞান বিষয়ে; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; যোগে-নিষ্কাম কর্মে; তু-কিন্তু; ইমাম্-এই; শৃণু-শ্রবণ কর; বুদ্ধ্যা-বুদ্ধির দ্বারা; যুক্তঃ-যুক্ত হলে; যয়া-যার দ্বারা; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; কর্মবন্ধমু-কর্মের বন্ধন; প্রহাস্যসি-তুমি মুক্ত হতে পারবে।

গীতার গান

জ্ঞানের বিচারে সব বলিনু তোমাকে।
এবে শুন বুদ্ধিযোগে জ্ঞান পরিপাক ॥
জ্ঞানীর যোগ্যতা যদি পরিপাক হয়।
ভক্তি দ্বারা বুদ্ধিযোগ তবে সে বুঝয় ॥
ভক্তিযুক্ত কর্ম হয় কর্মযোগ নাম।
যাহার সাধনে কর্ম বন্ধন বিরাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! আমি তোমাকে সাংখ্য-যোগের কথা বললাম। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর, যার দ্বারা তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

নিরুক্তি বা বৈদিক অভিধান অনুযায়ী সংখ্যা কথাটির অর্থ হচ্ছে, যা কোন কিছুর বিশদ বিবরণ দেয় এবং সাংখ্য বলতে সেই দর্শনকে বোঝায় যা আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে। আর 'যোগ' হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করার পন্থা। অর্জুনের যুদ্ধ না করার কারণ ছিল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা। তাঁর পরম কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে অর্জুন যুদ্ধ করতে নারাজ হলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে রাজ্যসুখ ভোগ করার চাইতে অহিংসার পথ অবলম্বন করা অধিকতর সুখদায়ক হবে। উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা। আত্মীয়-

স্বজনদের পরাজিত করে রাজ্যসুখ ভোগ করা এবং তাদের জীবিত দেখে তাদের সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা, এই দুই ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই হচ্ছে একমাত্র কারণ। এভাবেই অর্জুন তাঁর জ্ঞান ও কর্তব্য বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এই চিন্তাধারা অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, তাঁর পিতামহকে হত্যা করলেও, তিনি তাঁর পিতামহের আত্মাকে কখনই বিনাশ করতে পারবেন না, কারণ প্রতিটি জীব এবং ভগবান সনাতন ও স্বতন্ত্র। পূর্বেও এরা সকলেই এদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বর্তমান ছিল, বর্তমানেও এরা আছে এবং ভবিষ্যতেও এরা থাকবে। প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার চিরশাশ্বত আত্মা। বিভিন্ন সময়ে সে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে, যা হচ্ছে পোশাকের মতো। তাই, জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেও জীবের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে এই বর্ণনামূলক জ্ঞানকে নিরুক্তি অভিধান অনুসারে সাংখ্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সাংখ্যের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী কপিলের সাংখ্য-দর্শনের কোন যোগাযোগ নেই। ভণ্ড কপিলের সাংখ্য-দর্শনের বহু পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকৃত সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবানের অবতার কপিলদেব (ইনি নিরীশ্বরবাদী কপিল নন) তাঁর মাতা দেবহূতিকে এই দর্শনের ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, পুরুষ অথবা পরমেশ্বর ভগবান সক্রিয় এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের উদ্ভব হয়। বেদে এবং ভগবদ্গীতাতেও এই কথা স্বীকৃত হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে, ভগবান যখন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁর সেই দৃষ্টিপাতের ফলে প্রকৃতিতে অসংখ্য পারমাণবিক আত্মার সঞ্চার হয়। জড়া প্রকৃতিতে এই সমস্ত আত্মা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে এবং মায়ার প্রভাবের ফলে তারা মনে করছে, তারা ভোক্তা। এই বিকৃত মনোবৃত্তির সবচেয়ে অধঃপতিত অবস্থার প্রকাশ হয়, যখন তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাবার বাসনায় মুক্তি কামনা করে এবং তার পরিণতিতে নিজেদেরই ভগবান বলে জাহির করতে চেষ্টা করে। এটিই হচ্ছে মায়ার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ, কারণ তথাকথিত মুক্তিকামীরা মায়ামুক্ত হতে গিয়ে মায়ার সবচেয়ে জটিল ফাঁদে আটকে যায়। বহু বহু জন্ম এভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার বাসনায় মায়ার দ্বারা ভবসমুদ্রে নাকানি-চোবানি খাবার পর, যখন জীবের অন্তরে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তখন সে বুঝতে পারে, বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে জীবের চরম উদ্দেশ্য এবং ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ। তখন সে পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।
অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছেন- শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁকে 'বুদ্ধিযোগ' বা 'কর্মযোগ' অথবা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার পরিবর্তে ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভক্তিযোগ অনুশীলনের পন্থা বর্ণনা করবেন। এই বুদ্ধিযোগকে দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের অন্তরেই বিরাজ করছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত সেই রকম যোগাযোগ স্থাপন হয় না। তাই যিনি ভগবানে অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে অবস্থিত, পক্ষান্তরে যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই বুদ্ধিযোগের স্তর লাভ করেন। তাই ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা প্রীতিপূর্বক ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত, কেবল তাঁদেরই তিনি প্রেমভক্তির শুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করবেন। এভাবে ভগবদ্ভক্ত চির-আনন্দময় ভগবানের রাজ্যে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারেন।
এভাবে এই শ্লোকে বুদ্ধিযোগ বলতে ভক্তিযোগকে বোঝানো হয়েছে এবং এখানে সাংখ্য অর্থে নিরীশ্বরবাদী কপিলের 'সাংখ্য-যোগ'কে বোঝানো হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে

ভগবদ্গীতা বলেছিলেন, তখন সেই সাংখ্য-যোগের কোন 'প্রভাব ছিল না, আর তা ছাড়া কপিলের মতো নাস্তিকের কল্পনাপ্রসূত এই ভ্রান্তিবিলাস নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই ভগবানের ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভগবানের অবতার কপিলদেব প্রকৃত সাংখ্য শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু এখানে সেই সাংখ্যের কথাও ভগবান বলেননি। সাংখ্য বলতে এখানে দেহ ও আত্মার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের বিবরণের কথা বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করে শোনালেন যাতে তিনি বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সাংখ্যের কথা বলেছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবান কপিলদেবের সাংখ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, কারণ উভয় সাংখ্যই হচ্ছে ভক্তিযোগ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল সাংখ্য-যোগ ও ভক্তিযোগকে ভিন্ন বলে মনে করে (সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ)।

নাস্তিক কপিলের যে সাংখ্য-যোগ তার সঙ্গে ভক্তিযোগের অবশ্যই কোন সম্পর্ক নেই, তবুও কিছু বুদ্ধিহীন লোক দাবি করে থাকে, ভগবদ্গীতায় নাকি নাস্তিক সাংখ্য-যোগের উল্লেখ আছে।

ভগবদ্গীতার মূল তত্ত্ব এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, বুদ্ধিযোগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের তৃপ্তিসাধন করার জন্য ভগবদ্ভক্ত যখন বুদ্ধিযোগের মাধ্যমে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্তব্যকর্ম যতই কষ্টকর হোক না কেন, ভগবৎ-ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকার ফলে তিনি তখন অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকেন। ভগবানের এই সেবার ফলে অনায়াসে অপ্রাকৃত অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায় এবং ভগবানের কৃপার ফলে কোন রকম বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়াই হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং এভাবে তিনি মুক্তিলাভ করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম ও সকাম কর্মের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে, বিশেষ করে পারিবারিক ও জাগতিক সুখলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ে। তাই বুদ্ধিযোগ হচ্ছে অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন কর্ম, যা আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্লোক ৪০

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ন-নেই; ইহ-এই যোগে; অভিক্রম-প্রচেষ্টা; নাশ-বিনাশ; অস্তি-আছে; প্রত্যবায়ঃ হ্রাস; ন বিদ্যতে হয় না; স্বল্পম্-অল্প; অপি-যদিও; অস্য-এই; ধর্মস্য ধর্মের; ত্রায়তে-ত্রাণ করে; মহতঃ-মহা; ভয়াৎ-ভয় থেকে।

গীতার গান

ক্ষয় ব্যয় নাহি নাশ সে কার্য সাধনে।
যাহা পার করে যাও সঞ্চয় এ ধনে ॥
স্বল্প মাত্র হয় যদি সে ধর্ম সাধন।
মহাভয় হতে রক্ষা পাইবে তখন ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

তাৎপর্য

নিজের সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ কাজ। কেউ যদি একটু একটু করেও ভগবানের সেবা করতে শুরু করে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই এবং ভগবানের এই সেবা যত নগণ্যই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা বিফলে যায় না। জড়-জাগতিক স্তরে যে কোন কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন তাৎপর্যই থাকে না। কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ম বা ভগবৎ-সেবা সুসম্পন্ন না হলেও, বিফলে যায় না-তার সুফল চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। ভগবানের সেবা একবার যে শুরু করেছে, তার আর বিপথগামী হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এক জন্মে যদি তার ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ নাও হয়, তবে তার পরের জন্মে সে যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করবে। এভাবেই ভগবদ্ভক্তির ফল চিরস্থায়ী থাকে বলে ক্রমান্বয়ে জীবকে মায়ামুক্ত করে। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, খানিকটা ভগবদ্ভক্তি সাধন করে, অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করে উদ্ধার পেয়ে যায়। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) একটি সুন্দর শ্লোক আছে-

ত্যক্তা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যদি কেউ তার স্বীয় কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীচরণাম্বুজের সেবা করে এবং সেই ভগবৎ-সেবা সম্পূর্ণ না করে অধঃপতিত হয়, তাতে ক্ষতি কি? আর যদি কেউ জড়-জাগতিক সমস্ত কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করে তাতে তার কি লাভ?" কিংবা, যেমন খ্রিস্টধর্মীরা বলে থাকেন, "কোনও মানুষ সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও যদি তার শাশ্বত আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে, তবে তার কি লাভ?"

জড় দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব রকম জড়-জাগতিক প্রচেষ্টা এবং সেই সমস্ত প্রচেষ্টালব্ধ ফল, সব কিছুরই বিনাশ ঘটে। কিন্তু ভগবানের সেবায় মানুষ যে সব কাজকর্ম করে, তার ফলে সে আবার আরও ভালভাবে ভগবানের সেবা করবার সুযোগ পায়, এমন কি দেহের বিনাশ হলেও। ভগবানের সেবাকার্য সম্পূর্ণ না করে যদি কেউ দেহত্যাগ করে, তবে পরজন্মে সে আবার মনুষ্যজন্ম লাভ করে। সৎ ব্রাহ্মণ অথবা প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম লাভ করে সে আবার তার অসম্পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিকে সম্পূর্ণ করে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ পায়। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে আত্মনিয়োগ করার এই হচ্ছে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা-নিশ্চয়াত্মিকা কৃষ্ণভক্তি; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; একা-একটি মাত্র; ইহ-এই জগতে;

কুরুনন্দন-হে কুরুবংশীয়; বহুশাখা-বহু শাখায় বিভক্ত; হি-যেহেতু; অনন্তাঃ-অনন্ত; চ-এবং; বুদ্ধয়ঃ-বুদ্ধি; অব্যবসায়িনাম্-কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিদের।

গীতার গান

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হে কুরুনন্দন ।
একমাত্র হয় তাহা বহু না কখন ॥
অনন্ত অপার সে অব্যবসায়ী হয় ।
বহু শাখা বিস্তারিত কে করে নির্ণয় ॥

অনুবাদ

যারা এই পথ অবলম্বন করেছে তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন, অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করেন যে, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করলে, ভগবান তাঁকে এই জড় জগতের বন্ধনমুক্ত করে ভগবৎ-ধামে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতে (মধ্য ২২/৬২) বলা হয়েছে-

'শ্রদ্ধা'শব্দে-বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

বিশ্বাস মানে কোনও সুমহান বিষয়ে অবিচল আস্থা। সাধারণ অবস্থায় মানুষের নানা রকম দায়-দায়িত্ব থাকে। তার পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে, দেশের কাছে, তার কোন না কোন রকম কর্তব্য থাকে। এভাবে মনুষ্য-সমাজ সকলের কাছ থেকেই কোন না কোন রকম কর্তব্য দাবি করে থাকে। আর মানুষও তার পূর্বকৃত ভাল-মন্দ কর্মের ফল অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু যখন মানুষ ভগবৎ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, তখন আর তাকে সৎ কর্ম করে শুভ ফল লাভের প্রত্যাশী হতে হয় না, অথবা অসৎ কর্ম করে তার অশুভ ফল ভোগ করার ভয়ে ভীত হতে হয় না। কারণ, ভগবৎ-সেবা হচ্ছে অপ্রাকৃত কর্ম, তা ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, এই সব দ্বন্দ্বের অতীত। ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হলে জড় জগতের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকে না-একেই বলে বৈরাগ্য। ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হতে থাকলে, ভগবানের কৃপার ফলেই এক সময় এই স্তরে উপনীত হওয়া যায়।

কৃষ্ণভাবনায় কোন ব্যক্তির নিশ্চয়াত্মিকা কৃষ্ণভক্তির ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান। পরম তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার পরই ভক্ত ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ-একজন কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি দুর্লভ মহাত্মা এবং তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পারেন, বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের মূল। কারণ, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উৎস। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সারা গাছকেই জল দেওয়া হয়, তেমনই, সব কিছুর উৎস ভগবানের সেবা করলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, জাতি আদি সকলেরই সেবা করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি তুষ্ট হন, তা হলে সকলেই সন্তুষ্ট হবেন।

সদগুরুর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন করাই হচ্ছে মানব-জীবনের পরম কর্তব্যকর্ম। সদগুরু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুযোগ্য প্রতিনিধি। তিনি তাঁর শিষ্যের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাই, সুষ্ঠুভাবে ভক্তিযোগ সাধন করতে হলে ভগবানের প্রতিনিধি গুরুদেবের নির্দেশ শিরোধার্য করে এবং তাঁর আদেশকে জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করে তা পালন করতে হবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

শ্রীগুর্বষ্টকে বলেছেন-

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"গুরুদেব সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং গুরুদেবকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। তাই ত্রিসন্ধ্যায় আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের কীর্তিসমূহ ধ্যান করি, স্তব করি এবং তাঁর শ্রীচরণারবিন্দের বন্দনা করি।"

দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে ভক্তের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় এবং তখন তিনি সর্বান্তঃকরণে ভগবানের সেবায় ব্রতী হন। এই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান জানলেই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না-পূর্ণরূপে তার উপলব্ধি এবং আচরণ করার মাধ্যমেই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। যে মানুষের মন চঞ্চল ও বুদ্ধি অপরিণত, তার পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভব নয়। কারণ, সে সকাম কর্মের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত থাকার ফলে সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ৪২-৪৩

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

যাম্ ইমাম্-এই সমস্ত; পুষ্পিতাম্-পুষ্পিত; বাচম্-বাক্য; প্রবদন্তি-বলে; অবিপশ্চিতঃ-অবিবেকী মানুষ; বেদবাদরতাঃ-বেদের তথাকথিত অনুগামী; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ন-না; অন্যৎ-অন্য কিছু; অস্তি-আছে; ইতি-এভাবে; বাদিনঃ-মতবাদী; কামাত্মানঃ-কামনাযুক্ত; স্বর্গপরাঃ-স্বর্গ লাভই যাদের প্রধান উদ্দেশ্য; জন্মকর্মফলপ্রদাম্-জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ; ক্রিয়াবিশেষ-আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ; বহুলাম্-বিবিধ; ভোগ-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; ঐশ্বর্য-ঐশ্বর্য; গতিম্-প্রগতি; প্রতি-প্রতি।

গীতার গান

পুষ্পের সাজনে যাহা ইষ্ট মিষ্ট কথা।
কর্মীর হৃদয় তাহা করে প্রফুল্লিতা ॥
সেই বেদ বাদী সব ভোগের কারণ।
যথাসর্ব সেই কথা করয়ে বরণ ।।
মূর্খ সেই ভোগবাদী আপাত মধুর।
দগ্ধচিত্ত হয়ে যায় আসলে ফতুর ॥
কামাত্মনা লোক সব স্বর্গভোগ চায়।
কর্মফল ভোগলিপ্সা আর না বুঝয় ॥
আড়ম্বরে ভুলে যায় ভোগৈশ্বর্য চায়।
বুদ্ধিযোগ এক লক্ষ্য তাহা না মানয় ॥

অনুবাদ

বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ আদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদের মূর্খতার ফলে তারা বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সকাম কর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ভোগ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ স্বর্গলোকে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের চরম তৃপ্তিসাধন করাই হচ্ছে তাদের পরম কাম্য। বেদে স্বর্গলোকে যাবার জন্য নানা রকম যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে, তার মধ্যে 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞ বিশেষভাবে ফলপ্রদ। বাস্তবিকই যে মানুষ স্বর্গলোকে যেতে চায়, তার পক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞগুলি সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা মনে করে, এটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের চরম শিক্ষা। এই প্রকার অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভবপর হয় না। মূর্খ যেমন বিষ-বৃক্ষের ফল দেখে লালায়িত হয়, তেমনই অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে তা ভোগ করবার বাসনায় লালায়িত হয়।

বেদের কর্মকাণ্ডে উল্লেখ আছে-অপাম সোমমমৃতা অভূম। এ ছাড়া আরও উল্লেখ আছে-অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। এর মানে, চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করলে মানুষ স্বর্গলোকে গিয়ে সোমরস পান করে অমরত্ব লাভ করে এবং চিরকালের জন্য সুখী হতে পারে। এমন কি এই পৃথিবীতেও বহু লোক আছে, যারা সোমরস পান করার জন্য নিতান্ত উৎসুক। কারণ, সোমরস পান করে বল ও বীর্য বর্ধন করে কিভাবে আরও বেশি করে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে পারবে, সেটিই তাদের একমাত্র কাম্য। এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চায় না। এদের সীমিত বুদ্ধিতে এরা উপলব্ধি করতে পারে না যে, ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার যে আনন্দ, তার তুলনায় স্বর্গসুখ নিতান্তই তুচ্ছ। তাই, তারা আড়ম্বরপূর্ণ বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। এই ধরনের লোকেরা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, তাই তারা ইন্দ্রিয়-সুখের চরম স্তর স্বর্গলোকের অতীত যে আর কিছু থাকতে পারে, তা বুঝতে পারে না। মনে করে, স্বর্গের নন্দন-কাননে সোমরস পান করে অপরূপ রূপসী অপ্সরাদের সঙ্গ করে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। এই প্রকার দৈহিক সুখ নিঃসন্দেহে ইন্দ্রিয়জাত; তাই যারা এই প্রকার জাগতিক অস্থায়ী সুখের প্রতি আসক্ত, তারা নিজেদেরকে পার্থিব জগতের প্রভু বলে মনে করে।

শ্লোক ৪৪

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ভোগ-জড় সুখভোগে; ঐশ্বর্য-ঐশ্বর্যে, প্রসক্তানাম্-যারা গভীরভাবে আসক্ত; তয়া-তাদের দ্বারা; অপহৃতচেতসাম্-বিমূঢ়চিত্ত; ব্যবসায়াত্মিকা-দৃঢ়চিত্ত, নিশ্চয়াত্মিকা; বুদ্ধিঃ-ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবা; সমাধৌ-সংযতচিত্ত; ন-না; বিধীয়তে হয় না।

গীতার গান

ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত যে পাগলের মত।

নিজেকে হারিয়া বসে আশা শত শত ।।
তারা নাহি বুঝে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।
আসক্তি তাদের শুধু ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি ॥
অনুবাদ
যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না। তাৎপর্য
চিত্ত যখন একাগ্র হয়, তখন তাকে বলা হয় সমাধি। বৈদিক অভিধান নিরুক্তিতে বলা হয়েছে, সম্যগাধীয়তেহস্মিন্নাত্মতত্ত্বযাথাত্ম্যম্ "মন যখন আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য একাগ্র হয়, তাকে তখন বলা হয় সমাধি।" যে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ উপলব্ধি করতে উৎসুক এবং যারা অনিত্য জড় জগতের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তাদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে আত্ম-উপলব্ধি বা সমাধি লাভ করা অসম্ভব। মায়া তাদের এত গভীরভাবে বেঁধে রেখেছে যে, তাদের পক্ষে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া দুষ্কর।

শ্লোক ৪৫

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
ত্রৈগুণ্য-প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্পর্কিত; বিষয়াঃ-বিষয়ে; বেদাঃ-বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; নিস্ত্রৈগুণ্যঃ-জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত; ভব-হও; অর্জুন-হে অর্জুন; নির্দ্বন্দুঃ-দ্বন্দুরহিত; নিত্যসত্ত্বস্থঃ-শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্ময় অস্তিত্বে; নির্যোগক্ষেমঃ -অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং তার রক্ষার চিন্তা থেকে মুক্ত; আত্মবান্-অধ্যাত্ম চেতনায় অবস্থিত।
গীতার গান
ত্রিগুণের মধ্যে বেদ সত্ত্ব রজস্তম।
তাহার উপরে উঠ তবে সে উত্তম ॥
তখনই দ্বন্দুভাব ঘুচিবে তোমার।
নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বভাব হবে আবিষ্কার ॥
আত্মবান হয় সদা নির্যোগ নিক্ষেম।
যে ধনে সে ধনী তাহা ভগবদ্ প্রেম ।।
অনুবাদ
বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন। তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দু থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।
তাৎপর্য
জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে জড় জগতের প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া বা কর্মফল জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। বেদ সাধারণত সকাম কর্ম করার শিক্ষা দান করে, যার ফলে সাধারণ মানুষ জড় সুখ উপভোগ ও জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের স্তর থেকে ক্রমশ অধোক্ষজ স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে। ভগবান তাঁর প্রিয় সখা ও প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, বেদান্ত দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হতে। এই বেদান্ত দর্শনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে-ব্রহ্মাক্ষা-

জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করা। জড় জগতে প্রতিটি জীবই বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। এই সমস্ত মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান সৃষ্টির আদিতে বৈদিক জ্ঞান দান করেন, যাতে তারা বুঝতে পারে, কি রকম জীবনযাপন করলে তারা এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারবে। বেদের কর্মকাণ্ড নামক অধ্যায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জাগতিক কামনা-বাসনার তৃপ্তিসাধন করা যায়। এভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি জনিত নানা রকম সুখভোগ করার পর জীব যখন বুঝতে পারে, জড় জগতের সমস্ত সুখই অনিত্য ও নিরর্থক, তখন তার মন পারমার্থিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই বেদে কর্মকাণ্ডের পর উপনিষদে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন উপনিষদগুলি হচ্ছে বিভিন্ন বেদের মর্মার্থ, যেমন গীতোপনিষদ বা ভগবদ্গীতা হচ্ছে পঞ্চম বেদ মহাভারতের সারাংশ। এই উপনিষদগুলির মাধ্যমে মানুষের পারমার্থিক জীবন শুরু হয়।

যতক্ষণ আমাদের জড় দেহ আছে, ততক্ষণ প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে আমাদের কর্ম করতে হয় এবং তার ফল ভোগ করতে হয়। এটিই হচ্ছে কর্মবন্ধন। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হতে হলে এই যে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণের দ্বন্দুভাব, তাতে অবিচলিত থেকে তার প্রভাবমুক্ত হতে হয় এবং তখন আর লাভ-ক্ষতির বিচারবোধ থাকে না। মন তখন আর অনুশোচনা ও অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিত হয় না। এভাবেই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীব যখন ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, তখনই সে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তার সৎ, চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৪৬

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

যাবান্-যে সমস্ত; অর্থঃ-প্রয়োজন; উদপানে-ক্ষুদ্র জলাশয়ে; সর্বতঃ-সর্বতোভাবে; সংপ্লুতোদকে-অতি বৃহৎ জলাশয়ে; তাবান্-তেমনই; সর্বেষু-সমস্ত; বেদেষু-বৈদিক শাস্ত্রে; ব্রাহ্মণস্য-পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির; বিজানতঃ-পূর্ণ জ্ঞানবান।

গীতার গান

সেই প্রেমে ভাসমান সর্বলাভ পায়।
কূপ জল নদী জল যথা যথা হয় ॥
এক কূপে হয় এক কার্যের সাধন।
নদীর জলেতে হয় একত্রে ভাজন ॥
বেদের তাৎপর্য সেই এক লক্ষ্য হয় ।
ব্রাহ্মণ যে হয় সেই সমস্ত বুঝয় ॥

অনুবাদ

ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, সেগুলি বৃহৎ জলাশয় থেকে আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়। তেমনই, ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

তাৎপর্য

বেদের কর্মকাণ্ডে যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ক্রমশ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে উৎসাহিত করা। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে (১৫/১৫) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, বেদ অধ্যয়ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্ব কারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এভাবে আমরা দেখতে পাই, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৫/৭) ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, জীব হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ; তাই, জীবের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের সেবা করা-তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণভাবনা জাগিয়ে তোলা। এটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের চরম সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৭) তার সমর্থনে বলা হয়েছে-

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানচুর্নাম গৃণন্তি যেতে ॥

"হে ভগবান, নিরন্তর যিনি আপনার নাম কীর্তন করেন, তিনি যদি চণ্ডালের মতো নীচকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, তবুও তিনি অধ্যাত্ম-মার্গের অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। এই প্রকার মানুষ বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বহু তপশ্চর্যা করেছেন এবং সমস্ত পুণ্যতীর্থে বহু স্নান করে তিনি বহুবার বেদ অধ্যয়ন করেছেন। এমন মানুষকে আর্যকুলে শ্রেষ্ঠ বলেই বিবেচনা করা হয়।"

সুতরাং বেদ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠান করে স্বর্গলোকে উন্নততর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার শিক্ষা বৈদিক শাস্ত্র আমাদের দিচ্ছে না। বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, সমস্ত বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা এই যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্ত করার জন্য যে শক্তি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তা এই যুগের মানুষের নেই। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য ভগবানের দিব্য নামের সংকীর্তন করার পথ প্রদর্শন করে গেছেন। মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে মনে হয়, তবু বেদান্ত দর্শন পাঠ না করে তিনি কেন ভাবুকের মতো ভগবানের নাম কীর্তন করছেন। এর উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, তাঁর গুরুদেব বুঝতে পারেন যে, তিনি অত্যন্ত মূর্খ, তাই তিনি তাঁকে শাসন করে উপদেশ দিলেন যে, বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁর অধিকার নেই। এই বলে তিনি তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করার নির্দেশ দিলেন। এই নাম জপ করতে করতে তিনি ভগবদ্ভক্তির ভাবে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। এই কলিযুগে অধিকাংশ মানুষই মূর্খ। বেদান্ত দর্শন বোঝার তো ক্ষমতা তাদের নেই, তাই ভগবান বেদান্ত দর্শনের সারমর্ম ভগবদ্ভক্তির বার্তা বহন করে এনে, এই ভক্তি লাভ করার পথ প্রদর্শন করে গেলেন। নিষ্কলুষ চিত্তে নিরপরাধে ভগবানের নাম জপ করার মাধ্যমে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন। বৈদিক জ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছে বেদান্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তা। যে মহাত্মা নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করে অসীম আনন্দ উপভোগ করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত বেদান্ত-তত্ত্ববেত্তা। কারণ, সেটিই হচ্ছে বৈদিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৭

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

কর্মণি-নির্ধারিত কর্মে; এব-কেবলমাত্র; অধিকারঃ-অধিকার; তে-তোমার; মা-না; ফলেষু-কর্মফলে; কদাচন-কখনও; মা-না; কর্মফল কর্মফলের; হেতুঃ-কারণ; ভূঃ-হয়ো; মা-না; তে-তোমার; সঙ্গঃ-আসক্তি; অস্ত্ব-হোক; অকর্মণি-স্বধর্ম অনুষ্ঠান না করায়।

গীতার গান

নিজ অধিকার মাত্র কর্ম করে যাও।
কর্মফল নাহি চাও আসক্তি ঘুচাও ॥
কর্মফল হেতু সদা না হইবে তুমি।
অনুকূল কর্ম যেই সেই কর্ম ভূমি ॥

অনুবাদ

স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না, এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ না'করার প্রতিও আসক্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

এখানে আমাদের তিনটি জিনিস সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে- (১) কর্তব্যকর্ম, (২) খেয়ালখুশি মতো কর্ম এবং (৩) নৈষ্কর্ম্য। কর্তব্যকর্ম হচ্ছে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় জাগতিক কর্ম। খেয়ালখুশি মতো কর্ম হচ্ছে শাস্ত্র অথবা গুরুদেবের অনুমোদন ব্যতীত কর্ম এবং কর্তব্যকর্ম সম্পাদন না করাকে বলা হয় নৈষ্কর্ম্য। ভগবান অর্জুনকে নিষ্কর্মা না হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে যেতে। কারণ, মানুষ যখন তার কর্মফলের প্রত্যাশা করে, তখন সে কার্য-কারণে জড়িত হয়ে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই সে কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে।

কর্তব্যকর্মকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-বিধিবদ্ধ কর্ম, সঙ্কটকালীন কর্ম ও আকাঙ্ক্ষিত কর্ম। কোনও রকম ফলের প্রত্যাশা না করে শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম হচ্ছে সত্ত্বগুণের কর্ম। ফলের প্রত্যাশা করে যে কর্ম করা হয়, তা সত্ত্ব, রজ অথবা তম, যে গুণের প্রভাবেই করা হোক না কেন, তা অশুভ। কারণ, ফলের প্রত্যাশা করা মানেই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কর্তব্যকর্ম সকলকেই করতে হয়, কিন্তু কোন রকম ফলের প্রত্যাশা না করে নিরাসক্তভাবে সেই কর্ম করতে হয়; এই প্রকার ফলের আশাহীন কর্তব্যকর্ম নিঃসন্দেহে মুক্তির পথে চালিত করে।

ভগবান তাই অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ফলাফল না ভেবে নিরাসক্ত ভাবে যুদ্ধ করে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে যেতে। তাঁর যুদ্ধে যোগ না দেওয়াও ছিল অন্য এক প্রকারের আসক্তি। এই প্রকার আসক্তি কাউকে মুক্তির পথে চালিত করে না। হ্যাঁ বাচক অথবা না বাচক, যে-কোন প্রকার আসক্তিই বন্ধনের কারণ। কর্তব্যকর্ম থেকে নিষ্কর্মার মতো বিরত থাকা পাপ, তাই কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করাই ছিল অর্জুনের পক্ষে মুক্তির একমাত্র শুভ পথ।

শ্লোক ৪৮

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

যোগস্থঃ-যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে; কুরু-কর; কর্মাণি-তোমার কর্তব্যকর্ম; সঙ্গম্-আসক্তি; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; ধনঞ্জয়-হে অর্জুন; সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ-সাফল্য ও ব্যর্থতায়; সমঃ-সমভাবে; ভূত্বা-হয়ে; সমত্বম্-সমতা; যোগঃ-যোগ; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

যোগী হয়ে কর কর্ম আসক্তি রহিত ।
আসক্তি রহিত কর্ম ভগবানে প্রীত ॥
ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যজি কর্ম করে যাও।
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম বৈষম্য ঘুচাও ।
এই সমভাব হয় যোগসিদ্ধি নাম ।
সেই সিদ্ধিলাভে পূর্ণ সর্ব মনস্কাম ।।

অনুবাদ

হে অর্জুন! ফলভোগের কামনা পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগস্থ হয়ে স্বধর্ম-বিহিত কর্ম আচরণ কর। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি, তাকেই যোগ বলা হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যোগ বলতে কি বোঝায়? যোগের অর্থ হচ্ছে, সদা চিত্তচাঞ্চল্যকারী ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করা। পরমেশ্বর কে? সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখানে যেহেতু তিনি নিজেই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে আদেশ করছেন, সুতরাং সেই যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি তাঁর আসক্ত হওয়া উচিত নয়। আর তার লাভ অথবা জয় নির্ভর করছে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর। অর্জুনের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করা। ভগবানের আদেশ পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত যোগ এবং কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে এই যোগের অনুশীলন করা হয়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল অহঙ্কারমুক্ত হওয়া সম্ভব। ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের দাসের দাসত্ব বরণ করার ফলে অন্তরে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং তখন বিজিতেন্দ্রিয় হয়ে যোগের সাধন করা সম্ভব হয়।

অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং সেই হেতু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচরণ করতেন। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করা। জড় জগতের নীতি হচ্ছে যে, কারওই নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা উচিত। তাই কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট না করে, তবে সে বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। এভাবে ভগবান অর্জুনকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

দূরেণ-দূরে পরিত্যাগ করে; হি-যেহেতু; অবরম্ নিকৃষ্ট; কর্ম-কর্ম; বুদ্ধি-যোগাৎ-ভগবদ্ভক্তির বলে; ধনঞ্জয়-হে ধনঞ্জয়; বুদ্ধৌ-সেই প্রকার চেতনায়; শরণম্পূর্ণ শরণাগতি; অন্বিচ্ছ- চেষ্টা কর; কৃপণাঃ-কৃপণেরা; ফলহেতবঃ-ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

বুদ্ধিযোগ দ্বারা ছাড়া কর্ম অবরাদি।
কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে না হও বিষাদী ॥
অনুক্ষণ সেই বুদ্ধে শরণাগতি যার।
কৃপণের ফল হেতু ইচ্ছা নহে তার ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করে সকাম কর্ম থেকে দূরে থাক এবং সেই চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের শরণাগত হও। যারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, তারা কৃপণ।

তাৎপর্য

যে মানুষ বুঝতে পেরেছেন, তিনি ভগবানের নিত্যদাস, তিনি তখন তাঁর সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে ভক্তি সহকারে ভগবৎ-সেবায় ব্রতী হন। পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, বুদ্ধিযোগ হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা। এই সেবাই হচ্ছে সমস্ত জীবের যথার্থ কর্তব্যকর্ম। একমাত্র কৃপণেরাই তাদের স্বকর্মফল ভোগের বাসনা করে, ফলে তারা পুনরায় জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভক্তিযুক্ত কর্ম ছাড়া আর সমস্ত কাজকর্মই ঘৃণ্য, কারণ সেই সমস্ত কাজকর্ম মানুষকে নিরন্তর জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করে। তাই কখনই কর্মফলের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সমস্ত প্রকার কাজকর্ম করা উচিত। বহু কষ্ট স্বীকার করে অথবা অসীম সৌভাগ্যের ফলে অর্জিত সম্পদ কিভাবে তার ব্যয় করতে হয়, কৃপণ তা জানে না। সকলেরই উচিত, কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্মে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। তাতেই জীবনের সার্থকতা আসবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত হতভাগ্য মানুষেরা এই অমূল্য সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সেবায় ব্রতী না হয়ে, কৃপণের মতো এই অমূল্য সম্পদের অপচয় করে।

শ্লোক ৫০

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযুক্তঃ-যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত; জহাতি-মুক্ত হতে পারে; ইহ-এই জীবনে; উভে-উভয়; সুকৃত-দুষ্কৃতে-পুণ্য ও পাপ; তস্মাৎ-সেই জন্য; যোগায়-নিষ্কাম কর্মযোগের জন্য; যুজ্যস্ব-যুক্ত হও; যোগঃ-কৃষ্ণভক্তি; কর্মসু-সমস্ত কর্মের; কৌশলম্-কৌশল।

গীতার গান

বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল।
দুষ্কৃতি বা ফলে যাহা করয়ে নির্মল ॥
অতএব তুমি সেই যোগে যুদ্ধ কর।
কর্মের কৌশল এই বুদ্ধিযোগ ধর ॥

অনুবাদ

যিনি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি এই জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হন। অতএব, তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। সেটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ কর্মকৌশল।

তাৎপর্য

স্মরণাতীত কাল ধরে প্রতিটি জীব তার শুভ ও অশুভ কর্মের ফল সঞ্চয় করছে। এই কর্মফলের জন্যই সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে এবং জড়-জাগতিক ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত হচ্ছে। অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই জীব তার স্বরূপ ভুলে গেছে। এই দুঃখদায়ক অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় হচ্ছে, গীতায় নির্দেশিত ভগবানের উপদেশ হহৃদয়ঙ্গম করে তাঁর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা। তা হলে আমাদের অজ্ঞতার আবরণ উন্মোচিত হবে এবং জন্ম-জন্মান্তরে কর্ম ও কর্মফলের শৃঙ্খলায়িত শাস্তিভোগের কবল থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। সেই জন্য, সকল কর্মফলের প্রক্রিয়াকে পরিশুদ্ধ করে তোলার পন্থাস্বরূপ কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে নিযুক্ত থাকতে অর্জুনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৫১

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

কর্মজম্-কর্মজাত; বুদ্ধিযুক্তাঃ-ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে; হি-নিশ্চয়ই; ফলম্ ফল; ত্যক্তা-ত্যাগ করে; মনীষিণঃ-মহর্ষিগণ অথবা ভগবদ্ভক্তগণ, জন্মবন্ধ-জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে, বিনির্মুক্তাঃ-মুক্ত হয়ে; পদম্-পদ; গচ্ছন্তি-লাভ করেন; অনাময়ম্-দুঃখ-দুর্দশা রহিত।

গীতার গান

মনীষী যেই সে কর্ম বুদ্ধিযোগ দ্বারা।
ত্যাগেতে সমর্থ হয় কর্মফল সারা ॥
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত সেই কর্মযোগী।
অনামময় পদ প্রাপ্ত হয় সেই ত্যাগী ॥

অনুবাদ

মনীষিগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এভাবে তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অতীত অবস্থা লাভ করেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা যেখানে নেই, মুক্ত পুরুষেরা সেখানেই অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে-

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধিবৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সব কিছুর আশ্রয় এবং যিনি মুক্তিদাতা মুকুন্দ নামে খ্যাত, তাঁর পদপল্লবরূপ তরণীর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন। তাঁর কাছে এই ভবসমুদ্র গোষ্পদতুল্য। পরং পদ বা যেখানে জড়-জাগতিক ক্লেশ

নেই, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ হচ্ছে তাঁর গন্তব্যস্থল। যে জগতে প্রতি পদক্ষেপে বিপদ, সেখানে তিনি আবদ্ধ থাকতে চান না।"
আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে, এই জড় জগৎ প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এখানে প্রতি পদক্ষেপেই বিপদ। কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মনে করে, নানা রকম জাগতিক প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃতির প্রতিকূলতার নিরসন করে তারা সুখী হবে। তারা জানে না, এই জড় জগতে কোন জীবই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি আদি ক্লেশের থেকে রেহাই পেতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি ভগবানের নিত্যদাস, তিনি তখন ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার ফলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করেন, যেখানে জড়-জাগতিক ক্লেশ এবং মৃত্যু ও কালের প্রভাব নেই। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভগবানের মহিমান্বিত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। ভ্রান্তিবশত যে মানুষ মনে করে, ভগবান ও সে একই স্তরে অবস্থিত অর্থাৎ যে মানুষ মনে করে, সে-ই ভগবান, তার পক্ষে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা কখনই সম্ভব নয়। অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়ে সে নিজেকে সর্ব কারণের কারণ বলে মনে করে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়। ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা ছাড়া আর কোন উপায়েই জড় বন্ধন মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এই ভগবৎ-সেবাকে বলা হয় কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ, অথবা সরল ভাষায় একে বলা হয় ভক্তিযোগ।

শ্লোক ৫২

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

যদা-যখন; তে-তোমার; মোহ-মোহ; কলিলম্-গভীর অরণ্য; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; ব্যতিতরিষ্যতি অতিক্রম করে; তদা-সেই সময়; গন্তাসি-প্রাপ্ত হবে; নির্বেদম্-বিতৃষ্ণা; শ্রোতব্যস্য-শ্রোতব্য; শ্রুতস্য-ইতিপূর্বে যা শোনা হয়ে গেছে; চ-এবং।

গীতার গান

যখন তোমার মন বুদ্ধিযোগ দ্বারা।
মোহরূপ কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পারা ॥
তখন নির্বেদ সব হয়ে যাবে কাম।
শ্রুতির শ্রোতব্য তব নাহি রবে ধাম ॥

অনুবাদ

এভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয়, সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবানের মহান ভক্তদের অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করার ফলে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেন। যখন কোনও ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে চিরশাশ্বত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়, সে

স্বাভাবিক ভাবেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়, এমন কি সে যদি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণও হয়। মহাভাগবত ও গুরুপরম্পরা ধারায় আচার্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন-

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তমস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারং অঘং হরামি তদলং মন্যে কিমনোন মে ।

"হে ভগবান! ত্রিসন্ধ্যায় আমি তোমাকে বন্দনা করি, তোমার জয় হোক। হে দেবতাগণ! হে পিতৃগণ। স্নানান্তে আমি আর তোমাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে পারি না। আমার এই অক্ষমতা তোমরা ক্ষমা করো। এখন আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমি যদুকুলশ্রেষ্ঠ কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি এবং তার ফলে আমি সমস্ত পাপবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আমার মনে হয়, এটিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

পারমার্থিক মার্গে যাঁরা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাঁদের পক্ষে বেদের নির্দেশ অনুযায়ী বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করা একান্ত প্রয়োজন; যেমন-খুব সকালে স্নান করা, পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা, ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করা আদি। কিন্তু কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে যিনি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে আর কোন আচার-অনুষ্ঠানের বিধি পালন করতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত সাধনার পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। শাস্ত্রে যে-সমস্ত তপশ্চর্যা, যাগযজ্ঞ, বিধি-নিষেধের আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভ করে তাঁর পদারবিন্দে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা। তাই, ভগবানের সেবায় যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে আর সেই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের শরণ নিতে হয় না। সেই রকম, বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা, সেই কথা না জেনে যারা অন্ধের মতো আচার-অনুষ্ঠান আদিতে নিয়োজিত হয়, তারা অনর্থক তাদের সময় নষ্ট করে চলেছে। যে মানুষ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন, তিনি শব্দব্রহ্মের স্তর উত্তীর্ণ হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর কাছে বেদ, উপনিষদের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

শ্লোক ৫৩

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাল্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতি-বৈদিক জ্ঞান; বিপ্রতিপন্না-বেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; তে-তোমার; যদা-যখন; স্থাস্যতি থাকবে; নিশ্চলা-অবিচলিত; সমাধৌ-চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায়; অচলা-স্থির; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; তদা-তখন; যোগম্-আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান; অবাল্যসি-লাভ করবে।

গীতার গান

শ্রুতির গৃহীত জ্ঞান যখন নিশ্চলা।
কর্ম জ্ঞান যোগ আদি তখনি সফলা ॥
সমাধি তখন হয় কর্মযোগে স্থিতি।
স্থিতপ্রজ্ঞ তার নাম যোগারূঢ় গতি ॥

অনুবাদ

তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম-উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হবে।

তাৎপর্য

জীব যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করে, তখন তার সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি; যিনি পূর্ণ সমাধিমগ্ন হয়েছেন, তিনি ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও পরমাত্মা উপলব্ধির স্তর অতিক্রম করে সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অধ্যাত্ম-জ্ঞানের চরম পূর্ণতা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য দাসত্ব সম্পর্কের উপলব্ধি করা, তাই ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে জীবের একমাত্র কর্তব্য। সেই জন্য, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বেদের সুন্দর বর্ণনার দ্বারা মোহিত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করার জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলে ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রতিটি উপদেশের মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের আদেশে ভগবানের সেবা করলে, অচিরেই তার ফল পাওয়া যায় এবং ভগবদ্ভক্তির মাধুর্য আস্বাদন করা যায়।

শ্লোক ৫৪

অর্জুন উবাচ
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্জুন উবাচ-অর্জুন বললেন; স্থিতপ্রজ্ঞস্য-অচলা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির; কা-কি; ভাষা-লক্ষণ; সমাধিস্থস্য-সমাধিস্থ ব্যক্তির; কেশব-হে কৃষ্ণ; স্থিতধীঃ-কৃষ্ণভাবনায় স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি; কিম্-কি; প্রভাষেত বলেন; কিম্-কিভাবে; আসীত-অবস্থান করেন; ব্রজেত-বিচরণ করেন; কিম্-কিভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
কি লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ কিবা তাঁর ভাষা।
হে কেশব! কহ মোরে সমাধিস্থ আশা ॥
স্থিতধী কি বলে কিংবা উঠাবসা করে।
কিভাবে গমন করে কহত বিস্তারে ।

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?

তাৎপর্য

বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষেরই যেমন কোন না কোন লক্ষণ থাকে, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষেরও সেই রকম চলা, বলা, চিন্তাভাবনায় কতকগুলি প্রকৃতগত লক্ষণ থাকে। একজন ধনীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে ধনী, একজন রোগীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে রোগী, একজন জ্ঞানীর লক্ষণ দেখে যেমন

বোঝা যায় সে জ্ঞানী, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাবনায় মগ্ন কোনও ভগবদ্ভক্তের কথা বলবার ধরন, চলার ভঙ্গি, চিন্তাধারা, মনোবৃত্তি আদি দেখে বোঝা যায়, তিনি হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। ভগবস্তুক্তের এই সমস্ত লক্ষণের বর্ণনা ভগবদ্গীতাতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তিনি কিভাবে কথা বলেন; কারণ, কথার মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে গভীরভাবে মানুষের অন্তরের ভাবের প্রকাশ হয়। প্রবাদ আছে, মূর্খ যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ না খুলছে, ততক্ষণ তার মূর্খতা প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে ভাল পোশাকে সজ্জিত মূর্খ যতক্ষণ তার মুখ না খুলছে, তাকে চেনার উপায় নেই, কিন্তু যখনই সে মুখ খোলে, তখনই তার পরিচয় প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া আর কোন কথাই বলেন না। অন্যান্য লক্ষণ তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং তা নীচে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৫

শ্রীভগবানুবাচ
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; প্রজহাতি-ত্যাগ করেন; যদা-যখন; কামান্-কামনাসমূহ; সর্বান্-সর্ব প্রকার; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; মনোগতান্ মনের জল্পনা-কল্পনা; আত্মনি-আত্মার নির্মল অবস্থায়; এব-অবশ্যই; আত্মনা-বিশুদ্ধ চেতনার দ্বারা; তুষ্টঃ-সন্তুষ্ট; স্থিতপ্রজ্ঞঃ-চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; তদা-তখন; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
নিজের ইন্দ্রিয় সুখে যত কাম আছে।
বদ্ধ জীব মনোধর্মে ধায় পাছে পাছে ॥
সে সব কামনা ত্যজি আত্ম-ভগবানে।
সম্বন্ধ জানিয়া ক্রমে হয় আগুয়ানে ॥
তখন জানিবে তুষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ সুখী।
এ ছাড়া আর যে লোক সকলেই দুঃখী ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে পার্থ! জীব যখন মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে উদ্ভুত সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন এভাবে পবিত্র হয়ে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে মহৎ মুনি-ঋষিদের সমস্ত গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়; আর যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তাদের মধ্যে কোন গুণই দেখা যায় না। কারণ, তারা তাদের সীমিত মনের জল্পনা-কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে থাকে।

সুতরাং, এখানে যথার্থই বলা হয়েছে যে, জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সব রকমের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। কৃত্রিমভাবে এই ইচ্ছাকে কখনই সংবরণ করা

যায় না। কিন্তু মানুষ যখন কৃষ্ণভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন কোন রকম বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়া আপনা থেকেই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা প্রশমিত হয়। তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাহীনভাবে ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করা, কেন না এই পথ অবলম্বন করার ফলে সে অচিরেই অপ্রাকৃত চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। যিনি মহাত্মা তিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের দাস এবং এই সত্য উপলব্ধির ফলে তিনি নিত্যানন্দ অনুভব করেন। জড় জগৎকে ভোগ করার তুচ্ছ কোন বাসনাই তখন আর তাঁর থাকে না। তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপে পরমেশ্বরের নিত্য সেবায় মগ্ন থেকে সদাই সুখে থাকেন।

শ্লোক ৫৬

দুঃখেষুনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখেষু-ত্রিতাপ দুঃখে; অনুদ্বিগ্নমনাঃ-উদ্বেগশূন্য চিত্ত; সুখেষু-সুখে; বিগতস্পৃহঃ - স্পৃহাশূন্য; বীত-মুক্ত; রাগ-আসক্তি; ভয়-ভয়; ক্রোধঃ-ক্রোধ; স্থিতধীঃ -স্থিতপ্রজ্ঞ; মুনিঃ-মননশীল ব্যক্তি; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে নাহি স্পৃহা।
নিজ সেবাকার্যে যাঁর একমাত্র ঈহা ॥
বীতরাগ শোক ভয় ক্রোধ নাহি যাঁর।
সে জন স্থিতধী মুনি বিদিত সবার ॥

অনুবাদ

ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখ উপস্থিত হলেও যাঁর স্পৃহা হয় না এবং যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

মুনি' তাঁকে বলা হয়, যিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে নানা রকম অনুমান করবার জন্য মনকে নানাভাবে আলোড়িত করতে পারেন। তাই বলা হয় যে, 'নানা মুনির নানা মত।' কোন মুনির মত যদি অন্য মুনির থেকে স্বতন্ত্র না হয়, তবে তাঁকে যথার্থ মুনি বলা যায় না। নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ (মহাভারত, বনপর্ব ৩১৩/১১৭)। কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন, স্থিতধীমুনি সাধারণ মুনিদের থেকে ভিন্ন। স্থিতধীমুনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, কেন না তিনি জল্পনা-কল্পনামূলক সমস্ত কার্যকলাপের পরিসমাপ্তি করেছেন। তাঁকে বলা হয় প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তর (স্তোত্ররত্ন, ৪৩), অথবা যিনি জল্পনা-কল্পনার স্তর অতিক্রম করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বসুদেব-তনয় ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সবকিছু (বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ)। তাঁকে বলা হয় মুনি, যাঁর মন একনিষ্ঠ। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তকে জড় জগতের ত্রিতাপ ক্লেশের কোন আক্রমণই আর বিচলিত করতে পারে না। কারণ, তিনি সব রকমের দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন, তাঁর পূর্বকৃত অসৎ কর্মের ফলস্বরূপ আরও দুঃখ-দুর্দশা তাঁর একমাত্র প্রাপ্য, কিন্তু ভগবানের অহৈতুকী করুণার ফলে তাঁর সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার ভার অনেক লাঘব হয়ে গেছে। তেমনই,

যখন তাঁর সুখানুভূতি হয়, তখন তিনি নিজেকে সেই সুখের অযোগ্য বলেই মনে করেন; তিনি ভাবেন, ভগবানের কৃপাতেই তিনি ঐ রকম সুখপ্রদ অবস্থায় রয়েছেন এবং ভগবানের সেবায় তাই আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে পারছেন। ভগবানের সেবা করবার জন্য তিনি সব সময়ই সৎসাহসী ও তৎপর এবং কোন রকম আসক্তি বা বিরক্তি তাঁকে সেই সেবা থেকে বিরত করতে পারে না। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় আসক্তি এবং এই ধরনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকলে বলা হয় বিরক্তি। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনায় অবিচলিত, তাঁর কোন কিছুর প্রতি আসক্তিও নেই, বিরক্তিও নেই, কেন না ভগবানের সেবায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন। তাই তাঁর কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ক্রোধান্বিত হন না। সফল হন বা ব্যর্থই হন, তিনি তাঁর সংকল্পে সর্বদাই একনিষ্ঠ।

শ্লোক ৫৭

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যঃ-যিনি; সর্বত্র-সর্বত্র; অনভিস্নেহঃ-আসক্তি বর্জিত; তৎ তৎ-সেই সেই; প্রাপ্য-লাভ করে; শুভ-ভাল; অশুভম্-খারাপ; ন-না; অভিনন্দতি-প্রশংসা করেন; ন-না; দ্বেষ্টি-দ্বেষ করেন; তস্য-তাঁর; প্রজ্ঞা-পূর্ণ জ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা-প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

দেহস্মৃতি নাহি যাঁর শুভাশুভ কিবা তাঁর।
সর্বত্র অনভিস্নেহ লোক ব্যবহার ॥
অভিনন্দ দ্বেষ নাই সর্ব হিতে রত।
তাঁহার জানিও প্রজ্ঞা স্থির প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

জড় জগতে যিনি সমস্ত জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত, যিনি প্রিয় বস্তু লাভে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হলে দ্বেষ করেন না, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে সব সময়ই নানা রকম উত্থান-পতন ঘটে চলেছে, সেগুলি কখনও শুভ বা অশুভ হতে পারে। যিনি এই ধরনের উত্থান-পতনে বিচলিত হন না, যিনি ভাল-মন্দে প্রভাবিত হন না, তাঁকেই কৃষ্ণভাবনায় অবিচলিত বলে বিবেচনা করতে হবে। মানুষ জড় জগতে থাকলে সব সময়েই শুভ-অশুভ সম্ভাবনা থাকে, কারণ জড় জগৎটাই এই দ্বন্দুভাবের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় একনিষ্ঠ ভক্ত কখনই এই শুভ-অশুভ দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মগ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হন, যাকে পরিভাষায় বলা হয় 'সমাধি'।

শ্লোক ৫৮

যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

যদা-যখন; সংহরতে-প্রত্যাহার করেন; চ-এবং; অয়ম্ তিনি; কুর্মঃ-কচ্ছপ; অঙ্গানি-অঙ্গসমূহ; ইব-যেমন; সর্বশঃ-সর্বতোভাবে; ইন্দ্রিয়ানি-ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে, তস্য-তাঁর; প্রজ্ঞা-চেতনা; প্রতিষ্ঠিতা-প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

গোদাস ইন্দ্রিয়সুখে বিচলিত সদা ।
গোস্বামী হয়েছে ধীর আত্মাতে সর্বদা ॥
তাই সে ইন্দ্রিয় সব কুর্ম অঙ্গ মত।
ইন্দ্রিয় ভোগার্থ সদা বিষয়ে বিরত ॥
অতএব জানি তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।
সে জন উপাধিমুক্ত গোস্বামী বিদিত ॥

অনুবাদ।

কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী, যোগী অথবা ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে পারেন। অধিকাংশ মানুষই তাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রকৃত যোগীকে এভাবে চিনতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু সাপুড়ে যেমন সাপকে পোষ মানায়, যোগী বা ভগবদ্ভক্ত ঠিক তেমনভাবে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করেন। তিনি তাদের কখনই স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে দেন না। শাস্ত্রে কর্তব্য-অকর্তব্য, বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে নানা রকম নির্দেশ দেওয়া আছে। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের নির্দেশগুলি আচরণ করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করতে পারলে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা যায় না। এই সম্বন্ধে এখানে খুব সুন্দরভাবে কুর্মের উদাহরণ দেওয়া আছে। কুর্ম যে-কোন সময় তার হাত, পা, মাথা আদি অঙ্গগুলি তার খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে তাদের বার করে আনতে পারে। ঠিক তেমনই, কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত ভগবানের বিশেষ প্রয়োজনেই তার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করেন, আর অন্য সময় তাদের গুটিয়ে রাখেন। এভাবেই ইন্দ্রিয়-দমন করার মাধ্যমে একাগ্রচিত্তে ভগবানের সেবা করা যায়। অর্জুনকে এখানে সেভাবেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তিনি নিজের তৃপ্তি-সাধনের জন্য তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে কাজে না লাগিয়ে ভগবানের সেবায় তা নিয়োগ করেন। ভগবানের সেবায় কিভাবে সর্বদা ইন্দ্রিয়াদি নিয়োজিত রাখতে হয়, কুর্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। কুর্মের মতো ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

শ্লোক ৫৯

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥

বিষয়াঃ-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়সমূহ; বিনিবর্তন্তে-নিবৃত্ত হয়; নিরাহারস্য-কৃত্রিমভাবে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করে; দেহিনঃ- দেহীর; রসবর্জম্-বিষয়রস বর্জন করে; রসঃ-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; অপি-যদিও; অস্য-তাঁর; পরম্-উৎকৃষ্ট বস্তু; দৃষ্টা-দর্শন করে; নিবর্ততে-নিবৃত্ত হন।

গীতার গান

বৈরাগ্য করিয়া হয় বিষয়-নিবৃত্তি।
তাহা নহে স্থিতপ্রজ্ঞা স্বাভাবিক বৃত্তি ॥
পরমানন্দ জানি যেবা জড়ানন্দ ছাড়ে।
স্থিতপ্রজ্ঞ সেই বীর বিষয়ে বিহারে ॥

অনুবাদ

দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয়তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিত্যাগ করতে পারে না। বিধি-নিষেধের দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পন্থা অনেকটা রোগীর বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞার মতো। রোগী সাধারণত এই সমস্ত বিধি-নিষেধ মানতে চায় না এবং তার রোগের জন্য এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য খেতে সাময়িকভাবে বিরত থাকলেও তার খাওয়ার লালসা কোনও অংশে কমে না। তেমনই, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান আদি সমন্বিত অষ্টাঙ্গ-যোগের মতো কিছু পারমার্থিক পদ্ধতির দ্বারা যে ইন্দ্রিয় সংযম, তা উন্নত জ্ঞানহীন, অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনায় প্রগতি সাধনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প-কোটি কমনীয় রূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁর আর নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর প্রতি কোন রকম রুচি থাকে না। তাই, অধ্যাত্ম-মার্গের প্রাথমিক স্তরেই কেবল বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় যতক্ষণ রুচি না হয়, ততক্ষণ এই বিধি-নিষেধ মঙ্গলজনক হয়। যখন কেউ প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই ইতর বস্তুর প্রতি তাঁর রুচি হারিয়ে ফেলেন।

শ্লোক ৬০

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
'ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

যততঃ-যত্নশীল; হি-যেহেতু; অপি-সত্ত্বেও; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; পুরুষস্য-মানুষের; বিপশ্চিতঃ-বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; প্রমাথীনি-চিত্ত বিক্ষেপকারী; হরন্তি-হরণ করে; প্রসভম্বলপূর্বক; মনঃ-মনকে।

গীতার গান

আত্মার সম্পর্ক নাই বৈরাগ্যের যতন।

পণ্ডিত হলেও তার প্রসভিত মন ॥
প্রমাথী ইন্দ্রিয় তাকে বিষয়েতে ফেলে।
শুষ্ক বৈরাগীর লাগে আগুন কপালে ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা অতি যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

তাৎপর্য

অনেক ঋষি, মুনি ও অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মতো যোগী, যিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করবার জন্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, তিনিও স্বর্গের অপ্সরা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে কামান্ধ হয়ে অধঃপতিত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না করে, কেউই এই প্রকার জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে পারে না। একটি কার্যকর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহাসাধক ও ভগবদ্ভক্ত শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন-

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥

"আমার মন এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে এবং আমি প্রতিনিয়তই নব নব অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন করছি। এখন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা মনে হলেই আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে এবং আমি সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে থুথু ফেলি।"

কৃষ্ণভক্তি এমনই এক অপ্রাকৃত আনন্দে পরিপূর্ণ যে, এর স্বাদ একবার পেলে জড় সুখভোগের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। নানা রকম সুস্বাদু খাবার খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে যেমন আর আজেবাজে জিনিস খাবার ইচ্ছা থাকে না, তেমনই কৃষ্ণভক্তির স্বাদে পরিতৃপ্ত মন আর কিছুই চায় না। কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করার পর মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যায় এবং কোন অবস্থাতেই তা আর বিচলিত হয় না। তাই আমরা দেখতে পাই, মহারাজ অম্বরীষকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে, মহা-তেজস্বী মুনি দুর্বাসার প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তিনি মহারাজ অম্বরীষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রাণ রক্ষা করেন। কারণ, মহারাজ অম্বরীষের মন কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিল (স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে)।

শ্লোক ৬১

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

তানি-সেই ইন্দ্রিয়সমূহ; সর্বাণি-সমস্ত; সংযম্য-সংযত করে; যুক্তঃ-যুক্ত হয়ে; আসীত-

অবস্থিত হয়ে; মৎপরঃ-আমার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত; বশে-সম্পূর্ণরূপে বশীভূত; হি-অবশ্যই; যস্য-যাঁর; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; তস্য-তাঁর; প্রজ্ঞা-জ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা-প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

কৃষ্ণসেবা যুক্ত হয় ইন্দ্রিয় সংযত।
ইন্দ্রিয় সে বশ হয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে আমার প্রতি উত্তমা ভক্তিপরায়ণ হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ যোগ তা এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায় না। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহা-তেজস্বী দুর্বাসা মুনি অকারণে মহারাজ অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়-সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। পক্ষান্তরে, মহারাজ অম্বরীষ দুর্বাসার মতো শক্তিশালী তপস্বী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। অন্তরে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থেকে তিনি দুর্বাসার সমস্ত অত্যাচার ও অপমান নীরবে সহ্য করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর জয় হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/১৮-২০) বর্ণিত নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হবার ফলেই মহারাজ অম্বরীষ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন-

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ।
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমতুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাময়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

"মহারাজ অম্বরীষ তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের ধ্যানে, তাঁর বাণী দিয়ে বৈকুণ্ঠের গুণ বর্ণনায়, তাঁর হাত দিয়ে তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনে, তাঁর কান দিয়ে ভগবানের লীলা শ্রবণে, তাঁর চোখ দিয়ে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শনে, তাঁর দেহ দিয়ে ভক্তদেহ স্পর্শনে, তাঁর নাক দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর জিহ্বা দিয়ে ভগবানকে অর্পিত তুলসীর স্বাদ আস্বাদনে, তাঁর পদদ্বয় দ্বারা যেখানে ভগবানের মন্দির বিরাজমান সেই সব তীর্থস্থানে ভ্রমণে, তাঁর মস্তক দিয়ে ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর কামনা দিয়ে ভগবানের কামনা সম্পাদনে নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত গুণাবলী তাঁকে ভগবানের মৎপর ভক্ত করে তোলে।"
এখানে মৎপর শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কিভাবে মৎপর হওয়া যায়, তা মহারাজ অম্বরীষের আচরণের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মৎপর পরম্পরায় আচার্য মহাপণ্ডিত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেছেন, মদ্ভক্তিপ্রভাবেন সর্বেন্দ্রিয়বিজয়পূর্বিকা স্বাত্মদৃষ্টিঃ সুলভেতি ভাবঃ। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমেই কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করা যায়।" তা ছাড়া, কখনও কখনও

আগুনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়-"একটি আগুনের শিখা যেমন একটি ঘরের মধ্যে সব কিছু পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তেমনই যোগীর 'হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অন্তর থেকে সব রকমের কলুষতা দহন করেন।" যোগসূত্রেও ধ্যানের প্রণালী বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করতে। শূন্যকে ধ্যান করার কোন কথাই বলা হয়নি। যে সমস্ত তথাকথিত যোগী শ্রীবিষ্ণু ছাড়া অন্য কিছুর ধ্যান করে, তারা কোন অলীক ছায়ামূর্তির দর্শন করার আশায় অনর্থক সময় নষ্ট করে থাকে। কিন্তু যাঁরা পরমার্থ সাধনের প্রয়াসী, তাঁরা কেবল ভগবদ্ভক্তিই আকাঙক্ষা করেন-সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। এটিই হচ্ছে যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৬২-৬৩

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

ধ্যায়তঃ-ধ্যান করতে করতে; বিষয়ান্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; পুংসঃ-মানুষের; সঙ্গঃ-আসক্তি; তেষু-ইন্দ্রিয়-বিষয়ে; উপজায়তে-উৎপন্ন হয়; সঙ্গাৎ-আসক্তি থেকে; সঞ্জায়তে-সঞ্জাত হয়; কামঃ-কাম; কামাৎ-কাম থেকে; ক্রোধঃ-ক্রোধ; অভিজায়তে জন্মায়; ক্রোধাৎ-ক্রোধ থেকে; ভবতি-হয়; সম্মোহঃ-পূর্ণ মোহ; সম্মোহাৎ-সম্মোহ থেকে; স্মৃতি-স্মৃতির; বিভ্রমঃ-বিভ্রান্তি; স্মৃতিভ্রংশাৎ-স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার ফলে; বুদ্ধিনাশঃ-সৎ-অসৎ বিচারবুদ্ধির বিনাশ; বুদ্ধিনাশাৎ-বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে; প্রণশ্যতি-অধঃপতিত হয়।

গীতার গান

শুষ্ক বৈরাগ্য যে আর বিষয়েতে ধ্যান।
ক্রমে ক্রমে সঙ্গ সেই হয় আগুয়ান ॥
সঙ্গ ক্রমে কাম হয় কামে ক্রোধ হয়।
ক্রোধে সম্মোহন পরে বিভ্রম বাড়ায় ।।
স্মৃতি ভ্রষ্ট হলে পরে বুদ্ধিনাশ হয়।
বৈরাগীর সর্বনাশ সেই সে পর্যায় ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ, মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

যার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়নি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা মাত্রই তার মনে আসক্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিকভাবে নিযুক্ত করা দরকার, তাই সেগুলিকে যখন ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত করা না হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়গুলি জড়-জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। জড়-জগতের সকলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও এর দ্বারা প্রভাবিত-স্বর্গলোকের

অন্যান্য দেব-দেবীদের তো কোন কথাই নেই। জড় জগতের এই গোলক-ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়া। এক সময় মহাদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, পার্বতী যখন কামার্ত হয়ে তাঁর সঙ্গ কামনা করেন, তখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তিনি পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন, ফলে কার্তিকের জন্ম হয়। ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর হরিদাসও এভাবে স্বয়ং মায়াদেবীর দ্বারা প্রলুব্ধ হন, কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে তিনি অনায়াসে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীযামুনাচার্যের লেখা পূর্বোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, নিষ্ঠাবান ভক্ত ভগবানের দিব্য সাহচার্য লাভ করে এক অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ লাভ করেন, যার ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিহার করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে মন আপনা থেকেই আসক্তি রহিত হয়ে পড়ে এবং হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্তি ছাড়া জোর করে ইন্দ্রিয়-দমন করার চেষ্টা করলে তা কখনই ফলপ্রসূ হয় না, কারণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সামান্য চিন্তার ফলে সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়ে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় মন উন্মত্ত হয়ে ওঠে।
শ্রীল রূপ গোস্বামী আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন-

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৫৬)

ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হলে ভক্ত বুঝতে পারেন, সব কিছু দিয়েই ভগবানের সেবা করা যায়। যারা ভগবৎ-তত্ত্ব জানে না, তারা কৃত্রিম উপায়ে জড় বিষয়বস্তু পরিহার করার চেষ্টা করে এবং ফলস্বরূপ, যদিও তারা জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কামনা করে, কিন্তু এই রকম শত চেষ্টা করেও তাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় না। তাদের তথাকথিত বৈরাগ্যকে বলা হয় ফল্গু অর্থাৎ অসার। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত জানেন কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে হয়; তাই তিনি আর জড় চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নির্বিশেষবাদীদের মতে, ভগবান অথবা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নিরাকার, তাই তিনি খেতে পারেন না, ভোগও করতে পারেন না। সেই জন্য নির্বিশেষবাদীরা জোর করে ইন্দ্রিয়-দমন করবার অভিপ্রায়ে ভাল খাবার আদি সব রকমের ভোগ পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং ভক্তিভরে যা কিছু নৈবেদ্য তাঁকে নিবেদন করা হয়, তা তিনি ভোজন করেন। তাই, ভক্ত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভগবানের ভোগের জন্য নিবেদন করে, সেই নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তকে তাই জোর করে ইন্দ্রিয়-দমন করতে হয় না। এভাবেই ভগবানকে নিবেদন করার ফলে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে এবং সেই ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে অধঃপতনের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, নির্বিশেষবাদীরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসে সব কিছুই পার্থিব বলে পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু এই ধরনের কৃত্রিম বৈরাগ্যের ফলে তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। সামান্য উত্তেজনাতেই তাই তাদের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তারা জড় জগতের আবর্তে পতিত হয়। সেই জন্যই এই সমস্ত মুক্তিকামীরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেও, ভগবদ্ভক্তির অবলম্বন না থাকার ফলে, আবার জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়।

শ্লোক ৬৪

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

রাগ-আসক্তি; দ্বেষ-বিদ্বেষ; বিমুক্তৈঃ-যিনি মুক্ত হয়েছেন; তু-কিন্তু; বিষয়ান্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইন্দ্রিয়ৈঃ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; চরন-আচরণ করে; আত্মবশ্যৈঃ-স্বীয় বশীভূত; বিধেয়াত্মা-সংযতচিত্ত মানুষ, প্রসাদম্-ভগবানের রূপা; অধিগচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

অতএব রাগ দ্বেষ নাহি যাঁর অতি।
মুক্ত যেবা হইয়াছে বিষয়ের গতি ॥
চিত্ত প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণার্পিত মন।
বিষয়ে থাকিয়া তিনি জীবন্মুক্ত হন ॥

অনুবাদ

সংযতচিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, হঠযোগ আদি কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা সম্ভব হলেও, ভগবানের সেবায় তাদের নিযুক্ত না করলে, প্রতি মুহূর্তে মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় ভগবানের ভক্তকে আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়াসক্ত বলে মনে হলেও, ভগবানের প্রতি নির্মল ভক্তি লাভ করার ফলে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কার্যকলাপের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি থাকে না। ভগবানের প্রতি ভালবাসা এতই গভীর যে, আর কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন রকম মোহ থাকে না। ভগবানের প্রেমামৃতের আস্বাদন অর্জন করার ফলে বিষয়-বিষের প্রতি তাঁর আর আসক্তি থাকে না। ভগবানের ভক্তের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, কিভাবে তিনি ভগবানের সেবা করবেন, কিভাবে ভগবানকে তুষ্ট করবেন, এ ছাড়া আর কোন বিষয়েই তিনি চিন্তা করেন না। তাই তিনি সমস্ত রকমের আসক্তি ও নিরাসক্তির অতীত। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে কেবল তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি চান, তবে তিনি এমন কাজও করেন, যার জন্য সারা জগৎ তাঁকে নিন্দা করতে পারে। আবার শ্রীকৃষ্ণ না চাইলে তিনি তাঁর অবশ্য করণীয় কর্মও পরিত্যাগ করেন। কর্তব্যকর্ম সাধন সাধারণত নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছার উপরে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কেবল ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে চলেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে ভক্ত এই ধরনের শুদ্ধ চেতনা লাভ করেন, যার ফলে কোন রকম জড় কলুষময় পরিবেশে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকলেও কোন কলুষতা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ৬৫

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে-ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করার ফলে; সর্ব-সমস্ত; দুঃখানাম্-জড় দুঃখের; হানিঃ-বিনাশ; অস্য-তাঁর; উপজায়তে হয়; প্রসন্নচেতসঃ-প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির; হি-অবশ্যই;

আশু-অতি শীঘ্র; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; পরি-সর্বতোভাবে; অবতিষ্ঠতে-স্থির হয়।

গীতার গান

পরমানন্দ সুখ যেই প্রসাদ তার নাম ।
যাহার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান ॥
সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত।
আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি তার জগতে বিদিত ॥

অনুবাদ

চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না; এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়।

শ্লোক ৬৬

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ন অস্তি-থাকতে পারে না; বুদ্ধিঃ-চিন্ময় বুদ্ধি; অযুক্তস্য-যে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়; ন-না; চ-এবং; অযুক্তস্য-কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তির; ভাবনা-সুখের চিন্তায় মগ্নচিত্ত; ন-না; চ-এবং; অভাবয়তঃ-পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির; শান্তিঃ-শান্তি, অশান্তস্য-শান্তিরহিত ব্যক্তির; কুতঃ-কোথায়; সুখম্-সুখ।

গীতার গান

জীবের স্বরূপ হয় আনন্দেতে মতি।
বুদ্ধিযোগ বিনা তার কোথায় বা গতি ॥
অতএব সে ভাবনা নাহি যার স্থিতি।
কোথা শান্তি তার বল সুখের প্রগতি ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এই রকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়?

তাৎপর্য

ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করলে কোন মতেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। ভগবান নিজেই পঞ্চম অধ্যায়ে (৫/২৯) প্রতিপন্ন করেছেন যে, যখন কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, কৃষ্ণই হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার একমাত্র ভোক্তা, তিনিই সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের অধীশ্বর এবং তিনিই সমস্ত জীবের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, তবেই সে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে। তাই, যে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তার জীবনের কোন চরম উদ্দেশ্যই থাকে না। জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, তা না জানাই তার সমগ্র অশান্তির কারণ। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা, অধীশ্বর ও সর্বভূতের পরম সুহৃদ্, তখন তার মন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় একাগ্র হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সে প্রকৃত শান্তি লাভ করে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত হয়ে যে তার সময় অতিবাহিত করে, সে যতই লোক দেখানো তথাকথিত শান্তি ও পারমার্থিক প্রগতির বুলি আওড়াক না কেন, সে সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত ও অশান্ত। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে একটি স্বয়ং-প্রকাশিত

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ গড়ে তোলার মাধ্যমেই লাভকরা যায়।

শ্লোক ৬৭

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্-ইন্দ্রিয়সমূহের; হি-নিশ্চিতভাবে; চরতাম্-বিচরণকালে; যৎ-যার দ্বারা; মনঃ-মন; অনুবিধীয়তে-সদা অনুসরণ করে; তৎ-তা; অস্য-তার; হরতি-হরণ করে; প্রজ্ঞাম্-বুদ্ধিকে; বায়ুঃ-বায়ু; নাবম্-নৌকা; ইব-মতো; অম্ভসি-জলে।

গীতার গান

ইন্দ্রিয় চালিত করি মনোধর্মে স্থিতি।
বায়ুর মধ্যেতে যথা নৌকার প্রগতি ॥
সে নৌকা যেমন সদা টলমল করে।
অযুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা সেইরূপ হরে ।

অনুবাদ

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে, তেমনই সদা বিচরণকারী যে কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত যদি তাঁর সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না করেন, যদি তাঁর কোন একটি ইন্দ্রিয়ও জড় সুখ উপভোগ করার প্রয়াসী হয়, তা হলেও তাঁর মন ভগবানের শ্রীচরণকমল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, ফলে তাঁর পারমার্থিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। মহারাজ অম্বরীষের ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে আমরা শিক্ষা পাই, তাঁর মতো আমাদেরও সব কয়টি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তা হলেই মন একাগ্র হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে সমাধিস্থ হবে, কেন না সেটিই হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যথার্থ কৌশল।

শ্লোক ৬৮

তস্মাদ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

তস্মাৎ-অতএব; যস্য-খাঁর; মহাবাহো-হে মহাবীর; নিগৃহীতানি-নিবৃত্ত হওয়ার ফলে; সর্বশঃ-সর্ব প্রকারে; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ-ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; তস্য-তাঁর; প্রজ্ঞা-প্রজ্ঞা; প্রতিষ্ঠিতা-স্থির।

গীতার গান

অতএব মহাবাহো শুন মন দিয়া ।
নিগৃহীত মন যাঁর আমারে সঁপিয়া ॥

তাঁহার ইন্দ্রিয় বশ মোরে সমর্পিত।
তাঁহারই প্রজ্ঞা হয় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

সুতরাং, হে মহাবাহো। যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-তর্পণের বেগগুলিকে দমন করা যায়। যেমন উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ করে শত্রুদের দমন করা যায়, ইন্দ্রিয়গুলিকে তেমনই উপায়ে দমন করতে হয়-কোনও মানবিক প্রচেষ্টায় তা হয় না। সেগুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত রাখার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এই সত্য যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাই মানুষকে পরিশুদ্ধ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এনে দেয় এবং কোন সদগুরুর পথনির্দেশ মতোই সেই পদ্ধতির অনুশীলন করতে হয়, তাঁকেই বলা হয় সাধক, অর্থাৎ তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার যোগ্য পাত্র।

শ্লোক ৬৯

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যা-যা; নিশা-রাত্রি; সর্ব-সমস্ত; ভূতানাম্-জীবদের; তস্যাম্-তাতে; জাগর্তি-জাগ্রত থাকেন; সংযমী-আত্মসংযমী; যস্যাম্-যাতে; জাগ্রতি-জাগ্রত থাকেন; ভূতানি-সমস্ত জীব; সা-তা; নিশা-রাত্রি; পশ্যতঃ-তত্ত্বদর্শী; মুনে-মননশীল ব্যক্তির পক্ষে।

গীতার গান

বিষয়ী বিষয়ে নিষ্ঠা করে সে প্রচুর।
সর্বদা জাগ্রত সেই সদা ভরপুর ॥
সংযমীর সেই চেষ্টা নিশার সমান।
সংযমী জাগ্রত থাকে আত্মবিষয়ান ॥
বিষয়ীর সেই আত্মা রাত্রির সমান।
উভয়ের কার্য হয় বহু ব্যবধান ।।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্ম-বুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, তখন তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তা রাত্রিস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই জগতে দুই রকমের বুদ্ধিমান লোক আছে। এক ধরনের বুদ্ধিমান লোক ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে খুব উন্নতি লাভ করে, আর অন্য ধরনের বুদ্ধিমানেরা আত্মানুসন্ধানী এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সদা জাগ্রত। আত্মানুসন্ধানী সাধু বা চিন্তাশীল মানুষের কাজকর্ম জড়-জাগতিক ভাবে আচ্ছন্ন মানুষদের কাছে যেন রাত্রির অন্ধকার বলে মনে হয়। আত্ম-উপলব্ধি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই জড়-জাগতিক

মানুষেরা তেমন রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী মুনি জড়-জাগতিক মানুষদের রাত্রিতে অজাগ থাকেন। সেই সময় সাধুজন আধ্যাত্মিক চর্চায় ক্রমশ অগ্রগতির পথে অপ্রাকৃত আনন্দ উপলব্ধি করেন, আর তখন সংসারী লোক রাত্রিতে ঘুমিয়ে থেকে নানা রকম ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে সে কখনও নিজেকে সুখী মনে করে, কখনও ঘুমের ঘোরে দুঃখীও মনে করে। এই সমস্ত জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তি সর্বদাই উদাসীন থাকেন। তিনি জড়-জাগতিক প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে আত্ম-উপলব্ধির কাজে সচেষ্ট থাকেন।

শ্লোক ৭০

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

আপূর্যমাণম্ সর্বদা পূর্ণ; অচলপ্রতিষ্ঠম্-স্থির; সমুদ্রম্-সমুদ্রে; আপঃ-জলরাশি; প্রবিশন্তি-প্রবেশ করে; যদ্বৎ-যেমন; তদ্বৎ-তেমন; কামাঃ-কামনাসমূহ; যম্-যার মধ্যে; প্রবিশন্তি-প্রবেশ করে; সর্বে-সমস্ত; সঃ-সেই ব্যক্তি; শান্তিম্-শান্তি; আপ্নোতি-লাভ করেন; ন-না; কামকামী-বিষয়কামী ব্যক্তি।

গীতার গান

সমুদ্রে নদীর জল যেমন প্রবেশ।
বিচলিত নহে সেই সদা নির্বিশেষ ॥
সেইভাবে মনে যার কামের চালনা ।
সে শান্তি পাইবে ফল শান্তির সাধনা ॥

অনুবাদ

বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি লাভ করে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহও তেমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও তাঁকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না, অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যদিও মহাসমুদ্র সব সময় জলে পূর্ণ থাকে এবং বর্ষার সময় নদীবাহিত হয়ে আরও জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্তু সমুদ্রের কোনও পরিবর্তন হয় না-স্থির থাকে; সমুদ্র তখনও বিক্ষুব্ধ হয় না, এমন কি বেলাভূমি অতিক্রম করে প্লাবিত হয় না। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন কৃষ্ণভক্তও সর্ব অবস্থাতেই তেমনই অবিচল থাকেন। যতক্ষণ মানুষ জড় দেহ নিয়ে আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য দেহের চাহিদাও থাকবেই। কিন্তু ভগবানের ভক্ত তাঁর পূর্ণতার জন্য এই সমস্ত কামনা-বাসনার দ্বারা কখনই বিচলিত হন না। কারণ, কৃষ্ণভক্তের কোন কিছুরই অভাব নেই, ভগবান তাঁর সমস্ত অভাব মোচন করেছেন। তাই তিনি সমুদ্রের মতো-নিজের মধ্যেই সর্বদা পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়ের নদী বেয়ে কামনা-বাসনার যত জলই তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করুক, তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মতোই অবিচলভাবে পরিপূর্ণ থাকে। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ-জড় জগতের ভোগবাসনার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, যদিও বাসনাগুলি তাঁর মধ্যে রয়েছে। ভগবানের সেবায় গভীরভাবে মগ্ন থাকার ফলে তিনি যে

শান্তি লাভ করেছেন, তা সমুদ্রের মতোই অতলস্পর্শী। কোন কিছুই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে, অন্যেরা, এমন কি যারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষী-জাগতিক সাফল্যের আকাঙ্ক্ষীদের কি আর কথা, তারাও সর্বদাই অশান্ত। সকাম কর্মী, মুক্তিকামী ও সিদ্ধিকামী যোগী-সকলেই অশান্ত, যেহেতু তাদের অপূর্ণ বাসনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে পরম শান্তি লাভ করে থাকেন, তাঁর কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না। বাস্তবিকপক্ষে, তিনি এমন কি জড় জগতের তথাকথিত বন্ধন থেকে মুক্তির কামনাও করেন না। কৃষ্ণভক্তদের কোন জড় কামনা থাকে না, তাই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শান্ত।

শ্লোক ৭১

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

বিহায়-ত্যাগ করে; কামান্-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাসমূহ; যঃ-যে ব্যক্তি; সর্বান্-সমস্ত; পুমান্-পুরুষ; চরতি-বিচরণ করেন; নিঃস্পৃহঃস্পৃহাশূন্য; নির্মমঃ -মমত্ববোধ রহিত, নিরহঙ্কারঃ-অহঙ্কারশূন্য; সঃ-তিনি; শান্তিম্-প্রকৃত শান্তি, অধিগচ্ছতি-প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

কাম ছাড়ি সব যেবা নিস্পৃহ ধীমান্ ।
সর্বত্র ভ্রমণ করে নারদীয় গান ॥
মমতাবিহীন আর অহঙ্কার নাই।
তার শান্তি বিনিশ্চিত সেইত গোঁসাই ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভকরেন।

তাৎপর্য

নিষ্কাম হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন কিছু কামনা না করা। পক্ষান্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার কামনাই হচ্ছে নিষ্কামনা। এই জড় দেহটিকে বৃথাই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলে না ভেবে এবং জগতের কোনও কিছুর উপরে বৃথা মালিকানা দাবি না করে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে নিজের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাটাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পরিশুদ্ধ পর্যায়। এই পরিশুদ্ধ পর্যায়ে যে উন্নীত হতে পারে, সে বুঝতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর, তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সব কিছুই তাঁর সেবায় উৎসর্গ করা উচিত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে নারাজ হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপার ফলে তিনি যখন পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হলেন, তখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। নিজের জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা অর্জুনের ছিল না, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার কথা জেনে সেই একই অর্জুন যথাসাধ্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভগবানকে সন্তুষ্ট করার বাসনাই হচ্ছে বাসনা রহিত হওয়ার একমাত্র উপায়। কোন রকম কৃত্রিম উপায়ে কামনা-বাসনাগুলিকে জয় করা যায় না। জীব কখনই ইন্দ্রিয়া-নুভূতিশূন্য অথবা বাসনা রহিত হতে পারে না। তবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য

সে তাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে। জড়-জাগতিক বাসনাশূন্য মানুষ অবশ্যই বোঝেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের (ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্) এবং সেই জন্য তিনি কোন কিছুর উপরেই মালিকানা দাবি করেন না। এই পারমার্থিক জ্ঞান আত্ম-উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, তখন যথাযথভাবে বোঝা যায় যে, চিন্ময় স্বরূপে প্রত্যেকটি জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাই জীবের নিত্য স্থিতি কখনই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড় নয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের এই সত্য উপলব্ধি করাই হচ্ছে প্রকৃত শান্তি লাভের মূল নীতি।

শ্লোক ৭২

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

এষা-এই; ব্রাহ্মী-চিন্ময়; স্থিতিঃ-স্থিতি; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ন-না; এনাম্-এই; প্রাপ্য-লাভ করে; বিমুহ্যতি-বিমোহিত হন; স্থিত্বা-স্থিত হয়ে; অস্যাম্-এতে; অন্তকালে-জীবনের অন্তিম সময়ে; অপি-ও; ব্রহ্মনির্বাণম্-জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তর; ঋচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

সেই সে স্মৃতির নাম ব্রাহ্মীস্থিতি হয়।
যাঁর প্রাপ্তি হয় তাঁর মোহন কোথায় ॥
সেই স্থিতি যদি হয় মরণের কালে।
ব্রহ্মস্থিতি ভাব নহে কালের কবলে ॥

অনুবাদ

এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। হে পার্থ! যিনি এই স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবনের অন্তিম সময়ে এই স্থিতি লাভ করে, তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ ভগবৎ-পরায়ণ দিব্য জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে লাভ করা সম্ভব, আবার লক্ষ-কোটি জীবনেও তার নাগাল পাওয়া সম্ভব না হতেও পারে। এই জীবন লাভ করতে হলে কেবল পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তাকে গ্রহণ করতে হবে। খট্টাঙ্গ মহারাজ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে ভগবানের চরণারবিন্দে আত্মোৎসর্গ করার ফলে জীবনের সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। নির্বাণ কথাটির অর্থ হচ্ছে জড় জীবনের সমাপ্তি। বৌদ্ধদের মতে জড় জীবনের সমাপ্তি হলে আত্মা অসীম শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। ভগবদ্গীতা কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষা দেয় না। এই জড় জীবনের সমাপ্তি হবার পরে আমাদের প্রকৃত জীবন শুরু হয়। এই জড়-জাগতিক জীবনধারা পরিসমাপ্ত করতে হবে, সেই কথাটি জানাই স্থূল জড়বাদীর পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যিনি পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি জানেন যে, এই জড় জীবনের পরেও আর একটি জীবন আছে। এই জীবনের পরিসমাপ্তির পূর্বে, সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মনির্বাণ স্তর লাভ করে। ভগবৎ-ধাম ও ভগবৎ-সেবার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যেহেতু উভয়ই চিন্ময়, তাই ভক্তিযোগে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়াই হচ্ছে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তি। জড় জগতের সমস্ত কর্মই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য

সাধিত হয়, কিন্তু চিন্ময় জগতের সমস্ত কর্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সাধিত হয়। এমন কি এই জীবনে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং যিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তিনি নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যেই ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেছেন। ব্রহ্ম হচ্ছে জড় বস্তুর ঠিক বিপরীত। তাই ব্রাহ্মী স্থিতি বলতে বোঝায় 'জড়-জাগতিক স্তরের অতীত'। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা নিবেদনকে ভগবদ্গীতায় মুক্ত স্তররূপে স্বীকার করা হয়েছে (স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়কে সমগ্র ভগবদ্গীতার সারাংশ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমগ্র গীতার সারমর্ম-স্বরূপ ভক্তিযোগের আভাস দেওয়া হয়েছে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগতপ্রাণ ॥

ইতি-গীতার বিষয়বস্তুর সারমর্ম পরিবেশিত বিষয়ক 'সাংখ্য-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় - কর্মযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ' কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ৷ ১ ৷

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; জ্যায়সী-শ্রেয়তর; চেৎ-যদি; কর্মণঃ-সকাম কর্ম অপেক্ষা; তে-তোমার; মতা মতে; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; জনার্দন-হে শ্রীকৃষ্ণ; তৎ-তা হলে; কিম্-কেন; কর্মণি-কর্মে; ঘোরে ভয়ানক; মাম্-আমাকে; নিয়োজয়সি-নিযুক্ত করছ; কেশব-হে শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
যদি বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ ওহে জনার্দন।
ঘোর যুদ্ধে নিয়োজিত কর কি কারণ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে জনার্দন। হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, তা হলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছ?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে জড় জগতের দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করবার জন্য আত্মার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন-সেই পথ হচ্ছে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা। কখনও কখনও এই বুদ্ধিযোগের কদর্থ করে একদল নিষ্কর্মা লোক কর্ম-বিমুখতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষ্ণভাবনার নাম করে তারা নির্জনে বসে কেবল হরিনাম জপ করেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার দুরাশা করে। কিন্তু যথাযথভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা লাভ না করে নির্জনে বসে কৃষ্ণনাম জপ করলে নিরীহ, অজ্ঞ লোকের সস্তা বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। অর্জুনও প্রথমে বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার নামান্তর বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন, নির্জন অরণ্যে কৃষ্ণসাধনা ও তপশ্চর্যার জীবনযাপন করবেন। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণভাবনার অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান শিষ্যের মতো যখন তিনি তাঁর গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁকে কর্মযোগ বা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনান।

শ্লোক ২

ব্যামিশ্রেণের বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্ ॥ ২॥

ব্যামিশ্রেণ-দ্বার্থবোধক; ইব-যেন; বাক্যেন-বাক্যের দ্বারা; বুদ্ধিম্-বুদ্ধি; মোহয়সি-মোহিত করছ; ইব-মতো; মে-আমার; তৎ-অতএব; একম্-একমাত্র; বদ-দয়া করে বল; নিশ্চিত্য-নিশ্চিতভাবে; যেন-যার দ্বারা; শ্রেয়ঃ -প্রকৃত কল্যাণ; অহম্-আমি; আপ্লুয়াম্ লাভ করতে পারি।

গীতার গান

দ্বর্থক কথায় বুদ্ধি মোহিত যে হয়।
নিশ্চিত যা হয় কহ শ্রেয় উপজয় ॥

অনুবাদ

তুমি যেন দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করছ। তাই, দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে বল কোন্টি আমার পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয়স্কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার ভূমিকাস্বরূপ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, নিষ্কাম কর্ম, কনিষ্ঠ ভক্তের স্থিতি আদি বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি সবই অসম্বদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং উপলব্ধির জন্য যথাযথ পন্থা-প্রণালী সম্পর্কিত বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত নির্দেশাবলী একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে অর্জুন সাধারণ মানুষের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন, যাতে সাধারণ মোহাচ্ছন্ন মানুষেরাও ভগবানের উপদেশাত্মক বাণীর যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। ভগবৎ-তত্ত্বের যথার্থ অর্থ না বুঝতে পেরে অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কুতার্কিকদের মতো কথার জাল বিস্তার করে ভগবান অর্জুনকে বিভ্রান্ত করতে চাননি। নিষ্ক্রিয়তা অথবা সক্রিয় সেবা-কোনভাবেই অর্জুন কৃষ্ণভাবনামৃতের

পন্থা অনুসরণ করতে পারছিলেন না। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনাময় পথ সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যে ভগবানের অনুপ্রেরণায় অর্জুন নানা রকম প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যাতে ভগবদ্গীতার রহস্য উপলব্ধি করার জন্য যাঁরা গভীরভাবে আগ্রহী, তাঁদের সুবিধা হয়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; লোকে-জগতে; অস্মিন্-এই; দ্বিবিধা-দুই প্রকার; নিষ্ঠা নিষ্ঠা; পুরা-ইতিপূর্বে; প্রোক্তা-উক্ত হয়েছে; ময়া-আমার দ্বারা; অনঘ-হে নিষ্পাপ; জ্ঞানযোগেন-জ্ঞানযোগের দ্বারা; সাংখ্যানাম্-অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিকদের; কর্মযোগেন-ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা; যোগিনাম্-ভক্তদের।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেনঃ
দ্বিবিধ লোকের নিষ্ঠা বলেছি তোমারে।
সাংখ্য আর জ্ঞানযোগ যোগ্য অধিকারে ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ আত্ম-উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান।

তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯তম শ্লোকে ভগবান সাংখ্য-যোগ ও কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ-এই দুটি পন্থার ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্লোকে ভগবান তারই বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য-যোগ চেতন ও জড়ের প্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক বিষয়বস্তু। যে সমস্ত মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে চায়, তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই সাংখ্য-যোগ। অন্য পন্থাটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা বা বুদ্ধিযোগ, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান ৩৯তম শ্লোকেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করলে অতি সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অধিকন্তু এই পন্থায় কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ৬১তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করাই হচ্ছে বুদ্ধিযোগ এবং তার ফলে দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই সংযত হয়। তাই, এই দুটি যোগই ধর্ম ও দর্শনরূপে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা-কল্পনা। অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সত্যকে জানবার সাধনা করছেন, তাঁরাও অবশেষে কৃষ্ণভাবনায় এসে উপনীত হন। ভগবদ্গীতায়ও এই কথা বলা হয়েছে। সমগ্র পন্থাটি হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা। পরোক্ষ পন্থাটি হচ্ছে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে সে

কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উপনীত হতে পারে; আর অন্য পন্থাটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য, পরমেশ্বর বলে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে
আমাদের সনাতন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা। এই দুটির মধ্যে কৃষ্ণভাবনার পন্থাই শ্রেয়, কেন না এই পন্থা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলির শুদ্ধিকরণের উপর নির্ভরশীল নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত স্বয়ং শুদ্ধিকরণের পন্থা এবং কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অন্তরকে কলুষমুক্ত করে। ভক্তি নিবেদনের প্রত্যক্ষ পন্থারূপে এই পথ সহজ ও উচ্চস্তরের।

শ্লোক ৪

ন কর্মণামনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ন-না; কর্মণাম্-শাস্ত্রীয় কর্মের; অনারম্ভাৎ-অনুষ্ঠান না করে; নৈষ্কর্ম্যম্-কর্মফল থেকে মুক্তি; পুরুষঃ-মানুষ; অশ্নুতে-লাভ করে; ন-না; চ-ও; সন্ন্যসনাৎ-কর্মত্যাগের দ্বারা; এব-কেবল; সিদ্ধিম্ সাফল্য; সমধিগচ্ছতি-লাভ করে।

গীতার গান

বিহিত কর্মের নিষ্ঠা না করি আরম্ভ।
নৈষ্কর্ম জ্ঞান যে চর্চা হয় এক দম্ভ ।।
বিহিত কর্মের ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি নয়।
কেবল সন্ন্যাসে কার্যসিদ্ধি নাহি হয় ॥

অনুবাদ

কেবল কর্মের অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিধি-নিষেধের আচরণ করার ফলে যখন অন্তর পবিত্র হয় এবং জড় বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে যায়, তখন মানুষ সর্বত্যাগী জীবনধারায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার যোগ্য হয়। অন্তর পবিত্র না হলে-সম্পূর্ণভাবে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত না হলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন মানেই হয় না। মায়াবাদী জ্ঞানীরা মনে করে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্রই অথবা সকাম কর্ম পরিহার করা মাত্রই তারা তৎক্ষণাৎ নারায়ণের মতো ভগবান হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তা অনুমোদন করছেন না। অন্তর পবিত্র না করে, জড় বন্ধন মুক্ত না হয়ে সন্ন্যাস নিলে, তা কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাতেরই সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তবে তাঁর বর্ণ ও আশ্রমজনিত ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, ভগবান নিজেই সেই কথা বলেছেন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এই ধর্মের স্বল্প আচরণ করলেও জড় জগতের মহাভয় থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়।

শ্লোক ৫

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

ন-না; হি-অবশ্যই; কশ্চিৎ-কেউ; ক্ষণম্-ক্ষণ মাত্রও; অপি-ও; জাতু-কখনও; তিষ্ঠতি-থাকতে পারে; অকর্মকৃৎ-কর্ম না করে; কার্যতে-করতে বাধ্য হয়; হি-অবশ্যই; অবশঃ-অসহায়ভাবে; কর্ম-কর্ম; সর্বঃ-সকলে; প্রকৃতিজৈঃ -প্রকৃতিজাত; গুণৈঃ-গুণসমূহের দ্বারা।

গীতার গান

ক্ষণেক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম।
থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম ॥
প্রকৃতির গুণ যথা সবার নির্বন্ধ।
সেই কার্য করে যাতে করমের বন্ধ ॥

অনুবাদ

সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়; তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

কর্তব্যকর্ম না করে কেউই থাকতে পারে না। আত্মার ধর্মই হচ্ছে সর্বক্ষণ কর্মরত থাকা। আত্মার উপস্থিতি না থাকলে জড় দেহ চলাফেরা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জড় দেহটি একটি নিষ্প্রাণ গাড়ি মাত্র, কিন্তু সেই দেহে অবস্থান করে আত্মা সর্বক্ষণ তাকে সক্রিয় রাখার কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে এবং এই কর্তব্যকর্ম থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হতে পারে না। সেই হেতু, জীবাত্মাকে কৃষ্ণভাবনার মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত করতে হয়, তা না হলে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবাত্মা অনিত্য জড়-জাগতিক কর্মে ব্যাপৃত থাকে। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাই এই জড় গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হবার জন্য শাস্ত্র-নির্ধারিত কর্মের আচরণ করতে হয়। কিন্তু আত্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত হয়, তখন সে যা করে, তার পক্ষে তা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) বলা হয়েছে-

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যদি কেউ কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করে এবং তখন সে যদি শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না মেনেও চলে অথবা তার স্বধর্ম পালনও না করে, এমন কি সে যদি অধঃপতিত হয়, তা হলেও তার কোন রকম ক্ষতি বা অমঙ্গল হয় না। কিন্তু সে যদি পবিত্র হবার জন্য শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত আচার-আচরণ পালনও করে, তাতে তার কি লাভ, যদি সে কৃষ্ণভাবনাময় না হয়?" সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার জন্যই শুদ্ধিকরণের পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই, সন্ন্যাস আশ্রমের অথবা যে-কোন চিত্তশুদ্ধি করণ পন্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা। তা না হলে সব কিছুই নিরর্থক।

শ্লোক ৬

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি-পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়; সংযমা-সংযত করে; যঃ-যে; আস্তে-অবস্থান করে; মনসা-মনের দ্বারা; স্মরন্-স্মরণ করে; ইন্দ্রিয়ার্থান্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; বিমূঢ়-মূঢ়; আত্মা-আত্মা; মিথ্যাচারঃ-কপটাচার; সঃ-তাকে; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মরণ।
ইহা নাহি চিত্তশুদ্ধি নৈষ্কর্ম কারণ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রেতে কহয় ॥
অতএব সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অনেক মিথ্যাচারী আছে, যারা কৃষ্ণভাবনাময় সেবাকার্য করতে চায় না, কেবল ধ্যান করার ভান করে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় না। কারণ, তারা তাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে রোধ করলেও মন তাদের সংযত হয় না। পক্ষান্তরে, মন অত্যন্ত তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখের জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। তারা লোক ঠকানোর জন্য দুই-একটি তত্ত্বকথাও বলে। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা জানতে পারছি যে, তারা হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রতারক। বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করেও মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে মানুষ যখন তার স্বধর্ম পালন করে, তখন ক্রমে ক্রমে তার চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যোগী সেজে লোক ঠকায়, সে আসলে ত্যাগীর বেশ ধারণ করে ভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের প্রতারক। মাঝে মাঝে দুই-একটি তত্ত্বকথা বলে সরলচিত্ত সাধারণ মানুষের কাছে তার তত্ত্বজ্ঞান জাহির করতে চায়, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সেগুলি তোতাপাখির মতো মুখস্থ করা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে ঐ ধরনের পাপাচারী প্রতারকদের সমস্ত জ্ঞান অপহরণ করে নেন। এই প্রকার প্রতারকের মন সর্বদাই অপবিত্র এবং সেই জন্য তার তথাকথিত লোকদেখানো ধ্যান নিরর্থক।

শ্লোক ৭

যস্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

যঃ-যিনি; তু-কিন্তু; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; মনসা-মনের দ্বারা; নিয়ম্য-সংযত করে; আরভতে-আরম্ভ করেন; অর্জুন-হে অর্জুন; কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ-কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; কর্মযোগম্-কর্মযোগ, অসক্তঃ-আসক্তি রহিত; সঃ-তিনি; বিশিষ্যতে বিশিষ্ট হন।

গীতার গান

কিন্তু যদি নিজেন্দ্রিয় সংযত নিয়মে।

কর্মের আরম্ভ করে যথা যথা ক্রমে ॥
বাতুল না হয় মর্কট বৈরাগ্য করি।
অন্তর্নিষ্ঠা হলে হয় সহায় শ্রীহরি ॥
সেই হয় কর্মযোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ।
আসক্তিরহিত কর্ম বিশেষ প্রকারা ॥

অনুবাদ

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

সাধুর বেশ ধরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও ভোগতৃপ্তির জন্য লোক ঠকানোর চাইতে স্বকর্মে নিযুক্ত থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা শত-সহস্র গুণে ভাল। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। স্বার্থগতি অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় লাভ করা। সমগ্র বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সেই চরম গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম করার ফলে একজন গৃহস্থও ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। আত্ম-উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সংযত জীবনযাপন করে কেউ যখন কর্তব্যকর্ম করে, তখন আর তার কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকে না, কারণ সে তখন আসক্তিরহিত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহভাবে তার কর্তব্যকর্ম করে চলে। এভাবে সংযত ও নিঃস্পৃহ থাকার ফলে তার অন্তর পবিত্র হয় এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়। অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতারণাকারী মর্কট বৈরাগী হবার চাইতে একজন ঐকান্তিক ব্যক্তি যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে অনেক উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। যে-সমস্ত ভণ্ড সাধু লোক ঠকাবার জন্য ধ্যান করার ভান করে, তাদের থেকে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ মেথরও অনেক মহৎ।

শ্লোক ৮

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

নিয়তম্-শাস্ত্রোক্ত; কুরু-কর; কর্ম-কর্ম; ত্বম্-তুমি; কর্ম-কাজ; জ্যায়ঃ-শ্রেয়; হি-অবশ্যই; অকর্মণঃ-কর্মত্যাগ অপেক্ষা; শরীরযাত্রা-দেহধারণ; অপি-এমন কি; চ-ও; তে-তোমার; ন-না; প্রসিদ্ধ্যেৎ-সিদ্ধ হয়; অকর্মণঃ-কর্ম না করে।

গীতার গান

নিয়মিত কর্ম ভাল সেই অকর্ম অপেক্ষা।
অনধিকারীর কর্মত্যাগ, পরমুখাপেক্ষা ॥
শরীর নির্বাহ যার নহে কর্ম বিনা।
কর্মত্যাগ তার পক্ষে হয় বিড়ম্বনা ॥

অনুবাদ

তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর, কেন না কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না।

তাৎপর্য

অনেক ভণ্ড সাধু আছে, যারা জনসমক্ষে প্রচার করে বেড়ায় যে, তারা অত্যন্ত উচ্চ বংশজাত এবং কর্ম-জীবনেও তারা অনেক সাফল্য লাভ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তারা সব কিছু ত্যাগ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রকম ভণ্ড সাধু হতে নিষেধ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁকে শাস্ত্র-নির্ধারিত ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন ছিলেন গৃহস্থ ও সেনাপতি, তাই শাস্ত্র-নির্ধারিত গৃহস্থ-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। এই ধর্ম পালন করার ফলে জড় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের হৃদয় পবিত্র হয় এবং ফলে সে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। তথাকথিত ত্যাগীরা, যারা দেহ প্রতিপালন করবার জন্যই ত্যাগের অভিনয় করে, ভগবান তাদের কোন রকম স্বীকৃতি দেননি, শাস্ত্রেও তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এমন কি দেহ প্রতিপালন করবার জন্যও মানুষকে কর্ম করতে হয়। তাই, জড়-জাগতিক প্রবৃত্তিগুলিকে শুদ্ধ না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই জড় জগতে প্রত্যেকেরই অবশ্য জড়া প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার কলুষময় প্রবৃত্তি আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা আছে। সেই কলুষময় প্রবৃত্তিগুলিকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। শাস্ত্র-নির্দেশিত উপায়ে তা না করে, কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে এবং অন্যের সেবা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তথাকথিত অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী হবার চেষ্টা করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৯

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ-যজ্ঞ বা বিষ্ণুর জন্যই কেবল; কর্মণঃ-কর্ম; অন্যত্র-তা ছাড়া; লোকঃ -এই জগতে; অয়ম্-এই; কর্মবন্ধনঃ-কর্মবন্ধন; তৎ-তাঁর; অর্থম্-নিমিত্ত; কর্ম-কর্ম; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; মুক্তসঙ্গঃ-আসক্তি রহিত হয়ে; সমাচর-অনুষ্ঠান কর।

গীতার গান

যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তোষ লাগিয়া।
নিয়মিত কর্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া ॥
আর যত কর্ম হয় বন্ধের কারণ।
অতএব সেই কার্য কর নিবারণ ॥
ভগবদ্ সন্তোষার্থ কর্মের প্রসঙ্গ।
যত কিছু আচরণ সব মুক্ত সঙ্গ ॥

অনুবাদ

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্মই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ। তাই, হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর এবং এভাবেই তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

তাৎপর্য

যেহেতু দেহ প্রতিপালন করবার জন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম করতে হয়, তাই সমাজের বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্ধারিত করা হয়েছে, যাতে তাদের উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে সাধিত হয়। যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা

যজ্ঞানুষ্ঠানকে বোঝায়। তাই তাঁকে প্রীতি করার জন্যই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে বলা হয়েছে-যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। পক্ষান্তরে, নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ করা আর সরাসরিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করার দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান, কেন না এই শ্লোকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্যও হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে (বিষ্ণু পুরাণ ৩/৮/৮)।
তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। এ ছাড়া আর সমস্ত কর্মই আমাদের এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। সেই কর্ম ভালই হোক আর খারাপই হোক, সেই কর্মের ফল অনুষ্ঠাতাকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে (অথবা শ্রীবিষ্ণুকে) সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কর্ম করতে হয়। এভাবেই যে ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়েছে, সে আর কখনও জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয় না-মুক্ত স্তরে বিরাজিত। এটিই হচ্ছে কর্ম সম্পাদনের মহৎ কৌশল এবং এই পন্থার শুরুর প্রারম্ভে দক্ষ পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে অথবা স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বাবধানে (যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে অর্জুন করেছিলেন) গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই যোগ সাধন করতে হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কিছুই করা উচিত নয়, বরং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত। এভাবেই অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকেই মুক্ত থাকা যায়, তাই নয়-তা ছাড়া ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে ক্রমশ উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে তাঁর সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

শ্লোক ১০

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

সহ-সহ; যজ্ঞাঃ-যজ্ঞাদি; প্রজাঃ-প্রজাসকল; সৃষ্টা-সৃষ্টি করে; পুরা-পুরাকালে; উবাচ বলেছিলেন; প্রজাপতিঃ-সৃষ্টিকর্তা; অনেন-এর দ্বারা; প্রসবিষ্যধ্বম্-উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; এষঃ-এই সকল; বঃ-তোমাদের; অস্ত্র-হোক; ইষ্ট-সমস্ত অভীষ্ট; কামধুক্-প্রদানকারী।

গীতার গান

প্রজাপতি সৃষ্টি করি যজ্ঞের সাধন।
উপদেশ করেছিল শুনে প্রজাগণ ॥
যজ্ঞের সাধন করি সুখী হও সবে।
যজ্ঞদ্বারা ভোগ পাবে ইন্দ্রিয় বৈভবে ॥

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা যজ্ঞাদি সহ প্রজাসকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন-"এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করবে।"

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুঃ এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে মায়াবদ্ধ জীবদের ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই জীবসকল এই জড়া প্রকৃতিতে পতিত

হয়ে জড় বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বেদের বাণী আমাদের এই শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন- বেদৈশ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ভগবান বলছেন যে, বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে-পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। তাই, সমস্ত জীবের ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। শ্রীমদ্ভাগবতেও (২/৪/২০) শ্রীশুকদেব গোস্বামী নানাভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর পতি-

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ ।
পতিগতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥

ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন প্রজাপতি, তিনি সমস্ত জীবের পতি, তিনি সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের পতি, তিনি সমস্ত সৌন্দর্যের পতি এবং তিনি সকলের ত্রাণকর্তা। তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে জীব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তাঁকে তুষ্ট করতে পারে এবং তার ফলে তারা এই জড় জগতে নিরুদ্বিগ্নভাবে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে। তারপর এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর তারা ভগবানের অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করতে পারে। অপার করুণাময় ভগবান মায়াবদ্ধ জীবের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বদ্ধ জীব ক্রমশ কৃষ্ণচেতনা লাভ করে এবং সর্ব বিষয়ে ভগবানের দিব্য গুণাবলী অর্জন করে। বৈদিক শাস্ত্রে এই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম-কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন যাতে এই যুগের সব জীবই এই জড় বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। সংকীর্তন যজ্ঞ এবং কৃষ্ণভাবনা একই সঙ্গে চলবে। কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করবেন, সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে-

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিযাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"এই কলিযুগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মনীষিরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্ষদযুক্ত ভগবান শ্রীগৌরহরির আরাধনা করবেন।" বৈদিক শাস্ত্রে আর যে সমস্ত যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির অনুষ্ঠান করা এই কলিযুগে সম্ভব নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ এত সহজ ও উচ্চস্তরের যে, সকল উদ্দেশ্যে অনায়াসে যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং ভগবদগীতায়ও (৯/১৪) তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১১

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত্র বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাল্যথ ৷ ১১ ॥

দেবান্-দেবতারা; ভাবয়তা-সন্তুষ্ট হয়ে; অনেন-এই যজ্ঞের দ্বারা; তে-সেই; দেবাঃ-দেবতারা; ভাবয়স্তু-প্রীতি সাধন করবেন; বঃ-তোমাদের; পরস্পরম্-পরস্পর; ভাবয়ন্তঃ-প্রীতি সাধন করে; শ্রেয়ঃ-মঙ্গল; পরম্-পরম; অবাল্যথ-লাভ করবে।

গীতার গান

অধিকারী দেবগণ যজ্ঞের প্রভাবে।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখি সবে প্রীত হবে ॥
পরস্পর প্রীতিভাব হলে সম্পাদন।
ভোগের সামগ্রী শ্রেয় নহে অনটন ॥

অনুবাদ

তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন। এভাবেই পরস্পরের প্রীতি সম্পাদন করার মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভকরবে।

তাৎপর্য

ভগবান জড় জগতের দেখাশোনার ভার ন্যস্ত করেছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবের জীবন ধারণের জন্য আলো, বাতাস, জল আদির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ভগবান তাই এই সমস্ত অকাতরে দান করেছেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তির তত্ত্বাবধান করার ভার তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর, যাঁরা হচ্ছেন তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশস্বরূপ। এই সমস্ত দেব-দেবীর প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা নির্ভর করে মানুষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপর। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর তুষ্টি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু তা হলেও সমস্ত যজ্ঞের যজ্ঞপতি এবং পরম ভোক্তারূপে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা-ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্। তাই যজ্ঞপতির চরম তুষ্টবিধান করাই হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্ত যজ্ঞগুলি যখন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দান করেন এবং মানুষের তখন আর কোন অভাব থাকে না।
এভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে ধন-ঐশ্বর্য লাভ হয় ঠিকই, কিন্তু এই লাভগুলি যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যজ্ঞপতি বিষ্ণু যখন প্রীত হন, তখন তিনি জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সব রকমের কার্যকলাপ পরিশুদ্ধ হয়, তাই বেদে বলা হয়েছে-আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বগুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে খাদ্যসামগ্রী শুদ্ধ হয় এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্তা শুদ্ধ হবার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষ লাভের পথ খুঁজে পায়। এভাবেই জীবের চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার পথে অগ্রসর হয়। এই শুদ্ধ চেতনা সুপ্ত হয়ে গেছে বলেই আজকের জগৎ এই রকম বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ১২

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

ইষ্টান্-বাঞ্ছিত; ভোগান্-ভোগ্যবস্তু; হি-অবশ্যই; বঃ-তোমাদের; দেবাঃ-দেবতারা; দাস্যন্তে-দান করবেন; যজ্ঞভাবিতাঃ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে; তৈঃ-তাঁদের দ্বারা; দত্তান্-প্রদত্ত বস্তুসকল; অপ্রদায়-নিবেদন না করে; এভ্যঃ -দেবতাদেরকে; যঃ-যে; ভুক্তে-ভোগ করে; স্তেনঃ-চোর; এব-অবশ্যই; সঃ-সে।

গীতার গান

যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট যে ভোগ।
দেবতারা দেয় সব প্রচুর প্রয়োগ ॥
সেই দত্ত অন্ন যাহা দেবতারা দেয়।
তাঁহাদের না দিয়া খায় চোর সেই হয় ।

অনুবাদ

যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

তাৎপর্য

জীবের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীরা সরবরাহ করছেন। তাই, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এই সমস্ত দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেদে বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে তাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে। মানুষেরা যে বিভিন্ন জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত, সেই অনুসারে বেদে বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, যারা মাংসাশী তাদের জড়া প্রকৃতির বীভৎস-রূপী কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কালীর কাছে পশুবলি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে। সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধীরে ধীরে জড় স্তর অতিক্রম করে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া। সাধারণ লোকদের অন্তত পঞ্চমহাযজ্ঞ নামক পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের বোঝা উচিত যে, মনুষ্য-সমাজে যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই আসছে ভগবানের প্রতিনিধি বিভিন্ন দেব-দেবীদের কাছ থেকে। কোন কিছু তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যেমন, মানব-সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-ফল-মূল, শাক-সবজি, দুধ, চিনি, এগুলির কোনটাই আমরা তৈরি করতে পারি না। তেমনই আবার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি-যেমন উত্তাপ, আলো, বাতাস, জল আদিও কেউ তৈরি করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছার ফলেই সূর্য কিরণ দান করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টির ধারায় ধরণী রসসিক্ত হয়। এগুলি ছাড়া কেউই বাঁচতে পারে না। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান আমাদের দিচ্ছেন। এমন কি, কলকারখানায় আমরা যে সমস্ত জিনিস বানাচ্ছি, তাও তৈরি হচ্ছে ভগবানেরই দেওয়া বিভিন্ন ধাতু, গন্ধক, পারদ, ম্যাঙ্গানীজ আদি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি দিয়ে। আমাদের অগোচরে ভগবান আমাদের সমস্ত প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমরা আত্ম-উপলব্ধির জন্য স্বচ্ছল জীবন যাপন করে জীবনের পরম লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারি, অর্থাৎ যাকে বলা হয় জড়-জাগতিক জীবন-সংগ্রাম থেকে চিরতরে মুক্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে। আমরা যদি জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে ভগবানের দেওয়া সম্পদগুলি কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার করি এবং তার বিনিময়ে ভগবানকে এবং তাঁর প্রতিনিধিদের কিছুই না দিই, তবে তা চুরি করারই সামিল এবং তা যদি আমরা করি, তা হলে প্রকৃতির আইনে আমাদের শাস্তিভোগ করতেই হবে। যে সমাজ চোরের সমাজ, তা কখনই সুখী হতে পারে না, কেন না তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। স্থূল জড়বাদী যে সমস্ত চোরেরা ভগবানের সম্পদ চুরি করে জড় জগৎকে ভোগ করতে উন্মত্ত, তাদের

জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা; যজ্ঞ করে কিভাবে ভগবানের ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করতে হয়, তা তারা জানে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব চাইতে সহজ যজ্ঞ-সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন। এই যজ্ঞ যে কেউ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং তার ফলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত পান করতে পারে।

শ্লোক ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞশিষ্ট-যজ্ঞাবশেষ; অশিনঃ-ভোজনকারী; সন্তঃ-ভক্তগণ; মুচ্যন্তে-মুক্ত হন; সর্ব-সর্ব প্রকার; কিলিষৈঃ-পাপ থেকে; ভুঞ্জতে-ভোগ করে; তে-তারা; তু-কিন্তু; অঘম্-পাপ; পাপাঃ-পাপীরা; যে-যারা; পচন্তি-পাক করে; আত্মকারণাৎ-নিজের জন্য।

গীতার গান

যজ্ঞের সাধন করি অন্ন যেবা খায়।
মুক্তির পথেতে চলে পাপ নাহি হয় ॥
আর যেবা অন্ন পাক নিজ স্বার্থে করে।
পাপের বোঝা ক্রমে বাড়ে দুঃখভোগ তরে ॥

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি' পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।

তাৎপর্য

যে ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত পান করেছেন, তাঁকে বলা হয় সন্ত। তিনি সব সময় ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৮) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে- প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। যেহেতু সন্তগণ সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান গোবিন্দ (আনন্দ প্রদানকারী) অথবা মুকুন্দ (মুক্তিদাতা) অথবা শ্রীকৃষ্ণ (সর্বাকর্ষক পুরুষ)-এর প্রেমে মগ্ন থাকেন, সেই জন্য তাঁরা ভগবানকে প্রথমে অর্পণ না করে কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। তাই, এই ধরনের ভক্তেরা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন আদি বিবিধ ভক্তির অঙ্গের দ্বারা সর্বক্ষণই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁরা কখনই জড় জগতের কলুষতার দ্বারা প্রভাবিত হন না। অন্য সমস্ত লোকেরা, যারা আত্মতৃপ্তির জন্য নানা রকম উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে খায়, শাস্ত্রে তাদের চোর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের সেই খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাপও গ্রহণ করে। যে মানুষ চোর ও পাপী সে কি করে সুখী হতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই, সর্বতোভাবে সুখী হবার জন্য তাদের কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে, এই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি লাভের কোন আশাই নেই।

শ্লোক ১৪

অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্নাৎ-অন্ন থেকে; ভবন্তি-উৎপন্ন হয়; ভূতানি-জড় দেহ; পর্জন্যাৎ-বৃষ্টি থেকে; অন্ন-অন্ন; সম্ভবঃ-উৎপন্ন হয়; যজ্ঞাৎ-যজ্ঞ থেকে; ভবতি-সম্ভব হয়; পর্জন্যঃ-বৃষ্টি; যজ্ঞঃ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান; কর্মশাস্ত্রোক্ত কর্ম; সমুদ্ভবঃ-উদ্ভব হয়।

গীতার গান

অন্ন খেয়ে জীব বাঁচে অন্ন যে জীবন।
সেই অন্ন উৎপাদনে বৃষ্টি যে কারণ ॥
সেই বৃষ্টি হয় যদি যজ্ঞ কার্যে হয় ।
সেই যজ্ঞ সাধ্য হয় কর্মের কারণ ॥

অনুবাদ

অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ভগবদ্গীতার ভাষ্যে লিখেছেন-যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যচ্য তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি, তে সন্তঃ সর্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্বকি দ্বিষৈরনাদিকালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভব-প্রতিবন্ধকৈনিখিলৈঃ পাপৈর্বিমুচ্যন্তে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন যজ্ঞপুরুষ, অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছেন তিনিই। তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেব-দেবীরও ঈশ্বর। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সারা দেহের সেবা করে, ভগবানের অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীরাও তেমন ভগবানের সেবা করেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের ভগবান নিযুক্ত করেছেন জড় জগৎকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে যজ্ঞ করার মাধ্যমে এই সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়। এভাবে সন্তুষ্ট হলে তাঁরা আলো, বাতাস, জল আদি দান করেন, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হলে ভগবানের অংশ-বিশেষ দেব-দেবীরাও সেই সঙ্গে পূজিত হন; তাই তাদের আর আলাদা করে পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। এই কারণে, কৃষ্ণভাবনাময় ভগবানের ভক্তেরা ভগবানকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে তারপর তা গ্রহণ করেন। তার ফলে দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে খাদ্য গ্রহণ করার ফলে শুধু যে দেহের মধ্যে সঞ্চিত বিগত সমস্ত পাপ-কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, জড়া প্রকৃতির সকল কলুষ থেকেও দেহ বিমুক্ত হয়। যখন কোন সংক্রামক ব্যাধি মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগ-প্রতিষেধক টীকা নিলে মানুষ তা থেকে রক্ষা পায়। সেই রকম, ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করার পরে সেই আহার্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে জাগতিক কলুষতার প্রভাব থেকে যথেষ্ট রক্ষা পাওয়া যায় এবং যাঁরা এভাবে অনুশীলন করেন, তাঁদের ভগবদ্ভক্ত বলা হয়। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি, যিনি কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন, তিনি বিগত জড় সংক্রমণগুলিকে প্রতিরোধ করতে পারেন এবং এই সংক্রমণগুলি আত্ম-উপলব্ধির উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। পক্ষান্তরে, যে ভগবানকে নিবেদন না করে কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, তার পাপের বোঝা বাড়তে থাকে এবং তার মনোবৃত্তি অনুসারে সে পরবর্তী জীবনে শূকর ও কুকুরের মতো নিকৃষ্ট পশুদেহ ধারণ করে, যাতে সমস্ত পাপকর্মের ফল ভোগ করতে পারে। এই জড় জগৎ কলুষতাপূর্ণ, কিন্তু

কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করলে সে কলুষমুক্ত হয় এবং সে তার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়। তাই যে তা করে না, সে ভব-রোগের কলুষতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে। খাদ্য-শস্য, শাক-সবজি, ফল-মূলই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত আহার্য, আর পশুরা মানুষের উচ্ছিষ্ট ও ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। যে সমস্ত মানুষ আমিষ আহার করে, তাদেরও প্রকৃতপক্ষে গাছপালার উপরই নির্ভর করতে হয়, কারণ যে পশুমাংস তারা আহার করে, সেই পশুগুলি গাছপালা ও অন্যান্য উদ্ভিদের দ্বারাই পুষ্ট। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতির দান মাঠের ফসলের উপর নির্ভর করেই আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবন ধারণ করি, বড় বড় কলকারখানায় তৈরি জিনিসের উপরে নির্ভর করে নয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি হবার ফলে ক্ষেতে ফসল হয়। এই বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারা। এঁরা সকলেই হচ্ছেন ভগবানের আজ্ঞাবাহক ভৃত্য। তাই, যজ্ঞ করে, ভগবানকে তুষ্ট করলেই তাঁর ভৃত্যেরাও তুষ্ট হন এবং তাঁরা তখন সমস্ত অভাব মোচন করেন। এই যুগের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ, তাই অন্তত পক্ষে খাদ্য সরবরাহের অভাব-অনটন থেকে রেহাই পেতে গেলে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। এই সংকীর্তন যজ্ঞ করলে মানুষের খাওয়া-পরার আর কোন অভাব থাকবে না।

শ্লোক ১৫

কর্ম ব্রহ্মোঙবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ম-কর্ম; ব্রহ্ম-বেদ থেকে; উদ্ভবম্-উদ্ভূত; বিদ্ধি-জানবে; ব্রহ্ম-বেদ; অক্ষর-পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর ভগবান) থেকে; সমুদ্ভবম্-সম্যকরূপে উদ্ভূত; তস্মাৎ-অতএব; সর্বগতম্-সর্বব্যাপক; ব্রহ্ম-ব্রহ্মা; নিত্যম্-নিত্য; যজ্ঞে-যজ্ঞে; প্রতিষ্ঠিতম্-প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

কর্ম যাহা বেদবাণী নহে মনোধর্ম।
বেদবাণী ভগবদুক্তি অক্ষরের কারণ ॥
অতএব কর্ম হয় ঈশ্বরসাধনা।
সর্বগত ব্রহ্মনিত্য যজ্ঞেতে স্থাপনা ॥

অনুবাদ

যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভুত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্যই যে কর্ম করা প্রয়োজন, সেই কথা এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টির জন্যই যখন আমাদের কর্ম করতে হয়, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বেদের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম সাধন করা। বেদে সমস্ত কর্মপদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। যে কর্ম বেদে অনুমোদিত হয়নি, তাকে বলা হয় বিকর্ম বা পাপকর্ম। তাই, বেদের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম করাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, তাতে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। সাধারণ অবস্থায় যেমন মানুষকে রাষ্ট্রের -নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়, তেমনই ভগবানের

নির্দেশে তাঁর পরম রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। বেদের সমস্ত নির্দেশগুলি সরাসরি ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে-অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরসঃ। "ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ-এই সব কয়টি বেদই ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৫/১১) ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি নিঃশ্বাসের দ্বারাও কথা বলতে পারেন। ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে, সর্ব শক্তিমান ভগবান তাঁর যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সব কয়টি ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর নিঃশ্বাসের দ্বারা কথা বলতে পারেন, তাঁর দৃষ্টির দ্বারা গর্ভসঞ্চার করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে প্রাণের সঞ্চার হয়। জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীব সৃষ্টি করার পর, এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা যাতে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে, সেই জন্যই তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, এই জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড় সুখভোগ করতে চায়। কিন্তু বৈদিক নির্দেশাবলী এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের বিকৃত বাসনাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে পারি, তারপর তথাকথিত সুখভোগ পরিসমাপ্ত করে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। জড় জগতের দুঃখময় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবান জীবকে এভাবে করুণা করেছেন। তাই, প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ করা। যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে না, তারা যদি কৃষ্ণচেতনা বা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে, তবে তারাও বৈদিক যজ্ঞের সমস্ত সুফলগুলি প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৬

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এবম্-এই প্রকারে; প্রবর্তিতম্ বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; চক্রম্-চক্র; ন-করে না; অনুবর্তয়তি-গ্রহণ; ইহ-এই জীবনে; যঃ-যিনি; অঘায়ুঃ-পাপপূর্ণ জীবন; ইন্দ্রিয়ারামঃ-ইন্দ্রিয়াসক্ত; মোঘম্-বৃথা; পার্থ-হে পৃথাপুত্র (অর্জুন), সঃ-সেই ব্যক্তি; জীবতি-জীবন ধারণ করে।

গীতার গান

সেই সে ব্রহ্মের চক্র আছে প্রবর্তিত।
সে চক্রে যে নাহি হয় বিশেষ বর্তিত ॥
পাপের জীবন তার অতি ভয়ঙ্কর।
ইন্দ্রিয় প্রীতয়ে করে পাপ পরস্পর ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

তাৎপর্য

বৈষয়িক জীবন-দর্শন অনুযায়ী, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার যে অর্থহীন প্রচেষ্টা, তা অতি ভয়ংকর পাপের জীবন বলে ভগবান তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, যারা জড়-জাগতিক সুখভোগ করতে চায়,

তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যারা তা করে না, তারা অত্যন্ত জঘন্য জীবন যাপন করছে, কারণ তাদের পাপের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তারা ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়মে এই মনুষ্য-জীবন পাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে একটিকে অবলম্বন করে আত্ম-উপলব্ধি করা। পাপ-পুণ্যের অতীত পরমার্থবাদীদের কঠোরভাবে শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন আবশ্যকতা নেই; কিন্তু যারা জড় বিষয়ভোগে লিপ্ত, তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। মানুষ নানা ধরনের কর্মে লিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু ভগবানের সেবায় কর্ম না করা হলে সমস্ত কর্মই সাধিত হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য; তাই পুণ্যকর্ম করে তাদের পাপের ভার লাঘব করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই তাদের জন্য যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, অথচ সেই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। এই জগতের উন্নতি আমাদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে অলক্ষ্যে ভগবানের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞাবাহক দেব-দেবীর উপর। তাই বেদের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করে দেব-দেবীদের তুষ্ট করা হলে পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবীদের তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা এবং এভাবেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে করতে 'জীবের অন্তরে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও যদি অন্তরে কৃষ্ণভক্তির উদয় না হয়, তবে বুঝতে হবে, তা কেবল উদ্দেশ্যহীন নৈতিক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, বেদের নির্দেশগুলিকে কেবল নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত না রেখে, তার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভের চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৭

যত্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যঃ-যে; তু-কিন্তু; আত্মরতিঃ-আত্মারাম; এব-অবশ্যই; স্যাৎ-থাকেন; আত্মতৃপ্তঃ-আত্মতৃপ্ত; চ-এবং; মানবঃ-মানুষ; আত্মনি-আত্মাতে; এব-কেবল; চ-এবং; সন্তুষ্টঃ- সন্তুষ্ট; তস্য-তাঁর; কার্যম্ কর্তব্যকর্ম; ন-নেই; বিদ্যতে-বিদ্যমান।

গীতার গান

আর যে বুঝিয়াছে আত্মতত্ত্বসার।
কার্য কর্ম কিছু নাই করিবার তার ॥
পূর্ণজ্ঞানে ভগবানে ভক্তিশ্রুক্তি করে যেই।
আত্মতৃপ্ত আত্মজ্ঞানী তুষ্টচুষ্ট আত্মাতেই ॥

অনুবাদ

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত চপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই।

তাৎপর্য

যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় এবং কৃষ্ণসেবাব়াপ্রায় যিনি সম্পূর্ণভাবে মগ্ন, তাঁর অন্য কোন কর্তব্য নেই। কৃষ্ণভক্তি লাভ করার ফললে তাঁর অন্তর সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছে। হাজার হাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানেও যে ফল লাভ করা যায় না, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে তা মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হয়। এভাবে চেতনা শুদ্ধ হলে জীব পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর নিত্যকালের সম্প্যাম্পর্ক উপলব্ধিই করতে পারেন। তখন ভগবানের কৃপায় তাঁর কর্তব্যকর্ম স্বয়ং জ্ঞানান্তেগালোকিত হয় এবং তাই তিনি আর বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্যের গভিী ক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। এই রকম কৃষ্ণভক্ত জীবের আর জড় বিষয়াসক্তি থাঙ্খাকে না এবং কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি তাঁর আর কোন মোহ থাকে না।

শ্লোক ১৮

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃত্বে তেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থার্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন-নেই; এব-অবশ্যই; তস্য-তাঁর; কৃতেন-ন-কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; অর্থঃ -প্রয়োজন; ন-নেই; অকৃতেন-কর্তব্যকর্মী-র্ম না করলেও; ইহ-এই জগতে; কশ্চন-কোন কারণ; ন-নেই; চ-ও; অসাস্য-এর; সর্বভূতেষু-সমস্ত প্রাণীর মধ্যে; কশ্চিৎ-কেউই; অর্থ-প্রয়োজন; ব্যপাশ্রয়ঃ-আশ্রয় গ্রহণ।

গীতার গান

অর্থানর্থ বিচারাদি আত্মতৃত্ব তৃপ্ত নহে।
কর্তব্যাকর্তব্য যাহা কিছু বেদশাস্ত্র কহে ॥
সে নহে কাহার ঋণী নিজার্থ সাধনে।
সর্বস্ব হয়েছে পূর্ণ শরণ্য শরণে ॥

অনুবাদ

আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যক্তির এই জগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং এই প্রকার কর্ম না করারও কোন কারণ নেই। তাকে অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতেও হয় না।

তাৎপর্য

যে মানুষ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে জানতে পেরেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তিনি আর সামাজিক কর্তব্য-অকর্তব্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেন না। কারণ, তিনি তখন বুঝতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাটাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্যকর্ম। অনেকে আত্মজ্ঞান লাভ করার নাম করে কর্মবিহীন আলস্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ভগবান আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিষ্কর্মা, অলস লোকেরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণভক্তি মানে হচ্ছে কৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা, তাই কৃষ্ণভক্ত একটি মুহূর্তকেও নষ্ট হতে দেন না। তিনি প্রতিটি মহূর্তকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। অন্যান্য দেব-দেবীদের পূজা করাটাও কর্তব্য বলে ভগবানের ভক্ত মনে করেন না। কারণ, তিনি জানেন, কেবল ভগবানের সেবা করলেই সকলের সেবা করা হয়।

শ্লোক ১৯

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ-অতএব; অসক্তঃ-আসক্তি রহিত হয়ে; সততম্-সর্বদা; কার্যম্-কর্তব্য; কর্ম-কর্ম; সমাচর-অনুষ্ঠান কর; অসক্তঃ-অনাসক্ত হয়ে; হি-অবশ্যই; আচরন্-অনুষ্ঠান করলে; কর্ম-কর্ম; পরম্-পরতত্ত্ব; আপ্নোতি-প্রাপ্ত হয়; পুরুষঃ -মানুষ।

গীতার গান

অতএব অনাসক্ত হয়ে কার্য কর।
যুক্ত বৈরাগ্য সেই তাতে হও দৃঢ় ॥
অনাসক্ত কার্য করে পরম পদেতে।
যোগ্য হয় ক্রমে ক্রমে সে পদ লভিতে ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী মুক্তি চান, কিন্তু ভক্ত কেবল পরম পুরুষ ভগবানকে চান। তাই, সদগুরুর তত্ত্বাবধানে যখন কেউ ভগবানের সেবা করেন, তখন মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন, কারণ সেটি ছিল তাঁর ইচ্ছা। সৎ কর্ম করে, অহিংসা ব্রত পালন করে ভাল মানুষ হওয়াটাই স্বার্থপর কর্ম, কিন্তু সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিচার না করে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম; ভগবান নিজেই সেই উপদেশ দিয়ে গেছেন।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত অসৎ কর্মের কুফল থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু ভগবানের সেবায় যে কর্ম সাধিত হয়, তা অপ্রাকৃত কর্ম এবং তা শুভ ও অশুভ কর্মবন্ধনের অতীত। কৃষ্ণভক্ত যখন কোন কর্ম করেন, তা তিনি তাঁর ফলভোগ করার জন্য করেন না, তা তিনি করেন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সব রকম কর্ম করেন, কিন্তু সেই সমস্ত কর্ম থেকে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ থাকেন।

শ্লোক ২০

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

কর্মণা-কর্মের দ্বারা; এব-কেবল; হি-অবশ্যই; সংসিদ্ধিম্-সিদ্ধি; আস্থিতাঃ-প্রাপ্ত হয়েছিলেন; জনকাদয়ঃ-জনক আদি রাজারা; লোকসংগ্রহম্-জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য; এব অপি-ও; সংপশ্যন্-বিবেচনা করে; কর্তৃম্-কর্ম করা; অর্হসি-উচিত।

গীতার গান

জনকাদি মহাজন কর্ম সাধ্য করি।
সিদ্ধিলাভ করেছিল আপনি আচরি ॥
তুমিও সেরূপ কর লোকশিক্ষা লাগি।
লাভ নাই কিছুমাত্র মর্কট বৈরাগী ।।

অনুবাদ

জনক আদি রাজারাও কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব, জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।

তাৎপর্য

জনক রাজা আদি মহাজনেরা ছিলেন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী, তাই বেদের নির্দেশ অনুসারে নানা রকম যাগ-যজ্ঞ করার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁদের ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতেন। জনক রাজা ছিলেন সীতাদেবীর পিতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর। ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত হবার ফলে তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি মিথিলার (ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের একটি অঞ্চলের) রাজা ছিলেন, তাই তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চিরন্তন সখা অর্জুনের পক্ষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার কোনও দরকার ছিল না, কিন্তু সদুপদেশ ব্যর্থ হলে হিংসা অবলম্বনেরও প্রয়োজন আছে, এই কথা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্যই তাঁরা যুদ্ধে নেমেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, শান্তি স্থাপন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল, এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুরাত্মারা যুদ্ধ করতেই বদ্ধপরিকর। এই রকম অবস্থায় যথার্থ কারণে হিংসার আশ্রয় নিয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াটা অবশ্যই কর্তব্য। যদিও কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তের জড় জগতের প্রতি কোন রকম স্পৃহা নেই, কিন্তু তবুও তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কর্তব্যকর্মগুলি সম্পাদন করেন। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত এমনভাবে কর্ম করেন, যাতে সকলে তাঁর অনুগামী হয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

যৎ যৎ-যেভাবে যেভাবে; আচরতি-আচরণ করেন; শ্রেষ্ঠঃ-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তৎ তৎ-সেই সেভাবেই; এব-অবশ্যই; ইতরঃ-সাধারণ; জনঃ-মানুষ; সঃ-তিনি; যৎ-যা; প্রমাণম্-প্রমাণ; কুরুতে-স্বীকার করেন; লোকঃ-সারা পৃথিবী; তৎ-তা: অনুবর্ততে-অনুসরণ করে।

গীতার গান

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে লোকের আদর্শ।
ইতর জনতা যাহা করে হয় হর্ষ ॥
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কিছু প্রামাণ্য স্বীকারে।
তাহাই স্বীকার্য হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষদের এমনই একজন নেতার প্রয়োজন হয়, যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যে নেতা নিজেই ধূমপানের প্রতি আসক্ত, তিনি জনসাধারণকে ধূমপান থেকে বিরত হতে শিক্ষা দিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শিক্ষা দেওয়া শুরু করার আগে থেকেই শিক্ষকের সঠিকভাবে আচরণ করা উচিত। এভাবেই যিনি শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় আচার্য অথবা আদর্শ শিক্ষক। তাই, জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হয়। কেউ যদি শাস্ত্র-বহির্ভূত মনগড়া কথা শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক হতে চায়, তাতে কোন লাভ তো হয়ই না, বরং ক্ষতি হয়। মনুসংহিতা ও এই ধরনের শাস্ত্রে ভগবান নিখুঁত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং এই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সমাজকে গড়ে তোলাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। এভাবেই নেতাদের শিক্ষা এই ধরনের আদর্শ শাস্ত্র অনুযায়ী হওয়া উচিত। যিনি নিজের উন্নতি কামনা করেন, তাঁর আদর্শ নীতি অনুসরণ করা উচিত, যা মহান আচার্যেরা অনুশীলন করে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে, পূর্বতন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনযাপন করা উচিত, তা হলেই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান, পিতা ও শিক্ষক হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই নিরীহ জনগণের পথপ্রদর্শক। জনসাধারণকে পরিচালনা করার মহৎ দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তাই তাঁদের উচিত, শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি করে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জনসাধারণকে পরিচালিত করে, এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা। এটি কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু এর ফলে যে সমাজ গড়ে উঠবে, তাতে প্রতিটি মানুষের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ২২

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

ন-না; মে-আমার; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; অস্তি-আছে; কর্তব্যম্-কর্তব্য; ত্রিষু-তিন; লোকেষু-জগতে; কিঞ্চন-কোন; ন-না; অনবাপ্তম্-অপ্রাপ্ত; অবাপ্তব্যম্ প্রাপ্তব্য; বর্তে যুক্ত আছি; এব-অবশ্যই; চ-ও; কর্মণি-শাস্ত্রোক্ত কর্মে।

গীতার গান

আমার কর্তব্য নাই ত্রিভুবন মাঝে।
পার্থ তুমি জান কেবা সমতুল্য আছে ৷৷
প্রাপ্তব্য বলিয়া কিছু কোথা নাহি মোর।
তথাপি দেখহ আমি কর্তব্যে বিভোর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ। এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই এবং প্রাপ্তব্যও কিছু নেই। তবুও আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
ন. তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"ভগবান হচ্ছেন ঈশ্বরদেরও পরম ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও পরম দেবতা। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দান করেন; তাঁরা কেউ পরমেশ্বর নয়। তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজ্য এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পতিদের পরম পতি। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত অধিপতি ও নিয়ন্তার অতীত, সকলের পূজ্য। তাঁর থেকে বড় আর কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

"তাঁর দেহ সাধারণ জীবের মতো নয়। তাঁর দেহ এবং তাঁর আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই যে-কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম সাধন করতে পারে। তাই তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর শক্তি অসীম ও বহুমুখী, তাই তাঁর সমস্ত কর্ম স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়ে যায়।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৭-৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর কোন কর্তব্য নেই। কর্মের ফল যাদের ভোগ করতে হয়, তাদের জন্যই কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু এই ত্রিভুবনে যাঁর কোন কিছুই কাম্য নেই, তাঁর কোন কর্তব্যকর্মও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করেছেন, কেন না দুর্বলদের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। যদিও তিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অতীত, কিন্তু তবুও তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ লঙঘন করেন না।

শ্লোক ২৩

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

যদি-যদি; হি অবশ্যই; অহম্-আমি; ননা; বর্তেয়ম্ প্রবৃত্ত হই; জাতু-কখনও; কর্মণি-শাস্ত্রোক্ত কর্মে; অতন্দ্রিতঃ-অনলস হয়ে; মম-আমার; বর্ম্ম-পথ; অনুবর্তন্তে-অনুসরণ করবে; মনুষ্যাঃ-সমস্ত মানুষ; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; সর্বশঃ-সর্বতোভাবে।

গীতার গান

আমি যদি কর্ম ত্যজি অতন্দ্রিত হয়ে।
মম বর্জ্য সবে অনুগমন করয়ে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! আমি যদি অনলস হয়ে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে আমার অনুবর্তী হয়ে সমস্ত মানুষই কর্ম ত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় এবং এভাবে সমাজকে গড়ে তোলবার জন্য প্রতিটি সভ্য মানুষকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করে সুসংযত জীবন যাপন করতে হয়। এই সমস্ত নিয়মকানুনের বিধি-নিষেধ কেবল বদ্ধ জীবেদের জন্য, ভগবানের জন্য নয়। যেহেতু তিনি ধর্মনীতি প্রবর্তনের জন্য অবতরণ করেছিলেন, তাই তিনি শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত বিধির অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভগবান এখানে বলছেন, যদি তিনি এই সমস্ত বিধি-নিষেধের আচরণ না করেন; তবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি, এই পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘরে-বাইরে সর্বত্র গৃহস্থোচিত সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

উৎসীদেয়ঃ-উৎসন্ন হবে; ইমে-এই সমস্ত; লোকাঃ-সমস্ত লোক; ন-না; কুর্যাম্-করি; কর্ম-শাস্ত্রোক্ত কর্ম; চেৎ-যদি; অহম্-আমি; সঙ্করস্য-বর্ণসঙ্করের; চ-এবং; কর্তা-কর্তা; স্যাম্-হব; উপহন্যাম্-বিনষ্ট হবে; ইমাঃ -এই সমস্ত; প্রজাঃ-জীব।

গীতার গান

ফল এই হবে সবাই উচ্ছন্ন যাবে।
আমার দর্শিত পথ দেখার অভাবে ।
বিধি আর কিছু নাহি রবে ধরাতলে ।
বিনষ্ট হইবে এই প্রজারা সকলে ॥

অনুবাদ

আমি যদি কর্ম না করি, তা হলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হবে। আমি বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কারণ হব এবং তার ফলে আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বর্ণসঙ্কর হবার ফলে অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ভরে ওঠে এবং তার ফলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এই ধরনের সামাজিক উপদ্রব রোধ করবার জন্য শাস্ত্রে নানা রকমের বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা অনুসরণ করার ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং সুস্থ মনোভাবাপন্ন হয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভকরতে পারে। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জীবের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের তাৎপর্য ও তাদের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষকে বুঝিয়ে দেন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জগতের পিতা, তাই জীব যদি বিপথগামী হয়ে পথভ্রষ্ট হয়, পক্ষান্তরে ভগবানই তার জন্য দায়ী হন। তাই, মানুষ যখন শাস্ত্রের অনুশাসন না মেনে যথেচ্ছাচার করতে শুরু করে, তখন ভগবান নিজে অবতরণ করে পুনরায় সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনই আমাদের মনে রাখতে হবে, ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য, ভগবানকে অনুকরণ করা কোন অবস্থাতেই আমাদের উচিত নয়। অনুসরণ করা আর অনুকরণ করা এক পর্যায়ভুক্ত নয়।

ভগবান তাঁর শৈশবে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুকরণ করে আমরা গোবর্ধন পর্বত তুলতে পারি না। কোন মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। ভগবানের সমস্ত লীলাই অসাধারণ, তাঁর লীলা অনুকরণ করে ভগবান হবার চেষ্টা করা মূর্খতারই নামান্তর। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া, কোন অবস্থাতেই তাঁর অস্বাভাবিক লীলার অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩০-৩১) বলা হয়েছে-

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্য থারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্ ॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥

"ভগবান এবং তাঁর শক্তিতে শক্তিমান ভক্তদের নির্দেশ সকলের অনুসরণ করা কর্তব্য। তাঁদের দেওয়া উপদেশ আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করে এবং যে মানুষ বুদ্ধিমান, সে যথাযথভাবে এই সমস্ত উপদেশগুলিকে পালন করে। কিন্তু আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমরা কখনও তাঁদের অনুকরণ না করি। দেবাদিদেব মহাদেবকে অনুকরণ করে বিষ পান করা আমাদের কখনই উচিত নয়।"

আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের পদ বিবেচনা করা উচিত, অথবা যাঁরা অসীম ক্ষমতাশালীরূপে চন্দ্র ও সূর্যের গতি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই প্রকার শক্তি ছাড়া, কারও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরদের অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের অনুসরণ করা। সমুদ্র-মন্থনের সময় যে বিষ উঠেছিল, তা পান করে মহাদেব জগৎকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ যদি তার এক কণা বিষও পান করে, তবে তার মৃত্যু অবধারিত। কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের মহাদেবের ভক্ত বলে প্রচার করে এবং মহাদেবের বিষ খাওয়ার অনুকরণ করে গাঁজা আদি মাদকদ্রব্য পান করে। তারা জানে না, এর মাধ্যমে তাদের মৃত্যুকে তারা ডেকে আনছে। তেমনই, কিছু ভণ্ড কৃষ্ণভক্তও দেখা যায়, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবার জন্য ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ লীলা-রাসলীলার অনুকরণ করে। তারা ভেবেও দেখে না, ভগবানের মতো গোবর্ধন পর্বত তোলবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই শক্তিমানকে অনুকরণ না করে তাঁকে অনুসরণ করাটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ভগবান যে সমস্ত উপদেশ দিয়ে গেছেন, তা পালন করলেই আমাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু তা না করে, যদি আমরা নিজেরাই ভগবান সাজতে চাই, তা হলে আমাদের অধঃপতন অবধারিত।

আজকের জগতে বহু অবতারের দেখা মেলে-লোক ঠকাবার জন্য অনেক ভণ্ড নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে, কিন্তু সর্ব শক্তিমান ভগবানের সর্ব শক্তিমত্তার কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

শ্লোক ২৫

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

সক্তাঃ-আসক্ত হয়ে; কর্মণি-শাস্ত্রোক্ত কর্মে; অবিদ্বাংসঃ-অজ্ঞান মানুষেরা; যথা-যেমন; কুর্বন্তি-করে; ভারত-হে ভরতবংশীয়; কুর্যাৎ-কর্ম করবেন; বিদ্বান-জ্ঞানী ব্যক্তি; তথা-

তেমন; অসক্তঃ-আসক্তি রহিত হয়ে; চিকীর্ষুঃ-পরিচালিত করতে ইচ্ছা করে; লোকসংগ্রহম্-জনসাধারণকে।

গীতার গান

বিদ্বানের যে কর্তব্য অবিদ্বান সম ।
বাহ্যত আসক্ত হয়ে কর্ম সমাগম ॥
অন্তরে আসক্তি নাই লোকের সংগ্রহ।
বিদ্বানের হয় সেই কর্মেতে আগ্রহ ॥

অনুবাদ

হে ভারত! অজ্ঞানীরা যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, তেমনই জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করবেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এবং কৃষ্ণভাবনা-বিমুখ অভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তির পার্থক্য। কৃষ্ণভাবনার উন্নতি সাধনের পক্ষে যা সহায়ক নয়, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সেই সমস্ত কর্ম করেন না। অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মায়ামুগ্ধ জীবের কর্ম আর কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের কর্মকে অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে একই একম বলে মনে হয়, কিন্তু মায়াচ্ছন্ন মূর্খ মানুষ তার সমস্ত কর্ম করে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ তার কর্ম করে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করবার জন্য। তাই মানব-সমাজে কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন, কেন না তাঁরাই মানুষকে জীবনের প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে পরিচালিত করতে পারেন। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে পাক খাচ্ছে; সেই কর্মকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পণ করা যায়, তা কেবল তাঁরাই শেখাতে পারেন।

শ্লোক ২৬

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

ন-নয়; বুদ্ধিভেদম্-বুদ্ধিভ্রষ্ট; জনয়েৎ-জন্মানো উচিত; অজ্ঞানাম্-অজ্ঞ ব্যক্তিদের; কর্মসঙ্গিনাম্-কর্মফলের প্রতি আসক্ত; জোষয়েৎ-নিযুক্ত করা উচিত; সর্ব-সমস্ত; কর্মাণি-কর্ম; বিদ্বান্-জ্ঞানবান; যুক্তঃ-যুক্ত হয়ে; সমাচরন্-অনুষ্ঠান করে।

গীতার গান

বুদ্ধিভেদ নাহি করি মূঢ় কর্মীদের।
অজ্ঞানী যে হয় তারা তাই হেরফের ॥
তাই সে সাজাতে হবে সর্বকর্ম মাঝে।
আপনি আচরি সব অবিদ্যার সাজে ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না। বরং, তাঁরা ভক্তিযুক্ত চিত্তে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন।

তাৎপর্য

বেদৈশ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। সেটিই হচ্ছে বেদের শেষ কথা। বেদের সমস্ত আচার-

অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ আদি, এমন কি জড় কার্যকলাপের সমস্ত নির্দেশাদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যেহেতু বদ্ধ জীবেরা তাদের জড় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অতীত কোন কিছু জানে না, তাই তারা সেই উদ্দেশ্যে বেদ অধ্যয়ন করে। কিন্তু বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সকাম কর্ম ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাধ্যমে মানুষ ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হয়। তাই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণভক্ত কখনই অপরের কার্যকলাপ ও বিশ্বাসে বাধা দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা দেন, কিভাবে সমস্ত কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করা যেতে পারে। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এমনভাবে আচরণ করেন, যার ফলে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ লোকেরাও উপলব্ধি করতে পারে, তাদের কি করা কর্তব্য। যদিও কৃষ্ণভাবনাহীন অজ্ঞ লোকদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়, তবে অল্প উন্নতিপ্রাপ্ত কৃষ্ণভক্ত বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের বিধির অপেক্ষা না করে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। এই ধরনের ভাগ্যবান লোকের পক্ষে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের আচরণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে আর কোন কিছুই করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে সর্বকর্ম সাধিত হয়।

শ্লোক ২৭

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ-জড়া প্রকৃতির; ক্রিয়মাণানি-ক্রিয়মাণ; গুণৈঃ-গুণের দ্বারা; কর্মাণি-সমস্ত কর্ম; সর্বশঃ-সর্বপ্রকার; অহঙ্কার-বিমূঢ় অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; আত্মা-আত্মা; কর্তা-কর্তা; অহম্-আমি; ইতি-এভাবে; মন্যতে মনে করে।

গীতার গান

বিদ্বান মূর্খেতে হয় এই মাত্র ভেদ। প্রকৃতির বশ এক অন্য সে বিচ্ছেদ ॥ প্রকৃতির গুণে বশ কার্য করি যায়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজে কর্তা হয় ॥ আপনার পরিচয় প্রকৃতির মানে। দেহে আত্মবুদ্ধি করে অসত্যের ধ্যানে ॥

অনুবাদ

অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'-এই রকম অভিমান করে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ও দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী, এদের দুজনের কর্মকে আপাতদৃষ্টিতে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এক অসীম ব্যবধান রয়েছে। যে দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন, সে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেকেই সব কিছুর কর্তা বলে মনে করে। সে জানে না যে, তার দেহের মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম সাধিত হচ্ছে, তা সবই হচ্ছে প্রকৃতির পরিচালনায় এবং এই প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে ভগবানেরই নির্দেশ অনুসারে। জড়-জাগতিক মানুষ বুঝতে পারে না যে, সে সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অহঙ্কারের প্রভাবে বিমূঢ় যে আত্মা, সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে ভাবে, সে স্বাধীনভাবে কর্ম করে চলেছে, তাই সমস্ত কৃতিত্ব সে নিজেই গ্রহণ করে। এটিই

হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ। সে জানে না যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহটি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সেই জন্যই কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে তার দৈহিক ও মানসিক সমস্ত কাজই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করতে হবে। দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বহুকাল ধরে তার ইন্দ্রিয়গুলি অপব্যবহারের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ফলে মানুষ বাস্তবিকপক্ষে অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ২৮

তত্ত্ববিত্ত মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ৷ ২৮ ॥

তত্ত্ববিৎ-তত্ত্বজ্ঞ; তু-কিন্তু; মহাবাহো-হে মহাবীর; গুণকর্ম-প্রকৃতির প্রভাব জনিত কর্ম; বিভাগয়োঃ-পার্থক্য; গুণাঃ-ইন্দ্রিয়সমূহ: গুণেষু-ইন্দ্রিয়-তর্পণে; বর্তন্তে-প্রবৃত্ত হন; ইতি-এভাবে; মত্না-মনে করে; ন-না; সজ্জতে-আসক্ত হন।

গীতার গান

তত্ত্ববিৎ যে বিদ্বান বুঝে গুণকর্ম।
গুণ দ্বারা কার্য হয় জানে সারমর্ম ॥
অতএব গুণকার্য না করে সজ্জন।
প্রকৃতির গুণকার্য আসক্ত না হন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যে প্রবৃত্ত হন না।

তাৎপর্য

যিনি তত্ত্ববেত্তা, তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করেন যে, জড়া প্রকৃতির সংস্রবে তিনি প্রতিনিয়ত বিব্রত হয়ে আছেন। তিনি জানেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই জড়া প্রকৃতি তার প্রকৃত আলয় নয়। সচ্চিদানন্দময় ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপও জানেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, কোন না কোন কারণে তিনি দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর শুদ্ধ স্বরূপে তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস এবং ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সমস্ত কর্ম করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং তার ফলে স্বভাবতই তিনি আনুষঙ্গিক ও অনিত্য জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছার ফলেই তিনি জড় জগতে পতিত হয়েছেন, তাই এই দুঃখময় জড় জগতের কোন দুঃখকেই তিনি দুঃখ বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তা ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, যিনি ভগবানের তিনটি প্রকাশ-ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে জানেন, তাঁকে বলা হয় তত্ত্ববিদ্, কারণ ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন।

শ্লোক ২৯

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ৷ ২৯ ৷

প্রকৃতেঃ-জড়া প্রকৃতির; গুণসংমূঢ়াঃ-গুণের প্রভাবে বিমূঢ় ব্যক্তিরা; সজ্জন্তে-প্রবৃত্ত হয়; গুণকর্মসূ-প্রাকৃত কার্যকলাপে; তান্-সেই সকল; অকৃৎস্নবিদঃ-অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে; মন্দা-মন্দবুদ্ধি; কৃৎস্নবিৎ-তত্ত্বজ্ঞ, ন-না; বিচালয়েৎ-বিচলিত করেন।

গীতার গান

গুণকর্মে আসক্তি সে গুণেতে সংমূঢ়।
প্রাকৃত নিজেকে মানে সেই কার্যে দৃঢ় ॥
ভবরোগী মূঢ় জনে না করি বঞ্চন।
কর্মের যোজনা হতে ক্রমে জ্ঞান বল ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাদের কর্ম নিকৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সেই মন্দবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিচলিত করেন না।

তাৎপর্য

যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তারা তাদের জড় সত্তাকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তার ফলে তারা জড় উপাধির দ্বারা ভূষিত হয়। এই দেহটি জড়া প্রকৃতির উপহার। এই জড় দেহের সঙ্গে যারা গভীরভাবে আসক্ত, তাদের বলা হয় মন্দ, অর্থাৎ তারা হচ্ছে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত অলস ব্যক্তি। মূর্খ লোকেরা তাদের জড় দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে; এই দেহটিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাদেরকে তারা আত্মীয় বলে স্বীকার করে, যে দেশে তারা জন্ম নিয়েছে অর্থাৎ যে দেশে তারা তাদের জড় দেহটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি তাদের দেশ আর সেই দেশকে তারা পূজা করে এবং তাদের অনুকূলে কতকগুলি সংস্কারের অনুষ্ঠান করাকে তারা ধর্ম বলে মনে করে। সমাজসেবা, জাতীয়তাবাদ, পরমার্থবাদ আদি হচ্ছে এই ধরনের জড় উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কতকগুলি আদর্শ। এই সমস্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নানা রকম জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকে। তারা মনে করে, ভগবানের কথা হচ্ছে রূপকথা, তাই ভগবানকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তাদের নেই। এই ধরনের মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা অহিংসা-নীতি আদি দেহগত হিতকর কার্যে ব্রতী হয়, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করে যাঁরা তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে জানতে পেরেছেন, তাঁরা এই সমস্ত দেহসর্বস্ব মানুষদের কাজে কোন রকম বাধা দেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা নিঃশব্দে তাঁদের পারমার্থিক কর্ম ভগবানের সেবা করে চলেন।

যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ভগবদ্ভক্তির মর্ম বোঝে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তাদের মনে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করার চেষ্টা করে অনর্থক সময় নষ্ট না করতে। কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের চাইতেও বেশি কৃপালু, তাই তাঁরা নানা রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করে, সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে, সকলের অন্তরে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। কারণ, তাঁরা জানেন যে, মনুষ্যজন্ম লাভকরে ভগবদ্ভক্তি সাধন না করলে, সেই জন্ম সম্পূর্ণ বৃথা।

শ্লোক ৩০

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ময়ি-আমাকে; সর্বাণি-সর্বপ্রকার; কর্মাণি-কর্ম; সংন্যস্য-সমর্পণ করে; অধ্যাত্ম-আত্মনিষ্ঠ; চেতসা-চেতনার দ্বারা; নিরাশীঃ-নিষ্কাম; নির্মমঃ-মমতাশূন্য; ভূত্বা-হয়ে; যুধ্যস্ব-যুদ্ধ কর; বিগতজ্বরঃ-শোকশূন্য হয়ে।

গীতার গান

অতএব তুমি পার্থ ছাড় অভিমান।
তোমার সমস্ত শক্তি কর মোরে দান ॥
কর্মফল আশা ছাড় নির্মম হইয়া।
যুদ্ধ কর আশা ত্যজি মূঢ়তা ত্যজিয়া ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! অধ্যাত্মচেতনা-সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর এবং মমতাশূন্য, নিষ্কাম ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান আদেশ করছেন যে, সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। সৈনিকেরা যেমন গভীর নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ঠিক তেমনভাবে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের আদেশকে কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। তাই, শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল হয়ে তা আমাদের পালন করতেই হবে, কেন না সেটিই হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে মানুষ যদি সুখী হতে চেষ্টা করে, তবে তার সে চেষ্টা কোন দিনই সফল হবে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য এবং সেই জন্য তাকে যদি সব কিছু ত্যাগ করতেও হয়, তবে তা-ই বিধেয়। ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে ভগবানের আদেশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যেন সামরিক নেতার মতোই অর্জুনকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের পক্ষে সেই নির্দেশ যাচাই করার কোন পথ ছিল না; তাঁকে সেই নির্দেশ মানতেই হয়েছিল। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আত্মার আত্মা; তাই, নিজের সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে যিনি সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, অথবা পক্ষান্তরে, যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন অধ্যাত্মচেত। নিরাশীঃ মানে হচ্ছে, ভৃত্য যখন প্রভুর সেবা করে, তখন সে কোন কিছুর আশা করে না। খাজাঞ্চী লক্ষ লক্ষ টাকা গণনা করে, কিন্তু তার এক কপর্দকও সে নিজের বলে মনে করে না, কারণ সে জানে যে, সেই টাকা তার মালিকের। ঠিক তেমনই, এই জগতের সব কিছুই ভগবানের, তাই তাঁর সেবাতে সব কিছু অর্পণ করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি তা করি, তা হলে আমরা ভগবানের যথার্থ ভৃত্য হতে পারি। তা হলেই আমাদের জন্ম সার্থক হয় এবং আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি। সেটি হচ্ছে ময়ি অর্থাৎ 'আমাকে' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য। কেউ যখন এই প্রকার কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কর্ম করে, তখন নিঃসন্দেহে সে কোন কিছুর উপর মালিকানা দাবি করে না। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় নির্মম, অর্থাৎ 'কোন কিছুই আমার নয়।' ভগবানের এই কঠোর নির্দেশ পালন করতে যদি আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি-যদি আমরা আমাদের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের মায়ায়

আবদ্ধ হয়ে ভগবানের নির্দেশকে অবজ্ঞা করি, তবে তা মূঢ়তারই নামান্তর। এই বিকৃত মনোবৃত্তি ত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। এভাবেই মানুষ বিগতজ্বর অর্থাৎ শোকশূন্য হতে পারে। গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিশেষ কর্তব্য আছে এবং কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই কর্তব্য সম্পাদন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এই ধর্ম আচরণ করার ফলে আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৩১

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে-যাঁরা; মে-আমার; মতম্-নির্দেশাবলী; ইদম্-এই; নিত্যম্-সর্বদা; অনুতিষ্ঠন্তি-নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করেন; মানবাঃ-মানুষেরা; শ্রদ্ধাবন্তঃ-শ্রদ্ধাবান; অনসূয়ন্তঃ-মাৎসর্য রহিত; মুচ্যন্তে-মুক্ত হন; তে-তাঁরা সকলে; অপি-এমন কি; কর্মভিঃ-কর্মের বন্ধন থেকে।

গীতার গান

আমার এমত কার্য অনুষ্ঠান করি।
সর্ব কর্ম করে শুধু ভজিতে শ্রীহরি ॥
শ্রদ্ধাবান মোর ভক্ত অসূয়াবিহীন।
কর্মফল মুক্ত হয় ভক্তিতে বিলীন ॥

অনুবাদ

আমার নির্দেশ অনুসারে যে-সমস্ত মানুষ তাঁদের কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসর্য রহিত হয়ে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে আদেশ করেছেন, তা বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম, তাই সন্দেহাতীতভাবে তা শাশ্বত সত্য। বেদ যেমন নিত্য, শাশ্বত, কৃষ্ণভাবনার এই তত্ত্বও তেমন নিত্য, শাশ্বত। ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে এই উপদেশের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। তথাকথিত অনেক দার্শনিক ভগবদগীতার ভাষ্য লিখেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাঁরা কোন দিনও গীতার মম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন না এবং সকাম কর্মের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু অতি সাধারণ কোন মানুষও যদি ভগবানের শাশ্বত নির্দেশের। প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হয়, অথচ সমস্ত নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ হয়, তবুও সে অবধারিতভাবে কর্মের অনুশাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। ভক্তিযোগ সাধন করার প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ হয়ত ভগবানের নির্দেশ ঠিক ঠিকভাবে পালন নাও করতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে এই পন্থার প্রতি বিরক্ত নয় এবং যদি সে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বিবেচনা না করে ঐকান্তিকতার সঙ্গে এই কার্যক্রমের অনুষ্ঠান করতে থাকে, তবে সে নিশ্চিতভাবে ধীরে ধীরে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার পর্যায়ে অবশ্যই উন্নীত হবে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ৷

যে-যারা; তু-কিন্তু; এতৎ-এই; অভ্যসূয়ন্তঃ-মাৎসর্যবশত; ন-না; অনুতিষ্ঠন্তি-নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করে; মে-আমার; মতম্-নির্দেশ; সর্বজ্ঞান-সর্বপ্রকার জ্ঞানে; বিমূঢ়ান্-বিমূঢ়; তান্-তাদেরকে, বিদ্ধি-জানবে; নষ্টান্-বিনষ্ট; অচেতসঃ-কৃষ্ণভক্তিহীন।

গীতার গান

প্রকৃতিসদৃশ চেষ্টা করে গুণবান।
প্রকৃতির বশে সর্ব কার্য অনুষ্ঠান ॥

অনুবাদ

কিন্তু যারা অসূয়াপূর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না, তাদেরকে সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, বিমূঢ় এবং পরমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট বলে জানবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় না হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্মকর্তার নির্দেশ মানতে অবাধ্যতা করলে যেমন শাস্তি হয়, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অমান্য করলেও নিশ্চয়ই শাস্তি আছে। অমান্যকারী লোক, তা সে যতই উচ্চ স্তরের হোক, তার কাণ্ডজ্ঞানহীন বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য, তার নিজের স্বরূপ সম্পর্কে, এমন কি পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কেও সে অজ্ঞ। সুতরাং তার জীবনের পূর্ণতা লাভের কোনই আশা নেই।

শ্লোক ৩৩

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

সদৃশম্-অনুরূপভাবে; চেষ্টতে-চেষ্টা করে; স্বস্যাঃ-স্বীয়; প্রকৃতেঃ-প্রকৃতির ঋণ, জ্ঞানবান্-জ্ঞানবান; অপি-যদিও; প্রকৃতিম্-স্বভাবকে; যান্তি-অনুগমন করেন: ভূতানি-সমস্ত জীব; নিগ্রহঃ-দমন; কিম্-কি; করিষ্যতি করতে পারে।

গীতার গান

বহুকাল হতে যারা প্রকৃতির বশ।
নিগ্রহ করিতে নারে হইয়া বিবশ ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত তাঁর স্বীয় স্বভাবকে অনুগমন করেন। সুতরাং নিগ্রহ করে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হতে পারলে জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১৪) ভগবান সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। তাই, এমন কি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও কেবলমাত্র ধারণাগত জ্ঞান অথবা

দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করেও মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। বহু তথাকথিত তত্ত্ববিদ আছে, যারা ভগবৎ-তত্ত্বদর্শন লাভকরার অভিনয় করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণভাবে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা সম্পূর্ণভাবে মায়ার গুণের দ্বারা আবদ্ধ। পুঁথিগত বিদ্যায় কেউ খুব পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু বহুকাল ধরে মায়াজালে আবদ্ধ থাকার ফলে সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জীব সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে কেবল মাত্র কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে এবং এই কৃষ্ণচেতনা থাকলে সংসার-ধর্ম পালন করেও জড় লন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করে হঠাৎ ঘর-বাড়ি ছেড়ে, তথাকথিত যোগী অথবা কৃত্রিম পরমার্থবাদী সেজে বসলে কোনই লাভ হয় না। তার থেকে বরং নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করে কোন তত্ত্ববেত্তার নিদেশে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এভাবেই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে মানুষ মায়ামুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৪

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়স্য-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; ইন্দ্রিয়স্য অর্থে-ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহে; রাগ-আসক্তি; দ্বেষৌ-বিদ্বেষ; ব্যবস্থিতৌ-বিশেষভাবে অবস্থিত; তয়োঃ-তাদের; ন-নয়; বশম্-বশীভূত; আগচ্ছেৎ-হওয়া উচিত; তৌ-তাদের; হি-অবশ্যই; অস্য-তার; পরিপন্থিনৌ-প্রতিবন্ধক।

গীতার গান

অতএব ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ দ্বেষ ছাড়ি।
বিষয়েতে রাগ দ্বেষ কিছু নাহি করি ।
তাহার বশেতে নিজে কভু না রহিবা।
অনাসক্ত বিষয়েতে মাধবের সেবা ॥

অনুবাদ

সমস্ত জীবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে আসক্তি অথবা বিরক্তি অনুভব করে, কিন্তু এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ তা পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

যাদের মনে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয়েছে, তাদের আর জড়-জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা থাকে না। কিন্তু যাদের চেতনা শুদ্ধ হয়নি, তাদের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। তা হলেই পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে বিষয়ভোগ করার ফলে মানুষ জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করলে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ হতে হয় না। যেমন, যোনিসম্ভোগ করার বাসনা প্রতিটি বদ্ধ জীবাত্মার মধ্যেই থাকে, তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিবাহ করে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং অন্য সমস্ত স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে এই সমস্ত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা অনুসরণ করতে চায় না, ফলে সে জড় বন্ধনের নাগপাশ

থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই ধরনের বিকৃত বাসনাগুলি দমন করতে হবে, তা না হলে সেগুলি আত্ম-উপলব্ধির পথে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। জড় দেহটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার প্রয়োজনগুলিও মেটাতে হবে, কিন্তু তা করতে হবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমে। আর তা সত্ত্বেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। রাজপথে যেমন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তেমনই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বহুকাল ধরে এই জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাই, নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করলেও প্রতি পদক্ষেপে অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় উপভোগের আসক্তিও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে তাঁর সেবায় ব্রতী হলে, অচিরেই আমরা জড় সুখভোগ করার বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই, কোন অবস্থাতেই ভগবানের সেবা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা, তাই কোন অবস্থাতেই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রেয়ান্-শ্রেষ্ঠ; স্বধর্মঃ-স্বধর্ম; বিগুণঃ-দোষযুক্ত, পরধর্মাৎ-অন্যের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে; স্বনুষ্ঠিতাৎ-উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত; স্বধর্মে-স্বধর্মে; নিধনম্-নিধন; শ্রেয়ঃ-ভাল; পরধর্মঃ-অন্যের ধর্ম; ভয়াবহঃ-বিপজ্জনক।

গীতার গান

নিজ ধর্ম শ্রেয় জান পরধর্মাপেক্ষা।
ভগবদ্ সেবা লাগি কর্মযোগ শিক্ষা ॥
স্বধর্মে নিধন ভাল নহে পরধর্ম।
ভাল করি বুঝ তুমি এই গূঢ় মর্ম ॥

অনুবাদ

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক।

তাৎপর্য

পরধর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, স্বধর্ম আচরণ করাই মানুষের কর্তব্য। জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্মাচরণগুলি মানুষের দেহমনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। সদ্গুরু যে আদেশ দেন, তাই হচ্ছে পারমার্থিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করে থাকি। কিন্তু জাগতিক অথবা পারমার্থিক যাই হোক না কেন, অন্যের ধর্ম অনুকরণ অপেক্ষা মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। জাগতিক স্তরের কর্তব্য এবং পারমার্থিক স্তরের কর্তব্য ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সম্পাদন করা সব সময় মঙ্গলজনক। মানুষ যখন জড়া প্রকৃতির দ্বারা কবলিত থাকে, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে, তার বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট বিধান পালন করা এবং কোন অবস্থাতেই

অপরকে অনুকরণ করা উচিত নয়। যেমন, সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অহিংসা-পরায়ণ, কিন্তু রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয় প্রয়োজন হলে হিংসার আশ্রয় নিতে পারেন। স্বধর্ম আচরণ করতে গিয়ে ক্ষত্রিয়কে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাও ভাল, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অনুকরণ করে অহিংসার আচরণ করা তার উচিত নয়। চিত্তবৃত্তির পরিশোধন করা সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু তা সাধন করতে হয় ধীরে ধীরে-তাড়াহুড়ো করে নয়। তবে মানুষ যখন জড় গুণের প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করেন, তখন তিনি যে কোন রকম আচরণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর সেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সদগুরুর নির্দেশ অনুসারে। কৃষ্ণভাবনার সেই পূর্ণ স্তরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করতে পারেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করতে পারেন। অপ্রাকৃত স্তরে জড় জগতের গুণ অনুসারে স্তর-বিভাগ নেই। যেমন, ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছিলেন, আবার ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করেছিলেন। তাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তাঁরা এভাবে আচরণ করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ যখন প্রাকৃত স্তরে থাকে, তখন জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তাকে তার স্বধর্ম আচরণ করে সম্যভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করতে হয়।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।। ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; অথ-তবে; কেন কার দ্বারা; প্রযুক্তঃ-প্রেরিত হয়ে; অয়ম্-এই; পাপম্-পাপ; চরতি-আচরণ করে; পুরুষঃ-মানুষ; অনিচ্ছন-অনিচ্ছায়; অপি-যদিও; বায়ে-হে বৃষ্ণি-বংশাবতংশ; বলাৎ-বলপূর্বক; ইব-যেন; নিয়োজিতঃ-নিয়োজিত।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
হে বার্ষ্ণেয় কহ তুমি বুঝাইয়া মোরে।
কি লাগি হয়েছে জীব যুক্ত পাপ ঘোরে ॥
অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় পাপে নিয়োজিত।
অবশ হইয়া করে পাপ সে গর্হিত ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে বায়ে! মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

তাৎপর্য

ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ জীব মূলত চিন্ময়, পবিত্র ও সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই, সে জড় জগতের পাপের অধীন নয়। কিন্তু সে যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন সে বিনা দ্বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা একম পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তাই, এখানে অর্জুন জীবদের এই বিকৃত স্বভাব সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত। যদিও কখনও কখনও জীব পাপকর্ম করতে চায় না, তবুও সে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করে

পরমাত্মা কিন্তু আমাদের পাপকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তার কারণ ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাত্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; কামঃ-কাম; এষঃ-এই; ক্রোধঃ -ক্রোধ; এষঃ-এই; রজোগুণ রজোগুণ; সমুদ্ভবঃ-উদ্ভূত হয়; মহাশনঃ-সর্বগ্রাসী; মহাপাপদ্মা- অত্যন্ত পাপী; বিদ্ধি-জানবে; এনম্-একে; ইহ-এই জড় জগতে; বৈরিণম্ প্রধান শত্রু।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:
কাম আর ক্রোধ হয় রজোগুণ দ্বারা।
অভিভূত বদ্ধজীব ত্রিজগতে সারা ॥
জ্ঞানী জীব এই দুই মহা শত্রু জানে।
করে তাই গুণাতীত কার্য সাবধানে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে অর্জুন। রজোগুণ থেকে সমুদ্ভুত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

তাৎপর্য

জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম রজোগুণের প্রভাবে কামে পর্যবসিত হয়। টক তেঁতুলের সংস্পর্শে দুধ যেমন দই হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের প্রতি আমাদের অপ্রাকৃত প্রেম কামে রূপান্তরিত হয়। তারপর, কামের অতৃপ্তির ফলে হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়; ক্রোধ থেকে মোহ এবং এভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে স্থায়িভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কাম হচ্ছে জীবের সব চাইতে বড় শত্রু। এই কামই শুদ্ধ জীবাত্মাকে এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। ক্রোধ হচ্ছে তমোগুণের প্রকাশ; এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ আদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয়। তাই, রজোগুণের প্রভাবকে তমোগুণে অধঃপতিত না হতে দিয়ে, যদি ধর্মাচরণ করার মাধ্যমে তাকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করা যায়, তা হলে আমরা পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রোধ আদি ষড় রিপুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

ভগবান তাঁর নিত্য-বর্ধমান চিদানন্দের বিলাসের জন্য নিজেকে অসংখ্য মূর্তিতে বিস্তার করেন। জীব হচ্ছে এই চিন্ময় আনন্দের আংশিক প্রকাশ। ভগবান তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবকে আংশিক স্বাধীনতা দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং ভগবানের সেবা না করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে শুরু করে, তখন তারা কামের কবলে পতিত হয়। ভগবান এই ০৬ জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে বদ্ধ জীব তার এই কামোন্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পূর্ণ করতে পারে। এভাবে তার সমস্ত কামনা-

বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করতে গিয়ে জোর যখন সম্পূর্ণভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন সে তার স্বরূপের অন্বেষণ করতে শুরু করে।
এই অন্বেষণ থেকেই বেদান্ত-সূত্রের সূচনা, যেখানে বলা হয়েছে, অথাতো এখাজিজ্ঞাসা- মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব অনুসন্ধান করা। শ্রীমদ্ভাগবতে পরম-তত্ত্বকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে-জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চ, অর্থাৎ "সব কিছুর উৎস হচ্ছেন পরমব্রহ্ম।" সুতরাং কামেরও উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাই, যদি এই কামকে ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, অথবা কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা সায়, কিংবা সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়, তা হলে কাম ও ক্রোধ উভয়ই অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপ প্রাপ্ত হয়। এভাবেই কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে ** করবার জন্য রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর 1. এণধকে শক্রনিধন কার্যে প্রয়োগ করেছিলেন। এখানেও ভগবদ্গীতায়, ভগবান শাকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সমস্ত ক্রোধ শত্রুবাহিনীর উপরে প্রয়োগ করে ভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের কাজে লাগাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের কাম ও ক্রোধকে যখন আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করি, তখন তারা আর শত্রু থাকে না, আমাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ৩৮

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ।। ৩৮ ॥

গৃমেন-ধূমের দ্বারা; আব্রিয়তে আবৃত; বহ্নিঃ-আগুন; যথা-যেমন; আদর্শঃ -দর্পণ; মলেন- ময়লার দ্বারা; চ-ও; যথা-যেমন; উল্বেন জরায়ুর দ্বারা; আবৃতঃ-আবৃত থাকে; গর্ভঃ-গর্ভ; তথা-তেমন; তেন কামের দ্বারা; ইদম্-এই: আবৃতম্-আবৃত থাকে।

গীতার গান

ত্রিজগতে কাম মাত্র সর্ব আবরণ।
আগুনেতে ধূম যথা ধূসর দর্শন ॥
অথবা জরায়ু যথা গর্ভ আবরণ।
অল্পাধিক এই সব কামের কারণ ॥

অনুবাদ

অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

জীবের শুদ্ধ চেতনা সাধারণত তিনটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন ধুমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, দর্পণ যেমন ধূলোর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, জীবের শুদ্ধ চেতনাও তেমন কামের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। কামকে যখন ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূম আগুনকে ঢেকে রাখলেও যেমন আগুনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তেমনই কামের অন্তরালে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীবের অন্তরে যখন

অল্প-বিস্তর কৃষ্ণভাবনার প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মতো জীবের ভগবদ্ভক্তি কামের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। আগুনের প্রভাবেই ধুমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আগুন জ্বালাবার প্রথম পর্যায়ে আগুনকে দেখা যায় না। তেমনই, কৃষ্ণভাবনার প্রাথমিক পর্যায়েও বিশুদ্ধ, নির্মল ভগবৎ-প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে না। দর্পণের ধূলো পরিষ্কার করার পর যেমন আবার তাতে সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনই, নানা রকম পারমার্থিক প্রচেষ্টার দ্বারা চিত্ত-দর্পণকে মার্জন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করা। গর্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত জরায়ুর সঙ্গে জীবের বদ্ধ অবস্থার তুলনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, এই অবস্থায় জীব কত অসহায়। জঠরস্থ শিশু নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। জীবনের এই অবস্থাকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গাছেরাও জীব, কিন্তু প্রবল কামের বশবর্তী হয়ে পড়ার ফলে তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছে যে, তাদের চেতনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। ধূলোর দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণকে পশু-পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যায়। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হলে জীব তার সুপ্ত কৃষ্ণচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ধূমাচ্ছাদিত আগুনকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাওয়া দিতে থাকলে, তা যেমন এক সময়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই খুব সন্তর্পণে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ তার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। এভাবেই মনুষ্য-জন্মের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে জীব তার শত্রু কাম প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে আর তা সম্ভব হয় সদগুরুর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে।

শ্লোক ৩৯

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পরেণানলেন চ ৷৷ ৩৯ ॥

আবৃতম্ আবৃত; জ্ঞানম্-শুদ্ধ চেতনা; এতেন-এর দ্বারা; জ্ঞানিনঃ-জ্ঞানীর; নিত্যবৈরিণা-চিরশত্রুর দ্বারা; কামরূপেণ-কামরূপ; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; দুষ্পরেণ-অপূরণীয়; অনলেন-অগ্নির দ্বারা; চ-ও;

গীতার গান

এই নিত্য বৈরী করে জ্ঞান আবরণ।
জীব তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ ॥
কাম হয় দুপূরণ অগ্নির সমান।
অতএব কাম লাগি হও সাবধান ॥

অনুবাদ

কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত।

তাৎপর্য

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, ঘি ঢেলে যেমন আগুনকে কখনও নেভানো যায় না. তেমনই কাম উপভোগের দ্বারা কখনই কামের নিবৃত্তি হয় না। জড় জগতে সমস্ত কিছুর কেন্দ্র

হচ্ছে যৌন আকর্ষণ, তাই জড় জগৎকে বলা হয় 'মৈথুনাগার' অথবা যৌন জীবনের শিকল। আমরা দেখেছি, অপরাধ করলে মানুষ কারাগারে আবদ্ধ হয়; তেমনই, যারা ভগবানের আইন অমান্য করে, তারাও যৌন জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই মৈথুনাগারে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে জড় সভ্যতার উন্নতি লাভের অর্থ হচ্ছে, বদ্ধ জীবদের জড় অস্তিত্বের বন্দীদশার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তাই, এই কাম হচ্ছে অজ্ঞানতার প্রতীক, যার দ্বারা জীবদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার সময় সাময়িকভাবে সুখের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই তথাকথিত সুখই হচ্ছে জীবের পরম শত্রু।

শ্লোক ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়গুলি; মনঃ-মন; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; অস্য-এই কামের; অধিষ্ঠানম্-অধিষ্ঠান; উচ্যতে বলা হয়; এতৈঃ-এদের দ্বারা; বিমোহয়তি-বিমোহিত হয়; এষঃ-এই কাম; জ্ঞানম্-জ্ঞান; আবৃত্য-আবৃত করে; দেহিনম্-দেহাভিমানী জীবকে।

গীতার গান

সেই কাম অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াদি মনে।
বুদ্ধিতে বসিয়া আঁকে নিখিল ভুবনে ॥
বদ্ধ জীব সে কারণ দেহ অভিমানী।
স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার নাহি জানে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

'ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়স্থল। এই ইন্দ্রিয় আদির দ্বারা কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিভ্রান্ত করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবাত্মার দেহের ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশতে শত্রু অধিকার করে বসেছে, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত অংশের কথা ইঙ্গিতে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যাতে আমরা সেই শত্রুকে পরাভূত করতে পারি। ইন্দ্রিয় আদির সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র হচ্ছে মন, তাই মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনার কেন্দ্রস্থল। তাই যখন আমরা ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা শুনি, তখন স্বভাবতই মন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল প্রকার চিন্তাভাবনার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে; ও তারই ফলে মন ও ইন্দ্রিয়গুলি হয়ে ওঠে কামপ্রবৃত্তির আধার। এর পরে, বুদ্ধি বিভাগটি হয় এই সমস্ত কামপ্রবৃত্তির রাজধানী। বুদ্ধি হচ্ছে আত্মার সব চাইতে অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। এই বুদ্ধি যখন কামের দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে আত্মাতে অহঙ্কারের সঞ্চার করে, যার ফলে আত্মা জড় ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে জড়ের মাঝে তার স্বরূপ অন্বেষণ করে। জড় ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রকৃত সুখ বলে মনে করে আত্মা তখন তা উপভোগ করতে মত্ত হয়ে ওঠে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৪/১৩) আত্মার এই আত্মবিস্মৃতিকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে-

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষুভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে ত্রিধাতু সমন্বিত এই জড় দেহকে পরম প্রেমাস্পদ আত্মা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে আত্মীয়, পার্থিব জন্মস্থানকে পূজনীয় মনে করে এবং তীর্থস্থানে গিয়ে কেবলমাত্র নদীতে স্নান সেরে চলে আসে, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করে না, সে একটি গাধা অথবা গরু।"

শ্লোক ৪১

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ-সেই হেতু; ত্বম্-তুমি; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়গুলি; আদৌ প্রথমে; নিয়ম্য-নিয়ন্ত্রিত করে; ভরতর্ষভ-হে ভরতশ্রেষ্ঠ; পাপ্মানম্-পাপের প্রধান প্রতীক; প্রজহি-বিনাশ কর; হি অবশ্যই; এনম্-এই; জ্ঞান-জ্ঞান; বিজ্ঞান-আত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞান; নাশনম্-নাশক।

গীতার গান

অতএব হে ভারত! প্রথমেতে কাম।
নিয়মিত করি হও সম্পূর্ণ নিষ্কাম ॥
ভক্তির ধারণ সেই কাম জয় জন্য।
সে জ্ঞান বিজ্ঞাননাশী, নাহি পথ অন্য ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপের প্রতীকরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

ভগবান প্রথম থেকেই অর্জুনকে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করবার উপদেশ দিয়েছেন যাতে তিনি পরম শত্রু কামকে জয় করতে পারেন, কারণ এই কামের প্রভাবে জীব আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে তার স্বরূপ ভুলে যায়। এখানে জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যে জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা মনে করিয়ে দেয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের আত্মাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জড় দেহটি একটি আবরণ মাত্র। বিজ্ঞান বলতে সেই বিশেষ জ্ঞানকে বোঝায়, যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর ব্যাখ্যা করে শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩১) বলা হয়েছে-

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

"আত্মজ্ঞান ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান পরম গোপনীয় ও গভীর রহস্যপূর্ণ, কিন্তু ভগবান যখন নিজে এই জ্ঞান বিশ্লেষণ করেন, তখন তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" ভগবদ্গীতা আমাদেরকে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান প্রদান করে। জীবেরা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এই উপলব্ধিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই, জীবনের শুরু থেকেই আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া, যাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে আমাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি।

প্রতিটি জীবের অন্তরে যে ভগবৎ-প্রেম আছে, তারই বিকৃত প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাম। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই যদি আমরা ভগবানকে ভালবাসতে শিখি, তা হলে আমাদের স্বাভাবিক ভগবৎ-প্রেম আর কামে পর্যবসিত হতে পারে না। ভগবৎ-প্রেম কামে বিকৃত হয়ে গেলে, তখন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনা এমনই শক্তিশালী যে, এমন কি জীবনের শেষ পর্যায়েও যদি কেউ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে, তবে সে কৃষ্ণপ্রেম ফিরে পায়। তাই, জীবনের যে কোন পর্যায়ে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শুরু করা যায়। যখন আমরা কৃষ্ণভাবনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি, ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি, জীবনের যে পর্যায়েই হোক, তখন থেকেই আমরা ভক্তিযোগের অনুশীলন করতে পারি এবং আমাদের পরম শত্রু কামকে কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত করতে পারি। এটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতার স্তর।

শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; পরাণি-শ্রেয়; আহুঃ-বলা হয়; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ-ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা; পরম্-শ্রেয়; মনঃ-মন; মনসঃ-মনের থেকে; তু-ও; পরা-শ্রেয়; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; যঃ-যিনি; বুদ্ধেঃ-বুদ্ধির থেকে; পরতঃ-শ্রেয়; তু-কিন্তু; সঃ-তিনি।

গীতার গান

বদ্ধজীব জড়বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রধান।
ইন্দ্রিয়াধিপতি মন কর্মের বিধান ॥
মন হতে পরবুদ্ধি তারপর আত্মা।
অতএব কর সেবা সেই পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়; ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়; মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়; আর তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

তাৎপর্য

কামের নানাবিধ কার্যকলাপের নির্গম পথ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। কামের সঞ্চয় হয় আমাদের দেহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ হয়। তাই, সামগ্রিকভাবে জড় দেহের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়। আমাদের অন্তরে যখন উচ্চস্তরের চেতনার বিকাশ হয় অথবা কৃষ্ণচেতনার বিকাশ হয়, তখন এই সমস্ত নির্গম পথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অন্তরে কৃষ্ণভাবনার উন্মেষ হলে পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মা তার নিত্য সম্পর্ক অনুভব করে, তাই তখন আর তার জড় দেহের অনুভূতি থাকে না। দেহগত কার্যকলাপগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, তাই ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হলে, দেহও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু সেই অবস্থায় মন সক্রিয় থাকে, যেমন নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু মনেরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে আত্মা। তাই, আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ঠিক এভাবেই কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়

উপভোগের সামগ্রীগুলি শ্রেয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় উপভোগের সামগ্রীগুলি থেকে মন শ্রেয়। তাই, মন যদি সর্বতোভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিপদগামী হবার আর কোন সুযোগ থাকে না। এই মানসিক প্রবৃত্তির কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরং দৃষ্টা নিবর্ততে। মন যদি ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন থাকে, তা হলে নিম্নগামী প্রবৃত্তিগুলিতে আকৃষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তার আর থাকে না।
কঠোপনিষদে আত্মাকে মহান্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আত্মা হচ্ছে-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। তাই, আত্মার স্বরূপ সরাসরি উপলব্ধি করতে পারলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।
বুদ্ধি দিয়ে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে, মনকে কৃষ্ণচেতনায় নিযুক্ত করাই সকলের কর্তব্য। তা হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পরমার্থ সাধনে নবীন ভক্তকে সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়, কেন না তার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে সংযত হয়। তা ছাড়া, বুদ্ধি দিয়েও মনকে তার সঙ্কল্পে দৃঢ় করতে হয়। বুদ্ধির দ্বারা যদি আমরা কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে ভগবানের চরণ-কমলে আত্মনিবেদন করি, তা হলে মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে একাগ্র হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনগুলি আর মনকে বিচলিত করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি তখন বিষদাঁতহীন সাপের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা যদিও বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ না করলে, যে কোন মুহূর্তে মনের প্রভাবে বিচলিত হয়ে আত্মা অধঃপতিত হতে পারে।

শ্লোক ৪৩

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

এবম্-এভাবে; বুদ্ধেঃ-বুদ্ধির; পরম্পরতর; বুদ্ধা-জেনে; সংস্তভ্য-স্থির করে; আত্মানম্-মনকে; আত্মনা-নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা; জহি-জয় করে; শত্রুম্-শত্রুকে; মহাবাহো-হে মহাবীর; কামরূপম্ কামরূপ; দুরাসদম্-দুর্জয়।

গীতার গান

অপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা কর দাস্য তার।
ঘুচিবে সকল মোহ কাম ব্যবহার ॥
সেই সে উপায় এক শত্রু জিনিবার ।
কামরূপ দুরাসদ কেহ নাহি আর ॥

অনুবাদ

হে মহাবীর অর্জুন। নিজেকে জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির কর এবং এভাবেই চিৎশক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের স্বরূপ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যকালের দাস, সেই সত্য উপলব্ধি করতে পেরে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবান বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মো লীন হওয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। জড় জীবনে আমরা স্বাভাবিকভাবে কাম-

প্রবৃত্তি ও জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করবার প্রবৃত্তির দ্বারা প্রলোভিত হই। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ করার বাসনা হচ্ছে বদ্ধ জীবের পরম শত্রু। কিন্তু কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার ফলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারি। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে সংযত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ হবার ফলে আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে একাগ্র করতে পারি। এটিই হচ্ছে এই অধ্যায়ের মর্মার্থ। জড় জীবনের অপরিণত অবস্থায়, নানা রকম দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা এবং তথাকথিত যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হবার যতই চেষ্টা করি না কেন, পারমার্থিক জীবনধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উন্নত বুদ্ধিযোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করলেই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ।।

ইতি-কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন বিষয়ক 'কর্মযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় - জ্ঞানযোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে ব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ইমম্-এই; বিবস্বতে সূর্যদেবকে; যোগম্-ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; প্রোক্তবান্-বলেছিলাম; অহম্-আমি; অব্যয়ম্ অব্যয়; বিবস্বান্-বিবস্বান (সূর্যদেবের নাম); মনবে-মানবজাতির জনক বৈবস্বত মনুকে; প্রাহ-বলেছিলেন; মনুঃ-মনু; ইক্ষ্বাকবে-মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে; অব্রবীৎ-বলেছিলেন।

গীতার গান
ভগবান কহিলেন:
পূর্বে আমি বলেছিলাম, সূর্যকে প্রথম।
এই সে নিষ্কাম কর্ম অপূর্ব কথন ।
সূর্য বলেছিল পরে মনুকে স্বপুত্রে।
ইক্ষ্বাকু শুনিল পরে পরম্পরা সূত্রে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম

কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষাকুকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান ভগবদ্গীতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বহু প্রাচীনকালে সূর্যলোক আদি বিভিন্ন গ্রহলোকের রাজাদের ভগবান এই জ্ঞান দান করেন। সমস্ত গ্রহলোকের রাজাদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে প্রজাপালন করা এবং সেই জন্য তাঁদের সকলেরই ভগবদ্গীতার বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁদের প্রজাদের পারমার্থিক লক্ষ্যের দিকে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেন। তাই ভগবানের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ করে প্রাচীনকালের রাজারা মানুষকে কামনা-বাসনার জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পথ প্রদর্শন করতেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন করা এবং ভগবানের সঙ্গে তার যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া। তাই.. সকল গ্রহলোকের ও সকল রাষ্ট্রের শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে ও ভক্তির মাধ্যমে জনগণকে এই জ্ঞান বিতরণ করা। পক্ষান্তরে বলা যায়, সকল রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং সমাজের নেতাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিজ্ঞান সকলের কাছে বিতরণ করা, যাতে প্রতিটি মানুষ এই মহাবিজ্ঞানের সুফল অর্জন করতে পারে এবং মানব-জীবনের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে সাফল্যের পথে অনুসরণ করতে পারে।

এই মহাকাল কল্পে সূর্যদেবের নাম বিবস্বান, তিনিই হচ্ছেন সূর্যলোকের অধীশ্বর। এই সূর্য থেকেই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৫২)
বলা হয়েছে-

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মা বলেছেন, "সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি ভজন করি।"

সূর্য হচ্ছেন গ্রহগুলির রাজা এবং বর্তমানে সূর্যদেব বিবস্বান সূর্যগ্রহকে পরিচালনা করছেন। এই সূর্যগ্রহ সমস্ত গ্রহগুলিকে তাপ ও আলোক দান করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছেন। এই সূর্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ করে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করেন। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, ভগবদ্গীতা প্রাকৃত পণ্ডিতদের জল্পনা-কল্পনার সামগ্রী নয়, গীতা স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৪৮/৫১-৫২) আমরা ভগবদ্গীতার ইতিহাসের উল্লেখ পাই-

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষাকবে দদৌ।
ইক্ষাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥

"ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। মানব-সমাজের পিতা মনু এই জ্ঞান তাঁর পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং রঘুবংশের জনক ইক্ষাকুকে দান করেন। এই রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন।" সুতরাং, ভগবদ্গীতা মহারাজ ইক্ষাকুর সময় থেকেই মানব-সমাজে বর্তমান।

এই পৃথিবীতে এখন কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর চলছে। কলিযুগের স্থায়িত্ব ৪.৩২,০০০ বছর। এর আগে ছিল দ্বাপরযুগ (৮,০০,০০০ বছর) এবং তার আগে ছিল ত্রেতাযুগ (১২,০০,০০০ বছর)। এভাবে প্রায় ২০,০৫,০০০ বছর আগে মনু তাঁর পুত্র এই পৃথিবীর অধীশ্বর ইক্ষ্মাকুকে এই ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করেন। বর্তমান মনুর আয়ু ৩০,৫৩,০০,০০০ বছর, তার মধ্যে ১২,০৪,০০,০০০ অতিবাহিত হয়েছে। আমরা যদি মনে করি, মনুর জন্মের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন, তা হলেও গীতা প্রথমে বলা হয় ১২,০৪,০০,০০০ বছর আগে এবং মানব-সমাজে এই জ্ঞান প্রায় ২০,০০,০০০ বছর ধরে বর্তমান। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান এই জ্ঞান পুনরায় অর্জুনকে দান করেন। গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুযায়ী এই হচ্ছে গীতার ইতিহাস। ভগবান সর্বপ্রথম এই জ্ঞান বিবস্বানকে দান করেন, কারণ বিবস্বানও হচ্ছেন একজন ক্ষত্রিয় এবং সূর্যবংশজাত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের তিনিই হচ্ছেন আদি পিতা। ভগবানের কাছ থেকে আমরা ভগবদ্গীতা প্রাপ্ত হয়েছি বলে ভগবদ্গীতা বেদেরই মতো পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত-এই জ্ঞান অপৌরুষেয়। বৈদিক জ্ঞানকে যেমন যথানুরূপভাবে গ্রহণ করতে হয়, মানুষের কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা সেখানে প্রযোজ্য ৩য় না, ভগবদ্গীতাও তেমনই জড় বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাখ্যার কলুষমুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে। প্রাকৃত তার্কিকেরা ভগবানের দেওয়া ভগবদ্গীতার উপর তাদের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা যথাযথ ভগবদ্গীতা নয়। ভগবদ্গীতার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয় গুরু-পরম্পরার ধারায় এবং এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান এই জ্ঞান প্রথমে বিবস্বানকে দান করেন। বিবস্বান তা দেন মনুকে, মনু ইক্ষাকুকে-এভাবেই গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে।

শ্লোক ২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ৷

এবম্-এভাবে; পরম্পরা-পরম্পরাক্রমে; প্রাপ্তম্-প্রাপ্ত; ইমম্-এই বিজ্ঞান; রাজর্ষয়ঃ-রাজর্ষিরা; বিদুঃ-বিদিত হয়েছিলেন; সঃ-সেই জ্ঞান; কালেন-কালের প্রভাবে; ইহ-এই জগতে; মহতা-সুদীর্ঘ; যোগঃ-পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত বিজ্ঞান; নষ্টঃ-বিনষ্ট; পরন্তপ-হে শত্রু দমনকারী অর্জুন।

গীতার গান

সেই পরম্পরা দ্বারা রাজর্ষিগণ।
একে একে শুনে সব গীতার বচন ॥
কালক্রমে পরম্পরা হয়েছে বিনষ্ট।
পরম্পরা বিনা জান সব অর্থ ভ্রষ্ট ॥

অনুবাদ

এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গীতা রাজর্ষিদের জন্যই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হয়েছিল,

কারণ প্রজাপালনের কাজে তাঁরা যথার্থভাবে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কার্যকরী করবেন। ভগবদ্গীতার অমৃতময় উপদেশ কখনই অসুরদের জন্য নয়। তারা এই জ্ঞানকে গ্রহণ করতে অক্ষম এবং জনগণের সেবায় প্রয়োগ করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে, তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভগবানের দেওয়া এই দিব্য জ্ঞানের কদর্থ করে। এই সমস্ত মূঢ় দুরাচারীদের কদর্থ সমন্বিত মন্তব্যে ভগবদ্গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য যখন ব্যাহত হয়, তখন গুরু-শিষ্যের পরম্পরার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান স্বয়ং লক্ষ্য করেন যে. সেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, গীতার উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেছে। আজকের জগতেও আমরা দেখতে পাই, গীতার অর্থ কিভাবে বিকৃত হয়ে গেছে গীতার অনেক সংস্করণ আছে (বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায়), কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কোনটাই গুরু-পরম্পরার ধারা অনুযায়ী নয়। তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা গীতার অসংখ্য ধরনের ব্যাখ্যা লিখে কৃষ্ণকথার নামে একটি ভাল ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কেউই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে না। এটিই হচ্ছে আসুরিক প্রবৃত্তি। অসুরেরা কখনও ভগবানকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের সম্পত্তি ভোগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত ভগবদ্গীতার যথাযথ একটি ব্যাখ্যা প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা উপলব্ধি করে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। ভগবদ্গীতা মানুষের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ, মানব-সমাজে এটি এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করে, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনামূলক নিবন্ধ মনে করলে, কেবল সময়েরই অপচয় করা হবে।

শ্লোক ৩

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

সঃ-সেই; এব-অবশ্যই; অয়ম্-এই; ময়া-আমার দ্বারা; তে-তোমাকে; অদা-আজ; যোগঃ-যোগ-বিজ্ঞান; প্রোক্তঃ-বলা হল; পুরাতনঃ-অতি প্রাচীন; ভক্তঃ-ভক্ত; অসি-তুমি হও; মে-আমার; সখা-সখা; চ-ও; ইতি-অতএব; রহস্যম্ রহস্য; হি-অবশ্যই; এতৎ-এই; উত্তমম্-উত্তম।

গীতার গান

অতএব কহি পুনঃ সেই পুরাতন।
পুনর্বার পরম্পরা করিতে স্থাপন ॥
ভক্তি বিনা কে বুঝিবে গীতার রহস্য ।
তুমি মোর প্রিয়সখা করহ বিমুষ্য ॥

অনুবাদ

সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে দুই রকমের মানুষ আছে, তারা হচ্ছে ভক্ত ও অসুর। ভগবান অর্জুনকে ভগবদ্গীতা দান করতে মনস্থ করেছিলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর শুদ্ধ ভক্ত। অসুরেরা

কখনই এই রহস্যাবৃত জ্ঞানের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। এই মহৎ শাস্ত্র ভগবদ্গীতার বহু সংস্করণ আছে, তাদের মধ্যে কোনটি ভক্তের মন্তব্য সমন্বিত, আর কোনটি অসুরের মন্তব্য সমন্বিত। ভক্তের মন্তব্য সমন্বিত ভগবদ্গীতা পড়লে অনায়াসে গীতার যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করা যায় এবং তার ফলে ভগবানের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু অসুরের মন্তব্য পড়লে কোনই কাজ হয় না, উপরন্তু সর্বনাশ হয়। অর্জুন জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, তাই অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের কারণ, পরমেশ্বর ভগবান বলে মেনে নিয়ে ভগবদ্গীতাকে হৃদয়ঙ্গম করলেই এই পরম বিজ্ঞানের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। অসুরেরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে না। বরং তারা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। তারা ভগবানের নানা রকম পরিচয়ও খুঁজে বার করে। এভাবেই তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পথভ্রষ্ট করে এবং ভগবৎ-বিদ্বেষী করে তোলে। তাই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যাতে এই সমস্ত অসুরেরা আমাদের আর অনিষ্ট না করতে পারে। আমাদের উচিত অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্গীতার মর্মার্থ উপলব্ধি করা এবং ভগবানের দেওয়া এই আশীর্বাদকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে আমাদের মানবজন্ম সার্থক করে তোলা।

শ্লোক ৪

অর্জুন উবাচ
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; অপরম্-পরবর্তী; ভবতঃ-তোমার; জন্ম-জন্ম; পরম্-পূর্বে; জন্ম-জন্ম; বিবস্বতঃ-সূর্যদেবের; কথম্-কিভাবে; এতৎ-এই; বিজানীয়াম্-আমি বুঝব; ত্বম্-তুমি; আদৌ পুরাকালে; প্রোক্তবান্-বলেছিলে; ইতি-এভাবে।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
তুমি ত নবীন সখা সেদিন জন্মিলে।
কোটি কোটি বর্ষ পূর্বে সূর্য জন্ম নিলে ॥
এ কথা কি করে বুঝি পূর্ব এত দিনে।
উপদেশ পুরাতন তুমি বলেছিলে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে পুরাকালে তাঁকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?

তাৎপর্য

অর্জুন হচ্ছেন ত্রিভুবন বিশ্রুত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; তা হলে এটি কি করে সম্ভব যে, তিনি ভগবানের কথা বিশ্বাস করছেন না? তার কারণ হচ্ছে, অর্জুন এই কথাগুলি তাঁর নিজের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন না, কিন্তু যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না অথবা যে সমস্ত অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানতে চায় না, তাদের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন। দশম অধ্যায়ে প্রমাণিত হবে যে, অর্জুন সব সময়ই জানতেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম

ভগবান, সব কিছুর উৎস এবং পরম-তত্ত্বের শেষ কথা। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি বুঝতে পারা খুবই কঠিন যে, বসুদেব ও দেবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অনন্ত শক্তির উৎস ও অনাদির আদিপুরুষ ভগবান হতে পারেন। তাই, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, যাতে তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দান করে সকলের সন্দেহের নিরসন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা শুধু আজ নয়, পুরাকাল থেকে সমগ্র জগতের সকলেই বিশ্বাস করে আসছে, কিন্তু অসুরেরাই কেবল সেই সত্যকে মানতে চায় না। সে যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বজনগ্রাহ্য প্রামাণ্য উৎস, সেই জন্য অর্জুন এই প্রশ্নটি তাঁর কাছেই উপস্থাপন করেছিলেন যাতে তিনি নিজেই তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেন, অসুরদের কাছে ব্যাখ্যা শুনতে তিনি চাননি। কারণ, অসুরেরা সব সময়ে তাদের নিজেদের এবং অনুগামীদের বোধগম্য বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাতে চেয়েছে। প্রত্যেকেরই তার নিজের স্বার্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান জানা উচিত। তাই, ভগবান যখন নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত পরিচয় দান করেন, তখন সমস্ত জগতের মঙ্গল হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান • অসুরদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে, কারণ তারা অনাদি, অনন্ত ভগবৎ-তত্ত্বকে তাদের সীমিত মস্তিষ্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করতে চায়; কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানের নিজের দেওয়া ভগবৎ-তত্ত্বকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে কৃতার্থ হন। ভক্তবৃন্দ চিরকালই এই পরমতত্ত্ব গ্রহণে আগ্রহী, কারণ তাঁরা সর্বদা ভগবানের অনন্ত লীলা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। যারা নিরীশ্বরবাদী ভগবৎ-বিদ্বেষী, যারা মনে করে ভগবানও হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ, তারাও এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতি মানবিক, তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়, তিনি অপ্রাকৃত, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত। ভগবানের ভক্ত মাত্রই অর্জুনের মতো সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকে না। অসুরেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যের অধীন একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাদের সেই অবিশ্বাস জনিত যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের কাছে তাঁর ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের মনে ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহের কোন রকম অবকাশই থাকে না।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; বহুনি-বহু; মে-আমার; ব্যতীতানি-অতীত হয়েছে, জন্মানি-জন্ম; তব-তোমার; চ-এবং; অর্জুন-হে অর্জুন; তানি-সেই সমস্ত; অহম্-আমি; বেদ-জানি; সর্বাণি-সমস্ত; ন- না; ত্বম্-তুমি; বেথ-জান; পরন্তপ-হে শত্রু দমনকারী।
গীতার গান

ভগবান কহিলেন:
হে অর্জুন বহু জন্ম তোমার আমার ।
হয়েছে পূর্বকালে সে সব অপার ॥

ভুলি নাই আমি সেই তুমি ভুলে গেছ।
আমি বিভু তুমি জীব এইভাবে আছ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে পরন্তপ অর্জুন। আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৩) আমরা ভগবানের নানাবিধ অবতারের সম্বন্ধে জানতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে-

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত ও অনাদি। যদিও অনন্ত রূপে পরিব্যাপ্ত, তবুও তিনি সকলের আদি, পুরাণ-পুরুষ এবং তিনি সর্বদাই নব-যৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। যাঁরা শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, তাঁদের কাছেও ভগবানের সচ্চিদানন্দময় এই রূপ দুর্লভ, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানকে এই রূপে দর্শন করেন।"

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) আরও বলা হয়েছে-

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি, যিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব আদি বহুরূপে অবতরণ করেন, কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর আদি স্বরূপ এবং তিনি স্বয়ং অবতরণও করেন।"

বেদেও বলা হয়েছে যে, যদিও ভগবান অদ্বৈত, তবুও তিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন। বৈদূর্যমণি থেকে যেমন নানা বর্ণ বিচ্ছুরিত হলেও তার নিজের কোন পরিবর্তন হয় না, ভগবানও তেমন নানারূপে প্রকাশিত হলেও তাঁর নিজের কোন পরিবর্তন হয় না। ভগবানের সেই অনন্ত রূপ বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর অনন্ত রূপের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন (বেদেয় দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ)। অর্জুনের মতো ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সহচর। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরাও তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন। অর্জুন হচ্ছেন সেই রকমই একজন ভক্ত। এই শ্লোকে বোঝা যায়, লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভগবান যখন সূর্যদেব বিবস্বানকে ভগবদ্গীতা শোনান, তখন অর্জুনও অন্য কোন রূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান তা ভোলেননি, কিন্তু অর্জুন তা ভুলে গেছেন। বিভুচৈতন্য ভগবানের সঙ্গে অণুচৈতন্য জীবের এটিই পার্থক্য। অর্জুন ছিলেন মহা শক্তিশালী বীর, তিনি ছিলেন পরন্তপ, কিন্তু তা হলেও বহু পূর্ব জন্মের কথা মনে রাখবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই, ক্ষমতার মাপকাঠিতে জীব যত মহৎই হোক না কেন, সে কখনই ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না। যিনি ভগবানের নিত্য সহচর, তিনি অবশ্যই একজন মুক্ত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতাতে ভগবানকে অচ্যুত বলে বর্ণনা

করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, জড়-জগতে এলেও ভগবান মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কখনই আত্মবিস্মৃত হন না। তাই, জীব কখনই ভগবান হতে পারে না, এমন কি অর্জুনের মতো মুক্ত জীবও সকল বিষয়ে ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। অর্জুন যদিও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তবুও তিনি মাঝে মাঝে ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হন, আবার ভগবানের দিব্য কৃপার ফলে ভক্ত মুহূর্তের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কিন্তু অভক্ত বা অসুরেরা কখনই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তারই ফলস্বরূপ গীতায় বর্ণিত ভগবানের এই দিব্য তত্ত্বকে আসুরিক বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিত্য সহচর অর্জুন উভয়েই নিত্য শাশ্বত, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভগবান যে লীলা প্রকট করেন, তা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মনে আছে, কিন্তু অর্জুনের মনে নেই। এই শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, জীবের দেহান্তর হবার ফলে তার পূর্ণ বিস্মরণ ঘটে, কিন্তু ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ পরিবর্তন করেন না, তাই তিনি কিছুই ভোলেন না। তিনি অদ্বৈত অর্থাৎ তাঁর দেহ এবং তিনি স্বয়ং এক ও অভিন্ন। ভগবান সম্পর্কিত সব কিছুই চিন্ময়, কিন্তু জীবের স্বরূপ এবং তার জড় দেহ এক নয়। ভগবান যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখনও তাঁর দেহ এবং তিনি স্বয়ং একই থাকেন। তাই, জড় জগতে অবতরণ করলেও তিনি জীবের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবানের এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব অসুরেরা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সেই কথা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৬

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অজঃ-জন্মরহিত; অপি-যদিও; সন্-হয়েও; অব্যয়-অক্ষয়; আত্মা-দেহ; ভূতানাম্-জীবসমূহের; ঈশ্বরঃ-পরমেশ্বর; অপি-যদিও; সন্-হয়ে; প্রকৃতিম্-চিন্ময় রূপে; স্বাম্-আমার; অধিষ্ঠায়-অধিষ্ঠিত হয়ে; সম্ভবামি-আবির্ভূত হই; আত্মমায়য়া-আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

গীতার গান

সকলের নিয়ামক অজন্মা হইয়া।
অব্যয়াত্মা পরমাত্মা ভুবন ভরিয়া ॥
তথাপি স্বশক্তি সাথে জন্ম লই আমি।
সেই ভগবত্তা মোর ভাল বুঝ তুমি ॥

অনুবাদ

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন-যদিও তিনি সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন, তবুও তাঁর বহু বহু পূর্ব 'জন্মের' সমস্ত ঘটনাই তাঁর মনে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কি ঘটেছিল, তা মনে রাখতে পারে না। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, একদিন আগে ঠিক একই সময়ে সে কি করেছিল,

তবে সাধারণ লোকের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাকে অনেক হিসাব-নিকাশ করে, স্মৃতি রোমন্থন করে, তবে মনে করতে হয় গত দিন ঠিক সেই সময়ে সে কি করেছিল, অথচ তারাই আবার ভগবান হবার দুরাশা পোষণ করে। এই ধরনের অর্থহীন দাবি শুনে কারও বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। ভগবান এখানে তাঁর প্রকৃতি বা রূপের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতি বলতে 'স্বভাব' ও 'স্বরূপ' দুই-ই বোঝায়। ভগবান বলছেন, তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। সাধারণ জীবদের মতো তিনি এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হন না। বদ্ধ জীবাত্মা এই জন্মে এক রকম দেহ ধারণ করতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জন্মে সে ভিন্ন দেহ ধারণ করে। জড় জগতে জীবের দেহ স্থায়ী নয়, প্রকৃতপক্ষে সে প্রতিনিয়তই তার দেহ পরিবর্তন করছে। কিন্তু ভগবানকে দেহ পরিবর্তন করতে হয় না। যখন তিনি জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ নিয়েই আবির্ভূত হন। অর্থাৎ, তিনি যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর দ্বিভুজ, মুরলীধারী শাশ্বত রূপ নিয়েই আবির্ভূত হন। জড় জগতের কোন কলুষই তাঁর রূপকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যদিও তাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর থাকেন, তবুও তাঁর জন্মলীলা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই বলে মনে হয়। তাঁর দেহ যদিও পরিবর্তন হয় না, তবুও তিনি শৈশব থেকে পৌগণ্ডে, পৌগণ্ড থেকে কিশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে যৌবনের ঊর্ধ্বে তাঁর দেহের আর কোন রূপান্তর হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁর অনেক পৌত্র ছিল, অর্থাৎ জাগতিক হিসাবে তাঁর তখন অনেক বয়স হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত যেন তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছরের যুবক। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বকালীন আদিপুরুষ-সর্বপ্রাচীন পুরুষ, কিন্তু তাঁকে আমরা কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধরূপে দেখি না, কোন ছবিতেও শ্রীকৃষ্ণকে বার্ধক্যগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় না। কখনও তাঁর দেহের অথবা বুদ্ধির কোন রকম বিকার হয় না। তাই আমরা সহজেই বুঝতে পারি, এই জড় জগতে এসে সাধারণ মানুষের মতো লীলাখেলা করলেও তিনি চিরকালই অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন, আদিপুরুষ ও সচ্চিদানন্দময়। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সূর্যের মতো যেন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন, তারপর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। আকাশে সূর্যকে দেখে যেমন আমরা মনে করি, সূর্য এখন আকাশে রয়েছে, তারপর আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে যেমন আমরা মনে করি সূর্য এখন অস্ত গেছে। প্রকৃতপক্ষে সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে রয়েছে, কিন্তু আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে আমরা মনে করি যে, সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। ভগবানও তেমন নিত্য। তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সাধারণ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মতো নয়, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দময় এবং জড়া প্রকৃতির দ্বারা তিনি কখনই কলুষিত হন না। বেদেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু তবুও মনে হয় তাঁর বহুধা প্রকাশরূপে তিনি যেন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেছেন। সমস্ত বৈদিক অনুশাস্ত্রাদিতেও অনুমোদন করা হয়েছে যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হলেও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ও অপরিবর্তনীয় দেহ নিয়েই অবতরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, কংসের কারাগারে তিনি চতুর্ভুজ ও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ রূপ নিয়ে তাঁর মায়ের সামনে আবির্ভূত হন। জীবদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই তিনি তাঁর শাশ্বত আদি রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, যাতে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে-নির্বিশেষ রূপের প্রতি নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। মায়া অথবা আত্মমায়া হচ্ছে ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপা-বিশ্বকোষ

অভিধানে তাই বলা হয়েছে। ভগবান তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত অবতরণের এবং অন্তর্ধানের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখেন। কিন্তু সাধারণ জীব অন্য একটি দেহ পাওয়া মাত্রই তার পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা ভুলে যায়। ভগবান সমস্ত জীবের ঈশ্বর, কারণ এই জগতে অবস্থান করার সময় তিনি বিস্ময়কর ও অতিমানবীয় অসীম শৌর্যবীর্যের লীলা প্রদর্শন করেন। তাই, ভগবান সব সময়ই পরমতত্ত্ব। তাঁর নাম ও রূপের মধ্যে, গুণ ও লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান কেন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং আবার অন্তর্হিত হয়ে যান। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

যদা যদা-যখন ও যেখানে; হি অবশ্যই; ধর্মস্য ধর্মের; গ্লানিঃ-হানি; ভবতি-হয়; ভারত-হে ভরতবংশীয়; অভ্যুত্থানম্-উত্থান; অধর্মস্য অধর্মের; তদা-তখন; আত্মানম্-নিজেকে; সৃজামি প্রকাশ করি; অহম্-আমি।

গীতার গান

যদা যদা ধর্মগ্লানি হইল সংসারে।
হে ভারত! বিশ্বভার লঘু করিবারে ॥
অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্মগ্লানি হলে।
আত্মার সৃজন করি দেখয়ে সকলে ॥

অনুবাদ

হে ভারত। যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

এখানে সৃজামি কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই সৃজামি কথাটি সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী শ্লোক অনুযায়ী, ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য বিরাজমান, তাই ভগবানের রূপ বা শরীর কখনও সৃষ্টি হয় না। সুতরাং, সৃজামি মানে-ভগবানের যা স্বরূপ, সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যদিও ব্রহ্মার একদিনে, সপ্তম মনুর অষ্ট-বিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু প্রকৃতির কোন নিয়মকানুনের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ নন। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে লীলা করেন-তিনি হচ্ছেন স্বরাট়। তাই, যখন অধর্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্মের গ্লানি হয়, তখন ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই জড় জগতে অবতরণ করেন। ধর্মের তত্ত্ব বেদে নির্দেশিত হয়েছে এবং বেদের এই নির্দেশগুলির যথাযথ আচার না করাটাই হচ্ছে অধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, এই সমস্ত নির্দেশগুলি হচ্ছে ভগবানের আইন এবং ভগবান নিজেই কেবল ধর্মের সৃষ্টি করতে পারেন। বেদ ভগবানেরই বাণী এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনি এই জ্ঞান সঞ্চার করেন। তাই ধর্মের বিধান হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ (ধর্মং তু সাক্ষাত্ত-গবৎপ্রণীতম্)। ভগবদগীতার সর্বত্রই এই তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের নির্দেশে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে বেদের উদ্দেশ্য। গীতার শেষে ভগবান স্পষ্টভাবেই বলেছেন,

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ সর্ব ধর্ম ত্যাগি লও আমার শরণ। বৈদিক নির্দেশগুলি মানুষকে ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগত হতে সাহায্য করে। যখনই অসুরেরা অথবা আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তাতে বাধার সৃষ্টি করে, তখন ভগবান আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানতে পারি, যখন জড়বাদে পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল এবং জড়বাদীরা বেদের নাম করে যথেচ্ছাচার করছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার বুদ্ধদেব অবতরণ করেছিলেন। বেদে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় পশুবলি দেবার বিধান আছে, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে নিজেদের ইচ্ছামতো পশুবলি দিতে শুরু করে। এই অনাচার দূর করে বেদের অহিংস নীতির প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, ভগবানের সমস্ত অবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং শাস্ত্রে তার উল্লেখ থাকে: শাস্ত্রের প্রমাণ না থাকলে কাউকে অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। অনেকে আবার মনে করেন, ভগবান কেবল ভারত-ভূমিতেই অবতরণ করেন, কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায়, যে কোন রূপে অবতরণ করতে পারেন। প্রত্যেক অবতরণে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ততটুকুই ব্যাখ্যা করেন, যতটুকু সেই বিশেষ স্থান ও কালের মানুষেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য একই থাকে-ধর্ম সংস্থাপন করা এবং মানুষকে ভগবন্মুখী করা। কখনও তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন, কখনও তিনি তাঁর সন্তান অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, আবার কখনও তিনি ছদ্মবেশে অবতরণ করেন।
অর্জুনের মতো মহাভাগবতকে ভগবান ভগবদ্গীতা শুনিয়েছিলেন, কারণ ভগবদ্গীতার মর্মার্থ উন্নত বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল বুঝতে পারে। দুই আর দুইয়ে চার হয়। এই আঙ্কিক তত্ত্ব একটি শিশুর কাছেও সত্য আবার একজন মহাপণ্ডিত গণিতজ্ঞের কাছেও সত্য, কিন্তু তবুও গণিতের স্তরভেদ আছে। প্রতিটি অবতারে ভগবান একই তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, কিন্তু স্থান-কাল বিশেষে তাদের উচ্চ ও নিম্ন মানসম্পন্ন বলে মনে হয়। উচ্চ মানের ধর্ম অনুশীলন শুরু হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম সমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বত্র সকলকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। কেবলমাত্র অবস্থাভেদে সময়-সময় এই ভাবনার প্রকাশ ও অপ্রকাশ হয়।

শ্লোক ৮

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

পরিত্রাণায়-পরিত্রাণ করার জন্য; সাধূনাম্-ভক্তদের; বিনাশায়-বিনাশ করার জন্য; চ-এবং; দুষ্কৃতাম্-দুষ্কৃতকারীদের; ধর্ম-ধর্ম; সংস্থাপনার্থায় সংস্থাপনের জন্য; সম্ভবামি-অবতীর্ণ হই; যুগে যুগে-যুগে যুগে।

গীতার গান
সাধুদের পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ।
যে করে অধর্ম তার করি সর্বনাশ ॥
আর ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন ।
যুগে যুগে আসি আমি মান সে বচন ॥

অনুবাদ

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা অনুসারে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ যে মানুষ, তিনি হচ্ছেন সাধু। কোন লোককে আপাতদৃষ্টিতে অধার্মিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তরে তিনি যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তবে বুঝতে হবে তিনি সাধু। আর যারা কৃষ্ণভাবনাকে গ্রাহ্য করে না, তাদের উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতাম্ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত অসাধু বা দুষ্কৃতকারীরা লৌকিক বিদ্যায় অলঙ্কৃত হলেও এদের মূঢ় ও নরাধম বলা হয়। কিন্তু যিনি চব্বিশ ঘণ্টায় ভগবদ্ভক্তিতে নিয়োজিত, তিনি যদি মূর্খ এবং অসভ্যও হন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি সাধু। রাবণ, কংস আদি অসুরদের নিধন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যেমনভাবে অবতরণ করেছিলেন, নিরীশ্বরবাদীদের বিনাশ করবার জন্য তাঁকে তেমনভাবে অবতরণ করতে হয় না। ভগবানের অনেক অনুচর আছেন, যাঁরা অনায়াসে অসুরদের সংহার করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর ভক্তদের শান্তিবিধান করা। অসুরেরা ভগবানের ভক্তদের নানাভাবে কষ্ট দেয়, তাঁদের উপর উৎপাত করে, তাই তাঁদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। অসুরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তদের উপর অত্যাচার করা, ভক্ত যদি তার পরমাত্মীয়ও হয়, তবুও সে রেহাই পায় না। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সন্তান, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে। শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী ছিলেন কংসের ভগিনী, কিন্তু তা সত্ত্বেও কংস তাঁকে এবং তাঁর পতি বসুদেবকে নানাভাবে নির্যাতিত করে, কারণ সে জানতে পেরেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন। এর থেকে বোঝা যায়, কংসকে নিধন করাটা শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেবকীকে উদ্ধার করা। কিন্তু এই দুটি কাজই একসঙ্গে সাধিত হয়েছিল। তাই ভগবান এখানে বলেছেন, সাধুদের পরিত্রাণ আর অসাধুর বিনাশ করবার জন্য তিনি অবতরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিম্নলিখিত (মধ্য ২০/২৬৩-২৬৪) শ্লোকগুলির মাধ্যমে ভগবানের অবতরণের মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে উপস্থাপনা করেছেন-

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্তি 'অবতার' নাম ধরে ।
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥

"ভগবৎ-ধাম থেকে এই জড় জগতে প্রকট হবার ফলে ঈশ্বরমূর্তি অবতার নাম ধরে। এই অবতারেরা অপ্রাকৃত পরব্যোমে অবস্থান করেন। প্রাকৃত জগতে অবতরণ করার জন্য তাঁকে অবতার বলা হয়।"

ভগবানের অনেক রকম অবতার আছে, যেমন-পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, মন্বন্তর অবতার ও যুগাবতার। তাঁরা নির্ধারিত সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস-আদিপুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের আর্তিহরণ এবং পরিতোষণ করবার জন্য, যাঁরা তাঁর শাশ্বত সনাতন শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় তাঁকে দর্শন করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পরিতোষণ করা।

ভগবান এখানে বলেছেন, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি কলিযুগেও অবতরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে, কলিযুগের অবতার গৌরসুন্দর

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করবেন। তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করে গেছেন-

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণের কথা উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশে গুপ্তভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ভগবানের এই অবতার দুষ্কৃতকারীদের সংহার করেন না,, বরং তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপায় ভবসাগর থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

শ্লোক ৯

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥

জন্ম-জন্ম; কর্ম-কর্ম; চ-এবং; মে-আমার; দিব্যম্-দিব্য; এবম্-এভাবে; যঃ-যিনি; বেত্তি জানেন; তত্ত্বতঃ-যথার্থভাবে; ত্যক্ত্বা-ত্যাগ করে; দেহম্-বর্তমান দেহ; পুনঃ-পুনরায়; জন্ম-জন্ম; ন-না; এতি-প্রাপ্ত হন; মাম্ আমাকে; এতি-প্রাপ্ত হন; সঃ-তিনি; অর্জুন-হে অর্জুন।

গীতার গান

আমার যে জন্মকর্ম সে অতি মহান।
যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান ॥
সে ছাড়িয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম।
মম ধামে ফিরি আসে ছাড়ে জড় ধর্ম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরব্যোম থেকে ভগবানের অবতরণের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন এবং তাই দেহত্যাগ করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। জড় বন্ধন থেকে এভাবে মুক্ত হওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কৃম্প্রসাধনের ফলে এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা যে মুক্তি লাভ করে, তা পূর্ণ মুক্তি নয়, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ ও তাঁর লীলার অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করতে পেরে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন আর তাঁর জড় জগতে অধঃপতিত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে, ভগবানের রূপ অনন্ত, ভগবানের অবতার অনন্ত-অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্। ভগবানের রূপ অনন্ত হলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত জড় জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা এই পরম সত্যকে

বিশ্বাস করতে পারে না। বেদে (পুরুষবোধিনী উপনিষদে) বলা হয়েছে-
একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মা।
"এক ও অদ্বিতীয় ভগবান নানা দিব্যরূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে লীলা করতে নিত্য অনুরক্ত।" বেদের এই উক্তিকে ভগবান নিজেই গীতার এই শ্লোকে প্রমাণিত করেছেন। যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বেদের এই কথাকে, ভগবানের এই কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কালক্ষয় করেন না, তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মুক্তি লাভ করেন। বেদের তত্ত্বমসি কথাটির যথার্থ তাৎপর্য এই সন্দর্ভে আছে। যিনি বুঝতে পেরেছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর অথবা যিনি ভগবানকে বলতে পারেন, "তুমিই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান"-তাঁর তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের নিত্য ধামে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানের চিন্ময় সাহচর্য লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানের এই রকম একনিষ্ঠ ভক্তই যে পরমার্থ লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে বৈদিক উক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে-

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।

"পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার ফলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনই পথ নেই।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮) কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার পক্ষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মধুর বোতল চাটলেই যেমন মধুর স্বাদ লাভকরা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে ভগবদ্গীতা পাঠ করলে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা করলেও তেমন কোন কাজ হয় না। এই সমস্ত দার্শনিকেরা জড় জগতে অনেক সম্মান, অনেক প্রতিপত্তি, অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে, কিন্তু তারা ভগবানের কৃপা লাভ করে মুক্তি লাভের যোগ্য নয়। ভগবস্তক্তের অহৈতুকী কৃপা লাভ না করা পর্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত এই সমস্ত পণ্ডিতেরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে পরমার্থ সাধন করা।

শ্লোক ১০

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীত-মুক্ত; রাগ-আসক্তি; ভয়-ভয়; ক্রোধাঃ-ক্রোধ; মন্ময়া-আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত; মাম্-আমার; উপাশ্রিতাঃ-একান্তভাবে আশ্রিত হয়ে; বহবঃ-বহু, জ্ঞান-জ্ঞান; তপসা-তপস্যার দ্বারা; পূতাঃ-পবিত্র হয়ে; মদ্ভাবম্-আমার প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম; আগতাঃ-লাভ করেছে।

গীতার গান

ছাড়ি রাগ ভয় ক্রোধ ত্রিবিধ অসার।
মন্ময় মঙক্তি সাধ্য করিয়া বিচার ॥
বহু ভক্ত জ্ঞানী সব তপস্যার দ্বারে।
বিধৌত হইয়া পাপ পেয়েছে আমারে ।

অনুবাদ

আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে এবং

এভাবেই সকলেই আমার অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করেছে।

তাৎপর্য

আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ জড়ের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত, তাদের পক্ষে পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করা দুষ্কর। সাধারণত, যে সমস্ত মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত, তারা জড় বস্তুবাদ চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, তাদের পক্ষে ভগবানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। এই সমস্ত জড়বাদীরা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, ভগবানের একটি চিন্ময় দেহ আছে, যা অবিনশ্বর, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং নিত্য আনন্দময়। জড়বাদী চিন্তাধারায়, আমাদের জড় দেহটি নশ্বর, অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সুতরাং, এই জড় দেহটিকেই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মেনে নিয়ে আমরা মনে করি, ভগবানের দেহটিও তেমন নশ্বর, অজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সুতরাং, সাধারণ মানুষকে যখন ভগবানের ব্যক্তিগত স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তখন তারা জড় দেহগত ধারণাই মনে ভাবতে থাকে। এই জড় দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহসর্বস্ব মানুষ মনে করে, বিশ্বচরাচরের যে বিরাটরূপ সেটিই পরমতত্ত্ব। তার ফলে তারা মনে করে, পরমেশ্বরের কোন আকার নেই-তিনি নির্বিশেষ। আর তারা এতই গভীরভাবে বিষয়াসক্ত যে, জড় জগৎ থেকে মুক্ত হবার পরেও যে একটি অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব আছে, তা তারা মানতে ভয় পায়। যখন তারা অবহিত হয় যে, চিন্ময় জীবনও হচ্ছে স্বতন্ত্র ও সবিশেষ, তখন তারা পুনরায় ব্যক্তি হবার ভয়ে ভীত হয় এবং তাই নিরাকার, নির্বিশেষ শূন্যে বিলীন হতে পারলেই পরম প্রাপ্তি বলে তারা মনে করে। সাধারণত তারা জীবাত্মাকে সমুদ্রের বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনা করে, যা সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যায়। তাদের মতে এটিই হচ্ছে পৃথক ব্যক্তিসত্তা রহিত চিন্ময় অস্তিত্বের চরম সিদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানশূন্য জীবনের এক ভয়ংকর অবস্থা। এ ছাড়া আর এক দল লোক আছে যারা অপ্রাকৃত অস্তিত্বের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। মানুষের কল্পনাপ্রসূত নানা রকম দার্শনিক মতবাদ এবং তাদের মতভেদের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে তারা এতই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যে, শেষকালে তারা মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত নেয়, ভগবান নেই এবং এক সময় সব কিছুই শূন্যে পর্যবসিত হবে। এই ধরনের লোকেরা বিকারগ্রস্ত রুগ্ন জীবন যাপন করে। আর এক ধরনের লোক আছে, যারা জড় বিষয়ে এতই আসক্ত যে, পারমার্থিক তত্ত্ব নিয়ে তারা একেবারেই মাথা ঘামায় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরম চিন্ময় কারণে লীন হতে চায় এবং কেউ কেউ আবার মনগড়া দার্শনিক তত্ত্বের কোন কূল-কিনারা না পেয়ে, নিরাশ হয়ে সব কিছুকেই অবিশ্বাস করে। এই ধরনের মানুষেরা গাঁজা, চরস, ভাঙ আদি মাদকদ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের সেই নেশাগ্রস্ত বিকৃত মনের অলীক কল্পনাকে দিব্য দর্শন বলে প্রচার করে ধর্মভীরু কিছু মানুষকে প্রতারিত করে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, পারমার্থিক কর্তব্যে অবহেলা করা, ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপকে আমাদের জড় রূপের মতো বলে মনে করে ভীত হওয়া এবং জড় জীবনের নৈরাশ্যের ফলে সব কিছুকে শূন্য বলে মনে করা-জড় জগতের এই তিনটি আসক্তির স্তর থেকে মুক্ত হওয়া। জড় জীবনের এই তিনটি বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে-সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের সেবা করা, বিধি অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন করা। ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় 'ভাব' অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের অনুভূতি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রণীত ভক্তিবিজ্ঞান শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/৪/১৫-১৬) বলা হয়েছে-

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্পঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥
"প্রথমে অবশ্যই আত্ম-উপলব্ধি লাভের প্রতি প্রারম্ভিক আগ্রহ জাগাতে হবে। এই থেকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভের বাসনা জন্মাবে। পরবর্তী স্তরে কোনও ভগবৎ-জ্ঞানী সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নবদীক্ষিত ভক্ত সাধনভক্তির পদ্ধতি অনুশীলন করতে শুরু করবেন। সদ্গুরুর অধীনে এভাবেই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে, মানুষ জড় বন্ধনের আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, আত্ম-উপলব্ধির পথে অবাধ গতি লাভ করে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় রুচি অর্জন করে। এই রুচি অর্জনের ফলে মানুষ কৃষ্ণভাবনার প্রতি আরও আসক্তি লাভ করে-যা থেকে ভগবানের প্রতি পারমার্থিক প্রেমভক্তির প্রারম্ভিক স্তর 'ভাব' পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার নাম প্রেম। এই প্রেম হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতার পরিণতি।" এই প্রেমভক্তির স্তরে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত থাকে। সুতরাং সদ্গুরুর পথনির্দেশ অনুসারে ধীরে ধীরে ভগবৎ-সেবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে মানুষ আত্মোন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে। সে তখন জড় বন্ধনের সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, তার নিজের পৃথক চিন্ময় ব্যক্তিসত্তার আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয় এবং শূন্যবাদী জীবনদর্শন চিন্তার ফলে সৃষ্ট হতাশাবোধ থেকে নিষ্কৃতি পায়। তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে অবশেষে পৌঁছতে পারে।

শ্লোক ১১

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥
যে-যারা; যথা-যেভাবে; মাম্-আমাকে; প্রপদ্যন্তে-আত্মসমর্পণ করে; তান্-তাদের; তথা-সেভাবে; এব-অবশ্যই; ভজামি পুরস্কৃত করি; অহম্-আমি; মম-আমার; বর্জ্য-পথ; অনুবর্তন্তে-অনুসরণ করে; মনুষ্যাঃ-সমস্ত মানুষ; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; সর্বশঃ-সর্বতোভাবে।
গীতার গান
যেভাবে যে ভজে মোরে আমি সেই ভাবে।
যথাযোগ্য ফল দিই আপন প্রভাবে ॥
আমাকেই সর্ব মতে চাহে সব ঠাঁই।
আগুপিছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই ।
অনুবাদ
যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ। সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।
তাৎপর্য
সকলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছে। পরমেশ্বর ভগবান শাকৃষ্ণকে তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপে এবং অণু-পরমাণু সহ সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মারূপে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাই পেশল শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। সমস্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানী সাধকের সাধনার বস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ,

তবে যে যেভাবে ভগবানকে পেতে চায়, তার সিদ্ধিও তয় তেমনভাবে। অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের ভাবনা অনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করে থাকেন। সেখানে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর আনে সেবা করে, কেউ তাঁকে সখা বলে মনে করে খেলা করে, কেউ সন্তান বলে মনে করে স্নেহ করে, আবার কেউ পরম প্রিয় বলে মনে করে ভালবাসে। ভগবানও তেমন তাঁদের বাসনা অনুযায়ী তাঁদের সকলের সঙ্গে লীলাখেলা করে তাদের ভালবাসার প্রতিদান দেন। জড় জগতেও তেমন, বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে জনা করে এবং ভগবানও তাদের ভাবনা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত জগতে এবং এই জড় জগতে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী তাদের আত্মার সত্তাকে বিনাশ করে দিয়ে আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাদের তাঁর ব্রহ্মজ্যোতিতে আত্মসাৎ করে নেন। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ বিশ্বাস করে না; তাই তারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আনন্দও উপলব্ধি করতে পারে না এবং পরিণামে তাদের ব্যক্তিগত সত্তার অনুভূতিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ব্রহ্মেও বিলীন হয়ে যেতে পারে না, তারা এই জড় জগতে ফিরে এসে তাদের সুপ্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করে। তারা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করার অনুমতি পায় না, কিন্তু এই জগতে এসে আবার পবিত্র হবার সুযোগ পায়। যারা সকাম কর্মী, যজ্ঞেশ্বররূপে ভগবান তাদের যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রদান করেন এবং যে সমস্ত যোগী সিদ্ধি কামনা করে, তিনি তাদের সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, সকলের সাধনার সিদ্ধি লাভ হয় ভগবানেরই করুণার ফলে এবং পরমার্থ সাধনের বিভিন্ন পন্থাগুলি হচ্ছে সেই একই মার্গের বিভিন্ন স্তর। তাই, কৃষ্ণভাবনার চরম সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"সব রকম কামনা-রহিত ভক্তই হোক, সব রকম কামনা-বিশিষ্ট যাজ্ঞিকই হোক, বা মোক্ষকামী যোগীই হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা।

শ্লোক ১২

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ-কামনা করে; কর্মণাম্-সকাম কর্মসমূহের; সিদ্ধিম্-সিদ্ধি; যজন্তে-যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করে; ইহ-এই; দেবতাঃ-দেবতাদের; ক্ষিপ্রম্-অতি শীঘ্র; হি-অবশ্যই; মানুষে-মানব-সমাজে; লোকে-জড় জগতে; সিদ্ধিঃ-ফল লাভ; ভবতি-হয়; কর্মজা-সকাম কর্ম থেকে।

গীতার গান
কর্মকাণ্ডী সিদ্ধি লাগি বহু দেবদেবী।
ইহলোক হয় সব বহু সেব্য সেবী ॥

শীঘ্র যেই কর্মফল এ মনুষ্যলোকে।
অনিত্য সে ফল ভুঞ্জে দুঃখে আর শোকে ॥

অনুবাদ

এই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। সকাম কর্মের ফল অবশ্যই অতি শীঘ্রই লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে বিষয়াসক্ত লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু লোক, যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে লোক ঠকায়, তারা এই সমস্ত দেব-দেবীকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে এবং তাদের ভ্রান্ত প্রচারের ফলে জনসাধারণও সেই কথা সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত দেব-দেবী ভগবানের বিভিন্ন রূপ নন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ-বিশেষ। ভগবান হচ্ছেন এক আর অবিচ্ছেদ্য অংশেরা হচ্ছে বহু। বেদে বলা হয়েছে, নিত্যো নিত্যানাম্ ভগবান হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ-"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর।" বিভিন্ন দেব-দেবী হচ্ছেন শক্তিপ্রাপ্ত যাতে তাঁরা এই জড় জগৎকে পরিচালনা করতে পারেন। এই সমস্ত দেব-দেবীও হচ্ছেন জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীব (নিত্যানাম্), তাই তাঁরা কোন অবস্থাতেই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। যে মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ ও বিভিন্ন দেব-দেবী একই পর্যায়ভুক্ত, তার কোন রকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তাকে বলা হয় নাস্তিক অথবা পাষণ্ডী। এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব এবং আদি পিতামহ ব্রহ্মাকেও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন (শিববিরিঞ্চিনুতম্)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-সমাজে অনেক নেতা আছে, যাদেরকে মূর্খ লোকেরা 'ভগবানে নরত্ব আরোপ', এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অবতার জ্ঞানে পূজা করে। ইহ দেবতাঃ বলতে এই জড় জগতের কোন শক্তিশালী মানুষকে অথবা দেবতাকে বোঝায়। কিন্তু ভগবান শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনি এই জড় জগতের তত্ত্ব নন। তিনি জড় জগতের অতীত চিন্ময় জগতে অবস্থান করেন। এমন কি মায়াবাদ দর্শনের প্রণেতা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, নারায়ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের অতীত। কিন্তু মূর্খ লোকেরা (হৃতজ্ঞান) তা সত্ত্বেও তাৎকালিক ফল লাভ করার আশায় বিভিন্ন জড় দেব-দেবীর পূজা করে চলে। এই সমস্ত মূর্খ লোকগুলি বুঝতে পারে না, বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করার ফলে যে ফল লাভ হয়, তা অনিত্য। যিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানেরই সেবা করেন। তুচ্ছ ও অনিত্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন। জড়া প্রকৃতির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দেব-দেবীদের দেওয়া বরও হচ্ছে জড় এবং অনিত্য। জড় জগৎ, জড় জগতের বাসিন্দা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা সকলেই হচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের বুদ্বুদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জগতের মানব-সমাজ ভূসম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, ভোগের সামগ্রী আদি অনিত্য জড় ঐশ্বর্য লাভের আশায় উন্মাদ। এই প্রকার অনিত্য বস্তু লাভের জন্য মানুষেরা মানব-সমাজে বিভিন্ন দেব-দেবীর অথবা শক্তিশালী কোন ব্যক্তির পূজা করে। কোন রাজনৈতিক নেতাকে পূজা করে যদি ক্ষমতা লাভ করা যায়, সেটিকে তারা পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে। তাই তারা সকলেই তথাকথিত নেতাদের দণ্ডবৎ প্রণাম করছে এবং তার ফলে তাদের কাছ থেকে ছোটখাটো কিছু আশীর্বাদও লাভ করছে। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা জড় জগতের দুঃখকষ্ট থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হবার জন্য ভগবানের শরণাগত হতে আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, সকলেই তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য ব্যস্ত এবং তুচ্ছ একটু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য এরা দেব-দেবী নামক বিশেষ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবদের আরাধনার প্রতি আকর্ষিত হয়। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায়, খুব কম মানুষই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের শরণাগত হয়। অধিকাংশ মানুষই সর্বক্ষণ চিন্তা করছে কিভাবে আরও একটু বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। আর এই সমস্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে 'এটি দাও' 'ওটি দাও' বলে কাঙ্গালপনা করে তাদের সময় নষ্ট করছে।

শ্লোক ১৩

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

চাতুর্বর্ণাম্-মানব-সমাজের চারিটি বিভাগ; ময়া-আমার দ্বারা; সৃষ্টম্-সৃষ্ট হয়েছে; গুণ-গুণ; কর্ম-কর্ম; বিভাগশঃ-বিভাগ অনুসারে; তস্য-তার; কর্তারম্-অষ্টা; অপি-যদিও; মাম্-আমাকে; বিদ্ধি-জানবে; অকর্তারম্-অকর্তারূপে; অব্যয়ম্-পরিবর্তন রহিত।

গীতার গান

চারি বর্ণ সৃষ্টি মোর গুণ কর্ম ভাগে।
যার যাহা গুণ হয় কহিব সে আগে ॥
তথাপি সে নহি আমি গুণ কর্ম মাঝে।
যদ্যপি নিয়ন্তা আমি সকলের কাজে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারিটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবানই সব কিছুর স্রষ্টা। তাঁর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই সব কিছু রক্ষা করেন, আবার প্রলয়ের পরে সব কিছু তাঁরই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সমাজের চারটি বর্ণও তাঁরই সৃষ্টি। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এর পরের স্তর হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং এরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় বৈশ্য এবং এরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ভগবান যদিও এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মতো নন। জীব হচ্ছে ভগবানের অণুসদৃশ অংশ-বিশেষ, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন বিভু। প্রকৃতপক্ষে, মানব-সমাজ হচ্ছে যে-কোনও পশু-সমাজেরই মতো, কিন্তু মানুষকে পশুর স্তর থেকে প্রকৃত মানুষের স্তরে উন্নীত করবার জন্য ভগবান এই চারটি বর্ণ-বিভাগ করেছেন, যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। গুণ অনুসারে মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে জীবনের বিভিন্ন লক্ষণ ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মহ্মণের থেকেও উত্তম। যদিও গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহ্ম বা পরব্রহ্মোর জ্ঞানসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির উপাসক। তাঁরা

সবিশেষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। বিষ্ণুতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হয় ব্রহ্মতত্ত্বকে অতিক্রম করে এবং তখন তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হন। কৃষ্ণতত্ত্ব রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি সব কয়টি অংশ-অবতারের তত্ত্ব সমন্বিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমাজের চার বর্ণের অতীত, তাঁর ভক্তও তেমন এই বর্ণ-বিভাগের অতীত, এমন কি তিনি জাতি, কুলাদি বিচারেরও অতীত।

শ্লোক ১৪

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

ন-না; মাম্-আমাকে; কর্মাণি-সর্বপ্রকার কর্ম; লিম্পন্তি-প্রভাবিত করতে পারে; ন-না; মে-আমার; কর্মফলে কর্মফলে; স্পৃহা-আকাঙ্ক্ষা; ইতি-এভাবে; মাম্-আমাকে; যঃ-যিনি; অভিজানাতি-জানেন; কর্মভিঃ-এই প্রকার কর্মের দ্বারা; ননা; সঃ-তিনি; বধ্যতে- আবদ্ধ হন।

গীতার গান

আমি কর্মফলে লিপ্ত নহি কোন কালে।
স্পৃহা কভু নাই মোর কোন কর্মফলে ॥
আমার কর্মের কথা বুঝে ভাল মতে।
বন্ধন ঘুচিল তার কর্মের ফলেতে ॥

অনুবাদ

কোন কর্মই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সংবিধানে উল্লেখ থাকে যে, রাজা কোন ভুল করতে পারেন না, অথবা রাজা রাষ্ট্রের আইনের অধীন নন। তেমনই এই জড় জগতের অধীশ্বর ভগবানও জড় জগতের কোন কর্মের দ্বারাই আবদ্ধ নন। যদিও তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবুও এই জড় জগৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও উদাসীন। কিন্তু জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় বলে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক যেমন তাঁর কর্মচারীদের সৎ-অসৎ কোন কর্মের জন্যই দায়ী নন, কর্মচারীরাই তার জন্যে দায়ী হয়ে থাকে, জীবও তেমনই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য জীব নানা রকম কর্ম করে চলে। ভগবান কখনও এই ধরনের কর্ম করার বিধান দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব উত্তরোত্তর আরও বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য এই সংসারে কর্ম করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করার কামনা করে। ভগবান যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর তথাকথিত স্বর্গসুখের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ নেই। স্বর্গের দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানেরই দাস-দাসী, যাঁদের ভগবান নিজেই নিয়োজিত করেছেন। কর্মচারীরা যে প্রকার নিম্নস্তরের সুখভোগ করতে চায়, মালিক কখনই তা চায় না। ভগবানেরও তেমনই জড় সুখভোগ করার কোন স্পৃহা নেই। তিনি সব সময়ই জাগতিক কর্ম এবং তার ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ

বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে নানা রকম গাছপালা সৃষ্টির জন্য বৃষ্টি দায়ী নয়, যদিও বৃষ্টির অভাবে কোন গাছপালা জন্মানোর সম্ভাবনাই থাকে না। বৈদিক স্মৃতিতে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥

"এই জড় সৃষ্টির পরম কারণ হচ্ছেন একমাত্র ভগবান। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে নিমিত্ত কারণ, যার ফলে জড় সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।" সৃষ্ট জীব অনেক রকম, যেমন-দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি আদি এবং তারা সকলেই তাদের পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখ পেয়ে থাকে। ভগবান তাদের প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্ম করার সব রকম সুযোগ দেন। কিন্তু তিনি নিজে তাদের ভূত ও ভবিষ্যৎ কোন কর্মের জন্য দায়ী হন না। বেদান্ত-সূত্রে (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ-ভগবান সর্বদাই নিরপেক্ষ থাকেন, তিনি কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত নন। জীব তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে এবং সেই সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের। ভগবান বহিরঙ্গা শক্তি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে জীবের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করবার সুযোগ প্রদান করেন। সকাম কর্মের এই জটিল তত্ত্ব যিনি বুঝতে পারেন, তিনি তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করেন, তার ফলে কর্মের অধীন হন না। ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝতে না পেরে যে মনে করে, ভগবানও আর পাঁচটি বদ্ধ জীবের মতো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কোন দিনই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু যিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তিনি মুক্তাত্মারূপে কৃষ্ণভাবনায় দৃঢ়চিত্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১৫

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবম্-এভাবে; জ্ঞাত্বা-জেনে; কৃতম্-অনুষ্ঠান করেছেন; কর্ম-কর্ম; পূর্বৈঃ-প্রাচীন; অপি-যদিও; মুমুক্ষুভিঃ-মুক্তিকামীগণ কর্তৃক; কুরু-কর; কর্ম-শাস্ত্রোক্ত কর্ম; এব-অবশ্যই; তস্মাৎ-অতএব; ত্বম্-তুমি; পূর্বৈঃ-প্রাচীন মহাজনগণ কর্তৃক; পূর্বতরম্ প্রাচীনকালে; কৃতম্ অনুষ্ঠিত।

গীতার গান

এই গূঢ় তত্ত্বকথা পূর্বে যে বুঝিল।
অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল ॥
তুমি পূর্ব মহাজনে যথা অনুসার।
যথাবৎ সিদ্ধিলাভ হইবে বিস্তর ॥

অনুবাদ

প্রাচীনকালে সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা আমার অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয় সব রকমের কলুষে পরিপূর্ণ এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের হৃদয় অত্যন্ত নির্মল। কৃষ্ণভাবনার অমৃত-ভগবদ্ভক্তি এই দুই শ্রেণীর লোকেরই হিত সাধন করে। যাদের হৃদয় কলুষে পরিপূর্ণ, তারা বিধিভক্তির অনুশীলন করে তাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে পারে-তাদের হৃদয়ের আবর্জনা দূর করতে পারে; আর যাদের হৃদয় ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে আছে, তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে আর সকলকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার শিক্ষা দান করতে পারে। যারা মূর্খ, অথবা যাদের মনে কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়নি, তারা অনেক সময় মনে করে, সব রকমের কাজকর্ম পরিত্যাগ করে নির্জনে ভগবদ্ভজন করাটাই হচ্ছে পরমার্থ সাধন করার পন্থা। কিন্তু এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা থেকে নিরস্ত করেন। আমাদের কেবলমাত্র জানতে হবে কিভাবে কর্ম করতে হয়। কৃষ্ণভক্তির ভান করে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করাটা মূঢ়তা। যথার্থ কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার উদ্দেশ্যে সব রকম কাজকর্ম করা। তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে। ভগবান ত্রিকালজ্ঞ, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই জানেন। তাঁর ভক্তেরা কখন কিভাবে তাঁর সেবা করেছেন, সেই কথা তিনি কখনও ভোলেন না। তাই তিনি সূর্যদেব বিবস্বানের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। এই বিবস্বানকে বারো কোটি বছর আগে ভগবান নিজেই ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন। এই সমস্ত ভগবদ্ভক্ত মহাজনেরা সকলেই মুক্ত পুরুষ এবং তাঁরা সকলেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সেবায় রত। তাই, তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের সেবায় কর্তব্যকর্ম করাটাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়।

শ্লোক ১৬

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।
ততে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কিম্-কি; কর্ম-কর্ম; কিম্-কি; অকর্ম-অকর্ম; ইতি-এভাবে; কৰয়ঃ-বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ; অপি-ও; অত্র-এই বিষয়ে; মোহিতাঃ-মোহিত হন; তৎ-তাই; তে-তোমাকে; কর্ম-কর্ম; প্রবক্ষ্যামি-আমি বিশ্লেষণ করব; যৎ-যা; জ্ঞাত্বা-জেনে; মোক্ষ্যসে-তুমি মুক্ত হবে; অশুভাৎ-অশুভ অবস্থা থেকে।

গীতার গান

কিবা কর্ম অকর্ম বা করিতে বিচার ।
বড় বড় মুনি ঋষি হয় চমৎকার ॥
তাই সে বলিব আমি কিবা কর্ম হয়।
জানিলে সে তত্ত্বকথা অশুভের ক্ষয় ॥

অনুবাদ

কাকে কর্ম ও কাকে অকর্ম বলে, তা স্থির করতে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হন। আমি সেই কর্ম বিষয়ে তোমাকে উপদেশ করব। তুমি তা অবগত হয়ে সমস্ত অশুভ অবস্থা

থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করা সকলেরই কর্তব্য। পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, পরবর্তী শ্লোকে তিনি তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কেন স্বাধীনভাবে ভগবানের সেবা করা উচিত নয়।

এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে, পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এমন কোন মহাপুরুষকে গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভগবান নিজেই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সর্বপ্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে দান করেন, মনু তা তাঁর পুত্র ইক্ষাকুকে দান করেন। এভাবেই সৃষ্টির আদি থেকে এই তত্ত্বজ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পূর্বতন যে সমস্ত মহান আচার্যেরা রয়েছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, গুরু-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ না করলে, সে কখনই কৃষ্ণভাবনাময় তত্ত্বকে প্রামাণ্যরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। সেই জন্যই ভগবান নিজে অর্জুনকে এই তত্ত্বজ্ঞান সরাসরি দান করতে মনস্থ করলেন। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি কেউ ভগবানের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জড় জগতের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

কেবলমাত্র জাগতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ধর্মীয় পন্থাগুলি কখনই নিরূপণ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র ভগবানই পরমতত্ত্ব সম্বলিত ধর্মনীতি প্রণয়ন করতে পারেন। ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্ (ভাঃ ৬/৩/১৯)। জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে একটি মনগড়া ধর্ম তৈরি করলে তাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, মনু, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ, জনক, বলী মহারাজ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তা অনুশীলন করতে হয়। কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা প্রতিপাদন করতে পারি না। তাই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে সরাসরি অর্জুনকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমেই আমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৭

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্মণঃ-কর্মের; হি-অবশ্যই; অপি-ও; বোদ্ধব্যম্-জানা উচিত; বোদ্ধব্যম্-জ্ঞাতব্য; চ-ও; বিকর্মণঃ-শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম; অকর্মণঃ-অকর্ম; চ-ও; বোদ্ধব্যম্ জ্ঞাতব্য; গহনা-অত্যন্ত কঠিন; কর্মণঃ-কর্মের; গতিঃ-গতি।

গীতার গান

কর্ম যে বুঝিতে তুমি অকর্ম বুঝিবে।
বিকর্ম বুঝিতে তথা ভাবে বুদ্ধ হবে ॥
দুর্গম কর্মের গতি নিগূঢ় সে তত্ত্ব।

যে বুঝিল সে বুঝিল তাহার মহত্ত্ব ॥

অনুবাদ

কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।

তাৎপর্য

কেউ যদি সত্যিই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে তাকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের পার্থক্য জানতে হবে। তাকে জানতে হবে ভগবৎ-তত্ত্ব কি, ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক এবং এই জড় জগতের বিভিন্ন গুণের প্রভাবে সে কিভাবে তার কর্তব্যকর্ম করে। এই তত্ত্বের উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে যে উপলব্ধি করতে পারে, সে-ই বুঝতে পারে যে, জীবের 'স্বরূপ' হয়-'কৃষ্ণের নিত্যদাস'। তাই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করাই প্রতিটি জীবের পরম কর্তব্য। সমগ্র ভগবদ্গীতায় ভগবান আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষাই দান করেছেন। যে চিন্তাধারা এবং যে কর্ম এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, তাকে বলা হয় বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম। এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের সঙ্গ করতে হয়-সাধুসঙ্গ করতে হয় এবং তাদের কাছ থেকে এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয়। ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে এই জ্ঞান আহরণ করা এবং ভগবানের কাছ থেকে তা আহরণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই পরম তত্ত্বজ্ঞান এভাবেই সদ্গুরুর কাছ থেকে আহরণ না করলে বড় বড় বুদ্ধিমান মানুষেরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

কর্মণি-কর্মে; অকর্ম-অকর্ম; যঃ-যিনি; পশ্যেৎ-দর্শন করেন; অকর্মণি-অকর্মে; চ-ও; কর্ম-কর্ম; যঃ-যিনি; সঃ-তিনি; বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমান; মনুষ্যেষু-মানব-সমাজে; সঃ-তিনি; যুক্তঃ-চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; কৃৎস্নকর্মকৃৎ-সব রকম কর্মে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও।

গীতার গান

কর্মেতে অকর্ম দেখে অকর্মে যে কর্ম।
সে বুদ্ধিমান মনুষ্যে সে বুঝেছে মর্ম ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সব রকম কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়েছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে সব রকমের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর সমস্ত কর্মই করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। তাই তাঁর কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁকে আর সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁরাই মানব-সমাজে যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ। অকর্ম কথাটার অর্থ হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম।

নির্বিশেষবাদীরা কর্মফলের ভয়ে ভীত হয়ে সব রকম কর্ম পরিত্যাগ করে। তারা মনে করে, কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে এবং এই সমস্ত কর্মফল তাদের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভালভাবেই জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস। তাই তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সমস্ত কাজকর্ম করেন, তাই সেই সমস্ত কর্মের ফল ভগবানই গ্রহণ করেন, তাঁকে আর তা ভোগ করতে হয় না। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে তিনি সব রকম কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সর্বদা চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন। তাই বলা হয়, 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম', কারণ তাঁর ব্যক্তিগত কোন কামনা নেই। তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করবার জন্য কোন কিছুই আশা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করার পরম আনন্দ লাভের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত বাসনার নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১৯

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যস্য-যাঁর; সর্বে সব রকম; সমারম্ভাঃ-কর্ম প্রচেষ্টা; কাম-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; সংকল্প-সংকল্প; বর্জিতাঃ-রহিত; জ্ঞান-জ্ঞানের; অগ্নি-অগ্নি দ্বারা; দগ্ধ-দগ্ধ; কর্মাণম্ কর্মসমূহ; তম্-তাঁকে; আহুঃ বলেন; পণ্ডিতম্-পণ্ডিত; বুধাঃ-জ্ঞানীগণ।

গীতার গান

সকল সমারম্ভে যার সংকল্প বর্জন ।
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম পাণ্ডিত্যে গ্রহণ ॥

অনুবাদ

যাঁর সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সংকল্প রহিত, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানীগণ বলেন যে, তাঁর সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে।

তাৎপর্য

যে মানুষ প্রকৃতই জ্ঞানবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন। কারণ, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সব রকম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁর স্বরূপ যে ভগবানের নিত্যদাস, এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারার ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়েছে। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির আগুনে তাঁর অন্তরের সমস্ত কলুষ দগ্ধ হয়ে যায়। এভাবেই অন্তর যখন কলুষমুক্ত হয়, তখন জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সমস্ত কামনা অন্তর্হিত হয়, তাই তিনি তখন নিষ্কাম। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। ভগবানের নিত্য দাসত্বের এই পরম তত্ত্বজ্ঞানকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই আগুন একবার জ্বলে উঠলে, তা সব রকম কর্মফলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

শ্লোক ২০

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

ত্যক্ত্বা-ত্যাগ করে; কর্মফলাসঙ্গম্ কর্মফলের আসক্তি; নিত্য-সর্বদা; তৃপ্তঃ-পরিতৃপ্ত; নিরাশ্রয়ঃ-আশ্রয়শূন্য; কর্মণি-কর্মে; অভিপ্রবৃত্তঃ-পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত; অপি-সত্ত্বেও; ন-না; এব-অবশ্যই; কিঞ্চিৎ-কিছুই; করোতি করেন; সঃ-তিনি।

গীতার গান

ত্যক্ত কর্মফলাসঙ্গ আশ্রয় বিহীন।
নিত্য তৃপ্ত নিত্যানন্দ নিজ কর্মে লীন ॥
সে প্রবৃত্ত নিজ কর্মে কিছু নাহি করে।
অনাসক্ত কর্মফল স্বচ্ছন্দ বিহরে ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না, তিনি সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কর্মফলের আশায় কোন কিছুই করেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সব রকম কর্ম করার মাধ্যমেই কেবল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভকরেছেন যে ভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম করেন, তাই তিনি কোন রকম কর্মফলের আশা করেন না। তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত, তাই তিনি কিভাবে তাঁর জীবন ধারণ করবেন, সেই সম্বন্ধেও কোন রকম চিন্তা করেন না। তিনি জানেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তিনি সর্ব কারণের কারণ, তাই তিনি সব কিছুই ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। তিনি. কিছুই সংগ্রহ বা সঞ্চয় করতে চান না, কিংবা এ যাবৎ যা কিছু তিনি তাঁর অধিকারে লাভ করেছেন, সেই সবও সংরক্ষণ করে রাখতে চান না। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত সম্পদ দিয়ে তিনি কেবল ভগবানেরই সেবা করেন, এ ছাড়া আর কোন কাজেই তাঁর কোন রকম স্পৃহা থাকে না। এই ধরনের নিরাসক্ত কৃষ্ণভক্ত ভাল ও মন্দ সব রকম কর্মফল থেকে মুক্ত; যেন তিনি কোন কাজকর্মই করছেন না। এই হচ্ছে অকর্ম অর্থাৎ কর্মফলহীন কাজকর্মের লক্ষণ। তাই, কৃষ্ণভাবনা রহিত যে সব কর্ম, তা সবই জীবকে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাকে বলা হয় বিকর্ম, এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

নিরাশীঃ-কামনাশূন্য; যত-সংযত; চিত্তাত্মা-মন ও বুদ্ধি; ত্যক্ত-পরিত্যাগ করে; সর্ব-সমস্ত; পরিগ্রহঃ-আধিপত্য করার প্রবৃত্তি; শারীরম্-শরীর রক্ষার্থে, কেবলম্-কেবল; কর্ম-কর্ম;

কুর্বন্ করেও, ন-না; আপ্নোতি-লাভ করেন; কিল্বিষম্-পাপ।

গীতার গান

কর্মফলে স্পৃহাহীন দত্ত চিত্ত আত্মা।
সর্ব পরিগ্রহ ত্যক্ত যুক্ত সে সর্বথা ॥
শরীর নির্বাহ মাত্র কর্ম যেই করে।
করিয়াও সর্ব কর্ম সর্ব পাপ হরে ॥

অনুবাদ

এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর মন ও বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে সংযত করে কার্য করেন। তিনি প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করেন। এভাবেই কর্ম করার ফলে কোন রকম পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমৃত যিনি লাভ করেছেন, তিনি তাঁর কাজকর্মের ফলস্বরূপ শুভঅথবা অশুভ কোন ফলেরই আশা করেন না। তাঁর মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংযত। তিনি জানেন যে, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই পরমেশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁর কোন কাজকর্মই তাঁর নিজের কাজকর্ম নয়, সেই কাজকর্ম করা হয় ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে। যেমন, আমরা যখন আমাদের হাতটিকে নাড়ি, তখন হাতটি নিজের ইচ্ছায় নড়ে না। সমস্ত শরীরের প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ভগবানের বাসনার দ্বারাই পরিচালিত হন, কেন না তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন রকম বাসনা নেই। একটি যন্ত্রের অংশ যেভাবে পরিচালিত হয়, তিনিও সেভাবেই পরিচালিত হন। যন্ত্রের কলকব্জায় যেমন তেল দিতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়, ভগবদ্ভক্তও তেমন ভগবানের সেবা করার জন্যই কেবল নিজেকে সুস্থ-সবল রাখেন। তাই তিনি সব রকম কর্মফল থেকে মুক্ত। যেমন, একটি পশুর নিজের দেহের উপরেই কোন মালিকানার অধিকার নেই। পশুর নিষ্ঠুর মালিক ইচ্ছা করলেই সেই পশুটিকে বলি দিতে পারে, তবু পশুটি কোন প্রতিবাদ করে না। তার সত্যিই কোন স্বাধীনতা নেই। ভগবদ্ভক্তও তেমনই নির্বিকার। সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে তিনি যখন পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তিনি যখন পরম সত্যকে দর্শন করেন, তখন জড় জগতের উপর আধিপত্য করার কোন বাসনা তাঁর থাকে না। জীবন ধারণের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে তিনি তখন নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে করেন। তাই, এই সমস্ত জড়-জাগতিক পাপের দ্বারা তিনি আর কলুষিত হন না। তখন তিনি তাঁর সব রকমের কাজকর্মের ফল থেকে মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ২২

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দাতীতো বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছা-অনায়াসে; লাভ-লাভে; সন্তুষ্টঃ-সন্তুষ্ট; দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্ব; অতীতঃ-অতীত; বিমৎসরঃ-মাৎসর্যমুক্ত; সমঃ স্থির; সিদ্ধৌ-সিদ্ধি লাভে; অসিদ্ধৌ-অসাফল্যে; চ-ও; কৃত্বা-করলেও; অপি-যদিও, ন-না; নিবধ্যতে-প্রভাবিত হন।

গীতার গান

যথালাভ তথা তুষ্ট সর্ব দ্বন্দুমুক্ত।
নির্মৎসর সমচিত্ত নিজ কর্মে যুক্ত ॥
সিদ্ধাসিদ্ধ সমদৃষ্টি নাহিত বিদ্বেষ।
করিয়াও সর্ব কর্ম কর্মফল শেষ ॥

অনুবাদ

যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্যশূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন যে মানুষ, তিনি তাঁর শরীর সংরক্ষণের জন্যও অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করেন না। অনায়াসে তিনি যা পান, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অযাচিতভাবে তাঁর কাছে যা আসে, তিনি কেবল তা-ই গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষা করেন না, আবার ঋণও করেন না। তাঁর সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করে চলেন এবং তার ফলে তিনি যা পান, তা ভগবানের দান বলে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকেন। তাই, তাঁর জীবন ধারণের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বে বিঘ্ন হবে বলে, তিনি অন্য আর কারও দাসত্ব করেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার জন্য তিনি যে কোন রকম কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন। জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব-শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, তাঁকে কোন অবস্থাতেই প্রভাবিত করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদ লাভ করার ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তাই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির প্রকাশ-স্বরূপ এই দ্বন্দ্বভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে সর্ব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করতে চেষ্টা করেন। তাই সাফল্য ও ব্যর্থতা-এই দুয়ের প্রভাব থেকেই তিনি মুক্ত থাকেন। পূর্ণরূপে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয়।

শ্লোক ২৩

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ৷ ২৩ ॥

গতসঙ্গস্য-জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তি; মুক্তস্য-মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত -চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; চেতসঃ-চিত্ত; যজ্ঞায়-যজ্ঞের (শ্রীকৃষ্ণের) উদ্দেশ্যে; আচরতঃ-আচরণ করে; কর্ম-কর্ম; সমগ্রম্-সম্পূর্ণরূপে; প্রবিলীয়তে-লয় প্রাপ্ত হয়।

গীতার গান

অসঙ্গ নিযুক্ত জ্ঞানী চিত্তে ক্ষোভ নাই।
জ্ঞানাবস্থিত সেই সর্বদা সব ঠাঁই ॥
সেই সে যাজ্ঞিক সদা আচরণে দক্ষ।
তার কর্ম প্রবিলীত একান্ত সমক্ষ ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তি লাভ করে মানুষ যখন দ্বন্দুভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি প্রকৃতির ত্রিগুণের কলুষ থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি তখন যথার্থ মুক্ত, কারণ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখন আর তাঁর মন কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচলিত হয় না। তখন তিনি যা-ই করেন, তা কেবল আদি বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করেন। তাই, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম যজ্ঞময় হয়ে ওঠে, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়, তাই তাঁকে আর কর্মফল-জনিত ক্লেশভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্ম-চিন্ময় প্রকৃতি; অর্পণম্-অর্পণ; ব্রহ্ম-পরম; হবিঃ-মৃত; ব্রহ্ম-চিন্ময়; অগ্নৌ-অগ্নিতে; ব্রহ্মণা-আত্মার দ্বারা; হুতম্-নিবেদিত হয়; ব্রহ্ম-চিৎ-জগৎ; এব-অবশ্যই; তেন-তাঁর দ্বারা; গন্তব্যম্-গন্তব্য; ব্রহ্ম-চিন্ময়; কর্ম-কর্ম; সমাধিনা-সমাহিত হয়ে।

গীতার গান

ব্রহ্মময় কর্ম, তার ব্রহ্মোতে অর্পণ।
ব্রহ্ম হবি ব্রহ্ম অগ্নি হোতা ব্রহ্মফল ॥
তাহার সে ব্রহ্মগতি নিশ্চিত নির্ণয়।
ব্রহ্ম কর্ম সমাধিস্থ সর্বত্র বিজয় ॥

অনুবাদ

যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, কারণ তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন, তাও চিন্ময়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্মের প্রভাবে কিভাবে পরমার্থ সাধিত হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম নানা প্রকারের হতে পারে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে। কিন্তু তার আগে, এখানে কেবল কৃষ্ণভাবনার মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। বদ্ধ জীব জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত, তাই তাকে নিশ্চিতভাবে জড়-জাগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজকর্ম করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যে পন্থা অবলম্বন করে বদ্ধ জীব এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে, তাকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নানা রকম দুগ্ধজাত খাদ্যের অত্যাহারের ফলে যখন পেটের অসুখ হয়, তখন আর একটি দুগ্ধজাত খাদ্য দইয়ের দ্বারা সেই রোগ নিবারণ করা হয়। ঠিক তেমনই, বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের ভবরোগ নিরাময় করা যায় ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণভাবনার অমৃতের দ্বারা। ভবরোগ নিরাময়ের এই পন্থাকে বলা হয় যজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য কাজকর্ম বা যজ্ঞ করা। জড় জগতের যত বেশি কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনায় অথবা বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্টতার ফলে তত বেশি জড় পরিবেশ চিন্ময়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্ম বলতে বোঝায় 'চিন্ময়'। ভগবান হচ্ছেন চিন্ময় এবং

তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি বিশ্বচরাচরের সব কিছুই এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করছে। কিন্তু সেই জ্যোতি মায়া অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে তাকে প্রাকৃত বা জড়-জাগতিক বলা হয়। তখন সব কিছুই জড় বলে প্রতিভাত হয়। এই গুড় আবরণকে কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে উন্মোচিত করা যায়। তাই, ভগবদ্ভাবনায় ভাবিত হয়ে আমরা যখন ভগবানের চরণে কোন কিছু উৎসর্গ করি, তখন অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল অথবা যখন ভগবানের প্রসাদরূপে কোন কিছু গ্রহণ করি, তখন তা সবই একই তত্ত্বে পর্যবসিত হয়-ব্রহ্মান অথবা পরমতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব যখন মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তখন তাকে জড় পদার্থ বলে মনে হয়। আবার এই জড় পদার্থ দিয়ে যখন ভগবানের সেবা করা হয়, তখন তা অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা আমরা আমাদের জড় চেতনাকে ব্রহ্মন্ অথবা পরমতত্ত্বে রূপান্তরিত করতে পারি। মন যখন সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকে, তখন তাকে বলা হয় সমাধি। এই প্রকার অপ্রাকৃত চেতনায় যখন কোন কিছু করা হয়, তখন তাকে বলা হয় যজ্ঞ। এই চিন্ময় চেতনায় অর্পণ, অর্পিত হবি, অগ্নি, হোতা-সবই ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পদ্ধতি।

শ্লোক ২৫

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ।২৫ ॥

দৈবম্-দেবতাদের পূজায়; এব-এভাবে; অপরে অন্য অনেকে; যজ্ঞম্-যজ্ঞ; যোগিনঃ-যোগিগণ: পর্যুপাসতে যথাযথভাবে উপাসনা করেন; ব্রহ্ম-চিন্ময় তত্ত্বরূপ; অগ্নৌ-অগ্নিতে; অপরে-অন্যেরা; যজ্ঞম্-যজ্ঞ; যজ্ঞেন-যজ্ঞের দ্বারা; এব-এভাবে; উপজুহ্বতি-আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

দৈব যজ্ঞ করে পরে সেও যোগী হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানী সেও যোগী হোমাদি নিলয় ॥

অনুবাদ

কোনও কোনও যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাঁদের উপাসনা করেন, আর অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

পূর্বের বর্ণনা অনুসারে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন, তাঁকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা দেবোপাসনা করার জন্য অনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা ব্রহ্ম অথবা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং বিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞ। সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি হচ্ছে জড় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে ভগবানকে জানবার জন্য। যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানী, যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য তাঁদের সব কিছুই ভগবানের চরণে অর্পণ করেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা আরও বেশি করে জড় সুখভোগ করবার জন্য ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের উপাসনা করে যজ্ঞ করেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন অগ্নি, বায়ু, জল, বজ্র আদি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পর্যবেক্ষক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের এই সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মে নিয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত শক্তি ভগবানেরই শক্তি, এগুলি কোন দেবতার নিজস্ব শক্তি নয়। তবে ভগবানের আদেশ অনুসারে তাঁরা এই সমস্ত শক্তির পরিচালনা করেন। যারা জড় সুখভোগ করার জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের বলা হয় 'বহু-ঈশ্বরবাদী'। আর এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের উপাসনা করেন এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর অনিত্যতা অনুভব করে ব্রহ্মজ্যোতিতে তাঁদের পৃথক সত্তা উৎসর্গ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য দার্শনিক মনোধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে, সকাম কর্মী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁর জাগতিক সম্পদ উৎসর্গ করেন, আর নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবার জন্য তাঁর জড় উপাধিসমূহ উৎসর্গ করেন। নির্বিশেষবাদীদের কাছে যজ্ঞাগ্নি হচ্ছে পরমব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাগ্নিতে তাদের অস্তিত্বের আহুতি হচ্ছে যজ্ঞার্পণ। কিন্তু অর্জুনের মতো কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করেন- এমন কি তাঁর আত্ম-স্বরূপও ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত। এভাবেই, কৃষ্ণভক্ত হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর পৃথক স্বরূপের বিনাশ সাধন করেন না।

শ্লোক ২৬

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ্রোত্রাদীনি-শ্রবণ আদি; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; অন্যে-অন্যেরা; সংযম-সংযমরূপ; অগ্নিষু-অগ্নিতে; জুহ্বতি-আহুতি দেন; শব্দাদীন্-শব্দ আদি; বিষয়ান্-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আদি; অন্যে-অন্যেরা; ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়রূপ; অগ্নিষু-অগ্নিতে; জুহ্বতি-আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর যজ্ঞ ইন্দ্রিয় সংযম।
শ্রোতাদি মানস তপ অগ্নিতে অর্পণ ॥
রূপ রস শব্দ স্পর্শ বিষয়ে সংযম।
যজ্ঞাহুতি সেই হয় ইন্দ্রিয় হবন ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ (শুদ্ধ ব্রহ্মচারীরা) মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন, আবার অন্য অনেকে (নিয়মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা) শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-মানব-জীবনের এই চারটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পূর্ণ যোগী হতে সহায়তা করা। পশুদের মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তাই, মানব-জীবনের এই চারটি আশ্রমকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ব্রহ্মচারীরা সদ্গুরুর

তত্ত্বাবধানে থেকে ইন্দ্রিয় দমন করে মনঃসংযম করেন। এই শ্লোকে তাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, তাঁরা তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে চিত্তসংযমরূপী আগুনে অর্পণ করে। ব্রহ্মচারীরা কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনা সম্বন্ধীয় শব্দই শ্রবণ করেন। জ্ঞান আহরণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রবণ, তাই প্রকৃত ব্রহ্মচারী সর্বক্ষণ হরের্নামানুকীর্তনম্ অর্থাৎ, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে তন্ময় হয়ে থাকেন। তিনি কখনও লৌকিক আলোচনা বা গ্রাম্য কথা শ্রবণ করেন না। জড় জগতের যে শব্দ, সেই শব্দ মনকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে-মনকে জড় অভিমুখী করে তোলে। তাই ব্রহ্মচারী কখনও সেই রকম শব্দে কর্ণপাত না করে সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ ও কীর্তন করেন-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

তেমনই আবার যিনি গৃহস্থ, যিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার অনুমতি লাভ করেছেন, তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেই কার্যে লিপ্ত হন। যৌনসঙ্গ, মাদকদ্রব্য সেবন, আমিষ আহার আদির প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু সংযমী গৃহস্থ মৈথুনাদি বিষয় বা ইন্দ্রিয়তর্পণে কখনই অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবৃত্ত হন না। তাই, প্রতিটি সভ্য সমাজেই ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিতে বিবাহের প্রচলন দেখা যায়, কারণ সংযত যৌন জীবন যাপনের সেটিই ঠিক পথ। এই ধরনের সংযত, আসক্তি রহিত কামও এক প্রকার যজ্ঞ, কারণ এর মাধ্যমে সংযমী গৃহস্থ তাঁর বিষয়-ভোগোন্মুখ প্রবৃত্তিকে তাঁর পারমার্থিক জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের কাছে উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ২৭

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

সর্বাণি-সমস্ত; ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়; কর্মাণি কর্মসমূহ; প্রাণকর্মাণি-প্রাণবায়ুর কার্যকলাপ; চ-ও; অপরে-অন্যেরা; আত্মসংযম-মনঃসংযমের; যোগ-যুক্ত হওয়ার পন্থা; অগ্নৌ-অগ্নিতে; জুহ্বতি-আহুতি দেন; জ্ঞানদীপিতে আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত।

গীতার গান

সর্বেন্দ্রিয় কর্ম প্রাণ সংযম অগ্নিতে।
যত্নশীল যত যোগী হবন করিতে ॥
আত্মসংযমাদি যোগ জ্ঞান দীপিতে।
পৃথক পৃথক যোগী হয় যুক্ত সে যোগেতে ॥

অনুবাদ

মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাঁরা তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পতঞ্জলি প্রণীত যোগপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আত্মাকে প্রত্যগাত্মা ও পরাগাত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তাকে বলা হয় পরাগাত্মা। কিন্তু যখনই জীবাত্মা ঐ

ধরনের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ থেকে আসক্তি রহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রত্যগাত্মা। আত্মা জীবদেহের অভ্যন্তরে দশ রকমের বায়ুর কার্যকলাপের অধীন থাকে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমে এটি অনুভব করা যায়। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতি শিক্ষা দেয় কিভাবে দেহস্থিত বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মাকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়। এই যোগপদ্ধতি অনুসারে প্রত্যগাত্মাই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই প্রত্যগাত্মা হচ্ছে জড় কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। যেমন শ্রবণের জন্য কান, দৃষ্টির জন্য চোখ, ঘ্রাণের জন্য নাক, আস্বাদনের জন্য জিহ্বা ও স্পর্শের জন্য ত্বক এবং এরা সকলেই আত্মার বাইরে নানা রকম কাজকর্ম করে চলেছে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার প্রভাবে এগুলি সম্ভব হয়। অপান বায়ুর গতি অধোগামী, ব্যান বায়ুর প্রভাবে সংকোচন ও প্রসারণ হয়, সমান বায়ু সমতা বজায় রাখে, আর উদান বায়ু ঊর্ধ্বগামী। প্রবুদ্ধ মানুষ এদের সকলকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ২৮

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাঃ-দ্রব্য অর্পণরূপ যজ্ঞ; তপোযজ্ঞাঃ-তপস্যার মাধ্যমে যজ্ঞ; যোগযজ্ঞাঃ -অষ্টাঙ্গ যোগরূপী যজ্ঞ; তথা-তেমনই; অপরে-অন্যেরা; স্বাধ্যায়-বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ; জ্ঞানযজ্ঞাঃ-দিব্যজ্ঞান লাভরূপ যজ্ঞ; চ-ও; যতয়ঃ-তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; সংশিতব্রতাঃ-কঠোর ব্রতপরায়ণ।

গীতার গান

দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ যত ।
স্বাধ্যায় যোগীর জ্ঞান শংসিত সে ব্রত ॥

অনুবাদ

কঠোর ব্রত গ্রহণ করে কেউ কেউ দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ করেন। কেউ কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ-যোগরূপ যজ্ঞ করেন এবং অন্য অনেকে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত যজ্ঞকে নানা রকম শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। অনেক লোক আছে, যারা নানা রকম দান-ধ্যান করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করে। ভারতবর্ষে অনেক ধনী-বণিক ও রাজ-পরিবারের লোক আছেন, যাঁরা ধর্মশালা, অন্নক্ষেত্র, অতিথিশালা, অনাথাশ্রম, বিদ্যাপীঠ আদি নানা রকম দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য দেশেও হাসপাতাল, বৃদ্ধদের আশ্রয়-ভবন এবং এই ধরনের নানা রকম দাতব্য সংস্থা রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃস্থ-দরিদ্রদের খাদ্যসামগ্রী দান করা, শিক্ষা দান করা ও ঔষধ বিতরণ করা। এই সমস্ত দানকর্মকে বলা হয় দ্রব্যময়-যজ্ঞ। অনেক লোক আছেন যাঁরা উন্নততর জীবন অথবা স্বর্গারোহণ করবার জন্য চন্দ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য আদি স্বেচ্ছামূলক তপশ্চর্যার অনুশীলন করেন। এই সমস্ত পন্থায় বিশেষ বিধি-নিষেধের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করবার জন্য কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। যেমন, চাতুর্মাস্য ব্রত পালনকারী চার মাস দাড়ি কামান না, নিষিদ্ধ জিনিস আহার করেন না, দিনে একবারের বেশি দুবার আহার গ্রহণ

করেন না, অথবা কখনও গৃহ পরিত্যাগ করেন না। এভাবেই সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় তপোময়-যজ্ঞ। আর এক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা ব্রহ্মৈক্য লাভকরবার জন্য পাতঞ্জল-যোগ, হঠযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ আদির অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকেন। কেউ আবার সমস্ত পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকে বলা হয় যোগ-যজ্ঞ, অর্থাৎ এই জড় জগতে বিশেষ ধরনের সিদ্ধি লাভের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। অনেকে আছেন, যাঁরা নানা রকম বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র অথবা সাংখ্য-দর্শন পাঠ করেন। এগুলিকে বলা হয় স্বাধ্যায়-যজ্ঞ। এই সমস্ত যোগীরা শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞে নিয়োজিত এবং তাঁরা উচ্চতর জীবনের অভিলাষী। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত এই সমস্ত যজ্ঞ থেকে ভিন্ন, কারণ তা হচ্ছে পরম রসমাধুর্যপূর্ণ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। উপরোক্ত কোন প্রকার যজ্ঞের মাধ্যমে এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তিযোগ লাভ করা যায় না, তা লাভ করা যায় কেবল ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপার ফলে। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে দিব্য, অপ্রাকৃত।

শ্লোক ২৯

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অপানে-অধোগামী বায়ুতে; জুহতি-আহুতি দেন; প্রাণম্ ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে; প্রাণে-ঊর্ধ্বগামী বায়ুতে; অপানম্-অধোগামী বায়ুকে; তথা-তেমনই; অপরে-অপর কেউ; প্রাণ-প্রাণবায়ু; অপান-অপান বায়ু; গতী-গতি; রুদ্ধ্বা-নিরোধ করে; প্রাণায়াম-শ্বাস-প্রশ্বাস সংযমের মাধ্যমে প্রাণায়াম; পরায়ণাঃ-পরায়ণ; অপরে-অপর কেউ; নিয়ত-নিয়ন্ত্রিত করে; আহারাঃ-আহার; প্রাণান্-প্রাণবায়ুকে; প্রাণেষু-প্রাণবায়ুতে; জুহ্বতি-আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

প্রাণাপান যোগক্রিয়া অপানে হবন।
প্রাণাপান গতিরুদ্ধ প্রাণায়ামী হন ॥
আহারাদি খর্ব করি নিয়ত আহার।
প্রাণকে প্রাণেতে দেয় হোমের আকার ।।

অনুবাদ

আর যাঁরা প্রাণায়াম চর্চায় আগ্রহী, তাঁরা অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দিয়ে অবশেষে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে সমাধিস্থ হন। কেউ আবার আহার সংযম করে প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন।

তাৎপর্য

যোগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রণালীকে বলা হয় প্রাণায়াম। প্রাথমিক স্তরে হঠযোগে বিভিন্ন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে এই প্রাণায়ামের অনুশীলন করা হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবার জন্য এই সমস্ত বিধি বিধান দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ক্রিয়া অনুশীলন করার ফলে দেহস্থিত বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে বিপরীত দিকে চালিত করা হয়। অপান বায়ুর গতি নিম্নমুখী এবং প্রাণবায়ুর গতি ঊর্ধ্বমুখী। প্রাণায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে যোগী এই বায়ু দুটিকে বিপরীত মুখে চালিত করে তাদের বেগকে

দমন করেন এবং 'পূরকে' তাদের ভারসাম্যের সৃষ্টি করেন। এভাবেই নিঃশ্বাসকে যখন প্রশ্বাসে অর্পণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'রেচক'। দুটি বায়ুর গতিকে যখন স্থির করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কুম্ভক'। এই কুম্ভকের অনুশীলনের ফলে যোগীরা পারমার্থিক উপলব্ধির পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রবুদ্ধ যোগী একই জন্মে পারমার্থিক উপলব্ধির চরম পূর্ণতা লাভ করতে চান, পরবর্তী জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করতে ইচ্ছা করেন না। সেই জন্য, কুম্ভক-যোগ সাধনার মাধ্যমে যোগীরা বহু বহু বছর আয়ু বৃদ্ধি করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে নিত্যযুক্ত কৃষ্ণভক্ত অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন থাকার ফলে, অনায়াসে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে সক্ষম হন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তাই আর তিনি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং জীবনের শেষে, তিনি অনায়াসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্তরে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন যোগক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর আয়ুকে বর্ধিত করে বহু দিন এই জড় জগতে বাস করার কোন বাসনাই তাঁর থাকে না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) বলা হয়েছে-

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে অতিক্রম করেন এবং অচিরেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন।" প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মভূত স্তর থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতের শুরু হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মহাত্মারা তাই সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। এই স্তর থেকে তিনি কখনই পতিত হন না এবং অন্তকালে অবিলম্বে তিনি ভগবানের চিন্ময় ধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন বলে তিনি সর্বদাই অল্পাহারী এবং তার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই সংযত। আর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করতে পারলে কোন মতেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৩০

সর্বেঁইপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

সর্বে-সকলে; অপি-আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হলেও; এতে-এঁরা সকলে; যজ্ঞবিদঃ -যজ্ঞবিদ; যজ্ঞক্ষপিত-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে নির্মল হয়ে; কল্মষাঃ-পাপ থেকে; ষজ্ঞশিষ্ট-এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফল; অমৃতভুজঃ-অমৃত ভোজনকারীরা; যান্তি-লাভ করেন; ব্রহ্ম-পরম; সনাতনম্-সনাতন প্রকৃতি।

গীতার গান

এই সব তত্ত্ববিৎ ক্ষীণ পাপ হয়।
ক্রমে ক্রমে পাপহীন ব্রহ্ম সে প্রাপয় ॥
যজ্ঞনিষ্ঠ ভোজী তারা নিষ্পাপ জীবন।
যোগ্য ব্যক্তি হয় লাভে ব্রহ্ম সনাতন ॥

অনুবাদ

এঁরা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন, এবং তার পর সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান।

তাৎপর্য

যজ্ঞাদি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে, দ্রব্যময়-যজ্ঞ, তপোময়-যজ্ঞ, যাগ-যজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম করা। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাই হচ্ছে ভবরোগের মূল কারণ। তাই, ইন্দ্রিয়-সুখের ভোগবাসনা পরিত্যাগ না করতে পারলে সচ্চিদানন্দময় জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এই স্তর হচ্ছে শাশ্বত ব্রহ্মা পরিবেশ। পূর্বোক্ত সব কয়টি যজ্ঞ পাপপূর্ণ জীবনের কলুষ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এই আত্মোন্নতির দ্বারা কেবল এই জীবনেই সুখ-বৈভবের প্রাপ্তি হয়, তাই নয়, তা ছাড়া এই জীবনের শেষে নির্বিশেষ ব্রহ্মৈক্য লাভ অথবা ভগবৎ-ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয়।

শ্লোক ৩১

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোইন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

ন-না; অয়ম্-এই; লোকঃ-জগৎ; অস্তি-আছে; অযজ্ঞস্য-যজ্ঞরহিত ব্যক্তির; কুতঃ-কোথায়; অন্যঃ-অন্য; কুরুসত্তম-হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

ইহলোকে যজ্ঞ বিনা কোন সুখ নাই।
পরলোক বিনাযজ্ঞে কেমনে সে পাই ॥

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ। যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তা হলে পরলোকে সুখপ্রাপ্তি কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

জীব যে-রকম দেহই ধারণ করে এই জড় জগতে অবস্থান করুক না কেন, তার যথার্থ স্বরূপ তার কাছে অবধারিতভাবে অজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপের ফলে জীবাত্মা এই জড় জগতে অবস্থান করে। অজ্ঞানতা হচ্ছে এই পাপ-পঙ্কিল জীবনের কারণ এবং জীবন যতক্ষণ পাপের দ্বারা কলুষিত থাকে, ততক্ষণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতের এই কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মানব-শরীর। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধন করার মাধ্যমে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বেদ দেখিয়ে দিচ্ছে। ধর্মের পথে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে খাদ্য, শস্য, দুধ আদি পর্যাপ্ত মাত্রায় অর্জন করা যায়, তখন অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যদ্রব্যের কোন অনটন হয় না। দেহের এই সমস্ত স্থূল প্রয়োজনগুলি মিটে গেলে, তখন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রশ্ন আসে। তাই, বেদে নিয়ন্ত্রিতভাবে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিবাহ-যজ্ঞের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। মুক্ত জীবনের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। উপরের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা আসে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে যদি

কেউ এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, তা হলে সে এই দেহের মাধ্যমে সুখী জীবনের কি করে আশা করতে পারে এবং অন্য গ্রহে গিয়ে পরবর্তী জীবনের তো কথাই নেই? বিভিন্ন রকমের স্বর্গলোকে সুখভোগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে সব দিক দিয়েই অসীম সুখভোগ করা যায়। কিন্তু সর্বোচ্চ সুখ কেবল তখনই অনুভব করা যায়, যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, ভগবানের চিন্ময় ধামে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে ভগবানের সেবা করা যায়। তাই কৃষ্ণভক্তি সাধন করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং সব রকম সমস্যার সমাধান করার সেটি শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৩২

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এবম্-এভাবে; বহুবিধাঃ বহুবিধ; যজ্ঞাঃ-যজ্ঞ; বিততাঃ-বিস্তৃত; ব্রহ্মণঃ-বেদের; মুখে-মুখে; কর্মজান্ কর্মজাত; বিদ্ধি-জানবে; তান্-তাদের; সর্বান্-সকলকে; এবম্-এভাবে; জ্ঞাত্বা-জেনে; বিমোক্ষ্যসে-মুক্তি লাভ করতে পারবে।

গীতার গান

হে পুরুষোত্তম! অতঃ যজ্ঞই যে ধর্ম।
আর সব যাহা কিছু সকল বিকর্ম ॥
বেদাদি শাস্ত্রেতে তথা বহু যজ্ঞ হয়।
সে সব যজ্ঞাদি জান সব কর্মজান।
কত শাখা প্রশাখাদি কে করে নির্ণয় ।
মুক্তিপথ সেই জান যজ্ঞ সে সর্বান ॥

অনুবাদ

এই সমস্ত যজ্ঞই বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত। সেগুলিকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন কর্মীর বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে বেদে নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তার দেহাত্মবুদ্ধিতে তন্ময় হয়ে আছে। তাই, সমস্ত যজ্ঞের এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার দেহ, মন অথবা বুদ্ধির যোগ্যতা অনুসারে তাদের অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর নিজের মুখ থেকে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রেয়ান্-শ্রেয়; দ্রব্যময়াৎ-দ্রব্যময়; যজ্ঞাৎ-যজ্ঞ থেকে; জ্ঞানযজ্ঞঃ-জ্ঞানময় যজ্ঞ; পরন্তপ-হে শত্রু দমনকারী; সর্বম্-সমস্ত; কর্ম-কর্ম; অখিলম্পূর্ণরূপে; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; জ্ঞানে-জ্ঞানে; পরিসমাপ্যতে-সমাপ্ত হয়।

গীতার গান

কিন্তু শ্রেয় জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞাপেক্ষা।
জ্ঞানীর নাহিক আর কর্মজ অপেক্ষা ॥
সর্ব কর্ম শেষ হয় জ্ঞানে সমাপন।
কর্মশুদ্ধ চিত্তে হয় জ্ঞানের সাধন ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ। দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। হে পার্থ! সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করে অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর নিত্য সাহচর্য লাভ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি যজ্ঞেরই একটি নিগূঢ় রহস্য আছে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে সেই রহস্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানকারীর বিশ্বাস ও বাসনা অনুসারে যজ্ঞ বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করার কামনায় কেউ যখন জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ অপ্রাকৃত জ্ঞানরহিত কর্মযজ্ঞের থেকে শ্রেয়, কেন না জ্ঞানবিহীন যজ্ঞ লৌকিক ক্রিয়া মাত্র-তাতে পরমার্থ লাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞান সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপ্রাকৃত জ্ঞানে অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় পরিসমাপ্তি হয়। জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না হলে যজ্ঞানুষ্ঠান কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপ। যখন যজ্ঞের সকল কাজকর্ম অপ্রাকৃত জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে, তখন তার সুফল পারমার্থিক পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। স্তরভেদে যজ্ঞ-ক্রিয়াকে কর্মকাণ্ড (সকাম কর্ম) অথবা জ্ঞানকাণ্ড (সত্য-জিজ্ঞাসা) বলা হয়। কিন্তু সেই যজ্ঞই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, যার ফলে পরম জ্ঞান লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৪

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎ-বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান; বিদ্ধি-জানবার চেষ্টা কর; প্রণিপাতেন সদগুরুর শরণাগত হয়ে; পরিপ্রশ্নেন-ঐকান্তিক বিনম্র প্রশ্নের দ্বারা; সেবয়া-সেবার দ্বারা; উপদেক্ষ্যন্তি-উপদেশ দান করবেন; তে-তোমাকে; জ্ঞানম্-জ্ঞান; জ্ঞানিনঃ-আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; তত্ত্ব-তত্ত্ব; দর্শিনঃ-দ্রষ্টাগণ।

গীতার গান

অতএব সে বিজ্ঞান যে জানিবারে চায়।
উপযুক্ত গুরুপদ করয়ে আশ্রয় ।
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার সহিত।
গুরুস্থানে জানি লও আপনার হিত ॥

অনুবাদ

সদগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উপলব্ধির পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। তাই, ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেই সদ্গুরুর শরণাগত হতে, যিনি গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি কখনই গুরু হতে পারেন না। ভগবান হচ্ছেন আদি গুরু। তিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টির আদিতে দান করেছিলেন। তারপর গুরু-শিষ্য ধারায় পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই, এই পরম্পরার ধারায় যিনি এই জ্ঞান আহরণ করেছেন, তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তিনিই এই জ্ঞানকে যথাযথরূপে দান করতে পারেন। মনগড়া একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে আমরা কখনই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। একদল মূঢ় প্রতারক গুরু সেজে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। এই জন্য ভাগবতে (৬/৩/১৯) বলা হয়েছে, ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্ ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবানই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। তাই, জল্পনা-কল্পনা বা বৃথা তর্ক অথবা শাস্ত্রগ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে কখনই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হয়ে ক্রীতদাসের মতো তাঁর সেবা করতে হয়। সদ্গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে কেবল প্রশ্ন করে কখনই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কতটা প্রবল হয়েছে এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করেন। এখানে অন্ধের মতো অনুকরণ করা অথবা মূঢ়ের মতো নিরর্থক প্রশ্ন করার নিন্দা করা হয়েছে। শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরুপ্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করবে, তা নয়, তাকে আত্মসমর্পণ, গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতেও হবে। সদগুরু সর্বদাই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ। তাই শিষ্য যখন বিনীত ও আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সর্বতোভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৩৫

যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

যৎ-যা; জ্ঞাত্বা-জেনে; ন-না; পুনঃপুনরায়; মোহম্-মোহ; এবম্-এই প্রকার; যাস্যসি-প্রাপ্ত হবে; পাণ্ডব-হে পাণ্ডুপুত্র; যেন-যার দ্বারা; ভূতানি-জীবসমূহ; অশেষাণি-সমস্ত; দ্রক্ষ্যসি-দর্শন করবে; আত্মনি-পরমাত্মায়; অথো-অর্থাৎ; ময়ি-আমাতে।

গীতার গান

সে সব জ্ঞানের কথা বুঝিতে পারিলে।
মোহ আর হবে নাহি হারিলে জিতিলে ॥
তখন সে আত্মাদৃক দেখে ব্রহ্মসম ।
সম্পূর্ণ দর্শন সেই সম্পর্ক সে সম ॥

অনুবাদ

হে পাণ্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে শিষ্য বুঝতে পারে যে, সকল জীবই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা অস্তিত্ব থাকাকে বলা হয় মায়া। মা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'না' আর য়া শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যা' অর্থাৎ 'যার কোন অস্তিত্ব নেই'। কেউ কেউ মনে করে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ এবং পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মাহ্ম। কিন্তু ভগবদ্গীতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সর্ব কারণের কারণ। অনন্ত কোটি অবতারেরাও হচ্ছেন তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশ মাত্র। তেমনই, সকল জীবও হচ্ছে ভগবানের অংশ-প্রকাশ। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভুল করে মনে করে যে, বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে প্রকট হবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। এটি হচ্ছে প্রাকৃত চিন্তাধারা। প্রাকৃত জড় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যখন কোন কিছু খণ্ডরূপে পরিবেশিত হয়, তখন তার মূল স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মায়াবাদী দার্শনিকেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, ভগবান হচ্ছেন পরতত্ত্ব, তিনি হচ্ছেন অনন্ত। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে এক যোগ করলেও তাঁর কোন বিকার হয় না, আবার তাঁর থেকে এক বিয়োগ করলেও তাঁর কোন বিকার হয় না। এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

পর্যাপ্ত পারমার্থিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা বর্তমানে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছি এবং তারই ফলে আমরা মনে করি, আমরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাংশ কিন্তু তবুও আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। জীবের দেহগত পার্থক্য হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ তার সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা। মায়ার প্রভাবে অর্জুন মনে করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য চিন্ময় সম্পর্ক অপেক্ষা তাঁর দেহগত সম্বন্ধে যারা তাঁর আত্মীয়, তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভগবদ্গীতার সমস্ত উপদেশই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যকালের সেবক এবং সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। সে যদি মনে করে, সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা, সেটিই হচ্ছে মায়া। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জীবদের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। অনন্তকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়ার ফলেই তারা কখনও মানুষ কখনও পশু কখনও দেবতা আদি রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সেবার কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই এই দেহগত পার্থক্যের উদয় হয়। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন, তখন তিনি এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান কেবল সদ্গুরুর কাছ থেকেই লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের প্রভাবেই কেবল জীব শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ, এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরম তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান,

যার প্রভাবে আমরা জানতে পারি যে, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। এই পরম আশ্রয় হারিয়ে ফেলার ফলেই জীবসমূহ তাদের নিজেদের পৃথক পরিচয় আছে, এরূপ কল্পনা করে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এভাবেই তারা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে জগৎকে ভোগ করতে চায় এবং সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। এই ধরনের মোহগ্রস্ত জীবেরা যখন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তারা মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/৬) বলা হয়েছে- মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। মুক্তির অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া।

শ্লোক ৩৬

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি. ॥ ৩৬ ॥

অপি-এমন কি; চেৎ-যদি; অসি-তুমি হও, পাপেভ্যঃ-পাপীদের থেকে; সর্বেভ্যঃ-সমস্ত; পাপকৃত্তমঃ-পাপিষ্ঠ; সর্বম্-এই প্রকার সমস্ত পাপকর্ম; জ্ঞানপ্লবেন-দিব্য জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারা; এব-অবশ্যই; বৃজিনম্-দুঃখরূপ সমুদ্র; সন্তরিষ্যসি-অতিক্রম করবে।

গীতার গান

পাপী হতে পাপী যদি হয়ে থাক তুমি।
তথাপি জ্ঞানের পোতে তরিবে আপনি ॥

অনুবাদ

তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা এতই মাধুর্যময় যে, তা অজ্ঞানতার সমুদ্রে যে জীবন-সংগ্রাম, তা থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে। এই জড় জগৎকে কখনও অবিদ্যার সমুদ্র অথবা কখনও দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অতি সুদক্ষ সাঁতারুও যেমন সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হতে পারে না, ঠিক তেমনই জড় জগতের যে জীবন-সংগ্রাম তা দুরতিক্রম্য। মাঝ-সমুদ্রে যে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে, তার উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যদি কেউ এসে তাকে তুলে নেয়। এই ভবসমুদ্রে আমরাও সেই রকম হাবুডুবু খাচ্ছি। এখন কেউ যদি কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের এই ভবসমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলেই কেবল আমরা উদ্ধার পেতে পারি। ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া অপ্রাকৃত ভগবৎ-তত্ত্ব হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ। এই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে আমাদের উদ্ধারকারী নৌকা। মুক্তি লাভের এই পথ অত্যন্ত সহজ, সরল ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ৩৭

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

যথা-যেমন; এধাংসি-দাহ্য কাঠ; সমিদ্ধঃ-সম্যরূপে প্রজ্বলিত; অগ্নিঃ-অগ্নি; ভস্মসাৎ-ভস্মীভূত; কুরুতে করে; অর্জুন-হে অর্জুন; জ্ঞানাগ্নিঃ-জ্ঞানরূপ অগ্নি; সর্বকর্মাণি-সমস্ত জড় কর্মফলকে; ভস্মসাৎ-ভস্মীভূত; কুরুতে-করে; তথা-তেমনই।

গীতার গান

প্রবল অগ্নিতে যথা কাষ্ঠ ভস্মসাৎ।
জ্ঞানাগ্নি জ্বলিলে পাপ সকল নিপাত ॥
অতএব জ্ঞানতুল্য নাহি সে পবিত্র।
তাহা নহে জড় জ্ঞান লাভ যত্রতত্র ॥

অনুবাদ

প্রবলরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন! তেমনই জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে।

তাৎপর্য

যে জ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মা এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, তাকে এখানে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অগ্নি কেবল পাপ কর্মফলকেই দহন করে তাই নয়, তা পুণ্য কর্মফলকেও দহন করে তাদের ভস্মে পরিণত করে। কর্মের ফল নানা রকম হয়। কোন কোন কর্মের ফল অপরিণত, কোন কর্মের ফল পরিণত, কোন কর্মের ফল ইতিমধ্যেই ভোগ করা হয়ে গেছে, আবার কোন কোন কর্মের ফল পূর্বজন্মের থেকে সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু স্বরূপ উপলব্ধির পরম জ্ঞানের আগুনে তা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। বেদে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৪/২২) বলা হয়েছে, উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী-"পাপ ও পুণ্য উভয় কর্মফল থেকেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"

শ্লোক ৩৮

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ন-কিছুই নেই; হি-অবশ্যই; জ্ঞানেন-জ্ঞানের; সদৃশম্-তুল্য; পবিত্রম্-পবিত্র; ইহ-এই জগতে; বিদ্যতে বিদ্যমান; তৎ-তা; স্বয়ম্ স্বয়ং; যোগ-যোগে; সংসিদ্ধঃ-সম্যরূপে সিদ্ধ; কালেন-কালক্রমে; আত্মনি-আত্মায়; বিন্দতি-উপভোগ করেন।

গীতার গান

যোগসিদ্ধ সেই জ্ঞান চিন্ময় নির্মল।
সে জ্ঞান লভিলে হবে আনন্দে বিহ্বল ॥

অনুবাদ

এই জগতে চিন্ময় জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ক ফল। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, তিনি কালক্রমে আত্মায় পরা শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানের তাৎপর্য হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধি। তাই, এই দিব্য জ্ঞানের মতো মহিমান্বিত ও নির্মল

আর কিছুই নেই। আমাদের বন্ধনের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞান হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সুপক্ক ফল। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তাঁকে আর অন্যত্র শান্তির অন্বেষণ করতে হয় না, কেন না তিনি তাঁর অন্তস্তলে নিত্য শান্তি উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জ্ঞান ও শান্তি কৃষ্ণভাবনামৃতে পর্যবসিত হয়। ভগবদ্গীতার এই হচ্ছে চরম উপদেশ।

শ্লোক ৩৯

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্-শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি; লভতে-লাভ করেন; জ্ঞানম্-জ্ঞান; তৎপরঃ-সেই অনুষ্ঠানে অনুরক্ত; সংযত-সংযত; ইন্দ্রিয়ঃ-ইন্দ্রিয়সমূহ; জ্ঞানম্-জ্ঞান; লব্ধা-লাভ করে; পরাম্-অপ্রাকৃত; শান্তিম্-শান্তি; অচিরেণ-অচিরেই; অধিগচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

শ্রদ্ধাবান যেই হয় লভে সেই জ্ঞান।
সংযত ইন্দ্রিয় যার তৎপর সে হন ।
সে জ্ঞান লভিলে শান্তি অচিরাৎ পায় ।
সংসারের যত ক্লেশ সব মিটে যায় ॥

অনুবাদ

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভকরেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। শ্রদ্ধাবান তাঁকেই বলা হয় যিনি বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণভক্তি সাধন করলে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করলে জীবনের পরমার্থ সাধিত হয়। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন এবং হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অন্তর সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং তখন হৃদয়ে এই শ্রদ্ধার উদয় হয়। এ ছাড়া, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগগুলিকে সংযত করে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৪০

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ।৪০ ॥

অজ্ঞঃ-শাস্ত্রজ্ঞান রহিত মূঢ়; চ-এবং; অশ্রদ্দধানঃ-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; চ-ও; সংশয়-

সংশয়; আত্মা-ব্যক্তি; বিনশ্যতি বিনষ্ট হয়; ন-না; অয়ম্-এই; লোকঃ-লোকে; অস্তি-আছে; ন-না; পরঃ-পরবর্তী জীবনে; ন-না; সুখম্-সুখ; সংশয়-সংশয়; আত্মনঃ-ব্যক্তির।

গীতার গান

সংশয়াত্মা অজ্ঞ যারা তাহে শ্রদ্ধা নাই।
বিনাশ নিশ্চয় তার কহিনু নিশ্চয়ই ॥
সে সব লোকের নাই ইহ-পরকাল।
সংশয়ী আত্মা সে দুঃখী সে সংসারজাল ॥

অনুবাদ

অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রামাণ্য দিব্য শাস্ত্রের মধ্যে ভগবদ্গীতাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত মানুষের প্রবৃত্তি প্রায় পশুদের মতো, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান অথবা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। আবার এমনও কিছু লোক আছে, যাদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও বা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারলেও, শাস্ত্রের কথায় তাদের বিশ্বাস নেই। শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে এরা নানা রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি তাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। আবার আর এক ধরনের মানুষ আছে, যাদের ভগবদ্গীতার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর, তাই তারা তাঁর আরাধনা করে না। এই ধরনের মানুষদের মনে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয় না। তারা অধঃপতিত হয়। এদের মধ্যে যাদের মোটেই বিশ্বাস নেই এবং যারা এই শাস্ত্রোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সন্দিহান, তারা তাদের পারমার্থিক জীবনে কোন রকম উন্নতি লাভ করতে পারে না। ভগবান এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারা কখনই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের অনুগমন করে পরম জ্ঞান লাভকরাই হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। পারমার্থিক উপলব্ধির অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে এই জ্ঞানই সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে, সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষদের পক্ষে পারমার্থিক মুক্তির কোনও মর্যাদা লাভ সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে, গুরু-পরম্পরায় যে সমস্ত মহান আচার্য আছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করা।

শ্লোক ৪১

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় । ৪১ ॥

যোগ-কর্মযোগে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; সংন্যস্ত-ত্যাগ করেন; কর্মাণম্-কর্মফল; জ্ঞান-জ্ঞানের দ্বারা; সংছিন্ন-ছেদন করেন; সংশয়ম্-সংশয়; আত্মবন্তম্-আত্মবান; ন-না; কর্মাণিকর্মসমূহ; নিবধ্নন্তি-আবদ্ধ করতে পারে; ধনঞ্জয়-হে ধনঞ্জয়।

গীতার গান

অতএব যোগ দ্বারা কর্মবিহীন।
জ্ঞানলাভ দ্বারা হয় সংশয় বিলীন ॥

আত্মবান জ্ঞানবান কর্ম হতে মুক্ত।
হে ধনঞ্জয়! তুমি সেই হও নিত্যমুক্ত ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ধনঞ্জয়। যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্মত্যাগ করেন, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁকে কোন কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত গীতার জ্ঞানকে যিনি অনুসরণ করেন, এই দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাঁর অন্তরের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবার ফলে তিনি ইতিমধ্যেই আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত। তাই, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ৪২

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ৷ ৪২ ॥

তস্মাৎ-অতএব; অজ্ঞানসম্ভূতম্-অজ্ঞান থেকে উদ্ভুত; হৃৎস্থম্-হৃদয়স্থিত; জ্ঞান-জ্ঞানের; অসিনা-খঙ্গের দ্বারা; আত্মনঃ-আত্মার; ছিত্ত্বা-ছিন্ন করে; এনম্-এই; সংশয়ম্-সংশয়; যোগম্-যোগে; আতিষ্ঠ-অধিষ্ঠিত হও; উত্তিষ্ঠ-যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও; ভারত-হে ভরতবংশীয়।

গীতার গান

অজ্ঞানসম্ভূত মোহ জ্ঞান অসি দ্বারা।
হৃদয়ে উদয় সব হইয়াছে যারা ॥
এই সব ছিন্ন করি জাগিয়া উঠিবে।
হে ভারত! যোগোতিষ্ঠ হও এ সংসারে ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ভারত। তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞানপ্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে, তা জ্ঞানরূপ খঙ্গের দ্বারা ছিন্ন কর। যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে যে যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় 'সনাতন-যোগ' অর্থাৎ জীবের উপযোগী শাশ্বত কার্যকলাপ। এই যোগে দুই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধিত হয়-তার একটি হচ্ছে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ সব রকম জড় বিষয়কে উৎসর্গ করা এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মজ্ঞান যজ্ঞ, যা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ পারমার্থিক কর্ম। দ্রব্যময়-যজ্ঞ যদি পারমার্থিক উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তবে তা জড়-জাগতিক কর্মে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এই যজ্ঞ যদি পরমার্থ সাধন করবার জন্য, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সাধিত হয়, তবে তা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পারমার্থিক কর্মও দুটি ভাগে বিভক্ত-নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা। ভগবদগীতার যথার্থ জ্ঞান লাভকরলে এই দুটি তত্ত্বকেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। তখন অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকার উপলব্ধি পরম মঙ্গলময়,

কারণ এই জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলার তত্ত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্গীতায় নির্দেশিত ভগবানের উপদেশ যে বুঝতে পারে না, সে হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন ভগবৎ-বিদ্বেষী। ভগবান যে তাকে একটুখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে তার অপব্যবহার করছে। ভগবদ্গীতায় ভগবান এত সরলভাবে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে নিতান্তই মূর্খ। কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করলে ধীরে ধীরে অজ্ঞানতা দূর হয়। দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মাচর্য-যজ্ঞ, গার্হস্থ্য পালনরূপ যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যজ্ঞ, যোগাভ্যাস-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের দ্বারা অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশ হয়। এই সব কয়টিকেই বলা হয় 'যজ্ঞ' এবং সব কয়টি ক্রিয়াই নিয়ন্ত্রিত কর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। এই উদ্দেশ্যকে যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনিই হচ্ছেন ভগবদ্গীতার যথার্থ শিষ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে যার মনে সংশয় আছে, সে অধঃপতিত হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যথার্থ সদ্গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে, তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্গীতা বা অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ শিক্ষালাভ করা উচিত। সৃষ্টির আদি থেকে যে জ্ঞান গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, তা আহরণ করতে হয় পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত যে সদ্গুরু, তাঁর কাছ থেকে। কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে ভগবান যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে এবং সদ্গুরু তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে দান করেন। তাই, ভগবদ্গীতার যথাযথ উপদেশ প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। যে সমস্ত প্রতারক তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য ভগবদ্গীতার জ্ঞানকে বিকৃত করে তার কদর্থ করে মানুষকে বিপথে চালিত করে, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়াই মানুষের কর্তব্য। ভগবান হচ্ছেন অবিসম্বাদিত পরমেশ্বর এবং তাঁর সমস্ত লীলাই অপ্রাকৃত। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি ভগবদ্গীতার জ্ঞান লাভ করার মুহূর্ত থেকেই মুক্ত।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-অপ্রাকৃত পারমার্থিক জ্ঞানের স্বরূপ উদ্ঘাটন বিষয়ক 'জ্ঞানযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় - কর্মসন্ন্যাস-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।

মচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; সন্ন্যাসম্-ত্যাগ; কর্মণাম্-সমস্ত কর্মের; কৃষ্ণ-হে শ্রীকৃষ্ণ; পুনঃ-পুনরায়; যোগম্-যোগ; চ-ও; শংসসি-প্রশংসা করছ; যৎ-যা; শ্রেয়ঃ-শ্রেয়স্কর; এতয়োঃ-এই দুটির মধ্যে; একম্-একটি; তৎ-তা, মে-আমাকে; ব্রুহি--দয়া করে বল; সুনিশ্চিতম্-নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:

হে কৃষ্ণ বারেক কর্ম ত্যাগ যে কথন।
পুনরায় কর্মযোগ কহ বিবরণ ॥
তার মধ্যে যেবা নিশ্চিত জানিবা ।
সংশয়বিহীন করি আমারে কহিবা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে শ্রীকৃষ্ণ! প্রথমে তুমি আমাকে কর্ম ত্যাগ করতে বললে এবং তারপর কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে বললে। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক কল্যাণকর, তা সুনিশ্চিতভাবে আমাকে বল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন যে, শুষ্ক জ্ঞানের মানসিক জল্পনার চেয়ে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিভাবমূলক কর্ম শ্রেয়। ভক্তিভাবমূলক সেবা শুষ্ক • জল্পনা-কল্পনার চেয়ে সহজতর, কারণ এই ধরনের কর্ম অপ্রাকৃত এবং তা সাধন করার ফলে মানুষ কর্মফলের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার প্রাথমিক জ্ঞান এবং জড় জগতে তার বন্ধনের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে কিভাবে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তার ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যিনি শুধু জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর আর কোন কর্তব্য নেই। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সব রকমের যজ্ঞই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয়। তবে, এই চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে মোহমুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে। সুতরাং, এভাবে একই সঙ্গে ভক্তিভাবমূলক কর্মে নিয়োজিত হতে এবং জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম পরিহার করতে পরামর্শ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভ্রান্ত করেছিলেন আর তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচলিত করে তোলেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম ত্যাগের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে সমস্ত কর্ম, তা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ সাধন করার জন্য যদি কর্ম করা হয়, তা হলে কর্ম ত্যাগ করা হল কি করে? তিনি মনে করেছিলেন, জ্ঞানের প্রভাবে কর্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস হচ্ছে সব রকমের কর্ম থেকে বিরত হওয়া, কারণ কর্ম ও ত্যাগ তাঁর কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও বুঝতে পারেননি যে, পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে যে কর্ম করা হয়, তা কর্মফল থেকে মুক্ত এবং তাই তা 'অকর্ম'। সুতরাং, তিনি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন, পরমার্থ সাধনের জন্য তিনি কি সর্বতোভাবে কর্ম পরিত্যাগ করবেন, না, পূর্ণ জ্ঞানে কর্ম করবেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।
তয়োস্ত্র কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; সন্ন্যাসঃ-কর্মত্যাগ; কর্মযোগঃ-কর্মযোগ; চ-ও; নিঃশ্রেয়সকরৌ-মুক্তিদায়ক; উভৌ উভয়; তয়োঃ-সেই দুটির মধ্যে; তু-কিন্তু; কর্মসন্ন্যাসাৎ-কর্মসন্ন্যাস থেকে; কর্মযোগঃ-কর্মযোগ; বিশিষ্যতে-শ্রেয়।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন:
সন্ন্যাস আর কর্মযোগ দুই শ্রেয় হয়।
সকল বেদাদি শাস্ত্রে তাই সে কহয় ॥
তার মধ্যে কর্মযোগ সন্ন্যাস অপেক্ষা।
ক্রিয়াত্মক জনমধ্যে না কর উপেক্ষা ।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-কর্মত্যাগ কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিদায়ক। কিন্তু, এই দুটির মধ্যে কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস থেকে শ্রেয়।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে সকাম কর্ম করা হয়, তা মানুষকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। জীব যখন তার শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার আশায় নানাবিধ কর্ম করে চলে, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার কর্মের ফলস্বরূপ একটির পর একটি বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে এই জড় জগতে ঘুরে বেড়ায় এবং তার ফলে জড় বন্ধন অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকে। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৪-৬) প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে-

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোহয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥
পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥
এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুক্ত
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥

"ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য মানুষ উন্মাদ এবং সে জানে না যে, তার ক্লেশদায়ক দেহটি হচ্ছে তার পূর্বকৃত সকাম কর্মের ফল। এই দেহটি অস্থায়ী, অথচ এর জন্যই মানুষকে দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই, জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার আশায় কর্ম করা ভাল নয়। নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে মানুষ কোনও অনুসন্ধান করে না, তার জীবন ব্যর্থ বলেই মনে করতে হবে। যতদিন মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পারে, ততদিন তাকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কর্মফলের আশায় কর্ম করতে হয় এবং যতদিন বিষয়সুখ ভোগ করবার বাসনায় তার চেতনা আচ্ছন্ন থাকে, ততদিন তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন সকাম কর্মে নিবিষ্ট হতে পারে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মনের এই বাসনাকে দমন করে

বাসুদেবের চরণে প্রপত্তি করা। কেবল তখনই সে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পেতে পারে।"
তাই, যে জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, সে তার জড় দেহ নয়, তার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা, সেই জ্ঞানও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে আত্মার শাশ্বত ধর্ম পালন করতে হয়, নচেৎ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেই কর্ম সকাম কর্ম নয়। জ্ঞানময় কর্ম মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের প্রগতিকে শক্তিশালী করে। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়ে, কেবল সকাম কর্ম ত্যাগ করলেই বদ্ধ জীবের হৃদয় কলুষমুক্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ সকাম কর্মের স্তরে কর্ম করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সাধিত হলে তা আপনা থেকেই কর্মফলের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সাহায্য করে এবং তখন তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সর্বদাই কর্মত্যাগের চেয়ে শ্রেয়, কেন না কর্মত্যাগ থেকে পতনের সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন বৈরাগ্য অপূর্ণ, সেই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব ২/২৫৬) বলেছেন-

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"মুমুক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করে এবং সেই ত্যাগ সম্পূর্ণ হয় না। এই ধরনের বৈরাগ্যকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলা হয়।" আমরা যখন বুঝতে পারি যে, সব কিছুই ভগবানের, আমাদের কিছুই নয়, তাই 'আমার' বলে কোন কিছুর উপর আমাদের অধিকার বিস্তার করা উচিত নয়; তখন ত্যাগের সম্পূর্ণতা আসে। মানুষের বোঝা উচিত, বাস্তবিকই কোন কিছুই তার নিজের নয়। তা হলে ত্যাগের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? যে জানে, সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি, সে নিত্য বৈরাগ্যযুক্ত। যেহেতু সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের, তাই সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করতে হয়। এই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্ম মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃত্রিম বৈরাগ্যের চেয়ে অনেক ভাল।

শ্লোক ৩

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যোন দ্বেষ্টিন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ঃ-জ্ঞাতব্য; সঃ-তিনি; নিত্য-সর্বদা; সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী; যঃ-যিনি; ন-না; দ্বেষ্টি-দ্বেষ করেন; ন-না; কাঙ্ক্ষতি-আকাঙ্ক্ষা করেন; নির্দ্বন্দ্বঃ-দ্বন্দুরহিত; হি-অবশ্যই; মহাবাহো-হে মহাবীর; সুখম্-সুখে; বন্ধাৎ-বন্ধন থেকে; প্রমুচ্যতে-মুক্ত হন।

গীতার গান

রাগদ্বেষ বিবর্জিত যেবা কর্মযোগী।
অনাসক্ত বিষয়েতে নহেত সে ভোগী ॥
নির্দ্বন্দু সে মহাবাহো দুঃখ বন্ধ নাই।
তোমারে কহিনু আমি করিয়া নিশ্চয় ।

অনুবাদ

হে মহাবাহো! যিনি তাঁর কর্মফলের প্রতি দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকেই নিত্য

সন্ন্যাসী বলে জানবে। এই প্রকার ব্যক্তি দ্বন্দুরহিত এবং পরম সুখে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ত্যাগী, কারণ তিনি কর্মফলের প্রতি বীতরাগ বা অনুরাগ যে কোন দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত। এভাবেই যিনি সব কিছু ত্যাগ করে অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানী। কারণ, ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্যভাবেই পূর্ণ এবং তিনি হচ্ছেন তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান, তা গুণবৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণ-তত্ত্ব বিচারেও পরম সত্য। নির্বিশেষবাদীরা যে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে ভগবান হওয়ার বাসনা পোষণ করে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কারণ অংশ কখনও পূর্ণের সমান হতে পারে না। গুণগত বৈশিষ্ট্যে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবে পরিমাণ-তত্ত্ব বিচারে ভিন্নতা-বিশিষ্ট, এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বজ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান। তখন মানুষের আকাঙক্ষা বা শোক করবার কিছুই থাকে না। তাই তাঁর মনে আর কোনও দ্বন্দুভাব থাকে না, কারণ তিনি যা করেন তা সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করেন। এভাবেই দ্বন্দ্বভাবের স্তর থেকে মুক্ত হবার ফলে তিনি জড় বন্ধনমুক্ত হন। এমন কি এই জড় জগতে অবস্থানকালেও তিনি বন্ধনমুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৪

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

সাংখ্য-জড় জগতের বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব; যোগৌ-যোগকে; পৃথক্ পৃথক; বালাঃ-অল্পজ্ঞ; প্রবদন্তি বলে; ন-না; পণ্ডিতাঃ-পণ্ডিতেরা; একম্-একটিতে; অপি-ও; আস্থিতঃ-অবস্থিত হলে; সম্যক্-পূর্ণরূপে; উভয়োঃ-উভয়ের; বিন্দতে-লাভ হয়; ফলম্-ফল।

গীতার গান

সাংখ্যযোগ কর্মযোগ যেবা পৃথক বলে।
পণ্ডিত সে নহে কভু বালকের ছলে ॥
উভয় কার্যের মধ্যে যে কোন সে এক।
উভয়ের ফল প্রাপ্তি হইবে সম্যক্ ॥

অনুবাদ

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক পদ্ধতি বলে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তা বলেন না। উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটিকে সুষ্ঠুরূপে আচরণ করলে উভয়ের ফলই লাভ হয়।

তাৎপর্য

সাংখ্য-দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা। জড় জগতের আত্মা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু বা পরমাত্মা। ভক্তিযোগে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়, তখন পরমাত্মারও সেবা সাধিত হয়। একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে গাছের মূল খুঁজে বার করা, আর অন্যটি হচ্ছে সেই মূলে জলসিঞ্চন করা। সাংখ্য-দর্শনের যথার্থ শিক্ষার্থী জড় জগতের মূল শ্রীবিষ্ণুকে জানতে পেরে পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত হয়ে

তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হন। তাই, এই দুটি পদ্ধতিতে কোনও ভেদ নেই, কারণ এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তাই, পরম লক্ষ্যকে যারা জানে না, তারাই কেবল বলে যে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের উদ্দেশ্য এক নয়। কিন্তু যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি জানেন, এই সমস্ত বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এক।

শ্লোক ৫

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যৎ-যা; সাংখ্যৈঃ-সাংখ্য-দর্শনের দ্বারা; প্রাপ্যতে লাভ হয়; স্থানম্-স্থান; তৎ-তা; যোগৈঃ-নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা; অপি-ও; গম্যতে-প্রাপ্ত হওয়া যায়; একম্-এক; সাংখ্যম্-সাংখ্য; চ-এবং; যোগম্-কর্মযোগকে; চ-এবং; যঃ-যিনি; পশ্যতি-দর্শন করেন; সঃ-তিনি; পশ্যতি যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

সাংখ্যযোগ সাধ্য করি যে পদ সে পায়।
যোগসিদ্ধ হলে লাভ তাহা উপজয় ॥
অতএব সাংখ্য কিংবা যোগ এক বল।
বুদ্ধিমান সেই হয় যে বুঝে এক ফল ॥

অনুবাদ

যিনি জানেন, সাংখ্য-যোগের দ্বারা যে গতি লাভ হয়, কর্মযোগের দ্বারাও সেই গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাই যিনি সাংখ্যযোগ ও কর্ম-যোগকে এক বলে জানেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা।

তাৎপর্য

দার্শনিক গবেষণার যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া। জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি, তাই এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা ভিন্ন নয়। সাংখ্য-দর্শনের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জীব এই জড় জগতের বস্তু নয়, সে হচ্ছে পূর্ণ পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই, এই জড় জগতে চিন্ময় আত্মার কোনই প্রয়োজন নেই। তার অস্তিত্বের ও কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা। যখন সে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করে, তখন সে যথার্থই তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমোক্ত পদ্ধতি সাংখ্য-যোগের মাধ্যমে মানুষকে জড় বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হতে হয় এবং কর্মযোগ পদ্ধতি অনুসারে মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে আসক্ত হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি পন্থা এক ও অভিন্ন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাদের একটিকে নিরাসক্তি ও অন্যটিকে আসক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু জড় বস্তুর প্রতি অনাসক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি একই তত্ত্ব। এই কথা যিনি বুঝতে পেরেছেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

শ্লোক ৬

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

সন্ন্যাসঃ-সন্ন্যাস আশ্রম; তু-কিন্তু; মহাবাহো-হে মহাবীর; দুঃখম্-দুঃখ; আপ্তুম্-প্রাপ্ত হয়; অযোগতঃ-নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত; যোগযুক্তঃ-নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানকারী; মুনিঃ-জ্ঞানী; ব্রহ্ম-ব্রহ্মকে; ন চিরেণ-অচিরেই; অধিগচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

সন্ন্যাস করিয়া যদি নহে কর্মযোগী।
মহাবাহো কি বলিব বৃথা সেই ত্যাগী ॥
যোগযুক্ত মুনি যেবা ব্রহ্মপদ পায়।
অচিরাৎ সেই কার্য সিদ্ধি যোগে হয় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী দুই প্রকারের-মায়াবাদী ও বৈষ্ণব। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন করেন আর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-দর্শন অধ্যয়ন করেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও বেদান্ত-সূত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁরা তা অধ্যয়ন করেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণকারী বৈষ্ণবেরা পাঞ্চরাত্রিকী বিধি অনুসারে ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবা করেন, তাই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা চিন্ময় ভগবদ্ভক্তিতে নানাবিধ কর্তব্য পালন করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের জড়-জাগতিক কর্তব্যকর্ম সাধন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু তবুও ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁরা নানা রকম কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়নকারী এবং মনোধর্ম-পরায়ণ মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবদ্ভক্তি আস্বাদন করতে পারেন না। যেহেতু তাঁদের অধ্যয়ন অত্যন্ত শ্রমদায়ক, তাই ব্রহ্ম বিষয়ক মনোধর্মের প্রভাবে বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে তাঁরা কখনও কখনও শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাপন্ন হন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে না পারার ফলে তাও ক্লেশদায়ক হয়ে ওঠে। কৃত্রিম উপায়ে মায়াবাদীদের শুষ্ক জ্ঞানালোচনা এবং জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত অনুমান সবই নিরর্থক। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তাঁদের দিব্য কর্তব্য সম্পাদন করে অপ্রাকৃত আনন্দ লাভকরেন এবং এই জগতের কাজ সমাপ্ত হলে অন্তিমে তাঁরা যে চিন্ময় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও আত্ম-উপলব্ধির মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সমাজসেবা, পরোপকার আদি প্রাকৃত কার্যকলাপে পুনরায় প্রবৃত্ত হন। এগুলি সবই জড়-জাগতিক কর্মবন্ধন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, যাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে চলেছেন, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান অনুসন্ধানী সন্ন্যাসীদের থেকে অনেক উচ্চ মার্গে রয়েছেন। এই সমস্ত ব্রহ্মাম্মবাদী জ্ঞানীরাও বহু জন্মের পরে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেন।

শ্লোক ৭

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যোগযুক্তঃ-নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত; বিশুদ্ধাত্মা-শুদ্ধ চিত্ত; বিজিতাত্মা-আত্মসংযত; জিতেন্দ্রিয়ঃ-ইন্দ্রিয়জয়ী; সর্বভূতাত্মভূতাত্মা-সমস্ত জীবের প্রতি দয়াশীল; কুর্বন্নপি-কর্ম করেও; ন-না; লিপ্যতে-লিপ্ত হন।

গীতার গান

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিত ষড় গুণ।
জিতেন্দ্রিয় হয় সেই অত্যন্ত প্রবীণ ॥
সর্বভূত লাগি যেবা কর্মযোগ সাধে।
বিষয়ের মধ্যে থাকে বিষয় না বাধে ॥

অনুবাদ

যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত জীবের অনুরাগভাজন হয়ে সমস্ত কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন, তিনি প্রতিটি জীবেরই অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রতিটি জীবই তাঁর প্রিয়। কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার ফলেই এটি সম্ভব। এই প্রকার ব্যক্তি কোন কিছুকেই শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভিন্নরূপে দেখেন না। একটি গাছের ডালপালা যেমন গাছটি থেকে ভিন্ন নয়, তেমনই তিনিও দেখেন যে, প্রতিটি জীবও ভগবানের থেকে অভিন্ন। তিনি জানেন, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিকে জল দেওয়া হয় অথবা উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত দেহকেই খাদ্য দেওয়া হয়, তেমনই ভগবানের সেবা করার ফলে সমস্ত জীব-জগতের সেবা করা হয়। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার মাধ্যমে তিনি সকলেরই দাসত্ব করে চলেছেন। তাই তিনি সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই তাঁর অতি প্রিয়। যেহেতু তাঁর কার্যকলাপে সকলেই সন্তুষ্ট, তাই তাঁর চেতনা পবিত্র ও নির্মল। যেহেতু তাঁর চেতনা পবিত্র ও নির্মল, তাই তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে সংযত। আর তাঁর চিত্ত সংযত হবার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত। তাঁর মন সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবদ্ধ, তাই তিনি কখনই ভগবানকে বিস্মৃত হন না। সুতরাং, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জড় কার্যকলাপে নিযুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তিনি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছুই শোনেন না, তিনি কৃষ্ণপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না এবং তিনি ভগবানের মন্দির ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চান না। তাই, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতোভাবে সংযত। এভাবেই যাঁর ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে, তিনি কারও ক্ষতিসাধন করেন না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "তা হলে অর্জুন কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যদের আঘাত দিলেন? তিনি কি ভগবৎ-চেতনাময় ছিলেন না?" সেই প্রশ্নের উত্তর ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্জুনকে অপরাধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্রভাবে চিরকাল বেঁচে থাকবে, কেন না আত্মাকে কখনই হত্যা করা যায় না। তাই, আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কেউই নিহত হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কেবল তাদের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছিল। তাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সত্যি সত্যিই যুদ্ধ করছিলেন না। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করছিলেন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।

শ্লোক ৮-৯

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

ন-না; এব-অবশ্যই: কিঞ্চিৎ-কোন কিছু, করোমি করি; ইতি-এভাবে; যুক্তঃ -চিন্ময় চেতনায় যুক্ত; মন্যেত-মনে করেন; তত্ত্ববিৎ-তত্ত্বজ্ঞ, পশ্যন্-দর্শন; শৃণ্বন্-শ্রবণ; স্পৃশন্-স্পর্শ; জিঘন্-ঘ্রাণ; অশ্বন্-ভোজন; গচ্ছন্-গমন; স্বপন্-স্বপ্ন; শ্বসন্-শ্বাস গ্রহণ; প্রলপন্-প্রলাপ; বিসৃজন্-ত্যাগ; গৃহ্ণন্-গ্রহণ; উন্মিষন্-উন্মীলন; নিমিষন্-নিমীলন; অপি সত্ত্বেও; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়ার্থেযু-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে; বর্তন্তে-প্রবৃত্ত হয়; ইতি-এভাবে; ধারয়ন্-ধারণা করে।

গীতার গান

সে যোগী চিন্তয়ে সদা হয়ে তত্ত্ববিৎ।
সর্বকার্য করি কিন্তু করি না কিঞ্চিৎ ॥
দেখি শুনি স্পর্শ করি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
স্বপনে গমনে কিংবা ভোজনে বিলাসে ॥
প্রলাপন করি কিংবা ভোগে বা সে ত্যাগে।
উন্মীলন নিমীলন কিংবা নিদ্রা যায় জাগে ॥
জড়কার্যে জড়েন্দ্রিয় সতত সে জানে।
নিজ কার্য আত্মতত্ত্ব সর্বদা সে ধ্যানে ॥

অনুবাদ

চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও নিঃশ্বাস আদি ক্রিয়া করেও সর্বদা জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করছেন না। কারণ প্রলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ করার সময় তিনি সব সময় জানেন যে, জড় ইন্দ্রিয়গুলিই কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে, তিনি নিজে কিছুই করছেন না।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে পবিত্র, তাই তিনি কর্তা, কর্ম, অধিষ্ঠান, প্রচেষ্টা ও দৈব-এই পাঁচটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের দ্বারা সাধিত কর্মের সঙ্গে কোনভাবে সংযুক্ত নন। তার কারণ হচ্ছে, তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করছেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, তিনি তাঁর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁর কর্ম করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর যথার্থ স্থিতি সম্বন্ধে সচেতন, যা হচ্ছে পারমার্থিক কার্যকলাপ। জড় চেতনায় ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি বিধান করার সেবায় প্রবৃত্ত হয়। তাই, কৃষ্ণভক্তকে আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে নিয়োজিত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই মুক্ত। দর্শন ও শ্রবণাদি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান আহরণ করা, সেই রকম গমন, প্রলাপন ও মলত্যাগাদিও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম করা। কৃষ্ণভক্ত কোন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সেবা ছাড়া তিনি আর কোন কর্মই করতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস।

শ্লোক ১০

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মণি-পরমেশ্বর ভগবানকে; আধায়-সমর্পণ করে; কর্মাণি-সমস্ত কর্ম; সঙ্গম্-আসক্তি; ত্যক্ত্বা-ত্যাগ করে; করোতি-অনুষ্ঠান করেন; যঃ-যিনি; লিপ্যতে-প্রভাবিত হন; ন-না; সঃ-তিনি; পাপেন-পাপের দ্বারা; পদ্মপত্রম্-পদ্মপাতা; ইব-মতো; অম্ভসা-জল দ্বারা।

গীতার গান

ব্রহ্মণি নিবিষ্ট কার্য নিঃসঙ্গ যে করে।
বিষয় প্রভাবে সেই তাহাতে না ডরে ॥
অতএব পাপ পুণ্যে নাহি তারে লেপে।
সেই পদ্মপত্র জলে জানি বা সংক্ষেপে ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, কোন পাপ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মণি শব্দটির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায়। জড় জগৎ হচ্ছে প্রকৃতির তিনটি গুণের অভিব্যক্তি-তাকে বলা হয় 'প্রধান'। বৈদিক মন্ত্র-সর্বং হোতদ্ ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপনিষদ ২), তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে (মুণ্ডক উপনিষদ ১/১/৯) এবং ভগবদ্গীতার শ্লোক মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম (গীতা ১৪/৩) বর্ণনা করে যে, এই জগতে সব কিছুই ব্রহ্মের প্রকাশ। এই প্রকাশ যদিও ভিন্নরূপে হয়, কিন্তু তা মূল কারণ থেকে অভিন্ন। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, সব কিছুই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাই, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর। যিনি এই সত্যকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই উপলব্ধির ফলে সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই পাপ-পুণ্য কর্মফলের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হন না। পাপ অথবা পুণ্য কোন কর্মফলই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি জানেন, কোন বিশেষ কর্ম সাধন করার জন্যই ভগবান তাঁকে তাঁর জড় শরীরটি দান করেছেন, তাই ভগবানের সেবাতেই তিনি সেটি নিয়োজিত করেন। তখন তা সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত, ঠিক যেমন জলে থাকলেও পদ্মপাতাকে জল কখনও স্পর্শ করতে পারে না। গীতাতেও (৩/৩০) ভগবান বলেছেন, ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য- "সমস্ত কর্ম আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কাছে সমর্পণ কর।" সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে জীব কৃষ্ণভাবনাশূন্য, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়কে তার স্বরূপ মনে করে সে কর্ম করে, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনাময় তিনি জানেন, তাঁর দেহটি শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তিনি তা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ১১

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

কায়েন-দেহের দ্বারা; মনসা-মনের দ্বারা; বুদ্ধ্যা-বুদ্ধির দ্বারা; কেবলৈঃ-বিশুদ্ধ: ইন্দ্রিয়ৈঃ-ইন্দ্রিয় দ্বারা; অপি-এমন কি: যোগিনঃ-কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কাম কর্মযোগীগণ; কর্ম-কর্ম, কুর্বন্তি করেন; সঙ্গম্-আসক্তি; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; আত্ম-আত্মা; শুদ্ধয়ে-শুদ্ধ করার জন্য।

গীতার গান

কায় মন বাক্যে সে যে যোগের সাধন।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি একত্রে বন্ধন ॥
যোগার্থে যে কার্য হয় বৈরাগ্য সে যুক্ত।
সকল সময়ে জ্ঞানযোগী নিত্যযুক্ত ॥

অনুবাদ

আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ, মন, বুদ্ধি, এমন কি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও কর্ম করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা জীবকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করে। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের কোন জড় প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করার ফলে অনায়াসে সদাচার সাধিত হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ২/১৮৭) শ্রীল রূপ গোস্বামী তার বর্ণনা করে বলেছেন-

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি শরীর, মন, বুদ্ধি ও বাণী দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে অবস্থান করলেও, এমন কি তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি মুক্ত পুরুষ।" তাঁর কোন রকম মিথ্যা অহঙ্কার নেই এবং তিনি কখনই মনে করেন না তাঁর দেহটিই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ, অথবা তিনি তাঁর দেহটির মালিক। তিনি জানেন যে, তাঁর স্বরূপ তাঁর দেহটি নয় এবং তাঁর দেহটি তাঁর সম্পত্তি নয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর দেহটিও শ্রীকৃষ্ণের। যখন তিনি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি, বাণী, জীবন, ধন আদি সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিবেদন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণগত প্রাণ। যে মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাবে মানুষ মনে করে, তার দেহটি হচ্ছে তার স্বরূপ, কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় থাকার ফলে তিনি সেই অহঙ্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা।

শ্লোক ১২

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ৷ ১২ ৷

যুক্তঃ-যোগযুক্ত; কর্মফলম্ কর্মের ফল; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; শান্তিম্-শান্তি; আপ্নোতি-লাভ করেন; নৈষ্ঠিকীম্-নিষ্ঠাসম্পন্ন; অযুক্তঃ-সকাম কর্মী; কামকারেণ-কামনাপূর্বক প্রবৃত্ত হওয়ায়; ফলে-কর্মফলে; সক্তঃ-আসক্ত; নিবধ্যতে-আবদ্ধ হয়।

গীতার গান
কর্মফল ত্যজি যুক্ত বৈরাগ্য সাধন ।
নৈষ্ঠিকী শান্তি সে, নহে সংসার বন্ধন ॥
ফল্গু বৈরাগ্য যে কামকারী ফল।
ফলকার্যে নিবন্ধন তাই সে দুর্বল ॥

অনুবাদ

যোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন; কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ও দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বৈষয়িক মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী তার কর্মফলের প্রতি আসক্ত। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং তাঁর প্রীতি উৎপাদনের জন্য সমস্ত কর্ম করেন, তিনি অবধারিতভাবে মুক্ত পুরুষ; কারণ, তিনি কখনই কর্মফলের আশায় উৎকণ্ঠিত হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, দ্বৈত ধারণাযুক্ত হয়ে, অর্থাৎ পরতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত না হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মফলের প্রতি উৎকণ্ঠার উদয় হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরতত্ত্ব পরমেশ্বর। কৃষ্ণভাবনায় তাই দ্বৈতভাব নেই। বিশ্বচরাচরের যা কিছু আছে, তা সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিজাত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম মঙ্গলময়। তাই, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যে কার্যকলাপ সাধিত হয়, তা পারমার্থিক কর্ম; তা অপ্রাকৃত এবং জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাই কৃষ্ণভক্ত শান্ত। কিন্তু যারা সর্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য লাভ-ক্ষতির হিসাব করছে, তারা কখনই শান্তি পেতে পারে না। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের রহস্য-শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-রহিত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং এই সত্য উপলব্ধিই পরম শান্তি ও অভয় দান করে

শ্লোক ১৩

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব-সমস্ত; কর্মাণি-কর্ম; মনসা-মনের দ্বারা; সংন্যস্য-ত্যাগ করে; আস্তে-থাকেন; সুখম্-সুখে; বশী-সংযত; নবদ্বারে নয়টি দ্বারবিশিষ্ট; পুরে-নগরে; দেহী-দেহধারী জীব; ন-না; এব-অবশ্যই; কুর্বন্ করেন; ন-না; কারয়ন্ করান।

গীতার গান
বাহ্যে সর্বকার্য করে অন্তরে সন্ন্যাস।
সর্বকার্যে সুষ্ঠু করি সুখেতে নিবাস ॥
নবদ্বার যুক্ত দেহ থাকি সেই পুরে।
নিজে কিছু নাহি করে না করায় পরে ।

অনুবাদ

বাহ্যে সমস্ত কার্য করেও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জীব নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ গৃহে পরম সুখে বাস করতে থাকেন; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাউকে দিয়েও কিছু করান না।

তাৎপর্য

দেহধারী জীবাত্মা নয়টি দ্বারবিশিষ্ট একটি নগরে বাস করে। দেহরূপী নগরটির কার্য প্রকৃতির বিশেষ গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই সাধিত হয়। জীবাত্মা যদিও স্বেচ্ছায় এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবুও যদি সে ইচ্ছা করে, তবে এর থেকে মুক্ত হতে পারে। তার দিব্য স্বরূপের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে তার যথার্থ স্বরূপকে পুনরুজ্জীবিত করার ফলে সে তার দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জীব যখন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তখন তাঁর দেহগত সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে যখন তার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়, তখন সে মহানন্দে এই নবদ্বার-বিশিষ্ট নগরীতে বাস করে। এই নয়টি দ্বারবিশিষ্ট নগরীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ।

"পরমেশ্বর ভগবান যিনি জীবাত্মার দেহে বাস করছেন, তিনিই হচ্ছেন বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর। দেহের নয়টি দ্বার হচ্ছে-দুটি চোখ, দুটি নাক, দুটি কান, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু যখন সে তার অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় খুঁজে পায়, তখন দেহে থাকলেও সে পরমাত্মার মতোই মুক্ত হয়।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/১৮)

সেই জন্য, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ জড় দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ এই দুই প্রকার কর্ম থেকেই মুক্ত।

শ্লোক ১৪

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে । ১৪ ॥

ন-না; কর্তৃত্বম্-কর্তৃত্ব; ন-না; কর্মাণিকর্মসমূহ, লোকস্য-জীবের; সৃজতি-সৃষ্টি করে; প্রভুঃ-দেহরূপ নগরীর প্রভু; ন-না; কর্মফল-কর্মের ফল; সংযোগম্-সংযোগ; স্বভাবঃ-জড়া প্রকৃতির গুণ; তু-কিন্তু; প্রবর্ততে প্রবৃত্ত হয়।

গীতার গান

অনাদি কর্মফলে ভবার্ণব জলে।
আছে পড়ে বা না হয় তাঁহার সৃজন ॥
কর্মফল যেবা যোগ যাহা করে ভোগ।
স্বভাব সে কার্য হয় নাম ভবরোগ ॥

অনুবাদ

দেহরূপ নগরীর প্রভু জীব কর্ম সৃষ্টি করে না, সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না এবং সে কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। এই সবই হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, জীব ভগবানের মতোই পরা প্রকৃতি-সম্ভূত। এই পরা প্রকৃতি ভগবানের অন্য প্রকৃতি অপরা থেকে ভিন্ন। কোন না কোনভাবে এই উৎকৃষ্ট পরা

প্রকৃতির অংশ জীবাত্মা অনাদিকাল ধরে অপরা প্রকৃতির সংসর্গে আছে। জীবাত্মা তার কর্ম অনুসারে ক্ষণস্থায়ী এক-একটি দেহ প্রাপ্ত হয়ে সেই দেহে বাস করে। এভাবেই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। সে তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে সেই জড় দেহটিকেই তার প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করতে শুরু করে এবং সেই দেহগত কর্মের ফল ভোগ করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অজ্ঞতার পরিণামে তাকে এই দেহজাত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে এবং বুঝতে শেখে যে, সে তার দেহ নয়, সেই মুহূর্তেই সে তার দেহের বন্ধন থেকে-তার কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। যতক্ষণ সেই দেহরূপ নগরীতে সে বাস করে, ততক্ষণ সে মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে তার দেহটির অধীশ্বর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার দেহের অধীশ্বরও নয় এবং তার কর্মফলের কর্তাও নয়। সে হচ্ছে ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান, জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত, অণুসদৃশ জীব। ভব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার কোন শক্তিই তার নেই। চিন্ময় কৃষ্ণভাবনামৃতরূপী তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করলে সে এই ভবসমুদ্র পার হতে পারে-সমস্ত দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শ্লোক ১৫

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ন-না; আদত্তে গ্রহণ করেন; কস্যচিৎ-কারও; পাপম্-পাপ; ন-না; চ-ও; এব-অবশ্যই; সুকৃতম্-পুণ্য; বিভুঃ- পরমেশ্বর ভগবান; অজ্ঞানেন-অজ্ঞানের দ্বারা; আবৃতম্-আবৃত; জ্ঞানম্-জ্ঞান; তেন-তার দ্বারা; মুহ্যন্তি-মোহিত হয়; জন্তবঃ-জীবসমূহ।

গীতার গান

ঈশ্বরের দত্ত নহে সেই পাপ পুণ্য।
পাপ পুণ্য যাহা কিছু নিজ ইচ্ছা জন্য ॥
অজ্ঞানজনিত সেই ভোগ ইচ্ছা করে।
পাশে থাকি মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান জীবের পাপ অথবা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান আবৃত হওয়ার ফলে জীবসমূহ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

সংস্কৃত বিভু শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, যিনি অনন্ত জ্ঞান, শ্রী, যশ, বীর্য, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। তিনি সর্বদাই আত্মতৃপ্ত। পাপ ও পুণ্য তাঁকে কখনই স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কোন জীবের জন্যই কোন বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব বিভিন্ন পরিস্থিতির কামনা করে এবং তার ফলে তার কর্ম ও কর্মফলের প্রবাহ শুরু হয়। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতিজাত, তাই তার স্বরূপে সে পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার শক্তি সীমিত হওয়ার ফলে সে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভগবান সর্ব শক্তিমান, কিন্তু জীব তা নয়। ভগবান বিভু, কিন্তু জীব অণুসদৃশ। জীবাত্মার স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করার স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু কেবলমাত্র সর্ব

শক্তিমান ভগবানের দ্বারাই তার সেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। জীব যখন তার কামনা-বাসনার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই কামনা-বাসনাগুলিকে পূর্ণ করতে ভগবান তাকে অনুমোদন করেন। কিন্তু তাদের বিশেষ বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কর্ম ও কর্মফলের জন্য ভগবান কোন অবস্থাতেই দায়ী নন। বিভ্রান্ত হয়ে জীব তাই তার জড় দেহটিকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং অনিত্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে থাকে। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের নিত্য সহচর। ফুলের কাছে গেলে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনই আমাদের খুব কাছে আছেন বলে ভগবান আমাদের অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনাগুলির কথা জানেন। কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে জীবের বন্ধনের সূক্ষ্ম রূপ। জীব যেভাবে কামনা করে, ভগবান ঠিক সেভাবেই তার যথাযোগ্য পূর্তি করেন। তাই, ইচ্ছা পূরণ করার কোন শক্তিই জীবের নেই, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ, তাই তিনি অণু স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট জীবের ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন ভগবান তাঁর প্রতি বিশেষভাবে যত্নপরায়ণ হন এবং তাঁকে এমনভাবে উৎসাহিত করেন, যার ফলে তিনি তাঁকে পেয়ে শাশ্বত সুখ আস্বাদন করতে পারেন।
বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে, এয উ হোব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি যমধো নিনীষতে-"ভগবান জীবকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করেন যাতে তার উন্নতি সাধন হয়। তিনি জীবকে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত করেন যাতে সে নরকগামী হয়।" (কৌষীতকী উপনিষদ ৩/৮)

অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বাশ্বভ্রমেব চ ॥

"সুখ-দুঃখের উপর জীব সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। বায়ু যেমন মেঘকে চালিত করে, তেমনই ভগবানের ইচ্ছার ফলে জীব স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে।"
তাই, দেহধারী জীব অনন্তকাল ধরে কৃষ্ণবিমুখ হয়ে থাকার বাসনা করে এবং সেটিই তার মোহাচ্ছন্ন হবার কারণ। তাই সে সচ্চিদানন্দময় হলেও, যেহেতু তার সত্তা ক্ষুদ্র ও বন্ধ, তাই সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়-সে ভুলে যায় যে, সে ভগবানের নিত্যদাস এবং এভাবেই সে অবিদ্যার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে সে বলে যে, তার ভব-বন্ধনের জন্য ভগবানই দায়ী। এই কথার বিরোধিতা করে বেদান্ত-সূত্রে (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি- "ভগবান কাউকে ঘৃণা করেন না অথবা ভালবাসেন না, যদিও সেই রকম মনে হয়।"

শ্লোক ১৬

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানেন-জ্ঞানের দ্বারা; তু-কিন্তু; তৎ-সেই; অজ্ঞানম্-অজ্ঞান; যেষাম্-যাঁদের; নাশিতম্-বিনাশ হয়; আত্মনঃ-জীবের; তেষাম্-তাঁদের; আদিত্যবৎ-উদীয়মান সূর্যের মতো; জ্ঞানম্-জ্ঞান; প্রকাশয়তি-প্রকাশ করে; তৎ-সেই; পরম্ অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে।

গীতার গান

অতএব জ্ঞান উপজিলে মায়া নাশ।

আত্মার স্বরূপ তথা স্বতঃই প্রকাশ ॥
সূর্যের প্রকাশে যথা অন্ধকার যায়।
জ্ঞানের প্রকাশে তথা অজ্ঞানের ক্ষয় ।

অনুবাদ

জ্ঞানের প্রভাবে যাঁদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে, তাঁদের সেই জ্ঞান অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে, ঠিক যেমন দিনমানে সূর্যের উদয়ে সব কিছু প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছে তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত তাঁরা কখনই মোহাচ্ছন্ন হন না। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে-সর্বং জ্ঞানপ্লবেন, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি এবং ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্। জ্ঞান সর্বদাই অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। এই জ্ঞানের স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়, যে কথা সপ্তম অধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে-বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে। বহু বহু জন্মের পরে জ্ঞানী যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, অথবা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন, তখন তাঁর কাছে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, যেমন দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে সব কিছু প্রকাশিত হয়। জীব নানাভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধৃষ্টতাপূর্বক সে যখন নিজেকে ভগবান বলে মনে করে, তখন সে মায়ার অন্তিম ফাঁদে পতিত হয়। জীব যদি ভগবান হয়, তা হলে সে মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয় কিভাবে? যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, অজ্ঞান বা শয়তান ভগবানের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী। যথার্থ জ্ঞান কৃষ্ণভাবনাময় মহাপুরুষের কাছ থেকেই লাভকরা যায়। তাই, এই রকম যথার্থ সদ্গুরুর অনুসন্ধান করে তাঁর কাছে কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, কৃষ্ণভাবনামৃত তেমন সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানতা দূর করতে পারে। কেউ জ্ঞান লাভের 'মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে তার দেহ নয়, সে তার জড় দেহের অতীত, তবুও সে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। কিন্তু সে যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত সদ্গুরুর শরণাগত হতে যত্নবান হয়, তা হলে সে সব কিছুই ভালভাবে জানতে পারে। কেবলমাত্র ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্য লাভহলেই ভগবান ও ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা জানা যায়। ভগবানের প্রতিনিধি কখনও দাবি করেন না যে, তিনি ভগবান, কিন্তু তাঁকে ভগবানের মতোই সম্মান করা হয়, কারণ তিনি ভগবৎ-তত্ত্ব জানেন। ভগবান ও জীবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা জানা উচিত। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য বলেছেন, প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র এবং ভগবানও স্বতন্ত্র। অতীতে তাদের সকলেরই পৃথক স্বরূপ ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে মুক্তির পরেও থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে যেমন সব কিছুই এক বলে মনে হয়, কিন্তু দিনের বেলায় সূর্যোদয় হলে প্রতিটি বস্তু তাদের যথার্থ রূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে তেমনই সব কিছুর স্বরূপ উপলব্ধি হয়। পারমার্থিক জীবনে স্বতন্ত্রভাবে স্বরূপ উপলব্ধিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান।

শ্লোক ১৭

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ভূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

তদ্বুদ্ধয়ঃ-যাঁর বুদ্ধি পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে; তদাত্মানঃ-যাঁর পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্র হয়েছে; তন্নিষ্ঠাঃ-কেবল ভগবানেই নিষ্ঠাসম্পন্ন; তৎপরায়ণাঃ-যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; গচ্ছন্তি-লাভ করেন; অপুনরাবৃত্তিম্-মুক্তি; জ্ঞান-জ্ঞানের দ্বারা; নির্ধত-বিধৌত; কল্মষাঃ-কলুষ।

গীতার গান

সেই জ্ঞান অনুকূলে বুদ্ধি নিষ্ঠা যার।
আত্মজ্ঞান পরায়ণ সংসার উদ্ধার ॥

অনুবাদ

যাঁর বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, মন ভগবানের চিন্তায় একাগ্র হয়েছে, নিষ্ঠা ভগবানে দৃঢ় হয়েছে এবং যিনি ভগবানকে তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছে এবং তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরতত্ত্ব। সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা ঘোষণা করছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। তত্ত্ববিদেরা পরতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে জানেন। ভগবান হচ্ছেন পরতত্ত্বের শেষ কথা। তাঁর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। ভগবানও বলছেন, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়-"হে অর্জুন! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউই নয়।" নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্-আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়। সুতরাং, সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরাৎপর তত্ত্ব। যাঁর মন, বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণতেই নিত্য কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ যিনি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞানে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণভক্ত পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তিনি অবিচলিতভাবে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেন।

শ্লোক ১৮

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যা-বিদ্যা; বিনয়-বিনয়; সম্পন্নে-সম্পন্ন; ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে; গবি-গাভীতে; হস্তিনি-হাতিতে; শুনি-কুকুরে; চ-এবং; এব-অবশ্যই; শ্বপাকে-চণ্ডালে; চ-এবং; পণ্ডিতাঃ-পণ্ডিতেরা; সমদর্শিনঃ-সমদর্শী।

গীতার গান

সমদর্শী হয় সে জ্ঞানের প্রভাবে।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে বা গবে ॥
হস্তী বা কুকুর বা সে নীচ বা চণ্ডাল।
সমদর্শী জ্ঞানী দেখে সবাই সমান ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত কখনই জাতি অথবা কুলের মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন না। সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্রাহ্মণ একজন চণ্ডালের থেকে আলাদা হতে পারে, অথবা একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি জাতিগতভাবে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই দেহজাত ভেদগুলি নিরর্থক। কারণ, সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি দেখেন, সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আংশিক প্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। পরতত্ত্বের এই উপলব্ধি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ভগবান সকলকেই সমানভাবে কৃপা করেন, কারণ তিনি প্রতিটি জীবকেই তাঁর সখা বলে মনে করেন এবং জীবের অবস্থা নির্বিশেষে পরমাত্মা রূপে সর্বদাই তার সঙ্গে বিরাজ করেন। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণের দেহ ভিন্ন হলেও ভগবান তাদের উভয়ের সঙ্গেই পরমাত্মা রূপে বিরাজমান। জড়া প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রভাবে জড় দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেহমধ্যস্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই চিন্ময় গুণসম্পন্ন। গুণগতভাবে এক হলেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার আয়তন ভিন্ন, কারণ জীবাত্মা কেবল একটি দেহে থাকতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যেক দেহে বিরাজ করেন। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণভক্ত এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অবগত। তাই, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্য হচ্ছে যে, উভয়েই সচ্চিদানন্দময়; আর তাদের বৈসাদৃশ্য হচ্ছে যে, জীবাত্মা অণুচৈতন্য আর পরমাত্মা সর্বদেহে বিরাজমান বিভুচৈতন্য।

শ্লোক ১৯

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ইহ-এই জীবনে; এব-অবশ্যই; তৈঃ-তাঁদের দ্বারা; জিতঃ-বিজিত; সর্গঃ-জন্ম ও মৃত্যু; যেযাম্-যাঁদের; সাম্যে-সমভাবে; স্থিতম্-স্থিত; মনঃ-মন; নির্দোষম্-নির্দোষ; হি অবশ্যই; সমম্-সমভাব; ব্রহ্ম-ব্রহ্ম; তস্মাৎ-সেই হেতু; ব্রহ্মণি-ব্রহ্মো; তে-তারা; স্থিতাঃ-অবস্থিত।

গীতার গান

জীবন্মুক্ত সেই জ্ঞানী সাধারণ নয় ।
সেই সাম্যস্থিত মনে সংসার যে ক্ষয় ॥
সমতা নির্দেশ ব্রহ্ম তাহে ব্রহ্মস্থিতি।'
ব্রহ্মজ্ঞানী যেই তার সেই হয় রীতি ॥

অনুবাদ

যাঁদের মন সাম্যে অবস্থিত হয়েছে, তাঁরা ইহলোকেই জন্ম ও মৃত্যুর সংসার জয় করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মের মতো নির্দোষ, তাই তাঁরা ব্রহ্মোই অবস্থিত হয়ে আছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে মনের সাম্যস্থিতির কথা বলা হয়েছে, তা আত্ম-উপলব্ধির লক্ষণ। যাঁরা এই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা জড় বন্ধন, বিশেষ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। যতক্ষণ জীব তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, ততক্ষণ সে

জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির ফলে যখন সে সব কিছুর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তখন সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, তখন আর তাকে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, দেহত্যাগ করার পর সে ভগবৎ-ধামে প্রবিষ্ট হয়। রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হবার ফলে ভগবান সম্পূর্ণ নির্দোষ। তেমনই, জীবও যখন রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সেও নির্দোষ হয় এবং ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করে। এই ধরনের লোকেরা জীবন্মুক্ত। তাদের লক্ষণ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

ন-না; প্রহৃষ্যেৎ-হর্ষে উৎফুল্ল হন; প্রিয়ম্-প্রিয় বস্তু; প্রাপ্য-লাভ করে; ন-না; উদ্বিজেৎ-বিচলিত হন; প্রাপ্য-লাভ করে; চ-ও; অপ্রিয়ম্-অপ্রিয় বস্তু; স্থিরবুদ্ধিঃ-স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন; অসংমূঢ়ঃ-মোহশূন্য; ব্রহ্মবিৎ-ব্রহ্মজ্ঞানী; ব্রহ্মণি-ব্রহ্মে; স্থিতঃ-অবস্থিত।

গীতার গান

প্রিয় বস্তু প্রাপ্য হলে উঠে না নাচিয়া।
অপ্রিয় প্রাপ্তিতে কভু মরে না কাঁদিয়া ॥
স্থির বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ অসংমূঢ় মতি ।
ব্রহ্মেতে নিয়ত বাস নাম ব্রহ্মস্থিতি ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বিচলিত হন না, যিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ও ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর দেহটিকে তাঁর যথার্থ স্বরূপ বলে ভুল করেন না। তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অণুসদৃশ অংশ। সেই কারণে, দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি জড়-জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতিতে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না। মনের এই দৃঢ়তাকে বলা হয় স্থিরবুদ্ধি। তাই, কখনই তিনি তাঁর জড় দেহটিকে আত্মা বলে ভুল করেন না, অথবা দেহটিকে নিত্য বলে মনে করে আত্মার অবহেলা করেন না। এই জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন; অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে জানতে পারেন। তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তাই তিনি ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হয়ে যাবার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করেন না। এই হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা আত্ম-উপলব্ধি। এই স্থিরমতি ভাবনার স্তরকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনা।

শ্লোক ২১

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ৷ ২১ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ-বিষয়সুখে; অসক্তাত্মা-অনাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি; বিন্দতি-অনুভব করেন; আত্মনি-আত্মায়; যৎ-যা, সুখম্-সুখ; সঃ-তিনি; ব্রহ্ম-ব্রহ্মে; যোগযুক্তাত্মা-যোগযুক্ত হয়ে; সুখম্-সুখ; অক্ষয়ম্-অন্তহীন; অশ্নুতে-ভোগ করেন।

গীতার গান

বাহ্যস্পর্শ সুখ যাহা নাই যে আসক্তি।
আত্মানন্দে সেবানন্দী আত্মাতে বিন্দতি ॥
সেই ব্রহ্মযোগ যুক্ত আত্মা পায়।
অক্ষয় সুখেতে মগ্ন সর্বদা সে রয় ॥

অনুবাদ

সেই প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোন রকম জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তিনি চিন্ময় সুখ লাভ করেন। ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মহাভাগবত শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন-

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের সেবায় রত হয়ে নব নব রস আস্বাদন করছি, তখন থেকে নারীসঙ্গমের কথা মনে হলে সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুতু ফেলি এবং ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃত হয়।" ব্রহ্মযোগী বা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত ভগবানের প্রেমময় সেবায় এতই তন্ময় থাকেন যে, তখন আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার বাসনার প্রতি তাঁর লেশমাত্র রুচি থাকে না। জড় জগতে স্ত্রীসঙ্গ করাটাই হচ্ছে পরম সুখ। সমগ্র বিশ্ব এরই মোহে চালিত হচ্ছে। দেহসর্বস্ব বিষয়ী লোকেরা কিন্তু এর অনুপ্রেরণা ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত ভক্ত কামসুখ পরিহার করেও দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধির পরীক্ষা। পরমার্থ উপলব্ধি ও কাম উপভোগ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। জীবন্মুক্ত কৃষ্ণভক্ত কোন রকম ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ২২

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

যে-যে সমস্ত; হি-অবশ্যই; সংস্পর্শজাঃ-জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত; ভোগাঃ -ভোগসমূহ; দুঃখ-দুঃখ; যোনয়ঃ-কারণ; এব-অবশ্যই; তে-সেই সমস্ত; আদি-আদি; অন্তবন্তঃ-অন্তবিশিষ্ট; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; ন না; তেষু-তাতে; রমতে-প্রীতি লাভ করেন; বুধঃ-বিবেকী ব্যক্তি।

গীতার গান

স্পর্শ সুখে যে আনন্দ তাহা দুঃখময়।
ভোগ নহে ভোগী সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই সুখে আদি অন্তে শুধু দুঃখ হয় ।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেই না তাতে রময় ।

অনুবাদ

বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়! এই ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট। তাই, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতির উদয় হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলি অনিত্য, কারণ দেহটিই অনিত্য। জীবন্মুক্ত পুরুষ কখনও অনিত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন না। অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ পাবার পরে, কিভাবে তিনি অনিত্য জড় সুখভোগের প্রয়াসী হতে পারেন? পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে-

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

"যোগীরা পরমতত্ত্বে রমণ করে অনন্ত চিদানন্দ আস্বাদন করেন। তাই, সেই পরম-ব্রহ্মকে রাম বলা হয়।"
শ্রীমদ্ভাগবতেও (৫/৫/১) বলা হয়েছে-

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানহতে বিড়ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধোদ্যস্মাদ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

"হে পুত্রগণ! মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই। বিষ্ঠাহারী শূকরেরা এই সুখ লাভ করে থাকে। বরং, এই জীবনে তোমাদের তপশ্চর্যার অনুশীলন করা উচিত, যার প্রভাবে তোমরা শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে এবং তার ফলে অনন্ত চিন্ময় আনন্দ লাভ করবে।"
তাই, যথার্থ যোগী ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না, যা হচ্ছে অপ্রতিহত ভবরোগের কারণ। জীবের ভোগাসক্তি যত বেশি হয়, ততই সে জাগতিক ক্লেশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ২৩

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

শক্নোতি-সক্ষম; ইহ এব-এই শরীরে; যঃ-যিনি; সোঢুম্-সহ্য করতে; প্রাক্-পূর্বে; শরীর শরীর; বিমোক্ষণাৎ-ত্যাগ করার; কাম-কাম; ক্রোধ-ক্রোধ; উদ্ভবম্-উদ্ভূত; বেগম্-বেগ; সঃ-তিনি; যুক্তঃ-আত্ম-সমাহিত; সঃ-তিনি; সুখী-সুখী; নরঃ-মানুষ।

গীতার গান

শরীর ছাড়িতে পূর্বে যে অভ্যাস করে।
তাহার সুলভ সেই অন্যে কাঁদি মরে ॥

ষড়বেগ জয় করি গোস্বামী যে হয়।
সুখী সেই নরনারী করে দিগ্বিজয় ॥
অনুবাদ
এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যিনি কাম, ক্রোধ থেকে উদ্ভুত বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।
তাৎপর্য
যদি কেউ আত্ম-উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হন, তবে তাঁকে জড় ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করবার চেষ্টা করতেই হবে। এই বেগ ছয় প্রকারের-বাচোবেগ, ক্রোধবেগ, মনোবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ ও জিহ্বাবেগ। যিনি ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত বেগ ও মনকে বশ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী অথবা স্বামী। এই গোস্বামীরা কঠোর সংযমের সঙ্গে তাঁদের জীবন যাপন করেন এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বেগগুলিকে সর্বতোভাবে দমন করেন। জড় বাসনা যখন অতৃপ্ত থেকে যায়, তখন ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে মন, চক্ষু ও বক্ষ উত্তেজিত হয়। তাই, এই জড় দেহটিকে ত্যাগ করার আগেই এই বেগগুলি দমন করার অভ্যাস করতে হয়। যিনি তা পারেন, তিনি হচ্ছেন আত্ম-তত্ত্ববিদ এবং আত্ম-উপলব্ধির স্তরে তিনি পরম সুখী।যোগীদের কর্তব্য হচ্ছে কাম ও ক্রোধকে বশ করার প্রাণপণ চেষ্টা করা।

শ্লোক ২৪

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
যঃ-যিনি; অন্তঃসুখঃ-অন্তরে সুখী; অন্তরারামঃ-আত্মাতেই ক্রীড়াশীল; তথা-এবং; অন্তর্জোতিঃ-অন্তবর্তী আত্মাই যাঁর লক্ষ্য; এব-নিশ্চিতরূপে; যঃ-যিনি; সঃ-তিনি; যোগী-যোগী; ব্রহ্মনির্বাণম্ ব্রহ্মনির্বাণ; ব্রহ্মভূতঃ-ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে; অধিগচ্ছতি-লাভ করেন।
গীতার গান
বাহিরের সুখ ছাড়ি যেবা অন্তর্মুখ ।
অন্তরে রমণ করে অন্তর্জ্যোতি রূপ ॥
ব্রহ্মভূত হয় সেই ব্রহ্মতে নির্বাণ।
বহিরঙ্গা মায়া ছাড়ে পায় ভগবান ॥
অনুবাদ
যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত এবং আত্মাই যাঁর লক্ষ্য, তিনিই যোগী। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।
তাৎপর্য
আত্মায় যে সুখ আস্বাদন করেনি, সে অনিত্য সুখভোগের বাহ্য ক্রিয়াগুলি কিভাবে পরিত্যাগ করবে? জীবন্মুক্ত পুরুষ যথার্থ অনুভূতিতে সুখ আস্বাদন করেন। তাই, তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে চিন্ময় চেতনার সাহায্যে জীবনের ক্রিয়াগুলিকে উপভোগ করতে পারেন। এই ধরনের মুক্ত পুরুষ কখনই বাহ্য জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই অবস্থাকে ব্রহ্মভূত বলে, তখন ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া সুনিশ্চিত হয়।

শ্লোক ২৫

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

লভন্তে-লাভ করেন; ব্রহ্মনির্বাণম্ ব্রহ্মনির্বাণ; ঋষয়ঃ-ঋষিগণ; ক্ষীণকল্মষাঃ-নিষ্পাপ; ছিন্ন-ছিন্ন করে; দ্বৈধাঃ-দ্বিধা; যতাত্মানঃ-সংযতচিত্ত; সর্বভূত-সমস্ত জীবের; হিতে-কল্যাণে; রতাঃ-রত।

গীতার গান

নিষ্পাপ হইয়া ঋষি ব্রহ্মেতে নির্বাণ।
সর্বভূত হিতে রত ছিন্ন দ্বিধাজ্ঞান ॥

অনুবাদ

সংযতচিত্ত, সমস্ত জীবের কল্যাণে রত এবং সংশয় রহিত নিষ্পাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই কেবল পারেন সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধন করতে। মানুষ যখন বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ, তখন সেভাবেই ভাবিত হয়ে তিনি যে কর্ম করেন, সেই কর্ম সকলেরই মঙ্গল সাধন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর, পরম বন্ধু, সেই কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ নানাভাবে কষ্ট পায়। তাই, সমস্ত মানব-সমাজে এই চেতনাকে পুনর্জাগরিত করাই হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণকর কর্ম। ব্রহ্মনির্বাণ স্তর লাভ না করলে, এই পরম পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা যায় না। কৃষ্ণভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের পরম ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। তাঁর মনে কোন সংশয় থাকে না, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত। এটিই হচ্ছে দিব্য ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ।

যে মানুষ কেবলমাত্র মানব-সমাজের জাগতিক কল্যাণ সাধন করার কাজে রত, সে প্রকৃতপক্ষে কারওই কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বাহ্যিক দেহ ও মনের সাময়িক উপশম কখনই শান্তি দিতে পারে না। জীবন-সংগ্রামের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের যথার্থ কারণ হচ্ছে, ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের চরম বিস্মৃতি। মানুষ যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে যথার্থই মুক্তি লাভ করেন, এমন কি জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও তিনি তখন মুক্ত।

শ্লোক ২৬

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

কাম-কাম; ক্রোধ-ক্রোধ; বিমুক্তানাম্-মুক্ত; যতীনাম্-সন্ন্যাসীদের; যতচেতসাম্-সংযতচিত্ত; অভিতঃ-সর্বতোভাবে অচিরেই; ব্রহ্মনির্বাণম্-ব্রহ্মনির্বাণ; বর্ততে-উপস্থিত হয়; বিদিতাত্মনাম্-আত্মজ্ঞ।

গীতার গান

কাম ক্রোধ বিনির্মুক্ত যত চিত্ত ধীর।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী যতি অতীব গম্ভীর ॥
সদসদ বিচার করি ব্রহ্মেতে নির্বাণ ।
প্রকৃতি অতীত তার ব্রহ্মে অবস্থান ॥

অনুবাদ

কাম-ক্রোধশূন্য, সংযতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীরা সর্বতোভাবে অচিরেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

মুক্তি লাভের জন্য যে সমস্ত সাধুসন্ত সতত পরমার্থ সাধনে রত, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণভক্তই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। ভাগবতে (৪/২২/৩৯) এই কথার সমর্থনে বলা হয়েছে-

যৎপাদপঙ্কজ পলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্দপ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োহপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

"কেবল ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেবের ভজনা কর। যাঁরা সকাম কর্মের বদ্ধমূল বাসনা উৎপাটিত করে অপ্রাকৃত আনন্দের সঙ্গে ভগবানের পাদপদ্মের সেবায় রত আছেন, তাঁদের মতো সুষ্ঠুভাবে কোনও মহান মুনি-ঋষিরাও ইন্দ্রিয়বেগ দমন করতে পারেন না।" বদ্ধ জীবের কর্মফল ভোগ করার বাসনা এত প্রবল যে, বড় বড় মুনি-ঋষিরা বহু তপস্যার ফলেও সেই বাসনাকে দমন করতে পারেন না। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবান কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে, আত্ম-উপলব্ধি করে অতি শীঘ্রই ব্রহ্মনির্বাণ স্তর লাভ করেন। পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে তিনি সর্বদাই সমাধিস্থ থাকেন। এর উপমামূলক উদাহরণ দিয়ে বলা যায়-

দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্মবিহঙ্গমাঃ।
স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ ॥

"দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শের দ্বারাই কেবল মাছ, কুর্ম ও পাখিরা তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। হে পদ্মজ (ব্রহ্মা)। আমিও তাই করি।"
মাছেরা কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। কুর্ম ধ্যান করে তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। সে ডাঙ্গায় ডিম পেড়ে তারপর জলের মধ্যে তাদের ধ্যান করতে থাকে। তেমনই, কৃষ্ণভক্ত ভগবৎ-ধাম থেকে অনেক দূরে থাকলেও সর্বক্ষণ ভগবানের ধ্যান করার ফলে এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় তৎপর থাকার ফলে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হন। তিনি জড় জগতের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার। ভগবৎ-উপলব্ধির এই স্তরকে বলা হয় ব্রহ্মনির্বাণ, যার অর্থ হচ্ছে ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন থাকার ফলে প্রাকৃত দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ নিবৃত্তি।

শ্লোক ২৭-২৮

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

স্পর্শান্ শব্দ আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়; কৃত্বা-করে; বহিঃ বহিষ্কৃত; বাহ্যান্-বাহ্য; চক্ষু-চক্ষু; চ-ও; এব-নিশ্চিতভাবে; অন্তরে-মধ্যে; ভ্রুবোঃ-ভ্রূদ্বয়ের; প্রাণাপানৌ-প্রাণ ও অপান বায়ু; সমৌ-সমান; কৃত্বা-করে; নাসাভ্যন্তর-নাসিকার মধ্যে; চারিণৌ-বিচরণশীল; যত-সংযত; ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়; মনঃ-মন; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; মুনিঃ-মুনি; মোক্ষ-মুক্তি; পরায়ণঃ-পরায়ণ; বিগত-বর্জিত; ইচ্ছা-ইচ্ছা; ভয়-ভয়; ক্রোধঃ-ক্রোধ; যঃ-যিনি; সদা-সর্বদা; মুক্তঃ-মুক্ত; এব-অবশ্যই; সঃ-তিনি।

গীতার গান

এ ছাড়া অষ্টাঙ্গ যোগ তাহা বলি শুন।
অভ্যাস যাহার হয় অতীব ত্রিগুণ ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর যাহা গন্ধ।
বহির্বাহ্য করি রাখি না রাখি সম্বন্ধ ॥
চক্ষু সেই ভ্রমধ্যে রাখিয়া নিশ্চল।
প্রাণাপান বায়ু ধরি নাসা অভ্যন্তর ॥
নাসিকার অগ্রভাগ কেবল দর্শন।
উত্তম প্রক্রিয়া সেই যোগের সাধন ॥
ইন্দ্রিয় সংযম সেই যোগ প্রকরণ।
মন বুদ্ধি দ্বারা মুনি মোক্ষ পরায়ণ ॥
সে ভাবে যে বীত ইচ্ছা ভয় আর ক্রোধ।
মুক্ত হয় সে পুরুষ সংযত নিরোধ ॥

অনুবাদ

মন থেকে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রত্যাহার করে, ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে, 'ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযম করে এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে মুক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হলে অচিরেই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে কৃষ্ণভক্ত অপ্রাকৃত স্থিতি লাভ করে তাঁর কর্মের গণ্ডিতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই বিশেষ অবস্থাকে ব্রহ্মনির্বাণ বলা হয়।
ব্রহ্মনির্বাণ সম্বন্ধে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করার পর ভগবান অর্জুনকে অষ্টাঙ্গযোগ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অভ্যাস করার মাধ্যমে কিভাবে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে, এখানে কেবল তার অবতারণা করা হচ্ছে। যোগের প্রত্যাহার পদ্ধতির মাধ্যমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-এই ইন্দ্রিয়জ বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করে, দুই ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে নাসিকাগ্রে একাগ্র করতে হয়। এখানে সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ তা হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্পূর্ণভাবে চোখ খুলে রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে, কারণ তা হলে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার ভয় থাকে। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপান বায়ুকে রোধ করার ফলে নাসিকার অভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই অভ্যাস করার ফলে ইন্দ্রিয়-বিষয় পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়বেগ দমন করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে সাধক ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

এই যোগপদ্ধতি সব রকম ভয়, ক্রোধ আদি থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে এবং এভাবেই অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বময় অবস্থায় পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তবে, কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে যোগসাধন করার সবচেয়ে সহজ ও সাবলীল পন্থা। পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অন্য কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে না। সুতরাং, ইন্দ্রিয়-সংযম করার জন্য অষ্টাঙ্গ-যোগের চেয়ে ভক্তিযোগ অধিক উত্তম।

শ্লোক ২৯

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ভোক্তারম্-ভোক্তা; যজ্ঞ-যজ্ঞ; তপসাম্-তপস্যার; সর্বলোক সর্বলোকের; মহেশ্বরম্-পরম ঈশ্বর; সুহৃদম্-সুহৃদ; সর্ব-সমস্ত; ভূতানাম্-জীবের; জ্ঞাত্বা-এভাবে জেনে; মাম্-আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); শান্তিম্-জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি; ঋচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

যোগেশ্বর আমি হই আমি সেই লক্ষ্য।
সে কথা যে বুঝে ভাল সেই যোগী দক্ষ ॥
সকল যজ্ঞ তপস্যার আমি ভোক্তা হই ।
সমস্ত লোকের স্বামী কেহ নহে সেই ॥
সমস্ত জীবের বন্ধু আমি একমাত্র।
জগতের শান্তি হয় জানিলে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে শান্তির অন্বেষণ করে, কিন্তু ভগবদ্গীতার এই অংশে বর্ণিত শান্তি লাভের যথার্থ পন্থার কথা তারা জানে না। শান্তি লাভের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নীতি হচ্ছে-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কর্মের ভোক্তা, এটি উপলব্ধি করা। তাই, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করা, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গ্রহলোকের এমন কি দেবতাদের অধীশ্বর। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। শিব, ব্রহ্মা আদি শ্রেষ্ঠ দেবতারাও তাঁর অনুগত ভৃত্য। বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৭) ভগবানকে বলা হয়েছে-তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব সব কিছুর উপর আধিপত্য করার প্রয়াসী হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের মায়ার অধীন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াধীশ, কিন্তু জীব জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। এই সরল সত্যটিকে উপলব্ধি করতে না পারলে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে, কোনমতেই এই সংসারে শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণভাবনার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং আর সমস্ত জীব, এমন কি বড় বড় দেবতারাও হচ্ছেন তাঁর অনুগত ভৃত্য। এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলেই পূর্ণ শান্তি লাভ করা যায়।

ভগবদ্গীতার এই পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তির ব্যবহারিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাকে সাধারণত কর্মযোগ বলা হয়। কর্মযোগ কিভাবে মুক্তি প্রদান করতে পারে-মনোধর্ম-প্রসূত এই যে প্রশ্ন, তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। কর্মযোগের অর্থ হচ্ছে, পূর্ণজ্ঞানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর সেবায় কর্ম করা। এই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অভিন্ন। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ, আর জ্ঞানযোগ হচ্ছে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হওয়ার একটি পন্থাবিশেষ। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে পরম-তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর সেবায় কর্ম করা এবং এই ভাবনার পূর্ণতা আসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে। শুদ্ধ আত্মা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁর নিত্যদাস। মায়াকে ভোগ করবার বাসনার ফলে সে মায়ার সংসর্গে আসে এবং সেটিই তার নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগের কারণ। যতক্ষণ সে জড়ের সংসর্গে থাকে, ততক্ষণ সে জাগতিক আবশ্যকতা অনুযায়ী কর্ম করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির গণ্ডির মধ্যে থাকলেও তা মানুষকে পারমার্থিক জীবন দান করে, কারণ জড় জগতে ভক্তির অভ্যাস করলে জীবের চিন্ময় স্বরূপ পুনর্জাগরিত হয়। ভক্তিমার্গে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের অনুপাতে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। ভগবান কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। সব কিছু নির্ভর করে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও কাম-ক্রোধ দমন করবার জন্য কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ব্যবহারিক কর্তব্য পালন করার উপর। এই সমস্ত বিকারগুলি নিগ্রহ করে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করলে বাস্তবিকপক্ষে অপ্রাকৃত স্তর অথবা ব্রহ্মানির্বাণ লাভ করা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগের পরম লক্ষ্য হচ্ছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃতে অষ্টাঙ্গযোগ আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতি হয়। কিন্তু ভক্তিযোগের প্রারম্ভেই এই সব কয়টিতে সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। তাই, একমাত্র ভক্তিযোগই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে-ভক্তিযোগেই জীবনের পরম প্রাপ্তি।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম বিষয়ক 'কর্মসন্ন্যাস-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায় - ধ্যানযোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অনাশ্রিতঃ-আশ্রয় বা অপেক্ষা না করে; কর্মফলম্-কর্মফলের; কার্যম্ কর্তব্য; কর্ম-কর্ম; করোতি-অনুষ্ঠান করেন; যঃ-যিনি; সঃ-তিনি; সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী; চ-ও; যোগী-যোগী; চ-ও; ন-না; নিরগ্নিঃ-অগ্নি রহিত; ন-না; চ-ও; অক্রিয়ঃ-নিষ্ক্রিয়।

গীতার গান

ভগবান কহিলেনঃ

অনাশ্রিত কর্মফল সেই মুখ্য হয়।
তাহা বিনা সন্ন্যাসী কি যোগী কিছু নয় ॥
কর্মত্যাগ নহে মুখ্য কর্মফল ত্যাগ।
দৈহিক চেষ্টা সে ত্যাগ নহে ত সম্যক ॥
তাই সে সন্ন্যাসী যোগী সমান যে ক্রম।
কর্মফল ত্যাগ বিনা দুই সেই ভ্রম ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন এবং দৈহিক চেষ্টাশূন্য তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তাঁর কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, অষ্টাঙ্গযোগ হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার একটি পন্থাবিশেষ। তবে এই যোগ সকলের পক্ষে অনুশীলন করা কষ্টকর, বিশেষ করে এই কলিযুগে তা অনুশীলন করা এক রকম অসম্ভব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে অষ্টাঙ্গ-যোগের পদ্ধতি বর্ণনা করে অবশেষে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম বা কর্মযোগ অষ্টাঙ্গযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জগতের সকলেই তার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য কর্ম করে। ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা ভোগবাঞ্ছা ব্যতীত কেউই কোন কর্ম করে না। কিন্তু সাফল্যের মানদণ্ড হচ্ছে কর্মফলের প্রত্যাশা না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য কর্ম করা। প্রতিটি জীবই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কর্তব্য। শরীরের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ শরীরের পালন-পোষণের জন্য কর্ম করে, তাদের আংশিক স্বার্থের জন্য নয়। তেমনই, যে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে পরব্রহ্মের তৃপ্তির জন্য কর্ম করেন, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী।

ভ্রান্তিবশত, কিছু সন্ন্যাসী মনে করে যে, তারা সব রকম জাগতিক কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তাই তারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা ত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা স্বার্থপরায়ণ, কারণ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভকরা। এই সমস্ত বাসনা জাগতিক কামনা থেকে মহত্তর হলেও তা স্বার্থশূন্য নয়। ঠিক তেমনই, সব রকমের জাগতিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে, অর্ধনিমীলিত নেত্রে যোগী যে তপস্যা করে চলেছেন, তাও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত। তিনিও তাঁর আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্তই হচ্ছেন একমাত্র যোগী, যিনি পরমেশ্বরের তৃপ্তিসাধন করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করেন। তাই, তাতে একটুও স্বার্থসিদ্ধির বাসনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করাটাই তাঁর সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি, তাই, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, যথার্থ সন্ন্যাসী। বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন-

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে জগদীশ্বর! আমি ধন কামনা করি না, আমি অনুগামী কামনা করি না এবং আমি সুন্দরী স্ত্রী কামনা করি না। আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।"

শ্লোক ২

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২॥

যম্-যাকে; সন্ন্যাসম্-সন্ন্যাস; ইতি-এভাবে; প্রাহুঃ-বলা হয়; যোগম্ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে; তম্-তাকে; বিদ্ধি-জানবে; পাণ্ডব-হে পাণ্ডুপুত্র; ন-না; হি-অবশ্যই; অসংন্যস্ত-ত্যাগ না করে; সংকল্পঃ -সংকল্প; যোগী-যোগী; ভবতি হন; কশ্চন-কেউ।

গীতার গান

অসংন্যস্ত সংকল্প বিনা নহে যোগী।
বাহ্যে মাত্র ক্রিয়াহীন অন্তরে সে ভোগী ॥

অনুবাদ

হে পাণ্ডব! যাকে সন্ন্যাস বলা যায়, তাকেই যোগ বলা যায়, কারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ না করলে কখনই যোগী হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

যথার্থ 'সন্ন্যাস-যোগ' অথবা 'ভক্তিযোগের' তাৎপর্য হচ্ছে জীবাত্মারূপে স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই অনুসারে কর্ম করা। জীবাত্মার কোন পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। যখন সে জড়া শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন সে বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যখন সে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভকরে, অর্থাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। তাই, জীব যখন ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে বিরত হয়, অথবা সব রকম ইন্দ্রিয় উপভোগের কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়-দমন করে যোগীরা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত তাঁর সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন, তাই তাঁর অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আর আসক্তি থাকে না। সুতরাং, কৃষ্ণভক্ত একাধারে যোগী ও সন্ন্যাসী। জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বিষয়ক যোগের প্রয়োজন কৃষ্ণভাবনায় আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে না পারলে জ্ঞান অথবা যোগ সাধন করার কোন অর্থ হয় না। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে, সব রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে ব্রতী হওয়া। যিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি তাঁর আর কোন স্পৃহা থাকে না। তিনি সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করবার চেষ্টায় মগ্ন। যারা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেনি, তাদের পক্ষে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, কারণ নিষ্ক্রিয় স্তরে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে সব কয়টি প্রয়োজনই যথার্থভাবে সাধিত হয়।

শ্লোক ৩

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

আরুরুক্ষোঃ-আরোহণ করতে ইচ্ছুক; মুনেঃ-মুনির; যোগম্-অষ্টাঙ্গযোগ; কর্ম-কর্ম; কারণম্-কারণ; উচ্যতে বলা হয়; যোগ-অষ্টাঙ্গযোগ; আরূঢ়স্য-আরূঢ় হয়েছেন; তস্য-তাঁর; এব-অবশ্যই; শমঃ-সমস্ত কর্মের নিবৃত্তি; কারণম্ কারণ; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

সব যোগ হয় সিদ্ধ কর্ম সে কারণ।
আরুরুক্ষ মুনি সেই শুন বিবরণ ॥
যোগেতে আরূঢ় সেই শমতা কারণ ।
সাধকের ক্রম পন্থা যোগানুসরণ ॥

অনুবাদ

অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যাঁরা ইতিমধ্যেই যোগারূঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন।

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে বলা হয় যোগ। এই যোগকে একটি সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করা যায়। জীবনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে এই সিঁড়ির শুরু এবং ক্রমান্বয়ে তা অধ্যাত্মমার্গের চরম স্তরে উপনীত হয়েছে। উচ্চতার ক্রম অনুসারে এই সিঁড়ির বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সিঁড়িটিকে বলা হয় যোগ এবং সেটি তিন ভাগে বিভক্ত-জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই সিঁড়ির প্রথম ও সর্বোচ্চ সোপানকে যথাক্রমে যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ় স্তর বলা হয়।

অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রাথমিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মাধ্যমে আসন অভ্যাস করে ধ্যান করার প্রচেষ্টাকে সকাম কর্ম বলে গণ্য করা হয়। এই সমস্ত ক্রিয়ার প্রভাবে ক্রমশ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ণ মানসিক সমতা লাভ হয়। ধ্যানাভ্যাসে সিদ্ধি লাভ হলে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সব রকম মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায়। কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত শুরু থেকেই ধ্যানের স্তরে অবস্থিত, কারণ তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় রত, তাই তিনি সব রকম জাগতিক কর্মগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ৪

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেযু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যদা-যখন; হি-অবশ্যই; ন-না; ইন্দ্রিয়ার্থেযু-ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে; ন-না; কর্মসু-সকাম কর্মে; অনুষজ্জতে-আসক্ত হন; সর্বসংকল্প-সমস্ত জড় বাসনা; সন্ন্যাসী-ত্যাগী; যোগারূঢ়ঃ-

যোগারূঢ়; তদা-তখন; উচ্যতে বলা হয়।

গীতার গান

ইন্দ্রিয়ার্থ যদা কর্ম আচরিত নয়।
সর্ব সংকল্পশূন্য সন্ন্যাসী সে হয় ॥
যোগারূঢ় সে অবস্থা শাস্ত্রের নির্ণয়।
সে অবস্থা মুক্ত পথ করহ আশ্রয় ।

অনুবাদ

যখন যোগী জড় সুখভোগের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি রহিত হন, তখন তাঁকেই যোগারূঢ় বলা হয়।

তাৎপর্য

মানুষ যখন ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন সে সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা সকাম কর্ম করার কোন প্রবৃত্তি তার থাকে না। আর তা না হলে, সে অবশ্যই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হবে, কারণ কর্মরহিত হয়ে মানুষ কখনও থাকতে পারে না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম না করা হলে, আত্মকেন্দ্রিক অথবা সমষ্টির স্বার্থে কর্ম করার বাসনা দেখা দেবে। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সব কিছুই করেন, তাই তিনি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, যার এই উপলব্ধি হয়নি, তাকে যোগমার্গরূপ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যন্ত্রবৎ প্রযত্ন করতে হবে।

শ্লোক ৫

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

উদ্ধরেৎ-উদ্ধার করা কর্তব্য; আত্মনা-মনের দ্বারা; আত্মানম্-জীবাত্মাকে; ন-না; আত্মানম্-আত্মাকে; অবসাদয়েৎ-অধঃপতিত করা; আত্মা-মন; এব-অবশ্যই; হি-বাস্তবিকই; আত্মনঃ-জীবাত্মার; বন্ধুঃ-বন্ধু; আত্মা-মন; এব-অবশ্যই; রিপুঃ-শত্রু; আত্মনঃ-জীবাত্মার।

গীতার গান

অনাসক্ত বিষয়েতে যথা কর্ম দৃঢ়।
সংসার সে কূপ হতে নিজ আত্মা কাড় ॥
আত্মাকে উদ্ধার করা আত্মার উচিত।
আত্মাকে নাহি কভু কর অবসাদ ।।
আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই সে রিপু।
আত্মার শত্রু যে হয় হিরণ্যকশিপু ॥

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। মনই জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অবস্থানুসারে আত্মা বলতে দেহ, মন ও আত্মাকে বোঝায়। যোগপন্থায় বদ্ধ জীবাত্মা ও মনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যেহেতু মনই হচ্ছে, যোগাভ্যাসের কেন্দ্র, তাই এখানে আত্মা বলতে মনকে বোঝানো হয়েছে। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বশ করে ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে তাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখা। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, মনকে এমনভাবে সংযত করতে হবে যাতে তিনি বদ্ধ জীবকে অজ্ঞান-সাগর থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। জড় বন্ধনে আবদ্ধ জীব মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধ আত্মা এই, জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কারণ মন অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাই, মনকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে সে আর মায়ার মিথ্যা চমকের প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং তার ফলে বদ্ধ জীবাত্মার উদ্ধার হয়। ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অধঃপতিত হওয়া উচিত নয়। বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ যত বেশি হবে, ভবরোগের বন্ধনটিও তত দৃঢ় হবে। বন্ধন থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় মনকে সর্বক্ষণ নিযুক্ত করে রাখা। এই কথাটিকে জোর দেওয়ার জন্য হি শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ, এই ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, তাই এই পন্থাকে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥

"মনই মানুষের বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি মনের তন্ময়তা হচ্ছে বন্ধনের কারণ এবং বিষয়ের প্রতি মনের অনাসক্তি হচ্ছে মুক্তির কারণ।" (অমৃতবিন্দু উপনিষদ ২) চরম মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনায় সর্বদা মনকে নিয়োজিত রাখলে

শ্লোক ৬

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

বন্ধুঃ-বন্ধু; আত্মা-মন; আত্মনঃ-জীবের; তস্য-তাঁর; যেন-যার দ্বারা; আত্মা-মন; এব-অবশ্যই; আত্মনা-জীবাত্মা কর্তৃক; জিতঃ-বিজিত; অনাত্মনঃ -যিনি মনকে সংযত করতে অক্ষম; তু-কিন্তু; শত্রুত্বে শত্রুতার জন্য; বর্তেত-থাকেন; আত্মৈব-সেই মন; শত্রুবৎ-শত্রুর মতো।

গীতার গান

যে জন জিনিল নিজ মন আত্মজিত।
সে মন যে বন্ধু তাহা শাস্ত্রেতে কথিত ॥
অজিত যে মন সেই মন নিজ শত্রু।
অপকারী হয় সদা বিরুদ্ধ বিপক্ষ ॥

অনুবাদ

যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন, তাঁর মন তাঁর পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম, তাঁর মনই তাঁর পরম শত্রু।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে সংযত করা, যার ফলে পরমার্থ

সাধনের পথে সে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারে। মনঃসংযম না করে লোকদেখানো যোগাভ্যাস করলে কেবল সময়ের অপচয় হয়। যে মানুষ মনকে বশ করতে অক্ষম, সে সর্বক্ষণ তার পরম শত্রুর সঙ্গে বাস করছে। তার ফলে, তার জীবন ও তার উদ্দেশ্য, দু-ই নষ্ট হয়ে যায়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার প্রভুর আজ্ঞা পালন করা। মন যতক্ষণ অজিত শত্রু হয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদির আজ্ঞা পালন করতে হয়। কিন্তু মন যখন বশীভূত হয়, তখন পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত যে ভগবান তাঁর আদেশ পালনে জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। যোগাভ্যাসের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে, হৃদয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করা। কেউ যখন সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তখন সে আপনা থেকেই ভগবানের আজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হয়।

শ্লোক ৭

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জিতাত্মনঃ-জিতেন্দ্রিয়; প্রশান্তস্য-প্রশান্ত ব্যক্তির; পরমাত্মা-পরমাত্মা; সমাহিতঃ -সমাধিস্থ; শীত-শীত; উষ্ণ-তাপ; সুখ-সুখ; দুঃখেষু-দুঃখ; তথা-ও; মান-সম্মান; অপমানয়োঃ-অপমান।

গীতার গান

প্রশান্ত যে মন সেই সর্বদাই জিত।
আত্মজিত মন পরমাত্মা সমাহিত ॥
গ্রীষ্ম শীত যত দুঃখ মান অপমান।
জিত মন যার তার সকলই সমান ॥

অনুবাদ

জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর কাছে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ এবং সম্মান ও অপমান সবই সমান।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজ করেন যে ভগবান, তাঁর আদেশ পালন করাই হচ্ছে জীবের যথার্থ কর্তব্য। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে মন যখন বিপথে চালিত হয়, তখন জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কোন একটি যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে মন যখন সংযত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়েছেন। ভগবানের আদেশ সকলকেই পালন করতে হয়। মন যখন পরা প্রকৃতিতে নিবিষ্ট হয়, তখন ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পন্থা থাকে না। মনকে অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কারও বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে হয়। মনকে সংযত করার ফলে মন আপনা থেকেই পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত যেহেতু অবিলম্বে এই অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হন, তাই তিনি সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ আদি জড় অস্তিত্বের দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই অবস্থাকে বলা হয় ব্যবহারিক সমাধি অথবা ভগবৎ-তন্ময়তা।

শ্লোক ৮

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোস্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

জ্ঞান-জ্ঞান; বিজ্ঞান-উপলব্ধ জ্ঞান; তৃপ্ত-তৃপ্ত; আত্মা-জীব; কূটস্থঃ-চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; বিজিতেন্দ্রিয়ঃ-জিতেন্দ্রিয়; যুক্তঃ-আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য; ইতি-এভাবে; উচ্যতে বলা হয়; যোগী-যোগী; সম-সমদর্শী; লোষ্ট্র-মৃৎখণ্ড; অশ্ম-পাথর; কাঞ্চনঃ-সোনা।

গীতার গান

নিজ তৃপ্ত সেই মন জ্ঞান বিজ্ঞানেতে।
কূটস্থ বিজিতেন্দ্রিয় নিজের কার্যেতে ॥
সম লোষ্ট্র স্বর্ণ যার যুক্ত হয় যোগী।
সকল অবস্থাতে যে সর্বদাই ত্যাগী ॥

অনুবাদ

যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্ব অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী, তিনি যোগারূঢ় বলে কথিত হন।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্বের অনুভূতি না হলে পুঁথিগত বিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ।

"জড় কলুষিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেউ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে যখন দিব্য চেতনার উন্মেষ হয়, তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ ও লীলার চিন্ময় স্বরূপ তাঁর কাছে অনুভূত হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৩৪)

এই ভগবদ্গীতা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার বিজ্ঞান। কেবল লৌকিক পাণ্ডিত্যের দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্যবান হতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে কৃষ্ণভাবনাময় মহাত্মা ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তিনি শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ফলে মানুষ তাঁর জীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভ করেন। অপ্রাকৃত জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়, কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার ফলে আপাত পরস্পর-বিরোধী উক্তির দ্বারা সহজেই মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণভক্তই হচ্ছেন যথার্থ আত্ম-সংযমী, কারণ তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। তিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদের কাছে লৌকিক বিদ্যা ও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান স্বর্ণবৎ উত্তম বলে প্রতিভাত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কাছে তার মূল্য এক টুকরো মৃৎখণ্ড বা পাথরের থেকে বেশি নয়।

শ্লোক ৯

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

সুহৃৎ-স্বভাবত হিতাকাঙ্ক্ষী; মিত্র-স্নেহবশত হিতকারী; অরি-শত্রু; উদাসীন-বিবাদের মধ্যেও নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ-বিবাদ মিমাংসাকারী; দ্বেষ্য-মৎসর; বন্ধুষু-বন্ধুতে; সাধুষু-সাধুতে; অপি-ও; চ-এবং; পাপেষু-পাপীতে; সমবুদ্ধিঃ-সমবুদ্ধি; বিশিষ্যতে-শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

গীতার গান

সুহৃদ মিত্র নিষ্পক্ষ বন্ধু কিংবা অরি।
সকলের প্রতি যিনি সমবুদ্ধি করি ॥
মধ্যস্থ কিংবা সাধু যে পাপীয়সী হয়।
সকলের প্রতি সাম্য শ্রেষ্ঠতা প্রাপয় ॥

অনুবাদ

যিনি সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, মৎসর, বন্ধু, ধার্মিক ও পাপাচারী-সকলের প্রতি সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

শ্লোক ১০

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী-যোগী; যুঞ্জীত-সমাধিযুক্ত করবেন; সততম্-সর্বদা; আত্মানম্ (দেহ, মন ও আত্মার দ্বারা) নিজেকে; রহসি-নির্জন স্থানে; স্থিতঃ-অবস্থিত হয়ে; একাকী-একলা; যতচিত্তাত্মা-সংযতচিত্ত; নিরাশীঃ-নিস্পৃহ হয়ে; অপরিগ্রহঃ-পরিগ্রহ রহিত হয়ে।

গীতার গান

যে যোগী সতত থাকি একাকী নির্জনে।
নিরাশী অপরিগ্রহ চিত্তের যতনে ॥
সমাধিস্থ হয়ে থাকে অধিক সময় ।
বৈরাগী তাহার মন বশীভূত হয় ।

অনুবাদ

যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্বদা পরব্রহ্মে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর দেহ, মন ও নিজেকে নিয়োজিত করবেন; তিনি একাকী নির্জন স্থানে বসবাস করবেন এবং সর্বদা সতর্কভাবে তাঁর মনকে বশীভূত করবেন। তিনি বাসনামুক্ত ও পরিগ্রহ রহিত হবেন।

তাৎপর্য

স্তরবিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী এবং পরমাত্মার অন্বেষণকারী যোগীরাও আংশিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক প্রকাশ। তাই, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা না করলেও যোগী এবং জ্ঞানীরাও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনাময়। তবে, সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কারণ তিনি পূর্ণরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত। তিনিই পরমতত্ত্বকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও ধ্যানমগ্ন

যোগী পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে পারেননি।
তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে তাঁদের নির্দিষ্ট কার্যকলাপে সর্বদাই নিয়োজিত হবার জন্যে যাতে তাঁরা আগে-পরে সর্বোত্তম সিদ্ধিতে পৌঁছতে পারে। যোগীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মনকে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করা। মুহূর্তের জন্যও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না গিয়ে সর্বক্ষণ তাঁর কথা স্মরণ করা। এভাবেই নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার নাম হচ্ছে সমাধি। মনের এই একাগ্রতা লাভ করার জন্য নির্জনে বসবাস করা উচিত এবং বাহ্য বিষয়রূপী উপদ্রব থেকে দূরে থাকা উচিত। সাধকের সতর্ক থাকা উচিত-ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গ্রহণ করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিত্যাগ করা। দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাঁর অনাবশ্যক ভোগবাসনা পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ তা পরিগ্রহরূপে বন্ধনের সৃষ্টি করে।
এই সমস্ত সাধন ও সতর্কতার পূর্ণ পালন তিনিই করতে পারেন, যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময়; কারণ সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া মানেই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে আত্ম-উৎসর্গ করা। এই ধরনের ত্যাগে পরিগ্রহের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কৃষ্ণভাবনামৃতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন-

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"বিষয়ের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্বন্ধ করে ভগবানের সেবার অনুকূল বিষয়টুকু গ্রহণ করাকেই বলা হয় যুক্তবৈরাগ্য। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা না জেনে যে সব কিছু পরিত্যাগ করে, তার বৈরাগ্য পূর্ণ নয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫-২৫৬)
কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত যথার্থরূপে জানেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। তাই, তিনি কোন কিছুই নিজের বলে দাবি করেন না। নিজে ভোগ করার জন্য তিনি কোন কিছুর লালসা করেন না। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূলে কোন্টি গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্টি পরিত্যাগ করা উচিত। বিষয় ভোগের প্রতি তিনি সর্বদাই উদাসীন, কারণ তিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবদ্ভক্ত ছাড়া আর কারও সঙ্গ করার কোন প্রয়োজন নেই বলে তিনি সর্বদাই একাকী। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছে পরম যোগী।

শ্লোক ১১-১২

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুজ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

শুচৌ-পবিত্র; দেশে-স্থানে; প্রতিষ্ঠাপ্য-স্থাপন করে; স্থিরম্-স্থির; আসনম্-আসন; আত্মনঃ-নিজের; ন-না; অতি-অতি; উজ্জিতম্-উচ্চ; ন-না; অতি-অতি; নীচম্-নীচু, চৈলাজিনকুশোত্তরম্ কুশাসনের উপর মৃগচর্ম, তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে; তত্র-সেই আসনে; একাগ্রম্-একাগ্র; মনঃ-মনকে; কৃত্বা-করে; যতচিত্ত-মনকে সংযত করে; ইন্দ্রিয়-

ইন্দ্রিয়; ক্রিয়ঃ-কার্যকলাপ; উপবিশ্য-উপবেশন করে; আসনে-আসনে; যুজ্যাৎ-অভ্যাস করবেন; যোগম্-যোগ অভ্যাস; আত্ম-অন্তঃকরণ; বিশুদ্ধয়ে-শুদ্ধ করবার জন্য।

গীতার গান

পবিত্র স্থানেতে বসি নিজাসন উপরে।
চেলাজিন বস্ত্র আসনাদি পরোপরে ॥
অতি উচ্চে নাহি বসে অতি নীচে নহে।
স্থির মন হয়ে সেবা যোগাভ্যাসে রহে ॥
একাগ্রতঃ মন করি যত চিত্তেন্দ্রিয়।
যোগাভ্যাস করে মুনি বিশুদ্ধ হৃদয় ॥

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনের উপর মৃগচর্মের আসন, তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করে, সেই আসন পবিত্র স্থানে স্থাপন করে তাতে আসীন হবেন। সেখানে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাস করবেন।

তাৎপর্য

এখানে 'পবিত্র স্থান' বলতে তীর্থস্থানকে বোঝানো হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত যোগী ও ভক্ত গৃহত্যাগ করে প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হৃষীকেশ, হরিদ্বার আদি স্থানে অথবা গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী কোন নির্জন স্থানে বসবাস করে যোগ অনুশীলন করেন। কিন্তু আধুনিক যুগের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এই ধরনের সাধনা করা সম্ভব নয়। আজকাল অনেক বড় বড় শহরে তথাকথিত যোগ অনুশীলনের স্কুল বা যৌগিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি টাকা উপার্জনের একটি ভাল ব্যবসা হতে পারে, কিন্তু যথার্থ যোগ সাধনার জন্য এগুলি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। উদ্বিগ্নচিত্ত, অসংযমী মানুষ কখনই ধ্যান করতে পারে না। তাই, বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, বর্তমান কলিযুগে মানুষ যখন অল্পায়ু, পরমার্থ সাধনে অপটু এবং সর্বদাই নানা রকম উপদ্রবের দ্বারা উৎকণ্ঠিত, তাদের ক্ষেত্রে পরমার্থ সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"বিবাদ ও শঠতায় পরিপূর্ণ এই কলিযুগে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই।"

শ্লোক ১৩-১৪

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ।। ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

সমম্-সরল; কায়শিরঃ শরীর ও মস্তক; গ্রীবম্ গ্রীবা; ধারয়ন্ ধারণ করে; অচলম্-নিশ্চলভাবে; স্থিরঃ-স্থির হয়ে; সংপ্রেক্ষ্য-দৃষ্টি রেখে; নাসিকাগ্রম্-নাসিকার অগ্রভাগে; স্বম্-

স্বীয়; দিশঃ-সমস্ত দিকে; চ-ও; অনবলোকয়ন্‌-অবলোকন না করে; প্রশান্ত-প্রশান্ত; আত্মা-চিত্ত; বিগতভীঃ-নির্ভয়; ব্রহ্মচারিব্রতে-ব্রহ্মচর্য ব্রতে; স্থিতঃ-অবস্থিত; মনঃ-মন; সংযম্য-সম্পূর্ণরূপে সংযত করে; মৎ-আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে); চিত্তঃ-চিত্ত; যুক্তঃ-সমাহিতভাবে; আসীত-অবস্থান করবেন; মৎ-আমাকে; পরঃ-চরম লক্ষ্য।

গীতার গান

দেহ শির গ্রীবা তিন সমান করিয়া।
অচল অবস্থা ধীর ভাবেতে বসিয়া ॥
নাসিকার অগ্রভাগ সতত দেখিয়া।
অন্য যত দৃশ্যবস্তু কিছু না দেখিয়া ॥
প্রশান্তাত্মা ভয় নাই ব্রহ্মচারী ব্রত।
সংযমিত মন যেবা আমাতেই রত ॥

অনুবাদ

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রেখে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে, আমাকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে স্থির করে হৃদয়ে আমার ধ্যানপূর্বক যোগ অভ্যাস করবেন।

তাৎপর্য

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, যিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। যোগসাধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের এই পরমাত্মা রূপকে দর্শন করা। এ ছাড়া যোগের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। জীবের হৃদয়ে বিরাজমান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপী পরমাত্মাকে দর্শন করার অভিপ্রায় না নিয়ে যিনি যোগ অনুশীলন করেন, তিনি কেবল অনর্থক সময়ের অপচয় করেন। জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে তাঁরই অংশ পরমাত্মাকে জানার চেষ্টা করা হয়। জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপী শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করতে হলে পূর্ণ ব্রহ্মাচর্য পালন করতে হয়। তাই, যোগীকে গৃহত্যাগ করে নির্জনে একাকী পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের ধ্যান করতে হয়। ঘরে অথবা বাইরে নিত্য মৈথুন-পরায়ণ হয়ে তথাকথিত যোগশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে তথাকথিত যোগাভ্যাস করলে কখনই যোগী হওয়া যায় না। মনঃসংযম ও সমস্ত রকমের ইন্দ্রিয়তর্পণ, বিশেষ করে যৌন জীবন পরিত্যাগের অভ্যাস করতে হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রচিত ব্রহ্মচর্য-ব্রত সন্দর্ভে বলা হয়েছে-

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষতে ॥

"সব রকম পরিস্থিতিতে সর্বদা সর্বত্র মন, বচন ও-কর্মের দ্বারা পূর্ণরূপে মৈথুন পরিত্যাগ করাকে বলা হয় ব্রহ্মাচর্য।" মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তি কখনই যথার্থ যোগসাধন করতে পারে না। তাই শৈশব থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করার শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ তখন যৌন জীবন সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই থাকে না। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে শিশুকে পাঁচ বছর বয়সে গুরুকুলে প্রেরণ করা হয়, সেখানে গুরুদেব তাকে ব্রহ্মচর্যের দৃঢ় সংযম শিক্ষা দান করেন। এভাবেই সুনিয়ন্ত্রিত না হলে ধ্যান, জ্ঞান অথবা ভক্তি আদি কোন যোগের পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিবাহিত জীবন যাপন করে যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাকে ব্রহ্মাহ্মচারী বলে গণ্য করা হয়। এই ধরনের সংযত গৃহস্থকে ভক্ত সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী অথবা ধ্যানী সম্প্রদায় গৃহস্থ ব্রহ্মাচারীকেও গ্রহণ করে না। তাদের জন্য পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

ভক্তিমার্গে গৃহস্থ ব্রহ্মচারীকেও গ্রহণ করা হয়, কারণ এই যোগ এত বলবতী যে, তার অভ্যাস করে ভগবানের সেবা করার ফলে স্ত্রীসঙ্গ করার সমস্ত বাসনা আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে-

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

পরমার্থ সাধনের পথে আর সকলকে জোর করে ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হলেও পরম-তত্ত্বের সৌন্দর্য দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, ভক্তের আভ্যন্তরীণ বিষয়াসক্তি আপনা থেকেই নিবৃত্ত হয়ে যায়। ভক্ত ছাড়া আর কেউই এই অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ পায় না।

বিগতভীঃ। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে প্রশান্ত না হলে নির্ভীক হওয়া যায় না। বদ্ধ জীব স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে সর্বদাই ভীত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে-ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহ স্মৃতিঃ। কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র অবলম্বন। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই কেবল যথার্থভাবে যোগ অভ্যাস করতে পারেন। আর যেহেতু যোগসাধন করার পরম লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা, তাই নিঃসন্দেহে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী। এখানে যে যোগের কথা বলা হয়েছে, তা আজকাল যে সমস্ত জনপ্রিয় তথাকথিত যোগশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ১৫

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

যুঞ্জন-অভ্যাস করে; এবম্-এই প্রকারে; সদা-সর্বদা; আত্মানম্-দেহ, মন ও আত্মাকে; যোগী-যোগী; নিয়তমানসঃ-সংযতচিত্ত; শান্তিম্ শান্তি; নির্বাণ-পরমাম্-জড় বন্ধনমুক্তি; মৎসংস্থাম্-চিৎ-জগৎ; অধিগচ্ছতি-প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

সেভাবে যে যোগ সাধে নিয়ত মানস।
সদাত্ম সেই যোগী অমৃত পরশ ॥
নির্বাণ পরম শান্তি হয় অধিকারী।
ফিরে যায় মম ধামে যথা লীলাহরি ॥

অনুবাদ

এভাবেই দেহ, মন ও কার্যকলাপ সংযত করার অভ্যাসের ফলে যোগীর জড় বন্ধন মুক্ত হয় এবং তিনি তখন আমার ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলন করার পরম উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জড় জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যোগ-সাধনের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে যোগ-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা অথবা লৌকিক সিদ্ধিলাভ করার জন্য যোগ অভ্যাস যে করে, ভগবদ্গীতায় তাকে যোগী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ভবরোগ নিবৃত্তির অর্থ স্বকপোলকল্পিত শূন্যে বিলীন

হয়ে যাওয়া নয়। ভগবানের সৃষ্টিতে শূন্য বলে কিছুই নেই। বরং, ভবরোগ নিবৃত্তি হলে পরব্যোমে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তি হয়। ভগবদ্গীতায় ভগবৎ-ধামের বিশদ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, সেই বৈকুণ্ঠধামকে আলোকিত করবার জন্য সূর্য, চন্দ্র অথবা তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন হয় না। সেখানে প্রতিটি গ্রহই সূর্যের মতো আপন আলোকে উদ্ভাসিত। ভগবৎ-ধাম সর্বব্যাপক, কিন্তু পরব্যোম এবং সেখানে অবস্থিত গ্রহলোককে পরমং ধাম অথবা উৎকৃষ্ট ধাম বলা হয়।
যে যোগী তাঁর যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তাঁর সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন- মচ্চিত্তঃ, মৎপরঃ, মৎস্থানম্। তিনিই যথার্থ শান্তি লাভ করেন, জীবনান্তে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন নামক তাঁর পরম ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের আলয় গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৭) বলা হয়েছে, গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ-ভগবান যদিও তাঁর স্বধাম গোলোকে বাস করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মা এবং সর্বভূতে পরমাত্মারূপে সর্বত্র বিরাজমান। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর স্বাংশ-প্রকাশ বিষ্ণু সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত না হলে কোন অবস্থাতেই ভগবানের নিত্য আলয় বৈকুণ্ঠলোক অথবা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না। তাই, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যিনি ভগবানের সেবা করছেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী, কারণ তাঁর মন সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন-স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ। বেদেও (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮) বলা হয়েছে, তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি-"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারার ফলেই জন্ম ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।" এর থেকে বোঝা যায় যে, যোগসাধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। ম্যাজিক দেখানো বা শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে লোকঠকানো যোগের উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ১৬

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

ন-না; অতি-অত্যধিক; অশ্নতঃ-ভোজনকারী; তু-কিন্তু; যোগঃ-পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত; অস্তি-হয়; ন-না; চ-ও; একান্তম্-নিতান্ত, অনশ্নতঃ -অনাহারীর; ন-না; চ-ও; অতি-অত্যন্ত; স্বপ্নশীলস্য-নিদ্রাশীলের; জাগ্রতঃ -জাগরণকারীর; ন-না; এব-কখনও; চ-এবং; অর্জুন-হে অর্জুন।

গীতার গান

অতিভোজী অনাহারী যোগে সিদ্ধ নয়।
অতিনিদ্রা অতিজাগী শুন ধনঞ্জয় ॥

অনুবাদ

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় ও নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগী হওয়া সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যোগীদের আহার ও নিদ্রা সংযত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিভোজীর

অর্থ হচ্ছে যে, যারা প্রাণ ধারণের অতিরিক্ত আহার করে। মানুষের জন্য ভগবান যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য-শস্য, ফল-মূল, দুধ আদি দিয়েছেন, তাই পশু ভক্ষণ করা মানুষের কোন মতেই উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় এই প্রকার সাদাসিধে খাদ্যকে সত্ত্বগুণময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মাংস তমোগুণ-সম্পন্ন মানুষের আহার। তাই, যারা মাছ-মাংস আহার করে, মদ পান করে, ধূমপান করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে আহার করে, তারা আহার-দোষের ফলস্বরূপ নিঃসন্দেহে পাপের ফল ভোগ করে। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য রন্ধন করে এবং আহার করে, সে পাপ ভক্ষণ করে। যে এভাবে পাপ আহার করে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে, সে কখনই যোগ অনুশীলন করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ভগবানকে উৎসর্গ না করে কখনই কিছু গ্রহণ করেন না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই কেবল যোগসাধনে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। কিন্তু যে মনগড়া উপবাস প্রণালী সৃষ্টি করে কৃত্রিম উপায়ে আহার বর্জন করে, সে যথার্থ যোগ অনুশীলন করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপবাস করেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারও করেন না, আবার উপবাসও করেন না। তাই, তিনি যোগ অভ্যাস করার জন্য যথার্থই উপযুক্ত। যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে, সে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা রকম স্বপ্ন দেখে এবং তার ফলে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমায়। ৬ ঘণ্টার বেশি ঘুমানো কারও পক্ষেই উচিত নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ছয় ঘণ্টার বেশি ঘুমায়, সে অবধারিতভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। যে মানুষ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, সে স্বভাবতই অলস এবং অত্যধিক নিদ্রাতুর। সেই মানুষ যোগ অনুশীলন করতে পারে না।

শ্লোক ১৭

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসূ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যুক্ত-নিয়ন্ত্রিত; আহার-ভোজন; বিহারস্য-বিহার; যুক্ত-নিয়ন্ত্রিত; চেষ্টস্য-চেষ্টাবিশিষ্ট; কর্মযু-কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানে; যুক্ত-নিয়ন্ত্রিত; স্বপ্নাববোধস্য-নিদ্রিত ও জাগ্রত ব্যক্তির; যোগঃ-যোগ অভ্যাস, ভবতি-হয়; দুঃখহা-দুঃখনাশক।

গীতার গান

যুক্তভোজী বিহার সে যুক্ত কর্ম চেষ্টা।
যুক্ত নিদ্রা যুক্ত জাগি যোগ পরাসৃষ্টা ॥

অনুবাদ

যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

তাৎপর্য

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-এগুলি হচ্ছে দেহের প্রবৃত্তি। যথাযথভাবে এদের সংযত না করা হলে এরা যোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করার মাধ্যমে আহারের প্রবৃত্তিকে সংযত করা যায়। ভগবদ্গীতা (৯/২৬) অনুসারে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন, শাক, সবজি, ফল, ফুল, দুধ আদি নিবেদন করা যায়। এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত মানুষের অযোগ্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণের শ্রেণীভুক্ত নয়, এমন খাদ্য বর্জন করার শিক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্য পালন করতে তৎপর, তাই তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা উপভোগকে মস্ত বড় ক্ষতি বলে মনে করেন। অব্যর্থকালত্বম্ কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে চান না। তাই তিনি খুব অল্প সময় নিদ্রার জন্য ব্যয় করেন। এই বিষয়ে তাঁর আদর্শ হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী, যিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় থেকে কেবলমাত্র দুই ঘণ্টার জন্য নিদ্রা যেতেন, কখনও কখনও আবার তারও কম। নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস তিন লক্ষ নাম জপ না করে মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতেন না এবং প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। কৃষ্ণসেবা ছাড়া কৃষ্ণভক্ত আর কোন কর্মই করেন না। তাই, তাঁর প্রতিটি কর্মই সংযত এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কলুষ থেকে মুক্ত। কৃষ্ণভক্তের যেহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা থাকে না, তাই তাঁর জড় সুখভোগের অবকাশ নেই। যেহেতু তাঁর কর্ম, বাক্য, নিদ্রা, জাগরণ এবং সব রকমের দৈহিক কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত, তাই তিনি কখনই জড়-জাগতিক ক্লেশ ভোগ করেন না।

শ্লোক ১৮

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যদা-যখন; বিনিয়তম্-বিশেষভাবে সংযত; চিত্তম্-মন এবং তার কার্যকলাপ; আত্মনি-আত্মাতে; এব-নিশ্চিতভাবে; অবতিষ্ঠতে-অবস্থান করে; নিস্পৃহঃ-স্পৃহাশূন্য; সর্ব-সর্বপ্রকার; কামেভ্যঃ-কামনা থেকে; যুক্তঃ-যোগযুক্ত; ইতি-এভাবে; উচ্যতে-বলা হয়; তদা-তখন।

গীতার গান

যতাত্মা বিনিয়ত চিত্ত আত্মতুষ্ট।
নিস্পৃহ যে সর্বকামে সেই যোগপুষ্ট ॥

অনুবাদ

যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন, তখন তিনি যোগযুক্ত হয়েছেন বলে বলা হয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের সঙ্গে যোগীর কার্যকলাপের পার্থক্য হচ্ছে যে, যোগী কোন অবস্থাতেই জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা বিশেষ করে যৌনসঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যথার্থ যোগীর মনঃক্রিয়া এত সংযত যে, তিনি কোন রকম জাগতিক বাসনার দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই এই অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/১৮-২০) বলা হয়েছে-

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো
-বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ

তদভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

"মহারাজ অম্বরীষ সর্বপ্রথমে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। তারপর ক্রমশ তিনি তাঁর বাণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর হস্ত দ্বারা তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনা করেছিলেন, তাঁর শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের লীলা শ্রবণ করেছিলেন, তাঁর চক্ষু দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেছিলেন, তাঁর ত্বক-ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ভগবদ্ভক্তের দেহ স্পর্শ করেছিলেন এবং তাঁর ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত পদ্ম ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জিহ্বা দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পদযুগল দ্বারা তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানে এবং ভগবানের মন্দিরে গমন করেছিলেন, তাঁর মস্তক দিয়ে তিনি ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত কামনাকে তিনি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত অপ্রাকৃত কর্মগুলি শুদ্ধ ভক্তেরই যোগ্য।"

নির্বিশেষবাদীদের পক্ষে এই অপ্রাকৃত অবস্থার কথা অনুমান করা অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের পক্ষে তা অত্যন্ত সুগম এবং ব্যবহারিক, যা মহারাজ অম্বরীষের কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। অনবরত স্মরণের দ্বারা মন যতক্ষণ না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে একাগ্র হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবায় এই রকম তৎপরতা সম্ভব নয়। ভক্তিমার্গে এই সমস্ত বিহিত কর্মগুলিকে বলা হয় 'অর্চন' অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কোন না কোন কর্মে অবশ্যই নিযুক্ত করতে হয়। কর্মবিরত হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই, সাধারণ মানুষের বিশেষ করে যারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাদের পক্ষে পূর্ববর্ণিত বিধি অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে ও মনকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করাই ভগবৎ-প্রাপ্তির যথার্থ পন্থা। ভগবদ্গীতায় একে যুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যথা-যেমন; দীপঃ-প্রদীপ, নিবাতস্থঃ-বায়ুশূন্য স্থানে; ন-না; ইঙ্গতে-বিচলিত হয়; সা উপমা-সেই উপমা; স্মৃতা-বিবেচিত হয়; যোগিনঃ-যোগীর; যতচিত্তস্য-সংযতচিত্ত, যুঞ্জতঃ-অভ্যাসকারী; যোগম্-যোগ; আত্মনঃ-আত্ম-বিষয়ক।

গীতার গান

যথা দীপ বিনা বায়ু স্থিরভাবে থাকে।

উত্তম উপমা সেই যোগীর নিষ্ঠাকে ॥

অনুবাদ

বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাসকারী যোগীর চিত্তও তেমনইভাবে অবিচলিত থাকে।

তাৎপর্য

বাতাস না থাকলে দীপশিখা যেমন স্থিরভাবে জ্বলে, সর্বতোভাবে পরব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে আছেন যে ভক্ত, তাঁর চিত্তও সেই দীপশিখার মতোই স্থির নিশ্চল।

শ্লোক ২০-২৩

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

যত্র-যে অবস্থায়; উপরমতে-নিবৃত্তি হয়; চিত্তম্-চিত্ত; নিরুদ্ধম্ জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়; যোগসেবয়া-যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা; যত্র-যেখানে; চ-ও; এব-অবশ্যই; আত্মনা-শুদ্ধ মনের দ্বারা; আত্মানম্-আত্মাকে; পশ্যন্-উপলব্ধি করে; আত্মনি-আত্মাতে; তুষ্যতি-তুষ্ট হয়; সুখম্-সুখ; আত্যন্তিকম্-পরম; যৎ-যা; তৎ-তা; বুদ্ধি-বুদ্ধি দ্বারা; গ্রাহ্যম্-গ্রহণযোগ্য; অতীন্দ্রিয়ম্ অপ্রাকৃত; বেত্তি-জানেন; যত্র-যেখানে; ন-না; চ-ও; এব-অবশ্যই: অয়ম্-এই অবস্থায়; স্থিতঃ-অবস্থিত; চলতি-বিচলিত হন; তত্ত্বতঃ-আত্মস্বরূপ থেকে; যম্-যা; লব্ধা-অর্জনের মাধ্যমে; চ-ও; অপরম্-অন্য কিছু; লাভম্-লাভ; মন্যতে-মনে হয়; ন-না; অধিকম্-অধিক; ততঃ-তার চেয়েও; যস্মিন্-যাতে; স্থিতঃ-স্থিত হলে; ন-না; দুঃখেন-দুঃখের দ্বারা; গুরুণা অপি-যদিও খুব কঠিন; বিচাল্যতে-বিচলিত হয়; তম্-তা; বিদ্যাৎ-অবশ্যই জানবে; দুঃখসংযোগ-জড় জগতের সংযোগ-জনিত দুঃখ; বিয়োগম্-বিয়োগ; যোগসংজ্ঞিতম্-যোগসমাধি বলা হয়।

গীতার গান

যোগীর সে আত্মস্থির যোগ সাধনেতে।
যোগাত্মন তার নাম যোগ অভ্যাসেতে ॥
বিষয় ভোগের উপরতি যোগীর প্রমাণ।
নিরুদ্ধ সে যোগসেবা সিদ্ধির নিধান ॥
আত্মারাম যদা তুষ্ট আত্মার দর্শনে।
সিদ্ধ সেই যোগী হয় যোগের সাধনে ॥
সত্য যে সুখ তাহা ইন্দ্রিয়াতীত।
যেবা সেই নাহি জানে অস্থির তত্ত্বতঃ ॥
যে সুখ হইলে লাভ সর্বলাভ হয়।
অন্য সব যত লাভ কিছু কাম্য নয় ॥

যাহাতে হইলে স্থিত গুরু দুঃখে অতি।
অস্থির না হয় থাকে অটল বিচ্যুতি ॥
যোগ সাধি সে অবস্থা যদি লভ্য হয়।
অষ্টাঙ্গ-যোগের সিদ্ধি তাহারে কহয় ॥

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের ফলে যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়, সেই অবস্থাকে যোগসমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী আত্মাতেই পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত 'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোন কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হয় না। জড় জগতের সংযোগ-জনিত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে এটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলন করার ফলে ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। এটিই হচ্ছে যোগের প্রথম লক্ষণ। তারপর যোগী সমাধিতে স্থিত হন। যার অর্থ হচ্ছে-তিনি আত্মা ও পরমাত্মাকে এক বলে মনে করার ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও চিত্তের দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করেন। যোগমার্গ সাধারণত পতঞ্জলির যোগসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু কপট ব্যাখ্যাকার জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ স্থাপন করার অসৎ চেষ্টা করে এবং অদ্বৈতবাদীরা সেটিকে মুক্তি বলে মনে করে, কিন্তু তারা পতঞ্জলির যোগ প্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতিতে অপ্রাকৃত আনন্দের উপলব্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা তা স্বীকার করে না, কারণ তা হলে তাদের অদ্বৈত মতবাদ সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হবে। জ্ঞান ও জ্ঞাতার দ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করে না, কিন্তু এই শ্লোকটিতে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভূতির কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই কথার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন স্বয়ং পতঞ্জলি মুনি, যিনি হলেন যোগের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। এই মহামুনি তাঁর যোগসূত্রে (৩/৩৪) বলে গেছেন- পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

এই চিতিশক্তি অথবা অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে অপ্রাকৃত। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং পরিশেষে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়াকে অদ্বৈতবাদীরা বলেন কৈবল্য। কিন্তু পতঞ্জলি বলছেন যে, এই কৈবল্য হচ্ছে সেই দিব্য অন্তরঙ্গা শক্তি, যার দ্বারা জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে এই অবস্থাকে বলেছেন, চেতোদর্পণমার্জনম্ অথবা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করা। চিত্তের এই শুদ্ধিই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, অথবা ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্। প্রারম্ভিক নির্বাণ-মতও এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/৬) একে বলা হয়েছে স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। ভগবদ্গীতার এই শ্লোকেও সেই একই কথা বলা হয়েছে।

নির্বাণের পরে, অর্থাৎ জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি হলে কৃষ্ণভাবনামৃত নামক ভগবৎ-সেবার চিন্ময় ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ -এটিই হচ্ছে 'জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ'। এই স্বরূপ যখন বিষয়াসক্তির দ্বারা আবৃত থাকে, তখন জীবাত্মা মায়াগ্রস্ত হয়। এই বিষয়াসক্তি বা ভবরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তখন আদি নিত্য স্বরূপের বিনাশ হয়। পতঞ্জলি মুনি এই সত্যের সমর্থন করে বলেছেন- কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি। এই চিতিশক্তি বা অপ্রাকৃত আনন্দ হচ্ছে যথার্থ

জীবন। বেদান্ত-সূত্রেও (১/১/১২) সেই কথার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, আনন্দময়োহভ্যাসাৎ। এই স্বাভাবিক অপ্রাকৃত আনন্দই হচ্ছে যোগের চরম লক্ষ্য এবং ভক্তিযোগ সাধন করার মাধ্যমে অনায়াসে এই আনন্দ লাভ করা যায়। সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত যোগপদ্ধতিতে সমাধি দুই রকমের 'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি' ও 'অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি'। নানা রকম দার্শনিক অন্বেষণের দ্বারা অপ্রাকৃত স্থিতিকে বলা হয় 'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি'। 'অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে' কোন রকম জড় বিষয়ানন্দ ভোগের সম্বন্ধ থাকে না, কারণ এই স্থিতিতে তিনি সব রকম ইন্দ্রিয়জাত সুখের অতীত। এই চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত যোগী কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। যোগী যদি এই স্তরে উন্নীত না হতে পারেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর যোগসাধনা সফল হয়নি। আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগ, যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সঙ্গে যুক্ত তা পরস্পর-বিরোধী। মৈথুন ও মদ্যপানে আসক্ত হয়ে যে নিজেকে যোগী বলে, সে উপহাসের পাত্র। এমন কি, যে যোগী যৌগিক সিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট, সেও যথার্থ যোগী নয়। যোগী যদি যোগের আনুষঙ্গিক উপলব্ধির প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তবে সে যোগের যথার্থ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, সেই কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। তাই, যারা যোগ-ব্যায়ামের কসরৎ দেখায় অথবা তাদের সিদ্ধি প্রদর্শন করে ম্যাজিক দেখায়, তারা যোগের অপব্যবহার করছে। তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের যোগ-সাধনার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

এই যুগে যোগ-সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা এবং এই যোগসাধনা ব্যর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তি সাধন করবার মাধ্যমে ভক্ত যে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করে, তার ফলে তিনি আর কোন রকম জড় সুখভোগ করার আকাঙ্ক্ষা করেন না। শঠতাপূর্ণ এই কলিযুগে হঠযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ অনুশীলনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি আছে, কিন্তু কর্মযোগ অথবা ভক্তিযোগ অনুশীলনে তেমন কোন অসুবিধা নেই।

যতক্ষণ এই জড় দেহটি আছে, ততক্ষণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি জড় দেহের চাহিদাগুলিও মেটাতে হবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে যখন এই আবশ্যকতাগুলি মেটান হয়, তখন ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি উত্তেজিত হয় না। বরং, ভক্ত তাঁর জীবন ধারণের জন্য যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করে যথাসম্ভব লাভ ওঠাবার চেষ্টা করেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি দুর্ঘটনা, রোগ, অভাব, এমন কি অতি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু আদি প্রাসঙ্গিক ঘটনাতেও নির্বিকার থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি সাধনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ। কোন দুর্ঘটনাই তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না। ভগবদ্গীতাতে (২/১৪) বলা হয়েছে- আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত। তিনি এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলিকে সহ্য করেন, কারণ তিনি ভালমতেই জানেন যে, এগুলি অনিত্য-এগুলি আসবে ও যাবে, তাই তাঁর কর্তব্যকর্ম কখনই এদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এভাবেই তিনি যোগের পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৪

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিণ্ণচেতসা।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ-সেই যোগ; নিশ্চয়েন-অধ্যবসায় সহকারে; যোক্তব্যঃ-সাধন করা কতর্ব্য; যোগঃ-যোগপদ্ধতি; অনির্বিণ্ণচেতসা-অবিচলিতভাবে; সংকল্প-সংকল্প; প্রভবান্-জাত; কামান্-কামনা; ত্যক্ত্বা-ত্যাগ করে; সর্বান্-সমস্ত; অশেষতঃ -পূর্ণরূপে; মনসা-মনের দ্বারা; এব-অবশ্যই; 'ইন্দ্রিয়গ্রামম্-ইন্দ্রিয়সমূহকে, বিনিয়ম্য-নিয়ন্ত্রিত করে; সমন্ততঃ-সমস্ত দিক থেকে।

গীতার গান

উৎসাহ ধৈর্য আর নিলয় আত্মিকা ।
যোগসিদ্ধি লাগি ছাড়ি নির্বেদ প্রাপিকা ॥
সংকল্প সমস্ত দ্বারা না হয়ে কিঞ্চিৎ।
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে করিয়া বিজিত ॥

অনুবাদ

অবিচলিত অধ্যবসায় ও বিশ্বাস সহকারে এই যোগ অনুশীলন করা উচিত। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

যোগীকে দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য সহকারে অবিচলিত থেকে যোগ অভ্যাস করতে হয়। এক সময় না এক সময় সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই হবে-এভাবেই পূর্ণ আশাবাদী হয়ে গভীর ধৈর্য সহকারে এই পথ অনুসরণ করতে হয়। সাফল্য লাভে বিলম্ব হলে হতোদ্যম হওয়া কখনই উচিত নব। কারণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যিনি যোগ অভ্যাস করেন, তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করেন। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন-

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

"আন্তরিক উৎসাহ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভক্তসঙ্গে ভক্তির অনুকূল কর্ম করে এবং কেবল সত্ত্বগুণময়ী কর্ম করার ফলে ভক্তিযোগে সাফল্য লাভ করা যায়।" (উপদেশামৃত ৩)

দৃঢ় সংকল্প সম্বন্ধে সেই চড়াই পাখির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত, যার ডিম সাগরের জলে ভেসে গিয়েছিল। একটি চড়াই পাখি সমুদ্রের তীরে ডিম পেড়েছিল, কিন্তু মহাসমুদ্রের দুর্বার তরঙ্গে সেই ডিমগুলি ভেসে যায়। অত্যন্ত মর্মাহত চিত্তে সেই চড়াই পাখি তখন সমুদ্রের কাছে আবেদন করে তার ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু সমুদ্র তার সেই আবেদনে কর্ণপাতই করেনি। তখন সেই চড়াই পাখি সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলার সংকল্প করে তার ছোট্ট ঠোঁটে সমুদ্রের জল তুলতে লাগল। তার এই অসম্ভব সংকল্পের জন্য সকলেই তাকে পরিহাস করতে লাগল। এদিকে সেই চড়াই পাখির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের কানে সেই কথা পৌঁছল এবং তাঁর ছোট্ট বোনটির জন্য সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় ভরে উঠল। তিনি সেই ছোট্ট চড়াই পাখিটিকে দেখতে সেই সমুদ্রের তীরে এলেন। গরুড় চড়াই পাখির এই দৃঢ় সংকল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রকে আদেশ করলেন চড়াই পাখির ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে, আর সে যদি তা না করে, তা হলে তিনিই সেই চড়াই পাখির কাজটি সম্পন্ন করবেন, সেই কথাও তিনি সমুদ্রকে জানিয়ে দিলেন। ভীতগ্রস্ত হয়ে সমুদ্র তখন চড়াই পাখির ডিমগুলি ফিরিয়ে দিলেন। এভাবেই গরুড়ের কৃপায় সেই চড়াই পাখি তার ডিম ফিরে পেয়ে সুখী হল। তেমনই, যোগসাধনা করা, বিশেষ করে ভগবানের সেবার মাধ্যমে ভক্তিযোগ সাধন করাকে ভীষণ কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কেউ

যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন, তখন ভগবান তাঁকে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবেন, কেন না যে নিজেকে সাহায্য করে, ভগবান তাকে সব রকমের সাহায্য করেন।

শ্লোক ২৫

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

শনৈঃ শনৈঃ-ধীরে ধীরে; উপরমেৎ-নিবৃত্তি করে; বুদ্ধ্যা-বুদ্ধির দ্বারা; ধৃতিগৃহীতয়া-ধৈর্যযুক্ত; আত্মসংস্থম্-চিন্ময় স্তরে স্থিত; মনঃ-মন; কৃত্বা-করে; ন-না; কিঞ্চিদপি-অন্য কোন কিছুই; চিন্তয়েৎ-চিন্তা করা উচিত।

গীতার গান

ক্রমে ক্রমে উপরাম বিষয় ভোগেতে।
আত্মস্থিত মন করি বিরাম চিন্তাতে ॥

অনুবাদ

ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে আত্মাতে স্থির করে এবং অন্য কোন কিছুই চিন্তা না করে সমাধিস্থ হতে হয়।

তাৎপর্য

সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বুদ্ধির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশ করতে হয়। একেই বলা হয় 'প্রত্যাহার'। সুদৃঢ় বিশ্বাস, ধ্যান ও ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির দ্বারা মনকে সর্বতোভাবে সংযত করে সমাধিস্থ করতে হয়। তখন আর দেহতে আত্মবুদ্ধি হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, যতক্ষণ জড় দেহের অস্তিত্ব আছে, ততক্ষণ জড় জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, কখনই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা চিন্তা করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির কথা ছাড়া আর অন্য কোন সুখের কথা কল্পনা করাও উচিত নয়। সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার ফলে অনায়াসে এই স্থিতি লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৬

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

যতঃ যতঃ-যে যে বিষয়ে; নিশ্চলতি-অত্যন্ত বিচলিত হয়; মনঃ-মন; চঞ্চল-চঞ্চল; অস্থিরম্-অস্থির; ততঃ ততঃ-সেই সেই বিষয় থেকে; নিয়ম্য-নিয়ন্ত্রিত করে; এতৎ-এই; আত্মনি-আত্মাতে; এব-অবশ্যই; বশম্-বশে; নয়েৎ-আনবে।

গীতার গান

অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা ধায়।
চেষ্টা করি সেই মন বশেতে রাখয় ।
আত্মার বশেতে মন সদাই রাখিবে।

চঞ্চল স্বভাব তার শোধন করিবে ॥

অনুবাদ

চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে আত্মার বশে আনতে হবে।

তাৎপর্য

মন স্বভাবতই অস্থির ও চঞ্চল। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীর কর্তব্য হচ্ছে সেই মনকে নিয়ন্ত্রিত করা, মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তাঁর কখনই উচিত নয়। যিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করতে পেরেছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী অথবা স্বামী; আর যে মনের অধীন তাকে বলা হয় গোদাস, অর্থাৎ সে তার ইন্দ্রিয়ের দাস। বিষয় ভোগের নিরর্থকতা একজন গোস্বামী ভালমতেই জানেন। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সুখে, ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশ অথবা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকে। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণরূপে বশ করার সেটিই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেটিই যোগ-সাধনার পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ২৭

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশান্ত-প্রশান্ত, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবিষ্ট; মনসম্-যাঁর মন; হি-নিশ্চিতভাবে; এনম্-এই; যোগিনম্-যোগী; সুখম্-সুখ; উত্তমম্ সর্বোত্তম; উপৈতি-প্রাপ্ত হন; শান্তরজসম্-রজগুণ প্রশমিত; ব্রহ্মভূতম্-ব্রহ্মভাব-সম্পন্ন; অকল্মষম্-নিষ্পাপ।

গীতার গান

প্রশান্ত হইলে মন সুখ উত্তম যোগীর ।
শান্ত হয় রজোগুণ নিষ্পাপ শরীর ।
নিষ্পাপ হইলে সেই সত্ত্বগুণে স্থিত ।
ব্রহ্মভূত নাম তার শুদ্ধ সমাহিত ।।

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব-সম্পন্ন, প্রশান্ত চিত্ত, রজোগুণ প্রশমিত ও নিষ্পাপ হয়ে যাঁর মন আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, তিনিই পরম সুখ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত হওয়াকে বলা হয় ব্রহ্মহ্মভূত। মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ (ভঃ গীঃ ১৮/৫৪)। ভগবানের চরণারবিন্দে মন স্থিত না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতে নিত্য তন্ময় থাকলে রজোগুণ এবং সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৮

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ৷ ২৮ ॥

যুঞ্জন-যোগযুক্ত হয়ে; এবম্-এভাবে; সদা-সর্বদা; আত্মানম্-আত্মাকে; যোগী-যিনি পরম আত্মার সঙ্গে যুক্ত; বিগত-মুক্ত; কল্মষঃ-সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে; সুখেন-চিন্ময় সুখে; ব্রহ্মসংস্পর্শম্-পরব্রহ্মের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত হয়ে; অত্যন্তম্-পরম; সুখম্-সুখ; অশ্নুতে-লাভ করেন।

গীতার গান

বিধৌত সমস্ত পাপ যোগী অকল্মষ।
সুখে ব্রহ্মসংস্পর্শ সে ক্রমশ ক্রমশ ॥
ব্রহ্মসুখে মগ্ন হয় সে যোগী তখন।
প্রাকৃত গুণাদি ত্যজি ব্রহ্ম অনুভব ৷
ব্রহ্মস্পর্শ কিবা হয় কেমনে তা জানি।
সর্বভূত ব্রহ্মে দর্শন সর্ব ব্রহ্ম জানি ॥

অনুবাদ

এভাবেই আত্মসংযমী যোগী জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ পরম সুখ আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

আত্মদর্শনের অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা। জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ। তাই, তার কর্তব্য হচ্ছে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের সঙ্গে এই অপ্রাকৃত সম্পর্ককে বলা হয় ব্রহ্মসংস্পর্শ।

শ্লোক ২৯

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বভূতস্থম্-সমস্ত প্রাণীতে স্থিত; আত্মানম্-পরমাত্মাকে; সর্ব-সমস্ত; ভূতানি-জীব; চ-ও; আত্মনি-আত্মায়; ঈক্ষতে-দর্শন করেন; যোগযুক্তাত্মা-কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত; সর্বত্র-সর্বত্র; সমদর্শনঃ-সমদর্শন।

গীতার গান

সর্বত্র সমান দৃষ্টি যোগযুক্ত আত্মা।
সমাধিস্থ সেই যোগী দেখে পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

প্রকৃত যোগী সর্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতে সব কিছু দর্শন করেন। যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্রই আমাকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণচেতনাময় যোগীই হচ্ছেন প্রকৃত দ্রষ্টা, কারণ তিনি সকলের অন্তরে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণের হৃদয়ে

অবস্থান করছেন, তেমনই আবার একটি কুকুরের হৃদয়েও অবস্থান করছেন। যথার্থ যোগী জানেন যে, ভগবান হচ্ছেন নিত্য চিন্ময়, তাই তিনি একটি কুকুরের হৃদয়েই অবস্থান করুন অথবা একজন সৎ ব্রাহ্মহ্মণের হৃদয়েই অবস্থান করুন, জড় কলুষের দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না। এটিই হচ্ছে ভগবানের পরম নিরপেক্ষতা। স্বতন্ত্র জীবাত্মাও স্বতন্ত্র হৃদয়ে অবস্থান করে, কিন্তু সে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করে না। সেটিই হচ্ছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য। যে বাস্তবিকপক্ষে যোগ সাধনে রত নয়, সে তত স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারে না। একজন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণভক্ত আপনা থেকেই বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয়ের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। স্মৃতি শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে- আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাচ্চ আত্মা হি পরমো হরিঃ। সর্বজীবের উৎস হরি মায়ের মতো সকলকে পালন করেন। মা যেমন তাঁর সব কয়টি সন্তানের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, পরম পিতা বা মাতা ভগবানও তেমন সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। পরমাত্মারূপে তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করেন।

বাহ্যিকভাবেও, প্রতিটি জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। ভগবানের শক্তির মুখ্য প্রকাশ হচ্ছে তাঁর চিৎ-শক্তি বা পরা শক্তি এবং জড়া শক্তি বা অপরা শক্তি। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। জীব ভগবানের পরা শক্তির অংশ হলেও সে অপরা শক্তির দ্বারা বদ্ধ হয়ে পড়েছে। জীব সর্বদাই ভগবানের শক্তিতে অধিষ্ঠিত। প্রতিটি জীবই কোন না কোনভাবে ভগবানের মধ্যে অবস্থিত।

যোগী সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, কারণ তিনি দেখেন যে, জীব তাদের কর্মফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে থাকলেও সর্ব অবস্থাতেই তারা ভগবানের নিত্যদাস। জীব যখন ভগবানের অপরা শক্তিতে বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সে জড় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে; যখন সে ভগবানের পরা শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে সাক্ষাৎ ভগবানের সেবায় তৎপর হয়। উভয় অবস্থাতে জীব ভগবানেরই দাসত্ব করে। সর্বভূতের প্রতি এই যে সমদর্শন, তা কেবল কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৩০

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যঃ-যিনি; মাম্-আমাকে, পশ্যতি-দর্শন করেন; সর্বত্র-সর্বত্র; সর্বম্-সব কিছু চ-এবং; ময়ি-আমাতে; পশ্যতি-দর্শন করেন; তস্য-তাঁর; অহম্-আমি; ন-না; প্রণশ্যামি হারিয়ে যাই; সঃ-তিনি; চ-ও; মে-আমার; ন-না; প্রণশ্যতি-হারিয়ে যান।

গীতার গান

সে দেখে আমারে সব স্থাবর জঙ্গমে।
অন্য দৃষ্টি নাহি তার নির্গুণ সঙ্গমে ॥
সে হয় আমার প্রেমী আমি হই তার।
নীরস শুষ্কা তর্ক নহে ব্যবহার ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃসন্দেহে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন এবং তিনি সব কিছুই ভগবানের মধ্যে দেখতে পান। যদিও মনে হতে পারে যে, এই ধরনের মানুষ মায়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে সাধারণ মানুষের মতো ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরই প্রকাশ, তাই তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময়। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর ঈশ্বর। এটিই কৃষ্ণভাবনার মূলতত্ত্ব। কৃষ্ণভাবনামৃতের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ করা-এই স্তর জড় বন্ধন-মুক্তির অতীত। আত্ম-উপলব্ধির অতীত কৃষ্ণভাবনার এই স্তরে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, অর্থাৎ তাঁর কাছে তখন সব কিছুই কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে এবং তিনিও তখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে যান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে তখন এক নিবিড় অন্তরঙ্গ প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় জীব কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর কখনও তাঁর ভক্তের দৃষ্টির অগোচর হন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীন হলে আত্মার স্বাতন্ত্রের বিনাশ হয়। তাই ভক্ত কখনও এই ভুল করেন না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে-

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুরা যে অচিন্ত্য গুণসম্পন্ন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হহৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এই প্রেমাবস্থায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই তাঁর ভক্তের দৃষ্টির অগোচর হন না এবং ভক্তও ভগবানের দৃষ্টির অগোচর হন না। যে সিদ্ধ যোগী তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন করছেন, তিনিও এভাবেই নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করেন। এই ধরনের সিদ্ধ যোগী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন এবং তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে না দেখে থাকতে পারেন না।

শ্লোক ৩১

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে । ৩১ ॥

সর্বভূতস্থিতম্-সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত; যঃ-যিনি; মাম্-আমাকে; ভজতি-ভজনা করেন; একত্বম্-অভিন্নরূপে; আস্থিতঃ-আশ্রয়পূর্বক; সর্বথা-সর্বতোভাবে; বর্তমানঃ-অবস্থিত হয়ে; অপি-সত্ত্বেও; সঃ-তিনি; যোগী-যোগী; ময়ি-আমাতে; বর্ততে-অবস্থান করেন।

গীতার গান

সর্বভূতস্থিত দেখে সর্বত্র আমারে।
ভজনে আস্থিত হয়ে সেবয়ে সে মোরে ॥
সে যোগী নিখিল ভবে সর্বত্র থাকিয়া।
আমাতে বসয়ে নিত্য আমারে ভজিয়া ॥

অনুবাদ

যে যোগী সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা রূপে আমাকে জেনে আমার ভজনা করেন, তিনি সর্ব অবস্থাতেই আমাতে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

যে যোগী পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনি তাঁর হৃদয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ যোগীদের এটি জানা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা বিষ্ণুরূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করেন। তা ছাড়া, অসংখ্য জীবের অন্তরে যে অসংখ্য পরমাত্মা বিরাজ করছেন, তাঁরাও ভিন্ন নন। তেমনই, ভক্তিযোগে তন্ময় কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন যোগীর মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। কৃষ্ণভাবনাময় যোগী এই জড় জগতে অবস্থানকালে নানা রকম জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান করেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব ২/১৮৭) শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই সম্বন্ধে বলেছেন- নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে। সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত। নারদ পঞ্চরাত্রেও সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে-

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ।

"যিনি একাগ্র চিত্তে স্থান-কালের অতীত শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপক শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করেন, তিনি কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় হন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করে চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হওয়াটাই যোগ সাধনার পরম সিদ্ধি। সমাধিযুক্ত যোগী যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করছেন, তখনই তিনি সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির সমর্থন করে বেদে (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২১) বলা হয়েছে, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি- "যদিও ভগবান একজন, তিনি বহুরূপে অসংখ্য হৃদয়ে বিরাজমান।" অনুরূপভাবে, স্মৃতি-শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বব্যাপী ন সংশয়ঃ ।
ঐশ্বর্যাদ্রূপমেকং চ সূর্যবৎ বহুধেয়তে ॥

"অদ্বিতীয় হলেও শ্রীবিষ্ণু নিঃসন্দেহে সর্বব্যাপক। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এক বিগ্রহরূপে তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান। সূর্যের মতো তিনিও একই সময় বহু স্থানে দৃষ্ট হন।"

শ্লোক ৩২

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

আত্ম-নিজের; ঔপম্যেন-তুলনার দ্বারা; সর্বত্র সর্বত্র; সমম্-সমভাবে; পশ্যতি-দর্শন করেন; যঃ-যিনি; অর্জুন-হে অর্জুন; সুখম্-সুখ; বা-অথবা; যদি-যদি: বা-অথবা; দুঃখম্-দুঃখ; সঃ-সেই; যোগী-যোগী; পরমঃ-সর্বশ্রেষ্ঠ; মতঃ-মনে করা হয়।

গীতার গান

বসুধা কুটুম্ব তার কেহ নহে পর।

প্রাকৃত বিচার নাই স্বপর অপর ॥
নিজ সুখ নিজ দুঃখ অন্যেতে ব্যবহার।
সেই সে সমানদর্শী সর্বত্র প্রচার ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন। যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ সমানভাবে দর্শন করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন পরম যোগী। নিজের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকলেরই সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন। ভগবানের সঙ্গে তার শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই জীব ক্লেশভোগ করে। আবার পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই যে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপের পরম ভোক্তা, সমস্ত দেশ ও গ্রহলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে তার সুখের কারণ। সিদ্ধ যোগী জানেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করছে। আর কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত, যিনি পূর্ণ আনন্দের স্বাদ লাভ করেছেন, তিনি চান যে, আর সকলেই সেই দিব্য আনন্দ লাভ করুক, তাই তিনি সমস্ত বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। যথার্থ যোগী কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব প্রচার করার প্রয়াসী হন, তাই তিনি এই জগতের শ্রেষ্ঠ পরোপকারী এবং তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রিয়তম সেবক। ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ (গীতা ১৮/৬৯)। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত জীবের কল্যাণ সাধনে নিত্য তৎপর, তাই তিনি সকলের প্রকৃত সুহৃদ। তাঁকে সর্বোত্তম যোগী বলা হয়, কারণ তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য যোগের সিদ্ধি কামনা করেন না, বরং তিনি সমস্ত জীবের যথার্থ কল্যাণ সাধনে নিত্য যুক্ত। তিনি কারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ আদি মনোভাব পোষণ করেন না। শুদ্ধ ভক্ত ও সিদ্ধিকামী যোগীর মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। সিদ্ধি লাভ করার আশায় যে যোগী নির্জনে বসে ধ্যান করেন, তিনি স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত প্রতিটি মানুষকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, তিনি নির্জনে ধ্যানরত যোগীর থেকে অনেক উচ্চমার্গে অবস্থিত।

শ্লোক ৩৩

অর্জুন উবাচ
যোহয়ং যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; যঃ অয়ম্-এই পদ্ধতি; যোগঃ-যোগ; ত্বয়া-তোমার দ্বারা; প্রোক্তঃ বর্ণিত হল; সাম্যেন-সমদর্শনরূপ; মধুসূদন-হে মধুসূদন; এতস্য-এর; অহম্-আমি; ন-না; পশ্যামি দেখি; চঞ্চলত্বাৎ-চাঞ্চল্যবশত; স্থিতিম্ স্থিতি; স্থিরাম্-স্থায়ী।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
আপনি যে যোগবার্তা কহিলেন আমারে ।
হে মধুসূদন! তাহা না সম্ভবে মোরে ॥

মোর মন চঞ্চল সে অস্থির সে মতি।
অতএব বুঝি আমি অসম্ভব গতি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে মধুসূদন! তুমি সর্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগ উপদেশ করলে, মনের চঞ্চল স্বভাববশত আমি তার স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে শুচৌ দেশে থেকে শুরু করে যোগী পরমঃ পর্যন্ত যে যোগ-পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন, অর্জুন এখানে সেই যোগকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তিনি নিজেকে সেই যোগসাধনে অযোগ্য বলে মনে করেছেন। এই কলিযুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে গৃহত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে অথবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে নির্জন স্থানে যোগাভ্যাস করা সম্ভব নয়। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্প-আয়ুবিশিষ্ট জীবনের জন্য তিক্ত জীবন-সংগ্রাম। এই যুগের সাধারণ মানুষ এতই অধঃপতিত যে, পরমার্থ সাধন করবার কোন প্রচেষ্টাই তাদের মধ্যে নেই। অতি সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করেও তারা পরমার্থ সাধনের প্রয়াসী হয় না। তা হলে জীবনযাত্রা, উপবেশনের প্রক্রিয়া, স্থান নির্বাচন এবং জড় বিষয় থেকে মনের আসক্তি নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য যোগের সাধন তারা কিভাবে করবে? তাই বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্জুনের মতো মহাবীর চিন্তা করলেন, এই যোগসাধন করা একেবারেই অসম্ভব, এমন কি বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর অনুকূল পরিস্থিতি থাকলেও। অর্জুন ছিলেন অতি উচ্চ বংশজাত রাজকুমার এবং তিনি অনন্ত গুণে বিভূষিত। তিনি ছিলেন মহা বীর্যবান, দীর্ঘায়ু-সম্পন্ন মহারথী এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে অর্জুনের সুযোগ-সুবিধা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই যোগপদ্ধতি সাধন করতে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের কোথাও তাঁকে এই যোগ অনুশীলন করতে দেখা যায়নি। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, কলিযুগে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করা সাধারণত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কয়েকজন দুর্লভ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এটি অসম্ভব। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যদি এই রকম হয়ে থাকে, তা হলে এখনকার অবস্থা কি হবে? যে সমস্ত মানুষ বিভিন্ন যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে এই যোগ-পদ্ধতির অন্ধানুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তারা কেবল তাদের সময়ের অপব্যবহার করছে। তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্লোক ৩৪

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চলম্-চঞ্চল; হি-নিশ্চিতভাবে; মনঃ-মন; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ, প্রমাথি-বিক্ষোভকর; বলবৎ-বলবান, দৃঢ়ম্-দুর্দমনীয়; তস্য-তার; অহম্-আমি; নিগ্রহম্-নিগ্রহ; মন্যে-মনে করি; বায়োঃ-বায়ুর; ইব-মতো; সুদুষ্করম্-সুকঠিন।

গীতার গান

হে কৃষ্ণ জান না কিবা প্রমাথী মনেরে।

অতি বলবান সেই সব পণ্ড করে ॥
তাহার নিগ্রহ মানি অতি সুদুষ্কর।
বায়ুরোধ যথা হয় অত্যন্ত প্রখর ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও অধিকতর কঠিন বলে আমি মনে করি।

তাৎপর্য

মন এতই বলবান ও দুর্দমনীয় যে, সে কখনও কখনও বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে পরিচালিত করতে থাকে, যদিও স্বাভাবিকভাবে মন বুদ্ধির অধীনেই থাকা উচিত। সাংসারিক মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা রকম বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, তাই তার পক্ষে মনকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। কৃত্রিম উপায়ে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়ে মনের ভারসাম্য সৃষ্টি করার অভিনয় করলেও, বাস্তবিকভাবে কোন সংসারী মানুষ তা করতে পারে না। কারণ, তা প্রচণ্ড বেগবতী বায়ুকে সংযত করার চাইতেও কঠিন। বৈদিক শাস্ত্রে (কঠ উপনিষদ ১/৩/৩-৪) বলা হয়েছে-

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

"এই দেহরূপ রথের আরোহী হচ্ছে জীবাত্মা, বুদ্ধি হচ্ছে সেই রথের সারথি। মন হচ্ছে তার বল্গা এবং ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে ঘোড়া। এভাবেই মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহচর্যে আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। চিন্তাশীল মনীষীরা এভাবেই চিন্তা করেন।" বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করা উচিত, কিন্তু মন এত শক্তিশালী ও দুর্দমনীয় যে, বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে সে বুদ্ধিকেই পরাভূত করে তাকে পরিচালিত করতে শুরু করে। ঠিক যেমন, অনেক সময় জটিল সংক্রমণ ওষুধের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। এই রকম শক্তিশালী যে মন, তাকে যোগ-সাধনার মাধ্যমে সংযত করার বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অর্জুনের মতো প্রবৃত্তি-মার্গের মানুষের পক্ষেও তা সাধন করা বাস্তবসম্মত নয়। সুতরাং, আধুনিক মানুষের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? এই সম্পর্কে এখানে বায়ুর যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তা খুবই উপযুক্ত। বেগবতী বায়ুকে দমন করার ক্ষমতা কারও নেই এবং তার তুলনায় অস্থির মনকে বশ করা আরও কঠিন। মনকে দমন করার সবচেয়ে সহজ পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সেই পন্থা হচ্ছে পূর্ণ দৈন্য সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই পথ হচ্ছে স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ- মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তা হলেই আর কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন উদ্বিগ্ন হবে না।

শ্লোক ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অসংশয়ম্-সন্দেহ নেই; মহাবাহো-হে মহাবীর; মনঃ-মন; দুর্নিগ্রহম্-দুর্দমনীয়; চলম্-চঞ্চল; অভ্যাসেন-অভ্যাসের দ্বারা; তু-কিন্তু; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; বৈরাগ্যেণ-বৈরাগ্যের দ্বারা; চ-ও; গৃহ্যতে বশীভূত করা সম্ভব।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন:

অসংশয় সেই কথা তুমি যা কহিলে।
অত্যন্ত কঠিন সেই মনের চঞ্চলে ॥
কিন্তু যদি করে চেষ্টা শুনহ কৌন্তেয় ।
বৈরাগ্য সাধনে তবে হয় কার্য শ্রেয় ।॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে মহাবাহো। মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

তাৎপর্য

অবাধ্য মনকে সংযত করা যে কত কঠিন তা অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন। ভগবানও সেই কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান জানিয়ে দিলেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা সম্ভব। সেই অভ্যাসটি কি? বর্তমান কলিযুগে তীর্থবাস, পরমাত্মার ধ্যান, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির নিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, নির্জন বাস আদি কঠোর বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে নববিধা ভগবদ্ভক্তি সাধন করা যায়। ভক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ। মনকে সমস্ত ভ্রান্তি ও অনর্থ থেকে শুদ্ধ করার জন্য এটি অতি শক্তিশালী পন্থা। কৃষ্ণকথা যত বেশি শ্রবণ করা যায়, মন ততই প্রবুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণবিমুখ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কার্যকলাপ থেকে মনকে অনাসক্ত করার ফলে সহজেই বৈরাগ্য শিক্ষা লাভ করা যায়। বৈরাগ্য মানে হচ্ছে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি। নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক বেশি কঠিন। কৃষ্ণলীলায় মনকে আসক্ত করার থেকে কৃষ্ণলীলার প্রতি আসক্তি বস্তুত খুবই সহজসাধ্য, কারণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রোতা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। এই আসক্তিকে বলা হয় পরেশানুভব, অর্থাৎ পারমার্থিক সন্তোষ। এই অনুভূতি অনেকটা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধা-নিবৃত্তিরূপ তৃপ্তির মতো। ক্ষুধার সময় যতই ভোজন করা হয়, ততই তৃপ্তি ও শক্তি অনুভব হয়। সেই রকম, ভক্তির প্রভাবে মন বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয় এবং অপ্রাকৃত তৃপ্তি অনুভূত হয়। এই পদ্ধতি অনেকটা সুদক্ষ চিকিৎসা এবং উপযুক্ত আহারের দ্বারা রোগ নিরাময় করার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণ করা হচ্ছে উন্মত্ত মনের সুদক্ষ চিকিৎসা এবং কৃষ্ণপ্রসাদ হচ্ছে ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত পথ্য। এই সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩৬

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসংযত-অসংযত; আত্মনা-মনের দ্বারা; যোগঃ-আত্ম-উপলব্ধি; দুষ্প্রাপঃ-দুষ্প্রাপ্য; ইতি-

এভাবে; মে-আমার; মতিঃ-অভিমত; বশ্য বশীভূত; আত্মনা-মনের দ্বারা; তু-কিন্তু; যততা-যত্নবান; শক্যঃ-সমর্থ; অবাস্তুম্ লাভ করতে; উপায়তঃ-যথার্থ উপায় অবলম্বন করে।

গীতার গান

অসংযত মন যার যোগ সে দুষ্কর।
সেই সে আমার মত বুঝহ বিস্তর ॥
আত্মবশী চেষ্টা করি যে করে উপায়।
তাহার সে কার্যসিদ্ধি জানহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অসংযত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-উপলব্ধি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যার মন সংযত এবং যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করতে চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

ভগবান আমাদের এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জড় বিষয় থেকে মনকে অনাসক্ত করার যথার্থ চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কখনই যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। মনকে সুখভোগে নিয়োজিত রেখে যোগের অনুশীলন করাটা জল ঢেলে আগুন জ্বালাবার চেষ্টার সামিল। মনকে সংযত না করে যোগ অনুশীলন করা কেবল সময়েরই অপচয়। এই ধরনের লোকদেখানো যোগসাধনা অর্থ উপার্জন করার একটি ভাল উপায় হতে পারে, কিন্তু পরমার্থ সাধনের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই, নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত করে মনকে সংযত করতে হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবৎ-সেবা ছাড়া মনকে কখনও সংযত করা যায় না। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত আলাদা প্রচেষ্টা ছাড়াই অনায়াসে যোগ-সাধনার সমস্ত ফল লাভ করেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় না হয়ে যোগ অনুশীলনকারী কখনই তাঁর যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৭

অর্জুন উবাচ
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; অযতিঃ-ব্যর্থ যোগী; শ্রদ্ধয়া-শ্রদ্ধা সহকারে; উপেতঃ-যুক্ত; যোগাৎ-যোগ থেকে; চলিত-ভ্রষ্ট; মানসঃ-চিত্ত; অপ্রাপ্য- না পেয়ে; যোগসংসিদ্ধিম্-যোগের সম্যক ফল; কাম্-কি; গতিম্-গতি; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ; গচ্ছতি-প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
চেষ্টা করিয়াও যদি সিদ্ধ নাহি হয়।
হে কৃষ্ণ! বল তার কি আছে উপায় ॥
সাধ্যমত চেষ্টা করি বিচলিত হয়।
অপ্রাপ্য সে যোগসিদ্ধি তাহার নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে কৃষ্ণ! যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগে যুক্ত থেকে পরে

চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ভ্রষ্ট হয়ে যোগে সিদ্ধিলাভ করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থ যোগীর কি গতি লাভ হয়?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বা যোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আত্ম-উপলব্ধি বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায় যার ফলে বুঝতে পারা যায় যে, এই জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, তার স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় আত্মা। এই স্বরূপ অপ্রাকৃত, তা জড় দেহ ও মনের অতীত। জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ অথবা ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই আত্ম-উপলব্ধি অন্বেষণ করতে হয়। এই সব কয়টি পন্থাতেই অনুশীলনকারীকে জানতে হয় জীবের স্বরূপ কি, তার সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক এবং কিভাবে ভগবানের সাথে সেই সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়। এই তিনটি পথের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে সর্বান্তঃকরণে তার অনুশীলন করতে শুরু করলে এক সময় না এক সময় গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, পরমার্থ সাধনের পথে স্বল্প প্রচেষ্টাও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং মহৎ ভয়ের থেকে ত্রাণ করে। এই তিনটি পন্থার মধ্যে ভক্তিযোগই এই যুগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কারণ, ভগবানকে জানবার জন্য এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পথ। মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর করার জন্য অর্জুন আবার ভগবানকে সেই কথা জিজ্ঞেস করছেন। যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করতে পারি। কিন্তু তাদের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা এই কলিযুগে অত্যন্ত কঠিন। তাই, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলেও সিদ্ধি লাভ না হতেও পারে নানা কারণে তার পদস্খলন হতে পারে। সর্বপ্রথমে, কেউ হয়ত যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পন্থাটি অনুশীলন নাও করতে পারে। পরমার্থ সাধনে ব্রতী হওয়া মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করারই সামিল। অতএব, কেউ যখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, তখন মায়া বা জড়া প্রকৃতি তাকে নানাভাবে প্রলোভিত করে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। বদ্ধ জীব এমনিতেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আছে, তাই পরমার্থ সাধন করার সময় পুনরায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। একে বলা হয় যোগাচ্চলিতমানসঃ-যোগের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়া। এভাবেই যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়লে তার পরিণাম কি হয় তা জানতে অর্জুন উৎসুক।

শ্লোক ৩৮

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিৎ-কি; ন-না; উভয় উভয়; বিভ্রষ্টঃ-ভ্রষ্ট; ছিন্ন-ছিন্ন; অভ্রম্-মেঘ; 'ইব-মতো; নশ্যতি নষ্ট হয়; অপ্রতিষ্ঠঃ-নিরাশ্রয়; মহাবাহো-হে মহাবীর কৃষ্ণ, বিমূঢ়ঃ-বিমূঢ়; ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্ম লাভের; পথি-পথে।

গীতার গান

উভয় ভ্রষ্ট ছিন্নাভ্র মতো সর্বনাশ।
বিমূঢ় ব্রহ্মের পথে কিবা তার আশ ।
মহাবাহো! এ সংশয় করহ ছেদন।
ঘুচাও আপনি সেই মনের বেদন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো কৃষ্ণ। কর্ম ও যোগ হতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভের পথ থেকে বিমূঢ় হয়ে যে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, সে কি ছিন্ন মেঘের মতো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে?

তাৎপর্য

দুটি পথ ধরে এগোনো যায়। যারা বিষয়াসক্ত, তারা পরমার্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই তারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে জড় বিষয় ভোগ করতে তৎপর, অথবা যথোচিত কর্ম অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াসী। কেউ যখন পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে, তখন তাকে সব রকম বৈষয়িক কর্ম পরিত্যাগ করতে হয় এবং সব রকম জড় সুখভোগের বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়। এই পরমার্থ সাধনে তিনি যদি সফল না হন, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি দুই দিকই হারালেন-তিনি জড় সুখভোগ করতে পারলেন না, আর পারমার্থিক সিদ্ধিও লাভ করতে পারলেন না। তিনি যেন বায়ু তাড়িত মেঘের মতোই ছন্নছাড়া। আকাশে অনেক সময় এক টুকরা মেঘ একটি ছোট মেঘ থেকে সরে গিয়ে একটি বড় মেঘের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে যদি সেই বড় মেঘটির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে; তা হলে সে বায়ুর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অসীম আকাশে হারিয়ে যায়। ব্রহ্মণঃ পথি কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমার্থ সাধনের পথ, যার অনুশীলনের ফলে উপলব্ধি হয় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা। এই আত্মা হচ্ছে সেই পরমেশ্বরের অংশ, যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ; তাই তাঁর চরণে যিনি প্রপত্তি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সার্থক পরমার্থবাদী। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে বহু বহু জন্মের প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হতে পারে-বহুনাং জন্মনামন্তে। তাই পরমার্থ সাধনের পরম শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনামৃত, যার ফলে আমরা সরাসরিভাবে জানতে পারি-ভগবান কে? শ্রীকৃষ্ণ কে? তাঁর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

শ্লোক ৩৯

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেতুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

এতৎ-এই; মে-আমার; সংশয়ম্-সংশয়; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ; ছেতুম্ দূর করতে; অর্হসি-তুমি সমর্থ; অশেষতঃ-সর্বতোভাবে; ত্বৎ-তুমি ছাড়া; অন্যঃ- অন্য কেউ; সংশয়স্য-সংশয়ের; অস্য-এই; ছেত্তা ছেদনকারী; ন-না; হি-অবশ্যই: উপপদ্যতে পাওয়া যাবে।

গীতার গান

তুমি কৃষ্ণ সে স্বয়ং সব কিছু জান।
তুমি বিনা ছেত্তা কিবা আছে আর আন ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল আমার এই সংশয় দূর করতে সমর্থ। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউই আমার এই সংশয় দূর করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে ভগবান বলেছেন যে, প্রতিটি জীবই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অতীতে ছিল,

বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এমন কি, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার পরেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। এভাবেই তিনি প্রতিটি জীবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। এখন, অর্জুন তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইছেন, যে সমস্ত সাধকেরা তাঁদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারলেন না, তাঁদের কি পরিণতি হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ হতে পারে না। তথাকথিত সমস্ত জ্ঞানী ও দার্শনিকেরা, যারা প্রকৃতির কৃপার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তারাও কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। তাই, আমাদের সমস্ত সন্দেহ নিরসনের জন্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র, কারণ তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, কিন্তু তাঁকে কেউ কখনও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তেরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; নৈব-কখনও এই রকম হয় না; ইহ-এই জড় জগতে; ন-না; অমুত্র-পরলোকে; বিনাশঃ -বিনাশ; তস্য-তার; বিদ্যতে-বিদ্যমান; ন-না; হি-যেহেতু; কল্যাণকৃৎ-শুভ অনুষ্ঠানকারী; কশ্চিৎ-কেউই; দুর্গতিম্-দুর্গতি; তাত-হে বৎস; গচ্ছতি-প্রাপ্ত হয়।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
হে পার্থ! শুনহ তুমি সে রূপ তাহার।
একজন্মে নহে সিদ্ধ বিপত্তি অপার ॥
তাহারও নাহি নাশ ইহ বা অমুত্র।
কল্যাণ কার্য যে সেই বিজয় সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে পার্থ! শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদের ইহলোকে ও পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। হে বৎস! তার কারণ, কল্যাণকারীর কখনও অধোগতি হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন-

ত্যক্তা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে
-ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"কেউ যদি সব রকম জড়-জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়, তা হলে তার কোন রকম ক্ষতি বা পতনরূপী অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না।

পক্ষান্তরে, সর্বতোভাবে স্বধর্মাচরণে রত অভক্তের কোনই লাভ হয় না।" জাগতিক উন্নতির জন্য নানা রকম শাস্ত্রোক্ত ও প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করবার জন্য পরমার্থ সাধককে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করতে হয়। তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে সিদ্ধি লাভ করলে পরমার্থ সাধিত হতে পারে, কিন্তু যদি সিদ্ধি লাভ না হয় তা হলে তার জাগতিক জীবন ও পারমার্থিক জীবন উভয়ই বিফলে যায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বধর্মের আচরণ না করলে তাকে সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়; তাই কেউ যদি যথাযথভাবে পরমার্থ সাধনে ব্যর্থ হয়, তা হলে শাস্ত্র নির্দেশিত স্বধর্ম আচরণ না করার জন্য তার ফল ভোগ করতে হয়। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের সংশয় দূর করবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অসফল পরমার্থবাদীকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, এক জীবনে পরমার্থ সাধনে সিদ্ধি লাভ না করতে পারলেও তাতে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। এমন কি যদিও স্বধর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান না করার জন্য তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ার অধীন হলেও, তাঁর ক্ষতির কোন কারণ নেই। কারণ, শুভ কৃষ্ণভাবনামৃত কখনও বিফলে যায় না এবং পরবর্তী জীবনে কেউ যদি অত্যন্ত নীচ বংশেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলেও তিনি ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত হন না। পক্ষান্তরে, কেউ যদি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মের আচার অনুষ্ঠান করে, কিন্তু অন্তরে যদি ভগবদ্ভক্তি না থাকে, তা হলে তার কোনই কল্যাণ হয় না।

এই তাৎপর্যে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষকে দুভাগে ভাগ করা যায়-সংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। যে সমস্ত মানুষ পরজন্মের কথা বিবেচনা না করে, পারমার্থিক মুক্তির কথা বিবেচনা না করে, কেবল পশুর মতো তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার চেষ্টা করে, তারা উচ্ছৃঙ্খল পর্যায়ভুক্ত। আর যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবন যাপন করে, তারা সংযত পর্যায়ভুক্ত। যারা উচ্ছৃঙ্খল, তারা উন্নত হোক বা অনুন্নতই হোক, সভ্য হোক বা অসভ্যই হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিতই হোক, শক্তিশালী হোক অথবা দুর্বলই হোক, তারা সকলেই পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের ক্রিয়াকলাপ কখনও মঙ্গলজনক হয় না, কারণ আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুনের মাধ্যমে পশুর মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে সুখের অন্বেষণ করার ফলে তারা চিরকালই দুঃখময় জড় জগতে পড়ে থাকে এবং নিরন্তর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংযত জীবন যাপন করে ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভক্তির পর্যায়ে উন্নীত হন, তাঁদের জন্ম হয় সার্থক। যাঁরা মঙ্গলজনক সংযত জীবন যাপন করেন, তাঁদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) 'কর্মী'- যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছেন। ২) 'মুক্তিকামী'- যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ৩) 'ভগবদ্ভক্ত'- যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে চলেছেন যে সমস্ত কর্মী, তাঁদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়-'সকাম কর্মী' ও 'নিষ্কাম কর্মী'। ধর্ম আচরণ করার প্রভাবে অর্জিত পুণ্যফলের বলে যাঁরা জড় সুখভোগ করতে চান, তাঁরা উন্নত জীবন প্রাপ্ত হন, এমন কি তাঁরা স্বর্গলোকও প্রাপ্ত হন। কিন্তু জড় সুখভোগ করার বাসনায় আসক্ত থাকার ফলে তাঁরা যথার্থ মঙ্গলজনক পথ অনুসরণ করছেন না। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাই হচ্ছে মঙ্গলজনক কার্যকলাপ। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে অথবা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে জীবকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যে কর্ম সাধিত হয় না, তা কোন মতেই মঙ্গলজনক নয়। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মই হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলময় কর্ম। এই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের পথে প্রগতির জন্য যিনি স্বেচ্ছায় সব রকম শারীরিক অসুবিধাগুলিকে সহ্য করেন, তিনি নিঃসন্দেহে তপোনিষ্ঠ পূর্ণযোগী।

অষ্টাঙ্গ-যোগেরও পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা, তাই এই প্রচেষ্টাও অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং যিনি এই মার্গে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তাঁরও কোন রকম অধঃপতনের সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ৪১

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ৷ ৪১ ॥

প্রাপ্য-লাভ করে; পুণ্যকৃতাম্-পুণ্যবানদের; লোকান্-লোকসমূহ; উষিত্বা-বাস করে; শাশ্বতীঃ-বহু, সমাঃ-বৎসর; শুচীনাম্-সদাচারী; শ্রীমতাম্-ধনীর; গেহে-গৃহে; যোগভ্রষ্টঃ-যোগ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি; অভিজায়তে জন্মগ্রহণ করেন।

গীতার গান

যদিবা হইল ভ্রষ্ট যোগের সাধনে।
তথাপি সে পায় সেই যাহা পুণ্যবানে ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ ধনী বণিকের ঘরে।
যোগভ্রষ্ট জন্ম লয় বিধির বিচারে ॥

অনুবাদ

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রীমান ধনী বণিকদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

যোগভ্রষ্ট যোগী দুই প্রকারের-এক শ্রেণী হচ্ছেন যাঁরা অল্প সাধনার পর পতিত হয়েছেন, আর অপর শ্রেণী হচ্ছেন যাঁরা দীর্ঘকাল যোগাভ্যাস করার পর ভ্রষ্ট হয়েছেন। অল্প সাধনার পর যাঁরা পতিত হয়েছেন, তাঁরা উচ্চতর লোকে যান, যেখানে পুণ্যবানেরা প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। সেখানে দীর্ঘকাল নানা রকম সুখভোগ করার পরে তাঁরা আবার এই জগতে ফিরে আসেন এবং সৎ ব্রাহ্মাহ্মণ বৈষ্ণব অথবা ধনী বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগসাধন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা, যা এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই রকমের লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই যদি কেউ মোহিনী মায়ার প্রভাবে ভ্রষ্ট হন, তা হলে ভগবানের কৃপায় তাঁরা তাঁদের জাগতিক কামনা-বাসনার তৃপ্তিসাধন করার পূর্ণ সুযোগ পান এবং তারপর ধার্মিক অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই ধরনের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করার সুযোগ পান। তাই, তাঁরা ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করে তাঁদের ভগবদ্ভক্তি সাধনে ব্রতী হওয়া উচিত।

শ্লোক ৪২

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ৷

অথবা অথবা; যোগিনাম্-যোগিদের; এব-অবশ্যই; কুলে-বংশে; ভবতি-জন্মগ্রহণ করেন; ধীমতাম্-জ্ঞানবান; এতৎ-এই; হি অবশ্যই; দুর্লভতরম্-অত্যন্ত দুর্লভ; লোকে-এই জগতে; জন্ম-জন্ম; যৎ-যে; ঈদৃশম্-এই প্রকার।

গীতার গান

অথবা যোগীর কুলে তার জন্ম হয়।
দুর্লভ সে সব জন্ম কিবা তার ভয় ॥
সে সব দুর্লভ জন্ম যদি কেহ পায়।
তারপর সঙ্গ দোষে যদি না ভ্রময় ॥

অনুবাদ

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার জন্ম এই জগতে অবশ্যই অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান যোগী এবং পরমার্থবাদী সাধকের কুলে জন্ম হওয়ার প্রশংসা করেছেন। কারণ, এই কুলে জন্ম হওয়ার ফলে জীবনের শুরু থেকেই পরমার্থ সাধনের প্রেরণা লাভ করা যায়, বিশেষ করে আচার্য অথবা গোস্বামী পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলে। পরম্পরা এবং শিক্ষার প্রভাবে এই কুল বিদ্বান ও ভক্তিযুক্ত হয়, তাই তাঁরা গুরুপদ প্রাপ্ত হতেন। ভারতবর্ষে এই রকম বহু আচার্য পরিবার আছে, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা ও সংযমের অভাবে তারা অধঃপতিত হয়েছে। ভগবানের কৃপার ফলে কোন কোন পরিবারে পুরুষানুক্রমে সাধক উৎপন্ন হয়। এই রকম পরিবারে জন্ম লাভ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আচার্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও আমি স্বয়ং এই রকম পরিবারে জন্ম লাভ করেছি এবং জীবনের প্রারম্ভেই আমরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। দৈব বিধান অনুসারে পরবর্তীকালে আমরা মিলিত হয়েছি।

শ্লোক ৪৩

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন । ৪৩ ॥

তত্র-তার ফলে; ত্বম্ সেই; বুদ্ধিসংযোগম্-পরমাত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগ; লভতে-লাভ করেন; পৌর্ব-পূর্ব; দেহিকম্-জন্মকৃত; যততে-যত্ন করেন; চ-ও; ততঃ-তারপর; ভূয়ঃ-পুনরায়; সংসিদ্ধৌ-সিদ্ধি লাভের জন্য; কুরুনন্দন-হে কুরুপুত্র।

গীতার গান

বুদ্ধির সংযোগে পূর্ব দেহে যে সাধিল।
হে কুরুনন্দন জান সেই নিশ্চয়ই বুঝিল ॥
তবে বুদ্ধিমান করে পুনঃ যোগের সাধন।
দৃঢ় চেষ্টা করি যোগী পুনঃ সিদ্ধ হন ॥

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন। সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি পুনরায় তাঁর পূর্ব জন্মকৃত

পারমার্থিক চেতনার বুদ্ধিসংযোগ লাভ করে সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন।

তাৎপর্য

পূর্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে সৎ ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করে পারমার্থিক চেতনার বিকাশ করার খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা পাই মহারাজ ভরতের মাধ্যমে। মহারাজ ভরত ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং তাঁরই নামানুসারে স্বর্গের দেবতাদের কাছেও এই গ্রহের নাম হয় ভারতবর্ষ। পূর্বে নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ। পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করবার জন্য ভরত মহারাজ খুব অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করেন কিন্তু তিনি সিদ্ধি লাভে অক্ষম হন। পরবর্তী জীবনে তিনি এক সৎ ব্রাহ্মাণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না এবং কারও সঙ্গে কথা বলতেন না বলে তাঁর নাম হয় জড় ভরত। পরবর্তীকালে মহারাজ রহগণ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তিনি পরম ভাগবত। জড় ভরতের জীবনের মাধ্যমে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, পারমার্থিক সাধনা বা যোগসাধনা কখনই বিফলে যায় না। ভগবানের কৃপার ফলে পরমার্থ সাধকেরা কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধি লাভ করবার জন্য বারবার সুযোগ পান।

শ্লোক ৪৪

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ 88

পূর্ব-পূর্ব; অভ্যাসেন-অভ্যাসের দ্বারা; তেন-সেভাবে; এব-অবশ্যই; হ্রিয়তে-আকৃষ্ট হন; হি-নিশ্চিতভাবে; অবশঃ-অবশ হয়ে; অপি-ও; সঃ-তিনি; জিজ্ঞাসুঃ-জানতে ইচ্ছুক; অপি-এমন কি; যোগস্য-যোগের; শব্দব্রহ্ম-বেদোক্ত কর্মমার্গ; অতিবর্ততে-অতিক্রম করেন।

গীতার গান

স্বাভাবিক ভাবে সেই ইচ্ছার উদ্যম।
আকৃষ্ট হইয়া করে সে কার্যে উদ্যম ।
জিজ্ঞাসু যদি বা হয় যোগের বিষয়।
তথাপি সে কর্মকাণ্ড অতীত তরয় ।।

অনুবাদ

তিনি পূর্ব জন্মের অভ্যাস বশে যেন অবশ হয়ে যোগ-সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রকার যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষ বেদোক্ত সকাম কর্মমার্গকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকাম কর্মমার্গে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, তার থেকে উৎকৃষ্ট ফল লাভকরেন।

তাৎপর্য

উচ্চ স্তরের যোগীরা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট নন, কিন্তু তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই যোগ-পদ্ধতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, যা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উন্নীত করে। এই কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে পরমার্থ সাধনের সর্বোচ্চ স্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৭) বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উন্নত পরমার্থবাদীর নিরাসক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্মুরার্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যেতে ॥

"হে ভগবান। চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি কেউ তোমার অপ্রাকৃত নাম কীর্তন করেন, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত। যিনি ভগবানের নাম করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বেই সব রকমের তপশ্চর্যা, যাগ-যজ্ঞ, তীর্থস্নান ও শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন।"
এই সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠাকুর হরিদাস, যাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্যতম পার্ষদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নামাচার্যরূপে ভূষিত করেছিলেন, কেন না তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিন লক্ষ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র- হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করেছিলেন। যেহেতু তিনি নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করতেন, এর থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ব জন্মে তিনি শব্দব্রহ্ম নামক বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। অতএব শুদ্ধ না হলে ভগবদ্ভক্তি লাভকরা যায় না এবং ভগবানের অপ্রাকৃত নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না।

শ্লোক ৪৫

প্রযত্নাদ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিলিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রযত্নাৎ-যত্ন অপেক্ষা; যতমানঃ-যত্নবান; তু-কিন্তু; যোগী-এই প্রকার যোগী; সংশুদ্ধ-বিশুদ্ধ; কিল্বিঃ-সর্বপ্রকার পাপ; অনেক বহু; জন্ম-জন্ম; সংসিদ্ধঃ -সিদ্ধি লাভ করে; ততঃ-তারপর; যাতি লাভ করেন; পরাম্-পরম; গতিম্-গতি।

গীতার গান

যত্নমাত্র করি যোগী কার্যসিদ্ধি করে।
জন্ম-জন্মান্তরে সিদ্ধ ভবার্ণব তরে ।

অনুবাদ

যোগী 'ইহজন্মে পূর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করে পাপ মুক্ত হয়ে পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে পরম গতি লাভকরেন।

তাৎপর্য

ধর্মপরায়ণ, সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে মানুষ পরমার্থ সাধন করবার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাঁর অসম্পূর্ণ সাধনাকে পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন এবং এভাবেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন। কৃষ্ণভাবনাই হচ্ছে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) বলা হয়েছে-

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্যকর্মের ফলে কেউ যখন পাপ ও জড় জগতের মোহময় দ্বন্দ্ব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তিনি দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।"

শ্লোক ৪৬

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥
তপস্বিভ্যঃ-তপস্বীদের চেয়ে; অধিকঃ-শ্রেষ্ঠ; যোগী-যোগী; জ্ঞানিভ্যঃ-জ্ঞানীদের চেয়ে; অপি-ও; মতঃ-মত; অধিকঃ-শ্রেষ্ঠ; কর্মিভ্যঃ-সকাম কর্মীদের চেয়ে; চ-ও; অধিকঃ-শ্রেষ্ঠ; যোগী-যোগী; তস্মাৎ-অতএব; যোগী-যোগী; ভব-হও; অর্জুন-হে অর্জুন।

গীতার গান

তপস্বী সে যত আছে, সব নিম্ন যোগী কাছে,
জ্ঞানী নহে তার সমতুল্য।
কর্মীর কি কথা আর, কোথায় তুলনা তার,
হে অর্জুন! যোগী হও যোগ্য ।

অনুবাদ

যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন। সর্ব অবস্থাতেই তুমি যোগী হও।

তাৎপর্য

যোগের অর্থ হচ্ছে পরম-তত্ত্বের সঙ্গে চেতনের সংযোগ। বিভিন্ন পন্থা অনুসারে এই যোগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কর্মের মাধ্যমে যখন চেতনাকে ভগবানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কর্মযোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যখন ভগবানকে জানবার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং ভক্তির মাধ্যমে যখন ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। সমস্ত যোগের চরম পরিণতি বা পরম পূর্ণতা হচ্ছে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে, এই যোগ ভক্তিযোগের থেকে শ্রেয়। ভক্তিযোগ হচ্ছে পরম তত্ত্বজ্ঞান এবং তাকে কোন কিছুই অতিক্রম করতে পারে না। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তপশ্চর্যার কোন তাৎপর্য নেই। ভগবানে শরণাগতি না হলে গবেষণামূলক জ্ঞানও সম্পূর্ণ নিরর্থক। আর কৃষ্ণভাবনা-বিহীন সকাম কর্ম কেবল সময় নষ্ট করারই নামান্তর। তাই, সমস্ত যোগের মধ্যে ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাংস মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥
যোগিনাম্-যোগীদের; অপি-ও; সর্বেষাম্-সর্বপ্রকার; মদ্গতেন- আমাতেই আসক্ত; অন্তরাত্মনা-অন্তরে সব সময় আমার কথা চিন্তা করে; শ্রদ্ধাবান্-পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে; ভজতে-ভজনা করেন; যঃ-যিনি; মাম্-আমাকে (পরমেশ্বর ভগবানকে); সঃ-তিনি; মে-আমার; যুক্ততমঃ-সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মতঃ-অভিমত।

গীতার গান

যত যোগী প্রকার সে শাস্ত্রেতে নির্ণয়।
তার মধ্যে মদ্গতপ্রাণ যেবা কেহ হয় ।
সবার সে শ্রেষ্ঠ যোগী জানিহ নিশ্চয়।
শ্রদ্ধাবান যদি সেই আমারে ভজয় ॥

অনুবাদ

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

এখানে ভজতে শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভজ ধাতু থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'সেবা' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। পূজা করা এবং ভজনা করা-এই দুটি শব্দের অর্থ এক নয়। পূজা করার অর্থ পূজ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করা। কিন্তু ভজনা করার অর্থ হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি সহকারে সেবা করা, যা কেবল ভগবানেই প্রযোজ্য। পূজ্য ব্যক্তিকে অথবা দেবতাকে পূজা না করলে মানুষ কেবল শিষ্টাচারহীন অভদ্র বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে ভগবানের সেবা না করা নিন্দনীয় অপরাধ। প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ, তাই প্রতিটি জীবেরই ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। তা না করার ফলেই তার অধঃপতন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের ভজনা না করে, যে তার কর্তব্যে অবহেলা করে, সে অবধারিতভাবে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।"

এই শ্লোকেও ভজন্তি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেই কেবল ভজন্তি কথাটি প্রযোজ্য, কিন্তু 'পূজা' শব্দটি দেব-দেবী ও অন্যান্য মহৎ জীবের বেলায় ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের অবজানন্তি শব্দটির উল্লেখ ভগবদ্গীতাতেও পাওয়া যায়। অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ- "যারা অত্যন্ত মূঢ়, তারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থভাবে জানতে না পেরে অবজ্ঞা করে।" ভগবানের প্রতি সেবার মনোবৃত্তি ছাড়াই এই সব মূঢ়রা ভগবদ্গীতার তাৎপর্য লেখার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তাই তারা ভজন্তি ও 'পূজা' এই শব্দ দুটির মধ্যে যে কি পার্থক্য তা নিরূপণ করতে পারে না।

সব রকমের যোগ-সাধনার চরম পরিণতি হচ্ছে ভক্তিযোগ। অন্যান্য সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বা ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়া। 'যোগ' বলতে প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগকেই বোঝায়। আর অন্য সমস্ত যোগগুলি ক্রমান্বয়ে ভক্তিযোগেই যুক্ত হয়। কর্মযোগ থেকে শুরু করে ভক্তিযোগের শেষ পর্যন্ত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক সুদীর্ঘ পথ। নিষ্কাম কর্মযোগ থেকেই এই পথের শুরু। কর্মযোগের মাধ্যমে যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন সেই স্তরকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যখন জ্ঞানযোগের সঙ্গে ধ্যান যুক্ত হয়ে মনকে পরমাত্মার উপর একাগ্র করা হয়, তখন তাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ। অষ্টাঙ্গ-যোগকে অতিক্রম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই হচ্ছে ভক্তিযোগ। প্রকৃতপক্ষে, এই ভক্তিযোগই হচ্ছে চরম পরিণতি। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভক্তিযোগের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে অন্য সমস্ত যোগ সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। যে যোগী প্রগতিশীল, তিনি পরমার্থ সাধনের পথে বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু প্রগতিবিহীন হয়ে কেউ যখন কোন এক স্তরে স্থির হয়ে

পড়ে, তখন তাকে সেই বিশেষ স্তরের নামানুসারে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, রাজযোগী, হঠযোগী আদি নামে অভিহিত করা হয়। পরম সৌভাগ্যের ফলে কেউ যখন ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি অন্য সব যোগের স্তর ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছেন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে কৃষ্ণভক্ত হওয়াই যোগমার্গের সর্বোচ্চ শিখর। যেমন, আমরা যখন হিমালয় পর্বতের কথা বলি, তখন আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা সম্পর্কে বলি, এই হিমালয়ের আবার সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট।

অনেক সৌভাগ্যের ফলে মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী এই যোগ অনুশীলন করে। আদর্শ যোগী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়, কারণ তাঁর অঙ্গকান্তি জলভরা মেঘের মতো নীলাভ, তাঁর পদ্মের মতো মুখারবিন্দ সূর্যের মতো প্রফুল্লোজ্জ্বল, তাঁর বসন মণি-রত্নের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর শ্রীঅঙ্গ ফুলমালায় সুশোভিত। তাঁর দিব্য অঙ্গকান্তি ব্রহ্মজ্যোতির সর্ব ঐশ্বর্যময়ী প্রভায় সর্বদিক উদ্ভাসিত। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবরাহদেব এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অবতরণ করেন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী-তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মাতা যশোদার নন্দনরূপে সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, বাসুদেব আদি নামে পরিচিত হন। তিনি হচ্ছেন আদর্শ সন্তান, আদর্শ পতি, আদর্শ সখা, আদর্শ প্রভু। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এবং অপ্রাকৃত গুণাবলীতে বিভূষিত। ভগবানের এই স্বরূপ যিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধির এই স্তর লাভ হয় ভক্তিযোগের মাধ্যমে, যা বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে-

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ।।

"যে সমস্ত মহাত্মারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভকরেছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩)

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কাম্। "ভক্তি মানে হচ্ছে লৌকিক অথবা পারলৌকিক সব রকম বিষয়-বাসনা রহিত ভগবৎ-সেবা। বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে তন্ময় করা। সেটিই হচ্ছে নৈষ্কর্মের উদ্দেশ্য।"

(গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১৫)

এগুলি হচ্ছে যোগপদ্ধতির সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর-ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার কয়েকটি উপায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-ধ্যানযোগ নামক শ্রীমদ্ভগবদগীতার যষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় - বিজ্ঞান-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ।। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়ি-আমাতে; আসক্তমনাঃ-অভিনিবিষ্ট চিত্ত; পার্থ-হে পৃথার পুত্র; যোগম্-যোগ; যুঞ্জন-যুক্ত হয়ে; মদাশ্রয়ঃ-আমার ভাবনায় ভাবিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনা); অসংশয়ম্ নিঃসন্দেহে; সমগ্রম্-সম্পূর্ণরূপে; মাম্-আমাকে; যথা-যেরূপে; জ্ঞাস্যসি-জানবে; তৎ-তা; শৃণু-শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:
আমাতে আসক্ত হয়ে যোগের সাধন।
তোমারে কহিনু পার্থ সব এতক্ষণ ॥
সে যোগ আশ্রয় করি সমগ্র যে আমি।
অসংশয় বুঝিবে যে অনিবার্য তুমি ॥
শুন পার্থ সেই কথা তোমাকে যে কহি।
ভক্তিযোগ শুদ্ধ সত্ত্ব যাতে তুষ্ট রহি ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন-হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই সপ্তম অধ্যায়ে ভগবৎ-তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাঁর এই সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ কিভাবে হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চার ধরনের সৌভাগ্যবান লোক ভগবানের শ্রীচরণে আসক্ত হন এবং চার ধরনের হতভাগ্য লোক কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন না, তাঁদের কথাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার চিন্ময় আত্মা এবং বিভিন্ন যোগ-সাধনার মাধ্যমে সে চিন্ময় স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় নিযুক্ত করা বা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়াই সর্বপ্রকার যোগ-সাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে একাগ্র করার মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়, এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তা সম্ভব নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মা উপলব্ধি পরম-তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান নয়, কেন না তা হচ্ছে আংশিক উপলব্ধি। পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের কাছে সব কিছুই পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার ফলে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম জ্ঞান। বিভিন্ন প্রকার যোগ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে পদক্ষেপ মাত্র। সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যিনি ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি

অনায়াসে ব্রহ্মাতত্ত্ব ও পরমাত্মাতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত হন। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে সব কিছুই পরিপূর্ণরূপে জানতে পারা যায়। তখন সর্বতোভাবে জানা যায় ভগবান কে, জীব কি, জড়া প্রকৃতি কি এবং তাদের প্রকাশ কিভাবে হয়। তাই, ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন শুরু করা উচিত। নববিধা ভক্তির মাধ্যমে মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন করা যায়। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রবণম্। ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন, তচ্ছৃণু অর্থাৎ "আমার কাছ থেকে শ্রবণ কর।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই, আর তাই তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করলে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ হয়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করা যায়। তাই এই জ্ঞান সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হয়-কেতাবি বিদ্যায় অহঙ্কারী, অভক্ত ভুঁইফোড়ের কাছ থেকে নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির এই পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

"বৈদিক শাস্ত্রসমূহ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলে অথবা ভগবদ্গীতা থেকে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করলে কল্যাণ হয়। কেউ যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকলের অন্তরে বিরাজমান, তিনি পরম বন্ধুর মতো তাঁর হৃদয়কে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করেন। এভাবেই ভক্তের হৃদয়ে সুপ্ত পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে তিনি যত কৃষ্ণকথা শোনেন, ততই তাঁর অন্তরে ভগবদ্ভক্তি সুদৃঢ় হয়। ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হওয়ার ফলে রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং এভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি অন্তর্হিত হয়। এই সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে ভগবদ্ভক্ত তখন শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তখন আন্তরিকভাবে ভগবৎ-সেবায় সঞ্জীবিত হন এবং পরিপূর্ণরূপে ভগবৎ-তত্ত্বের বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। এভাবেই ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে জড় আসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং মানুষ তখন অচিরেই অসংশয়ং সমগ্রম্, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হন।" (ভাগবত ১/২/১৭-২১)

তাই, কৃষ্ণতত্ত্বের বিজ্ঞান বুঝতে হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের কাছ থেকে।

শ্লোক ২

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জাত্বা নেহ ভুয়োহন্যজজ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

জ্ঞানম্-জ্ঞানের কথা; তে-তোমাকে; অহম্-আমি; স বিজ্ঞানম্-বিজ্ঞান সমন্বিত; ইদম্-এই; বক্ষ্যামি বলব; অশেষতঃ-পূর্ণরূপে; যৎ-যা; জ্ঞাত্বা-জেনে; ন-না; ইহ-এই জগতে; ভূয়ঃ-পুনরায়; অন্যৎ-আর কিছু; জ্ঞাতব্যম্-জানবার; অবশিষ্যতে বাকি থাকে।

গীতার গান

আমার বিষয়ে যে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান।
সে বিষয়ে অশেষত শুন দিয়া মন ।।
জানিলে সে তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাতব্য বিষয়।
সহজেই সব তত্ত্ব সমাধান হয় ॥

অনুবাদ

আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞান সমন্বিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলব, যা জানা হলে এই জগতে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না।

তাৎপর্য

পূর্ণজ্ঞান বলতে প্রপঞ্চময় জগৎ, এর পশ্চাতে চেতন ও উভয়ের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত জ্ঞান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে অর্জুন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সখা। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান সেই কথা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখানেও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভগবানের ভক্তই কেবল গুরু-পরম্পরা ধারায় সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই, যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে সমস্ত জ্ঞানের উৎসকে জানবার প্রয়াসী হতে হয়, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের কারণ এবং সমস্ত যোগ-সাধনায় ধ্যানের একমাত্র বিষয়বস্তু। যখন সমস্ত কারণের কারণকে জানা যায়, তখন যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সবই জানা হয়ে যায় এবং আর কোন কিছুই অজানা থাকে না। বেদে (মুণ্ডক উপনিষদ ১/৩) বলা হয়েছে-কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

শ্লোক ৩

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

মনুষ্যাণাম্ মানুষের মধ্যে; সহস্রেযু-হাজার হাজার; কশ্চিৎ-কোন একজন; যততি-যত্ন করেন; সিদ্ধয়ে-সিদ্ধি লাভের জন্য; যততাম্-সেই প্রকার যত্নশীল; অপি-বাস্তবিকই; সিদ্ধানাম্-সিদ্ধদের; কশ্চিৎ-কেউ; মাম্-আমাকে; বেত্তি-জানতে পারেন; তত্ত্বতঃ-স্বরূপত।

গীতার গান

সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন একজন।
সিদ্ধিলাভ করিবারে করয়ে যতন ॥
যত্নশীল সেই কার্যে কোন একজন।
সিদ্ধিলাভ করিবারে উপযুক্ত হন ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তত্ত্বত।
বুঝিতে সমর্থ হন বিবেকবশত ॥

অনুবাদ

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে নানা রকম মানুষ আছে এবং হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দুই-একজন কেবল আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য পরমার্থ সাধনের যথার্থ প্রয়াসী হন। সাধারণ অবস্থায় মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করে, অর্থাৎ তার একমাত্র চিন্তা হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। কদাচিৎ কেউ দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহী হয়। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা কেবল সেই সাধকেরই আছে, যাঁরা আত্মজ্ঞান তথা পরমাত্ম জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও বিবেক, বুদ্ধি আদি আত্মানুভূতির মার্গ অনুগমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তেরাই কেবল কৃষ্ণকে জানতে পারেন। অন্য অধ্যাত্মবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন, কারণ তা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির চেয়ে সহজ। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা জ্ঞানেরও অতীত। যোগীরা ও জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যান। যদিও নির্বিশেষবাদীদের অগ্রগণ্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে স্বীকার করে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তবুও তাঁর অনুগামীরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে মানতে চায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা খুবই দুঃসাধ্য, এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি হওয়ার পরেও কৃষ্ণতত্ত্ব সুদুর্বোধ্য থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণ, আদি পুরুষ গোবিন্দ। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ / অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্। অভক্তদের পক্ষে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। যদিও তারা বলে, ভক্তিমার্গ অতি সহজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তার অনুগমন করতে পারে না। ভক্তিমার্গ যদি এতই সহজ হয়, তা হলে তারা তা পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ নির্বিশেষ পথ গ্রহণ করে কেন? প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিমার্গ সহজ নয়। তথাকথিত কোন মনগড়া পন্থায় ভক্তিযোগ অনুশীলন করা সহজ হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যথার্থ ভক্তিযোগ অনুশীলন করা মনোধর্মী জ্ঞানী ও দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, তারা অচিরেই ভক্তিমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ২/১০১) শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন-

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রবিধির অনুগামী না হয়ে যে ভগবদ্ভক্তি, তা কেবল সমাজে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।”

ব্রহ্মবেত্তা নির্বিশেষবাদী অথবা পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ যোগী কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দন অথবা পার্থসারথি রূপকে জানতে পারে না। এমন কি মহা মহিমাময় দেবতারাও কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন (মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ)। মাং তু বেদ ন কশ্চন-ভগবান নিজেই বলেছেন, "কেউই আমাকে তত্ত্বত জানতে পারে না।" আর কেউ যদি তাঁকে জেনে থাকে, তবে স মহাত্মা সুদুর্লভঃ-"এমন মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" এভাবেই ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করলে, মহাপণ্ডিত অথবা দার্শনিকেরাও শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারে না। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের সর্বকারণ-কারণত্ব, সর্বশক্তি, শ্রী, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য আদি অচিন্ত্য চিন্ময় গুণসমূহ কিঞ্চিৎরূপে জানেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহশীল। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা-উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা। তাই ভক্তেরাই কেবল তাঁকে তত্ত্বত উপলব্ধি

করতে পারেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ।

"জড় স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৩৪)।

শ্লোক ৪

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমিঃ-মাটি; আপঃ-জল; অনলঃ-অগ্নি; বায়ুঃ-বায়ু; খম্-আকাশ; মনঃ-মন; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; এব-অবশ্যই; চ-এবং; অহঙ্কার-অহঙ্কার; ইতি-এভাবে, ইয়ম্-এই সমস্ত; মে-আমার; ভিন্না-ভিন্ন; প্রকৃতিঃ-প্রকৃতি; অষ্টধা-অষ্টবিধ।

গীতার গান

ভূমি জল অগ্নি বায়ু বুদ্ধি যে আকাশ।
আর অহঙ্কার মন বুদ্ধির প্রকাশ ॥
এই সব অষ্ট প্রকারের হয় যে প্রকৃতি।
ভিন্না সেই আমা হতে বাহির বিভূতি ॥

অনুবাদ

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-এই আট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

তাৎপর্য

ভগবৎ-বিজ্ঞান ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। ভৌতিক শক্তিকে প্রকৃতি বা ভগবানের বিভিন্ন পুরুষাবতারের শক্তি বলা হয়। সেই সম্বন্ধে সাত্বত-তন্ত্রে বলা হয়েছে-

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

"প্রাকৃত সৃষ্টির নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ তিনজন বিষ্ণুরূপে প্রকট হন। প্রথম মহাবিষ্ণু মহৎ-তত্ত্ব নামে সম্পূর্ণ ভৌতিক শক্তির সৃজন করেন। দ্বিতীয়, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ সৃষ্টি করবার জন্য তাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয়, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মারূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হন। এমন কি, তিনি পরমাণুগুলির মধ্যেও বিরাজ করেন। এই তিন বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের যোগ্য।"

এই জড় জগৎ ভগবানের অনন্ত শক্তির একটির সাময়িক প্রকাশ। জড় জগতের প্রতিটি কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ এই তিন বিষ্ণুর পরিচালনায় সাধিত হয়। তাঁদের বলা হয় ভগবানের পুরুষ-অবতার। সাধারণত যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎটি জীবের ভোগের জন্য এবং জীবই

হচ্ছে পুরুষ-প্রকৃতির কারণ, নিয়ন্তা ও ভোক্তা। ভগবদ্গীতা অনুসারে এই নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জড় সৃষ্টির আদি কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। জড়া সৃষ্টির যে সমস্ত উপাদান তা হচ্ছে ভগবানেরই ভিন্না শক্তি। এমন কি নির্বিশেষবাদীদের পরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতিও হচ্ছে পরব্যোমে অভিব্যক্ত ভগবানেরই একটি চিন্ময় শক্তি।
বৈকুণ্ঠলোকের মতো ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই এবং নির্বিশেষবাদীরা এই ব্রহ্মজ্যোতিকেই তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে। পরমাত্মার প্রকাশও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অস্থায়ী সর্বব্যাপক রূপ। চিন্ময় জগতে পরমাত্মা রূপের অভিব্যক্তি নিত্য শাশ্বত নয়। সুতরাং, যথার্থ পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পূর্ণ শক্তিমান পুরুষ এবং তিনি বিভিন্ন অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি সমন্বিত।
পূর্বের উল্লেখ অনুসারে জড়া প্রকৃতি প্রধান আটটিরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি-মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত বা স্থূল সৃষ্টি। তাদের মধ্যে নিহিত আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভৌত জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। জড় বিজ্ঞানে এই দশটি তত্ত্বই আছে, আর কিছুই নেই। কিন্তু অন্য তিনটি তত্ত্ব-মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সম্পর্কে জড়বাদীরা কোন গুরুত্ব দেয় না। সব কিছুর পরম 'উৎস শ্রীকৃষ্ণকে না জানার ফলে মনোধর্মী দার্শনিকেরা কখনই পূর্ণজ্ঞানী হতে পারে না। 'আমি' ও 'আমার' -এই মিথ্যা অহঙ্কারই জড় অস্তিত্বের মূল কারণ এবং এর মধ্যে বিষয় ভোগের জন্য দশটি ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয়। বুদ্ধি বলতে মহৎ-তত্ত্ব নামক সমগ্র প্রাকৃত সৃষ্টিকে বোঝায়। এভাবেই ভগবানের ভিন্না আটটি শক্তি থেকে জড় জগতের চরিশটি তত্ত্বের প্রকাশ হয়, যা নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু। এই ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দার্শনিকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে জানতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তিই সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু, যা ভগবদ্গীতাতেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অপরা-নিকৃষ্টা; ইয়ম্-এই: ইতঃ-ইহা ব্যতীত; তু-কিন্তু; অন্যাম্-আর একটি; প্রকৃতিম্-প্রকৃতি: বিদ্ধি-অবগত হয়; মে-আমার; পরাম্-উৎকৃষ্টা; জীবতাম্-জীবস্বরূপা: মহাবাহো-হে মহাবীর; যয়া-যার দ্বারা; ইদম্-এই: ধার্যতে-ধারণ করে আছে; জগৎ-জড় জগৎ।

গীতার গান

অনুৎকৃষ্টা তারা সহ উৎকৃষ্টা তা হতে।
প্রকৃতি আর এক যে আছয়ে আমাতে ॥
জীবভূতা সে প্রকৃতি শুন মহাবাহো।
জীব দ্বারা ধার্য জড়া জান অহরহ ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই

প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টা শক্তির অন্তর্গত। ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তিই হচ্ছে জড় জগৎ, যা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক উপাদানগুলির দ্বারা প্রকাশিত -হয়েছে। জড় জগতে স্থূল পদার্থ-ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এবং সূক্ষ্ম পদার্থ-মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সবগুলিই ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অনুৎকৃষ্টা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করছে যে জীব, সে হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি এবং এই শক্তির প্রভাবেই সমস্ত জড় জগৎ সক্রিয় হয়ে আছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীবের দ্বারা সক্রিয় না হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কর্মই সাধিত হয় না। শক্তি সব সময়ই শক্তিমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই, জীব সর্বদাই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে-তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কিছু নির্বোধ লোক মনে করে যে, জীব ভগবানের মতোই শক্তিশালী। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, জীব কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। জীব ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/৩০) বলা হয়েছে-

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভূতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥

"হে শাশ্বত পরমেশ্বর! দেহধারী জীব যদি তোমার মতোই শাশ্বত ও সর্বব্যাপক হত, তা হলে তারা কখনই তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন হত না। কিন্তু তারা যদি তোমার অনন্ত শক্তির অণুসদৃশ অংশ হয়, তা হলে তারা সর্বতোভাবে তোমার পরম নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাই, তোমার শরণাগত হওয়াই হচ্ছে জীবের প্রকৃত মুক্তি এবং এই শরণাগতি জীবকে প্রকৃত আনন্দ দান করে। সেই স্বরূপে অবস্থান করলে তবেই তারা নিয়ন্তা হতে পারে। সুতরাং, যে সমস্ত মূর্খ মানুষ অদ্বৈতবাদের প্রচার করে বলে যে, ভগবান ও জীব সর্বতোভাবে সমান, তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ও কলুষিত চিন্তাধারা নিয়ে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্যদেরও বিপথে পরিচালিত করছে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সব জীবেরা ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কারণ গুণগতভাবে তার অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু ক্ষমতার বিচারে তারা কখনই ভগবানের সমকক্ষ নয়। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব যখন সূক্ষ্ম ও স্থূল অনুৎকৃষ্ট। শক্তিকে ভোগ করে, তখন সে তার প্রকৃত চিন্ময় মন ও বুদ্ধিকে ভুলে যায়। জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে জীবের এই বিস্মরণ ঘটে। কিন্তু জীব যখন মায়ার মোহময় - জড়া শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়। জড়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অহঙ্কারের প্রভাবে জীব মনে করে যে, সে তার দেহ এবং এই দেহকে কেন্দ্র করে যা কিছু, তা সবই তার। যখনই সে তার অজ্ঞতা-জনিত জড়া শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখনই সে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়। আবার ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে দুরভিসন্ধি, সেটিও একটি মস্ত বড় বন্ধন। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বন্ধন। তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করতে হয়। এখানে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জীব হচ্ছে তাঁর অনন্ত শক্তির একটি শক্তিমাত্র; এই শক্তি যখন জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করে,

তখন সে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে মুক্তি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৬

এতদযোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

এতৎ-এই দুটি প্রকৃতি থেকে; যোনীনি-উৎপন্ন হয়েছে, ভূতানি-জড় ও চেতন সব কিছু; সর্বাণি-সমস্ত; ইতি-এভাবে; উপধারয়-জ্ঞাত হও; অহম্-আমি: কৃৎস্নস্য-সমগ্র; জগতঃ-জগতের; প্রভবঃ-উৎপত্তির কারণ; প্রলয়ঃ-প্রলয়; তথা-এবং।

গীতার গান

এই দুই প্রকৃতি সে নাম পরাপরা।
সর্বভূত যোনি তারা জান পরম্পরা ॥
যেহেতু প্রকৃতি দুই আমা হতে হয়।
জগতের উৎপত্তি লয় আমি সে নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।

তাৎপর্য

বিশ্বচরাচরে যা কিছু বর্তমান তা সবই জড় ও চেতন থেকে উৎপন্ন। চেতন হচ্ছে সৃষ্টির আধার এবং জড় বস্তু এই চেতনতত্ত্ব দ্বারা রচিত। এমন নয় যে, জড়ের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন এক পর্যায়ে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই চিন্ময় শক্তি থেকেই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এই জড় দেহটিতে চিৎ-শক্তি বা আত্মা আছে বলেই এই দেহটির বৃদ্ধি হয়, বিকাশ হয়; একটি শিশু ধীরে ধীরে বালকে পরিণত হয়, তারপরে সে যুবকে পরিণত হয়, কারণ ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি আত্মা সেই দেহতে রয়েছে। ঠিক তেমনই, এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও বিকাশ হয় পরমাত্মা বিষ্ণুর অবস্থিতির ফলে। তাই চেতন ও জড়, যাদের সমন্বয়ের ফলে এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, তারা হচ্ছে মূলত ভগবানেরই দুটি শক্তি। সুতরাং, ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। ভগবানের অণুসদৃশ অংশ জীব একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা, একটি বৃহৎ কারখানা অথবা একটি বড় শহর গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে কখনও একটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গড়তে পারে না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হচ্ছেন বৃহৎ আত্মা বা পরমাত্মা। আর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় আত্মার কারণ। তাই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের মূল কারণ। সেই কথা প্রতিপন্ন করে কঠ উপনিষদে (২/২/১৩) বলা হয়েছে-নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।

শ্লোক ৭

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

মত্তঃ-আমার থেকে; পরতরম্ শ্রেষ্ঠ; ন-না; অন্যৎ-অন্য; কিঞ্চিৎ-কিছু: অস্তি-আছে, ধনঞ্জয়-হে ধনঞ্জয়; ময়ি-আমাতে; সর্বম্-সব কিছু; ইদম্-এই; প্রোতম্-গাঁথা; সূত্রে-সূত্রে; মণিগণাঃ-মণিসমূহের; ইব-মতন।

গীতার গান

আমাপেক্ষা পরতত্ত্ব শুন ধনঞ্জয় ।
পরাৎপর যে তত্ত্ব অন্য কেহ নয় ॥
আমাতেই সমস্ত জগৎ আছে প্রতিষ্ঠিত।
সূত্রে যেন গাঁথা থাকে মণিগণ যত ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়। আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব সবিশেষ না নির্বিশেষ এই সম্বন্ধে বহু আলোচিত মতবিভেদ আছে। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং প্রতি পদক্ষেপেই আমরা সেই সত্যের প্রমাণ পাই। বিশেষ করে এই শ্লোকটিতে পরমতত্ত্ব যে সবিশেষ পুরুষ, তা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতাতেও বলা হয়েছে- ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অর্থাৎ, পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, তিনিই হচ্ছেন আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ব্রহ্মার মতো মহাজনদের কাছ থেকে যখন আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, তখন আর তাঁর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। নির্বিশেষবাদীরা অবশ্য বৈদিক ভাষ্য মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৩/১০) এই শ্লোকটির উল্লেখ করে তর্ক করে-ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ / য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তাথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি। "এই জড় জগতে ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব। সুর, অসুর ও মানুষের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মার ও ঊর্ধ্বে এক অপ্রাকৃত তত্ত্ব বর্তমান, যাঁর কোন জড় আকৃতি নেই এবং যিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাঁকে যে জানতে পারেন, তিনি এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করতে পারেন। আর যারা তাঁকে জানতে পারে না, তারা এই জড় জগতে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে।"

নির্বিশেষবাদীরা এই শ্লোকের অরূপম্ শব্দটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এই অরূপম্ শব্দটির অর্থ নির্বিশেষ নয়। এর দ্বারা ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ব্রহ্মসংহিতার উপরে উদ্ধৃত অংশে ব্যক্ত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্যান্য শ্লোকেও (৩/৮-৯) সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে-

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥

"আমি সেই পরমেশ্বরকে জানি, যিনি সর্বতোভাবে সংসারের সকল অজ্ঞানতার অন্ধকারের অতীত। যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই কেবল জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারেন। এই পরম পুরুষের জ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই মুক্তি লাভ করা

যায় না।
"এই পরম পুরুষের অতীত আর কোন সত্য নেই, কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর এবং তিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর। একটি গাছের মতো মৌনভাবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং তিনি সমস্ত পরব্যোমকে আলোকে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। একটি গাছ যেমন তার শিকড় বিস্তার করে, তিনিও তেমনই তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে বিস্তৃত করেছেন।"
এই সমস্ত শ্লোক থেকে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, যিনি তাঁর জড় ও চিন্ময় অনন্ত শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত।

শ্লোক ৮

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

রসঃ-স্বাদ: অহম্-আমি; অপ্সু-জলে; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; প্রভা-জ্যোতি; অস্মি-আমি হই; শশিসূর্যয়োঃ-চন্দ্র ও সূর্যের; প্রণবঃ-ওঙ্কার; সর্ব-সমগ্র; বেদেষু-বেদে; শব্দঃ-শব্দ; খে-আকাশে; পৌরুষম্-ক্ষমতা: নৃষ-মানুষে।

গীতার গান

জলের যে সরসতা আমি সে কৌন্তেয়।
চন্দ্রসূর্য প্রভা যেই আমা হতে জ্ঞেয় ।।
সর্ববেদে যে প্রণব হয় মুখ্যতত্ত্ব।
আকাশের শব্দ সেই আমি হই সত্য ।

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! আমিই জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে ভগবান তাঁর বিভিন্ন জড়া শক্তি ও চিৎ-শক্তির দ্বারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভগবান সম্বন্ধে জানতে সচেষ্ট হলে প্রথমে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। তবে এই স্তরের যে ভগবৎ-উপলব্ধি তা নির্বিশেষ। যেমন সূর্যদেব হচ্ছেন একজন পুরুষ এবং তাঁকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর সর্বব্যাপক শক্তি তাঁর কিরণের মাধ্যমে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিত্য ধামে বিরাজমান, তবুও তাঁর সর্বব্যাপক শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। জলের স্বাভাবিক স্বাদ হচ্ছে জলের একটি সক্রিয় ধর্ম। আমরা কেউ সমুদ্রের জল পান করতে চাই না, তার কারণ সেখানে বিশুদ্ধ জলের সাথে লবণ মেশানো রয়েছে। আস্বাদনের শুদ্ধতার জন্যই জলের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এবং এই শুদ্ধ আস্বাদন ভগবানেরই অনন্ত শক্তির একটি অভিপ্রকাশ। নির্বিশেষবাদীরা জলের স্বাদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সবিশেষবাদীরাও ভগবান যে করুণা করে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য তাঁর গুণকীর্তন করেন। এভাবেই পরম পুরুষের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষবাদ আর সবিশেষবাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। যিনি বাস্তবিক ভগবানকে জেনেছেন, তিনি জানেন যে, নির্বিশেষ ও

সবিশেষ উভয় রূপেই তিনি সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন এবং এতে কোন বিরোধ নেই।
তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা মহিমান্বিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব অর্থাৎ একই সাথে একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন।
সূর্য ও চন্দ্রের রশ্মিচ্ছটাও মূলত ভগবানের দেহনির্গত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি থেকে প্রকাশিত হয়। তেমনই বৈদিক মন্ত্রের প্রারম্ভে ভগবানকে সম্বোধনসূচক অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম প্রণব বা 'ওঁকার' মন্ত্রও ভগবানের থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অসংখ্য নামের দ্বারা সম্বোধন করতে খুবই ভয় পায়, তাই তারা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ওঁকারের মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করে। কিন্তু তারা বোঝে না যে, ওঁকার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই শব্দ প্রকাশ।
কৃষ্ণভাবনার পরিধি সর্বব্যাপ্ত, তাই কৃষ্ণচেতনার উপলব্ধি যিনি লাভকরেছেন, তাঁর জীবন সার্থক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যারা জানে না, তারা মায়াবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হওয়াই হচ্ছে মুক্তি, আর তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই হচ্ছে বন্ধন।

শ্লোক ৯

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পুণ্যঃ-পবিত্র; গন্ধঃ-গন্ধ; পৃথিব্যাম্-পৃথিবীর; চ-ও; তেজঃ-তেজ; চ-ও; অস্মি-আমি হই; বিভাবসৌ-অগ্নির; জীবনম্-আয়ু; সর্ব-সমস্ত; ভূতেষু-প্রাণীর; তপঃ-তপশ্চর্যা; চ-ও; অস্মি-হই; তপস্বিষ-তপস্বীদের।

গীতার গান

পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ সূর্যের প্রভাব।
জীবন সর্বভূতের তপস্বীর তপ ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বীদের তপ।

তাৎপর্য

পূণ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যার বিকার হয় না; পুণ্য হচ্ছে মৌলিক। এই জড় জগতে সব কিছুরই একটি বিশিষ্ট সৌরভ বা গন্ধ আছে। যেমন ফুলের গন্ধ, মাটির গন্ধ, আগুনের গন্ধ, জলের গন্ধ, বাতাসের গন্ধ আদি। তবে, পবিত্র নিষ্কলুষ, আদি অকৃত্রিম যে সুবাস সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তা হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই, সব কিছুরই বিশেষ একটি স্বাদ আছে, তবে রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এই স্বাদের পরিবর্তন করা যায়। তাই প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব ঘ্রাণ, সুবাস ও স্বাদ আছে। বিভাবসু মানে অগ্নি। এই অগ্নি ছাড়া কলকারখানা চলে না, রান্না করা যায় না, অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজই করা যায় না। সেই আগুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই আগুনের তাপই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয় যে, আমাদের উদরস্থ নিম্নতাপের ফলেই অজীর্ণতা হয়। সুতরাং, খাদ্য হজম করবার জন্যও আমাদের আগুনের প্রয়োজন। কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে আমরা জানতে পারি যে, মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি আদি সব রকমের সক্রিয় উপাদান এবং সব রকমের রাসায়নিক ও ভৌতিক পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের আয়ুও নির্ভর করে

শ্রীকৃষ্ণের উপরে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে মানুষের আয়ু দীর্ঘ অথবা সীমিত হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সক্রিয় রয়েছে।

শ্লোক ১০

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বীজম্-বীজ; মাম্-আমাকে; সর্বভূতানাম্-সর্বভূর্তের; বিদ্ধি-জানবে; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; সনাতনম্-নিতা; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; বুদ্ধিমতাম্-বুদ্ধিমানদের; অস্মি-হই; তেজঃ-তেজ; তেজস্বিনাম্-তেজস্বীগণের; অহম্-আমি।

গীতার গান

উৎপত্তির বীজরূপ সবার সে আমি।
সনাতন তত্ত্ব পার্থ সকলের স্বামী ॥
বুদ্ধিমান যেবা হয় তার বুদ্ধি আমি।
তেজস্বীর তেজ হয় যাহা অন্তর্যামী ॥

অনুবাদ

হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বৃদ্ধি এবং তেজস্বীদের তেজ।

তাৎপর্য

বীজ থেকে সব কিছু উৎপত্তি হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর বীজ। সচল ও অচল নানা রকমের জীব আছে। পশু, পাখি, মানুষ এই ধরনের জীবেরা জঙ্গম অর্থাৎ সচল। গাছপালা আদি হচ্ছে স্থাবর অর্থাৎ অচল, কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন জীবের মধ্যে কেউ স্থাবর, কেউ আবার জঙ্গম। কিন্তু তাদের সকলেরই বীজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন তিনিই, যাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম বা পরম আত্মা। ব্রহ্ম হচ্ছে নির্বিশেষ, কিন্তু পরমব্রহ্মা হচ্ছেন সবিশেষ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে সবিশেষ রূপের মধ্যেই অবস্থিত, তা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে। তাই, মূলত শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর উৎস। তিনিই সব কিছুর মূল। একটি গাছের মূল যেমন সমস্ত গাছটিকে প্রতিপালন করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমন সব কিছুর আদি মূলরূপে সমস্ত জড়-জাগতিক অভিপ্রকাশের প্রতিপালন করেন। বৈদিক শাস্ত্রে (কঠ উপনিষদ ২/২/১৩) সেই কথা প্রমাণিত হয়েছে-

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্!

যা কিছু নিত্য, তার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন পরম নিত্য। যা কিছু চেতন, তার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন পরম চেতন। তিনি একাই সব কিছুর প্রতিপালন করেন। বুদ্ধি ছাড়া কেউ কোন কিছু করতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত বুদ্ধির উৎস। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ না হলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না।

শ্লোক ১১

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

বলম্বল; বলবতাম্-বলবানের; চ-এবং; অহম-আমি; কাম-কাম; রাগ-আসক্তি; বিবর্জিতম্-বিহীন; ধর্মাবিরুদ্ধঃ-ধর্মের অবিরোধী; ভূতেষু-সমস্ত জীবের মধ্যে; কামঃ কাম; অস্মি-হই; ভরতর্ষভ-হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

বলবান যত আছে তার বল আমি।
কামরাগ বিবর্জিত যত অগ্রগামী ॥
ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম হে ভরতর্ষভ।
সে সব বুঝহ তুমি আমার বৈভব ।

অনুবাদ

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল এবং ধর্মের অবিরোধী কামরূপে আমি প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান।

তাৎপর্য

যে বলবান তার কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলকে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন অপরকে আক্রমণ করা হয়, লুণ্ঠন করা হয়, তখন সেটি বলের অপচয় করা হয়। তেমনই, কাম বা যৌন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মপরায়ণ সন্তান উৎপাদন করা। তা না করে যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যৌন জীবন যাপন করা হয়, তা অন্যায়। প্রতিটি পিতা-মাতার পরম কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সন্তানদের কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তোলা।

শ্লোক ১২

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

যে-যে সকল; চ-এবং; এব-অবশ্যই; সাত্ত্বিকাঃ-সাত্ত্বিক; ভাবাঃ-ভাবসমূহ; রাজসাঃ-রাজসিক; তামসাঃ-তামসিক; চ-ও; যে-যে সমস্ত; মত্তঃ-আমার থেকে; এব-অবশ্যই; ইতি-এভাবে; তান্-সেগুলি; বিদ্ধি-জানবার চেষ্টা কর; ন-নই; তু-কিন্তু; অহম্-আমি; তেষু-তাদের মধ্যে; তে-তারা; ময়ি-আমাতে।

গীতার গান

যে সব সাত্ত্বিক ভাব রজস তমস।
আমা হতে হয় সব আমি নহি বশ ॥

অনুবাদ

সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমার থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে। আমি সেই সকলের অধীন নই, কিন্তু তারা আমার শক্তির অধীন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সব কিছুই প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে সাধিত হয়। জড়া প্রকৃতির এই

ত্রিগুণ যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি কখনই এই গুণত্রয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজা যেমন আইন সৃষ্টি করে দোষীদের দণ্ড দেন, কিন্তু তিনি নিজে সেই আইনের অতীত। তেমনই জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ-সত্ত্ব, রজ ও তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ এই গুণগুলি যদিও তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি এই সমস্ত গুণের অতীত। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ১৩

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ত্রিভিঃ-তিন; গুণময়ৈঃ-গুণের দ্বারা; ভাবৈঃ- ভাবের দ্বারা; এভিঃ-এই: সর্বম্-সমগ্র; 'ইদম্-এই; জগৎ-জগৎ; মোহিতম্-মোহিত; ন অভিজানাতি-জানতে পারে না; মাম্-আমাকে; এভ্যঃ-এই সকলের অতীত; পরম্-পরম; অব্যয়ম্-অব্যয়।

গীতার গান

এই তিনগুণ দ্বারা মোহিত জগত।
না বুঝিতে পারে মোরে পরম শাশ্বত ॥

অনুবাদ

(সত্ত্ব, রজ, ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত গুণের অতীত ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ বিমোহিত হয়ে আছে। জড়া প্রকৃতি বা মায়ার প্রভাবে যারা বিমোহিত, তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

প্রকৃতির প্রভাবে জড় জগতে প্রতিটি জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ও দৈহিক গুণাবলীতে ভূষিত হয়। এই গুণের প্রভাবে মানুষেরা চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়। যাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। যারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের বলা হয় বৈশ্য। যারা সম্পূর্ণ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের বলা হয় শূদ্র। আর তার থেকেও যারা হেয়, তারা হচ্ছে পশু। তবে, এই বর্ণবিভাগ নিত্য নয়। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র অথবা যা-ই হই না কেন, যে কোন অবস্থাতেই এই জীবনটি অনিত্য। কিন্তু যদিও জীবন অনিত্য এবং আমরা জানি না পরবর্তী জীবনে কি দেহ আমরা লাভ করব, তবুও মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আমরা আমাদের দেহটিকেই আমাদের স্বরূপ বলে মনে করি এবং ভাবতে শুরু করি যে, আমরা আমেরিকান, রাশিয়ান, ভারতীয়, কিংবা ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমান আদি। এভাবেই যখন আমরা জড় গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তখন সমস্ত গুণের অন্তরালে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তা আমরা ভুলে যাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত হয়ে মানুষ বুঝতে পারে না যে, এই সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং।

পশু, পক্ষী, মানুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব-দেবী আদি প্রতিটি বিভিন্ন জীবই জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এরা সকলেই অপ্রাকৃত পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে গেছে। যারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এমন কি যারা সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, তারাও পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ব্রহ্মা-উপলব্ধির ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। শ্রীভগবান, যিনি পরম পুরুষ, যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ শ্রী, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীর্য, যশ ও বৈরাগ্য বিদ্যমান, সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সবিশেষ ভগবানের সামনে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত রয়েছে, তারাও যখন এই তত্ত্বকে বুঝতে পারে না, তখন রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবের সম্বন্ধে আর কি আশা করা যেতে পারে? কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণের অতীত। আর যাঁরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে আছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত মুক্ত।

শ্লোক ১৪

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ৷ ১৪ ॥

দৈবী-অলৌকিকী; হি-নিশ্চয়; এষা-এই; গুণময়ী-ত্রিগুণময়ী; মম-আমার; মায়া-শক্তি; দূরত্যয়া-দুরতিক্রমণীয়া: মাম্-আমাকে; এব-অবশ্যই; যে-যাঁরা; প্রপদ্যন্তে-শরণাগত হন; মায়াম্ এতাম্-এই মায়াশক্তিকে; তরন্তি-উত্তীর্ণ হন; তে-তাঁরা।

গীতার গান

অতএব গুণময়ী আমার যে মায়া।
বহিরঙ্গা শক্তি সেই অতি দুরত্যয়া ॥
সে মায়ার হাত হতে যদি মুক্তি চায়।
আমার চরণে সেই প্রপত্তি করয় ॥

অনুবাদ

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত দিব্য শক্তির অধীশ্বর এবং সেই শক্তিরাজি দিব্যগুণ-সম্পন্ন। যদিও, জীব তাঁর সেই শক্তিসম্ভূত এবং তাই দিব্য, কিন্তু জড়া শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সেই প্রকৃত দিব্য স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। এভাবেই জড়া শক্তির প্রভাবে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে চিন্ময় পরা শক্তি ও জড় অপরা শক্তি উভয়ই নিত্য। জীব ভগবানের নিত্য পরা শক্তির অংশ, কিন্তু অপরা প্রকৃতি বা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে তার মোহও নিত্য। তাই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ। জড় জগতের সময়ের হিসাবে কেউই বলতে পারে না, জীব কবে বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। জড়া প্রকৃতি যদিও ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তি, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব তাকে অতিক্রম করতে পারে না বা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অনুৎকৃষ্টা জড়া শক্তি

বা মায়াকে ভগবান এখানে দৈবী বলে অভিহিত করেছেন, কেন না তা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি এবং বিনাশের কাজ করে চলেছে। এই সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে-মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। "মায়া যদিও মিথ্যা অথবা অনিত্য, তবুও মায়ার অন্তরালে রয়েছেন পরম যাদুকর পরম পুরুষ ভগবান, যিনি হচ্ছেন মহেশ্বর, পরম নিয়ন্তা।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/১০)
গুণ শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে রজ্জু। এর থেকে বোঝা যায় যে, মায়া এ সমস্ত রজ্জুর দ্বারা বন্ধ জীবকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে। যে মানুষের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে নিজে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে হলে তাকে এমন কারও সাহায্য নিতে হয়, যিনি নিজে মুক্ত। কারণ, যে নিজেই বদ্ধ, সে কাউকে মুক্ত করতে পারে না; অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরাই কেবল অপরকে মুক্ত করতে পারেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবই কেবল বদ্ধ জীবকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই ধরনের পরম সাহায্য ব্যতীত জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা এই মুক্তির পরম সহায়ক হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর। তাই, তিনি যখন এই অলঙ্ঘনীয় মায়াকে আদেশ দেন কাউকে মুক্ত করে দিতে, মায়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেন। জীব হচ্ছে ভগবানের সন্তান, তাই জীব যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণাবশে পিতৃবৎ স্নেহে তাকে মুক্ত করতে মনস্থ করেন এবং তিনি তখন মায়াকে আদেশ দেন তাকে মুক্ত করে দিতে। তাই, ভগবানের চরণ-কমলের শরণাগত হওয়াটাই হচ্ছে কঠোর জড়া প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।
মাম্ এব কথাগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। মাম্ মানে শ্রীকৃষ্ণকে বা বিষ্ণুকেই বোঝায়-ব্রহ্মা কিংবা শিব নয়। যদিও ব্রহ্মা এবং শিব অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং তারা প্রায় বিষ্ণুর সমকক্ষ, কিন্তু ভগবানের এই রজোগুণ ও তমোগুণের গুণাবতারেরা কখনই জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, ব্রহ্মা এবং শিবও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত। বিষ্ণুই কেবল মায়াধীশ। তাই, তিনিই কেবল বদ্ধ জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই সম্বন্ধে বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮) প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তমেব বিদিত্বা, অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণকে জানার মাধ্যমেই কেবল জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" স্বয়ং মহাদেব স্বীকার করেন যে, বিষ্ণুর কৃপার ফলেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। তিনি বলেছেন, মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ- "ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে সকলের মুক্তিদাতা, সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।"

শ্লোক ১৫

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ন-না; মাম্-আমাকে; দুষ্কৃতিনঃ-দুষ্কৃতকারী; মূঢ়াঃ-মূঢ়; প্রপদ্যন্তে-শরণাগত হয়; নরাধমাঃ-নিকৃষ্ট নরগণ: মায়য়া-মায়ার দ্বারা; অপহৃত-অপহৃত; জ্ঞানাঃ -যাদের জ্ঞান; আসুরম্-আসুরিক; ভাবম্-স্বভাব; আশ্রিতাঃ-আশ্রয় করে।

গীতার গান

কিন্তু যারা দুরাচার নরাধম মূঢ়।
সর্বদাই গুণকার্যে অতিমাত্রা দৃঢ় ॥
মায়ার দ্বারাতে যারা অপহৃত জ্ঞান ।
প্রপত্তি করে না তারা যত অসুরান্ ॥

অনুবাদ

মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলে শুধুমাত্র আত্মসমর্পণ করলেই অনায়াসে দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তথাকথিত পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, পরিচালক, রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের নেতারা কেন সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হন না? মানব-সমাজের নেতারা জড়া প্রকৃতির বিধান থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য বহু বছর ধরে অধ্যবসায় সহকারে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেই মুক্তি লাভ করাটা যদি কেবল মাত্র ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করার মতো সহজ ব্যাপার হয়, তা হলে এই সমস্ত বুদ্ধিমান ও কঠোর পরিশ্রমী নেতারা সেই সহজ সরল পন্থাকে অবলম্বন করে না কেন?

ভগবদ্গীতাতে অত্যন্ত সরলভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সমাজের যথার্থ নেতা, যেমন-ব্রহ্মা, শিব, কুমার, মনু, ব্যাসদেব, কপিল, দেবল, অসিত, জনক, প্রহ্লাদ, বলি এবং পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং আরও অনেকে যাঁরা হচ্ছেন বিশ্বস্ত দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, তাঁরা সকলেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, শিক্ষক নয়, শাসক নয়, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই প্রকার ভান করে লোক ঠকায়, তারা কখনই ভগবানের নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে না। ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই; তারা কেবলমাত্র মনগড়া জড়-জাগতিক পরিকল্পনা রচনা করে এবং তার ফলে সমাজের সমস্যা লাঘব হওয়ার পরিবর্তে তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার দ্বারা তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ, জড়া প্রকৃতি এতই শক্তিশালী যে, আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক নেতাদের সব রকম শাস্ত্রবিরোধী পরিকল্পনাগুলি সে ব্যর্থ করে দেয় এবং 'পরিকল্পনা কমিশনগুলির' জ্ঞানের দম্ভ নস্যাৎ করে দেয়।

নাস্তিক পরিকল্পনাকারীদের এখানে দুষ্কৃতিনঃ অথবা 'দুষ্কৃতকারী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কৃতী মানে সুকৃতিকারী। ভগবৎ-বিদ্বেষী পরিকল্পনাকারীরা অনেক সময়ে খুব বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ও গুণ-সম্পন্নও হয়, কেন না যে কোন বড় পরিকল্পনা, তা ভালই হোক অথবা খারাপই হোক, সফল করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করে বলে নিরীশ্বরবাদী পরিকল্পনাকারীদের দুষ্কৃতী বলা হয় অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা ভুল পথে চালিত হচ্ছে।

ভগবদ্গীতাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়া শক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নির্দেশে পরিচালিত হয়। এর কোনও স্বাধীন-স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই। কোন কিছুর প্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত বস্তুর উপর নির্ভরশীল, জড়া প্রকৃতিও ঠিক তেমনই ভগবানের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তবুও জড়া শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। ভগবৎ-বিমুখ নাস্তিকদের ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নেই, তাই তারা কখনই বুঝতে পারে না জড়া প্রকৃতি কিভাবে পরিচালিত হয় এবং ভগবানের পরিকল্পনা কি। মায়ার প্রভাবে সম্মোহ এবং রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার ফলে তার সব কয়টি পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। হিরণ্যকশিপু, রাবণ আদি

অসুরেরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে কারও চাইতে কম ছিল না। তারা সকলেই ছিল মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিক্ষক ও পরিচালক। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাদের সেই সমস্ত বিরাট বিরাট পরিকল্পনাগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই সমস্ত দুরাচারীদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান ও আসুরিক ভাবাপন্ন।
(১) মূঢ় হচ্ছে তারা, যারা কঠোর পরিশ্রমী ভারবাহী পশুর মতো মূর্খ। তারা সব সময় তাদের নিজেদের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করতে চায়। তাই, তারা শ্রীভগবানকে তাদের কর্ম উৎসর্গ করতে পারে না। গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশুর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই পশুটি তার মনিবের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। এই বেচারি গাধা জানে না সে কার জন্য দিন-রাত খেটে চলেছে। একটুখানি ঘাস খেয়ে উদরপূর্তি করে, মনিবের হাতে মার খাওয়ার আতঙ্কে একটুখানি ঘুমিয়ে উঠে এবং গর্দভীর লাথি খেতে খেতে তার যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি করে সে মনে করে যে, সে খুব সুখেই আছে। এই গাধাগুলি মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করে জীবন-দর্শন আওড়ায়, কিন্তু তার রাসভ-নাদের ফলে সে অন্যদের কেবল জ্বালাতনই করে। মূঢ় সকাম কর্মীদের অবস্থাও ঠিক এই গাধারই মতো। তারা জানে না কার জন্য কর্ম করা উচিত। তারা জানে না যে, কর্ম করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ, অর্থাৎ ভগবানকে সন্তুষ্ট করাই হচ্ছে কর্ম করার যথার্থ উদ্দেশ্য।
এই সমস্ত কর্মী, যারা তাদের স্বকল্পিত কর্তব্যের ভার লাঘব করবার জন্য দিন-রাত গাধার মতো খেটে চলেছে, তারা প্রায়ই বলে যে, জীবের অমরত্বের কথা শোনবার মতো সময় তাদের নেই। এই সমস্ত মূঢ় লোকগুলির কাছে ক্ষয়িষ্ণু জাগতিক লাভটাই হচ্ছে সব কিছু। অথচ ওরা জানে না দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা যে কর্ম করছে, তার একটা নগণ্য অংশই কেবল তারা উপভোগ করতে পারে। অনর্থক বিষয় লাভের জন্য তারা দিনরাত না ঘুমিয়ে গাধার মতো পরিশ্রম করে, মন্দাগ্নি আদি উদরপীড়ায় পীড়িত হয়ে এক রকম অনাহারে থেকে তারা তাদের কল্পিত প্রভুর সেবায় রত থাকে। তাদের যথার্থ প্রভুকে না জেনে তারা ধনদেবতার পরিচর্যা করে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে। দুর্ভাগ্যবশত, তারা কখনই সমস্ত প্রভুর পরম প্রভুর শরণাগত হয় না, অথবা তারা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করে না। বিষ্ঠাহারী শূকর কখনই দুধ, ঘি, চিনির তৈরি মিঠাই খেতে চায় না। তেমনই, মূঢ় কর্মীরা অস্থির পার্থিব জগতের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিদায়ক কথাই কেবল শ্রবণ করে, কিন্তু যে শাশ্বত প্রাণশক্তি জড় জগৎকে চালনা করছে, সেই অপ্রাকৃত শক্তির কথা শোনবার বিন্দুমাত্র সময় পায় না।
(২) অন্য শ্রেণীর দুরাচারীদের বলা হয় নরাধম অর্থাৎ তারা হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। ৮৪,০০,০০০ যোনির মধ্যে ৪,০০,০০০ হচ্ছে মনুষ্য-যোনি। এর মধ্যে অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সাধারণত অসভ্য। সভ্য মানুষ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন যাপন করে। আর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত হলেও যাদের জীবন ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয় না, তাদের নরাধম বলে গণ্য করা হয়। ভগবানকে বাদ দিয়ে কখনও কোন ধর্ম হয় না। কারণ, ধর্মের পথ অনুসরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্বকে জানা এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া। গীতাতে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর উপরে ক্ষমতাশালী কেউ নেই এবং তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য। তাঁর উর্ধ্বে আর কোনও ক্ষমতা নেই। সভ্য মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম সত্য বা সর্ব শক্তিমান, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের লুপ্ত চেতনার পুনর্জাগরণ করা। মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় নরাধম। শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে (যে অবস্থাটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর), তখন সে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা

করে যে, সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই সে ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। বিপদে পড়লে ভগবানকে প্রার্থনা জানানো জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রসব হওয়ার পরেই শিশু তার জন্ম-যন্ত্রণার কথা ভুলে যায় এবং মায়ার প্রভাবে তার মুক্তিদাতাকেও ভুলে যায়।

শিশুর অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁদের সন্তানদের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমকে পুনর্জাগরিত করা। ধর্মশাস্ত্র মনু-স্মৃতিতে নির্দেশিত দশকর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্ণাশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে এই ভগবৎ-প্রেমকে পুনর্জাগরিত করা। কিন্তু আধুনিক যুগে পৃথিবীর কোথাও এই পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাই, আধুনিক যুগে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নরাধমে পরিণত হয়েছে।

যখন সমগ্র জনগণই নরাধমে পরিণত হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সর্ব শক্তিময়ী মায়ার প্রভাবে তাদের তথাকথিত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। গীতার মানদণ্ড অনুসারে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পণ্ডিত, যিনি একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি ও একজন চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যথার্থ নরাধম জগাই ও মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্ধার করেন এবং এভাবেই তিনি দেখিয়ে গেছেন যে, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের করুণা কিভাবে সব চাইতে অধঃপতিত মানুষের উপরেও বর্ষিত হয়। তাই, যে নরাধমকে ভগবান পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন, ভগবদ্ভক্তের কৃপার প্রভাবে তার হৃদয়ে আবার পারমার্থিক কৃষ্ণভাবনার উন্মেষ হতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাগবত-ধর্ম অথবা ভগবদ্ভক্তদের কার্যপদ্ধতি প্রচার করে উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে হবে। ভগবানের দেওয়া এই উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে ভগবদ্গীতা। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানের দেওয়া উপদেশ শ্রবণ করার ফলে নরাধমও উদ্ধার পেতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা তো দূরে থাকুক, এই সমস্ত নরাধমগুলি ভগবানের বাণী পর্যন্ত কানে শুনতে চায় না। এভাবেই নরাধমেরা সব সময়ই মানব-জীবনের পরম কর্তব্যকে একেবারেই অবহেলা করে।

(৩) পরবর্তী শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ, অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে যাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। সাধারণত এরা অধিকাংশই খুব বিদ্বান হয়- যেমন বড় বড় দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক আদি। কিন্তু মায়াশক্তি তাদের বিপথগামী করেছে, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে থাকে।

আজকের জগতে অসংখ্য মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ মানুষ দেখা যায়, এমন কি অনেক ভগবদ্গীতার পণ্ডিতও এই ধরনের মূঢ়। গীতাতে সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই। তাঁকে সমস্ত মানুষের আদি পিতা ব্রহ্মারও পিতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণকে কেবল ব্রহ্মারই পিতা বলা হয় না, তিনি সমস্ত যোনিভুক্ত জীবেরও পিতা। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁরই অংশ। তিনি সব কিছুরই উৎস, তাই তাঁর চরণারবিন্দের শরণাগত হওয়ার জন্য প্রত্যেককেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুদৃঢ়ভাবে এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ মানুষেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে এবং তাঁকে আর একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা জানে না যে, এই দুর্লভ মনুষ্য-শরীর ভগবানেরই নিত্য চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের অনুকরণে রচিত হয়েছে।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ মূর্খেরা গীতার যে প্রামাণ্যবর্জিত ব্যাখ্যা করে, তার ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে গীতার যথাযথ অর্থের কদর্থ করে। গুরু-পরম্পরাক্রমে গীতার জ্ঞান প্রাপ্ত না

হওয়ার ফলে তারা গীতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। তারা যে মনগড়া ব্যাখ্যা করে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং তাদের সেই সমস্ত মতবাদগুলি পারমার্থিক সাধনার পথে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত মোহগ্রস্ত ব্যাখ্যাকাররা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হয় না এবং অন্য কাউকেও ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষাদান করে না।
(৪) সর্বশেষ শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ অথবা আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি। এই ধরনের মানুষেরা নির্লজ্জভাবে নাস্তিক। এই শ্রেণীর নররূপধারী অসুরেরা তর্ক করে যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনই এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন না। কিন্তু ভগবান যে কেন এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন না, সেই সম্বন্ধে তারা কোন যুক্তিও প্রদর্শন করতে পারে না। এদের কেউ কেউ আবার বলে যে, ভগবান নির্বিশেষ ব্রহ্মের অধীন, যদিও গীতাতে ঠিক এর বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এই সমস্ত নাস্তিকেরা স্বকপোলকল্পিত অপ্রামাণিক একাধিক অবতারদের অবতারণা করে। এই ধরনের মানুষদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের নিন্দা করা, তাই তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হতে পারে না।
দক্ষিণ ভারতের শ্রীযামুনাচার্য আলবন্দার বলেছেন, "হে ভগবান! তুমি যদিও তোমার অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলার দ্বারা অলঙ্কৃত, সমস্ত শাস্ত্র যদিও তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীবিগ্রহকে অঙ্গীকার করে এবং দৈবীগুণ-সম্পন্ন জ্ঞানী আচার্যেরা তোমার জয়জয়কার করেন, কিন্তু তবুও আসুরিক ভাবাপন্ন নিরীশ্বরবাদীরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না।"
তাই, উপরোক্ত (১) মূঢ়, (২) নরাধম, (৩) মায়াপহৃত-জ্ঞান (৪) আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিকেরা শাস্ত্র ও মহাজনদের উপদেশ সত্ত্বেও কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হয় না।

শ্লোক ১৬

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।। ১৬ ॥

চতুর্বিধাঃ-চার প্রকার; ভজন্তে-ভজনা করেন; মাম্-আমাকে; জনাঃ-ব্যক্তিগণ; সুকৃতিনঃ-পুণ্যকর্মা; অর্জুন-হে অর্জুন; আর্তঃ-আর্ত; জিজ্ঞাসুঃ-অনুসন্ধিৎসু; অর্থার্থী-ভোগ অভিলাষী; জ্ঞানী-তত্ত্বজ্ঞ, চ-ও; ভরতর্ষভ-হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

সুকৃতি করেছে যারা সেই চারিজন।
আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু কিম্বা জ্ঞানী হন ॥
প্রপত্তি সহিত তারা করয়ে ভজন।
অসুরাদি মায়াযুদ্ধে হারায় জীবন ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী-এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

দুষ্কৃতকারীদের ঠিক বিপরীত হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণকারী এবং তাঁদের বলা হয় সুকৃতিনঃ অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন মানুষ। এরা সব সময়ই শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলে, সমাজের নীতি মেনে চলে এবং এরা সকলেই অল্প-বিস্তর ভগবদ্ভক্ত। এরাও আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত- (১) আর্ত, (২) অর্থার্থী (৩) জিজ্ঞাসু ও (৪) জ্ঞানী। এই সমস্ত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কারণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয়। এরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নয়, কারণ ভক্তির বিনিময়ে এরা কোন না কোন অভিলাষ পূর্তির কামনা করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি সব রকমের কামনা থেকে মুক্ত এবং জড়-জাগতিক কোন কিছু লাভ করার অভিলাষ থাকে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ১/১১) শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

অন্যাভিলাষিতাশূনাং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"জড়-জাগতিক লাভের অভিলাষ বর্জন করে, জ্ঞান, কর্ম, যোগ আদি নৈমিত্তিক ধর্মের আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে, অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিবা প্রেমভক্তি সেবা করাই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।"

এই চার শ্রেণীর ব্যক্তিরা যখন ভগবানের সেবা করে, তখন সাধুসঙ্গের প্রভাবে তারাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি করা খুবই কঠিন, কারণ তারা অত্যন্ত স্বার্থপর, অসংযত ও পারমার্থিক উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু তবুও সৌভাগ্যক্রমে তাদের কেউ যদি শুদ্ধ ভগবস্তুক্তের সংস্পর্শে আসে, তা হলে তারাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে।

যারা সকাম কর্মের ফল ভোগ করবার জন্য সর্বদাই নানা রকম কাজে ব্যস্ত, তারা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ভগবানের শরণাগত হয় এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে দুঃখের মধ্যেও তারা ভগবস্তুক্তে পরিণত হয়। নৈরাশ্যের ফলেও অনেকে সাধুসঙ্গ করে এবং তার প্রভাবে ভগবানের কথা জানতে জিজ্ঞাসু হয়। তেমনই, আবার শূন্যগর্ভ দার্শনিকেরাও সমস্ত জাগতিক জ্ঞানের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রয়াসী হয় এবং ভগবানের সেবা করতে শুরু করে। তার ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং ভগবানের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা স্তর অতিক্রম করে, পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ভগবানের সাকার রূপের জ্ঞান লাভ করে। মোটের উপর এই সমস্ত আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরা যখ। উপলব্ধি করতে পারে যে, পরমার্থ সাধন করার সঙ্গে জড়-জাগতিক লাভ-ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই, তখন তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। এই পরম শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত ভক্ত সকাম কর্মের দ্বারা দূষিত হয়ে থাকে এবং জড়-জাগতিক জ্ঞানের অন্বেষণও করতে থাকে। তাই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হলে, এই সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতে হয়।

শ্লোক ১৭

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্-তাঁদের মধো: জ্ঞানী-তত্ত্বজ্ঞ; নিত্যযুক্তঃ-সর্বদাই আমাতে একাগ্রচিত্ত; এক-

একমাত্র; ভক্তিঃ-ভগবদ্ভক্তিতে; বিশিষ্যতে-শ্রেষ্ঠ; প্রিয়ঃ-প্রিয়; হি-যেহেতু; জ্ঞানিনঃ-জ্ঞানীর; অত্যর্থম্-অত্যন্ত; অহম্-আমি; সঃ-তিনি; চ-ও; মম-আমার; প্রিয়ঃ-প্রিয়।

গীতার গান

এই চারিজন মধ্যে জ্ঞানী সে বিশিষ্ট।
প্রিয় হয় জ্ঞানী মোর অতি সে বলিষ্ঠ ॥

অনুবাদ

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেন না আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

সব রকম জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে সমস্ত জড় বাসনা থেকে নিস্পৃহ তত্ত্বজ্ঞানী বাস্তবিকই শুদ্ধ ভগবস্তুক্তে পরিণত হন। এই চার শ্রেণীর মধ্যে যিনি পূর্ণ জ্ঞানবান এবং সেই সঙ্গে ভক্তিপরায়ণ, ভগবান বলেছেন যে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ করার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, জড় দেহটি থেকে আত্মা ভিন্ন এবং এই তত্ত্বানুসন্ধানের পথে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম ও পরমাত্মার জ্ঞান উপলব্ধি করেন। পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি ভগবানের নিত্য দাস। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার ফলে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী-এঁরা সকলেই শুদ্ধ হন। কিন্তু যে মানুষ প্রাথমিক সাধনাবস্থায় ভগবান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে ভক্তিপরায়ণ, তিনি ভগবানের অতিশয় প্রিয়। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃততত্ত্ব সম্পর্কে শুদ্ধ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, ভক্তিযোগের পথে ভগবান তাঁকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেন যে, জড় জগতের কোন কলুষতা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

উদারাঃ-উদার; সর্ব-সকলে; এব-অবশ্যই; এতে-এরা; জ্ঞানী-জ্ঞানী; তু-কিন্তু; আত্মা এব-আমার নিজের মতো; মে-আমার; মতম্-মত; আস্থিতঃ-অবস্থিত; সঃ-তিনি; হি-যেহেতু; যুক্তাত্মা-ভক্তিযোগে যুক্ত; মাম্-আমাকে; এব-অবশ্যই: অনুত্তমাম্-সর্বোৎকৃষ্ট; গতিম্-গতি।

গীতার গান

উক্ত চারিজন ভক্ত সকলে উদার।
শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন ক্রমশ বিস্তার ॥
তার মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত অতি সে আত্মীয়।
সে কারণে উত্তম গতি হয় বরণীয় ॥

অনুবাদ

এই সকল ভক্তেরা সকলেই নিঃসন্দেহে মহাত্মা, কিন্তু যে জ্ঞানী আমার তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমার মতে তিনি আমার আত্মস্বরূপ। আমার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়ে তিনি

সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের প্রিয়, কিন্তু তা বলে যে ভগবান তাঁর অন্য ভক্তদের ভালবাসেন না, তা নয়। ভগবান বলেছেন যে, তাঁরা সকলেই উদার, কারণ যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরাই ভগবানের কাছে আসেন, তাঁরা সকলেই মহাত্মা। ভগবদ্ভক্তির বিনিময়ে যে সমস্ত ভক্ত কোন কিছু লাভের আশা করেন, ভগবান তাঁকেও গ্রহণ করেন, কারণ সেই ক্ষেত্রেও প্রীতির আদান-প্রদান হয়। ভগবানকে ভালবেসেই তাঁরা তাঁর কাছে কোন বিষয় লাভের কামনা করেন। তারপর তাঁর বাঞ্ছাপূর্তি-জনিত সন্তুষ্টির ফলে তিনি আরও গভীরভাবে ভগবানকে ভালবাসেন। কিন্তু তবুও পূর্ণ জ্ঞানবান ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অতিশয় প্রিয়, কারণ তাঁর একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। এই ধরনের ভক্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য বা ভগবৎ-সেবা বিনা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। সেই রকম ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/৬৮) ভগবান বলেছেন-

সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদনাৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

"ভক্তেরা আমার হৃদয়ে সর্বদাই নিবাস করেন এবং আমিও সর্বক্ষণই তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান থাকি। আমাকে ছাড়া ভক্ত আর কিছুই জানেন না, আর আমিও তাই ভক্তকে কখনই ভুলতে পারি না। আমার শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা প্রগাঢ় প্রেমময় ও আন্তরিক। পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তেরা কখনই পারমার্থিক সান্নিধা বর্জন করেন না, তাই তাঁরা আমার এত প্রিয়।"

শ্লোক ১৯

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বহুনাম্-বহু, জন্মনাম্-জন্মের; অন্তে-পরে; জ্ঞানবান্-তত্ত্বজ্ঞানী; মাম্-আমাতে; প্রপদ্যতে-প্রপত্তি করেন; বাসুদেবঃ- বাসুদেব; সর্বম্-সমস্ত; ইতি-এভাবে; সঃ-সেইরূপ; মহাত্মা-মহাপুরুষ; সুদুর্লভঃ-অত্যন্ত দুর্লভ।

গীতার গান

ক্রমে ক্রমে জ্ঞানীজন বহু জন্ম পরে।
আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি সে করে ॥
বাসুদেবময় তদা জগৎ দর্শন।
দুর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণন ॥

অনুবাদ

বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

বহু বহু জন্মে ভগবদ্ভক্তি সাধন করার ফলে অথবা পারমার্থিক কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে

জীব এই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে. পারমার্থিক উপলব্ধির চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। পারমার্থিক উপলব্ধির প্রারম্ভিক স্তরে, সাধক যখন ভোগাসক্তির জড় বন্ধন নিবৃত্তি করার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর প্রবৃত্তি কিছুটা নির্বিশেষবাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যখন উন্নতি লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, পারমার্থিক জীবনেও অপ্রাকৃত ক্রিয়াকর্ম আছে এবং তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এটি বুঝতে পেরে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হন এবং তাঁর শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করেন। এই অবস্থায় তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই হচ্ছে সর্ব সারসর্বস্ব, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং এই বিশ্বচরাচর তাঁর থেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়। তিনি বুঝতে পারেন, এই জড় জগৎ চিন্ময় বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিবিম্ব এবং সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্বন্ধযুক্ত। তাই, তিনি বাসুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু চিন্তা করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্বত্র দেখার এই অভ্যাস পরম লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্পণ ত্বরান্বিত করে। এই প্রকার শরণাগত মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।
এই শ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক ১৪-১৫) খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫/১/১৫) বলা হয়েছে, ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হোবৈতানি সর্বাণি ভবন্তি-"জীবের দেহের মধ্যে বাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি আসল জিনিস নয়; প্রাণশক্তিই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু।" ঠিক সেই রকমভাবে, ভগবান বাসুদেব অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর মধ্যে মূল সত্তা। এই দেহের মধ্যে বাক্যশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাভাবনার শক্তি আদি রয়েছে। কিন্তু এই সব যদি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তা হলে এগুলির কোনই গুরুত্ব থাকে না। আর যেহেতু বাসুদেব সর্বব্যাপক এবং সব কিছুই হচ্ছেন বাসুদেব স্বয়ং, তাই ভক্ত পূর্ণজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করেন। (তুলনীয়-ভগবদ্গীতা ৭/১৭ ও ১১/৪০)

শ্লোক ২০

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

কামৈঃ-কামনাসমূহের দ্বারা; তৈঃ-সেই; তৈঃ-সেই; হৃত-অপহৃত; জ্ঞানাঃ -জ্ঞান; প্রপদ্যন্তে-প্রপত্তি করে; অন্য-অন্য; দেবতাঃ-দেব-দেবীদের; তম্-সেই; তম্-সেই; নিয়মম্-নিয়ম; আস্থায়-পালন করে; প্রকৃত্যা-স্বভাবের দ্বারা; নিয়তাঃ-নিয়ন্ত্রিত হয়ে; স্বয়া-স্বীয়।

গীতার গান

যে পর্যন্ত কামনার দ্বারা থাকে বশীভূত।

প্রপত্তি আমাতে তদা নহে ত' সম্ভূত ॥
সেই কাম দ্বারা তারা হৃতজ্ঞান হয়।
আমাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা পূজয় ॥

অনুবাদ

জড় কামনা-বাসনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।

তাৎপর্য

যারা সর্বতোভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ সে স্বভাবতই অভক্ত থাকে। কিন্তু এমন কি বিষয়-বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করে, তখন সে আর ততটা বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না; যথার্থ লক্ষ্যের প্রতি উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে হতে সে শীঘ্রই সমস্ত প্রাকৃত কাম-বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তই হোক, অথবা প্রাকৃত অভিলাষযুক্ত হোক, অথবা জড় কলুষ থেকে মুক্তিকামীই হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে বাসুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর উপাসনা করা। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে (২/৩/১০)-

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারবীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

যে সব স্বল্পবুদ্ধি মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই বিষয়-বাসনার তাৎক্ষণিক পূর্তির জন্য দেবতাদের শরণাপন্ন হয়। সাধারণত, এই স্তরের মানুষের। ভগবানের শরণাগত হয় না, কারণ রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকে। দেবোপাসনার বিধি-বিধান পালন করেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা তাদের তুচ্ছ অভিলাষের দ্বারা এতই মোহাচ্ছন্ন থাকে যে, তারা পরম লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। ভগবানের ভক্ত কিন্তু কখনই এই পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন না। বৈদিক শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীকে পুজা। করার বিধান দেওয়া আছে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবের উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অভক্তেরা মনে করে যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেব-দেবীরা ভগবান থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে-একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। তাই, শুদ্ধ ভক্ত কখনও তাঁর বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য দেব-দেবীর কাছে যান না। তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল এবং ভগবানের কাছ থেকে তিনি যা পান তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ২১

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

যঃ-যে; যঃ-যে; যাম্-যে; যাম্-যে; তনুম্-দেব-দেবীর মূর্তি; ভক্তঃ-ভক্ত; শ্রদ্ধয়া-শ্রদ্ধা সহকারে; অর্চিতুম্-পূজা করতে, ইচ্ছতি-ইচ্ছা করে; তস্য-তার; তস্য-তার; অচলাম্-অচলা; শ্রদ্ধাম্-শ্রদ্ধা; তাম্-তাতে; এব-অবশ্যই; বিদধামি-বিধান করি; অহম্-আমি।

গীতার গান

আমি অন্তর্যামী তার থাকিয়া অন্তরে।
সেই সেই দেবপূজা করাই সত্বরে ॥
সেই সেই শ্রদ্ধা দিই করিয়া অচল।
অতএব অন্য দেব করয়ে পূজন ॥

অনুবাদ

পরমাত্মারূপে আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি। যখনই কেউ দেবতাদের পূজা করতে ইচ্ছা করে, তখনই আমি সেই সেই ভক্তের তাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।

তাৎপর্য

ভগবান প্রত্যেককেই স্বাধীনতা দিয়েছেন; তাই, কেউ যদি জড় সুখভোগ করার জন্য কোন দেবতার পূজা করতে চায়, তখন সকলের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাদের সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন। সমস্ত জীবের পরম পিতা ভগবান কখনও তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন। এই সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, জড় জগৎকে ভোগ করার ফলে জীব যদি মায়ার ফাঁদে পতিত হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন তাদের এই সুযোগ প্রদান করেন? এর উত্তর হচ্ছে, পরমাত্মারূপে ভগবান যদি সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা না দিতেন, তা হলে জীবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূলাই থাকত না। তাই, তিনি প্রতিটি জীবকে তাদেরই ইচ্ছানুরূপ আচরণ করার জন্য পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করেন। কিন্তু তাঁর পরম নির্দেশ আমরা ভগবদ্গীতাতে পাই-সব কিছু পরিত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হোন। আর মানুষ যদি তা করে, তা হলেই সে সুখী হতে পারে।

জীবাত্মা ও দেবতা, এরা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার অধীন। তাই, জীব নিজের ইচ্ছায় দেব-দেবীর পূজা করতে পারে না এবং দেব-দেবীরাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত বর দান করতে পারেন না। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা বিনা একটি পাতাও নড়ে না। সাধারণত, সংসারে বিপদগ্রস্ত মানুষেরাই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে দেবোপাসনা করে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য রোগী সূর্যোপাসনা করে, বিদ্যার্থী বাগদেবী সরস্বতীর পূজা করে এবং সুন্দরী স্ত্রী লাভকরার জন্য কোন ব্যক্তি শিবপত্নী উমার পূজা করে। এভাবেই শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করার বিধান দেওয়া আছে। আর যেহেতু প্রতিটি জীবই কোন বিশেষ জাগতিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করার অভিলাষী হয়, তাই ভগবান তাদের অন্তরে বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীদের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা দান করে তাঁদের উপাসনা করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তার ফলে তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করতে সমর্থ হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি জীবের যে অনুরাগ জন্মায়, তা ভগবানেরই দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। দেব-দেবীরা তাঁদের নিজেদের শক্তির প্রভাবে জীবকে তাঁদের প্রতি অনুরক্ত করতে পারেন না। জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিদ্যমান থেকে শ্রীকৃষ্ণই মানুষকে দেবোপাসনায় অনুপ্রাণিত করেন। দেবতারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ, তাই তাঁদের কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। বেদে বলা হয়েছে, "পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের হৃদয়েও বিরাজ করেন, তাই তিনিই বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে জীবের প্রার্থনা পূর্ণ

করেন। এভাবেই দেবতা ও জীবাত্মা কেউই স্বাধীন নয়, তাঁরা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার অধীন।"

শ্লোক ২২

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

সঃ-তিনি; তয়া-সেই; শ্রদ্ধয়া-শ্রদ্ধা সহকারে, যুক্তঃ-যুক্ত হয়ে: তস্য-তাঁর; আরাধনম্-আরাধনা; ঈহতে-প্রয়াস করেন; লভতে-লাভ করেন; চ-এবং; ততঃ-তাঁর থেকে; কামান্-কামনাসমূহ; ময়া-আমার দ্বারা; এব-কেবল; বিহিতান্-বিহিত; হি-অবশ্যই: তান্-সেই।

গীতার গান

সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত দেব আরাধন।
করিয়া সে ফল পায় আমার কারণ ॥
কিন্তু সেই সেই ফল অনিত্য সকল।
স্বল্প মেধা চাহে তাই সাধন বিফল ॥

অনুবাদ

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অনুমতি ছাড়া দেব-দেবীরা তাঁদের ভক্তদের কোন রকম বর দান করে পুরস্কৃত করতে পারেন না। সব কিছুই যে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, সেই কথা জীব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু দেবতারা তা ভোলেন না। তাই, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই ব্যবস্থা অনুসারে সাধিত হয়। এই ব্যাপারে দেব-দেবীরা হচ্ছেন উপলক্ষ্য মাত্র। অল্প-বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সেই কথা জানে না, তাই তারা কিছু সুবিধা লাভের জন্য নির্বোধের মতো বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সেই জন্য প্রার্থনা করেন। জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করা যদিও শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ নয়। কিন্তু জীব মাত্রই দেবতাদের শরণাপন্ন হয়, কারণ তারা কামনা চরিতার্থ করার জন্য মত্ত হয়ে থাকে। এটি তখনই হয়, যখন সে কোন ভ্রান্ত অনর্থ কামনা করে, যার পূর্তি ভগবান নিজে করেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ ভগবানের আরাধনা করে সেই সঙ্গে জড় সুখ কামনা করে, তবে তা পরস্পর বিরোধী ও অসঙ্গত। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা একই পর্যায়ে হতে পারে না, কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত, আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত।

যে জীব তার যথার্থ আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চায়, তার কাছে জাগতিক কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে এক একটি প্রতিবন্ধক। তাই, শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগৈশ্বর্য দান করেন না, যা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আবার সেগুলিই লাভ করবার জন্য দেবোপাসনায় তৎপর হয়।

শ্লোক ২৩

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।। ২৩ ।।

অন্তবৎ-সীমিত ও অস্থায়ী; তু-কিন্তু, ফলম্-ফল; তেষাম্-তাদের; তৎ-সেই; ভবতি-হয়; অল্পমেধসাম্-অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের; দেবান্-দেবতাগণকে; দেবযজঃ-দেবোপাসকগণ; যান্তি-প্রাপ্ত হন; মৎ-আমার; ভক্তাঃ-ভক্তগণ; যান্তি-প্রাপ্ত হন; মাম্-আমাকে; অপি-অবশ্যই।

গীতার গান

তারা দেবলোকে যায় অনিত্য সে ধাম।
মোর ভক্ত মোর ধামে নিত্য পূর্ণকাম ॥
স্বল্পবুদ্ধি যার হয় সে বলে নিরাকার।
জানে না তাহারা চিদ বিগ্রহ আমার ॥

অনুবাদ

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনা লব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, কোন দেব-দেবীর উপাসনা যে করে, সে-ও ভগবানের কাছে যেতে পারে, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, দেবোপাসকেরা সেই সমস্ত গ্রহলোকে যায়, যেখানে তাদের উপাসিত দেব-দেবীরা অধিষ্ঠিত। যেমন, সূর্যের উপাসকেরা সূর্যলোকে যায়, চন্দ্রের উপাসকেরা চন্দ্রলোকে যায়। তেমনই, কেউ যদি ইন্দ্রের মতো দেবতার উপাসনা করে, তা হলে সে সেই বিশেষ দেবতার লোকে যেতে পারে। এমন নয় যে, যে-কোন দেব-দেবীর পূজা করলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়। এখানে সেই কথা অস্বীকার করা হয়েছে। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা এই জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত সরাসরিভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধামে গমন করেন।

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, দেব-দেবীরা যদি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হন, তা হলে তাদের পূজা করার মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া উচিত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেব-দেবীর উপাসকেরা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাই তারা জানে না দেহের কোন অংশে খাদ্য দিতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এত বোকা যে, তারা দাবি করে, ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নভাবে খাবার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেউ কি কান দিয়ে কিংবা চোখ দিয়ে দেহকে খাওয়াতে পারে? তারা জানে না যে, বিভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন এক-একজন ভগবান এবং তাঁরা সকলেই ভগবানের প্রতিদ্বন্দী।

দেব-দেবীরাই কেবল ভগবানের অংশ নন, সাধারণ জীবেরাও ভগবানের অংশ-বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা হচ্ছে ভগবানের মস্তক, ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছে তাঁর বাহু, বৈশ্যেরা তাঁর উদর, শূদ্রেরা হচ্ছে তাঁর পদ এবং তারা সকলেই এক-একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করছে। মানুষ যে স্তরেই থাক না কেন, যদি সে বুঝতে পারে যে, দেব-দেবীরা ও সে নিজে ভগবানের অংশ-বিশেষ, তা হলে তার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এটি না বুঝতে পেরে সে যদি কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে, তা হলে সে সেই

দেবলোকে গমন করে। এটি সেই একই গন্তব্যস্থল নয়, যেখানে ভক্তেরা পৌঁছয়। দেব-দেবীদের তুষ্ট করার ফলে যে বর লাভ হয়, তা ক্ষণস্থায়ী, কারণ এই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেব-দেবীরা, তাঁদের ধাম ও তাঁদের উপাসক সব কিছুই বিনাশশীল। তাই, এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজা করে যে ফল লাভ হয়, তা বিনাশশীল এবং অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করার ফলে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন। তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা দেবোপাসকদের প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান অসীম, তাঁর অনুগ্রহ অসীম এবং তাঁর করুণাও অসীম। তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উপর তাঁর যে করুণা বর্ষিত হয়, তা অসীম।

শ্লোক ২৪

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তম্-অব্যক্ত; ব্যক্তিম্-ব্যক্তিত্ব; আপন্নম্- প্রাপ্ত; মন্যন্তে-মনে করে; মাম্-আমাকে; অবুদ্ধয়ঃ-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ; পরম্-পরম; ভাবম্-ভাব; অজানন্তঃ-না জেনে; মম-আমার; অব্যয়ম্-অব্যয়; অনুত্তমম্ সর্বোত্তম।

গীতার গান

সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ হয় আমার শরীর।
অব্যয় সচ্চিদানন্দ যাহা জানে সব ধীর ॥
আমি সূর্য সম নিত্য সনাতন ধাম।
সবার নিকটে নহি দৃশ্য আত্মারাম ।।

অনুবাদ

বুদ্ধিহীন মানুষেরা, যারা আমাকে জানে না, মনে করে যে, আমি পূর্বে অব্যক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে দেবোপাসকদের অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানে নির্বিশেষবাদীদেরও সেই রকম বুদ্ধিহীন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে অর্জুনের সঙ্গে এখানে কথা বলছেন, অথচ নির্বিশেষবাদীরা এতই মূর্খ যে, অন্তিমে ভগবানের কোন রূপ নেই বলে তারা তর্ক করে। শ্রীরামানুজাচার্যের পরম্পরায় মহিমাময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীযামুনাচার্য এই সম্পর্কে একটি অতি সমীচীন শ্লোক রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন-

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈব পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥

"হে ভগবান! মহামুনি ব্যাসদেব, নারদ আদি ভক্তেরা তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান এলে জানেন। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার গুণ, রূপ, লীলা আদি সম্বন্ধে

অবগত হওয়া যায় এবং জানতে পারা যায় যে, তুমিই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত অভক্ত অসুরেরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না, কারণ তোমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে তারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই ধরনের অভক্তেরা বেদান্ত, উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা সম্ভব নয়।" (স্তোত্ররত্ন ১২)

ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, কেবল বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারা যায় না। ভগবানের কৃপার ফলেই কেবল তিনি যে পরম পুরুষোত্তম, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তাই, এই শ্লোকে 'পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর উপাসকেরাই কেবল অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, যে সমস্ত অভক্ত বেদান্ত ও বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের কল্পনাপ্রসূত মতবাদ পোষণ করে এবং যাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতের লেশমাত্র নেই, তারাও অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদের পক্ষে ভগবানের সবিশেষ রূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। যারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার, তাদের অবুদ্ধয়ঃ বলা হয়েছে অর্থাৎ এরা পরম-তত্ত্বের পরম রূপকে জানে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অন্বয়-জ্ঞানের সূচনা হয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে, তারপর তা পরমাত্মার স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু পরম-তত্ত্বের শেষ কথা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। আধুনিক যুগের নির্বিশেষবাদীরা বিশেষভাবে মূর্খ, কারণ তারা এমন কি তাদের পূর্বতন মহান আচার্য শঙ্করাচার্যের শিক্ষাও অনুসরণ করে না, যিনি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। নির্বিশেষবাদীরা তাই পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত না হয়ে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকী ও বসুদেবের সন্তান মাত্র, অথবা একজন রাজকুমার, অথবা একজন অত্যন্ত শক্তিশালী জীব মাত্র। ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান এই ভ্রান্ত ধারণার নিন্দা করে বলেছেন, অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্- "অত্যন্ত মূঢ় লোকগুলিই কেবল আমাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে।"

প্রকৃতপক্ষে, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করে কৃষ্ণভাবনা অর্জন না করলে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/২৯) এই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে-

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিশ্বন্ ॥

"হে ভগবান! আপনার শ্রীচরণ-কমলের কণামাত্রও কৃপা যে লাভ করতে পারে, সে আপনার মহান পুরুষত্বের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেবলই জল্পনা-কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতে থাকলেও আপনাকে জানতে সক্ষম হয় না।" কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা আর বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা আদি জানতে পারা যায় না। তাঁকে জানতে হলে অবশ্যই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। কেউ যখন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে -এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে ভক্তিযোগ অনুশীলন শুরু করে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে মগ্ন হয়, তখনই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায়। নির্বিশেষবাদী অভক্তেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ এই জড়া প্রকৃতির তৈরি এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ, লীলা আদি সবই মায়া। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীদের বলা হয় মায়াবাদী। তারা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বিংশতি শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ -"কামনা-বাসনা দ্বারা যারা অন্ধ, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়।" এটিও স্বীকৃত হয়েছে যে, ভগবানের পরম ধাম ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে। ত্রয়োবিংশতিতম শ্লোকে বলা হয়েছে, দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি- দেব-দেবীর উপাসকেরা দেব-দেবীদের বিভিন্ন লোকে যায় এবং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তারা কৃষ্ণলোকে যায়। যদিও এই সব কিছুই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও মূঢ় নির্বিশেষবাদীরা দাবি করে যে, ভগবান নিরাকার এবং তাঁর এই সমস্ত রূপ আরোপণ মাত্র। গীতা পড়ে কি কখনও মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাঁদের লোকগুলি নির্বিশেষ? তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বিভিন্ন দেব-দেবীরা কেউই নির্বিশেষ নন। তাঁরা সকলেই সবিশেষ ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর নিজস্ব গ্রহধাম আছে এবং দেব-দেবীদেরও তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে।
তাই অদ্বৈতবাদীদের মতবাদ এই যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার এবং তাঁর রূপ কেবল আরোপণ মাত্র, তা সত্য বলে প্রমাণিত নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপ আরোপিত নয়। ভগবদ্গীতা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর ও ভগবানের রূপ একই সঙ্গে বিদ্যমান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সচ্চিদানন্দময়। বেদেও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন আনন্দময়োহভ্যাসাৎ অর্থাৎ স্বভাবতই তিনি চিৎ-ঘনানন্দ এবং তিনি অনন্ত শুভ মঙ্গলময় গুণের আধার। গীতাতে ভগবান বলেছেন যে, যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি আবির্ভূত হন। গীতার মাধ্যমে ভগবানের সম্বন্ধে এই সমস্ত তত্ত্ব আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। মায়াবাদীরা যে মনে করে ভগবান নির্বিশেষ, সেটি আমাদের ধারণারও অতীত। গীতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীদের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে এবং ব্যক্তিত্ব আছে।

শ্লোক ২৫

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ন-না; অহম্-আমি; প্রকাশঃ-প্রকাশিত; সর্বস্য সকলের কাছে; যোগমায়া-অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; সমাবৃতঃ-আবৃত; মূঢ়ঃ-মূঢ়; অয়ম্-এই; ন-না; অভিজানাতি-জানতে পারে; লোকঃ- ব্যক্তিরা; মাম্-আমাকে; অজম্-জন্মরহিত; অব্যয়ম্-অব্যয়।

গীতার গান

উপরোক্ত মূঢ় লোক নাহি দেখে মোরে।
আমি যে অব্যয় আত্মা অজর অমরে ॥

অনুবাদ

আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

অনেক সময় অনেকে যুক্তি দেখায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি সকলেরই গোচরীভূত ছিলেন, তা হলে এখন তিনি সবার সামনে প্রকট হন না কেন? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত হননি। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বসুন্ধরায় অবতরণ করেছিলেন, তখন কয়েকজন দুর্লভ মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পেরেছিলেন। কৌরব সভায়, যখন শিশুপাল সভার অধ্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাচিত করণের বিরোধিতা করেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেন। সেই রকম পঞ্চপাণ্ডব আদি কিছু সংখ্যক মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পেরেছিলেন, সকলে পারেনি। অভক্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রকাশিত হননি। তাই ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া আর সকলেই তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে মনে করে। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদেরই কাছে সমস্ত আনন্দের উৎসরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে যোগমায়ার দ্বারা আবৃত করে রেখেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৮/১৯) কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন যে, ভগবান যোগমায়ার যবনিকার দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন, তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। যোগমায়ার আবরণ সম্পর্কে শ্রীঈশোপনিষদেও (মন্ত্র ১৫) প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যেখানে ভক্ত প্রার্থনা করছেন-

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

"হে ভগবান! তুমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। তোমাকে ভক্তি করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তুমি আমাকেও পালন কর। তোমার অপ্রাকৃত রূপ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। ব্রহ্মজ্যোতিই তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির আবরণ। কৃপা করে তুমি তোমার এই জ্যোতির্ময় আবরণকে উন্মোচিত করে তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন দান কর।" ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁর চিন্ময়-শক্তি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই কারণেই অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিশেষবাদীরা ভগবানকে দেখতে পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/১৪/৭) ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে পরম পুরষোত্তম ভগবান। হে পরমাত্মন্! হে সমস্ত রহস্যের স্বামী! এই জগতে আপনার শক্তি ও লীলা কে হিসাব করতে পারে? আপনি সর্বদাই আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার করছেন, তাই কেউই আপনাকে বুঝতে পারে না। বিদ্বান বৈজ্ঞানিকেরা ও পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহের সমস্ত অণু-পরমাণুর হিসাব করতে পারলেও, কিন্তু তবুও তারা কখনই তোমার অনন্ত শক্তির হিসাব করতে পারে না, যদিও তুমি সকলের সামনে বিদ্যমান।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল অজই নন, তিনি অব্যয়ও। তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁর সমস্ত শক্তি অক্ষয় অব্যয়।

শ্লোক ২৬

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

বেদ-জানি; অহম্-আমি; সমতীতানি-সম্পূর্ণরূপে অতীত; বর্তমানানি-বর্তমান; চ-এবং; অর্জুন-হে অর্জুন; ভবিষ্যাণি-ভবিষ্যৎ; চ-ও; ভূতানি-জীবসমূহ; মাম্-আমাকে; তু-কিন্তু; বেদ-জানে; ন-না; কশ্চন-কেউই।

গীতার গান

আমার আনন্দরূপ নিত্য অবস্থিতি।
সে কারণে হে অর্জুন ত্রিকালবিধিতি ॥
বর্তমান ভবিষ্যৎ অথবা অতীত।
সমস্ত কালের গতি আমাতে বিদিত ॥
কিন্তু মূঢ় লোক যারা নাহি জানে মোরে।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ বিদিত সংসারে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

তাৎপর্য

ভগবানের রূপ নির্বিশেষ না সবিশেষ, সেই সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের ধারণা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের রূপ যদি মায়া হত তা হলে আর সমস্ত জীবের মতো তাঁরও দেহান্তর হত এবং তার ফলে তিনি তাঁর পূর্বজীবনের সব কথা ভুলে যেতেন। জড় শরীর-বিশিষ্ট কেউই তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে রাখতে পারে না এবং তার ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, তা ছাড়া তার বর্তমান জীবনের পরিণাম সম্পর্কেও পূর্বাভাস দিতে অক্ষম। অতএব সে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ। জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত না হতে পারলে কেউই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে না।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাঁর তুলনা হয় না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি পূর্ণরূপে জানেন অতীতে কি হয়েছিল, বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও কি হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেব বিবস্বানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মনে আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীব সম্বন্ধেই জানেন, কারণ তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবেরই অন্তরে বিরাজ করছেন। কিন্তু যদিও তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের অন্তরে এবং এই জগতের অতীত ভগবৎ-ধামে ভগবৎ-স্বরূপে বিরাজ করছেন, তবুও অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করতে পারলেও, পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পারে না। ভগবানের দিব্য শ্রীবিগ্রহ অবিনশ্বর ও নিত্য। ভগবান হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো এবং মায়া একটি মেঘের মতো। জড় আকাশে আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য আছে, মেঘ আছে ও গ্রহ-নক্ষত্র আছে। আমাদের সীমিত দৃষ্টির জন্যই আমরা মনে করি যে, সূর্য, চন্দ্র আদিকে মেঘ ঢেকে ফেলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র কখনই আচ্ছাদিত হয় না। তেমনই, মায়াও কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন দুর্লভ ব্যক্তি এই মানবজন্মে সিদ্ধি লাভের প্রয়াসী হয় এবং এই রকম হাজার হাজার সিদ্ধ-পুরুষের মধ্যে কোন একজন কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে সক্ষম হন। এমন কি যদিও কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই জানতে পারা যায়

না।

শ্লোক ২৭

"ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দ্বন্দুমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

ইচ্ছা-বাসনা; দ্বেষ-দ্বেষ; সমুখেন-উদ্ভূত; দ্বন্দু-দ্বন্দু; মোহেন-মোহের দ্বারা: ভারত-হে ভারত; সর্ব-সমস্ত; ভূতানি-জীবসমূহ: সম্মোহম্-মোহাচ্ছন্ন; সর্গে-সৃষ্টির সময়ে; যান্তি-প্রাপ্ত হয়; পরন্তপ-হে শত্রু নিপাতকারী।

গীতার গান

দুর্ভাগা যে লোক সেই দ্বন্দেতে মোহিত।
ইচ্ছা দ্বেষ দ্বারা তারা সংসারে চালিত ॥
অতএব হে ভারত তারা জন্মকালে।
পূর্বাপূর্ব সংস্কারের সর্বদা কবলে ॥

অনুবাদ

হে ভারত। হে পরন্তপ! ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

তাৎপর্য

জীবের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে যে, সে শুদ্ধ জ্ঞানময় ভগবানের নিত্য দাস। কেউ যখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই শুদ্ধ জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে মায়ার কবলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। মায়ার অভিব্যক্তি হয় ইচ্ছা, দ্বেষ আদি দ্বন্দের মাধ্যমে। ইচ্ছা ও দ্বেষের প্রভাবেই অজ্ঞানী মানুষ ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করতে শুরু করে। যাঁরা ইচ্ছা ও দ্বেষের মোহ অথবা কলুষ থেকে মুক্ত, ভগবানের সেই শুদ্ধ ভক্তেরা বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন, কিন্তু যারা দ্বন্দু ও অজ্ঞানতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তারা মনে করে যে, জড়া শক্তি থেকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সৃষ্টি হয়। এটি তাদের দুর্ভাগ্য। এ ধরনের মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, স্ত্রী-পুরুষ, ভাল-মন্দ আদির দ্বন্দ্বে প্রভাবান্বিত হয়ে মনে করে, "এই আমার স্ত্রী, এটি আমার বাড়ি, আমি এই বাড়ির মালিক। আমি এই স্ত্রীর স্বামী।" এটিই হচ্ছে মোহের দ্বন্দু। যারা এভাবেই দ্বন্দুের দ্বারা মোহিত, তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২৮

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দুমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

যেষাম্-যে সমস্ত; তু-কিন্তু; অন্তগতম্-সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত; পাপম্-পাপ; জনানাম্-

ব্যক্তিদের; পুণ্য-পুণ্য; কর্মণাম্-কর্মকারী; তে-তাঁরা; দ্বন্দু-দ্বন্দু; মোহ-মোহ; নির্মুক্তাঃ-বিমুক্ত; ভজন্তে-ভজনা করেন; মাম্-আমাকে, দৃঢ়ব্রতাঃ -দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে।

গীতার গান

নিষ্পাপ হয়েছে যারা পুণ্যকর্ম দ্বারা।
দ্বন্দুমোহ হতে মুক্ত হয়েছে যাহারা ॥
তারা হয় দৃঢ়ব্রত ভজনে আমার।
নির্ভয় তাহারা সব জিনিতে সংসার ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দমোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

যাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্য, তাঁদের কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা পাপী, নাস্তিক, মূঢ় ও প্রবঞ্চক, তাদের পক্ষে ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বন্দু থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যাঁরা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করে জীবনকে. অতিবাহিত করেছেন এবং যাঁরা পুণ্যকর্ম করে নিষ্পাপ হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। তখন তাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্যানে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হতে পারেন। এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থা। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণভাবনায় এই উন্নত স্তর লাভ করা সম্ভব, কেন না মহান ভক্তদের সঙ্গের ফলে মানুষ মোহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।
শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/২) বলা হয়েছে যে, যদি কেউ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তের সেবা করতে হবে (মহৎসেবাং দ্বারমাহবিমুক্তেঃ); কিন্তু বিষয়ী লোকদের সঙ্গের প্রভাবে মানুষ জড় অস্তিত্বের অন্ধতম প্রদেশের দিকে ধাবিত হয় (তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্)। ভগবানের অনুগত মহাভাগবতেরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মানুষদের উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবী পর্যটন করেন।
নির্বিশেষবাদীরা জানে না যে, ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁদের স্বরূপ ভুলে যাওয়াই হচ্ছে ভগবানের আইন লঙঘন করা। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, অথবা দৃঢ় সংকল্পের নঙ্গে দিবা ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হতে পারে না।

শ্লোক ২৯

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

জরা-বার্ধক্য, মরণ-মৃত্যু; মোক্ষায়-মুক্তি লাভের জন্য; মাম্-আমাকে; আশ্রিত্য-আশ্রয় করে; যতন্তি-যত্ন করেন; যে-যাঁরা; তে-তাঁরা; ব্রহ্ম-ব্রহ্ম; তৎ-সেই; বিদুঃ-জানতে পারেন; কৃৎস্নম্-সব কিছু; অধ্যাত্মম্-অধ্যাত্মতত্ত্ব; কর্ম-কর্মতত্ত্ব; চ-ও; অখিলম্-সম্পূর্ণরূপে।

গীতার গান

আমাকে আশ্রয় করি যে জন সংসারে।

জরা মরণ মোক্ষের মার্গ সদা যত্ন করে ।
সে যোগী জানে তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা।
কিংবা কর্মগতি যাহা জানে সে ধর্মাত্মা ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে যত্ন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত, কেন না তাঁরা অধ্যাত্মতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব সব কিছু সম্পূর্ণরূপে অবগত।

তাৎপর্য

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দ্বারা এই জড় শরীর আক্রান্ত হয়, কিন্তু চিন্ময় দেহ কখনই এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। চিন্ময় দেহের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নেই। তাই, কেউ যখন তার চিন্ময় দেহ ফিরে পায়, তখন সে ভগবানের নিত্য পার্যদত্ব লাভ করে এবং ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন সে যথার্থই মুক্ত। অহম্ ব্রহ্মাস্মি-আমি ব্রহ্মা। কথিত আছে-প্রত্যেকের জানা উচিত যে, সে হচ্ছে ব্রহ্মা বা আত্মা। ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবা করার মধ্যেও এই ব্রহ্মানুভূতির অবকাশ রয়েছে, যা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থান করেন এবং তাঁরা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত।

ভগবৎ-সেবা পরায়ণ চার প্রকার অশুদ্ধ ভক্তের যখন অভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ হয়, তখন তারাও ভগবানের দিব্য সাহচর্য লাভ করে। কিন্তু যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে, তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য ধামে পৌঁছতে পারে না। এমন কি অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানীরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছতে পারে না। যাঁরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেন (মাম্ আশ্রিত্য), তাঁদেরই যথার্থ 'ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করা যায়, কারণ, তাঁরা বাস্তবিকই কৃষ্ণলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী। এই ধরনের ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, তাই তাঁরা বাস্তবিকই 'ব্রহ্ম'।

যাঁরা ভগবানের অর্চা বিগ্রহের উপাসনা করেন, অথবা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবানের ধ্যান করেন, তাঁরাও ভগবানের কৃপার ফলে ব্রহ্মা, অধিভূত আদির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। সেই কথা ভগবান পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩০

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

সাধিভূত-অধিভূত; অধিদৈবম্-অধিদৈব; মাম্-আমাকে; সাধিযজ্ঞম্-অধিযজ্ঞ সহ, চ-এবং; যে-যাঁরা; বিদুঃ-জানেন; প্রয়াণকালে-মৃত্যুর সময়; অপি-এমন কি; চ-এবং; মাম্-আমাকে; তে-তাঁরা; বিদুঃ-জানেন; যুক্তচেতসঃ-আমাতে আসক্তচিত্ত।

গীতার গান

অধিভূত অধিদৈব কিংবা অধিযজ্ঞ।
সেই সব তত্ত্বজ্ঞানে যারা হয় বিজ্ঞ ॥
তাহারাও প্রয়াণ সময়ে বুঝে মোরে।

পরমাত্মার সালোক্য লাভ সেই করে ।

অনুবাদ

যাঁরা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব সহ আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে অবগত হন, তাঁরা আমাতে আসক্তচিত্ত, এমন কি মরণকালেও আমাকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবা করেন, তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হন না। কৃষ্ণভাবনার অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভ করার ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় জগতের নিয়ন্তা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবীরাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই, অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভ করার ফলে ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং মৃত্যুর সময়েও এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন না। স্বভাবতই তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করে অনায়াসে ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন।

এই সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিভাবে পূর্ণ কৃষ্ণচেতনা লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির সান্নিধ্যের ফলেই কৃষ্ণভাবনা শুরু হয়। এই পারমার্থিক সঙ্গ লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং তাঁর কৃপার ফলে জানতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই সঙ্গে এটিও জানা যায় যে, স্বরূপত কৃষ্ণদাস হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায় এবং জাগতিক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সৎসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণভাবনায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করার ফলে জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কৃষ্ণকে ভুলে থাকার দরুন সে জড়া প্রকৃতির অনুশাসনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সে আরও বুঝতে পারে যে, মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে সে তার অন্তরে কৃষ্ণভাবনা বিকশিত করে তোলবার এক মহৎ সুযোগ লাভ করেছে এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করবার জন্য এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত।

এই অধ্যায়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে-আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় এবং ভগবানের আরাধনা। তবে, যিনি যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেছেন, তিনি অন্য কোন পদ্ধতিকেই কোন রকম গুরুত্ব দেন না। তিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং এভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিতা দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। সেই অবস্থায় তিনি শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করে মহানন্দ অনুভব করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এরই মাধ্যমে তাঁর পরম প্রাপ্তি সাধিত হবে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় 'দৃঢ়ব্রত'। এর থেকেই শুরু হয় ভক্তিযোগ বা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা। সমস্ত শাস্ত্রাদিতে এই কথা স্বীকৃত হয়েছে। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের সারমর্ম হচ্ছে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-পরম-তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান বিষয়ক 'বিজ্ঞান-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায় - অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; কিম্-কি; তৎ-সেই; ব্রহ্ম-ব্রহ্ম; কিম্-কি; অধ্যাত্মম্-আত্মা; কিম্-কি; কর্ম-কর্ম: পুরুষোত্তম-হে পুরুষোত্তম; অধিভূতম্-জড়-জাগতিক প্রকাশ; চ-এবং; কিম্-কি: প্রোক্তম্-বলা হয়; অধিদৈবম্-দেবতাগণ, কিম্-কি, উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
ব্রহ্ম কিংবা অধ্যাত্ম কি কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূত অধিদৈব কহ তার ক্রম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্ট করে বল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে অর্জুনের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি এখানে কর্ম, সকাম কর্ম, ভক্তিযোগ, যোগের পন্থা ও শুদ্ধ ভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই নামে অভিহিত হন। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র জীবাত্মাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন। আত্মা বলতে দেহ, আত্মা ও মনকে বোঝায়। বৈদিক অভিধান অনুসারে আত্মা বলতে মন, আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বোঝায়।
অর্জুন এখানে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলি তিনি শুধু মাত্র এক বন্ধুকে করছেন তা নয়, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান জেনে তিনি এই প্রশ্নগুলি করেছেন, যিনি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দানে পরম অধিকর্তা।

শ্লোক ২

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ।২॥

অধিযজ্ঞঃ-যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা; কথম্-কিভাবে; কঃ-কে; অত্র-এখানে; দেহে-শরীরে; অস্মিন্-এই; মধুসূদন-হে মধুসূদন; প্রয়াণকালে-মৃত্যুর সময়; চ-এবং; কথম্-কিভাবে;

জ্ঞেয়ঃ-জ্ঞাত; অসি-হও; নিয়তাত্মভিঃ-আত্ম-সংযমীর দ্বারা।

গীতার গান

অধিযজ্ঞ কিবা সেই হে মধুসূদন।
কিভাবে তোমাকে পায় প্রয়াণ যখন ॥

অনুবাদ

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, এবং এই দেহের মধ্যে তিনি কিরূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কিভাবে তোমাকে জানতে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়কেই যজ্ঞের অধীশ্বররূপে গণ্য করা হয়। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত মুখ্য দেবতাদের, এমন কি ব্রহ্মা ও শিবেরও অধীশ্বর এবং যে সমস্ত দেব-দেবী প্রকৃতির পরিচালনা কার্যে সহায়তা করেন, ইন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান দেবতা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েরই উপাসনা করা হয়। কিন্তু এখানে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে, যজ্ঞের প্রকৃত অধীশ্বর কে এবং কিভাবে তিনি জীবের দেহে অবস্থান করেন।
অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ একদা মধু নামক এক অসুরকে সংহার করেছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত, তাই তাঁর মনে এই সমস্ত সংশয়জনক প্রশ্নের উদয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং অর্জুনের মনের এই সংশয়গুলি অসুরের মতো; আর শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু অসুর সংহার করার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী, তাই অর্জুন তাঁকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁর মনের সমস্ত আসুরিক সন্দেহগুলি সমূলে বিনাশ করেন।
এই শ্লোকে প্রয়াণকালে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আমাদের সারা জীবনে আমরা যা কিছুই করি, তার পরীক্ষা হয় আমাদের মৃত্যুর সময়। অর্জুনের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, মৃত্যুর সময় কৃষ্ণভাবনাময় ভগবস্তুক্তেরা ভগবানের কথা স্মরণ করতে পারেন কি না, কারণ মৃত্যুর সময় দেহের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মন তখন স্বাভাবিক অবস্থায় নাও থাকতে পারে। এভাবেই দেহের অস্বাভাবিক অবস্থায় বিচলিত হয়ে, তখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই, মহাভাগবত মহারাজ কুলশেখর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান! আমার শরীর এখন সুস্থ এবং এখনই যেন আমার মৃত্যু হয়, যাতে আমার মনরূপী রাজহংস তোমার শ্রীচরণ-কমল লতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।" এখানে এই উপমার অবতারণা করা হয়েছে, কারণ রাজহংস যেমন কমল-কর্ণিকায় প্রবেশ করে আনন্দিত হয়, তেমনই শুদ্ধ ভগবস্তুক্তের মনরূপী রাজহংস ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। মহারাজ কুলশেখর পরমেশ্বরকে জানাচ্ছেন, "এখন আমার মন অবিচলিত রয়েছে, আর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি। যদি আমি এখনই তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করি, তা হলে আমি নিশ্চিত হব যে, তোমার প্রতি আমার প্রেমভক্তি সার্থকতা লাভ করবে। কিন্তু যদি আমার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে কি যে ঘটবে তা আমি জানি না, কারণ সেই সময়ে আমার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হবে, আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর তাই, আমি জানি না, আমি তোমার নাম জপ করতে পারব কি না। তাই, এখনই এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হোক।" অর্জুন তাই প্রশ্ন করছেন-মৃত্যুর সময় কিভাবে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে একাগ্র রাখা যায়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অক্ষরম্-বিনাশ-রহিত; ব্রহ্ম-ব্রহ্মা; পরমম্-পরম; স্বভাবঃ-নিত্য স্বভাব; অধ্যাত্মম্-অধ্যায়; উচ্যতে-বলা হয়; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ-জীবের জড় দেহের উৎপত্তিকর; বিসর্গঃ-সৃষ্টি; কর্ম-কর্ম; সংজ্ঞিতঃ-কথিত হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:
অক্ষয় বিনাশ নাই অতএব ব্রহ্ম।
আমি ভগবান সেজন্য পরমব্রহ্ম ॥
পরমাত্মা আর যে ভগবান।
সেই যে পরমতত্ত্ব সেই ব্রহ্মজ্ঞান ॥
কর্ম সে কারণ জড় শরীর বিসর্গ।
ভূতোদ্ভব যার নাম শুন তার বর্গ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-নিত্য বিনাশ-রহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তার নিত্য স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলে। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর সংসারই কর্ম।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা অবিনশ্বর, নিত্য শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই ব্রহ্মেরও অতীত হচ্ছে পরব্রহ্মা। ব্রহ্ম বলতে জীবকে বোঝায় এবং পরব্রহ্মা বলতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝায়। জীবের স্বরূপ জড় জগতে তার যে স্থিতি তার থেকে ভিন্ন। জড় চেতনায় জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কিন্তু পারমার্থিক কৃষ্ণভাবনায় তার স্থিতি হচ্ছে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা। জীব যখন জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন তাকে জড় জগতে নানা রকম দেহ ধারণ করতে হয়। তাকে বলা হয় কর্ম, অর্থাৎ জড় চেতনার প্রভাবে উৎপন্ন নানাবিধ সৃষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যে জীবকে বলা হয় জীবাত্মা ও ব্রহ্ম, কিন্তু কখনই তাকে পরব্রহ্ম বলা হয় না। জীবাত্মা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়-কখনও সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়ে নিজেকে সে জড় পদার্থ বলে মনে করে, আবার কখনও সে নিজেকে উৎকৃষ্ট, পরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলে মনে করে। তাই, তাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়। অপরা ও পরা প্রকৃতিতে তার স্থিতি অনুসারে সে পঞ্চভৌতিক জড় দেহ অথবা চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সে যখন নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে, তখন সে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন শরীরের কোনও একটি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে তার রূপ একটি। জড়া প্রকৃতিতে সে তার কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি আদির শরীর প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে নানা রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য সে কখনও কখনও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার সেই পুণ্য-কর্মফলগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে এই পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈদিক যাগযজ্ঞের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞের বেদিতে পাঁচ রকমের অগ্নিকুণ্ডে পাঁচ রকমের অর্ঘ্য দান করা হয়। পঞ্চবিধ অগ্নিকুণ্ডকে বিভিন্ন স্বর্গলোক, মেঘ, পৃথিবী, নর ও নারীরূপে ধারণা করা হয় এবং পঞ্চবিধ যাজ্ঞিক অর্ঘ্যগুলি হচ্ছে বিশ্বাস, চন্দ্রলোকের ভোক্তা, বৃষ্টি, শস্য ও বীর্য।

বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে জীবাত্মা বিভিন্ন স্বর্গলোকে গমন করতে

পারে। তারপর সেই যজ্ঞের ফলে অর্জিত পুণ্য-কর্মফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে বৃষ্টির মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তারপর সে শস্যকণায় পরিণত হয়। মানুষ সেই শস্য আহার করে এবং তা বীর্যে পরিণত হয়, তারপর সেই বীর্য স্ত্রীযোনিতে সঞ্চারিত হয়ে গর্ভবতী করে। এভাবেই জীবাত্মা আবার মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এভাবেই জীব প্রতিনিয়ত এই জড় জগতে গমনাগমন করতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত অবশ্য এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিহার করেন। তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করেন।

নির্বিশেষবাদীরা অযৌক্তিকভাবে গীতার ব্যাখ্যা করে অনুমান করে যে, ব্রহ্মা জড় জগতে জীবরূপ ধারণ করে এবং তার প্রমাণস্বরূপ তারা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের অবতারণা করে। কিন্তু এই শ্লোকে জীবাত্মা সম্পর্কে পরমেশ্বর এই কথাও বলেছেন যে, "আমারই নিত্য ভিন্ন অংশ"। ভগবানের অণুসদৃশ অংশ জীবাত্মা জড় জগতে পতিত হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান (অচ্যুত) কখনও পতিত হন না। তাই পরমব্রহ্ম জীবে পরিণত হন এই অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মা (জীবাত্মা) ও পরম-ব্রহ্মকে (পরমেশ্বরকে) কখনই এক বলে বর্ণনা করা হয়নি, সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

শ্লোক ৪

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ।৪ ॥

অধিভূতম্-অধিভূত; ক্ষরঃ-নিয়ত পরিবর্তনশীল; ভাৰঃ-ভাব; পুরুষঃ-সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ; চ-এবং; অধিদৈবতম্ অধিদৈব বলা হয়; অধিযজ্ঞঃ-পরমাত্মা; অহম্-আমি (শ্রীকৃষ্ণ); এব-অবশ্যই; অত্র-এই; দেহে শরীরে; দেহভূতাম্-দেহধারীদের মধ্যে; বর- শ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

পদার্থ যে অধিভূত ক্ষর ভাব নাম।
বিরাট পুরুষ সেই অধিদৈব নাম ॥
অন্তর্যামী আমি সেই অধিযজ্ঞ নাম।
যত দেহী আছে তার হৃদে মোর ধাম ॥

অনুবাদ

হে দেহধারীশ্রেষ্ঠ। নশ্বর জড়া প্রকৃতি অধিভূত। সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে অধিদৈব বলা হয়। আর দেহীদের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী রূপে আমিই অধিযজ্ঞ।

তাৎপর্য

প্রতিনিয়তই প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। জড় শরীর সাধারণত ছয়টি অবস্থা প্রাপ্ত হয়-তার জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, প্রজনন করে, ক্ষীণ হয় এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় অধিভূত। এক সময় এর সৃষ্টি হয় এবং কোন এক সময় এর বিনাশ হয়। ভগবানের বিশ্বরূপ, যাতে সমস্ত দেব-দেবীরা ও তাঁদের

নিজস্ব লোকসমূহ অবস্থিত, তাকে বলা হয় অধিদৈবত। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা, যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁকে বলা হয় অধিযজ্ঞ। এই শ্লোকের এব শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শব্দটির দ্বারা ভগবান এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, এই পরমাত্মা তাঁর থেকে অভিন্ন। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের সঙ্গে থেকে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলেন এবং তিনি হচ্ছেন তাদের বিবিধ চেতনার উৎস। পরমাত্মা জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দেন এবং তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবা পরায়ণ শুদ্ধ ভক্তের কাছে আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে কনিষ্ঠ ভক্ত অধিদৈবত নামক ভগবানের সুমহান বিশ্বরূপের ধ্যান করে, কারণ তখন সে ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, কনিষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের বিশ্বরূপের অথবা বিরাট পুরুষের ধ্যান করতে উপদেশ দেওয়া হয়, যাঁর পদদ্বয় হচ্ছে পাতাললোক, যাঁর চক্ষুদ্বয় হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র এবং যাঁর মস্তক হচ্ছে ঊর্ধ্বলোক।

শ্লোক ৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্তকালে-অন্তিম সময়ে; চ-ও; মাম্-আমাকে; এব-অবশ্যই; স্মরন্-স্মরণ করে; মুক্তা-ত্যাগ করে; কলেবরম্ দেহ; যঃ-যিনি; প্রয়াতি-প্রয়াণ করেন; সঃ-তিনি; মদ্ভাবম্-আমার স্বভাব; যাতি লাভ করেন; নাস্তি-নেই; অত্র-এখানে; সংশয়ঃ-সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব অন্তকালে আমারে স্মরিয়া।
যেবা চলি যায় এই শরীর ছাড়িয়া ॥
সে পায় আমার ভাব অমর সে হয়।
নিশ্চয়ই কহিনু এই নাহিত সংশয় ॥

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান সকল শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম। সুতরাং, নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকলে শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম হয়ে ওঠা যায়। এখানে স্মরন শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত জীবেরা অশুদ্ধ, যারা কখনও ভগবদ্ভক্তি সাধন করেনি, তাদের পক্ষে ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা উচিত। জীবনের শেষে সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অপরিহার্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখতে হলে সর্বক্ষণ অবিরামভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ

দিয়েছেন যে, প্রত্যেকের তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া উচিত (তরোরিব সহিষ্ণুনা)। যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ কীর্তন করবেন, তাঁর অনেক রকম বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নগুলিকে সহ্য করে তাঁকে অনবরত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-কীর্তন করে যেতে হবে, যাতে জীবনের অন্তিমকালে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৬

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যম্ যম্-যেমন যেমন; বা-বা; অপি-ও; স্মরন্-স্মরণ করে; ভাবম্ভাব; ত্যজতি-ত্যাগ করেন; অন্তে-অন্তিমকালে; কলেবরম্ দেহ; তম্ তম্-সেই সেই; এব-অবশ্যই; এতি-প্রাপ্ত হন; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; সদা-সর্বদা; তৎ-সেই; ভাব-ভাব; ভাবিতঃ-তন্ময়চিত্ত।

গীতার গান

যে যেই স্মরণ করে জীব অন্তকালে।
যেভাবে সে ত্যাজে নিজ জড় কলেবরে ॥
সেই সেই ভাবযুক্ত তত্ত্ব লাভ করে।
হে কৌন্তেয়! থাকি সদা সেই ভাব ঘরে ॥

অনুবাদ

অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সংকটময় মুহূর্তে কিভাবে জীবের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মানুষ দেহত্যাগ করবার সময়ে কৃষ্ণচিন্তা করে, সে পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি অর্জন করে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যে, শ্রীকৃষ্ণবিহীন অন্য কিছু চিন্তা করলেও সেই পরা প্রকৃতি অর্জন করা যায়। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করতে হবে। কিভাবে উপযুক্ত মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করা যায়? এক মহান ব্যক্তি হয়েও মৃত্যুর সময় মহারাজ ভরত হরিণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হন। হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পশুর শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই, জীবিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত চিন্তা করে থাকি, সেই অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং, এই জীবনই সৃষ্টি করে আমাদের পরবর্তী জীবন। কেউ যদি সর্বক্ষণ শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় ও চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তা হলে তাঁর পক্ষে জীবনের অন্তিমকালে কৃষ্ণচিন্তা করা সম্ভব। সেটিই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতিতে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করবে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন হয়ে থাকলে, পরবর্তী জীবনে অপ্রাকৃত শরীর ধারণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাঁকে আর জড় দেহ ধারণ করতে হয় না। তাই, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে জীবনের অন্তিমকালে ভাব পরিবর্তনের সফলতম শ্রেষ্ঠ

উপায়।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ-অতএব; সর্বেষু-সব; কালেষু-সময়ে; মাম্-আমাকে; অনুস্মর-স্মরণ করে; যুধ্য যুদ্ধ কর; চ-ও; ময়ি আমাতে; অর্পিত-সমর্পিত হলে; মনঃ-মন; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; মাম্-আমাকে; এব-অবশ্যই; এষ্যসি-পাবে; অসংশয়ঃ-নিঃসন্দেহে।

গীতার গান

অতএব তুমি সদা আমাকে স্মরিবে।
কায়মন বুদ্ধি সব আমাকে অর্পিবে ॥
সেভাবে থাকিলে মোরে পাইবে নিশ্চয়।
আমাতে অর্পিত মন যদি অসংশয় ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত প্রতিটি মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বলছেন না যে, মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ তার নিজের কর্তব্যকর্ম করে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। তার ফলে সে জড়-জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তার মন ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে জীব নিঃসন্দেহে পরম ধাম কৃষ্ণলোকে উত্তীর্ণ হবে।

শ্লোক ৮

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

অভ্যাস-অভ্যাস; যোগযুক্তেন-যোগে যুক্ত হয়ে; চেতসা-মন ও বুদ্ধির দ্বারা; ন অন্যগামিনা-অনন্যগামী; পরমম্-পরম; পুরুষম্-পুরুষকে, দিব্যম্-দিব্য; যাতি-প্রাপ্ত হন; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; অনুচিন্তয়ন্-অনুক্ষণ চিন্তা করে।

গীতার গান

কঠিন নহে ত এই অভ্যাস করিলে।
মনকে অন্যত্র সদা নাহি যেতে দিলে ॥
হে পার্থ সেভাবে চিন্তি পরম পুরুষে।

নিশ্চয়ই পাইবে তুমি দেহ অবশেষে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি অনুক্ষণ পরম পুরুষের চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁকেই প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি পুনর্জাগরিত হয়। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের নাম সমন্বিত অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে আমাদের কান, জিভ ও মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। এভাবেই ভগবানের দিবা নাম আশ্রয় করে তাঁর ধ্যান করা অত্যন্ত সহজ এবং তা করার ফলে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। পুরুষম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভোক্তা। জীব যদিও ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত, কিন্তু সে জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই সে নিজেকে ভোক্তা মনে করে, কিন্তু সে কখনই পরম ভোক্তা হতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, নারায়ণ, বাসুদেব আদি বিভিন্ন স্বাংশ প্রকাশ রূপে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম ভোক্তা।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে ভগবদ্ভক্ত তাঁর আরাধ্য ভগবানের শ্রীনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম আদি যে কোন একটি রূপকে নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। এই অনুশীলনের ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয় এবং জীবনের অন্তিমকালে সতত কীর্তন করার প্রভাবে তিনি ভগবৎ-ধামে স্থানান্তরিত হন। যোগ অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অন্তঃস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করা। তেমনই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণ-কমলে আবিষ্ট হয়। মন চঞ্চল, তাই তাকে জোর করে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিয়োজিত করতে হয়। এই সম্পর্কে শুঁয়াপোকার উদাহরণের অবতারণা করা হয়, যে সর্বক্ষণ প্রজাপতি হওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, সেই জীবনেই প্রজাপতিতে রূপান্তিত হয়। সেই রকম, আমরাও যদি সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করি, তবে আমরাও নিঃসন্দেহে এই জীবনের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হব।

শ্লোক ৯

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

কবিম্-সর্বজ্ঞ; পুরাণম্-অনাদি; অনুশাসিতারম্-নিয়ন্তা; অণোঃ-সূক্ষ্ম থেকে; অণীয়াংসম্-সূক্ষ্মতর; অনুস্মরেৎ-নিরন্তর স্মরণ করেন; যঃ-যিনি; সর্বস্য-সব কিছুর; ধাতারম্-বিধাতা; অচিন্ত্য-অচিন্ত্য; রূপম্-রূপ; আদিত্যবর্ণম্-সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়; তমসঃ-অন্ধকারের; পরস্তাৎ-অতীত।

গীতার গান

পরম পুরুষ ধ্যান, শুনহ তাহার জ্ঞান,
সর্বজ্ঞ তিনি সে সনাতন।

নিয়ন্তা সে অতি সূক্ষ্ম, বিধাতা সে অন্তরীক্ষ,
অগোচর জড় বুদ্ধি মন ॥
যে জন স্মরণ করে, নিত্য সেই পুরুষেরে,
আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ।
প্রকৃতির পরপারে, যে জানে সে বিধাতারে,
স্বরাট তিনি চিদ্ বিলাস ॥

অনুবাদ

সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য ও পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের কথা চিন্তা করতে হয়, সেই কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে, তিনি নির্বিশেষ বা শূন্য নন। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করা যায় না। সেটি অত্যন্ত কঠিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করার পন্থা খুবই সহজ এবং এখানে বাস্তব-সম্মত ভাবেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথমে জানতে হবে যে, ভগবান হচ্ছেন 'পুরুষ' বা একজন ব্যক্তি-আমরা পুরুষ রাম ও পুরুষ কৃষ্ণের চিন্তা করি। তাঁকে শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ যেভাবেই চিন্তা করি, তাঁর রূপ কেমন, ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটিতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবানকে কবি বলা হয়েছে, তার মানে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই জানেন। তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ, কারণ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সমস্ত জগতের পরম নিয়ন্তা, পালনকর্তা এবং সমগ্র মানব-সমাজের উপদেষ্টা। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। জীবাত্মার আয়তন হচ্ছে কেশের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু ভগবান এমনই সূক্ষ্ম যে, তিনি সেই জীবাত্মারও অন্তরে প্রবেশ করেন। তাই, তাঁকে সুক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, অণুসদৃশ জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং পরমাত্মারূপে তাদের পরিচালিত করেন। যদিও তিনি সূক্ষ্ম, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনিই সব কিছুর পালনকর্তা। তাঁরই পরিচালনায় জড় জগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি যে, কিভাবে এই বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রগুলি আকাশে ভেসে আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই সমস্ত বিশাল বিপুলাকৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীকে ধরে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শক্তি আমাদের কল্পনার এবং চিন্তারও অতীত, তাই তা অচিন্ত্য। এই কথা কে অস্বীকার করতে পারে? তিনি সমগ্র জড় জগতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তবুও তিনি এই জড় জগতের অতীত। এই জড় জগৎ সম্বন্ধেই আমাদের কোন ধারণা নেই এবং অপ্রাকৃত জগতের তুলনায় এই জড় জগৎ অত্যন্ত নগণ্য। তা হলে এই জগতের অতীত সেই অপ্রাকৃত জগতের কথা আমরা কিভাবে চিন্তা করব? অচিন্ত্য মানে হচ্ছে, যা এই জড় জগতের অতীত, যা দার্শনিক অনুমান, তর্ক, যুক্তি আদির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই যে বুদ্ধিমান তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, সব রকমের যুক্তি-তর্ক, জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে বেদ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করা। তা হলেই সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারা যায়।

শ্লোক ১০

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

প্রয়াণকালে-মৃত্যুর সময়; মনসা-মনের দ্বারা; অচলেন-অচঞ্চলভাবে; ভক্ত্যা-ভক্তি সহকারে; যুক্তঃ-সংযুক্ত; যোগবলেন- যোগশক্তির বলে; চ-ও; এব-অবশ্যই; ভ্রুবোঃ-ভ্রূযুগল; মধ্যে মধ্যে; প্রাণম্-প্রাণবায়ুকে; আবেশ্য-স্থাপন করে; সম্যক্-সম্পূর্ণরূপে; সঃ-তিনি; তম্-সেই; পরম্-পরম; পুরুষম্-পুরুষকে; উপৈতি-প্রাপ্ত হন; দিব্যম্ দিব্য।

গীতার গান

অচল মনেতে যেবা, প্রয়াণকালেতে কিবা,
ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবলে।
ভ্রূর মধ্যে রাখি প্রাণ, যদি হয় সে স্মরণ,
দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে ॥

অনুবাদ

যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মনকে ভক্তি সহকারে ভগবানের ধ্যানে একাগ্র করা উচিত। যাঁরা যোগ সাধন করছেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দুই ভ্রূর মধ্যে 'আজ্ঞা-চক্রে' তাঁদের প্রাণশক্তিকে স্থাপন করতে হবে। এখানে 'ষট্চক্র' যোগের মাধ্যমে ধ্যানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত এই ধরনের যোগাভ্যাস করেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই তিনি মৃত্যুর সময়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় তাঁকে স্মরণ করতে পারেন। এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে সেই কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে যোগবলেন কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, 'ষট্চক্র' যোগ বা ভক্তিযোগই হোক না কেন, কোন একটি যোগ অভ্যাস না করলে মৃত্যুর সময়ে এই অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় আকস্মিকভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় না। কোন একটি যোগের অনুশীলন, বিশেষ করে ভক্তিযোগ পদ্ধতির অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তাই আজীবন যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হয়, যাতে সেই চরম মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ১১

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

যৎ-যাঁকে; অক্ষরম্-অবিনাশী; বেদবিদঃ- বেদবিৎ; বদন্তি বলেন; বিশন্তি-প্রবেশ করেন; যৎ-যাতে; যতয়ঃ-সন্ন্যাসীগণ; বীতরাগাঃ-বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যৎ-যাঁকে; ইচ্ছন্তঃ-ইচ্ছা করে; ব্রহ্মচর্যম্ ব্রহ্মচর্য; চরন্তি-পালন করেন; তৎ-সেই; তে-তোমাকে; পদম্-পদ; সংগ্রহেণ-সংক্ষেপে; প্রবক্ষ্যে বলব।

গীতার গান

বেদজ্ঞানী যে অক্ষর, লাভে হয় তৎপর,
যাহাতে প্রবিষ্ট হয় যতিগণ।
সদা আচরণ করি, বীতরাগ ব্রহ্মচারী,
সে তথ্য বলি শুন বিবরণ ॥

অনুবাদ

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ষট্‌চক্র যোগাভ্যাসের জন্য অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে দুই ভ্রূর মাঝখানে স্থাপন করতে হয়। অর্জুন ষট্‌চক্র যোগাভ্যাস জানতেন না বলে মেনে নিয়ে, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর তাঁর অভ্যাস পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্ম যদিও অদ্বয়, তবুও তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ ও রূপ আছে। বিশেষত নির্বিশেষবাদীদের কাছে অক্ষর বা ও শব্দ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ব্রহ্মের বর্ণনা করেছেন, যাঁর মধ্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ প্রবেশ করেন।

বৈদিক শিক্ষার রীতি অনুসারে, বিদ্যার্থীদের শুরু থেকেই 'ও' উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁরা আচার্যদেবের সান্নিধ্যে থেকে পূর্ণ ব্রহ্মাচর্য পালন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এভাবেই তাঁরা ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই অনুশীলন অতি আবশ্যক। আধুনিক যুগে এই রকম ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক যুগে সমাজ ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, বিদ্যার্থীর জীবনের শুরু থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য অনেক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু এমন একটিও শিক্ষাকেন্দ্র কোথাও নেই, যেখানে ব্রহ্মাচর্য আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচর্য আচরণ না করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করে গেছেন যে, বর্তমান কলিযুগে শাস্ত্রবিধান অনুসারে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করা ছাড়া পরমতত্ত্ব উপলব্ধির আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১২

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

সর্বদ্বারাণি-শরীরের সব কয়টি দ্বার; সংযম্য-সংযত করে; মনঃ-মনকে; হৃদি-হৃদয়ে; নিরুধ্য-নিরোধ করে; চ-ও; মূর্ধ্বি-ভ্রূদ্বয়ের মধ্য; আধায় স্থাপন করে; আত্মনঃ-আত্মার; প্রাণম্-প্রাণবায়ুকে; আস্থিতঃ-স্থিত; যোগধারণাম্-যোগধারণা।

গীতার গান

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার, রুদ্ধ হয়েছে যার,
বিষয়েতে অনাসক্তি নাম।
মনকে নিরোধ করি, হৃদয়েতে স্থির করি,
যেই জন হয়েছে নিষ্কাম ॥
প্রাণকে ভ্রূর মাঝে, যোগ্য সেই যোগীসাজে,
সমর্থ যোগ ধারণে সেই।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যোগাভ্যাস করার জন্য সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সব কয়টি দ্বার বন্ধ করতে হবে। এই অভ্যাসকে বলা হয় 'প্রত্যাহার', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্বরণ করা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক-এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনা দমন করতে হয়। এভাবেই মন তখন হৃদয়ে পরমাত্মায় একাগ্র হয় এবং প্রাণবায়ুর মস্তকে ঊর্ধ্বারোহণ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অভ্যাস করা বাস্তব-সম্মত নয়। এই যুগের সর্বোত্তম সাধনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর মনকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন রাখতে পারেন। তাঁর পক্ষে অবিচলিতভাবে অপ্রাকৃত সমাধিতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

শ্লোক ১৩

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ও-ওঙ্কার; ইর্তি-এই; একাক্ষরম্-এক অক্ষর; ব্রহ্ম-ব্রহ্ম; ব্যাহরণ-উচ্চারণ করতে করতে; মাম্-আমাকে (কৃষ্ণকে); অনুস্মরন্-স্মরণ করে; যঃ-যিনি; প্রয়াতি-প্রয়াণ করেন; ত্যজন্-ত্যাগ করে; দেহম্-দেহ: সঃ-তিনি; যাতি-প্রাপ্ত হন; পরমাম্-পরম; গতিম্-গতি।

গীতার গান

ওঙ্কার অক্ষর ব্রহ্ম, উচ্চারণে সেই ব্রহ্ম,
আমাকে স্মরণ করে যেই ॥
সে যায় শরীর ছাড়ি, বৈকুণ্ঠবিহারী হরি,
সমান লোকেতে হয় বাস।
সেই সে পরমা গতি, শ্রীহরি চরণে রতি,
ধন্য তার পরমার্থ আশ ॥

অনুবাদ

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ওঁকার, ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ওঁ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ শব্দব্রহ্ম, কিন্তু হরে কৃষ্ণ নামেও ও' নিহিত আছে। এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তাই কেউ যদি জীবনের অন্তিমকালে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় গুণবৈশিষ্ট্য অনুসারে যে কোন একটি চিন্ময় লোকে পৌঁছবেন। কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। সবিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠলোক নামক পরব্যোমের অসংখ্য গ্রহলোকেও প্রবিষ্ট হন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হন।

শ্লোক ১৪

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্যচেতাঃ-একাগ্রচিত্তে; সততম্-নিরন্তর: যঃ-যিনি; মাম্-আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); স্মরতি-স্মরণ করেন; নিত্যশঃ-নিয়মিতভাবে; তস্য-তাঁর কাছে। অহম্-আমি; সুলভঃ-সুখলভা; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; নিত্য-নিত্য; যুক্তস্য-যুক্ত; যোগিনঃ-ভক্তযোগীর পক্ষে।

গীতার গান

যে যোগী অনন্য চিত্ত, আমাকে স্মরয় নিত্য,
দৃঢ়তার সহ অবিরাম।
তাহার সুলভ আমি, হে পার্থ জানহ তুমি,
নিত্য যোগে তাহার বিশ্রাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীর কাছে সুলভ হই।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থেকে শুদ্ধ ভক্তগণ যে চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, তা বিশেষভাবে এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে আর্ত (দুর্দশাগ্রস্ত), অর্থার্থী (জড়-জাগতিক ভোগসন্ধানী), জিজ্ঞাসু (জ্ঞান লাভে আগ্রহী) ও জ্ঞানী (চিন্তাশীল দার্শনিক)-এই চার রকম ভক্তদের কথা বলা হয়েছে। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার বিভিন্ন পন্থা-কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও হঠযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত যোগপদ্ধতিতে কিছুটা ভক্তিভাব মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম কিংবা হঠযোগের কোনও রকম সংমিশ্রণ ছাড়াই বিশেষ করে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনন্যচেতাঃ শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই চান না। শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গারোহণ, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়া, অথবা ভব-বন্ধন থেকে মুক্তিও

কামনা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুই অভিলাষ করেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তকে বলা হয়েছে 'নিষ্কাম', অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য কোন বাসনা থাকে না। তিনিই কেবল পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারেন, যারা সর্বদা স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা করে, তারা কখনই সেই শান্তি লাভ করতে পারে না। জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী অথবা হঠযোগীর প্রত্যেকের নিজ নিজ বাসনা থাকে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রসন্ন বিধান করা ছাড়া অন্য কোন বাসনা থাকে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্তের কাছে তিনি সুলভ।
শুদ্ধ ভক্তমাত্রই সদাসর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটি অপ্রাকৃত রূপের মাধ্যমে তাঁর ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অংশ-প্রকাশ ও অবতার আছেন এবং কোন ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপের যে কোনও একটির প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। এই প্রকার ভক্তের অন্যান্য যোগ অনুশীলনকারীদের মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় না। ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল, শুদ্ধ ও সহজসাধ্য। কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে যে কেউই এই যোগসাধনা শুরু করতে পারে। ভগবান সকলেরই প্রতি করুণাময়, তবে পূর্ববর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী, যাঁরা অনন্যচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। এই প্রকার ভক্তকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বেদে (কঠ উপনিষদ ১/২/২৩) বলা হয়েছে, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্-পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে যিনি নিরন্তর তাঁর প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবদ্গীতাতেও (১০/১০) বলা হয়েছে, দদামি বুদ্ধিযোগং তম্-এই ধরনের ভক্তকে ভগবান পর্যাপ্ত বুদ্ধি দান করেন যাতে তিনি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারেন।
শুদ্ধ ভক্তের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, তিনি স্থান-কাল বিবেচনা না করে অবিচলিতভাবে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। তাঁর কাছে কোন বাধাবিঘ্ন আসতে পারে না। তিনি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে ভগবৎ-সেবা করতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের মতো ধামে অথবা ভগবানের লীলা-ভূমিতেই কেবল ভক্তদের বাস করা উচিত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত যে কোন জায়গায় থাকতে পারেন এবং তিনি সেই স্থানটি তাঁর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই শ্রীবৃন্দাবনের মতো পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন, "হে প্রভু! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন।"
সততম্ ও নিত্যশঃ কথা দুটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, 'সদাসর্বদা', 'নিয়মিতভাবে' অথবা 'প্রতিদিন' শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তাঁর শ্রীচরণারবিন্দের ধ্যান করেন। এই সবই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের গুণ এবং এই অনন্য ভক্তির ফলেই ভগবান তাঁদের কাছে এত সুলভ। গীতায় ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ যোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত, ভক্তিযোগী পাঁচ প্রকারে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন-১) শান্ত-ভক্ত-নিরপেক্ষ উদাসীনভাবে ভগবানের সেবা
করেন; ২) দাস্য-ভক্ত-দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেন; ৩) সখ্য-ভক্ত-ভগবানের সখারূপে সেবা করেন; ৪) বাৎসল্য-ভক্ত-পিতা অথবা মাতারূপে ভগবানের সেবা করেন এবং ৫) মাধুর্য-ভক্ত-ভগবানের প্রেয়সীরূপে তাঁর সেবা করেন। এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ-সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত থাকেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই ভুলতে পারেন না, আর সেই কারণেই ভগবান তাঁর কাছে সুলভ। শুদ্ধ ভক্ত এক মুহূর্তের জন্যও পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না, আর তেমনই

ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে -এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অনায়াসে কৃষ্ণভাবনাময় পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৫

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মাম্-আমাকে; উপেত্য-লাভ করে; পুনঃ-পুনরায়; জন্ম-জন্ম; দুঃখালয়ম্-দুঃখালর; অশাশ্বতম্-অনিত্য; ন-না; আপুবন্তি-প্রাপ্ত হন; মহাত্মানঃ-মহাত্মাগণ; সংসিদ্ধিম্-সিদ্ধি; পরমাম্-পরম; গতাঃ-প্রাপ্ত হয়েছেন।

গীতার গান

আমাকে লাভ করে সে মহাত্মা হয়।
নহে তার পুনর্জন্ম যেথা দুঃখালয় ॥
অশাশ্বত সংসারেতে নহে তার স্থিতি।
পরমা গতিতে তার সিদ্ধ অবস্থিতি ॥

অনুবাদ

মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেন না তাঁরা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

যেহেতু এই অনিত্য জড় জগৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত, স্বভাবতই যিনি পরমার্থ সাধন করে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে পরম গতি লাভ করেন, তিনি কখনই এই জগতে ফিরে আসতে চান না। পরম ধামের বর্ণনা করে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তা হচ্ছে অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমা গতি: অর্থাৎ, সেই গ্রহলোক আমাদের জড় দৃষ্টির অতীত এবং যা বর্ণনারও অতীত, কিন্তু তাই হচ্ছে মহাত্মাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। মহাত্মারা আত্ম-উপলব্ধি প্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব আহরণ করেন এবং ক্রমশ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁদের ভগবদ্ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। এভাবেই তাঁরা ভগবৎ-সেবায় এত তন্ময় থাকেন যে, কোনও উচ্চলোকে অথবা পরব্যোমে উত্তীর্ণ হবার কোন রকম বাসনাও তাঁদের থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য ব্যতীত তাঁরা আর কিছুই কামনা করেন না। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সার্থকতা। এই শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষবাদী ভক্তদের কথাই গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা হচ্ছেন মহাত্মা।

শ্লোক ১৬

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ৷ ১৬ ॥

আব্রহ্ম-ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; ভুবনাৎ-পৃথিবী থেকে; লোকাঃ-লোকসমূহ; পুনঃ-পুনরায়; আবর্তিনঃ-আবর্তনশীল; অর্জুন-হে অর্জুন; মাম্-আমাকে; উপেত্য-প্রাপ্ত হলে; তু-কিন্তু; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; পুনর্জন্ম-পুনর্জন্ম, ন-না; বিদ্যতে-হয়।

গীতার গান

চতুর্দশ ভুবনেতে যত লোক হয়।
ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সে নিত্য কেহ নয় ॥
সে সব লোকেতে স্থান গমনাগমন ।
সকল লোকেতে আছে জনম মরণ ॥
ভক্তির আশ্রয় যেবা আমাকে যে পায়।
কেবল তাহার মাত্র পুনর্জন্ম নয় ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়। আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

তাৎপর্য

কর্ম, জ্ঞান, হঠ আদি যোগ সাধনকারী যোগীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে প্রবেশ করতে হলে, পরিশেষে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্য ধামে একবার প্রবেশ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে অথবা দেবলোকে প্রবেশ করলেও জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীনেই থাকতে হয়। মর্তবাসীরা যেমন উচ্চলোকে উন্নীত হয়, তেমনই ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক আদি উচ্চলোকের অধিবাসীরাও এই গ্রহলোকে পতিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে-কেউ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মলোকে যদি তিনি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন না করেন, তবে তাঁকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। উচ্চতর গ্রহলোকে যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করেন, তাঁরা উত্তরোত্তর উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্রলয়ের পর সনাতন চিন্ময় ধামে প্রবেশ করেন। শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনায় এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন-

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

"এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের পর নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্রহ্মা ও তাঁর ভক্তগণ তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে পরব্যোমস্থিত অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশেষ বিশেষ চিন্ময় গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হন।"

শ্লোক ১৭

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

সহস্র সহস্র; যুগ-চতুর্যুগ; পর্যন্তম্-ব্যাপী; অহঃ-দিন; যৎ-যা; ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্মার; বিদুঃ-যাঁরা

জানেন; রাত্রিম্-রাত্রি; যুগ-চতুর্যুগ; সহস্রান্তাম্-তেমনই, সহস্র চতুর্যুগের অন্তে; তে-সেই; অহোরাত্র-দিন ও রাত্রির; বিদঃ-তত্ত্ববেত্তা; জনাঃ-মানুষেরা।

গীতার গান

মানুষের সহস্র যে চতুর্যুগ যায়।
ব্রহ্মার সে একদিন করিয়া গণয় ॥
সেইরূপ একরাত্রি ব্রহ্মার গণন।
রাত্রিদিন ব্রহ্মার যে করহ মনন ।।

অনুবাদ

মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। এভাবেই যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।

তাৎপর্য

জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্বকাল সীমিত। এর প্রকাশ হয় কল্পের সৃষ্টিচক্রে। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলা হয়। এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-এই চারটি যুগ এক হাজার বার আবর্তিত হয়। সত্যযুগের লক্ষণ হচ্ছে সদাচার, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম। সেই যুগে অজ্ঞান ও পাপ প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই যুগের স্থায়িত্ব ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগে পাপকর্মের সূচনা হয় এবং এই যুগের স্থায়িত্ব ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপর-যুগে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। এই যুগের স্থায়িত্ব ৮,৬৪,০০০ বছর এবং সব শেষে কলিযুগ (গত ৫,০০০ বছর ধরে এই যুগ চলছে)। এই যুগে কলহ, অজ্ঞানতা, অধর্ম ও পাপাচারের প্রাবল্য দেখা যায় এবং যথার্থ ধর্মাচরণ প্রায় লুপ্ত। এই যুগের স্থায়িত্ব প্রায় ৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগে অধর্ম এত বৃদ্ধি পায় যে, এই যুগের শেষে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কল্কি অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে অসুরদের বিনাশ করেন এবং তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করে আর একটি সত্যযুগের সূচনা করেন। তারপর এই প্রক্রিয়া আবার চলতে থাকে। এই চারটি যুগ যখন এক হাজার বার আবর্তিত হয়, তখন ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সমপরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। এই রকম দিন ও রাত্রি সমন্বিত বর্ষ অনুসারে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থেকে তারপর দেহ ত্যাগ করেন। এই একশ বছর পৃথিবীর অনুসারে ৩১১,০৪,০০০,০০,০০,০০০ বছরের সমান। এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু কল্পনাপ্রসূত ও অক্ষয় বলে মনে হয়, কিন্তু নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এর স্থায়িত্ব বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণস্থায়ী। অতলান্তিক মহাসাগরের বুদ্ধদের মতো কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মার নিত্য উদয় ও লয় হয়ে চলেছে। ব্রহ্মা ও তাঁর সৃষ্টি জড় ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং তাই তা নিরন্তর প্রবহমান।

জড় ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি ব্রহ্মাও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্র থেকে মুক্ত নন। তবুও এই জড় জগতের পরিচালনায় তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করছেন, তাই তিনি সদ্যমুক্তি লাভ করেন। উচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মার বিশিষ্টলোক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, যা হচ্ছে জড় জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক এবং অন্য সমস্ত স্বর্গীয় গ্রহলোকের বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তা বর্তমান থাকে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাহ্মলোকের সমস্ত বাসিন্দাদের যথাসময়ে মৃত্যু হয়।

শ্লোক ১৮

অব্যক্তাদ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ৷ ১৮ ॥

অব্যক্তাৎ-অব্যক্ত থেকে; ব্যক্তয়ঃ-জীবসমূহ; সর্বাঃ-সমস্ত; প্রভবন্তি-প্রকাশিত হয়; অহরাগমে দিনের শুরুতে, রাত্র্যাগমে-রাত্রি সমাগমে; প্রলীয়ন্তে-লীন হয়ে যায়; তত্র-সেখানে; এব-অবশ্যই; অব্যক্ত-অব্যক্ত; সংজ্ঞকে-নামক।

গীতার গান

সেই রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে।
ব্যক্ত হয় এ ত্রিলোক ব্রহ্মার দিনেতে ॥
আবার সে রাত্রিকালে হইবে প্রলয়।
অব্যক্ত হইতে জন্ম অব্যক্তে মিলায় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত জীব অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির আগমে তা পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৯

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ৷ ১৯ ॥

ভূতগ্রামঃ-জীবসমষ্টি; সঃ-সেই; এব-অবশ্যই; অয়ম্-এই; ভূত্বা ভূত্বা-পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; প্রলীয়তে-লয় প্রাপ্ত হয়; রাত্রি-রাত্রি; আগমে-সমাগমে; অবশঃ-আপনা থেকেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; প্রভবতি-প্রকাশিত হয়; অহঃ-দিনের বেলা; আগমে-আগমনে।

গীতার গান

চরাচর যাহা কিছু সেই উদ্ভব প্রলয়।
পুনঃ পুনঃ জন্ম আর পুনঃ পুনঃ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ। সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় দিনের আগমনে তারা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব যারা এই জড় জগতে থাকবার চেষ্টা করে, তারা বিভিন্ন উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হতে পারে এবং তার পরে আবার তাদের এই পৃথিবীগ্রহে পতন হয়। ব্রহ্মার দিবসকালে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন লোকগুলিতে তারা তাদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তারা আবার সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মার দিবাভাগে তারা বিভিন্ন কলেবর প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রে তাদের সেই সমস্ত কলেবরের বিনাশ হয় এবং এই সময়ে জীবসমূহ শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহে একসঙ্গে অবস্থান করে। তারপর ব্রহ্মার দিনের আবির্ভাবে তারা আবার অভিব্যক্ত হয়। ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে-দিনের বেলায় তারা প্রকাশিত হয় এবং রাত্রিবেলায় তারা আবার লয় প্রাপ্ত হয়। অন্তিমে, ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তারা সকলে বিলীন হয়ে যায় এবং কোটি কোটি বছর ধরে অপ্রকাশিত থাকে। তারপর-আর একটি কল্পে ব্রহ্মা যখন আবার জন্মগ্রহণ করে, তখন তারা পুনরায় ব্যক্ত হয়। এভাবেই জীব

জড় জগতের মোহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সমও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, তাঁরা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করে মানব-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করেন। এভাবেই, এমন কি এই জীবনে তারা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে প্রবেশ করে পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত, সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২০

পরস্তস্মাতু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।২০ ॥

পরঃ-শ্রেষ্ঠ; তস্মাৎ-সেই; তু-কিন্তু; ভাবঃ-প্রকৃতি; অন্যঃ-অন্য; অব্যক্তঃ-অব্যক্ত; অব্যক্তাৎ-অব্যক্ত থেকে; সনাতনঃ-নিত্য; যঃ-যা; সঃ-তা: সর্বেষু-সমস্ত; ভূতেষু-প্রকাশ: নশাৎসু-বিনষ্ট হলেও; ন-না; বিনশ্যতি-বিনষ্ট হয়।

গীতার গান

তাহার উপরে যেই ভাবের নির্ণয়।
সনাতন সেই ধাম অক্ষয় অব্যয় ॥
সকল সৃষ্টির নাশ এ জগতে হয়।
সনাতন ধাম নহে হইবে প্রলয় ॥

অনুবাদ

কিন্তু আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পরা বা চিন্ময় শক্তি অপ্রাকৃত ও নিত্য। ব্রহ্মার দিন ও রাত্রে যথাক্রমে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয় যে অপরা প্রকৃতি, তার প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তি গুণগতভাবে জড়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সপ্তম অধ্যায়ে এই পরা ও অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম । ২১ ॥

অব্যক্তঃ-অব্যক্ত; অক্ষরঃ-অক্ষর; ইতি-এভাবে; উক্তঃ-বলা হয়; তম্-তাকে; আহুঃ-বলে; পরমাম্-পরম; গতিম্-গতি; যম্যাঁকে; প্রাপ্য-পেয়ে; ন-না; নিবর্তন্তে-ফিরে আসে; তদ্ধাম-সেই ধাম; পরমম্ পরম; মম-আমার।

গীতার গান

সেই সে অব্যক্ত নাম 'অক্ষর' তাহার।
জীবের সে গতি নাম পরমা যাহার ॥

সে গতি হইলে লাভ না আসে ফিরিয়া।
আমার সে নিত্য ধাম সংসার জিনিয়া ॥

অনুবাদ

সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে, তাই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাঁকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে ব্রহ্মসংহিতায় 'চিন্তামণি ধাম' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ধামে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবন চিন্তামণি দিয়ে তৈরি প্রাসাদে পরিপূর্ণ। সেখানকার গাছগুলি কল্পতরু, যা ইচ্ছামাত্র আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দান করে। সেখানকার গাভীগুলি 'সুরভী', যারা অপর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দান করে। এই নিত্য ধামে সহস্রশত লক্ষ্মী নিরন্তর অনাদির আদিপুরুষ সর্ব কারণের কারণ শ্রীগোবিন্দের সেবা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তাঁর বেণুবাদন করেন (বেণুং কণন্তম্)। তাঁর দিব্য শ্রীবিগ্রহ ত্রিভুবনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমলদলের মতো এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘের মতো ঘনশ্যাম। তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ কোটি কোটি কন্দর্পকে বিমোহিত করে। তাঁর পরনে পীত বসন, গলায় বনমালা আর মাথায় তাঁর শিখিপুচ্ছ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় জগতের সর্বোচ্চ লোকে তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে কেবল একটু আভাস দিয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে তাঁর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রে (কঠ উপনিষদ ১/৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের চিন্ময় ধামের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই এবং সেই ধামই হচ্ছে পরম গতি (পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ)। সেই ধাম প্রাপ্ত হলে কেউ আর এই জড় জগতে ফিরে আসে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তাঁরা সমান চিদ্‌গুণ-সম্পন্ন। দিল্লি থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বৃন্দাবন চিৎ-জগতের সর্বোচ্চে গোলোক বৃন্দাবনের প্রতিরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি মথুরা জেলায় ৮৪ বর্গমাইল পরিধি-বিশিষ্ট সেই বৃন্দাবন ধামে তাঁর দিব্য লীলাখেলা করেদিলেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্রনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ-পরমেশ্বর ভগবান; সঃ-তিনি; পরঃ-পরম, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ভক্ত্যা-ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; লভ্যঃ-লাভ করা যায়; তু-কিন্তু, অনন্যয়া-অনন্যা; যস্য-যাঁর; অন্তঃস্থানি-মধ্যে; ভূতানি-এই সমস্ত জড় প্রকাশ; যেন যাঁর দ্বারা; সর্বম্-সমস্ত; ইদম্-এই; ততম্-পরিব্যাপ্ত।

গীতার গান

পরমপুরুষ সেই নিত্য ধামে বাস।
হে পার্থ! অনন্য ভক্তি তাহার প্রয়াস ॥
তাঁহারই অন্তরেতে হয় সমস্ত জগত।
অন্তর্যামী সে পুরুষ সর্বত্র বিস্তৃত ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্যা ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভকরা যায়। তিনি যদিও তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তবুও সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছু তাঁর মধ্যেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সেই পরম ধাম, যেখান থেকে আর পুনরাগমন হয় না, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ব্রহ্মসংহিতায় এই পরম ধামকে আনন্দচিন্ময়রস বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সব কিছুই চিন্ময় আনন্দে পরিপূর্ণ। সেখানে যত রকমের বিচিত্রতার প্রকাশ, তা সবই দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ-কোন কিছুই জড় নয়। এই সমস্ত বৈচিত্র্য পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় আত্মবিস্তার, কারণ সেই ধাম পূর্ণরূপে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই কথা সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান যদিও তাঁর পরম ধামে নিত্য অধিষ্ঠিত, কিন্তু তবুও তাঁর অপরা শক্তির দ্বারা তিনি সর্বব্যাপ্ত। এভাবেই তাঁর পরা ও অপরা শক্তির মাধ্যমে তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয় জগতেই সর্বদাই বিদ্যমান। যস্যান্তঃস্থানি কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনি সব কিছুই তাঁর মধ্যে ধারণ করে আছেন-তা সে পরা শক্তিই হোক অথবা অপরা শক্তিই হোক। এই দুই শক্তির দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপ্ত। এখানে ভক্ত্যা শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে অথবা অগণিত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা সম্ভব। অন্য কোনও পন্থায় সেই পরম ধাম লাভ করা যায় না। বেদেও (গোপাল-তাপনী উপনিষদ ৩/২) এই পরম ধাম ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা আছে। একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণঃ-সেই পরম ধামে কেবল এক পরম পুরুষোত্তম ভগবান আছেন, যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম করুণাময় বিগ্রহ এবং যদিও তিনি সেখানে এক হয়ে অবস্থান করে আছেন, কিন্তু তিনিই লক্ষ লক্ষ অসংখ্য অংশ-রূপ ধারণ করে বিরাজ করছেন। বেদে পরমেশ্বরকে এমন একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে গাছটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও নানা ধরনের ফল, ফুল বহন করছে এবং এমন সব পাতা সৃষ্টি করে চলেছে, যা নিয়ত বদলে যাচ্ছে। ভগবানের অংশ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকগুলির অধিপতি হচ্ছেন চতুর্ভুজধারী এবং তাঁরা পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর, জনার্দন, নারায়ণ, বামন, পদ্মনাভ আদি বিবিধ নামে পরিজ্ঞাত।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যদিও ভগবান তাঁর পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত, যার ফলে সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে চলেছে (গোলোক এব নিবসতাখিলাত্মভূতঃ)। বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৮) উল্লেখ আছে যে, পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে/স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ-তাঁর শক্তিসমূহ এতই সুদূরপ্রসারী যে, তারা সুবিন্যস্ত ও ত্রুটিহীনভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পরিচালনা করে চলেছেন, যদিও পরমেশ্বর ভগবান বহু বহু দূরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

যত্র-যে; কালে-সময়ে; তু-কিন্তু; অনাবৃত্তিম্-ফিরে আসে না; আবৃত্তিম্-ফিরে আসে; চ-ও; এব-অবশ্যই; যোগিনঃ-বিভিন্ন প্রকার যোগী; প্রয়াতাঃ-মৃত্যু হলে; যান্তি-প্রাপ্ত হন; তম্-সেই; কালম্-কাল; বক্ষ্যামি-বলব; ভরতর্যভ-হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

যে কালেতে অনাবৃত্তি যোগীর সম্ভব ।
বলিতেছি শুন তাহা ভরত ঋষভ ॥

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে কালে মৃত্যু হলে যোগীরা এই জগতে ফিরে আসেন অথবা ফিরে আসেন না, সেই কালের কথা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

ভগবানের পূর্ণ শরণাগত অনন্য ভক্তগণ কখনও চিন্তা করেন না, তাঁরা কিভাবে ও কখন দেহত্যাগ করবেন। তাঁরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দেন এবং তাই তাঁরা অনায়াসে ও অতি আনন্দের সঙ্গে ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। কিন্তু যারা অনন্য ভক্ত নয়, যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ আদি অন্যান্য সাধনার উপর নির্ভর করে, তাদের অবশ্যই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করতে হয়, যার ফলে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এই জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তাদের আর ফিরে আসতে হবে কি হবে না।
সিদ্ধযোগী এই জড় জগৎ ত্যাগ করবার জন্য উপযুক্ত স্থান ও কাল নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সিদ্ধ না হন, তবে তাঁর সাফল্য নির্ভর করে, দৈবক্রমে যদি তিনি কোন বিশেষ উপযুক্ত সময়ে তাঁর দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তার উপর। যেই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করলে আর ফিরে আসতে হয় না, তা পরবর্তী শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন। আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মত অনুসারে, এখানে উল্লিখিত কাল শব্দে কালের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

অগ্নি্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অগ্নিঃ-অগ্নি; জ্যোতিঃ-জ্যোতি; অহঃ-দিন; শুক্লঃ-শুক্লপক্ষ; ষন্মাসাঃ ছয় মাস; উত্তরায়ণম্-উত্তরায়ণ: তত্র-সেই মার্গে; প্রয়াতাঃ-দেহ ত্যাগকারী; গচ্ছন্তি-গমন করেন; ব্রহ্ম-ব্রহ্মে; ব্রহ্মবিদঃ-ব্রহ্মজ্ঞানী; জনাঃ-বাক্তি।

গীতার গান

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যে জ্যোতি শুভদিনে।
উত্তরায়ণ কালেতে করিলে প্রয়াণে ॥
ব্রহ্মলাভ হয় তার অনাবৃত্তি গতি।
কর্মীর জ্ঞানীর সেই সাধারণ মতি ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষে ও ছয় মাস উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ করেন।

তাৎপর্য

অগ্নি, জ্যোতি, দিন, পক্ষ আদির উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, এই সকলের এক-একজন বিশেষ অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, যাঁরা আত্মার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন। মৃত্যুর সময় মন জীবাত্মাকে নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৈবক্রমে অথবা সাধনার প্রভাবে এই শ্লোকে বর্ণিত সময়ে দেহত্যাগ করলে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তম যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কোন বিশেষ স্থানে, কোন বিশেষ সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন। অন্য কোন মানুষের সেই নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য নেই। দৈবক্রমে শুভ মুহূর্তে যদি কারও দেহত্যাগ হয়, তবে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনরাগমন করবে না, নতুবা অবশ্যই তাকে এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত দৈবক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়, শুভ অথবা অশুভ, যে সময়েই দেহত্যাগ করুন না কেন, তাঁর কখনও পুনরাগমনের আশঙ্কা থাকে না।

শ্লোক ২৫

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যথাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ-ধূম: রাত্রিঃ-রাত্রি; তথা-ও; কৃষ্ণঃ-কৃষ্ণপক্ষ; যন্মাসাঃ ছয় মাস; দক্ষিণায়নম্-দক্ষিণায়ন; তত্র-সেই মার্গে; চান্দ্রমসম্-চন্দ্রলোক; জ্যোতিঃ-জ্যোতি, যোগী-যোগী; প্রাপ্য-লাভ করে; নিবর্ততে-প্রত্যাবর্তন করেন।

গীতার গান

তারা ইষ্টাপূর্তি কর্মে রাত্রি কৃষ্ণপক্ষে।
ধূম বা দক্ষিণায়ন চন্দ্র জ্যোতি লক্ষে ॥
মার্গ সেই আশ্রয়েতে পুনরাগমন।
কর্মযোগী নাহি করে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥

অনুবাদ

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের ছয় মাস কালে দেহত্যাগ করে যোগী চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক সুখভোগ করার পর পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল মুনি উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যাঁরা সকাম কর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ, তাঁরা দেহত্যাগ করার পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই সমস্ত উন্নত আত্মারা সেখানে দেবতাদের গণনা অনুসারে ১০,০০০ বছর বাস করেন এবং সোমরস পান করে জীবন উপভোগ করেন। কিন্তু শেষকালে এক সময় তাঁদের আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, চন্দ্রলোকে অনেক উন্নত স্তরের জীব আছেন, যদিও তাঁরা স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর নন।

শ্লোক ২৬

শুক্লকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

শুক্ল-শুক্ল; কৃষ্ণে-কৃষ্ণ; গতী-মার্গ; হি অবশ্যই; এতে-এই দুই: জগতঃ-জগতের; শাশ্বতে-বৈদিক; মতে-মতে; একয়া-একটির দ্বারা; যাতি-প্রাপ্ত হয়; অনাবৃত্তিম্-অপ্রত্যাবর্তন; অন্যয়া-অন্যটির দ্বারা; আবর্ততে-প্রত্যাবর্তন করে; পুনঃ-পুনরায়।

গীতার গান

অতএব দুই মার্গ শুক্ল কৃষ্ণ নাম।
শাশ্বত যে দুই পথ হই বর্তমান ॥
শুক্লমার্গে যার গতি তার অনাবৃত্তি।
কৃষ্ণমার্গে যার গতি সে আবৃত্তি ॥

অনুবাদ

বৈদিক মতে এই জগৎ থেকে দেহত্যাগের দুটি মার্গ রয়েছে-একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণ। শুক্রমার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহত্যাগ করলে ফিরে আসতে হয়।

তাৎপর্য

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫/১০/৩-৫) থেকে জড় জগতে গমনাগমনের এই রকমই একটি শ্লোকের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যাঁরা অনন্ত কাল ধরে দার্শনিক জ্ঞান ও সকাম কর্মের অনুশীলন করে আসছেন, তাঁরা নিরন্তর গমনাগমন করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হন না বলে তাঁরা যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥

ন-না; এতে-এই দুটি; সৃতী-মার্গ; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; জানন্-জেনে; যোগী-ভগবদ্ভক্ত: মুহ্যতি-মোহগ্রস্ত; কশ্চন-কোন; তস্মাৎ-অতএব; সর্বেষু কালেষু-সর্বদা; যোগযুক্তঃ-কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত; ভব-হও; অর্জুন-হে অর্জুন।

গীতার গান

কিন্তু পার্থ ভক্ত মোর দুই মার্গ জানি।
মোহপ্রাপ্ত নাহি হয় ভক্তিযোগ মানি ॥
অতএব হে অর্জুন! মোরে নিত্য স্মর।
ভক্তিযোগযুক্ত হও কভু না পাসর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! ভক্তেরা এই দুটি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনও মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সংসার ত্যাগ করার জন্য জীবাত্মা এই দুটি মার্গের যে কোন একটা মার্গ গ্রহণ করতে পারে বলে তাঁর চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ভগবদ্ভক্ত তাঁর প্রয়াণ ইচ্ছাকৃতভাবে হবে, না দৈবক্রমে হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন না।

ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। তাঁর জানা উচিত যে, এই দুটি মার্গের যে কোনটিই ক্লেশকর। কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। এর ফলে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তির পথ নিরাপদ, নিশ্চিত ও সরল হয়। এই শ্লোকে যোগযুক্ত কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি দৃঢ়তাপূর্বক যোগ অভ্যাস করেন, তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের উপদেশ হচ্ছে যে, অনাসক্তস্য বিষয়ান যথাহমুপযুঞ্জতঃ-জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত থাকতে হবে এবং সমস্ত কিছু কৃষ্ণভাবনামৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। এভাবেই 'যুক্তবৈরাগ্য' পন্থার মাধ্যমে অতি সহজে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। তাই, আত্মার গমন পথের এই সমস্ত বিবরণে ভক্ত কখনই বিচলিত হন না, কারণ তিনি জানেন যে, ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে তিনি অবশ্যই ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ২৮

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বেদেষু-বেদপাঠে; যজ্ঞেষু-যজ্ঞানুষ্ঠানে; তপঃসু-তপস্যায়; চ-ও; এব-অবশ্যই; দানেষু-দানে; যৎ-যে; পুণ্যফলম্-পুণ্যফল; প্রদিষ্টম্-নির্দেশিত হয়েছে; অত্যেতি-অতিক্রম করে; তৎ সর্বম্-সেই সমস্ত; ইদম্-এই; বিদিত্বা-জেনে; যোগী-ভক্ত; পরম্-পরম; স্থানম্-স্থান; উপৈতি-প্রাপ্ত হন; চ-ও; আদ্যম্-আদি।

গীতার গান

বেদাদি শাস্ত্রেতে যাহা, যজ্ঞ তপ দান তাহা,
পুণ্যফল যাহা সে প্রদিষ্ট।
সে যোগ যে অবলম্বে, পায় তাহা অবিলম্বে,
সম্যক বুঝিয়া নিজ ইষ্ট ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সেই সমুদয়ের যে ফল, তা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভক্তিযোগের বিশেষ বর্ণনা সমন্বিত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের সারমর্ম। শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার অনুশীলন করা অত্যন্ত আবশ্যক। বৈদিক প্রথা অনুসারে ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে থেকে অনুগত ভৃত্যের মতো গুরুদেবের সেবা করতে হয় এবং তাকে গুরুদেবের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারেই কেবল সে ভোজন করে, এবং যদি কোনদিন গুরুদেব তাকে ভোজনে না ডাকেন, তা হলে সেই দিন সে উপবাসী থাকে। এগুলি ব্রহ্মচর্য-ব্রতের কয়েকটি বৈদিক সিদ্ধান্ত।

পাঁচ বৎসর থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন করার পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী পরম চরিত্রবান মানুষ হতে সক্ষম হন। বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরাম-কেদারায় উপবেশনরত মনোধর্মীদের মনোরঞ্জন করা নয়, তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা। এই প্রশিক্ষণের পরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে বিবাহ করতে পারেন। গৃহস্থাশ্রমেও তাঁকে নানা রকম যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়, যাতে তিনি অধিকতর সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হন। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুযায়ী দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের পার্থক্য নির্ণয় করে যথোপযুক্তভাবে দানধ্যান করাও তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তারপর গৃহস্থাশ্রম থেকে নিবৃত্ত হয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বনবাসী হয়ে বল্কল ধারণ করে ক্ষৌরকর্ম পরিহার করে তাকে নানা রকম তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে হয়। এভাবেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-বিধান পালন করে জীবনের পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হন এবং তার পরে আরও উন্নতি সাধন করার পরে পরব্যোমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা বৈকুণ্ঠলোকে বা কৃষ্ণলোকে পরম মুক্তি লাভ করেন। বৈদিক সাহিত্যে এই পথের দিগ্দর্শন দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের সৌন্দর্য এতই অনুপম যে, কেবল ভগবানকে ভক্তি করার একটিমাত্র সাধনার মাধ্যমেই এই সমস্ত আশ্রম এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়।

ইদং বিদিত্বা শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার এই অধ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, তা পুঁথিগত বিদ্যা বা জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে তাঁর কাছ থেকে এর তত্ত্ব শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবদ্গীতার সারমর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায় এবং শেষের ছয়টি অধ্যায় যেন মাঝের ছয়টি অধ্যায়কে আবৃত করে রেখেছে-যেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। যদি কোন ভাগ্যবান ভক্তসঙ্গে ভগবদ্গীতার, বিশেষ করে মাঝখানের এই ছয়টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তার জীবন সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদির ঊর্ধ্বে দিব্য কীর্তির দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, কেন না শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমেই তিনি এই সব রকম কর্মেরই সুফল অর্জন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার প্রতি যাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাঁর পক্ষে কোনও ভক্তজনের কাছ থেকেই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তজনই উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কেউ যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। সুতরাং, মনোধর্মীদের কাছ থেকে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা না শুনে কোনও কৃষ্ণভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটিই হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেউ যখন কোনও ভক্তের সন্ধান করতে থাকে, এবং অবশেষে ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবেই ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ভগবৎ-সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, পরিকর আদি হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং এই সকল বিষয়ে সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এভাবেই সমস্ত সংশয় দূর হলে অধ্যয়নে মনোনিবেশ হয় তখন ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে আস্বাদন করা যায় এবং কৃষ্ণভাবনার প্রতি অনুরাগ ও ভাবের উদয় হয়। আরও উন্নত স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেমানুরাগের উদয় হয়। এই পরম সিদ্ধির স্তরে ভক্ত চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হন, যেখানে তিনি চিন্ময় শাশ্বত আনন্দ লাভ

করেন।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-পরমতত্ত্ব লাভ বিষয়ক 'অক্ষরব্রহ্ম-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

নবম অধ্যায় - রাজগুহ্য-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানু উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ইদম্-এই; তু-কিন্তু; তে-তোমাকে; গুহ্যতমম্-অতি গোপনীয়; প্রবক্ষ্যামি বলছি; অনসূয়বে নির্মৎসর; জ্ঞানম্-জ্ঞান; বিজ্ঞান-উপলব্ধ জ্ঞান; সহিতম্-সহ; যৎ-যা; জ্ঞাত্বা-জেনে; মোক্ষ্যসে-মুক্ত হবে; অশুভাৎ-দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
এবার হে অর্জুন শুন অসূয়া রহিত।
এই এক গুহ্যতম কহি তব হিত ॥
'ইহা হয় জ্ঞান আর বিজ্ঞানসম্মত।
জানিলে সে মুক্ত হয় সর্ব অশুভত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে অর্জুন! তুমি নির্মৎসর বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

তাৎপর্য

ভক্ত যতই ভগবানের কথা শ্রবণ করে, ততই তাঁর অন্তরে দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই শ্রবণ পদ্ধতির মহিমা বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে- "ভগবানের কথা দিব্য শক্তিতে পূর্ণ এবং এই দিব্য শক্তি উপলব্ধি করা যায় যদি ভক্তদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচিত হয়। মনোধর্মী জল্পনাকারী অথবা কেতাবি বিদ্যায় পণ্ডিতদের সঙ্গ করলে এই বিজ্ঞান কখনও লাভ করা যায় না, কেন না এই দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি সঞ্জাত।"

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবান কৃষ্ণভাবনাময় প্রতিটি

জীবের মনোভাব ও আন্তরিকতা জানেন এবং ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-বিষয়ক বিজ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা অলৌকিক শক্তিশালী। যদি কোন সৌভাগ্যবান জীব এই সৎসঙ্গ লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভে যত্নশীল হন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অবশ্যই উন্নতি সাধন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেবায় অর্জুনকে উত্তরোত্তর উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে এই নবম অধ্যায়ে সেই রহস্যের বর্ণনা করেছেন, যা পূর্ববর্ণিত তত্ত্বসমূহ থেকে অনেক বেশি গূঢ় ও গোপনীয়।

ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় হচ্ছে গ্রন্থটির মোটামুটি প্রস্তাবনা-স্বরূপ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের পারমার্থিক জ্ঞানকে গুহ্য বলা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ভক্তিযোগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এবং যেহেতু তার প্রভাবে কৃষ্ণভাবনা বিকশিত হয়, তাই তাকে গুহ্যতর বলা হয়েছে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে কেবল শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়টি হচ্ছে গুহ্যতম। যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই পরম গুহ্যতম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি স্বাভাবিকভাবে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। তাই, জড় জগতে অবস্থানকালেও তাঁর কোন রকম জড়-জাগতিক জ্বালাযন্ত্রণা থাকে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলা হয়েছে, যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উৎকণ্ঠিত থাকেন, তিনি সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মুক্ত। তেমনই, ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে, যিনি এভাবেই নিয়োজিত, তিনিই হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ।

নবম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইদং জ্ঞানম ('এই জ্ঞান') কথাটির অর্থ শুদ্ধ ভক্তিযোগ, যা হচ্ছে নববিধা ভক্তি-শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। ভক্তিযোগের এই. নয়টি অঙ্গের অনুশীলনের ফলে চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হওয়া যায়। এভাবেই জড়-জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয় শুদ্ধ হলে এই কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। জীবাত্মা যে জড় সত্তা নয়, শুধু এই উপলব্ধিটুকুই যথেষ্ট নয়। এর মাধ্যমে কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির সূচনাই হতে পারে। কিন্তু জীবের দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তিনি দেহটি নন, তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কি ভেদ, সেটি জানা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ঐশ্বর্যপূর্ণ শক্তিমত্তা, তাঁর বিবিধ শক্তি, পরা ও অপরা প্রকৃতি এবং এই সমস্ত জড়-জাগতিক সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এই নবম অধ্যায়ে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে।

এই শ্লোকে অনসূয়বে সংস্কৃত কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত গীতার ব্যাখ্যাকারেরা উচ্চ শিক্ষিত হলেও তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এমন কি বড় বড় পণ্ডিতেরাও ভগবদ্গীতার অত্যন্ত অশুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের ভাষ্য অর্থহীন, কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। ভগবদ্গীতার যথার্থ ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তই করতে পারেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কখনই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করতে পারে না অথবা কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব না জেনে যারা তাঁর চরিত্রের সমালোচনা করে, তারা বাস্তবিকই মূঢ়। তাই, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেই সমস্ত ভাষ্য বর্জন করাই কল্যাণকর। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ, দিব্য পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান বলে জানেন, তাঁর পক্ষে এই অধ্যায়গুলি হবে পরম কল্যাণকর।

শ্লোক ২

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২॥

রাজবিদ্যা-সমস্ত বিদ্যার রাজা; রাজগুহ্যম্-গোপনীয় জ্ঞানসমূহের রাজা; পবিত্রম্-পবিত্র; ইদম্-এই; উত্তমম্-উত্তম; প্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; অবগমম্-উপলব্ধ হয়; ধর্ম্যম্ ধর্ম; সুসুখম্-অত্যন্ত সুখদায়ক; কর্তৃম্-অনুষ্ঠান করতে; অব্যয়ম্-অব্যয়।

গীতার গান

রাজবিদ্যা এই জ্ঞান রাজগুহ্য কহে।
পবিত্র উত্তম তাহা সাধারণ নহে ॥
যাহার সাধনে হয় প্রত্যক্ষানুভব।
সুসুখ সে ধর্ম হয় অব্যয় বৈভব ॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই অধ্যায়টিকে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে, কারণ পূর্ববর্ণিত সমস্ত মত ও দর্শনের সারমর্ম এই অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন গৌতম, কণাদ, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব। সুতরাং দর্শন অথবা দিব্য জ্ঞানে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে ভগবান বলেছেন যে, নবম অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং বেদ অধ্যয়ন ও বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের সারতত্ত্ব। এই তত্ত্বজ্ঞান পরম গুহ্য, কারণ এই জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মা ও দেহের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এবং এই রাজবিদ্যার চরম পরিণতি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

সাধারণত, মানুষ এই রাজবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে না; তাদের শিক্ষা কেবল বাহ্যিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমিত। জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ রাজনীতি, সমাজনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যন্ত্র-বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন বিভাগে সাধারণত শিক্ষা লাভ করে। সমগ্র বিশ্বে এই জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন বিভাগ ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে চিন্ময় আত্মার তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ এই দেহে আত্মার মাহাত্ম্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাবিহীন দেহ মৃত। কিন্তু তবুও প্রাণের আধার এই আত্মাকে উপেক্ষা করে কেবল জড় দেহটির আবশ্যকতাগুলির উপরেই মানুষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আত্মতত্ত্বের মাহাত্ম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই জড় দেহটি নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর (অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ)। দেহের থেকে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর ও সনাতন-এই মৌলিক উপলব্ধি হচ্ছে জ্ঞানের গুহ্য তত্ত্ব। কিন্তু এর মাধ্যমে আত্মার সম্বন্ধে কোন ইতিবাচক সংবাদ প্রদান করে না। কখনও কখনও মানুষ মনে করে যে, দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং দেহান্তর হলে অথবা দেহ থেকে মুক্তি লাভ হলে, আত্মা শূন্যে লীন হয়ে গিয়ে তার সত্তা হারিয়ে ফেলে এবং নির্বিশেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটি কিভাবে সম্ভব যে, দেহে অবস্থিত অত্যন্ত সক্রিয় যে আত্মা, তা দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়? আত্মা নিত্য সক্রিয় থাকে। আত্মা যদি নিত্য হয়, তা হলে তার সক্রিয়তাও নিত্য এবং ভগবৎ-ধামে তার ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানরাজ্যের গুহ্যতম অংশ। আত্মার এই

সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে এখানে রাজবিদ্যা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে পরম গুহ্যতম বলা হয়েছে।
এই জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের পরম বিশুদ্ধ রূপ। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্ম পুরাণে মানুষের পাপকর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পাপের পর পাপকর্মের পরিণাম দেখানো হয়েছে। যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত, তারা পাপ-কর্মফলের বিভিন্ন স্তরে আবদ্ধ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যখন কোন বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়, সেটি তৎক্ষণাৎ একটি বৃক্ষে পরিণত হয় না; তার জন্য কিছু সময় লাগে। সর্বপ্রথমে তা একটি চারা গাছে অঙ্কুরিত হয়, তারপর একটি গাছের রূপ ধারণ করে পল্লবিত হয় এবং ফুলে-ফলে শোভিত হয়। এভাবেই তা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে যে রোপণ করেছিল, সে তার ফল ও ফুল উপভোগ করে। সেই রকম, মানুষের পাপকর্মের বীজেরও ফল প্রাপ্ত হতে সময় লাগে। কর্মফলের বিভিন্ন স্তর আছে। পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরেও তার কর্তাকে সেই পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। অনেক পাপকর্ম এখনও বীজরূপে রয়েছে, অনেক পাপের ফল দুঃখ-দুর্দশারূপে ফল প্রাপ্ত হয়েছে, যা আমরা এখনও ভোগ করছি।
সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সমস্ত পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছেন এবং জড়-জাগতিক সংসারের দ্বন্দু থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সৎকর্ম-পরায়ণ হয়েছেন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তিনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই কথা পদ্ম পুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে-

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

ভক্তি সহকারে যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বীজত্ব সমস্ত পাপকর্মের ফলই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত প্রবল পাপ নাশকারী শক্তি আছে। এই কারণে তাকে পবিত্রম্ উত্তমম্ অর্থাৎ পরম পবিত্র বলা হয়। উত্তমম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপ্রাকৃত। তমস্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎ অথবা অন্ধকার এবং উত্তম শব্দের অর্থ হচ্ছে জড় কার্যকলাপের অতীত। ভক্তিমূলক কার্যকলাপকে কখনই জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কখনও কখনও মনে হতে পারে যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সাধারণ মানুষের মতোই কর্তব্যকর্ম করে চলেছে। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অবগত তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ জানেন যে, ভক্তের কাজকর্ম কখনই জড়-জাগতিক কাজকর্ম নয়। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় এবং ভক্তিভাবময়।
এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, ভগবদ্ভক্তির সাধন এতই উৎকৃষ্ট যে, তার পরিণাম সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে অপরাধমুক্ত হয়ে কীর্তন করার ফলে সকলেরই যথাসময়ে অপ্রাকৃত আনন্দানুভূতি হয়, যার ফলে মানুষ অতি শীঘ্রই জড়-জাগতিক সমস্ত কলুষ থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটি বাস্তবিকই দেখা গেছে। অধিকন্তু, কেবলমাত্র শ্রবণ করাই নয়, সেই সঙ্গে যদি কেউ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের কথা প্রচার করে অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের কাজকর্মে সহযোগিতা করে, তবে সেও উত্তরোত্তর পারমার্থিক উন্নতি অনুভব করে। পারমার্থিক জীবনের এই উন্নতি কোন প্রকার পূর্বার্জিত শিক্ষা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। এই পথ স্বরূপত এতই পবিত্র যে, তার অনুগামী হওয়া মাত্রই মানুষ আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে ওঠে। বেদান্ত-সূত্রে (৩/২/২৬) এই সিদ্ধান্তের নিরূপণ করা হয়েছে-প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ।

"ভক্তিযোগ এত শক্তিশালী যে, তার অনুশীলন করার ফলে নিঃসন্দেহে দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায়।" এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় নারদ মুনির পূর্বজীবনে। ত্রিভুবনখ্যাত ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি নারদ পূর্বজন্মে এক দাসীর পুত্র ছিলেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না অথবা কৌলীন্যও ছিল না। কিন্তু তাঁর মা যখন মহাভাগবতদের সেবা করেছিলেন, তখন তিনিও তাঁদের সেবাপরায়ণ হতেন এবং কখনও কখনও তাঁর মায়ের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেই সেই মহাভাগবতদের সেবা করতেন। নারদ মুনি নিজেই বলেছেন-

উচ্ছিষ্টলে পাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৫/২৫) এই শ্লোকটিতে নারদ মুনি তাঁর শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্বজন্মে বাল্যকালে চাতুর্মাস্যের সময় তিনি কয়েকজন মহাভাগবতের সেবা করেছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভ করেন। তাঁদের অনুগ্রহক্রমে তিনি তাঁদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবার মাত্র ভোজন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর পাপ দূর হয় এবং চিত্ত মার্জিত হয়। তখন তাঁর হৃদয় সেই মহাভাগবতদের মতো নির্মল হয় এবং তাতে পরমেশ্বরের আরাধনায় রুচি জাগ্রত হয়। সেই মহাভাগবতেরা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির রসাস্বাদন করতেন। সেই রুচির উন্মেষ হওয়ার ফলে নারদও শ্রবণ ও কীর্তনে অত্যন্ত উৎসাহিত হন। নারদ মুনি তাই আরও বলেছেন-

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃন্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ ॥

সাধুসঙ্গের প্রভাবে নারদ ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে রুচি লাভ করেন এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির প্রতি তীব্র আসক্তি জন্মায়। তাই, বেদান্ত-সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকাশশ কর্মণ্যভ্যাসাৎ-ভগবদ্ভক্তিতে অনন্য নিষ্ঠা হলে ভক্তের হৃদয়ে পূর্ণরূপে সকল প্রকার ভগবৎ-তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় এবং তখন তিনি সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। একেই বলা হয় 'প্রত্যক্ষ' অনুভূতি।

এই শ্লোকে ধর্মাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ধর্মের পথ'। নারদ মুনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক দাসীপুত্র, তাই তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি। তিনি কেবল তাঁর মাকে সাহায্য করতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মা ভগবদ্ভক্তের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শিশু নারদও সেই সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কেবল সাধুসঙ্গের প্রভাবেই তিনি সমস্ত ধর্মের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্ম আচরণের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিযোগ (স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে)। ধর্মপরায়ণ লোকেরা সাধারণত জানে না যে, ধর্মাচরণের চরম সার্থকতা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। অষ্টম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে (বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব) আমরা ইতিমধ্যেই সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সাধারণত আত্ম-উপলব্ধি করতে হলে বৈদিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এখানে, যদিও নারদ কখনও কোন গুরুদেবের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাননি এবং বৈদিক সিদ্ধান্তে শিক্ষিত হতে পারেননি, তবুও তিনি বৈদিক জ্ঞান অনুশীলনে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই ভক্তিপথ এতই শক্তিশালী যে, নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান না করেও পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। এটি কি করে সম্ভব? বৈদিক সাহিত্যে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে-আচার্যবান পুরুষো বেদ। মহান আচার্যদের সঙ্গ লাভ করার ফলে

অশিক্ষিত ও বৈদিক জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মানুষও আত্ম-উপলব্ধির উপযোগী জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।
ভক্তিযোগের পথ অত্যন্ত সুখসাধ্য (সুসুখম্)। কেন? ভক্তিযোগের অঙ্গ হচ্ছে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ, সুতরাং ভগবানের নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন অথবা প্রামাণিক আচার্যদের দিব্যজ্ঞান সমন্বিত দার্শনিক প্রবচন শোনার মাধ্যমে ভক্তিযোগ সাধিত হয়। শুধু বসে বসেই শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তারপর ভগবানের সুস্বাদু প্রসাদ আস্বাদন করা যায়। যে-কোন অবস্থায় ভক্তিযোগ অত্যন্ত আনন্দদায়ক। পরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ভক্তিযোগ সাধন করা যায়। ভগবান বলেছেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্ তিনি ভক্তের নিবেদিত সব কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তা যা-ই হোক না কেন তাতে কিছু মনে করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল, জল আদি পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ ভগবানকে তা প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করতে পারে। ভক্তি সহকারে ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করা হয়, তা-ই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ আছে। ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর সৌরভ শুধুমাত্র ঘ্রাণ করে সনৎকুমার আদি মহর্ষিরা মহাভাগবতে পরিণত হন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তির পন্থা অতি উত্তম এবং অত্যন্ত সুখসাধ্য। ভগবানকে আমরা যা কিছুই নিবেদন করি না কেন, তিনি কেবল আমাদের ভালবাসাটাই গ্রহণ করেন।
এখানে ভক্তিযোগকে শাশ্বত নিত্য বলা হয়েছে। এই ভক্তি মায়াবাদীদের মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে। মায়াবাদীরা কখনও কখনও নামমাত্র ভক্তি অনুশীলন করে এবং মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তার আচরণ করতে থাকে, কিন্তু সব শেষে যখন তারা মুক্ত হয়, তখন ভক্তি ত্যাগ করে 'ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়'। অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ এই ভক্তিকে শুদ্ধ ভক্তি বলা যায় না। যথার্থ ভক্তিযোগের অনুশীলন এমন কি মুক্তির পরেও পূর্ববৎ চলতে থাকে। ভক্ত যখন ভগবৎ-ধামে ফিরে যান, তখন তিনি সেখানেও ভগবৎ-সেবায় মগ্ন থাকেন। ভক্ত কখনই ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন না।
ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যথার্থ ভক্তিযোগের শুরু হয় মুক্তি লাভের পরে। মুক্তির পরে কেউ যখন ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখনই তাঁর ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন শুরু হয় (সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্)। স্বাধীনভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ অথবা অন্য যে কোন যোগ অনুষ্ঠান করলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। এই সব যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে ভক্তিযোগের পথে মানুষ কিছুটা অগ্রসর হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির স্তরে উপনীত না হলে পুরুষোত্তম ভগবান যে কি, কেউ তা বুঝতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রতিপন্ন করাও হয়েছে যে, ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে, বিশেষত মহাভাগবতদের মুখারবিন্দ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত অথবা ভগবদ্গীতা শ্রবণ করলে কৃষ্ণতত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব জানা যায়। এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ। হৃদয় যখন সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তি ও অনর্থ থেকে মুক্ত হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে ভগবান কি। এভাবেই ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের রাজা। এটি হচ্ছে পরম বিশুদ্ধ ধর্ম এবং আনন্দের সঙ্গে অনায়াসে এর অনুশীলন করা চলে। তাই, এই পন্থা গ্রহণ করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ৩

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ-শ্রদ্ধাহীন; পুরুষাঃ-ব্যক্তিরা; ধর্মস্য ধর্মের; অস্য-এই; পরন্তপ-হে পরন্তপ; অপ্রাপ্য-না পেয়ে; মাম্-আমাকে; নিবর্তন্তে-ফিরে আসে; মৃত্যু-মৃত্যুর; সংসার-সংসার; বর্ত্মনি-পথে।

গীতার গান

যাহার সে শ্রদ্ধা নাই ওহে পরন্তপ।
এই ধর্ম বিজ্ঞানেতে বৃথা জপতপ ॥
সে আমাকে নাহি পায় জানিহ নিশ্চয়।
মৃত্যু সংসারের পথে নিরন্তর রয় ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! এই ভগবদ্ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা আমাকে লাভকরতে পারে না। তাই, তারা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর পথে ফিরে আসে।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; এটি হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এতই হতভাগ্য যে, মহাপুরুষদের মুখারবিন্দ থেকে বেদের সমস্ত প্রমাণ শ্রবণ করার পরেও তাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয় না। সন্দেহান্বিত হওয়ার ফলে তারা ভক্তিযোগে স্থির থাকতে পারে না। তাই, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করবার জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, শ্রদ্ধা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাৎ শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা মানুষ সব রকমের সার্থকতা অর্জন করতে পারে। একেই বলা হয় প্রকৃত বিশ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে-

যথা তরোমূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

"গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা ও পল্লবাদি আপনা থেকেই পুষ্ট হয়, উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হয়, তেমনই চিন্ময় ভগবৎ-সেবা করার ফলে সমস্ত দেবতা ও জীব আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হয়।" সুতরাং, ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে কর্তব্য। জীবনের এই দর্শনের প্রতি বিশ্বাসই হচ্ছে যথার্থ শ্রদ্ধা। আর এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

এখন, সেই বিশ্বাসের উন্নতি সাধন করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পন্থা। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মানুষকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়। সর্বনিম্ন তৃতীয় স্তরে যারা আছে, তাদের কোনই বিশ্বাস নেই। এমন কি যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে নিযুক্ত থাকে, তবুও তারা পরম সার্থকতার স্তর অর্জন করতে পারে না। এদের অধিকাংশই কিছুকাল পরে হয়ত ভক্তিমার্গ থেকে স্খলিত হয়। তারা কিছু কালের জন্য ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারে, কিন্তু পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকার ফলে তাদের পক্ষে অধিককাল কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত থাকা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের প্রচারকার্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি যে, কিছু লোক গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন শুরু করে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হলে তারা এই পন্থা পরিত্যাগ করে আবার পুরানো জীবনধারা গ্রহণ করে। কেবলমাত্র শ্রদ্ধার দ্বারাই মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন

করতে পারে। শ্রদ্ধার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে বলা যায়, ভক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থে যিনি পারদর্শী এবং যিনি দৃঢ় শ্রদ্ধার স্তর লাভ করেছেন, তাঁকে কৃষ্ণভাবনায় প্রথম শ্রেণীর মানুষ বা উত্তম অধিকারী বলা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম অধিকারী হচ্ছেন তিনি, যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ততটা পারদর্শী নন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম মার্গ এবং তাই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই মার্গ অনুসরণ করেন। এভাবেই মধ্যম অধিকারী কনিষ্ঠ অধিকারীর থেকে উত্তম। কনিষ্ঠ অধিকারীর যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান ও দৃঢ় শ্রদ্ধা এই দুইয়েরই অভাব। কিন্তু তাঁরা সাধুসঙ্গ ও নিষ্কপট সহকারে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে কনিষ্ঠ অধিকারীর পতন হতে পারে, কিন্তু কেউ যখন মধ্যম অধিকারীতে স্থিত হন, তিনি তখন পতিত হন না এবং কৃষ্ণভাবনায় উত্তম অধিকারীর পতনের কখনও সম্ভাবনাই থাকে না। উত্তম অধিকারী নিশ্চিতভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে অবশেষে সুফল প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ অধিকারীর যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জেগেছে, কিন্তু সে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেনি। কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃতের এই কনিষ্ঠ অধিকারীদের কর্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগের প্রতি কিছুটা প্রবণতা থাকে এবং কখনও কখনও তারা ভক্তিমার্গ থেকে বিচলিত হয়ে পড়ে; কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আদির সংক্রমণ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তারা কৃষ্ণভাবনায় মধ্যম অথবা উত্তম অধিকারীতে পরিণত হতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধার তিনটি ভরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে প্রথম শ্রেণীর আসক্তি, দ্বিতীয় শ্রেণীর আসক্তি ও তৃতীয় শ্রেণীর আসক্তির কথাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণকথা তথা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও যাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় না এবং যারা কেবল সেগুলিকে স্তুতিমাত্র বলে মনে করে, তাদের কাছে এই পথ অত্যন্ত দুর্গম বলে প্রতিভাত হয়, এমন কি যদিও তারা তথাকথিতভাবে ভক্তিযোগে তৎপর আছে বলে মনে হয়। তাদের পক্ষে সিদ্ধি লাভ করার কোনই আশা নেই। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তিযোগ সাধনে শ্রদ্ধা অত্যন্ত দরকারি।

শ্লোক ৪

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষুবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ময়া-আমার দ্বারা; ততম্-ব্যাপ্ত; ইদম্-এই; সর্বম্-সমস্ত; জগৎ-বিশ্ব; অব্যক্তমূর্তিনা-অব্যক্তরূপে; মৎস্থানি-আমাতে অবস্থিত, সর্বভূতানি-সমস্ত জীব; ন-না; চ-ও; অহম্-আমি; তেষু-তাতে; অবস্থিতঃ-অবস্থিত।

গীতার গান
অব্যক্ত যে নির্বিশেষ আমারই রূপ।
জগৎ ব্যাপিয়া থাকি অনির্দিষ্ট রূপ ॥
আমাতে জগৎ সব না আমি তাহাতে।
পরিণাম হয় তাহা আমার শক্তিতে ॥
অনুবাদ

অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি

তাতে অবস্থিত নই।

তাৎপর্য

স্থূল ও জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। কথিত আছে যে-

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরতাদঃ ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৩৪)

জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা আদি উপলব্ধি করা যায় না। সদগুরুর তত্ত্বাবধানে যিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সাধন করেন, তাঁর নিকট তিনি প্রকাশিত হন। ব্রহ্মাহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়ে বিলোকয়ন্তি-পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি বিকাশ সাধন করার ফলে অন্তরে ও বাইরে তাঁকে সর্বদা দর্শন করা যায়। তাই, তিনি সকলের কাছে প্রকট নন। এখানে বলা হয়েছে, যদিও তিনি সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র দৃশ্য, তবুও তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচরীভূত নন। এখানে অব্যক্তমূর্তিনা কথাটির দ্বারা সেই কথাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, তবুও সব কিছু তাঁকেই আশ্রয় করে আছে। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, সেই অনুসারে সমস্ত মহাজাগতিক সৃষ্টি ভগবানের উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তি ও নিকৃষ্ট জড় শক্তির সমন্বয় মাত্র। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যকিরণের বিস্তারের মতো ভগবানের শক্তি সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে বিস্তারিত এবং সব কিছুই সেই শক্তির আশ্রয়ে বিদ্যমান।

কিন্তু তা বলে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এই যুক্তিকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করবার জন্য ভগবান বলেছেন, "আমি সর্বব্যাপক এবং সব কিছুই আমাকে আশ্রয় করে আছে, কিন্তু তবুও আমি সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র।" উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, রাজা যেমন তাঁর প্রশাসনের অধীশ্বর বা প্রশাসন তাঁর একটি শক্তির প্রকাশ; বিবিধ প্রশাসনিক বিভাগে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং প্রতিটি বিভাগ তাঁর ক্ষমতার উপর আশ্রিত। কিন্তু তবুও তিনি স্বয়ং প্রতিটি বিভাগে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান থাকেন না। এটি অবশ্য একটি স্থূল উদাহরণ। সেই রকম, যা কিছু আমরা দেখি এবং জড় জগতে ও চিন্ময় জগতে যত সৃষ্টি আছে, সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বর্তমান। ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রসারণের ফলে সৃষ্টির উদ্ভব হয় এবং ভগবদ্গীতাতে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্-তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির দ্বারা বা বিভিন্ন শক্তির পরিব্যাপ্তির দ্বারা তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান।

শ্লোক ৫

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

ন-না; চ-ও; মৎস্থানি-আমাতে স্থিত; ভূতানি-সমগ্র সৃষ্টি; পশ্য-দেখ; মে-আমার; যোগমৈশ্বরম্-অচিন্ত্য যোগশক্তি; ভূতভূৎ-সমস্ত জীবের ধারক; ন-না; চ-ও; ভূতস্থঃ-জড় সৃষ্টির মধ্যে; মম-আমার; আত্মা-স্বরূপ; ভূতভাবনঃ-সমগ্র জগতের উৎস।

গীতার গান

আমার শক্তিতে থাকে ভিন্ন আমা হতে।
যোগেশ্বর্য সেই মোর বুঝ ভাল মতে ॥
ভর্তা সকল ভূতের নহি সে ভূতস্থ।
ভূতভূৎ নাম মোর ভূতাদি তটস্থ ॥

অনুবাদ

যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগেশ্বর্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি এই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেন না আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে বলেছেন যে, সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে (মৎস্থানি সর্বভূতানি)। ভগবানের এই উক্তির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়। এই জড় সৃষ্টির পালন-পোষণের ব্যাপারে ভগবানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কখনও কখনও ছবিতে দেখি যে, গ্রীক পুরাণের অ্যাটলাস নামে এক অতিকায় পুরুষ তার কাঁধে পৃথিবী ধারণ করে আছে। তাকে দেখে মনে হয় এই বিশাল পৃথিবী গ্রহটির ভার বহন করে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন না। তিনি বলেছেন, যদিও সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে, তবুও তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রহমণ্ডলী মহাকাশে ভাসছে এবং এই মহাকাশ হচ্ছে ভগবানের শক্তি। কিন্তু তিনি মহাকাশ থেকে ভিন্ন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাই ভগবান বলেছেন, "তারা যদিও আমার অচিন্ত্য শক্তিতে অবস্থান করে, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি তাদের থেকে স্বতন্ত্র।" এটিই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য।

নিরুক্তি নামে বৈদিক অভিধানে বলা হয়েছে যে, যুজাতেহনেন দুর্ঘটেযু কার্যেধু "ভগবান তাঁর বিচিত্র শক্তির প্রভাবে অদ্ভুত, অচিন্ত্য লীলা পরিবেশন করেন।" তিনি বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং তাঁর সংকল্পই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত। আমরা অনেক কিছুই করার ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু তাদের বাস্তবে রূপদান করতে গেলে আমাদের নানা একমের প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক সময় আমাদের ইচ্ছানুসারে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন কিছু করতে চান, তখন তাঁর সংকল্প মাত্রই সমস্ত কিছু এত সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় যে, তা কল্পনাও করা যায় না। ভগবান এই সত্যের ব্যাখ্যা করে বলেছেন-যদিও তিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টির ধারক ও প্রতিপালক, কিন্তু তবুও তিনি তা স্পর্শও করেন না। কেবলমাত্র তাঁর পরম বলবতী ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, পালন ও সংহার সাধিত হয়। আমাদের জড় মন ও স্বয়ং আমি, এর মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু ভগবানের মন ও স্বয়ং তিনি সর্বদাই অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম চৈতন্য। যুগপৎভাবে ভগবান সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান; তবুও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে ন। কিভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান। ভগবান এই সৃষ্টির থেকে ভিন্ন, তবুও সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। এই অচিন্ত্য সত্যকে এখানে যোগমৈশ্বরম্ অর্থাৎ ভগবানের যোগশক্তি বলা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

যথা-যেমন; আকাশস্থিতঃ-আকাশে অবস্থিত; নিত্যম্ সর্বদা; বায়ুঃ-বায়ু; সর্বত্রগঃ-সর্বত্র বিচরণশীল; মহান্ মহান; তথা-তেমনই; সর্বাণি-সমস্ত; ভূতানি-জীবসমূহ; মৎস্থানি-আমাতে অবস্থিত; ইতি-এভাবে; উপধারয়-উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর।

গীতার গান

আকাশ আর যে বায়ু সেরূপ তুলনা ।
আকাশ পৃথক হতে বায়ুর চালনা ॥
আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত বায়ু যথা থাকে।
তথা সর্বভূত স্থিত থাকে যে আমাতে ॥

অনুবাদ

অবগত হও যে, মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনই সমস্ত সৃষ্ট জীব আমাতে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

এই বিশাল জড় জগৎ কিভাবে ভগবানকে আশ্রয় করে আছে, এই সত্য সাধারণ মানুষের কাছে অচিন্ত্যনীয়। তাই, আমাদের বোঝাবার জন্য ভগবান এখানে এই উদাহরণের অবতারণা করেছেন। এই সৃষ্টিতে, আমাদের কল্পনায় আকাশ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর সেই আকাশের মধ্যে বাতাস হচ্ছে মহাজগতের সবচেয়ে বিশাল এক অভিপ্রকাশ। সেই বাতাসের চলাচল থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য সব কিছুর চলাচল। কিন্তু এই মহান বায়ু অত বিশাল হলেও আকাশের মধ্যেই তার অবস্থান; বাতাস তো আকাশের বাইরে নয়। তেমনই, চমকপ্রদ সমস্ত সৃষ্টি ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে বিদ্যমান এবং সেই সমস্ত পূর্ণরূপে তাঁরই ইচ্ছার অধীন। যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না। এভাবেই সব কিছুই তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে সাধিত হয়-তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, সব কিছুর পালন হচ্ছে এবং সব কিছুর বিনাশ হচ্ছে। কিন্তু তবুও তিনি সব কিছুর থেকে পৃথক, যেমন আকাশ সব সময়ই বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজ করে।

উপনিষদে বলা হয়েছে, যদ্ভীষা বাতঃ পবতে- "ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৮/১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩/৮/৯) বলা হয়েছে-এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিবৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। "পরমেশ্বর ভগবানের পরম আজ্ঞার ফলে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য বৃহৎ গ্রহমণ্ডলী তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।" ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫/৫২) বলা হয়েছে-

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এখানে সূর্যের ভ্রমণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাপ ও আলো বিকিরণকারী অনন্ত শক্তিসম্পন্ন সূর্য ভগবানের একটি চক্ষুবিশেষ। শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা ও ইচ্ছা অনুসারে তিনি তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং, বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, অতি অদ্ভুত ও মহানরূপে প্রতিভাত হয় যে জড় সৃষ্টি, তা পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অধ্যায়ে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এই তথ্যের বিশদ বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৭

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

সর্বভূতানি-সমগ্র সৃষ্টি; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; প্রকৃতিম্-প্রকৃতি; যান্তি-প্রবেশ করে; মামিকাম্-আমার; কল্পক্ষয়ে-কল্পের অবসানে; পুনঃ-পুনরায়; তানি-তাদের সকলকে; কল্পাদৌ-কল্পের শুরুতে; বিসৃজামি-সৃষ্টি করি; অহম্-আমি।

গীতার গান

প্রকৃতির লয় হলে বিশ্রাম আমাতে।
কল্পারম্ভে হয় সৃষ্টি পুনঃ আমা হতে ।।
প্রলয়ের পরে থাকি আমি যে ঈশ্বর।
সৃষ্টাসৃষ্ট যাহা কিছু আমার কিঙ্কর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত জড় সৃষ্টি আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। 'কল্পের অবসানে' মানে ব্রহ্মার মৃত্যু হলে। ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর। তাঁর একদিন পৃথিবীর ৪৩০,০০,০০,০০০ বছরের সমান। তাঁর রাত্রির স্থায়িত্বও সম পরিমাণ। তাঁর এক মাস এই রকম ত্রিশ দিন ও রাত্রির সমন্বয়। এই রকম বারোটি মাসে তাঁর এক বৎসর হয়। এই রকম একশ বছর পরে ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রলয় হয়। এর অর্থ হচ্ছে ভগবানের দ্বারা অভিব্যক্ত শক্তি পুনরায় তাঁরই মধ্যে লয় হয়ে যায়। তার পরে আবার যখন জড় জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর ইচ্ছানুসারে তা সম্পন্ন হয়। বহু স্যাম্-"এক হলেও আমি বহুরূপ ধারণ করব।" এটি হচ্ছে বৈদিক সূত্র (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/৩)। তিনি নিজেকে এই মায়াশক্তিতে বিস্তার করেন এবং তার ফলে সমস্ত জড় জগৎ পুনরায় প্রকট হয়।

শ্লোক ৮

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮।

প্রকৃতিম্-জড়া প্রকৃতি; স্বাম্-আমার নিজের; অবষ্টভ্য-আশ্রয় করে; বিসৃজামি-সৃষ্টি করি; পুনঃ পুনঃ- বার বার; ভূতগ্রামম্-সমগ্র জড় সৃষ্টি, ইমম্ এই; কৃৎস্নম্-সমগ্র; অবশম্-আপনা থেকে; প্রকৃতেঃ-প্রকৃতির; বশাৎ-বশে।

গীতার গান

আমার প্রকৃতি দ্বারা সৃজি পুনঃ পুনঃ।
প্রকৃতির বশে হয় যত ভূতগ্রাম ॥

অনুবাদ

এই জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন। তা প্রকৃতির বশে অবশ হয়ে আমার ইচ্ছার দ্বারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় এবং আমারই ইচ্ছায় অন্তকালে বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ ভগবানেরই অপরা বা নিকৃষ্ট শক্তির অভিব্যক্ত। সেই কথা পূর্বেই কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির সময় জড়া শক্তি মহৎ-তত্ত্বরূপে পরিণত হয় এবং প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু তাতে প্রবেশ করেন। তিনি কারণ সমুদ্রে শায়িত থাকেন এবং তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি নিজেকে আবার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত করেন এবং সেই বিষ্ণু সর্বভূতে প্রবিষ্ট হন-এমন কি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও প্রবেশ করেন। সেই তত্ত্ব এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন, জীবদের সম্পর্কে যা সংঘটিত হতে থাকে তা হচ্ছে, সেগুলিকে জড়া প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চারিত করা হয় এবং তাদের অতীতের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এভাবেই এই জড় জগতের কার্যকলাপ শুরু হয়। সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রজাতির জীবদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এমন নয় যে, সব কিছুই বিবর্তিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি-সমস্তই একই সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে, কারণ পূর্ব কল্পের প্রলয়ের সময় জীবদের যার যেমন বাসনা ছিল, সেভাবেই তারা আবার অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে অবশম্ শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়াতে জীবদের কিছুই করার সামর্থ্য থাকে না। পূর্ব সৃষ্টিকালের মধ্যে তাদের পূর্ব জীবনে তাদের সত্তার যে অবস্থা ছিল, ঠিক সেভাবেই তারা আবার অভিবাক্ত হয় এবং এ সবই সাধিত হয় শুধুমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই। এটিই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি এবং বিভিন্ন জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করার পরে তাদের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ থাকে না। বিভিন্ন জীবের কর্মবাসনা পূর্ণ করবার জন্যই জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং তাই ভগবান এই জড় জগতের সঙ্গে লিপ্ত হন না।

শ্লোক ৯

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ৷ ৯ ॥

ন-না; চ-ও; মাম্-আমাকে; তানি-সেই সমস্ত; কর্মাণি-কর্ম, নিবঘ্নন্তি-বন্ধন করে; ধনঞ্জয়-হে ধনঞ্জয়; উদাসীনবৎ-উদাসীনের ন্যায়; আসীনম্-অবস্থিত; অসক্তম্-আসক্তি রহিত; তেষু-সেই সমস্ত; কর্মসু-কর্মে।

গীতার গান

কিন্তু ধনঞ্জয় তুমি বুঝিবে নিশ্চয় ।
প্রকৃতির কার্যে কভু আমি লিপ্ত নয় ॥
উদাসীন আমি সেই প্রকৃতির কার্যে।
আসক্তি নহে ত মোর প্রকৃতি বিধার্যে ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! সেই সমস্ত কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি সেই সমস্ত কর্মে

অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকি।

তাৎপর্য

এই সম্বন্ধে এটি মনে করা উচিত নয় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান নিষ্ক্রিয়। তাঁর চিন্ময় জগতে তিনি নিত্য সক্রিয় হয়ে রয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৬) বলা হয়েছে, আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ- "তিনি তাঁর শাশ্বত, আনন্দময় ও চিন্ময় রসাত্মক লীলায় নিত্য তৎপর, কিন্তু এই জড় জগতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁর কোন সংসর্গ নেই।" সমস্ত জড়-জাগতিক ক্রিয়াগুলি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভগবান তাঁর সৃষ্ট জগতের সমস্ত জড়-জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি নিত্য উদাসীন থাকেন। এখানে উদাসীনবৎ কথাটির মাধ্যমে তাঁর উদাসীনতার বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও জাগতিক কার্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে, তবুও তিনি যেন উদাসীন হয়ে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ন্যায়াধীশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তাঁর আজ্ঞায় কত ঘটনা ঘটে চলে-কারও প্রাণদণ্ড হয়, কারও কারাবাস হয়, কেউ আবার অসীম সম্পদ-সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু তবুও তিনি নিরপেক্ষভাবে উদাসীন হয়ে থাকেন। সেই সমস্ত লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই রকমভাবে, যদিও জড় জগতের প্রতিটি ব্যাপারেই ভগবানের হাত থাকে, তবুও তিনি সব কিছুর থেকেই নিত্য উদাসীন। বেদান্ত-সূত্রে (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন-তিনি এই জড় জগতের দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করেন না। তিনি এই সব জড়-জাগতিক দ্বন্দ্বের অতীত। এই জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশেও তাঁর কোন আসক্তি নেই। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির দেহ ধারণ করে এবং ভগবান তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করেন না।

শ্লোক ১০

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ বিপরিবর্ততে ৷ ১০ ॥

ময়া-আমার; অধ্যক্ষেণ-অধ্যক্ষতার দ্বারা; প্রকৃতিঃ-জড়া প্রকৃতি; সূয়তে-প্রকাশ করে; স-সহ; চরাচরম্-স্থাবর ও জঙ্গম; হেতুনা-কারণে; অনেন-এই; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; জগৎ-জগৎ, বিপরিবর্ততে-পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়।

গীতার গান

ইঙ্গিত মাত্র সে মোর জড়াকার্য করে।
চরাচর যত কিছু প্রসবে সবারে ॥
জগৎ পরিবর্তন হয় সেই সে কারণ।
পুনঃ পুনঃ হয় যত জনম মরণ ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলেও ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে এই

জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু তার পরিচালনা করেন জড়া প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে বলেছেন যে, বিভিন্ন যোনি থেকে উদ্ভূত সমস্ত জীব-প্রজাতির তিনিই হচ্ছেন পিতা। মাতার গর্ভে বীজ প্রদান করে পিতা সন্তান উৎপাদন করেন, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির গর্ভে সমস্ত জীবকে সঞ্চারিত করেন এবং এই সমস্ত জীব তাদের পূর্ব কর্মবাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও যোনি প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত জীবেরা যদিও ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পূর্ব কর্মবাসনা অনুসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, ভগবান স্বয়ং এই প্রাকৃত সৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই জড়া প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়। যেহেতু ভগবান মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন নিঃসন্দেহে সেটিও তাঁর একটি কার্যকলাপ, কিন্তু জড় জগতের সৃষ্টির অভিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। স্মৃতি শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে-কারও সামনে যখন একটি সুবাসিত ফুল থাকে, তখন সেই ফুলের সৌরভ ও তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও সেই ফুলটি পরস্পর থেকে পৃথক। জড় জগৎ এবং ভগবানের মধ্যেও এই রকমেরই সম্বন্ধ রয়েছে। এই জড় জগতে তাঁর কিছু করার নেই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিপাত ও আদেশের মাধ্যমে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এর মর্মার্থ হচ্ছে, ভগবানের পরিচালনা ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না, তবুও সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পরমেশ্বর ভগবান অনাসক্ত।

শ্লোক ১১

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অবজানন্তি-অবজ্ঞা করে; মাম্-আমাকে; মূঢ়াঃ-মূঢ় ব্যক্তিরা; মানুষীম্-মনুষ্যরূপে; তনুম্-শরীর; আশ্রিতম্ ধারণ করে; পরম্-পরম; ভাবম্-তত্ত্ব; অজানন্তঃ-না জেনে; মম-আমার; ভূত-সব কিছুর; মহেশ্বরম্-পরম ঈশ্বর।

গীতার গান

আমার মনুষ্যাকার বিগ্রহ দেখিয়া।
মূঢ় লোক নাহি বুঝে অবজ্ঞা করিয়া ।।
আমি মহেশ্বর এই জগৎ সংসারে।
আমার পরম ভাব কে বুঝিতে পারে ॥

অনুবাদ

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, নররূপে অবতরণ করলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবান সাধারণ মানুষ নন। সমস্ত সৃষ্টির সৃজন, পালন ও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান কখনই একজন মানুষ হতে পারেন না। কিন্তু তবুও অনেক মূঢ় লোক মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন শক্তিশালী মানুষ মাত্র এবং

তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্মসংহিতাতে তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ-তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর।
সৃষ্টিতে একাধিক ঈশ্বর বা নিয়ন্তা রয়েছেন এবং তাঁদের এক জনের থেকে আর একজনকে শ্রেয় বলে মনে হয়। জড় জগতেও সাধারণত প্রতিটি প্রশাসনে কোনও সচিব, সচিবের উপরে মন্ত্রী এবং সেই মন্ত্রীর উপরে রাষ্ট্রপতি শাসন করেন। এঁরা সকলেই নিয়ন্তা, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই আবার কারও না কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। জড় ও চিন্ময় এই উভয় জগতে নিঃসন্দেহে অনেক নিয়ন্তা আছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা (ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ) এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ হচ্ছে সচ্চিদানন্দঘন, অর্থাৎ অপ্রাকৃত।
পূর্ব শ্লোকগুলিতে বর্ণিত সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করা জড়-জাগতিক কলেবর-বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। যদিও তিনি একজন সাধারণ মানুষ নন, কিন্তু তবুও মূঢ় লোকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তাঁর শ্রীবিগ্রহকে এখানে মানুষীম্ বলা হয়েছে, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ ও অর্জুনের সখারূপে মানুষের মতো লীলা করেছিলেন। বিভিন্নভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলা করলেও তাঁর রূপ হচ্ছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-শাশ্বত আনন্দ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্রেও সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়-"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি জানাই, যাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়।" (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১) বৈদিক শাস্ত্রে আরও অনেক বিবরণ আছে। তমেকং গোবিন্দম্ "তুমি হচ্ছ ইন্দ্রিয়সমূহের ও গাভীদের আনন্দ বর্ধনকারী গোবিন্দ।" সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্-"আর তোমার রূপ হচ্ছে শাশ্বত, জ্ঞানময় ও আনন্দময়।" (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/৩৫)
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ জ্ঞানময়, আনন্দময় এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবদ্গীতার অনেক তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও ব্যাখ্যাকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে এই ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবান হতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তার জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। তাই তাকে মূঢ় বলা হয়েছে, কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ এবং তাঁর শক্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ, তারাই তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এই ধরনের মূঢ় লোকেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রতীক, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর এবং তিনি যে কোন জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণসমূহের কথা না জানার ফলে এই ধরনের মূঢ় লোকেরা তাঁকে উপহাস করে।
এই সমস্ত মূঢ় লোকেরা এটিও জানে না যে, এই জড় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অবতরণ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির একটি প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর। যে কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে (মম মায়া দুরত্যয়া), সেই অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করছেন যে, অতি প্রবল মায়াশক্তি সর্বতোভাবে তাঁর অধীন, তাই তাঁর চরণারবিন্দের শরণাগত হওয়ার ফলে যে কোনও জীব এই মায়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে যদি বদ্ধ জীব মায়াশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে, তা হলে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহারের পরিচালক স্বয়ং সেই পরমেশ্বর ভগবান কি করে আমাদের মতো জড় দেহধারী হতে পারেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ মূঢ়তাপূর্ণ। মূর্খেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, সাধারণ মানুষের রূপবিশিষ্ট পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু থেকে শুরু করে

বিরাট বিশ্বরূপ পর্যন্ত সব কিছুরই নিয়ন্তা হতে পারেন। বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম তাদের ধারণার অতীত, তাই তারা কল্পনা করতে পারে না যে, তাঁর নরাকার শ্রীবিগ্রহ কিভাবে এক সঙ্গে অসীম ও অতি ক্ষুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে ভগবান এই অসীম ও সসীমকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিনি এই সৃষ্টির অভিপ্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন। এটিই তাঁর যোগমৈশ্বরম্ অর্থাৎ অচিন্ত্য দিব্য শক্তি। যদিও মূঢ় লোকেরা কল্পনা করতে পারে না কিভাবে নররূপেই শ্রীকৃষ্ণ অসীম ও সসীমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, কারণ তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাই তিনি তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হন।
শ্রীকৃষ্ণের নররূপে অবতার সম্বন্ধে সবিশেষবাদী ও নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য শাস্ত্র ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাপন্ন হই, তা হলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এই ধরাধামে নররূপে অবতরণ করলেও তিনি সামান্য মানুষ নন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যখন শৌনক মুনির নেতৃত্বে ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন-

কৃতবান্ কিল কর্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিম্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মনুষ্যরূপে নীলাবিলাস করেছেন এবং এভাবেই তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন।" (ভাঃ ১/১/২০) পরমেশ্বরের নররূপ অবতার মূঢ়দের কাছে বিড়ম্বনা-স্বরূপ। পৃথিবীতে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন, তা কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকীর সমক্ষে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন, তখন তিনি চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন। কিন্তু মাতা-পিতার বাৎসল্য প্রেমময়ী প্রার্থনায় তিনি একটি সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেন। ভাগবতে (১০/৩/৪৬) বলা হয়েছে, বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ-তিনি একটি সাধারণ শিশু, একটি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। এখন, আবার এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষরূপে প্রকট হওয়া তাঁর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের এক মধুর বিলাস। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়েও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ ররূপ দেখবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন)। এই চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশের পর, অর্জুনের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁর আদি মনুষ্যরূপ (মানুষং রূপম্) ধারণ করেছিলেন। ভগবানের এই বিবিধ রূপ-বৈচিত্র্য সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।
কিছু লোক যারা মায়াবাদের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে, তারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের (৩/২৯/২১) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে। অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা-"আমি সর্বদা সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে অবস্থান করি।" শ্রীকৃষ্ণকে উপহাসকারী অনধিকারী ব্যক্তিদের মনোকল্পিত ব্যাখ্যার অনুসরণ না করে এই শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আদি বৈষ্ণব আচার্যদের ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই, যে প্রাকৃত ভক্ত কেবল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের অর্চামূর্তির পরিচর্যায় ব্যস্ত, কিন্তু অন্যান্য জীবদের সম্মান দিতে জানে না, তার অর্চাপূজা ব্যর্থ। তিন শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে প্রাকৃত ভক্তেরা সবচেয়ে কনিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত। সে অন্য ভক্তদের উপেক্ষা করে মন্দিরের অর্চা-বিগ্রহের প্রতি একাগ্র হয়ে

থাকে। সুতরাং, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সাবধান বাণী হচ্ছে যে, এই প্রকার মনোবৃত্তি সংশোধন করা আবশ্যক। ভক্তের দেখা উচিত যে, যেহেতু পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকেন, তাই প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের মন্দির। ভগবানের মন্দিরকে যেভাবে অভিবাদন করা হয়, তেমনই পরমাত্মার মন্দিরস্বরূপ প্রতিটি প্রাণীকে যথোচিত সম্মান করা উচিত। প্রত্যেককেই যথোচিত শ্রদ্ধা জানানো উচিত এবং কখনই কাউকে অবহেলা করা উচিত নয়।

অনেক নির্বিশেষবাদী আছে, যারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করাকে উপহাস করে। তারা তর্ক করে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপক, অতএব মন্দিরে পূজা করে তাঁকে সীমিত করা হবে কেন? কিন্তু ভগবান যদি সর্বব্যাপক হন, তা হলে কি তিনি মন্দিরে অথবা অর্চা-বিগ্রহে নেই? সবিশেষবাদী এবং নির্বিশেষবাদীরা যদিও এভাবেই আবহমান কাল তর্ক করে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত যথার্থই জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম হলেও তিনি সর্বব্যাপক। ব্রহ্মসংহিতাতেও সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাঁর পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিবিধ শক্তির প্রভাবে এবং তাঁর অংশ-কলার প্রকাশের মাধ্যমে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান।

শ্লোক ১২

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ।

মোঘাশাঃ-ব্যর্থ আশা; মোঘকর্মাণঃ-নিষ্ফল কর্ম; মোঘজ্ঞানাঃ-বিফল জ্ঞান; বিচেতসঃ-মোহাচ্ছন্ন; রাক্ষসীম্-রাক্ষসী; আসুরীম্-আসুরী; চ-এবং; এব-অবশ্যই; প্রকৃতিম্-প্রকৃতি; মোহিনীম্-মোহকারী; শ্রিতাঃ-আশ্রয় গ্রহণ করে।

গীতার গান

আমাকে অবজ্ঞা তাই ব্যর্থ সব আশা।
বিফল করম তার জ্ঞানের জিজ্ঞাসা ॥
যাহার আসুরী ভাব রাক্ষস স্বভাব।
ছাড়ে মোরে মানে শুধু প্রকৃতি বৈভব ।
প্রকৃতি মোহিনীমূর্তি তারে জারি মারে।
মায়াময় মূর্তি বলে তাহারা আমারে ॥

অনুবাদ

এভাবেই যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাক্ষসী ও আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

অনেক ভক্ত আছে, যারা নিজেদের কৃষ্ণভাবনাময় ও ভক্তিযোগে যুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু তারা অন্তরে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলে স্বীকার করে না। তারা কোন দিনই ভক্তিযোগের ফলস্বরূপ ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হতে পারে না। তেমনই, যারা সকাম পুণ্যকর্মে নিয়োজিত এবং যারা পরিশেষে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশা

করছে, তারা কোনটিতেই সফল হবে না, কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে, তারা আসুরিক ভাবাপন্ন কিংবা নাস্তিক। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে তাই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের আসুরিক ভাবাপন্ন দুষ্ট লোকেরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয় না। তাই, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তারা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সাধারণ জীব ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মনে করে যে, তাদের মনুষ্যদেহ এখন মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, কিন্তু যখন কেউ তার দেহ থেকে মুক্ত হবে, তখন তার ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মোহগ্রস্ত চিন্তাধারার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হওয়ার এই যে প্রচেষ্টা তা কোন দিনই সফল হবে না। পারমার্থিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের নাস্তিক্য ও আসুরিক অনুশীলন সর্বদাই নিষ্ফল হয়। এটিই হচ্ছে এই শ্লোকের নির্দেশ। এই ধরনের লোকদের দ্বারা বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে জ্ঞান অনুশীলন চিরকালই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়।
সুতরাং, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা মহা অপরাধ। যারা তা করে তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত, কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্বস্মাদ বহিষ্কার্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ ॥
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।

"যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত দেহ বলে মনে করে, তাকে শ্রুতি ও সম্মৃতি শাস্ত্রের সমস্ত বিধান থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত এবং ঘটনাক্রমে যদি কখনও তার মুখদর্শন ঘটে, তা হলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্নান করা উচিত।" পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তারাই উপহাস করে, যারা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের নিয়তি হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিশ্চিতভাবে বারবার আসুরিক ও নিরীশ্বরবাদী যোনিতে জন্মগ্রহণ করা। তাদের প্রকৃত জ্ঞান চিরকালই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যার ফলে তারা উত্তরোত্তর সৃষ্টিরাজ্যের সবচেয়ে তমসাময় অধম যোনিতেই পতিত হবে।

শ্লোক ১৩

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

মহাত্মানঃ-মহাত্মাগণ; তু-কিন্তু; মাম্-আমাকে; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; দৈবীম্-দৈবী; প্রকৃতিম্-প্রকৃতি; আশ্রিতাঃ-আশ্রয় করে; ভজন্তি-ভজনা করেন; অনন্যমনসঃ-অনন্যমনা হয়ে; জ্ঞাত্বা-জেনে; ভূত-সৃষ্টির; আদিম্-আদি; অব্যয়ম্-অব্যয়।

গীতার গান

কিন্তু যেবা মহাত্মা সে আরাধ্য-প্রকৃতি।
আশ্রয় লইয়া করে ভজন সঙ্গতি ॥
অনন্য মনেতে করে বিশুদ্ধ ভজন।

সমস্ত ভূতের আদি আমাকে তখন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের আদি ও অব্যয় জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ মহাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদাই দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি কখনই উড়া প্রকৃতির অধীনে থাকেন না। আর তা কিভাবে সম্ভব? সপ্তম অধ্যায়ে তার এ্যাখ্যা করা হয়েছে-যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তিনি অবিলম্বে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে যোগ্যতা। মানুষ যখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে মুক্তি লাভ করার প্রাথমিক সূত্র। যেহেতু জীবসত্তা ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ৩ওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিন্ময় প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে। চিন্ময় প্রকৃতির পথ-নির্দেশকেই বলা হয় দৈবী প্রকৃতি। সুতরাং, এভাবেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে কেউ যখন উন্নত হন, তখন তিনি মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন কিছুর দিকেই মহাত্মা তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেন •না. কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষ, তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই চিত্তবৃত্তির উন্মেষ হয় অন্য মহাত্মাদের বা শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার ফলে। শুদ্ধ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য রূপের প্রতি, এমন কি চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর প্রতিও আকৃষ্ট হন না। তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপেই অনুরক্ত থাকেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন না, এমন কি অন্য কোন দেবতা বা মানুষের প্রতিও তাঁদের কোনও রকম আসক্তি থাকে না। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁরা একটানা কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় নিত্য তন্ময় হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৪

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

সততম্-নিরন্তর; কীর্তয়ন্তঃ-কীর্তন করে; মাম্-আমাকে; যতন্তঃ-যত্নশীল কয়ে; চ-ওঃ দৃঢ়ব্রতাঃ-দৃঢ়ব্রত; নমস্যন্তঃ-নমস্কার করে; চ-ও; মাম্-আমাকে; ভক্ত্যা-ভক্তি সহকারে; নিত্যযুক্ত্যাঃ-নিরন্তর যুক্ত হয়ে; উপাসতে- উপাসনা করে।

গীতার গান

লক্ষণ সে মহাত্মার হয় বিলক্ষণ।
মহিমা আমার করে সতত কীর্তন ॥
আমার মহিমা জন্য সর্ব কর্মে রত।
সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ব্রত ॥
ভক্তির যাজন আর প্রণাম বিজ্ঞপ্তি।

নিত্যসেবা উপাসনা আমাকেই প্রাপ্তি ॥

অনুবাদ

দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে।

তাৎপর্য

কোন সাধারণ মানুষকে একটি ছাপ মেরে মহাত্মা বানানো যায় না। মহাত্মার স্বরূপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁর আর অন্য কোন কাজই থাকে না। তিনি নিরন্তর পরমেশ্বরের মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহাত্মা কখনই নির্বিশেষবাদী হন না। মহিমা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে, ভগবানের ধাম, ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ ও ভগবানের অদ্ভুত চরিত্রের লীলাসমূহ কীর্তন করা। এই সমস্ত বিষয় সর্বদাই কীর্তনীয়; তাই যথার্থ মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকেন।
ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি যে আসক্ত, তাকে ভগবদ্গীতায় মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই ধরনের মানুষকে পরবর্তী শ্লোকে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাত্মা সর্বদাই ভগবদ্ভক্তির নানা রকম কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের শ্রবণ ও কীর্তন করেন এবং কখনই দেব-দেবী বা কোন মানুষের মহিমা কীর্তন করেন না। সেটিই হচ্ছে ভক্তি-শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ এবং স্মরণম্ অর্থাৎ তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা। এই প্রকার মহাত্মা পাঁচটি দিবা রসের যে কোন একটির দ্বারা ভগবানের সঙ্গে অন্তিমকালে নিত্যযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত থাকেন। সেটিকে বলা হয় পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত।
ভক্তিযোগের কতগুলি ক্রিয়া অবশ্য পালনীয়, যেমন একাদশী, জন্মাষ্টমী আদি পূণ্যতিথিতে উপবাস করা। এই সমস্ত বিধি-বিধান মহান আচার্যদের দ্বারা তাঁদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, যাঁরা চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার প্রকৃত প্রয়াসী। মহাত্মারা এই সমস্ত বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করেন। তাই, তাঁরা অবধারিতভাবে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।
এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই ভক্তিযোগ কেবল সহজসাধ্যই নয়, তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করা যায়। এর জন্য কোন কঠোর তপস্যা বা কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন হয় না। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে গৃহস্থ, সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারীরূপে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোনও অবস্থায় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হওয়া যায়।

শ্লোক ১৫

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন-জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা; চ-ও; অপি-অবশ্যই; অন্যে-অন্যেরা; যজন্তঃ- যজন করে; মাম্-আমাকে; উপাসতে-উপাসনা করেন, একত্বেন-অভেদ চিন্তার দ্বারা, পৃথক্ত্বেন-পৃথক চিন্তার দ্বারা; বহুধা-বহু প্রকারে; বিশ্বতোমুখম্-বিশ্বরূপের।

গীতার গান

যারা শুদ্ধ ভক্ত নহে কিন্তু মোরে ভজে।
জ্ঞান যজ্ঞ করি তারা তিনভাবে মজে ॥
অহংগ্রহ উপাসনা একত্ব সে নাম।
পৃথকত্বে উপাসনা প্রতীকোপাসন ॥
বিশ্বরূপ উপাসনা অনির্দিষ্ট রূপ।
নিরাকার ভাব কিংবা ভাবে বহুরূপ ॥

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা অভেদ চিন্তাপূর্বক, কেউ কেউ বহুরূপে প্রকাশিত ভেদ চিন্তাপূর্বক এবং অন্য কেউ আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহের সারমর্ম ব্যক্ত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত যে অনন্য ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা। কিন্তু এমনও কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা যথার্থ মহাত্মা না হলেও বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। সেই রকম কিছু ভক্তের মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের থেকে আরও নিম্নস্তরের উপাসক আছে এবং এরা তিন ভাগে বিভক্ত (১) অহংগ্রহ উপাসক-যে নিজেকে ভগবানের অভেদ মনে করে নিজের উপাসনা করে, (২) প্রতীকোপাসক-যে কল্পনাপ্রসূত কোন একরূপে ভগবানের উপাসনা করে এবং (৩) বিশ্বরূপোপাসক-যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপকে স্বীকার করে তাঁর উপাসনা করে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যারা নিজেদেরকে ভগবান বলে মনে করে নিজেদের উপাসনা করে, তাদের বলা হয় অদ্বৈতবাদী। এরাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের ভগবৎ উপাসক এবং এদেরই প্রাধান্য বেশি। এই প্রকার লোকেরা নিজেদের পরমেশ্বর বলে মনে করে নিজেদেরই উপাসনা করে। এটিও এক রকমের ঈশ্বর উপাসনা, কারণ এর মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, তাদের জড় দেহটি তাদের স্বরূপ নয়, তাদের স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে এই বিবেকের উন্মেষ হয়। সাধারণত নির্বিশেষবাদীরা এভাবেই ভগবানের উপাসনা করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা হচ্ছে দেবোপাসক। তারা তাদের কল্পনাপ্রসূত যে কোন একটি রূপকে ভগবানের রূপ বলে মনে করে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে যারা রয়েছে, তারা এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি বিশ্বরূপের অতীত আর কোনও কিছুকে চিন্তা করতে পারে না। তাই, তারা ভগবানের বিশ্বরূপকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করে সেটির আরাধনায় তৎপর হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটি ভগবানেরই একটি রূপ।

শ্লোক ১৬

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অহম-আমি; ক্রতুঃ-অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ; অহম্-আমি; যজ্ঞঃ-স্মার্ত যজ্ঞ, স্বধা-শ্রাদ্ধ আদি কর্ম; অহম্-আমি; অহম্-আমি; ঔষধম্-রোগ নিবারক ভেষজ, মন্ত্রঃ-মন্ত্র; অহম্-আমি; অহম্-আমি; এব-অবশ্যই; আজ্যম্ ঘৃত; অহম-আমি; অগ্নিঃ-অগ্নি; অহম্-আমি;

হুতম্-হোমক্রিয়া।

গীতার গান

আমিই সে স্মার্তযজ্ঞে শ্রৌত বৈশ্যদেব।
আমিই সে স্বধা মন্ত্র ঔষধ বিভেদ ॥
আমিই সে অগ্নি হোম ঘৃতাদি সামগ্রী।
আমি পিতা আমি মাতা অথবা বিধাতৃ ॥

অনুবাদ

আমি অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি বৈশ্বদেব আদি স্মার্ত যজ্ঞ, আমি 'পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম, আমি রোগ নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া।

তাৎপর্য

'জ্যোতিষ্টোম' নামক যজ্ঞ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে তিনি 'মহাযজ্ঞ'। পিতৃলোককে অর্পণ করা হয় যে স্বধা বা ঘৃতরূপী ঔষধ, তাও শ্রীকৃষ্ণেরই একটি এপ। এই ক্রিয়াতে উচ্চারিত মন্ত্রও হচ্ছে কৃষ্ণ। যজ্ঞে যে সমস্ত দুগ্ধজাত পদার্থ আতি দেওয়া হয়, তাও শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নিকেও শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে, কারণ পঞ্চমহাভূতের একটি তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাও শ্রীকৃষ্ণেরই ভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ, বৈদিক কর্মকাণ্ডে প্রতিপাদিত বিবিধ যজ্ঞের সমষ্টিও হচ্ছে কৃষ্ণ। প্রকারান্তরে এটি জানা উচিত যে, যে মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাবান, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন।

শ্লোক ১৭

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ৷ ১৭ ॥

পিতা-পিতা; অহম্-আমি; অস্য-এই; জগতঃ-জগতের; মাতা-মাতা; ধাতা-বিধাতা; পিতামহঃ-পিতামহ; বেদ্যম্-জ্ঞেয় বস্তু; পবিত্রম্ শোধনকারী; ওঙ্কারঃ-ওস্কার; ঋক্ ঋগ্বেদ; সাম-সামবেদ; যজুঃ যজুর্বেদ; এব-অবশ্যই; চ-এবং।

গীতার গান

আমি পিতামহ বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার।
আমি ঋক্ আমি সাম যজু কিংবা আর ॥

অনুবাদ

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমি জ্ঞেয় বস্তু, শোধনকারী ও ওঙ্কার। আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিবিধ ক্রিয়ার ফলেই চরাচরের সমস্ত সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়। সংসারে আমরা বিভিন্ন জীবের সঙ্গে নানা রকম আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করি; এই সমস্ত জীব বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির অধীনে, তাদের কেউ কেউ আমাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, সৃষ্টিকর্তা আদিরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ ব্যতীত আর কিছুই নন। এভাবেই আমাদের মাতা, পিতারূপে প্রতিভাত হয় যে সমস্ত জীবসত্তা, তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নন। এই

শ্লোকে ধাতা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সৃষ্টিকর্তা'। আমাদের পিতা-মাতা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ তাই নন, পরন্তু সৃষ্টিকর্তা, পিতামহী ও পিতামহ প্রমুখ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে বস্তুতপক্ষে প্রতিটি জীবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তাই, সম্পূর্ণ বেদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। বেদের মাধ্যমে আমরা যা কিছু জানতে চাই, তা ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের দিকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে। যে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের অন্তরকে কলুষমুক্ত করতে সাহায্য করে, তা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান জানবার প্রয়াসী, সেও শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে ওঁ শব্দটিকে বলা হয় 'প্রণব' এবং সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ, তাই সেটিও শ্রীকৃষ্ণ। আর যেহেতু ঋক্, সাম, যজুঃ ও অর্থর্ব-এই চার বেদের সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে 'প্রণব' বা ওঙ্কার হচ্ছে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাই বুঝতে হবে সেটিও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৮

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

গতিঃ-গতি; ভর্তা-পতি; প্রভুঃ-নিয়ন্তা; সাক্ষী-সাক্ষী; নিবাসঃ-নিবাস; শরণম্-রক্ষাকর্তা; সুহৃৎ-সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু; প্রভবঃ-সৃষ্টি; প্রলয়ঃ-প্রলয়; স্থানম্-স্থিতি; নিধানম্-আশ্রয়; বীজম্-বীজ; অব্যয়ম্-অবিনাশী।

গীতার গান

আমি গতি আমি ভর্তা মোরে সাক্ষী কর।
আমি সে শরণ্যধাম প্রভব প্রলয় ॥

অনুবাদ

আমি সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। আমিই উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আশ্রয় ও অব্যয় বীজ।

তাৎপর্য

গতি শব্দে এখানে গন্তব্যস্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে আমরা যেতে চাই। কিন্তু সকলেরই পরম গতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যদিও সাধারণ মানুষ এই কথা জানে না। যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্ট। তাদের তথাকথিত উন্নতির পথে প্রগতি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক। অনেক মানুষ আছে, যারা বিভিন্ন দেব-দেবীকে তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের পূজা করার ফলে তারা চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ইন্দ্রলোক, মহর্লোক আদি উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রচিত এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি যুগপৎভাবে কৃষ্ণ আবার কৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির প্রকাশ হওয়ায়, এই সমস্ত গ্রহলোকও শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধির পথে এক পদক্ষেপ অগ্রসর হতে সাহায্য করে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তির সমীপবর্তী হওয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরোক্ষভাবে অগ্রসর হওয়ার মতো। তাই, সময় ও সামর্থ্যের ব্যর্থ অপব্যয় না করে প্রত্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হওয়া বিধেয়, তার ফলে সময় ও শক্তি বাঁচানো যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন বাড়িতে উঠবার জন্য লিফ্ট থাকে, তা হলে অনর্থক সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠবে

কেন? সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে আশ্রয় করে আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, কারণ সব কিছু তাঁরই অধীন এবং তাঁরই শক্তিকে আশ্রয় করে সব কিছু বিদ্যমান। সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সাক্ষী। আমাদের নিবাস, দেশ, গ্রহলোক আদি যেখানে আমরা বসবাস করি তাও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আশ্রয় ও গতি। তাই আমাদের সুরক্ষার জন্য অথবা দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত। যখনই আমরা সুরক্ষার প্রয়োজন বোধ করব, আমাদের জানতে হবে যে, কোনও জীবশক্তিকেই আশ্রয় বলে মানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম জীবসত্তা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সৃষ্টির উৎস অথবা পরম পিতা, তাই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেউ সুহৃদ হতে পারে না, অন্য কেউ হিতৈষী হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ এবং প্রলয়ান্তে পরম আশ্রয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৯

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

তপামি-তাপ প্রদান করি; অহম্-আমি; অহম্-আমি; বর্ষম্-বৃষ্টি; নিগৃহ্নামি-আকর্ষণ করি; উৎসৃজামি-বর্ষণ করি; চ-এবং; অমৃতম্-অমৃত; চ-এবং; এব-অবশ্যই; মৃত্যুঃ-মৃত্যু; চ-এবং; সৎ-চেতন; অসৎ-জড় বস্তু; চ-এবং; অহম্-আমি; অর্জুন-হে অর্জুন।

গীতার গান

আমি সে উৎপত্তি স্থিতি বীজ অব্যয়।
আমি বৃষ্টি আমি মেঘ আমি মৃত্যুময় ॥
আমি সে অমৃততত্ত্ব শুন হে অর্জুন।
সদসদ্ যাহা কিছু আমি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমি তাপ প্রদান করি এবং আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও আকর্ষণ করি। আমি অমৃত এবং আমি মৃত্যু। জড় ও চেতন বস্তু উভয়ই আমার মধ্যে।

তাৎপর্য

শাকৃষ্ণ তাঁর বিবিধ শক্তি বিদ্যুৎ ও সূর্যের মাধ্যমে তাপ ও আলোক বিকিরণ করেন। গ্রীষ্ম ঋতুতে তিনি বৃষ্টিকে আকাশ থেকে পড়তে দেন না, আবার বর্ষা ঋতুতে তিনি অবিরাম প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যে শক্তি আমাদের আয়ুকে পরিবর্ধিত করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। জীবনের অন্তেও শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিভিন্ন শক্তির বিশ্লেষণ বন্যার ফলে আমরা প্রতিপন্ন করতে পারি যে, তাঁর দৃষ্টিতে জড় ও চেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, অথবা পক্ষান্তরে, জড় ও চেতন উভয়ই তাঁর প্রকাশ। তাই, কৃষ্ণভাবনার অতি উন্নত স্তরে এই রকম পার্থক্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত যিনি উত্তম অধিকারী, তিনি সর্বত্র সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পান।

যেহেতু জড় ও চেতন উভয় শ্রীকৃষ্ণ, তাই সমস্ত জড় উপাদানে সংঘটিত বিশাল বিশ্বরূপও হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপে তাঁর যে বৃন্দাবনলীলা, সেটি তাঁর পরম মাধুর্যময়

ভগবৎ-লীলা।

শ্লোক ২০

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

এেবিদ্যাঃ-ত্রিবেদজ্ঞগণ; মাম্-আমাকে; সোমপাঃ-সোমরস পানকারী; পূত-পবিত্র; পাপাঃ-পাপ; যজ্ঞৈঃ-যজ্ঞের দ্বারা; ইষ্টা-পূজা করে; স্বর্গতিম্-স্বর্গে গমন; প্রার্থয়ন্তে-প্রার্থনা করেন; তে-তাঁরা; পুণ্যম্পুণ্য; আসাদ্য-লাভ করে। সুরেন্দ্র-ইন্দ্র; লোকম্-লোক; অশ্বন্তি-ভোগ করেন; দিব্যান্-দিব্য, দিবি-সর্থে; দেবভোগান্-দেবতাদের ভোগসমূহ।

গীতার গান

কর্মকাণ্ড বেদ এয়, সাধনে যে পূর্ণ হয়,
সোমরস পানে পাপ ক্ষয় ॥
যজ্ঞ মোর উপাসনা, যেবা করে সে সাধনা,
স্বর্গসুখ প্রার্থনা সে করে ॥
পুণ্যের ফলেতে সেই, সুরেন্দ্র লোকেতে যায়,
দিব্যসুখ ভোগ সেথা করে।

অনুবাদ

ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গে গমন প্রার্থনা করেন। তাঁরা পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে দেবভোগ্য দিব্য স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ত্রৈবিদ্যাঃ বলতে সাম, যজুঃ ও ঋক্ নামক তিনটি বেদকে বুঝায়। যে ব্রাহ্মণ এই তিনটি বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে বলা হয় ত্রিবেদী। যাঁরা এই তিনটি বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা মনুষ্য-সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেদের অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন ত্রিবেদীদের পরম লক্ষ্য। যথার্থ ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হন এবং তাঁর প্রীতি উৎপাদনের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে নিয়োজিত থাকেন। এই ভক্তিযোগ শুরু হয় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও সেই সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব জানবার প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষ কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করে, তারা ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা এই ধরনের দেবোপাসকেরা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণের দোষ থেকে শুদ্ধ হয়ে স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক আদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত স্বর্গলোকে একবার অধিষ্ঠিত হলে এই জগতের থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন কলা সম্ভব হয়।

শ্লোক ২১

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

তে-তাঁরা; তম্-সেই; ভুক্ত্বা-ভোগ করে; স্বর্গলোকম্-স্বর্গলোক; বিশালম্-বিশাল; ক্ষীণে-ক্ষীণ হলে; পুণ্যে-পুণ্যফল; মর্ত্যলোকম্-মর্ত্যলোকে; বিশন্তি-অধঃপতিত হন; এবম্ এভাবে; ত্রয়ী-তিন বেদের; ধর্মম্ ধর্ম; অনুপ্রপন্না-অনুষ্ঠান-পরায়ণ, গতাগতম্-জন্ম ও মৃত্যু; কামকামাঃ-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী; লভন্তে-লাভ করেন।

গীতার গান

বিশাল সে স্বর্গসুখ, ভুলে যায় জড় দুঃখ,
ক্রমে ক্রমে তার পুণ্য হরে ।
ত্রয়ী ধর্ম কর্মকাণ্ড, পয়োমুখ বিষভাণ্ড,
অমৃত ভাবিয়া যেবা খায়।
গতাগতি কামলাভ, জন্মে জন্মে মহাতাপ,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ।

অনুবাদ

তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এভাবেই ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকে উন্নীত হবার ফলে জীব তথাকথিত দীর্ঘ জীবন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু তারা চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। পুণ্য-কর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। বেদান্ত-সূত্রে নির্দেশিত পূর্ণজ্ঞান (জন্মাদ্যস্য যতঃ) যে প্রাপ্ত হয়নি, অথবা যে সর্ব কারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারেনি, সে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে কখনও স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হয় এবং তার পরে আবার এই মর্ত্যলোকে নেমে আসে, যেন সে নাগরদোলায় বসে কখনও উপরের দিকে কখনও নীচের দিকে পাক খেতে থাকে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, যেখানে একবার ফিরে গেলে আর নীচে নেমে আসতে হয় না, সেই চিন্ময় জগতে উন্নীত না হয়ে, সে কেবলমাত্র উচ্চ ও নিম্নলোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন করতে থাকে। তাই, মানুষের উচিত চিন্ময় জগৎ প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা, যার ফলে সচ্চিদানন্দময় নিত্য জীবন লাভ করা যায় এবং আর কখনও এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ২২

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অনন্যাঃ-অনন্য; চিন্তয়ন্তঃ-চিন্তা করতে করতে; মাম্-আমাকে; যে-যে; জনাঃ-ব্যক্তিগণ; পর্যুপাসতে যথাযথভাবে আরাধনা করেন; তেষাম্-তাঁদের; নিত্য-সর্বদা; অভিযুক্তানাম্-ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; যোগক্ষেমম্-অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ; বহামি-বহন করি; অহম্-আমি।

গীতার গান

কিন্তু যে অনন্যভাবে মোরে চিন্তা করে।
একান্ত হইয়া শুধু আমাকে যে স্মরে ॥
সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয়।
যে সুখ চাহয়ে সেই হয় মোর দেয় ।
আমি তার যোগক্ষেম বহি লই যাই।
আমা বিনা অন্য তার কোন চিন্তা নাই ॥

অনুবাদ

অনন্যচিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যাঁরা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনা ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, তিনি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের দ্বারা নবধা ভক্তিপরায়ণ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ছাড়া অন্য কিছু করেন না। ভক্তির এই সমস্ত ক্রিয়া পরম মঙ্গলময় এবং পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন, যার ফলে ভক্ত আত্ম-উপলব্ধিতে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তখন তাঁর একমাত্র অভিলাষ হয় ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। এই প্রকার ভক্ত অনায়াসে নিঃসন্দেহে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। একে বলা হয় যোগ। ভগবানের কৃপার ফলে এই ধরনের ভক্তদের আর কখনও এই জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না। ক্ষেম কথাটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের কৃপাময় সংরক্ষণ। যোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করতে ভগবান ভক্তকে সহায়তা করেন এবং তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে ভগবান তাঁকে দুঃখময় বদ্ধ জীবনে পতিত হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ২৩

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

যে-যারা; অপি-ও; অন্য-অন্য; দেবতা-দেবতা; ভক্তাঃ- ভক্তেরা; যজন্তে-পূজা করে; শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ-শ্রদ্ধা সহকারে; তে-তারা; অপি-ও; মাম্ এব-আমাকেই; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; যজন্তি-পূজা করে; অবিধিপূর্বকম্-অবিধিপূর্বক।

গীতার গান

ইতর দেবতা যেবা পূজে শ্রদ্ধা করি।
সেও আমাকে পূজে বিধি ধর্ম ছাড়ি ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে,

প্রকৃতপক্ষে তারা অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা দেবতাদের উপাসনা করে, তারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, যদিও এই ধরনের উপাসনা পরোক্ষভাবে আমারই উপাসনা।" উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি তার ডালপালায় জল দিতে থাকে, তবে সেটি সে করে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে অথবা সাধারণ নিয়মনীতি পালন না করার ফলে। তেমনই, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সেবা করার উপায় হচ্ছে উদরে খাদ্য প্রদান করা। সুতরাং বলা যেতে পারে, দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সার্বভৌম প্রশাসনের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদাধিকারী শাসক ও সঞ্চালক। প্রজার কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন পালন করা, কর্মচারীর অথবা সঞ্চালকদের কল্পিত বিধান পালন করা কখনই তার কর্তব্য নয়। তেমনই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাঁর কর্মচারী-স্বরূপ বিভিন্ন দেবতারাও আপনা থেকেই তুষ্ট হন। শাসক ও সঞ্চালকেরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত থাকেন এবং তাঁদের উৎকোচ দেওয়া অবৈধ। সেটিই এখানে অবিধিপূর্বকম্ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ অনাবশ্যক দেবোপাসনা কখনই অনুমোদন করেন না।

শ্লোক ২৪

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অহম্-আমি; হি-নিশ্চয়ই; সর্ব-সমস্ত; যজ্ঞানাম্-যজ্ঞের; ভোক্তা-ভোক্তা; চ-এবং; প্রভুঃ-প্রভু; এব-ও; চ-এবং; ন-না; তু-কিন্তু; মাম্-আমাকে; অভিজানন্তি-জানে; তত্ত্বেন-স্বরূপত; অতঃ-অতএব; চ্যবন্তি-অধঃপতিত হয়; তে-তারা।

গীতার গান

সর্ব যজ্ঞেশ্বর আমি প্রভু আর ভোক্তা।
সে কথা বুঝে না যারা নহে তত্ত্ববেত্তা ॥
অতএব তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচ্যুত।
প্রতীকোপাসনা সেই তাত্ত্বিক বিস্মৃত ।।

অনুবাদ

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বেদে নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। যজ্ঞ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ্ণু। ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক মানব-সভ্যতার পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলেছেন, "সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা হচ্ছি আমি, কারণ আমি হচ্ছি পরম প্রভু।" তবু অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে সাময়িক

লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। তাই, তারা সংসার সমুদ্রে পতিত হয় এবং জীবনের যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যদি কারও জাগতিক বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষ থাকে, তার বরং ভগবানের কাছে তা প্রার্থনা করা অধিক শ্রেয়স্কর (যদিও তা শুদ্ধ ভক্তি নয়) এবং এভাবেই সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করবে।

শ্লোক ২৫

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

যান্তি-প্রাপ্ত হন; দেবব্রতাঃ-দেবতাদের উপাসক; দেবান্-দেবতাদের; পিতৃন্-পূর্ব-পুরুষদের; যান্তি-লাভ করেন; পিতৃব্রতাঃ-পিতৃপুরুষদের উপাসকগণ; ভূতানি-ভূত-প্রেতদের; যান্তি লাভ করেন; ভূতেজ্যাঃ-ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ; যান্তি-লাভ করেন; মৎ-আমার; যাজিনঃ-ভক্তগণ; অপি-কিন্তু; মাম্-আমাকে।

গীতার গান

ইতর দেবতা যাজী যায় দেবলোকে।
পিতৃলোক উপাসক যায় পিতৃলোকে ।।
ভূতপ্রেত উপাসক ভূতলোকে যায়।
আমাকে ভজন করে আমাকেই পায় ॥
আমার পূজন হয় সকলে সম্ভব।
দরিদ্র হলেও নহে অপেক্ষা বৈভব ॥

অনুবাদ

দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

যদি কোন মানুষ চন্দ্র, সূর্য আদি গ্রহলোকে যেতে চায়, তা হলে তার লক্ষ্য অনুসারে বিশেষ বৈদিক বিধান পালন করার ফলে সেখানে সে যেতে পারে। এই সমস্ত বিধান বেদের 'দর্শ-পৌর্ণমাসী' নামক কর্মকাণ্ডীয় বিভাগে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে স্বর্গলোকের অধিপতি দেবতাদের উপাসনা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেই রকম বিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনই, আবার প্রেতলোকে গিয়ে যক্ষ, রক্ষ অথবা পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিশাচ উপাসনাকে জাদুবিদ্যা বা তিমির ইন্দ্রজাল বলা হয়। অনেক মানুষ আছে, যারা এই জাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান করে এবং তারা মনে করে যে, এটি পারমার্থিক অনুষ্ঠান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সম্পূর্ণ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের উপাসক শুদ্ধ ভক্ত নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের মাধ্যমে এটি অত্যন্ত সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, যদি দেব-উপাসনা করার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, পিতাদের পূজা করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পিশাচ উপাসনা করার ফলে প্রেতলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা হলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কেন কৃষ্ণলোক বা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হবেন না? দুর্ভাগ্যবশত, অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণ এবং

শ্রীবিষ্ণুর এই অলৌকিক ধাম সম্বন্ধে অবগত নয় এবং ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হবার ফলে তারা বারবার সংসারে পতিত হয়। এমন কি নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি থেকেও অধঃপতিত হয়। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত মানব-সমাজে এই পরম কল্যাণকারী জ্ঞান মুক্ত হস্তে বিতরণ করছে যে, কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মানুষ এই জীবন সার্থক করে তার যথার্থ আবাস ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৬

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

পত্রম্-পত্র; পুষ্পম্-ফুল; ফলম্-ফল; তোয়ম্ জল; যঃ-যিনি; মে-আমাকে; ভক্ত্যা-ভক্তি সহকারে; প্রযচ্ছতি-প্রদান করেন; তৎ-তা; অহম্-আমি; ভক্ত্যুপহৃতম্-ভক্তি সহকারে নিবেদিত; অশ্নামি গ্রহণ করি; প্রযতাত্মনঃ -আমার ভক্তি প্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত সেই ব্যক্তির।

গীতার গান

পত্র পুষ্প ফল জল ভক্ত মোরে দেয়।
ভক্তির কারণ সেই গ্রহণীয় হয় ॥
যত্ন করি মোর ভক্ত যাহা কিছু দেয়।
সন্তুষ্ট হইয়া লই ভক্তির প্রভায় ॥
নিরপেক্ষ ভক্ত তুমি এ মোর নিশ্চয়।
তোমার যে কার্যক্রম সব ভক্তি হয় ॥

অনুবাদ

যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হয়ে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া আবশ্যক। তার ফলে শাশ্বত সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দময় ভগবৎ-ধাম লাভ করা যায়। এই প্রকার বিস্ময়কর ফল লাভ করার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ এবং এমন কি অত্যন্ত দরিদ্রতম ব্যক্তিও কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই এর অনুশীলন করতে পারে। এটি লাভ করার পক্ষে একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। কার কি পদমর্যাদা অথবা তার স্থিতি কি, তাতে কিছু আসে যায় না। পন্থাটি এতই সহজ যে, অকৃত্রিম প্রেমভক্তি সহকারে এমন কি একটি পত্র অথবা একটু জল অথবা ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করা যেতে পারে এবং ভগবান তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবেন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে কেউই বাদ পড়তে পারে না, কারণ এটি অতি সহজসাধ্য ও সর্বজনীন। অত্যন্ত এই সরল পন্থার দ্বারা সচ্চিদানন্দময় জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে এমন কোন মূঢ় আছে যে, সে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে চায় না? কৃষ্ণ কেবল প্রেমভক্তি চান, অন্য কিছু নয়। কৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্ত থেকে এমন কি একটি পত্রও গ্রহণ করেন। তিনি অভক্তের কাছ থেকে কোন রকমের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর কারও কাছ থেকে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু তবুও প্রীতি ও ভালবাসার বিনিময়ে তিনি তাঁর ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভাবনায় বিকাশ সাধন

করাই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার একমাত্র উপায় যে ভক্তি, সেই কথাটিকে জোর দিয়ে ঘোষণা করবার জন্য ভক্তি শব্দটি এই শ্লোকে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন উপায়ে, যেমন কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, শিক্ষিত পণ্ডিত হয়, ধন-বিত্তশালী হয় অথবা বড় দার্শনিক হয়, তবুও তারা কৃষ্ণকে কোন কিছু নৈবেদ্য গ্রহণ করাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ভক্তির মৌলিক বিধান ব্যতীত কারও কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করাতে ভগবানকে কেউই অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ভক্তি হচ্ছে অহৈতুকী। পন্থাটি হচ্ছে শাশ্বত। এটি পরম-তত্ত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ সেবা সম্পাদন।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, আদিপুরুষ ও সমস্ত যজ্ঞের পরম লক্ষ্য। এই শ্লোকে তিনি বলেছেন, কি ধরনের যজ্ঞ তাঁর প্রীতি উৎপাদন করে। যদি কেউ হৃদয়কে নির্মল করার জন্য এবং জীবনের পরম প্রয়োজন-প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা প্রাপ্ত হবার জন্য ভক্তিযোগে নিয়োজিত হবার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে জানতে হবে ভগবান তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি তাঁকে কেবল সেই জিনিসগুলিই অর্পণ করেন, যা তাঁর প্রিয়। তিনি কখনও অবাঞ্ছিত অথবা প্রতিকূল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন না। তাই মাছ, মাংস, ডিম আদি কখনই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য নয়। যদি শ্রীকৃষ্ণ চাইতেন যে, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাঁকে অর্পণ করা হোক, তা হলে তিনি সেই কথা বলতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে, পাতা, ফল, ফুল ও জল আদি দ্রব্যই যেন কেবল তাঁকে অর্পণ করা হয়। এই প্রকার ভোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, "আমি সেগুলি গ্রহণ করব।" তাই, আমাদের বুঝা উচিত যে, তিনি মাছ, মাংস, ডিম আদি কখনই গ্রহণ করেন না। শাক-সবজি, অন্ন, ফল, দুধ ও জল মানুষের উপযুক্ত আহার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সেই বিধান দিয়ে গেছেন। এই সমস্ত সাত্ত্বিক সামগ্রী ব্যতীত আমরা যদি অন্য কিছু আহার করি, তবে তা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তিনি কখনই তা গ্রহণ করেন না। অতএব, যদি আমরা মাছ, মাংস আদি নিষিদ্ধ পদার্থ ভগবানকে অর্পণ করি, তা হলে তা প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করা হবে।
তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই হচ্ছে শুদ্ধ, তাই যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক উন্নতি এবং মায়া বন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষী, তাদের পক্ষে এই অন্নই হচ্ছে আহার্য। ভগবানকে উৎসর্গ না করে যারা খাদ্য আহার করে, ভগবান সেই একই শ্লোকে বলেছেন যে, তারা তাদের পাপ ভক্ষণ করে। পক্ষান্তরে, তাদের প্রতিটি গ্রাস তাদেরকে মায়াজালের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু কেউ যদি শাক-সবজির ব্যঞ্জন বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি অথবা অর্চা-বিগ্রহকে তা নিবেদন করে বন্দনাপূর্বক সেই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করার প্রার্থনা করে, তবে তার জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়, দেহ শুদ্ধ হয় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি সূক্ষ্ম হয়, যার ফলে পবিত্র নির্মল চিন্তা করা সম্ভব হয়। তবে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত ভোগ যেন প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির সব কিছুর একমাত্র অধিকারী, তাই আমাদের উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতা তাঁর নেই, কিন্তু তবুও আমরা যখন তাঁর প্রীতি উৎপাদন করবার জন্য তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ করি, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। আর ভোগ তৈরি করা এবং নিবেদন করার গুরুত্বপূর্ণ বিচার হচ্ছে, তা করা উচিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে।
নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা যারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়বিহীন, ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের কাছে এটি কেবল রূপক অলঙ্কার মাত্র, অথবা তারা এটিকে গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ যে একজন সাধারণ মানুষ, তার প্রমাণ বলে মনে করে। কিন্তু যথার্থ সত্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য

ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে সক্ষম। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয় পরমতত্ত্ব বলার অর্থ। তিনি যদি ইন্দ্রিয়বিহীন হতেন, তা হলে তাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বলা হত না। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীবদের প্রেরণ করেন। তেমনই ভোগ অর্পণ করে ভক্ত যখন প্রেমময়ী প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে তা নিবেদন করেন, ভগবান তখন তা শুনতে পান এবং তিনি তখন তা গ্রহণ করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর শ্রবণ করা, ভোজন করা এবং স্বাদ আস্বাদন করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভক্তই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি ভগবানের বর্ণনার কদর্থ করেন না, তাই তিনি জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ভোগ আহার করেন এবং তার ফলে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৭

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

যৎ-যা; করোষি-তুমি কর; যৎ-যা, অশ্নাসি-তুমি খাও; যৎ-যা; জুহোষি-হোম কর; দদাসি-দান কর; যৎ-যা; যৎ-যা; তপস্যসি-তপস্যা কর; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; তৎ-তা; কুরুষ-কর; মৎ-আমাকে; অর্পণম্-সমর্পণ।

গীতার গান

অতএব কর যাহা ভোগ যজ্ঞ তপ।
অর্পণ করহ তুমি আমাকে সে সব ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে কোন অবস্থাতেই সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। দেহ ও আত্মাকে একই সঙ্গে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সকলকেই কর্ম করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত কর্ম যেন কেবল তাঁর জন্যই করা হয়। জীবন ধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়; অতএব সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে হয়; অতএব শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, "এই সব কিছুই আমার জন্য কর," এবং একে বলা হয় অর্চন। সকলেরই কিছু না কিছু দান করার প্রবৃত্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, "আমাকে দান কর।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সমস্ত সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আজকাল ধ্যানযোগ পদ্ধতির প্রতি মানুষের অভিরুচি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই যুগের পক্ষে তা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু যে মানুষ জপমালায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকার অভ্যাস করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে পরম যোগী। সেই কথা ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

শ্লোক ২৮

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শুভ-মঙ্গলজনক; অশুভ-অমঙ্গলজনক; ফলৈঃ-ফলবিশিষ্ট; এবম্-এ ভাবে; মোক্ষ্যসে-মুক্ত হবে; কর্ম-কর্ম; বন্ধনৈঃ বন্ধন হতে; সন্ন্যাস-সন্ন্যাস; যোগ-যোগ: যুক্তাত্মা-যুক্তচিত্ত; বিমুক্তঃ-মুক্ত; মাম্-আমাকে; উপৈষ্যসি-প্রাপ্ত হবে।

গীতার গান

শুভাশুভ ফল যাহা হয় তাহা দ্বারা।
তাহার বন্ধন হতে মুক্ত তুমি সারা ॥`
সেই সে সন্ন্যাসযোগ করিতে ঘুয়ায়।
যাহার ফলেতে লোক মোরে প্রাপ্ত হয় ।

অনুবাদ

এভাবেই আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা শুভ ও অশুভ ফলবিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এভাবেই সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি মুক্ত হবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

যিনি গুরুদেবের নির্দেশে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁকে যুক্ত বলা হয়। একে পরিভাষায় বলা হয় 'যুক্তবৈরাগ্য'। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই অবস্থাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথাহমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ২/২৫৫)

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ আমরা এই সংসারে আছি, ততক্ষণ আমাদের কর্ম করতেই হবে; আমরা কখনই কাজ না করে থাকতে পারি না। তাই, আমরা যদি কর্ম করে তার ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করি, তখন তাকে বলা হয় 'যুক্তবৈরাগ্য'। এই সন্ন্যাস যোগযুক্ত ক্রিয়া চিত্তরূপী দর্পণকে পরিমার্জিত করে এবং তার ফলে অনুশীলনকারী ক্রমশ পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নতি সাধন করেন এবং তখন তিনি পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হন। সুতরাং অবশেষে তিনি বিশিষ্ট মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তির ফলে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যান না, পক্ষান্তরে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন। ভগবান এখানে স্পষ্টই বলেছেন, মামুপৈষ্যসি- "সে আমার কাছে চলে আসে," অর্থাৎ সে তার যথার্থ আবাস ভগবৎ-ধামে ফিরে যায়। মুক্তি পাঁচ প্রকারের হয় এবং এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, সারা জীবন ভগবৎ-আজ্ঞা পালনকারী ভক্ত এমন পর্যায়ে উন্নীত হন, যেখান থেকে তিনি দেহত্যাগ করার পরে ভগবৎ-ধামে প্রবিষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন।

অনন্য ভক্তি সহকারে যিনি ভগবানের সেবায় নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। এই ধরনের মানুষ নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করেন এবং সর্বদাই ভগবৎ-সংকল্পে আশ্রিত থাকেন। তাই, তিনি যে কাজই করেন, তা কেবল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেন। তাই, তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ ভগবৎ সেবাময় হয়ে ওঠে। তিনি বেদ বিহিত সকাম কর্ম এবং স্বধর্মের প্রতি কোন গুরুত্ব দেন

না। সাধারণ মানুষের জন্যই কেবল বৈদিক স্বধর্মের আচরণ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত শুদ্ধ ভক্ত কখনও কখনও বৈদিক বিধানের বিপরীত আচরণ করেন বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়।
তাই, বৈষ্ণব আচার্যেরা বলে গেছেন যে, এমন কি অতি বুদ্ধিমান লোকও শুদ্ধ ভক্তের পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকর্ম বুঝতে পারে না। অবিকল কথাটি হচ্ছে-তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য ২৩/৩৯) এভাবেই যে মানুষ ভগবানের সেবায় নিত্যযুক্ত অথবা ভগবানের চিন্তায় এবং ভগবানের সেবা-সংকল্পে নিত্য মগ্ন থাকেন, তাঁকে মনে করতে হবে তিনি বর্তমানে সর্বতোভাবে মুক্ত এবং ভবিষ্যতে তিনি যে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মতো সব রকম জাগতিক সমালোচনার অতীত।

শ্লোক ২৯

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সমঃ-সমভাবাপন্ন; অহম্-আমি; সর্বভূতেষু-সমস্ত জীবের প্রতি; ননয়; মে-আমার; দ্বেষ্যঃ-বিদ্বেষ ভাবাপন্ন; অস্তি-হয়; ননয়; প্রিয়ঃ-প্রিয়; যে যাঁরা; ভজন্তি-ভজনা করেন; তু-কিন্তু; মাম্-আমাকে; ভক্ত্যা-ভক্তির দ্বারা; ময়ি-আমাতে; তে-তাঁরা; তেষু-তাঁদের; চ-ও; অপি-অবশ্যই; অহম্-আমি।

গীতার গান

আমি ত' সকল ভূতে দেখি সমভাব।
নহে কেহ প্রিয় মোর দ্বেষ্য বা প্রভাব ।।
কিন্তু সেই ভজে মোরে ভক্তিযুক্ত হই।
সে আমাতে আমি তাতে আসক্ত যে রই ।

অনুবাদ

আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রতিটি জীবের প্রতিই সমভাবাপন্ন হন এবং কেউই যদি তাঁর বিশেষ প্রিয় না হয়, তা হলে তিনি তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত অনন্য ভক্তের প্রতি কেন বিশেষভাবে অনুরক্ত? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন ভেদভাব নেই, উপরন্তু এটিই স্বাভাবিক। এই জড় জগতে কোন মানুষ মহাদানী হতে পারে, তবুও সে তার নিজের সন্তানদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। ভগবান দাবি করছেন যে, প্রতিটি জীবই তাঁর সন্তান, তা সে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করুক। তাই, তিনি সমস্ত প্রাণীর জীবনের সব রকম প্রয়োজন উদারভাবে পূর্ণ করেন। পাষাণ, স্থল ও জলে কোন রকম ভেদবুদ্ধি না করে মেঘ যেমন সর্বত্রই সমানভাবে বর্ষণ করে, ভগবানের করুণাও তেমনই সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। এই ধরনের ভক্তের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে-তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় নিয়তই

মগ্ন, তাই তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের মধ্যে অপ্রাকৃত স্তরে স্থিত থাকেন। 'কৃষ্ণভাবনা' এই শব্দটির অভিব্যক্তি এই যে, এই প্রকার চেতনা-সম্পন্ন মানুষ শ্রীভগবানের মধ্যে স্থিত জীবন্মুক্ত যোগী। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ময়ি তে-"তারা আমাতে স্থিত।" স্বভাবতই ভগবানও তাঁদের মধ্যে স্থিত থাকেন। এই সম্পর্ক পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেও, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্-"আমার প্রতি শরণাগতির মাত্রা অনুসারে আমি তাঁর তত্ত্বাবধান করি।" এই অপ্রাকৃত বিনিময় বর্তমান, কারণ ভগবান ও ভক্তবৃন্দ উভয়েই চৈতন্যময়। একটি সোনার আংটিতে যখন হীরে বসানো হয়, তখন সেটি দেখতে অতি সুন্দর লাগে। একত্রিত হবার ফলে সোনা ও হীরে উভয়েরই শোভা বর্ধিত হয়। ভগবান ও জীব নিত্যকাল প্রভাযুক্ত। জীব যখন ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়, তখন সে সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান হচ্ছেন হীরে এবং তাই এই দুইয়ের সমন্বয় অত্যন্ত সুন্দর। শুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট জীবকে বলা হয় ভক্ত। পরমেশ্বর ভগবানও আবার তাঁর ভক্তের ভক্ত হয়ে যান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যদি এই বিনিময়ের সম্বন্ধ না থাকে, তা হলে সবিশেষ দর্শনের অস্তিত্বই থাকে না। নির্বিশেষবাদে পরমতত্ত্ব ও জীবের মধ্যে কোনও বিনিময় হয় না, কিন্তু সবিশেষবাদে অবশ্যই তা হয়। এই উদাহরণটির প্রায়ই অবতারণা করা হয় যে, ভগবান কল্পবৃক্ষের মতো এবং এই কল্পবৃক্ষ থেকে যে যা চায়, ভগবান তাই দান করেন। কিন্তু এখানকার ব্যাখ্যাটি আরও পূর্ণাঙ্গ। এখানে ভগবানকে তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী বলা হয়েছে। এটি ভক্তদের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার অভিব্যক্তি। ভক্ত ও ভগবানের এই ভাব বিনিময়কে কর্মফলের অধীন বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি দিব্যস্তরে অবস্থিত, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তেরা নিত্য ক্রিয়াশীল। ভগবদ্ভক্তি এই জড় জগতের ক্রিয়া নয়; তা চিন্ময় জগতের ক্রিয়াকলাপ, যেখানে সচ্চিদানন্দময় দিব্য ভক্তিরস বিরাজ করে।

শ্লোক ৩০

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

অপি-এমন কি; চেৎ-যদি; সুদুরাচারঃ- অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি; ভজতে-ভজনা করেন; মাম্-আমাকে; অনন্যভাক্-অনন্য ভক্তি সহকারে; সাধুঃ-সাধু; এব-অবশ্যই; সঃ-তিনি; মন্তব্যঃ-মনে করা উচিত; সম্যক্-পূর্ণরূপে; ব্যবসিতঃ-দৃঢ়ভাবে অবস্থিত; হি-অবশ্যই; সঃ-তিনি।

গীতার গান

অনন্য যে ভক্ত যদি কভু দুরাচার।
ভজন করয়ে মোরে একনিষ্ঠতার ॥
সে সাধু মন্তব্য হয় সম্যগ ব্যবসিত।
দোষ তার কিছু নয় সে যে দৃঢ়ব্রত ॥

অনুবাদ

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সুদুরাচারঃ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা কর্তব্য। বদ্ধ জীবের ক্রিয়া দুই রকমের-নৈমিত্তিক ও নিত্য। দেহরক্ষা অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধান পালনের জন্য বিভিন্ন কর্ম করা হয়। বদ্ধ জীবনে ভক্তকেও এই ধরনের কার্য করতে হয়। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় নৈমিত্তিক। এ ছাড়া, যে জীব তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং যিনি কৃষ্ণভাবনায় অথবা ভগবদ্ভক্তিতে নিয়োজিত, তাঁর কার্যকলাপকে বলা হয় অপ্রাকৃত। তাঁর চিন্ময় স্বরূপে এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিভাষায় সেগুলিকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি। এখন বদ্ধ অবস্থায় কখনও কখনও ভগবৎ-সেবা এবং দেহ সম্বন্ধীয় কর্ম একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। কিন্তু তারপর আবার, কখনও কখনও এই দুই ধরনের ক্রিয়ায় পরস্পর বিরোধও উৎপন্ন হতে পারে। ভক্ত সাধারণত যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন, যাতে তিনি এমন কোন কাজ না করেন যার ফলে তাঁর ভগবৎ-সেবা বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। তিনি জানেন যে, কৃষ্ণভাবনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতির উপর তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সফলতা নির্ভর করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনা-পরায়ণ মানুষ এমন কাজ করে বসেন, যা সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হয়। কিন্তু এই প্রকার ক্ষণিক পতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভক্তিযোগের অযোগ্য হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অনন্যভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ মানুষ যদি পতিতও হন, তা হলে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি তাঁকে নির্মল করে পাপমুক্ত করে দেন। মায়ার মোহময়ী প্রভাব এতই প্রবল যে, এমন কি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ যোগীও কখনও কখনও তার ফাঁদে পতিত হন; কিন্তু কৃষ্ণভাবনা এত অধিক শক্তিসম্পন্ন যে, যার ফলে এই ধরনের আকস্মিক পতন তৎক্ষণাৎ পরিশোধিত হয়ে যায়। তাই, ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বদা সাফল্য অর্জন করে। যদি ভক্ত অকস্মাৎ আদর্শ ভাগবত পথ থেকে চাত হন, তা হলেও তাঁকে উপহাস করা উচিত নয়, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে ভক্তের এই আকস্মিক পতন যথাসময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র জপ করেন, তিনি যদি ঘটনাক্রমে অথবা অকস্মাৎ অধঃপতিত হন, তবুও তিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত আছেন বলেই মনে করা উচিত। এই সম্বন্ধে সাধুরেব (তিনি সাধু) কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অভক্তদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আকস্মিক পতন হওয়ার জন্য ভক্তকে উপহাস করা উচিত নয়; বরং তাঁকে সাধু বলেই মান্য করা উচিত। তা ছাড়া মন্তব্যঃ শব্দটি আরও বেশি জোরালো। এই শ্লোকের বিধান না মেনে যদি আকস্মিকভাবে পতিত ভক্তকে উপহাস করা হয়, তা হলে তা ভগবানের আজ্ঞার অবহেলা করা হবে। ভগবদ্ভক্তের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতাভাবে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত থাকা। নৃসিংহ পুরাণে বর্ণিত আছে-

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশমলিনোহপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ
তিমির পরাভবতাম্ উপৈতি চন্দ্রঃ ॥

এর অর্থ হচ্ছে, কেউ সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে রত থাকলেও কখনও কখনও তাকে হীন কর্মে নিয়োজিত দেখা যায়; এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে চাঁদের কলঙ্কের মতো মনে করতে হবে। এই প্রকার কলঙ্ক চন্দ্রের আলো বিকিরণের বাধাস্বরূপ হয় না। তেমনই সৎপথ থেকে ভক্তের আকস্মিক পতন তাঁকে পাপাত্মায় পরিণত করে না।

তা বলে এটি কখনও মনে করা উচিত নয় যে, অপ্রাকৃত ভগবৎ-পরায়ণ ভক্ত সব রকম নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন। এই শ্লোকে কেবল বিষয় সংসর্গ-জনিত দুর্ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি বস্তুতপক্ষে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। ভক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের দুর্ঘটনা-জনিত অধঃপতন হতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, পূর্ণরূপে শক্তিশালী হওয়ার পরে তাঁর আর কখনও পতন হয় না। এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে ভক্ত বলে মনে করা কখনই উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করার পরেও যদি চরিত্র শুদ্ধ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে উত্তম ভক্ত নয়।

শ্লোক ৩১

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

ক্ষিপ্রম্-অতি শীঘ্র; ভবতি-হন; ধর্মাত্মা-ধার্মিক; শশ্বৎ-নিত্য; শান্তিম্-শান্তিঃ নিগচ্ছতি-প্রাপ্ত হন; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; প্রতিজানীহি ঘোষণা কর; ন-না; মে-আমার; ভক্তঃ-ভক্ত; প্রণশ্যতি বিনাশ প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

অতিশীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার।
ধর্মভাব হবে তার ভক্তিতে আমার ॥
হে কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞা এ শুনহ আমার।
আমার যে ভক্ত হয় নাশ নাহি তার ॥

অনুবাদ

তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হন এবং নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়। তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না।

তাৎপর্য

ভগবানের এই উক্তির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, অসৎ কর্মে লিপ্ত মানুষেরা কখনই তাঁর ভক্ত হতে পারে না। যে ভগবানের ভক্ত নয়, তার কোনই সদ্‌গুণ নেই। তাই এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তা হলে স্বেচ্ছায় অথবা দুর্ঘটনাক্রমে পাপকর্মে প্রবৃত্ত মানুষ কিভাবে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্থাপন ন্যায়সঙ্গত। সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, যে দুষ্কৃতকারী সর্বদাই ভগবদ্ভক্তি থেকে বিমুখ থাকে, তার কোনই সদ্‌গুণ নেই। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে। সাধারণত, নবধা ভক্তি আচরণকারী ভক্ত সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয়কে নির্মল করতে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করেন, তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন। উন্নত স্তর থেকে ভ্রষ্ট হলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান বেদে আছে। কিন্তু এখানে সে রকম প্রায়শ্চিত্ত করার কোন বিধান দেওয়া হয়নি, কারণ নিরন্তর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তা করার ফলে ভক্তের হৃদয় আপনা থেকেই নির্মল হয়ে যায়। তাই, নিরন্তর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা উচিত। তার ফলে ভক্ত সব রকম

আকস্মিক পতন থেকে রক্ষা পান। এভাবেই তিনি সব রকম জড় কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৩২

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

মাম্-আমাকে; হি-অবশ্যই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ব্যপাশ্রিত্য-বিশেষভাবে আশ্রয় করে; যে-যারা; অপি-ও; স্যুঃ-হয়; পাপযোনয়ঃ-নীচকুলে জাত; স্ত্রিয়ঃ-স্ত্রী; বৈশ্যাঃ-বৈশ্য; তথা-এবং; শূদ্রাঃ-শূদ্র; তে অপি-তারাও; যান্তি-লাভকরে; পরাম্-পরম; গতিম্-গতি।

গীতার গান

আমাকে আশ্রয় করি যেবা পাপযোনি।
ম্লেচ্ছাদি যখন কিংবা বেশ্যা মধ্যে গণি ॥
কিংবা বৈশ্য শূদ্র যদি আমার আশ্রয়।
পাইবে বৈকুণ্ঠগতি জানিহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নীচকূলে জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, ভক্তিযোগে সকলেরই সমান অধিকার, এতে কোন জাতি-কূল আদির ভেদাভেদ নেই। জড়-জাগতিক জীবন ধারায় এই প্রকার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির কাছে তা নেই। পরম লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৪/১৮) বলা হয়েছে যে, এমন কি অত্যন্ত অধম যোনিজাত কুকুরভোজী চণ্ডাল পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সংসর্গে শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং, ভগবদ্ভক্তি ও শুদ্ধ ভক্তের পথনির্দেশ এতই শক্তিসম্পন্ন যে, তাতে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ নেই; যে কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। সবচেয়ে নগণ্য মানুষও যদি শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে যথাযথ পথনির্দেশের মাধ্যমে সেও অচিরে শুদ্ধ হতে পারে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, রজোগুণ-বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় (শাসক), রজ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট বৈশ্য (বণিক) এবং তমোগুণ-বিশিষ্ট শূদ্র (শ্রমিক)। তাদের থেকে অধম মানুষকে পাপযোনিভুক্ত চণ্ডাল বলা হয়। সাধারণত, উচ্চকুলোদ্ভূত মানুষেরা এই সমস্ত পাপযোনিভুক্ত জীবকে অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নীচবর্ণের মানুষদেরও মানব-জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করতে সক্ষম। এটি সম্ভব হয় কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে। ব্যপাশ্রিত্য শব্দটির দ্বারা এখানে তা নির্দেশিত হয়েছে, তাই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া উচিত। যিনি তা করেন, তিনি মহাজ্ঞানী এবং যোগীদের চেয়েও অধিক গৌরবান্বিত হন।

শ্লোক ৩৩

কিং পুনব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

কিম্-কি; পুনঃ-পুনরায়; ব্রাহ্মণাঃ-ব্রাহ্মণেরা; পুণ্যাঃ-পুণ্যবান; ভক্তাঃ-ভক্তেরা; রাজর্ষয়ঃ-রাজর্ষিরা; তথা-ও; অনিত্যম্-অনিত্য; অসুখম্-দুঃখময়; লোকম্-লোক; ইমম্-এই; প্রাপ্য লাভ করে; ভজস্ব ভজনা কর; মাম্-আমাকে।

গীতার গান

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যারা তাদের কি কথা।
পুণ্যবান হয় তারা জানিবে সর্বথা ॥
অতএব এ অনিত্য সংসারে আসিয়া।
ভজন করহ মোর নিশ্চিন্তে বসিয়া ॥

অনুবাদ

পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও রাজর্ষিদের আর কি কথা? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরাগতি লাভ করবেন। অতএব, তুমি এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্যলোক লাভ করে আমাকে ভজনা কর।

তাৎপর্য

এই জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জগৎ কারও জন্যই সুখদায়ক নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অনিত্যমসুখং লোকম্-এই জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় এবং কোন সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ভদ্রলোকের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা এটি নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই জগৎকে অনিতা ও দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু দার্শনিকেরা, বিশেষ করে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলে যে, এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জগৎ মিথ্যা নয়; তবে এই জগৎ হচ্ছে অনিত্য। অনিত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই জগৎ অনিত্য, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে, যা নিত্য শাশ্বত। এই জগৎ দুঃখময়, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে যা নিত্য ও আনন্দময়।

অর্জুন রাজর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকেও ভগবান বলেছেন, "আমাকে ভক্তি কর এবং শীঘ্রই ভগবৎ-ধামে ফিরে এস।" এই দুঃখময় অনিত্য জগতে কারওই পড়ে থাকা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে শাশ্বত সুখ লাভ করা। ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে সকল শ্রেণীর মানুষের সব রকম দুঃখ দূর করার একমাত্র উপায়। তাই, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে তার জীবন সার্থক করে তোলা।

শ্লোক ৩৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

মন্মনাঃ-মঙ্গত চিত্ত; ভব-হও; মৎ-আমার; ভক্তঃ-ভক্ত; মৎ-আমার; যাজী-পূজাপরায়ণ,

মাম্-আমাকে; নমস্কুরু-নমস্কার কর; মাম্-আমাকে; এব-সম্পূর্ণরূপে: এষ্যসি-প্রাপ্ত হবে; যুক্তৈবম্-এভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে; আত্মানম্-তোমার আত্মা; মৎপরায়ণঃ- মৎপরায়ণ হয়ে।

গীতার গান

মন্মনা মদ্ভক্ত মোর ভজন পূজন।
আমাকে প্রণাম তুমি কর সর্বক্ষণ ॥
মৎপর হয়ে তুমি নিজ কার্য কর।
অবশ্য পাইবে মোরে জান ইহা কর ॥

অনুবাদ

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এভাবেই মৎপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনার অমৃতই হচ্ছে এই দূষিত জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। যদিও এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ভক্তিযোগের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসাধু ব্যাখ্যাকারেরা এই অতি স্পষ্ট তথ্যকে বিকৃত করে পাঠকের চিত্ত কৃষ্ণবিমুখ করে তোলে এবং তাকে কুপথে চালিত করে। এই ধরনের ব্যাখ্যাকারেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের মন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাঁর দেহ, তাঁর মন ও তিনি স্বয়ং অদ্বয় পরমতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১-৪৮ সংখ্যক শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কুর্ম পুরাণ থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বলেছেন, দেহদেহিবিভেদোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ। অর্থাৎ, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর দেহে কোন ভেদ নেই। কিন্তু যেহেতু তথাকথিত ব্যাখ্যাকারেরা কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তারা তাদের ব্যাখ্যা ও বাচাতুর্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল করে রেখে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ তাঁর দেহ ও মন থেকে ভিন্ন। যদিও এই ধরনের মন্তব্য কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক, কিন্তু কিছু মানুষ জনসাধারণকে এভাবেই বিপথগামী করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

কিছু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষও শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করে। কিন্তু তাদের চিন্তা শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংসের মতোই বিদ্বেষপূর্ণ। সে-ও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সদাসর্বদা তন্ময় থাকত, কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুরূপে চিন্তা করত। তার সব সময় উদ্বেগ হত যে, কখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করতে আসবেন। এই ধরনের চিন্তার ফলে কোন লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা উচিত প্রেমভক্তি সহকারে। তাকেই বলা হয় ভক্তিযোগ। প্রত্যেকের নিরন্তর কৃষ্ণবিজ্ঞান অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত। সেই অনুকূল অনুশীলন কি? সদ্গুরুর আশ্রয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাই হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্বের অনুকূল অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার বিশ্লেষণ করেছি যে, তাঁর শ্রীবিগ্রহ জড় নয়, কিন্তু তা সচ্চিদানন্দময়। এই ধরনের কৃষ্ণকথা মানুষকে ভক্ত হতে সহায়তা করে। তা না করে যদি কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণতত্ত্ব জানবার চেষ্টা করা হয়, তা হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, আদ্যরূপে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করে, হৃদয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জেনে তাঁর পূজায় তৎপর হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার জন্য হাজার হাজার মন্দির আছে এবং সেখানে

ভক্তিযোগ অনুশীলন করা হয়। এই ভক্তিযোগের একটি অঙ্গ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করা। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত এবং কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখ হতে হয়। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত নিষ্ঠার উদয় হয় এবং কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসাধু ব্যাখ্যাকারদের বাক্‌চাতুর্যে কারও পথভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির অনুশীলনে প্রত্যেকের নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া উচিত। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে মানব-সমাজের পরম প্রাপ্তি। ভগবদ্গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে মনোধর্মী জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও সকাম কর্ম থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। যারা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হতে পারেনি, তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা আদি ভগবানের অন্যান্য রূপের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত' কেবল ভগবানের সেবাকেই অঙ্গীকার করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক একটি অতি মধুর কবিতাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর পূজায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ মূঢ় এবং তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা লাভ করতে পারে না। ভক্ত প্রামাণিক পর্যায়ে কখনও কখনও তাঁর প্রকৃত অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে অধঃপতিত হতে পারে, তবুও তাঁকে সকল দার্শনিক ও যোগীদের থেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা উচিত। যে ব্যক্তি কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সতত কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত আছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। তাঁর দৈবক্রমে অনুষ্ঠিত অভক্তোচিত কার্যকলাপ অচিরেই বিনষ্ট হবে এবং তিনি শীঘ্রই নিঃসন্দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করবেন। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কখনও পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কৃষ্ণভক্তির এই সরল পন্থাটি অবলম্বন করে, এই জড় জগতেই পরম সুখে জীবন যাপন করা উচিত। অবশেষে তিনিই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা লাভ করবেন।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-গূঢ়তম জ্ঞান বিষয়ক 'রাজগুহ্য-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদগীতার নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম অধ্যায় - বিভূতি-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ভূয়ঃ- পুনরায়; এব-অবশ্যই; মহাবাহো- হে

মহাবীর; শৃণু-শ্রবণ কর; মে- আমার; পরমম্-পরম; বচঃ -বাক্য; যৎ-যা; তে- তোমাকে; অহম্-আমি; প্রীয়মাণায়- আমার প্রিয় পাত্র বলে মনে করে; বক্ষ্যামি-বলব; হিতকাম্যয়া- হিত কামনায়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:

আবার বলি যে শুন পরম বচন।।
তোমার মঙ্গল হেতু কহি বিবরণ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে মহাবাহো! পুনরায় শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার প্রিয় পাত্র, তাই তোমার হিতকামনায় আমি পূর্বে যা বলেছি, তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি।

তাৎপর্য

ভগবান শব্দটির ব্যাখ্যা করে পরাশর মুনি বলেছেন, যিনি সর্বতোভাবে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ-যাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তিনি তাঁর ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন। তাই পরাশর মুনির মতো মহর্ষিরা সকলেই তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিভূতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরও গূঢ়তম জ্ঞান প্রদান করেছেন। পূর্বে সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং তারা কিভাবে ক্রিয়া করে, সেই কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন এই অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিশেষ বিভূতির কথা অর্জুনকে শোনাচ্ছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছেন যাতে অর্জুনের হৃদয়ে দৃঢ় ভক্তির উদয় হয়। এই অধ্যায়ে তিনি আবার অর্জুনকে তাঁর বিবিধ প্রকাশ ও বিভূতির কথা শোনাচ্ছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের কথা যতই শ্রবণ করা যায়, ভগবানের প্রতি ভক্তি ততই দৃঢ় হয়। ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা সর্বদাই শ্রবণ করা উচিত, তার ফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। যাঁরা যথার্থভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের প্রয়াসী, তাঁরাই কেবল ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করতে সক্ষম। অন্যেরা এই ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, যেহেতু অর্জুন তাঁর অতি প্রিয়, তাই তাঁর মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত কথা আলোচনা হচ্ছে।

শ্লোক ২

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥২॥

ন-না; মে-আমার; বিদঃ- জানেন; সুরগণাঃ- দেবতাগণ; প্রভবম্ - উৎপত্তি; ন-না; মহর্ষয়ঃ- মহর্ষিগণ; অহম্-আমি; আদিঃ- আদি কারণ; হি-অবশ্যই; দেবানাম্- দেবতাদের; মহর্ষীণাম্ মহর্ষিদের; চ-ও; সর্বশঃ- সর্বতোভাবে।

গীতার গান

আমার প্রভাব যেই কেহ নাহি জানে।
সুরগণ ঋষিগণ কত জনে জনে ॥

সকলের আদি আমি দেব ঋষি যত।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা কি বুঝিবে কত ॥

অনুবাদ

দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেন না. সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই; তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ। এখানেও ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত দেব-দেবী ও ঋষিদের উৎস। এমন কি দেব-দেবী এবং ঋষিরাও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না। তাঁরা তাঁর নাম ও স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন না, সুতরাং এই অতি ক্ষুদ্র গ্রহের তথাকথিত পণ্ডিতদের জ্ঞান যে কতটুকু, তা সহজেই অনুমেয়। পরমেশ্বর ভগবান কেন যে এই পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষের মতো অবতীর্ণ হয়ে পরম আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক লীলাবিলাস করেন, তা কেউই বুঝতে পারে না। তাই আমাদের বোঝা উচিত যে, তথাকথিত পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। এমন কি স্বর্গের দেব-দেবী এবং মহান ঋষিরাও মনোধর্মের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি। শ্রীমদ্ভাগবতেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের সীমিত অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুমান করতে পারেন এবং তার ফলে নির্বিশেষবাদের অপসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, যা জড় জগতের তিনগুণের অতীত, অথবা মনোধর্মের বশবর্তী হয়ে তাঁরা নানা রকমের অলীক কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের নির্বোধ অনুমানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ভগবান এখানে পরোক্ষভাবে বলেছেন যে, যদি কেউ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চায়, "আমিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, আমিই সেই পরমতত্ত্ব।" এটি সকলেরই বোঝা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান অচিন্তনীয়, তাই তিনি আমাদের সামনে থাকলেও তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তবুও তিনি আছেন। আমরা কিন্তু ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী যথাযথভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারি। যারা ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তিতে অবস্থিত, তারা ভগবানকে কোন শাসক-প্রধানরূপে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুমান করতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে না।

যেহেতু অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে এই সমস্ত মনোধর্মীদের প্রতি কৃপা করেন। কিন্তু ভগবানের অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও, এই ধরনের মনোধর্মীরা জড় জগতের কলুষের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মাই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। যে সব ভক্ত সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি নিয়ে ভক্ত মাথা ঘামান না। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁরা তাঁকে জানতে পারেন। তা ছাড়া আর কেউই তাঁকে জানতে পারে না। তাই মহাঋষিরাও স্বীকার করেন, আত্মা কি? পরমতত্ত্ব কি? তা হচ্ছেন তিনি, যাঁকে আমাদের ভজনা করা উচিত।

শ্লোক ৩

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

যঃ যিনি; মাম্-আমাকে; অজম্-জন্মরহিত; অনাদিম্ অনাদি; চ-ও; বেত্তি-জানেন: লোক-সমস্ত গ্রহলোকের; মহেশ্বরম্ ঈশ্বর; অসংমূঢ়ঃ-মোহশূন্য হয়ে; সঃ-তিনি; মর্ত্যেষু-মরণশীলদের মধ্যে; সর্বপাপৈঃ- সমস্ত পাপ থেকে; প্রমুচ্যতে-মুক্ত হন।

গীতার গান

যে মোরে অনাদি জানে লোক মহেশ্বর।
সচ্চিদ আনন্দ শ্রেষ্ঠ অব্যয় অজর ॥
মর্ত্যলোকে অসংগূঢ় যেই ব্যক্তি হয়।
এই মাত্র জানি তার সর্ব পাপ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনিই কেবল মানুষদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

সপ্তম অধ্যায়ে (৭/৩) বলা হয়েছে যে, মনুষ্যাণাং সহস্রেযু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে-যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। আত্ম-জ্ঞানবিহীন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের থেকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যথার্থ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়াসী পুরুষদের মধ্যে কদাচিৎ দুই-একজন কেবল উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সর্বলোক মহেশ্বর ও অজ। এভাবেই যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁরাই অধ্যাত্ম মার্গে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারার ফলেই কেবল পাপময় কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায়।

এখানে অজ শব্দটির দ্বারা ভগবানকে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'জন্মরহিত'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবকেও অজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান জীব থেকে ভিন্ন। জীবেরা জন্মগ্রহণ করছে এবং বৈষয়িক আসক্তির ফলে মৃত্যুবরণ করছে, কিন্তু ভগবান তাদের থেকে আলাদা। বদ্ধ জীবাত্মারা তাদের দেহ পরিবর্তন করছে, কিন্তু ভগবানের দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। এমন কি তিনি যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অপরিবর্তিত অজ রূপেই অবতরণ করেন। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ভগবান সব সময়ই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। তিনি কখনই অনুৎকৃষ্টা মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সব সময়ই তাঁর উৎকৃষ্টা শক্তিতে অবস্থান করেন।

এই শ্লোকে বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ কথাটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর এবং তা সকলের জানা উচিত। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। দেব-দেবীরা সকলেই এই জড় জগতে সৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, তিনি কখনও সৃষ্ট হন না; তাই তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদের থেকেও ভিন্ন। আর যেহেতু তিনি ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবীর সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি সমস্ত গ্রহলোকেরও পরম পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ তাই সমস্ত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন এবং এভাবেই যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হলে সব রকমের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই

তাঁকে জানা যায়, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তাঁকে জানতে পারা যায় না। সেই কথা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে কখনই একজন মানুষরূপে জানবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পূর্বেই সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, একমাত্র মূঢ় ব্যক্তি তাঁকে একজন মানুষ বলে মনে করে। সেই কথাই এখানে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ মূর্খ নয়, যিনি যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সব রকমের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ যদি দেবকীর পুত্র হন, তা হলে তিনি অজ হন কি করে? সেই কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে-তিনি যখন দেবকী ও বসুদেবের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেননি; তিনি তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যা কিছু করা হয়, তা অপ্রাকৃত। তা জড় জগতের শুভ অথবা অশুভ কোন কর্মফলের দ্বারাই কলুষিত হয় না। জড় জগতের শুভও অশুভ সম্বন্ধে যে ধারণা তা কম-বেশি মনোধর্ম-প্রসূত অলীক কল্পনা মাত্র, কারণ এই জড় জগতে শুভ বলতে কিছুই নেই। সব কিছুই অশুভ, কারণ এই জড়া প্রকৃতিই হচ্ছে অশুভ। আমরা' কেবল কল্পনা করি যে, তা শুভ। প্রগাঢ় ভক্তি ও সেবার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের উপর যথার্থ শুভ নির্ভরশীল। যদি আমরা প্রকৃতই শুভ কর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হই, তা হলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা উচিত। সেই সমস্ত নির্দেশ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা সদ্গুরুর কাছ থেকে পেতে পারি। সদ্গুরু যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁর নির্দেশ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ। সদ্গুরু, সাধু ও শাস্ত্র একই নির্দেশ দান করেন। এই তিনের নির্দেশের মধ্যে কোন রকম বিরোধ নেই। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে সাধিত সমস্ত কর্ম জড় জগতের সব রকমের শুভ বা অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত থাকে। কর্মকালে ভক্তের অপ্রাকৃত মনোভাবই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য এবং তাকেই বলা হয় সন্ন্যাস। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, যিনি কর্তব্যবোধে কর্ম করেন, যেহেতু সেই প্রকার কর্ম করতে তিনি ভগবানের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছেন এবং যিনি তাঁর কর্মফলের প্রতি আশ্রিত নন (অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্), তিনিই হচ্ছে যথার্থ সন্ন্যাসী। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসী বা যোগীর পোশাক পরলেই যোগী হওয়া যায় না।

শ্লোক ৪-৫

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; জ্ঞানম্-জ্ঞান; অসংমোহঃ- সংশয়মুক্তি; ক্ষমা- ক্ষমা; সত্যম্-সত্যবাদিতা; দমঃ-ইন্দ্রিয়-সংযম; শমঃ- মনঃসংযম; সুখম্- সুখ, দুঃখম্-দুঃখ; ভবঃ- জন্ম; অভাবঃ- মৃত্যু;

ভয়ম্-ভয়; চ-ও; অভয়ম্-অভয়; এব-ও; চ-এবং; অহিংসা- অহিংসা; সমতা-সমতা; তুষ্টিঃ- সন্তুষ্টি; তপঃ-তপশ্চর্যা; দানম্-দান; যশঃ- যশ; অযশঃ- অযশ; ভবন্তি-উৎপন্ন হয়; ভাবাঃ - ভাব; ভূতানাম্-প্রাণীদের; মত্তঃ- আমার থেকে; এব- অবশ্যই; পৃথবিধাঃ -নানা প্রকার।

গীতার গান

সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় যোগ্য বুদ্ধি যাহা হয়।
আত্ম যে অনাত্ম তাহা জ্ঞানের বিষয় ॥
সত্য, দম, শম, ক্ষমা, সুখ, দুঃখ, ভয়।
অভয়, ভবাভব আর অহিংসা যা হয় ।
সমতাদিতুষ্টিযশ অযশ বা দান।
সকল ভূতের ভাব যাহা কিছু আন ॥
আমি তার সৃষ্টিকর্তা পৃথক পৃথক।
বুদ্ধিমান যেবা হয় বুঝয়ে নিছক ॥

অনুবাদ

বুদ্ধি, জ্ঞান, সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃসংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও অযশ- প্রাণীদের এই সমস্ত নানা প্রকার ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

জীবের সব রকম গুণাবলী-ভালই হোক অথবা মন্দই হোক, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই সৃষ্ট এবং সেই সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
যথাযথভাবে বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি এবং জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার বোধকে বলা হয় জ্ঞান। জড় বস্তু সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের ফলে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তা সাধারণ জ্ঞান এবং তাকে এখানে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা। আধুনিক যুগের শিক্ষায় চেতন সম্বন্ধে কোন রকম জ্ঞানই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেগুলি কেবল জড় উপাদান ও জড় দেহের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই কেতাবি বিদ্যা অসম্পূর্ণ।
অসংমোহ, অর্থাৎ সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি তখন লাভ করা সম্ভব, যখন কারও অপ্রাকৃত দর্শনতত্ত্ব উপলব্ধি লাভ করার ফলে দ্বিধা মোচন হয়। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে তখন মোহ থেকে মুক্ত হয়। অন্ধভাবে কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়; সব কিছু গ্রহণ করা উচিত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে। ক্ষমা অনুশীলন করা উচিত, সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং অপরের ক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিগুলি মার্জনা করে দেওয়া উচিত। সত্যম্ অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য অপরের সুবিধার জন্য যথাযথভাবে প্রদান করা উচিত। সত্যকে কখনই বিকৃত করা উচিত নয়। সামাজিক রীতি অনুসারে বলা হয় যে, সত্য কথা কেবল তখনই বলা যেতে পারে, যদি তা অপরের রুচিকর হয়। কিন্তু সেটি সত্যবাদিতা নয়। দৃঢ়তা ও সপ্রতিভতার সঙ্গে অকপটভাবে সত্য বলা উচিত, যাতে যথার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে সকলে অবগত হতে পারে। কোন মানুষ যদি চোর হয় এবং অপরকে যদি সেই সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়, তবে সেটি সত্য, যদিও সত্য কখনও কখনও অপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার থেকে নিরস্ত হওয়া কখনই উচিত নয়। সত্য আমাদের কাছে দাবি করে যে, অপরের সুবিধার জন্য প্রকৃত ঘটনা যথাযথভাবে প্রদান করা হোক। সেটিই হচ্ছে সত্যের সংজ্ঞা।
ইন্দ্রিয়-সংযমের অর্থ হচ্ছে নিরর্থক আত্মতৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার না করা। ইন্দ্রিয়ের যথার্থ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য কোন রকম নিষেধ নেই, কিন্তু অযথা

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পারমার্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। তাই ইন্দ্রিয়গুলির অনর্থক ব্যবহার দমন করা উচিত। তেমনই মনকেও অনাবশ্যক চিন্তা থেকে বিরত রাখা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শম। অর্থ উপার্জনের চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সেটি কেবল চিন্তাশক্তির অপচয় মাত্র। মানব-জীবনের পরম প্রয়োজন উপলব্ধি করার জন্যই মনের ব্যবহার করা উচিত এবং তা শাস্ত্রসম্মত যথাযথভাবে করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, সাধু, সদ্‌গুরু ও উন্নতমনা পুরুষের সাহচর্যে চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা উচিত। সুখম্‌, শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির দিব্যজ্ঞান লাভের পক্ষে যা অনুকূল, তার মাধ্যমেই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আর তেমনই, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে যা প্রতিকূল তা দুঃখজনক। কৃষ্ণভক্তি বিকাশের পক্ষে যা অনুকূল তা গ্রহণীয় এবং যা প্রতিকূল তা বর্জনীয়।
ভব অর্থাৎ জন্ম, দেহ সম্পর্কিত বলেই জানা উচিত। আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না; সেই কথা ভগবদ্গীতার প্রারম্ভেই আলোচনা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু জড় জগতে দেহ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল সম্বন্ধযুক্ত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই নির্ভীক, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাঁর কার্যকলাপের ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয়, চিন্ময় জগতে ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। তাই তাঁর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। অন্যেরা কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরবর্তী জীবনে তাদের ভাগ্যে কি আছে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তাই, তারা সর্বক্ষণ গভীর উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করে। আমরা যদি উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে চাই, তবে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া। সেভাবেই আমরা সব রকম ভয়ের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারব। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে যে, ভয়ং দ্বিতীয়া-ভিনিবেশতঃ স্যাৎ-মায়াতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কিন্তু যাঁরা মায়াশক্তি থেকে মুক্ত, যাঁরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাঁদের স্বরূপ তাঁদের জড় দেহটি নয়, তাঁরা হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্ময় অংশ, তাই তাঁরা সর্বক্ষণ ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত এবং সর্বতোভাবে ভয় থেকে মুক্ত। তাঁদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেনি, তারাই কেবল আশঙ্কাগ্রস্ত। অভয়ম্‌, অর্থাৎ ভয়শূন্য কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত।
অহিংসা হচ্ছে অপরের অনিষ্ট সাধন না করা বা অপরকে বিভ্রান্ত না করা। রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা যে সমস্ত জড় কর্মের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার ফলে কারওই তেমন কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। কারণ, রাজনীতিবিদ বা লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের দিব্য দৃষ্টি নেই। মানব-সমাজের যথার্থ মঙ্গল কিভাবে সাধিত হতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। অহিংসা শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানব-দেহের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া। মানব-দেহের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধি করা। সুতরাং যে সংস্থা বা যে আন্দোলন এই উদ্দেশ্যে মানুষকে পরিচালিত করে না, তা মনুষ্য-শরীরের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করে। যে প্রচেষ্টা সমগ্র জনসাধারণকে ভাবী দিব্য আনন্দ প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে, তাই হচ্ছে যথার্থ অহিংসা।
সমতা বলতে বোঝায় আসক্তি ও বিরক্তিতে নিস্পৃহ। অত্যধিক আসক্তি ও অত্যধিক বিরক্তি ভাল নয়। আসক্তি অথবা বিরক্তি রহিত হয়ে জড় জগৎকে গ্রহণ করা উচিত। কৃষ্ণভক্তি সাধনে যা অনুকূল তা গ্রহণ করা উচিত, যা প্রতিকূল তা বর্জন করা উচিত। তাকেই বলা হয় সমতা। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা-আনুকূল্য ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করেন না বা বর্জন করেন না।
তুষ্টি বলতে বোঝায় অনর্থক কর্মের মাধ্যমে অধিক থেকে অধিকতর জড় সম্পত্তি সঞ্চয় না করা। ভগবানের কৃপার প্রভাবে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাকেই

বলা হয় তুষ্টি। তপঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে তপস্যা বা কৃষ্ণসাধন। এই সম্বন্ধে বেদে নানা রকম নিয়ম-নিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-যেমন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করা। কখনও কখনও খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কষ্ট স্বীকার করাকে বলা হয় তপস্যা। তেমনই, মাসের কতগুলি নির্দিষ্ট দিনে উপবাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের উপবাস করতে আমাদের ইচ্ছা নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করতে চাই, তা হলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে এই ধরনের দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তা বলে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ না করে নিজের ইচ্ছামতো অনাবশ্যক উপবাস করা উচিত নয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপবাস করা উচিত নয়। ভগবদগীতাতে এই ধরনের উপবাস করাকে তামসিক উপবাস বলা হয়েছে এবং তম অথবা রজোগুণে কৃতকর্ম আমাদের পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয় না। সত্ত্বগুণে কৃত কর্মই কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে উপবাস করার ফলে পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, উপার্জিত অর্থের অর্ধাংশ কোন সৎকর্মে দান করা উচিত। সৎকর্ম বলতে কি বোঝায়? কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্যে সাধিত কর্মই হচ্ছে সৎকর্ম। তা কেবল সৎকর্মই নয়, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৎ, তাই তাঁর উদ্দেশ্যে যে কর্ম সাধিত হয় তাও সৎ। তাই, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁকেই দান করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যথাযথভাবে সাধিত না হলেও, সেই রীতি আজও চলে আসছে। তবুও নির্দেশ হচ্ছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করা। কেন? কারণ ব্রাহ্মহ্মণেরা সর্বদা পারমার্থিক জ্ঞানের উচ্চতর অনুশীলনে মগ্ন থাকেন। ব্রাহ্মণের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করা। ব্রহ্মা জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ -যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। এভাবেই দান ব্রাহ্মণদের নিবেদন করা হয়, কারণ উচ্চতর পারমার্থিক প্রয়াসে নিবিষ্ট থাকার ফলে তাঁরা জীবিকা অর্জনের কোন অবসর পান না। বৈদিক শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, সন্ন্যাসীদেরও দান করা উচিত। সন্ন্যাসীরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন অর্থ উপার্জন করার জন্য নয়-প্রচারের জন্য। এভাবেই তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে গৃহস্থদের অজ্ঞানতার সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠার জন্য আবেদন করেন। কারণ, গৃহস্থেরা গৃহসংক্রান্ত কর্মে এতই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের জীবনের আসল উদ্দেশ-কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করার কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। তাই, সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করা। বেদে বলা হয়েছে, জেগে ওঠ এবং মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য লাভ কর। সন্ন্যাসীরা এই জ্ঞান ও পন্থা প্রদান করেন। তাই দান সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও সেই ধরনের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা উচিত, নিজের খেয়ালখুশি মতো দান করা উচিত নয়।

যশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুসারে হওয়া উচিত। মহাপ্রভু বলেছেন যে, একজন মানুষ তখনই যশ লাভের অধিকারী হন, যখন তিনি ভগবানের মহান ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত যশ। যদি জানা যায় যে, কোন মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভ করেছেন, তখন তিনি প্রকৃত যশস্বী হন। আর এই রকম যশ যার নেই, সে কখনই যশস্বী নয়।

এই গুণগুলি ব্রহ্মাণ্ডে মানব ও দেবতা সকল সমাজেই বর্তমান। অন্যান্য গ্রহলোকেও বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যজাতি রয়েছে এবং এই গুণগুলি সেখানেও বর্তমান। এখন, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে চান, কৃষ্ণ তখন তাঁর জন্য এই সমস্ত গুণগুলি সৃষ্টি করেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি নিজে সেগুলিকে অন্তরে বিকাশ সাধন করেন।

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন, তিনি ভগবানের ব্যবস্থাপনায় সমস্ত সদ্গুণের বিকাশ সাধন করেন।
ভাল বা মন্দ, যাই আমরা দেখি না কেন, তার মূল উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে কোন কিছুই মধ্যে নেই। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। প্রকাশিত হতে পারে না, যা শ্রীকৃষ্ণের যদিও আমরা জানি যে, প্রতিটি বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের এটি উপলব্ধি করা উচিত যে, সব কিছু সৃষ্টির মূলেই আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৬

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষয়ঃ- মহর্ষিগণ; সপ্ত-সাত; পূর্বে-পূর্বে; চত্বারঃ- সনকাদি চারজন; মনবঃ- চতুর্দশ মনু; তথা-ও; মদ্ভাবাঃ- আমার থেকে জন্মগ্রহণ করেছে; মানসাঃ- মন থেকে; জাতাঃ- উৎপন্ন; যেষাম্ যাঁদের; লোকে- এই জগতে; ইমাঃ-এই সমস্ত; প্রজাঃ-প্রজাসমূহ।

গীতার গান

মরীচ্যাদি সপ্তঋষি চারি সনকাদি।
চতুর্দশ মনু পূর্ব হিরণ্যগর্ভাদি ॥
তাদের এ প্রজা সব যত লোকে আছে।
আমা হতে জন্ম সব মানসাদি পাছে ॥

অনুবাদ

সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্বজাত সনকাদি চার কুমার ও চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়ে আমা হতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এই জগতের স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত বংশানুক্রমিক বিবরণ দান করেছেন। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ নামক শক্তি থেকে প্রথম জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা থেকে সপ্ত ঋষি এবং তাঁদের আগে চারজন মহর্ষি সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এবং তারপর চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়। এই পঁচিশজন মহর্ষিরা হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহের পিতৃকুল। এই জগতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত গ্রহলোক রয়েছে এবং প্রতিটি গ্রহলোক নানা রকম প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত। তারা সকলেই এই পঁচিশজন পিতৃপুরুষের দ্বারা জাত। ব্রহ্মা দেবতাদের সময়ের হিসাব অনুসারে এক সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করার পর জানতে পারেন কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর ব্রহ্মা থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের আবির্ভাব হয়। তার পরে রুদ্র ও সপ্ত ঋষি এবং এভাবেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাকে বলা হয় পিতামহ এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রপিতামহ। কারণ, তিনি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে (১১/৩৯) এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

এতাম্-এই সমস্ত; বিভূতিম্- বিভূতি; যোগম্ যোগ; চ-ও; মম- আমার; যঃ- যিনি; বেত্তি- জানেন; তত্ত্বতঃ- যথার্থরূপে; সঃ- তিনি; অবিকল্পেন-অবিচলিত; যোগেন- ভক্তিযোগ দ্বারা; যুজ্যতে-যুক্ত হন; ন-না; অত্র-এই বিষয়ে; সংশয়ঃ- সন্দেহ।

গীতার গান

আমার স্বরূপজ্ঞান শক্তি বা বিভূতি।
সমস্ত ক্রিয়াদি যোগ শ্রেষ্ঠ সে ভকতি ॥
এই সব তত্ত্ব যারা নিশ্চিত জানিল।
ভক্তিযোগ সাধিবারে যোগ্য সে হইল ॥

অনুবাদ

যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভগবানের অনন্ত বিভূতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত না হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি না। সাধারণত সকলেই জানে যে, ভগবান মহান। কিন্তু ভগবান কেন মহান, তা তারা বিশদভাবে অবগত নয়। এখানে তার বিশদ বর্ণনা করা হচ্ছে। আমরা যখন ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে পারি, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই। যখন আমরা বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে অবগত হই, তখন ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া বিকল্প কোন উপায় থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারা যায়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় বহু দেব-দেবীরা বিভিন্ন গ্রহলোকে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁদের প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, চতুঃস্বন ও প্রজাপতিগণ। ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরা বহু প্রজাপতি থেকে উদ্ভুত হয়েছে এবং এই সমস্ত প্রজাপতিরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত প্রজাপতিদের আদিপুরুষ।

এই সমস্ত ভগবানের অনন্ত বৈভবের কয়েকটির প্রকাশ। এই সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে যখন দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়, তখন আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ও নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারি এবং তখন আমরা তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই। প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় মহান তা পূর্ণরূপে জানার জন্য আমাদের কখনও অবহেলা করা উচিত নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৮

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥

অহম্-আমি; সর্বস্য- সকলের; প্রভবঃ- উৎপত্তির হেতু; মত্তঃ- আমার থেকে; সর্বম্-সব কিছু, প্রবর্ততে-প্রবর্তিত হয়; ইতি-এভাবে; মত্বা- জেনে; ভজন্তে-ভজন করেন; মাম্-আমাকে; বুধাঃ-পণ্ডিতগণ; ভাবসমন্বিতাঃ-ভাবযুক্ত হয়ে।

গীতার গান

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সব আমা হতে হয়।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানি আমাকে ভজয় ॥
আমার যে ভাব তাহা ভক্তির লক্ষণ।
অপণ্ডিত নাহি জানে জানে পণ্ডিতগণ ॥

অনুবাদ

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যথার্থ বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সেই শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা বুঝেছেন, তাঁরা জানেন যে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতের সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে তাঁরা অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁরা কখনই অপসিদ্ধান্ত বা মূর্খ মানুষের অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এক বাক্যে স্বীকার করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীর উৎস। অথর্ব বেদে (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২৪) বলা হয়েছে, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ-"ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি সেই জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন।" তারপর পুনরায় নারায়ণ উপনিষদে (১) বলা হয়েছে, "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি-"তারপর পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাণী সৃষ্টির ইচ্ছা করেন।" উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ অষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ একাদশ রুদ্রো জায়ন্তে, নারায়ণাদ দ্বাদশাদিত্যাঃ-“নারায়ণ হতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, নারায়ণ হতে, প্রজাপতিদের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে ইন্দ্রের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে অষ্টবসুর জন্ম হয়, নারায়ণ থেকে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয় এবং নারায়ণ থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়।" এই নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-প্রকাশ।

সেই একই বেদে আরও বলা হয়েছে, ব্রহ্মাণ্যো দেবকীপুত্রঃ-"দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান"। (নারায়ণ উপনিষদ ৪) তারপর বলা হয়েছে, একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নি-সমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যঃ- "সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা ছিল না, শিব ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য ছিল না।” (মহা উপনিষদ ১) মহা উপনিষদে আরও বলা হয়েছে যে, শিবের জন্ম হয় পরমেশ্বর ভগবানের ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে। এভাবেই বেদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সকলের আরাধ্য।

মোক্ষধর্মে শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন-

প্রজাপতিং চ রুদ্রং চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥

"প্রজাপতিগণ, রুদ্র ও অন্য সকলকে আমি সৃষ্টি করেছি, যদিও তাঁরা তা জানেন না। কারণ, তাঁরা আমার মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত।" বরাহ পুরাণেও বলা হয়েছে-

নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোহভবদ্ দেবঃ স চ সর্বজ্ঞতাং গতঃ ॥

"নারায়ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান আর তাঁর থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁর থেকে শিবের জন্ম হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং তাঁকে বলা হয় সব কিছুর নিমিত্ত কারণ। তিনি বলেছেন, "যেহেতু সব কিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমিই সব কিছুর আদি উৎস। সব কিছুই আমার অধীন। আমার উপরে কেউ নেই।" শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া পরম নিয়ন্তা আর কেউ নেই। সদ্গুরু ও বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত করেন এবং তিনিই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। তাঁর তুলনায় অন্য সকলে যারা কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান যথাযথভাবে লাভ করেনি, তারা নিতান্তই মূর্খ। মূর্খেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। মূর্খদের প্রলাপের দ্বারা কৃষ্ণভক্তের কখনই বিচলিত হওয়া উচিত নয়; ভগবদ্গীতার সমস্ত অপ্রামাণিক ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় কর্ণপাত না করে দৃঢ় প্রত্যয় ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৯

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ৷ ৯৷

মচ্চিত্তাঃ-যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত; মদ্গতপ্রাণাঃ-তাঁদের প্রাণ আমাতে সমর্পিত; বোধয়ন্তঃ-বুঝিয়ে; পরস্পরম্-পরস্পরকে; কথয়ন্তঃ-আলোচনা করে; চ-ও; মাম্-আমার সম্বন্ধেই; নিত্যম্ সর্বদা; তুষ্যন্তি-তুষ্ট হন; চ-ও; রমন্তি-অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন; চ-ও।

গীতার গান

আমার অনন্য ভক্ত মচ্চিত্ত মৎপ্রাণ।
পরস্পর বুঝে পড়ে আনন্দে মগন ॥
আমার সে কথা নিত্য বলিয়া শুনিয়া ।
তোষণ রমণ করে ভক্তিতে মজিয়া ॥

অনুবাদ

যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত, যাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা সর্বদাই পূর্ণরূপে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তিতে যুক্ত থাকেন। তাঁদের মন কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ থেকে বিক্ষিপ্ত হয় না। তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই

ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁদের মনপ্রাণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিমগ্ন থাকে এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে গভীর আনন্দ উপভোগ করেন।

ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে ভক্ত ভগবানের সেবার মাধ্যমেই অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন এবং পরিপক্ক অবস্থায় তাঁরা ভগবৎ-প্রেমে প্রকৃতই মগ্ন থাকেন। একবার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, তখন তাঁরা পূর্ণতম রস আস্বাদন করতে পারেন, যা ভগবান তাঁর ধামে প্রদর্শন করে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিকে জীবের হৃদয়ে বীজ বপন করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন গ্রহে অসংখ্য জীব ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান জীব শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে ভগবদ্ভক্তির নিগূঢ় রহস্যের কথা অবগত হতে সক্ষম হন। এই ভগবদ্ভক্তি ঠিক একটি বীজের মতো এবং তা যদি জীবের হৃদয়ে বপন করা হয় এবং হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করা হয়, তা হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঠিক যেমন, নিয়মিত জল সিঞ্চনের ফলে একটি গাছের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই অপ্রাকৃত ভক্তিলতা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে জড় ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ-আকাশের ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে। চিৎ-আকাশেও এই লতা বর্ধিত হতে থাকে এবং অবশেষে সর্বোচ্চ আলয় শ্রীকৃষ্ণের পরম গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। পরিশেষে, এই লতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে বিশ্রাম লাভ করে। একটি লতা যেমন ক্রমশ ফল-ফুল উৎপাদন করে, সেই ভক্তিলতাও সেখানে ফল উৎপাদন করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চনের পন্থা চলতে থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা উনবিংশতি অধ্যায়ে) এই ভক্তিলতার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই ভক্তিলতা যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের চরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, ভক্ত তখন ভগবৎ-প্রেমে নিমগ্ন হন। তখন তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সংস্পর্শ ব্যতীত থাকতে পারেন না-ঠিক যেমন একটা মাছ জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। এই অবস্থায়, পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলে ভক্ত সমস্ত দিব্যগুণে গুণান্বিত হনু।

শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই রকম দিব্য সম্পর্কের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তদের অতি প্রিয় এবং সেই কথা ভাগবতেই (১২/১৩/১৮) বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্। এই বর্ণনায় কোন রকম জড়-জাগতিক কর্মের, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অথবা মুক্তির উল্লেখ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন, ঠিক যেমন, কোন যুবক-যুবতী পরস্পরের সঙ্গ লাভের ফলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

শ্লোক ১০

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ৷ ১০ ॥

তেষাম্-তাঁদের; সততযুক্তানাম্-নিতাযুক্ত; ভজতাম্-ভক্তিযুক্ত সেবাপরায়ণ হয়ে;

প্রীতিপূর্বকম্-প্রীতিপূর্বক; দদামি-দান করি; বুদ্ধিযোগম্বুদ্ধিযোগ; তম্-সেই; যেন-যার দ্বারা; মাম্-আমাকে; উপযান্তি-প্রাপ্ত হন; তে-তাঁরা।

গীতার গান

সেই নিত্যযুক্ত যারা ভজনে কুশল।
প্রীতির সহিত তারা ধরে ভক্তিবল ॥
আমি দিই ভক্তিযোগ তাদের অন্তরে।
আমার পরম ধাম তারা লাভ করে ।

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বুদ্ধিযোগম্ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমরা স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি তাঁকে বুদ্ধিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এখানে সেই বুদ্ধিযোগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধিযোগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধির অর্থ হচ্ছে বোধশক্তি এবং যোগের অর্থ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় কার্যকলাপ অথবা যোগারূঢ়। কেউ যখন তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় সম্যকভাবে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর সেই কার্যকলাপকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিযোগ হচ্ছে সেই পন্থা, যার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। সাধনার পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণ মানুষ সেই কথা জানে না। তাই, ভগবদ্ভক্ত ও সদ্গুরুর সঙ্গ অতি আবশ্যক। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হলে, ধীরস্থির গতিতে সেই লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অথচ ক্রমোন্নতির পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে সেই পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

কেউ যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্মফল ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, তখন সেই স্তরে সাধিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। কেউ যখন জানতে পারে যে, পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং কেউ যখন পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা বুদ্ধিযোগ এবং সেটিই হচ্ছে যোগের পরম পূর্ণতা। যোগের এই পূর্ণতাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর।

কেউ সদ্গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে কোন পারমার্থিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যথার্থ বুদ্ধি যদি তাঁর না থাকে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তস্থল থেকে তাঁকে যথাযথভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপা লাভ করার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁকে কোন একটি কর্ম করতে হবে এবং সেই কর্ম প্রীতির সঙ্গে সাধন করতে হবে। ভক্ত যদি আত্ম-উপলব্ধির বিকাশ সাধনে যথার্থ বুদ্ধিমান না হন, কিন্তু ভক্তিযোগ সাধনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সুযোগ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ক্রমশ উন্নতি সাধন করেন এবং অবশেষে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ১১

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তেষাম্-তাঁদের; এব-অবশ্যই; অনুকম্পার্থম্-অনুগ্রহ করার জন্য; অহম্-আমি; অজ্ঞানজম্-অজ্ঞান-জনিত; তমঃ-অন্ধকার; নাশয়ামি-নাশ করি; আত্মভাবস্থঃ -হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে; জ্ঞান-জ্ঞানের; দীপেন-প্রদীপের দ্বারা; ভাস্বতা-উজ্জ্বল।

গীতার গান

সেই সে অনন্য ভক্ত নহেত অজ্ঞানী।
আমি তার হৃদয়েতে জ্ঞানদীপ আনি ॥
অন্ধকার তমোনাশ করি সে অশনি।
জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া করি তারে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত অন্ধকার নাশ করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে /হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করে প্রচার করছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হয়েছিল। বারাণসীর অত্যন্ত প্রভাবশালী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভাবুক বলে উপহাস করেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তের সমালোচনা করে, কারণ তারা মনে করে যে, অধিকাংশ ভক্তেরাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তত্ত্বদর্শনে অনভিজ্ঞ ভাবুক। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ভক্তিতত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এমন কি কোন ভক্ত যদি এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা সদ্গুরুর সাহায্য গ্রহণ না-ও করেন, কিন্তু তিনি যদি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অন্তর থেকে সাহায্য করেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত কখনই তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নন। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

আধুনিক যুগের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, পার্থক্য বিচার না করে কেউ শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তার উত্তরে পরমেশ্বর ভগবান এখানে বলেছেন যে, যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁরা যদি অশিক্ষিত এবং পর্যাপ্ত বৈদিক জ্ঞানবিহীনও হন, তবুও তিনি তাঁদের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন, যা এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, মূলত মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে কখনই পরম সত্য বা পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা যায় না, কেন না পরম সত্য এতই বৃহৎ যে, কেবল কোন রকম মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা অথবা তাঁকে লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান করে যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিত্তে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি না জাগছে, পরম সত্যের প্রতি প্রীতির উদয় না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মতেই শ্রীকৃষ্ণকে বা পরম সত্যকে জানতে পারে না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করা যায় এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের

হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সূর্যসম শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে অজ্ঞানতার সমস্ত অন্ধকার তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এটি একটি বিশেষ কৃপা।
লক্ষ লক্ষ জন্ম-জন্মান্তরে বৈষয়িক সংসর্গের কলুষতার ফলে জড়বাদের ধূলির দ্বারা আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু আমরা যখন ভক্তিযোগে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হয়ে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে থাকি, তখন অতি শীঘ্রই হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা বিদূরিত হয় এবং আমরা শুদ্ধ জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নতি লাভ করি। পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র এভাবেই কীর্তন ও সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনোধর্ম-প্রসূত কল্পনা অথবা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নয়। জীবন ধারণের আবশ্যকতাগুলির জন্য শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম উদ্বেগগ্রস্ত হন না। তাঁর উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর হৃদয় থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবান আপনা থেকেই তার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, কারণ ভক্তের ভক্তিযুক্ত সেবায় ভগবান অত্যন্ত প্রীত হন। এটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার শিক্ষার সারমর্ম। ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে শুদ্ধ ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে পারি। ভগবান যখন আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন আমরা সব রকম জাগতিক প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হই।

শ্লোক ১২-১৩

অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ৷ ১৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; পরম্-পরম; ব্রহ্ম-সত্য; পরম্-পরম; ধাম-ধাম; পবিত্রম্-পবিত্র; পরমম্-পরম; ভবান্-তুমি; পুরুষম্-পুরুষ; শাশ্বতম্-সনাতন; দিব্যম্-দিব্য; আদিদেবম্-আদিদেব; অজম্-জন্মরহিত; বিভুম্-সর্বশ্রেষ্ঠ; আহুঃ-বলেন; ত্বাম্-তোমাকে; ঋষয়ঃ-ঋষিগণ; সর্বে-সমস্ত; দেবর্ষিঃ-দেবর্ষি; নারদঃ-নারদ; তথা-ও; অসিতঃ-অসিত; দেবলঃ-দেবল; ব্যাসঃ-ব্যাসদেব; স্বয়ম্ তুমি নিজে; চ-ও; এব-অবশ্যই; ব্রবীষি-বলছ; মে-আমাকে।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম।
তুমি কৃষ্ণ হও নিত্য এই মোর জ্ঞান ॥
শাশ্বত পুরুষ তুমি অজ, আদি বিভু।
অপ্রাকৃত দেহ তব সকলের প্রভু ॥
দেবর্ষি নারদ আর যত ঋষি আছে।
অসিত দেবল ব্যাস সেই গাহিয়াছে ॥
তোমার এই শ্রীমূর্তি ওহে ভগবান।

না জানে দেবতা কিংবা যারা দানবান ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, দিব্য, আদি দেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান আধুনিক যুগের তথাকথিত দার্শনিকদের তাঁর সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র জীবাত্মা থেকে পরমতত্ত্ব ভিন্ন। এই অধ্যায়ে ভগবদ্গীতার সারমূলক চারটি মুখ্য শ্লোক শোনার পর অর্জুন সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে স্বীকার করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "তুমি হচ্ছ পরং ব্রহ্মা অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, তিনি সকলের ও সব কিছুর আদি। প্রতিটি মানুষ, এমন কি স্বর্গের দেব-দেবীরাও তাঁর উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে মানুষ ও দেবতারা মনে করেন যে, তাঁরা পূর্ণ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন, ভগবানের কৃপার ফলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং সেই কথা বেদেও স্বীকার করা হয়েছে। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে অর্জুন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বা পরমতত্ত্ব বলে তোষামোদ করেছেন। এই শ্লোক দুটিতে অর্জুন যা বলেছেন, তা সবই বৈদিক শাস্ত্রসম্মত। বেদে বলা হয়েছে যে, ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এ ছাড়া আর কোনভাবেই তাঁকে জানতে পারা সম্ভব নয়। এখানে অর্জুন যা বলেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা বেদের নির্দেশ অনুসারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কেন উপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুরই পরম আশ্রয়। মুণ্ডক উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সব কিছুর আশ্রয়, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার মাধ্যমেই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই নিরন্তর চিন্তাকে বলা হয় স্মরণম্, তা ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ। কৃষ্ণভক্তির ফলেই কেবল আমরা আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

বেদে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পরম পবিত্র বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি সব রকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ না করলে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন পরম পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তা বৈদিক নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি। এই সত্য সমস্ত মুনি-ঋষিরাও স্বীকার করেছেন, যাঁদের মধ্যে নারদ মুনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর ধ্যানে মগ্ন থেকে আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের অপ্রাকৃত সম্পর্কের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি। তিনিই হচ্ছেন শাশ্বত অস্তিত্ব। তিনি সব রকম দৈহিক প্রয়োজন, জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত। সেই কথা যে কেবল অর্জুনই বলেছেন, তা নয়, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ ও ইতিহাস যুগ-যুগান্তর ধরে সেই কথা ঘোষণা করে আসছে। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, "যদিও আমি অজ, তবুও এই পৃথিবীতে আমি ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য অবতরণ করি।" তিনি পরম উৎস; তাঁর কোন কারণ নেই, কেন না তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ এবং

তাঁর থেকেই সব কিছুর প্রকাশ হয়। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল এই দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়।
ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল অর্জুন তাঁর এই উপলব্ধির কথা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি ভগবদগীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে এই শ্লোক দুটিতে ভগবান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে। একে বলা হয় পরম্পরা ধারা অর্থাৎ গুরুশিষ্য পারম্পর্যে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত না হলে ভগবদগীতার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেতাবি বিদ্যার দ্বারা ভগবদগীম্বর জ্ঞান লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রে অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগের তথাকথিত দাম্ভিক পণ্ডিতেরা তাদের কেতাবি বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে গোঁয়ার্তুমি করে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ।

শ্লোক ১৪

সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বম্-সমস্ত; এতৎ-এই; ঋতম্-সত্য; মন্যে মনে করি; যৎ-যা; মাম্ আমাকে; বদসি-বলেছ; কেশব-হে কৃষ্ণ; ন-না; হি-অবশ্যই; তে-তোমার; ভগবন্ হে পরমেশ্বর ভগবান; ব্যক্তিম্-তত্ত্ব; বিদুঃ-জানতে পারে; দেবাঃ-দেবতারা; ন-না; দানবাঃ-দানবেরা।

গীতার গান

হে কেশব তোমার এ গীত বাণী যত।
সর্ব সত্য মানি আমি সে বেদসম্মত ॥
তোমার মহিমা তুমি জান ভাল মতে।
অনন্ত পারে না গাহিতে অনন্ত' জিহ্বাতে ॥

অনুবাদ

হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলেছ, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নন।

তাৎপর্য

অর্জুন এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি দেব-দেবীরা পর্যন্ত তাঁকে জানতে পারেন না, সুতরাং আধুনিক যুগের তথাকথিত পণ্ডিতদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে? ভগবানের কৃপায় অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তিনি পূর্ণ শুদ্ধ। তাই, আমাদের অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। কারণ, ভগবদগীতাকে তিনিই যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ভগবদগীতার জ্ঞান মানুষ হারিয়ে ফেলে। তাই, অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান সেই পরম্পরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, কারণ অর্জুন হচ্ছেন তাঁর সখা ও পরম ভক্ত। সুতরাং, গীতোপনিষদ ভগবদগীতার প্রস্তাবনায় আমরা বলেছি যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে ভগবদগীতার জ্ঞান আহরণ করা উচিত। পরম্পরা নষ্ট হয়েছিল বলেই অর্জুনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নির্দেশগুলি অর্জুন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবদগীতার যথাযথ অর্থ যদি আমরা উপলব্ধি

করতে চাই, তা হলে আমাদেরও অর্জুনেরই মতো ভগবানের সব কয়টি নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে জানতে পারব।

শ্লোক ১৫

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

স্বয়ম্-স্বয়ং; এব-অবশ্যই; আত্মনা-নিজেই; আত্মানম্-নিজেকে; বেত্থ-জান; ত্বম্-তুমি; পুরুষোত্তম-হে পুরুষোত্তম; ভূতভাবন-হে সর্বভূতের উৎস; ভূতেশ-হে সর্বভূতের ঈশ্বর; দেবদেব-দেবতাদেরও দেবতা; জগৎপতে-হে বিশ্বপালক।

গীতার গান

হে পুরুষোত্তম, তুমি জান তোমার তোমাকে।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥
তোমার বিভূতি যোগ দিব্য সে অশেষ।
যদি কৃপা করি বল বিস্তারি বিশেষ ॥

অনুবাদ

হে পুরুষোত্তম। হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি নিজেই তোমার চিৎ-শক্তির দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ব অবগত আছ।

তাৎপর্য

অর্জুন ও অর্জুনের অনুগামীদের মতো যাঁরা ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা যা ভগবানের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা একটি অত্যন্ত গর্হিত পাপ। সুতরাং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তাদের কখনই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং যেহেতু তা কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান, তা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত, ঠিক যেভাবে অর্জুন তা বুঝেছিলেন। নাস্তিকের কাছ থেকে কখনই ভগবদ্গীতা শোনা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে-

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

পরমতত্ত্বকে তিন রূপে উপলব্ধি করা যায়-নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা এবং সবশেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে। সুতরাং পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধির স্তরেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে পারা যায়। মুক্ত পুরুষ, এমন কি সাধারণ মানুষেরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তবুও তারা ভগবদ্গীতার শ্লোকের মাধ্যমে এই গীতার বক্তা সবিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নাও বুঝতে পারে। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করেন অথবা তাঁর প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তবুও বহু মুক্ত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ বলে বুঝতে পারেন না। তাই, অর্জুন তাঁকে

পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন। তবুও অনেকে এখনও নাও জানতে পারে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা। তাই, অর্জুন তাঁকে ভূতভাবন বলে সম্বোধন করেছেন। আর তাঁকে সর্বজীবের পরম পিতা বলে জানলেও অনেকে তাঁকে পরম নিয়ন্তারূপে নাও জানতে পারে; তাই এখানে তাঁকে ভূতেশ অর্থাৎ সর্বভূতের পরম নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এমন কি কৃষ্ণকে সর্বভূতের পরম নিয়ন্তা বলে জানলেও, অনেকে তাঁকে সমস্ত দেব-দেবীর উৎস বলে নাও জানতে পারে; তাই তাঁকে এখানে দেবদেব অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য দেবতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এমন কি তাঁকে সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য দেবতা বলে জানলেও অনেকে তাঁকে সমস্ত জগতের পতিরূপে নাও জানতে পারেন; তাই তাঁকে জগৎপতে বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এভাবেই অর্জুনের উপলব্ধির মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৬

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

বক্তুম্-বলতে; অর্হসি-সক্ষম; অশেষেণ-বিস্তারিতভাবে; দিব্যাঃ-দিব্য; হি-অবশ্যই; আত্ম-স্বীয়; বিভূতয়ঃ-বিভূতিসকল; যাভিঃ-যে সমস্ত; বিভূতিভিঃ-বিভূতি দ্বারা; লোকান্-লোকসমূহ; ইমান্-এই সমস্ত; ত্বম্-তুমি; ব্যাপ্য-ব্যাপ্ত হয়ে; তিষ্ঠসি-অবস্থান করছ।

গীতার গান

যে যে বিভূতি বলে ভুবন চতুর্দশ।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি সর্বত্র সে যশ ॥
কিভাবে করিয়া চিন্তা তোমার মহিমা।
হে যোগী তোমাকে জানি তাহা সে কহিবা ॥

অনুবাদ

তুমি যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, সেই সমস্ত তোমার দিব্য বিভূতি সকল তুমিই কেবল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি পড়ে প্রতীয়মান হয় যে, অর্জুন যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এগুলির মাধ্যমে মানুষ আর যা কিছু অর্জন করতে পারে, সেই সবের দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ভগবান সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন সংশয় নেই, তবু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন তাঁর সর্বব্যাপ্ত বিভূতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতে। সাধারণ লোকেরা এবং বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীরা প্রধানত পরম-তত্ত্বের সর্বব্যাপ্ত রূপের প্রতিই আগ্রহী। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর বিবিধ শক্তির মাধ্যমে তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপে তিনি কিভাবে বিরাজ করেন। এখানে আমাদের বোঝা উচিত যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নগুলি করেছেন সাধারণ মানুষের হয়ে, তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য।

শ্লোক ১৭

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

কথম্-কিভাবে; বিদ্যাম্ অহম্-আমি জানব; যোগিন্-হে যোগেশ্বর; ত্বাম্-তোমাকে; সদা-সর্বদা; পরিচিন্তয়ন্-চিন্তা করে; কেষু-কোন্ কেষু-কোন; চ-ও; ভাবেযু-ভাবে; চিন্ত্যঃ অসি-চিন্তনীয় হও; ভগবন্ হে পরমেশ্বর ভগবান; ময়া-আমার দ্বারা।

গীতার গান

কিভাবে বুঝিব আমি তোমার সে বৈভব।
কৃপা করি তুমি মোরে কহ সে ভাব ॥

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর! কিভাবে সর্বদা তোমার চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবন্। কোন্ কোন্ বিবিধ আকৃতির মাধ্যমে আমি তোমাকে চিন্তা করব?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন। যে সকল ভক্ত তাঁর চরণে সর্বতোভাবে আত্মত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে দেখতে পারেন। এখন অর্জুনের মনে আর কোন সংশয় নেই যে, তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি জানতে চান কিভাবে সাধারণ মানুষ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে। কোন সাধারণ মানুষ, নাস্তিক ও অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু তবুও অর্জুন আবার এই প্রশ্নগুলি করেছেন তাদেরই মঙ্গলের জন্য। উত্তম ভক্ত কেবল নিজের জানার জন্যই শুধু উৎসাহী নন, সমগ্র মানবজাতি যাতে জানতে পারে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব, তাই অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে তিনি ভগবানের সর্বব্যাপকতার নিগূঢ় রহস্যের আবরণ জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষত যোগী বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগমায়া শক্তির অধীশ্বর। এই যোগমায়ার দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখেন অথবা প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মানুষের ভক্তি নেই, সে শ্রীকৃষ্ণের কথা সব সময়ে চিন্তা করতে পারে না। তাই তাকে জড়-জাগতিক পদ্ধতিতেই চিন্তা করতে হয়। অর্জুন এই জড় জগতের বিষয়াসক্ত মানুষের কথা বিবেচনা করেছেন। কেবু কেষু চ ভাবেষু কথাটি জড়া প্রকৃতিকে উল্লেখ করে (ভাব শব্দটির অর্থ 'জড় বস্তু')। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, তাই এখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জড় বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করে এবং তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই নিজেকে প্রকাশিত করছেন, তা দেখবার চেষ্টা করতে।

শ্লোক ১৮

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

বিস্তরেণ-বিস্তারিতভাবে; আত্মনঃ-তোমার; যোগম্-যোগ; বিভূতিম্-বিভূতি; চ-ও; জনার্দন-হে জনার্দন; ভূয়ঃ-পুনরায়; কথয়-বল; তৃপ্তিঃ-তৃপ্তি; হি-অবশ্যই; শৃণ্বতঃ-শ্রবণ করে; ন অস্তি-হচ্ছে না; মে-আমার; অমৃতম্ উপদেশামৃত।

গীতার গান

হে জনার্দন তোমার যোগ বা বিভূতি।
বিস্তার শুনিতে মন হয়েছে সে অতি ॥
পুনঃ পুনঃ বল যদি তবু তৃপ্ত নয়।
অমৃত তোমার কথা মৃতত্ত্ব না ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন। তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তারিতভাবে পুনরায় আমাকে বল। কারণ তোমার উপদেশামৃত শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না; আমি আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

অনেকটা এই ধরনের কথা, শৌনক মুনির নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সূত গোস্বামীকে বলেছিলেন। সেই বিবৃতিটি হচ্ছে-

বয়ং তুন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃন্নতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥

"উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা নিরন্তর শ্রবণ করলেও কখনও তৃপ্তি লাভ হয় না। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা পদে পদে তাঁর অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১৯) এভাবেই অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিশেষ করে কিভাবে তিনি সর্বব্যাপ্ত ভগবানরূপে বিরাজমান, তা জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।

এখন অমৃত সম্বন্ধে বলতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনা অমৃতময় এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই অমৃত আস্বাদন করা যায়। আধুনিক গল্প, উপন্যাস ও ইতিহাস ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা থেকে ভিন্ন। জাগতিক গল্প-উপন্যাস একবার পড়ার পরেই মানুষ অবসাদ বোধ করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে কখনই ক্লান্তি আসে না। সেই জন্যই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস ভগবানের অবতারসমূহের লীলাকাহিনীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যেমন, পুরাণ হচ্ছে অতীতের ইতিহাস, যাতে রয়েছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবর্ণনা। এভাবেই ভগবানের এই সমস্ত লীলাকাহিনী বার বার পাঠ করলেও নিত্য নব নব রসের আস্বাদন লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ৷ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; হন্ত-হ্যাঁ; তে-তোমাকে; কথয়িষ্যামি-আমি বলব; দিব্যাঃ-দিব্য; হি অবশ্যই; আত্মবিভূতয়ঃ-আমার বিভূতিসমূহ; প্রাধান্যতঃ- যেগুলি প্রধান; কুরুশ্রেষ্ঠ-হে কুরুশ্রেষ্ঠ; নাস্তি-নেই; অন্তঃ-অন্ত; বিস্তরস্য-বিভূতি বিস্তারের; মে-

আমার।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
হে অর্জুন বলি শুন বিভূতি আমার।
যাহার নাহিক অন্ত অনন্ত অপার ॥
প্রধানত বলি কিছু শুন মন দিয়া।
কুরুশ্রেষ্ঠ নিজ শ্রেষ্ঠ বুঝ সে শুনিয়া ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে অর্জুন, আমার দিব্য প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ তোমাকে বলব, কিন্তু আমার বিভূতিসমূহের অন্ত নেই।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব ও তাঁর বিভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র জীবাত্মার ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত এবং তা দিয়ে কৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব। তবুও ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের সেই প্রয়াস এই রকম নয় যে, কোন বিশেষ সময়ে অথবা জীবনের কোন বিশেষ স্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত আলোচনা এতই আস্বাদনীয় যে, তা ভক্তদের কাছে অমৃতবৎ প্রতিভাত হয়। এভাবেই ভক্তেরা তা উপভোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা আলোচনা করে শুদ্ধ ভক্তেরা দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই, তাঁরা নিরন্তর তা শ্রবণ ও কীর্তন করতে চান। শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, জীবেরা তাঁর বিভূতির কূল-কিনারা পায় না। তাই, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মুখ্য প্রকাশগুলি কেবল বর্ণনা করতে সম্মত হয়েছেন। প্রাধান্যতঃ ('প্রধান') কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা কেবল ভগবানের শক্তির কয়েকটি মুখ্য প্রকাশই কেবল অনুভব করতে পারি, কেন না তাঁর শক্তিবৈচিত্র্য অনন্ত। সেই অনন্ত শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই শ্লোকে ব্যবহৃত বিভূতি বলতে উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অমরকোষ অভিধানে বিভূতি শব্দের অর্থে বলা হয়েছে 'অসাধারণ ঐশ্বর্য'।
নির্বিশেষবাদীরা অথবা সর্বেশ্বরবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের অসাধারণ বিভূতি ও তাঁর দিব্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারে না। জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেই ভগবানের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, একজন সাধারণ মানুষও কিভাবে তা অনুভব করতে পারে। এভাবেই ভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিকে কেবল আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২০

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অহম্-আমি; আত্মা-আত্মা; গুড়াকেশ-হে অর্জুন; সর্বভূত-সমস্ত জীবের; আশয়স্থিতঃ-হৃদয়ে অবস্থিত; অহম্-আমি; আদিঃ-আদি; চ-ও; মধ্যম্ মধ্য; চ-ও; ভূতানাম্-সমস্ত জীবের; অন্তঃ-অন্ত; এব-অবশ্যই; চ-এবং।

গীতার গান

সর্বভূত আশ্রয় সে আমি গুড়াকেশ।
আমি আদি আমি মধ্য আমি সেই শেষ ॥

অনুবাদ

হে গুড়াকেশ। আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ 'যিনি নিদ্রারূপী তামসকে জয় করেছেন'। যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিদ্রিত, তারা কখনই জানতে পারে না, পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে বিবিধ প্রকারে জড় ও চিন্ময় জগতে নিজেকে। প্রকাশ করেন। তাই, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের এভাবে সম্বোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন যেহেতু এই তামসের অতীত, তাই পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বিভিন্ন বিভূতির কথা শোনাতে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে জ্ঞাপন করেছেন যে, তাঁর মুখ্য বিস্তারের মাধ্যমে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের আত্মা। সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে স্বাংশ পুরুষ অবতার রূপে প্রকাশিত করেন এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়। তাই, তিনি হচ্ছেন মহৎ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির আত্মা। সমগ্র জড় শক্তি সৃষ্টির কারণ নয়, প্রকৃতপক্ষে মহাবিষ্ণু মহৎ-তত্ত্ব বা সমগ্র জড় শক্তিতে প্রবেশ করেন। তিনি হচ্ছেন আত্মা। মহাবিষ্ণুর যখন প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি আবার প্রতিটি সত্তার অন্তরে পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, চিন্ময় স্ফুলিঙ্গের উপস্থিতির ফলেই জীবের এই জড় দেহ সক্রিয় হয়। এই চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ ব্যতীত দেহের কোন রকম বিকাশ হতে পারে না। তেমনই, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ না করা পর্যন্ত জড় জগতের কোন রকম বিকাশ হতে পারে না। সুবল উপনিষদে বর্ণনা দেওয়া আছে, প্রকৃত্যাদিসর্বভূতান্তর্যামী সর্বশেষী চ নারায়ণঃ- "পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরমাত্মা রূপে সব কয়টি প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডেই বিরাজমান।"

শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটি পুরুষ অবতারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি আবার সাত্বত-তন্ত্রেও বর্ণিত আছে। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ-"পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই জড় জগতে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু-এই তিন রূপে নিজেকে প্রকটিত করেন।" ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) মহাবিষ্ণু বা কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর বর্ণনা আছে। যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাম্-সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু রূপে কারণ-সমুদ্রে শায়িত থাকেন। সুতরাং পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব, প্রকটিত বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা এবং সমগ্র শক্তির সংহারকর্তা।

শ্লোক ২১

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

আদিত্যানাম্-আদিত্যদের মধ্যে; অহম্-আমি; বিষ্ণুঃ-বিষ্ণু; জ্যোতিষাম্-জ্যোতিষ্কদের

মধ্যে; রবিঃ-সূর্য; অংশুমান্-কিরণশালী; মরীচিঃ-মরীচি; মরুতাম্-মরুতদের মধ্যে; অস্মি হই; নক্ষত্রাণাম্ নক্ষত্রদের মধ্যে; অহম্-আমি; শশী-চন্দ্র।

গীতার গান

আদিত্যগণের বিষ্ণু জ্যোতিষে সে সূর্য।
মরীচি মরুৎগণে শশী তারাচর্য ॥

অনুবাদ

আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

তাৎপর্য

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান। আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য হল মুখ্য। ব্রহ্মসংহিতায় সূর্যকে ভগবানের একটি উজ্জ্বল চোখরূপে গণ্য করা হয়েছে। অন্তরীক্ষে পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এবং এগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা মরীচি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

অসংখ্য নক্ষত্রদের ভিতর রাত্রিবেলায় চন্দ্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট উজ্জ্বল এবং এভাবেই চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। এই শ্লোক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রও একটি নক্ষত্র; তাই যে সমস্ত নক্ষত্র আকাশে ঝলমল করে, সেগুলিতেও সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি সূর্য রয়েছে, তা বৈদিক শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সূর্য একটিই এবং সূর্যের প্রতিফলনের দ্বারা যেমন চন্দ্র আলোকিত হয়, সেই রকম নক্ষত্রগুলিও আলোকিত হয়। যেহেতু ভগবদ্গীতা এখানে নির্দেশ করছে যে, নক্ষত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রও একটি নক্ষত্র, তাই যে সমস্ত নক্ষত্র বঝলমল করছে সেগুলি সূর্য নয়, বরং সেগুলি চন্দ্রেরই মতো নক্ষত্র।

শ্লোক ২২

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

বেদানাম্-সমস্ত বেদের মধ্যে; সামবেদঃ-সামবেদ; অস্মি-হই; দেবানাম্-সমস্ত দেবতাদের মধ্যে; অস্মি হই; বাসবঃ-ইন্দ্র; ইন্দ্রিয়াণাম্ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে; মনঃ-মন; চ-ও; অস্মি-হই; ভূতানাম্-প্রাণীদের মধ্যে; অস্মি-হই; চেতনা-চেতনা।

গীতার গান

বেদ-মধ্যে সামবেদ দেবগণে ইন্দ্র।
ইন্দ্রিয়গণের মন চেতনার কেন্দ্র ॥

অনুবাদ

সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা।

তাৎপর্য

জড় ও চেতনের পার্থক্য হচ্ছে যে, জীবসত্তার মতো জড়ের চেতনা নেই। তাই, চেতন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কখনই চেতনা সৃষ্টি করা যায় না।

শ্লোক ২৩

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

রুদ্রাণাম্ রুদ্রদের মধ্যে; শঙ্করঃ-শিব; চ-ও; অস্মি-হই; বিত্তেশঃ-কুবের; যক্ষরক্ষসাম্-যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে; বসূনাম্-বসুদের মধ্যে; পাবকঃ-অগ্নি; চ-ও; অস্মি হই; মেরুঃ-মেরু; শিখরিণাম্-পর্বতসমূহের মধ্যে; অহম্-আমি।

গীতার গান

রুদ্রদের মধ্যে শিব যক্ষের কুবের।
পাবক সে বসুমধ্যে পর্বতে সুমের ॥

অনুবাদ

রুদ্রদের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতসমূহের মধ্যে আমি সুমেরু।

তাৎপর্য

একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর বা শিব হচ্ছেন প্রধান। তিনি হচ্ছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তমোগুণের নিয়ন্তা এবং ভগবানের গুণাবতার। যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি কুবের হচ্ছেন দেবতাদের সমস্ত ধন-সম্পদের কোষাধ্যক্ষ এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মেরু হচ্ছে একটি সুবিখ্যাত পর্বত, যা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

পুরোধসাম্-পুরোহিতদের মধ্যে; চ-ও; মুখ্যম্-প্রধান; মাম্-আমাকে; বিদ্ধি-জানবে; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; বৃহস্পতিম্-বৃহস্পতি; সেনানীনাম্-সেনাপতিদের মধ্যে; অহম্-আমি; স্কন্দঃ-কার্তিকেয়; সরসাম্-সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে; অস্মি-হই; সাগরঃ-সাগর।

গীতার গান

পুরোহিতগণ মধ্যে হই বৃহস্পতি।
সেনানীর মধ্যে স্কন্দ সাগর জলেতি ॥

অনুবাদ

হে পার্থ। পুরোহিতদের মধ্যে আমি প্রধান বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর।

তাৎপর্য

স্বর্গরাজ্যের প্রধান দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র এবং তাঁকে স্বর্গের রাজা বলা হয়। তাঁর শাসনাধীন গ্রহলোককে ইন্দ্রলোক বলা হয়। বৃহস্পতি হচ্ছেন ইন্দ্রের পুরোহিত এবং ইন্দ্র যেহেতু সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, সেই জন্য বৃহস্পতি হচ্ছেন সমস্ত পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান। আর ইন্দ্র যেমন সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, তেমনই শিব-পার্বতীর পুত্র স্কন্দও সমগ্র সেনাবর্গের মধ্যে প্রধান। আর সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্রই হচ্ছে প্রধান।

শ্রীকৃষ্ণের এই অভিব্যক্তিগুলি তাঁর মাহাত্ম্যকেই ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ২৫

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষীণাম্-মহর্ষিদের মধ্যে, ভৃগুঃ ভৃগু; অহম্-আমি; গিরাম্-বাক্যসমূহের মধ্যে; অস্মি-হই; একম্ অক্ষরম্-এক অক্ষর প্রণব; যজ্ঞানাম্-যজ্ঞসমূহের মধ্যে; জপযজ্ঞঃ-জপযজ্ঞ; অস্মি-হই; স্থাবরাণাম্ স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে; হিমালয়ঃ -হিমালয় পর্বত।

গীতার গান

মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু আমি হই।
ওঙ্কার প্রণব আমি একাক্ষর সেই ॥
যজ্ঞ যত হয় তার মধ্যে আমি জপ।
অচলেতে হিমালয় স্থাবর যে সব ॥

অনুবাদ

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি ওঁকার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মা বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টির জন্য কয়েকজন সন্তান সৃষ্টি করেন। তাঁর সেই সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সন্তান হচ্ছেন মহান ঋষি ভৃগু। সমস্ত অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে ওঁ (ওঁকার) শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, কারণ এই মহামন্ত্র হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কখনও কখনও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হিংসার কোন স্থান নেই। এটি সবচেয়ে সরল ও পবিত্রতম যজ্ঞানুষ্ঠান। জগতে যা কিছু পরম মহিমান্বিত, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতীক। তাই, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় তাঁরই প্রতীক। পূর্ববর্তী শ্লোকে মেরু পর্বতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মেরু পর্বত কখনও কখনও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে, কিন্তু হিমালয় অচল। এভাবেই হিমালয়ের মাহাত্ম্য মেরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৬

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বত্থঃ-অশ্বত্থ বৃক্ষ, সর্ববৃক্ষাণাম্ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে; দেবর্ষীণাম্ দেবর্ষিদের মধ্যে; চ-এবং; নারদঃ-নারদ মুনি; গন্ধর্বাণাম্ গন্ধর্বদের মধ্যে; চিত্ররথঃ-চিত্ররথ; সিদ্ধানাম্-সিদ্ধদের মধ্যে;

কপিলঃ মুনিঃ-কপিল মুনি।

গীতার গান

সর্ব বৃক্ষ মধ্যে হই অশ্বত্থ বিশাল।
দেবর্ষির মধ্যে নাম নারদ আমার ॥
গন্ধর্বের চিত্ররথ সিদ্ধের কপিল।
মুনিগণের মধ্যে সে সর্বত জটিল ॥

অনুবাদ

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ। গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

তাৎপর্য

অশ্বথ বৃক্ষ হচ্ছে গাছের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল ও সবচেয়ে সুন্দর। ভারতবাসীরা প্রতিদিন সকালে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করে থাকেন। দেবতাদের মধ্যে দেবর্ষি নারদকেও তাঁরা পূজা করে থাকেন এবং তাঁকে এই জগতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য করা হয়। এভাবেই নারদ হচ্ছেন ভগবানের ভক্তরূপী প্রকাশ। গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী এবং তাঁদের মধ্যে চিত্ররথ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। সিদ্ধদের মধ্যে দেবহূতিনন্দন কপিলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার বলা হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর দর্শনের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে আর একজন কপিল খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তবে তাঁর প্রবর্তিত দর্শন নাস্তিক মতবাদ-প্রসূত। তাই ভগবৎ অবতার কপিল এবং এই নাস্তিক কপিলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

শ্লোক ২৭

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসম্-উচ্চৈঃশ্রবা; অশ্বানাম্-অশ্বদের মধ্যে; বিদ্ধি-জানবে; মাম্-আমাকে; অমৃতোদ্ভবম্-সমুদ্র-মন্থনের সময় উদ্ভূত; ঐরাবতম্ ঐরাবত; গজেন্দ্রাণাম্-শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে; নরাণাম্-মানুষদের মধ্যে; চ-এবং; নরাধিপম্-রাজা।

গীতার গান

অশ্বদের মধ্যে হই উচ্চৈঃশ্রবা নাম ।
সমুদ্র মন্থনে সে হয় মোর ধাম ॥
গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত হই।
সম্রাটগণের মধ্যে মনুষ্যেতে সেই ॥

অনুবাদ

অশ্বদের মধ্যে আমাকে সমুদ্র-মন্থনের সময় উদ্ভুত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে। শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যদের মধ্যে আমি সম্রাট।

তাৎপর্য

একবার ভগবদ্ভক্ত দেবতা ও ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরেরা সমুদ্র-মন্থনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মন্থনের ফলে অমৃত ও বিষ উত্থিত হয়েছিল এবং দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ পান করে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন। অমৃতের থেকে অনেক জীব উৎপন্ন

হয়েছিল। উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ও ঐরাবত নামক হস্তী এই অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যেহেতু এই দুটি পশু অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই তাঁদের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এবং সেই জন্য তাঁরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।
মনুষ্যদের মধ্যে রাজা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জগতের পালনকর্তা এবং দৈব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার ফলে রাজারা তাঁদের রাজ্যের পালনকর্তা রূপে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো নরপতিরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বৈদিক শাস্ত্রে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে, ধর্মনীতি কলুষিত হয়ে যাওয়ার ফলে রাজতন্ত্র ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি অনস্বীকার্য যে, পুরাকালে ধর্মপরায়ণ রাজার তত্ত্বাবধানে প্রজারা অত্যন্ত সুখে বসবাস করত।

শ্লোক ২৮-২৯

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ৷ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

আয়ুধানাম্-সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে; অহম্-আমি; বজ্রম্-বজ্র; ধেনূনাম্-গাভীদের মধ্যে; অস্মি-হই; কামধুক্- কামধেনু; প্রজনঃ-সন্তান উৎপাদনের কারণ; চ-এবং; অস্মি-হই; কন্দর্পঃ-কামদেব; সর্পাণাম্ সর্পদের মধ্যে; অস্মি-হই; বাসুকি বাসুকি; অনন্তঃ-অনন্ত; চ-ও; অস্মি-হই; নাগানাম্-নাগদের মধ্যে; বরুণঃ-বরুণদেব; যাদসাম্-সমস্ত জলচরের মধ্যে; অহম্-আমি; পিতৃণাম্-পিতৃদের মধ্যে; অর্যমা-অর্যমা; চ-ও; অস্মি-হই; যমঃ-যমরাজ; সংযমতাম্-দণ্ডদাতাদের মধ্যে; অহম্-আমি।

গীতার গান

অস্ত্রের মধ্যেতে বজ্র ধেনু কামধেনু।
উৎপত্তির কন্দর্প হই কামতনু ॥
সর্পগণের মধ্যেতে আমি সে বাসুকি ।
অনন্ত সে নাগগণে বরুণ যাদসি ॥
পিতৃদেব মধ্যে আমি হই সে অর্যমা ॥
যমরাজ আমি সেই মধ্যেতে সংযমা।

অনুবাদ

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু। সন্তান উৎপাদনের কারণ আমিই কামদেব এবং সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি। সমস্ত নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত এবং জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ। পিতৃদের মধ্যে আমি অর্যমা এবং দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই অসীম শক্তিশালী অস্ত্র বজ্র শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। চিন্ময় জগতে কৃষ্ণলোকে গাভীদের যে কোন সময় দোহন করলেই যত পরিমাণ ইচ্ছা তত পরিমাণ দুধ

পাওয়া যায়। জড় জগতে অবশ্য এই ধরনের গাভী দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বহু গাভী রয়েছে এবং এই সমস্ত গাভীদের বলা হয় সুরভী। বর্ণিত আছে যে, গোচারণে ভগবান নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কন্দর্প হচ্ছেন কামদেব, যাঁর প্রভাবে সুসন্তান উৎপন্ন হয়। তাই কন্দর্প হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে কাম তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু সুসন্তান উৎপাদনের জন্য যে কাম, তাই হচ্ছেন কন্দর্প এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করেন।
বহু ফণাধারী নাগদের মধ্যে অনন্ত হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ এবং জলচরদের মধ্যে বরুণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। তাঁরা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পিতৃ বা পূর্বপুরুষদেরও একটি গ্রহলোক আছে এবং সেই গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতা হচ্ছেন অর্যমা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। পাপীদের যাঁরা দণ্ড দেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন যমরাজ। এই পৃথিবীর নিকটেই যমালয় অবস্থিত। মৃত্যুর পর পাপীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যমরাজ তাদের নানাভাবে শাস্তি দেন।

শ্লোক ৩০

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

প্রহ্লাদঃ-প্রহ্লাদ; চ-ও; অস্মি হই; দৈত্যানাম্ দৈত্যদের মধ্যে; কালঃ-কাল। কলয়তাম্-বশীকারীদের মধ্যে; অহম্-আমি; মৃগাণাম্-সমস্ত পশুদের মধ্যে। চ-এবং, মৃগেন্দ্রঃ-সিংহ; অহম্-আমি; বৈনতেয়ঃ-গরুড়; চ-ও, পক্ষিণামদ-পক্ষীদের মধ্যে।

গীতার গান

দৈত্যদের প্রহ্লাদ সে ভক্তির পিপাসী।
বশীদের মধ্যে আমি কাল মহাবশী ॥
মৃগদের মধ্যে সিংহ আমি হয়ে থাকি।
পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড় সে পক্ষী ॥

অনুবাদ

দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়।

তাৎপর্য

দিতি ও অদিতি দুই ভগ্নী। অদিতির পুত্রদের বলা হয় আদিত্য এবং দিতির পুত্রদের বলা হয় দৈত্য। সমস্ত আদিত্যেরা ভগবানের ভক্ত, আর সমস্ত দৈত্যেরা নাস্তিক। যদিও প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শৈশব থেকে তিনি ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাঁর ভক্তি ও দৈব গুণাবলীর জন্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা হয়।
নানা ধরনের বশীভূতকরণ নিয়ম আছে, কিন্তু কাল এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই পরাস্ত করে এবং তাই কাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। জন্তুদের মধ্যে সিংহ হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিংস্র। সমগ্র পক্ষীকুলের মধ্যে শ্রীবিযুক্তর বাহক গরুড় হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৩১

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

পবনঃ-বায়ু; পবতাম্-পবিত্রকারীদের মধ্যে; অস্মি-হই; রামঃ-পরশুরাম; শস্ত্রভৃতাম্-শস্ত্রধারীদের মধ্যে; অহম্-আমি; ঝষাণাম্-মৎস্যদের মধ্যে; মকরঃ -মকর; চ-ও; অস্মি-হই; স্রোতসাম্-নদীসমূহের মধ্যে; অস্মি-হই; জাহ্নবী-গঙ্গা।

গীতার গান

বেগবান মধ্যে আমি হই সে পবন ।
শস্ত্রধারী মধ্যে সে আমি পরশুরাম ॥
জলচর মধ্যে আমি হয়েছি মকর ।
জাহ্নবী আমার নাম মধ্যে নদীবর ।

অনুবাদ

পবিত্রকারী বস্তুদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা।

তাৎপর্য

সমগ্র জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর হচ্ছে বৃহত্তম এবং মানুষের কাছে দারুণ ভয়ঙ্কর। এভাবেই মকর শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

শ্লোক ৩২

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

সর্গাণাম্ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; আদিঃ-আদি; অন্তঃ-অন্ত; চ-এবং; মধ্যম-মধ্য; চ-ও; এব-অবশ্যই; অহম্-আমি; অর্জুন-হে অর্জুন; অধ্যাত্মবিদ্যা-চিন্ময় জ্ঞান; বিদ্যানাম্-সমস্ত বিদ্যার মধ্যে; বাদঃ- সিদ্ধান্তবাদ; প্রবদতাম্-তার্কিকদের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে; অহম্-আমি।

গীতার গান

যত সৃষ্ট বস্তু তার আদি মধ্য অন্ত।
হে অর্জুন দেখ মোর ঐশ্বর্য অনন্ত ॥
যত বিদ্যা হয় তার মধ্যে আত্মজ্ঞান।
আমি সে সিদ্ধান্ত মধ্যে যত বাদীগণ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকদের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি সিদ্ধান্তবাদ।

তাৎপর্য

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমগ্র জড় উপাদান প্রথম সৃষ্টি হয়। পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এই জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কার্য করেন এবং তারপর পুনরায় সৃষ্টির প্রলয় সাধন করেন শিব। ব্রহ্মা হচ্ছেন গৌণ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি,

স্থিতি ও প্রলয়ের এই সমস্ত প্রতিনিধিরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার। তাই, তিনি হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত।
উন্নতমানের শিক্ষার জন্য জ্ঞানের বহুবিধ গ্রন্থ আছে, যেমন চতুর্বেদ, তাদের অন্তর্ভুক্ত ষড়দর্শন, বেদান্ত-সূত্র, ন্যায় শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ। সুতরাং, শিক্ষামূলক গ্রন্থের সর্বসমেত চতুর্দশটি বিভাগ রয়েছে। এগুলির মধ্যে যেই গ্রন্থটি অধ্যাত্মবিদ্যা বা পারমার্থিক জ্ঞান পরিবেশন করছে, বিশেষ করে বেদান্ত-সূত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।
ন্যায় শাস্ত্রে তার্কিকদের মধ্যে তর্কের বিভিন্ন স্তর আছে। বাদী-প্রতিবাদীর যুক্তিতর্কের সমর্থনে সাক্ষ্য বা প্রামাণিক তথ্যকে বলা হয় 'জল্প'। পরস্পরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'বিতণ্ডা' এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বলা হয় 'বাদ'। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

শ্লোক ৩৩

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দুঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরাণাম্-সমস্ত অক্ষরের মধ্যে; অকারঃ-অকার; অস্মি-হই; দ্বন্দুঃ-দ্বন্দ্ব; সামাসিকস্য-সমাসসমূহের মধ্যে; চ-এবং; অহম্-আমি; এব-অবশ্যই; অক্ষয়ঃ-নিত্য; কালঃ-কাল; ধাতা-স্রষ্টা; অহম্-আমি; বিশ্বতোমুখঃ-ব্রহ্মা।

গীতার গান

অক্ষরের মধ্যে আমি 'অ'কার সে হই।
সমাসের দ্বন্দু আমি কিন্তু দ্বন্দু নই ।
স্রষ্টাগণে আমি ব্রহ্মা ধ্বংসে মহাকাল।
রুদ্র নাম ধরি আমি সংহারী বিশাল ॥

অনুবাদ

সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দু-সমাস, সংহারকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র এবং স্রষ্টাদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অকার হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের প্রথম অক্ষর। অকার ছাড়া কোন শব্দের উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাই অকার হচ্ছে শব্দের সূত্রপাত। সংস্কৃতে একাধিক শব্দের সমন্বয় হয়, যেমন রাম-কৃষ্ণ একে বলা হয় দ্বন্দ্ব। রাম ও কৃষ্ণ এই দুটি শব্দেরই ছন্দরূপ এক রকম, তাই তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়।
সমস্ত বিনাশকারীদের মধ্যে কাল হচ্ছেন চরম শ্রেষ্ঠ, কারণ কালের প্রভাবে সকলেরই বিনাশ হয়। কাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ কালক্রমে এক মহা অগ্নি-প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।
সমস্ত স্রষ্টা জীবদের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মাই হচ্ছেন প্রধান। তাই, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৪

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

মৃত্যুঃ-মৃত্যু; সর্বহরঃ-সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে; চ-ও; অহম্-আমি; উদ্ভবঃ -উদ্ভব; চ-ও; ভবিষ্যতাম্-ভবিষ্যতের; কীর্তিঃ কীর্তি; শ্রীঃ-ঐশ্বর্য অথবা সৌন্দর্য; বাক্-বাণী; চ-ও; নারীণাম্ নারীদের মধ্যে; স্মৃতিঃ-স্মৃতি; মেধা-মেধা; ধৃতিঃ-ধৃতি; ক্ষমা-ক্ষমা।

গীতার গান

হরণের মধ্যে আমি মৃত্যু সর্বহর ।
ভবিষ্য যে হয় আমি উদ্ভব আকর ॥
নারীদের মধ্যে আমি শ্রী বাণী স্মৃতি।
কীর্তি, মেধা, ক্ষমা মূর্তি অথবা সে ধৃতি ॥

অনুবাদ

সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু, ভাবীকালের বস্তুসমূহের মধ্যে আমি উদ্ভব। নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

তাৎপর্য

জন্মের পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। এভাবেই মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি প্রাণীকে গ্রাস করে চলেছে, কিন্তু তার শেষ আঘাতকে মৃত্যু বলে সম্বোধন করা হয়। এই মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিটি প্রাণীকেই ছয়টি মুখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাদের জন্ম হয়, তাদের বৃদ্ধি হয়, কিছু কালের জন্য তারা স্থায়ী হয়, তারা প্রজনন করে, তাদের হ্রাস হয় এবং অবশেষে তাদের বিনাশ হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গর্ভ থেকে সন্তানের প্রসব এবং তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। এই উদ্ভবই হচ্ছে ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপের আদি উৎস।

এখানে যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা-এই সাতটি ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। কোন ব্যক্তি যখন এই ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে সব কয়টি বা কয়েকটি ধারণ করেন, তখন তিনি মহিমান্বিতা হন। কোন মানুষ যখন ধার্মিক ব্যক্তিরূপে বিখ্যাত হন, তখন সেটি তাঁকে মহিমান্বিত করে। সংস্কৃত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভাষা, তাই তা অতি মহিমান্বিত। কোন কিছু পাঠ করার পরেই কেউ যখন তা মনে রাখতে পারে, সেই বিশেষ গুণকে বলা হয় স্মৃতি। আর যে সামর্থ্যের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ কেবল অধ্যয়ন করাই নয়, সেই সঙ্গে সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করা, তাকে বলা হয় মেধা এবং এটিও একটি বিভূতি। যে সামর্থ্যের দ্বারা অস্থিরতাকে দমন করা যায়, তাকে বলা হয় ধৃতি। আর কেউ যখন সম্পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন, তবুও বিনয়ী ও ভদ্র এবং কেউ যখন সুখ ও দুঃখ উভয় সময়ে ভারসাম্যতা রক্ষা করতে সক্ষম, তাঁর সেই ঐশ্বর্যকে বলা হয় ক্ষমা।

শ্লোক ৩৫

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

বৃহৎসাম-বৃহৎসাম; তথা-ও; সান্নাম্-সামবেদের মধ্যে; গায়ত্রী-গায়ত্রী মন্ত্র; ছন্দসাম্-ছন্দসমূহের মধ্যে; অহম্-আমি; মাসানাম্-মাসসমূহের মধ্যে; মার্গশীর্ষঃ -অগ্রহায়ণ; অহম্-আমি; ঋতুনাম্-সমস্ত ঋতুর মধ্যে; কুসুমাকরঃ-বসন্ত।

গীতার গান

সামবেদ মধ্যে আমি বৃহৎ সে সাম।
ছন্দ যত তার মধ্যে গায়ত্রী সে নাম ॥
মাসগণে আমি হই সে অগ্রহায়ণ।
বসন্ত নাম মোর মধ্যে ঋতুগণ ॥

অনুবাদ

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম এবং ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদের মধ্যে আমি বসন্ত।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্বেই বলেছেন যে, সমস্ত বেদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সামবেদ। সামবেদ বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা গীত অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই সঙ্গীতগুলির একটিকে বলা হয় বৃহৎসাম, যার সুর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত এবং মধ্যরাত্রে গীত হওয়ার রীতি। সংস্কৃত ভাষায় কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ করার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। ছন্দ ও মাত্রা আধুনিক কবিতার মতো খামখেয়ালীভাবে লেখা হয় না। সুসংবদ্ধ কবিতার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যা সুযোগ্য ব্রাহ্মণেরা গেয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তাই তা হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। অধ্যাত্মমার্গে বিশেষভাবে উন্নত মানুষদের জন্যই গায়ত্রী মন্ত্র এবং কেউ যদি এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারেন। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে, প্রথমে জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির গুণ অর্জন করা প্রয়োজন। বৈদিক সভ্যতায় গায়ত্রী মন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁকে ব্রহ্মের শব্দ অবতার বলে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন এর প্রবর্তক এবং এই মন্ত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তাঁর থেকে নেমে এসেছে।

সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য করা হয়। কারণ, ভারতবর্ষে এই সময়ে ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করা হয় এবং তাই জনসাধারণ সকলেই এই সময় গভীর সুখে মগ্ন থাকে। অবশ্যই বসন্ত এমনই একটি ঋতু যে, সকলেই তা পছন্দ করে, কারণ বসন্ত ঋতু নাতিশীতোষ্ণ এবং এই সময় গাছপালা ফুলে-ফলে শোভিত হয়। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহকে স্মরণ করে অনেক মহোৎসব উদযাপিত হয়; তাই বসন্ত ঋতুকে সর্বাপেক্ষা আনন্দোজ্জ্বল ঋতু বলে গণ্য করা হয় এবং এই ঋতুরাজ বসন্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৬

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্যূতম্-দ্যূতক্রীড়া; ছলয়তাম্-বঞ্চনাকারীদের মধ্যে; অস্মি হই; তেজঃ-তেজ; তেজস্বিনাম্-

তেজস্বীদের মধ্যে; অহম্-আমি; জয়ঃ-জয়; অস্মি-হই; ব্যবসায়ঃ -উদ্যম; অস্মি-হই; সত্ত্বম্বল; সত্ত্ববতাম্-বলবানদের মধ্যে; অহম্-আমি।

গীতার গান

বঞ্চনার মধ্যে আমি হই দ্যূতক্রীড়া।
তেজস্বীগণের মধ্যে আমি তেজবীরা ॥
উদ্যমের মধ্যে হই আমি সে বিজয়।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি হই ব্যবসায় ॥
বলবান মধ্যে আমি হয়ে থাকি বল।
আমার বিভূতি এই বুঝহ সকল ॥

অনুবাদ

সমস্ত বঞ্চনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ। আমি বিজয়, আমি উদ্যম এবং বলবানদের মধ্যে আমি বল।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে নানা রকম প্রবঞ্চনাকারী আছে। সব রকম প্রবঞ্চনার মধ্যে দ্যূতক্রীড়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, তাই তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পরমেশ্বর রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কোন মানুষের থেকেও অনেক বড় প্রবঞ্চক হতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি কাউকে প্রতারণা করতে চান, তা হলে কেউই তাঁকে এড়াতে পারেন না। ভগবান সব ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ, এমন কি প্রতারণাতেও। বিজয়ীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন জয়। তিনি হচ্ছেন তেজস্বীর তেজ। উদ্যমী ও অধ্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট উদ্যমী ও অধ্যবসায়ী। দুঃসাহসীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী এবং বলবানের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বলশালী। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁর মতো শক্তিশালী কেউই ছিল না। এমন কি তাঁর শৈশবেই তিনি গিরি-গোবর্ধন তুলেছিলেন। তাঁর মতো প্রবঞ্চক কেউ ছিল না, তাঁর মতো তেজস্বী কেউ ছিল না, তাঁর মতো বিজয়ী কেউ ছিল না, তাঁর মতো উদ্যমী কেউ ছিল না এবং তাঁর মতো বলবানও কেউ ছিল না।

শ্লোক ৩৭

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃষীনাম্-বৃষ্ণিদের মধ্যে; বাসুদেবঃ-দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ; অস্মি-হই; পাণ্ডবানাম্-পাণ্ডবদের মধ্যে, ধনঞ্জয়ঃ-অর্জুন; মুনীনাম্-মুনীদের মধ্যে; অপি-ও; অহম্-আমি; ব্যাসঃ-ব্যাসদেব; কবীনাম্-মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে; উশনাঃ-শুক্র; কবিঃ-কবি।

গীতার গান

বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব হই।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি জান ধনঞ্জয় ॥
মুনিদের মধ্যে ব্যাস কবি শুক্রাচার্য।
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি সেই আর্য ॥

অনুবাদ

বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন। মুনিদের মধ্যে আমি

ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তার সাক্ষাৎ কায়ব্যূহ হচ্ছেন বাসুদেব। বাসুদেবের অর্থ হচ্ছে বসুদেবের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েই বসুদেবের সন্তানরূপে অবতরণ করেন।

পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে অর্জুন ধনঞ্জয়রূপে বিখ্যাত। তিনি হচ্ছেন নরশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী মুনি অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ কলিযুগের জনসাধারণকে বৈদিক জ্ঞান দান করার মানসে তিনি বেদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাসদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের অবতার; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। কবি তাঁদের বলা হয়, যাঁরা যে কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। কবিদের মধ্যে দৈত্যদের কুলগুরু উশনা বা শুক্রাচার্য হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। এভাবেই শুক্রাচার্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির আর এক প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৮

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

দণ্ডঃ-দণ্ড; দময়তাম্-দমনকারীদের মধ্যে; অস্মি-হই; নীতিঃ-নীতি; অস্মি-হই; জিগীষতাম্-জয় অভিলাষকারীদের; মৌনম্-মৌন; চ-এবং; এব-ও; অস্মি-হই; গুহ্যানাম্-গোপনীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে; জ্ঞানম্-জ্ঞান; জ্ঞানবতাম্-জ্ঞানবানদের মধ্যে; অহম্-আমি।

গীতার গান

শাসনকর্তার সেই আমি হই দণ্ড।
ন্যায়াধীশগণ মধ্যে আমি সেই ন্যায্য ॥
গুপ্ত যে বিষয় হয় তার মধ্যে মৌন।
জ্ঞানীদের আমি জ্ঞান আর সব গৌণ ॥

অনুবাদ

দমনকারীদের মধ্যে আমি দণ্ড এবং জয় অভিলাষীদের মধ্যে আমি নীতি। গুহ্য ধর্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদের মধ্যে আমিই জ্ঞান।

তাৎপর্য

শাসন করার যে দণ্ড তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিজয় লাভের প্রচেষ্টা করে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় হচ্ছে নৈতিকতা। শ্রবণ, মনন ও ধ্যান আদি গুপ্ত কার্যকলাপের মধ্যে মৌনতাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মৌনতার মাধ্যমে অতি শীঘ্রই পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়। জ্ঞানী তাঁকে বলা হয়, যিনি জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন অর্থাৎ যিনি ভগবানের উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। এই জ্ঞান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ৩৯

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ-যা; চ-ও; অপি-হতে পারে; সর্বভূতানাম্-সর্বভূতের; বীজম্-বীজ; তৎ-তা; অহম্-আমি; অর্জুন-হে অর্জুন; ন-না; তৎ-তা; অস্তি-হয়; বিনা-ব্যতীত; যৎ-যা; স্যাৎ-অস্তিত্ব, ময়া-আমাকে; ভূতম্ বস্তু; চরাচরম্-স্থাবর ও জঙ্গম।

গীতার গান

সর্বভূতপ্রবাহ বীজ আমি সে অর্জুন।
আমি বিনা চরাচর সকল অগুণ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন। যা সর্বভূতের বীজস্বরূপ তাও আমি, যেহেতু আমাকে ছাড়া স্থাবর ও জঙ্গম কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

সব কিছুরই একটি কারণ আছে এবং সেই কারণ বা প্রকাশের বীজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিনা কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না; তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তি বিনা স্থাবর ও জঙ্গম কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে যা স্থিত নয়, তাকে বলা হয় মায়া, অর্থাৎ 'যা নয়'।

শ্লোক ৪০

নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এয তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

ন-না; অন্তঃ-সীমা; অস্তি-হয়; মম-আমার; দিব্যানাম্-দিব্য; বিভূতীনাম্-বিভূতি-সমূহের; পরন্তপ-হে পরন্তপ; এষঃ-এই সমস্ত; তু-কিন্তু; উদ্দেশতঃ -সংক্ষেপে; প্রোক্তঃ বলা হল; বিভূতেঃ-বিভূতির; বিস্তরঃ-বিস্তার; ময়া-আমার দ্বারা।

গীতার গান

আমার বিভূতি দিব্য নাহি তার অন্ত।
সংক্ষেপে বলিনু সব শুন হে তপন্ত ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি-সমূহের অন্ত নেই। আমি এই সমস্ত বিভূতির বিস্তার সংক্ষেপে বললাম।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যদিও ভগবানের বিভূতি ও শক্তি নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়, তবুও তাঁর বিভূতির কোন অন্ত নেই; তাই ভগবানের সমস্ত বিভূতি ও শক্তি বর্ণনা করা যায় না। অর্জুনের কৌতূহল নিবারণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর অনন্ত বৈভবের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলেন।

শ্লোক ৪১

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ যৎ-যে যে; বিভূতিমৎ-ঐশ্বর্যযুক্ত; সত্ত্বম্-অস্তিত্ব; শ্রীমৎ-সুন্দর; ঊর্জিতম্-মহিমান্বিত; এব-অবশ্যই; বা-অথবা; তৎ তৎ-সেই সমস্ত; এব-অবশ্যই; অবগচ্ছ-অবগত হও; ত্বম্-তুমি; মম-আমার; তেজঃ-তেজের; অংশ-অংশ; সম্ভবম্-সম্ভূত।

গীতার গান

যেখানে বিভূতি সত্তা ঐশ্বর্যাদি বল।
সে সব আমার কৃপা জানিবে সকল ॥
আমার তেজাংশ দ্বারা হয় সে সম্ভব ।
সেখানে আমার সত্তা কর অনুভব ॥

অনুবাদ

ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পন্ন ও বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতেই হোক বা অপ্রাকৃত জগতেই হোক, যা কিছু মহিমান্বিত বা সুন্দর তা সবই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির নিতান্তই আংশিক প্রকাশ মাত্র। যা কিছুই অস্বাভাবিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪২

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

অথবা অথবা; বহুনা-বহু, এতেন-এই প্রকার; কিম্-কি; জ্ঞাতেন-জ্ঞান দ্বারা। তৰ-তোমার; অর্জুন-হে অর্জুন; বিষ্টভ্য-ব্যাপ্ত হয়ে; অহম্-আমি; ইদম্-এই; কৃৎস্নম্-সমগ্র; এক-এক; অংশেন-অংশের দ্বারা; স্থিতঃ-অবস্থিত; জগৎ-জগৎ।

গীতার গান

অধিক কি বলি অর্জুন সংক্ষেপে শুন।
আমি সে প্রবিষ্ট হই সর্বশক্তি গুণ ॥
জগতে সর্বত্র থাকি আমার একাংশে।
সত্যবৎ জড় মায়া তাই সে প্রকাশে ।

অনুবাদ

হে অর্জুন! অথবা এই প্রকার বহু জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বভূতে পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট হয়ে এই জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, এই জগতের কোন কিছুরই নিজস্ব কোন ঐশ্বর্য

নেই, তাই তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্বন্ধে অবগত হয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের জানতে হবে যে, সব কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সেগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। মহত্তম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পর্যন্ত সকলেরই অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে, কারণ ভগবান তাদের সকলের অন্তরে বিরাজমান এবং তিনিই তাদের প্রতিপালন করছেন।

অনেকে প্রচার করে থাকে যে, যে-কোন দেব-দেবীর আরাধনা করে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে বা পরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু এখানে দেব-দেবীদের পূজা করতে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ ব্রহ্মাক্ষা ও শিবের মতো শ্রেষ্ঠ দেবতারাও হচ্ছেন ভগবানের অনন্ত বিভূতির অংশ মাত্র। ভগবানই হচ্ছেন সকলের উৎস এবং তাঁর থেকে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। তিনি 'অসমোর্ধ্ব' অর্থাৎ তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেব-দেবীর সমান বলে মনে করে-এমন কি ভগবানকে যদি ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী আদি শ্রেষ্ঠ দেব-দেবীদের সমান বলে মনে করে, তা হলে তখনই সে ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকে পরিণত হয়। কিন্তু, যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার ও বিভূতির বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করি, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারি এবং তার ফলে অনন্য ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় মনকে আমরা স্থির করতে পারি। তাঁর অংশ-প্রকাশরূপে সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার বিস্তারের দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপ্ত। শুদ্ধ ভক্তেরা তাই সর্বতোভাবে ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে তাঁদের মনকে কৃষ্ণচেতনায় কেন্দ্রীভূত করেন। তাই, তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গলাভ করে ভক্তিযোগের পূর্ণতা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বিশদভাবে এই অধ্যায়ে, বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরু-পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত একজন মহান আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই অধ্যায়ের তাৎপর্যের উপসংহারে বলেছেন-

যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্যাদ্যা ভবন্ত্যত্যুগ্রতেজসঃ।
যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণো দশমেহ্যতে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলবান শক্তি থেকে এমন কি শক্তিশালী সূর্য তার শক্তি লাভকরে এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হয়। সেই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আরাধ্য।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য বিষয়ক 'বিভূতি-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায় -বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ৷ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; মদনুগ্রহায়-আমার প্রতি অনুগ্রহ করে; পরমম্-পরম; গুহ্যম্-গোপনীয়; অধ্যাত্ম-অধ্যাত্ম; সংজ্ঞিতম্-বিষয়ক; যৎ-যে; ত্বয়া-তোমার দ্বারা; উক্তম্-উক্ত হয়েছে, বচঃ-বাক্য; তেন তার দ্বারা; মোহঃ-মোহ; অয়ম্-এই; বিগতঃ-দূর হয়েছে; মম-আমার।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
অনুগ্রহ করি মোরে শুনাইলে যাহা।
মোহ নষ্ট হইয়াছে শুনি তত্ত্ব তাহা ॥
সেই সে অধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি গুহ্যতম।
বিগত সন্দেহ হল যত ছিল মম।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি যে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম গুহ্য উপদেশ আমাকে দিয়েছ, তার দ্বারা আমার এই মোহ দূর হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব কারণের পরম কারণ, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র জড় জগতের প্রকাশ হয় মহাবিষ্ণু থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই মহাবিষ্ণুরও উৎস। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন; তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। সেই কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে অর্জুন বলেছেন, তাঁর মোহ নিরসন হয়েছে। অর্থাৎ, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করছেন না, তাঁর বন্ধু বলেও মনে করছেন না; তিনি তাঁকে সমস্ত কিছুর পরম উৎসরূপে দর্শন করছেন। অর্জুন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে তিনি বন্ধুরূপে পেয়েছেন, তা উপলব্ধি করে পরম আনন্দ আস্বাদন করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটিও ভাবছেন যে, তিনি তো শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণরূপে জানতে পারলেন, কিন্তু অন্যেরা তো তাঁকে সেভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য, সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে জানাবার জন্য এই অধ্যায়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন যাতে তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ অতি ভয়ংকর এবং সেই রূপ দর্শনে সকলেই ভীত হয়-যেমন অর্জুন হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময় যে, সেই ভয়ংকর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর তিনি আবার তাঁর আদিরূপ-দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে তত্ত্বজ্ঞান দান করলেন, অর্জুন তা শাশ্বত সত্যরূপে গ্রহণ করলেন। অর্জুনের মঙ্গলের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সব কিছু শোনালেন এবং অর্জুনও তা শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং পরমাত্মা রূপে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

শ্লোক ২

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২॥

ভব-উৎপত্তি; অপ্যয়ৌ-লয়; হি-অবশ্যই; ভূতানাম্-সমস্ত জীবের; শ্রুতৌ-শ্রুত হয়েছে; বিস্তরশঃ-বিস্তারিতভাবে: ময়া-আমার দ্বারা; ত্বত্তঃ- তোমার থেকে, কমলপত্রাক্ষ-হে পদ্মপলাশলোচন; মাহাত্ম্যম্-মাহাত্ম্য; অপি-ও; চ-এবং, অব্যয়ম্-অব্যয়।

গীতার গান

দুই তত্ত্ব শুনিলাম কমল পত্রাক্ষ।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আর নিত্য তত্ত্ব ॥
এই সৃষ্টিমধ্যে যথা তুমি হে পরমেশ্বর।
নিজ রূপ প্রকটিয়া প্রকাশ বিস্তর ॥

অনুবাদ

হে পদ্মপলাশলোচন! সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয় এবং তোমার কাছ থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য অবগত হলাম।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা - "আমি এই সমগ্র জড়-জাগতিক প্রকাশের সৃষ্টির ও লয়ের উৎস, তাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কমলপত্রাক্ষ বলে সম্বোধন করেছেন (কারণ শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে অর্জুন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করেছেন। অর্জুন আরও জানতে পারেন যে, এই বিশ্ব-চরাচরের সব কিছুরই প্রকাশ এবং লয়ের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও ভগবান সব কিছু থেকে পৃথক। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, যদিও তিনি সর্বব্যাপক, কিন্তু তবুও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্রই বিরাজমান থাকেন না। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য, যা অর্জুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ৩

এবমেতদ্ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ।৩।

এবম্-এরূপ; এতৎ-এই; যথা-যথাযথ; আথ-বলেছ, ত্বম্-তুমি; আত্মানম্-নিজেকে; পরমেশ্বর- হে পরমেশ্বর ভগবান, দ্রষ্টুম্-দেখতে; ইচ্ছামি-ইচ্ছা করি; তে-তোমার; রূপম্-রূপ; ঐশ্বরম্ ঐশ্বর্যময়; পুরুষোত্তম-হে পুরুষোত্তম।

গীতার গান

পুরুষোত্তম সে যদি দেখাও আমাকে।
ইচ্ছা মোর দেখিবার যদি শক্তি থাকে ।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর। তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলেছ, যদিও আমার সম্মুখে তোমাকে সেই রূপেই দেখতে পাচ্ছি, তবুও হে পুরুষোত্তম। তুমি যেভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ, আমি তোমার সেই ঐশ্বর্যময় রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

ভগবান বলছেন যে, এই জড় জগতে তিনি স্বাংশ প্রকাশরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন বলেই এই জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং তা বিদ্যমান রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জুন অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু অর্জুনের মনে সংশয় দেখা দিল যে, আগামী দিনের মানুষেরা হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে পারে, তাই তাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করবার জন্য তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন, এই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জগতের অভ্যন্তরে সমস্ত কর্ম পরিচালনা করছেন। এখানে অর্জুন যে পরমেশ্বর ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাই তিনি অর্জুনের অন্তরেও বিরাজমান। সুতরাং, অর্জুনের হৃদয়ের সমস্ত বাসনার কথা তিনি জানতেন এবং তিনি এটিও জানতেন যে, তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার কোন বিশেষ বাসনা অর্জুনের ছিল না। কারণ, তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেই অর্জুন পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, অন্যদের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যই অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাইছিলেন। ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে অর্জুনের আর কোন রকম সন্দেহ ছিল না। তাই, তাঁর নিজের মনের সন্দেহ নিরসন করার জন্য তিনি ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণ আরও জানতেন যে, অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাইছিলেন একটি নীতির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। কারণ, পরবর্তীকালে বহু ভণ্ড নিজেদেরকে ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করবে। সুতরা, মানুষকে সাবধান করতে হবে। তাই অর্জুন শিক্ষা দিয়ে গেলেন, কেউ যদি নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তা হলে সেই দাবির যথার্থতা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন করবার জন্য তাকে বিশ্বরূপ দেখাতে হবে।

শ্লোক ৪

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

মন্যসে-মনে কর; যদি-যদি; তৎ-তা; শক্যম্-সমর্থ; ময়া-আমার দ্বারা; দ্রষ্টুম্-দেখতে; ইতি-এভাবে; প্রভো-হে প্রভু, যোগেশ্বর-হে যোগেশ্বর; ততঃ-তারপর; মে-আমাকে; ত্বম্-তুমি; দর্শয়-দেখাও; আত্মানম্-তোমার স্বরূপ; অব্যয়ম্ নিত্য।

গীতার গান

অতএব তুমি যদি যোগ্য মনে কর।
দেখিবারে বিশ্বরূপ তোমার বিস্তর ॥
যোগেশ্বর তাহা তুমি দেখাও আমারে।
নিবেদন এই মোর কহিনু তোমারে ॥

অনুবাদ

হে প্রভু! তুমি যদি মনে কর যে, আমি তোমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করার যোগ্য, তা হলে হে যোগেশ্বর। আমাকে তোমার সেই নিত্যস্বরূপ দেখাও।

তাৎপর্য

আমাদের জানা উচিত যে, জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না, তাঁর কথা শোনা যায় না, তাঁকে জানা যায় না অথবা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত হলে, তবেই ভগবানকে দর্শন করবার দিব্য দৃষ্টি আমরা লাভ করতে পারি। প্রতিটি জীবই হচ্ছে কেবলমাত্র চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ; তাই তার পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অর্জুন ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। তাই, তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তাঁর কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর না করে, ভগবানের কাছে জীবরূপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেছেন। অর্জুন জানতেন যে, সীমিত জীবের পক্ষে অনন্ত-অসীম ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অসীম যখন কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই কেবল অসীমের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। যোগেশ্বর শব্দটিও এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভগবান অচিন্ত্য শক্তির অধীশ্বর। যদিও তিনি অসীম-অনন্ত, তবুও তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাই, অর্জুন এখানে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ দিচ্ছেন না। অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ না করলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই নিজেকে প্রকাশ করেন না। এভাবেই যাঁরা নিজেদের মানসিক চিন্তাশক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ৷ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; পশ্য-দেখ; মে-আমার; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; রূপাণি-রূপসকল; শতশঃ-শত শত; অথ-ও; সহস্রশঃ-সহস্র সহস্র; নানাবিধানি-নানাবিধ; দিব্যানি-দিব্য; নানা-বিভিন্ন; বর্ণ-বর্ণ; আকৃতীনি-আকৃতি; চ-ও।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:

হে পার্থ আমার রূপ সহস্র সে শত।

এই দেখ নানাবিধ দিব্য ভাল মত ॥

অনেক আকৃতি বর্ণ করহ প্রত্যক্ষ।

সকল আমার সেই হয় যোগৈশ্বর্য ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন-হে পার্থ! নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপসমূহ দর্শন কর।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ যদিও দিব্য, তবুও তাঁর প্রকাশ হয় এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাই তা এই জড় জগতের কালের উপর নির্ভরশীল। জড়া প্রকৃতির যেমন প্রকট হয় এবং অপ্রকট হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপেরও প্রকট হয় এবং অপ্রকট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রকাশের মতো তাঁর এই রূপ পরা প্রকৃতিতে নিত্য বিরাজমান নয়। ভগবানের ভক্তেরা বিশ্বরূপ দর্শনে উৎসাহী নন। কিন্তু অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করবার শক্তি দেন, তখনই কেবল তাঁর এই রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ৷ ৬ ॥

পশ্য-দেখ; আদিত্যান্-অদিতির দ্বাদশ পুত্র; বসূন্-অষ্টবসু; রুদ্রান্-একাদশ রুদ্র; অশ্বিনৌ-অশ্বিনীকুমারদ্বয়; মরুতঃ-ঊনপঞ্চাশ মরুত (বায়ুর দেবতা); তথা-এবং; বহুনি-বহু; অদৃষ্ট-যা তুমি দেখনি; পূর্বাণি-পূর্বে; পশ্য-দেখ; আশ্চর্যাণি-আশ্চর্য; ভারত-হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

আদিত্যাদি বসু রুদ্র অশ্বিনী মরুত।
অদৃষ্ট অপূর্ব সব আশ্চর্য ভারত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুত এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখ।

তাৎপর্য

এমন কি যদিও অর্জুন ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিশেষ জ্ঞানী পুরুষ, তবুও তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানা সম্ভব ছিল না। এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষেরা ভগবানের এই রূপ এবং প্রকাশ সম্বন্ধে আগে কখনও শোনেনি অথবা জানেনি। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই বিস্ময়কর রূপসমূহ প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৭

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ইহ-এই; একস্থম্-একত্রে অবস্থিত; জগৎ-বিশ্ব; কৃৎস্নম্-সমগ্র; পশ্য-দেখ; অদ্য-এক্ষণে; স-সহ; চর-জঙ্গম; অচরম্-স্থাবর; মম-আমার; দেহে-শরীরে; গুড়াকেশ-হে অর্জুন; যৎ-যা কিছু; চ-ও; অন্যৎ-অন্য; দ্রষ্টুম্ দেখতে; ইচ্ছসি-ইচ্ছা কর।

গীতার গান

চরাচর বিশ্বরূপ আমার ভিতর ।
দেখ আজ একস্থানে সব পরাপর ।।
গুড়াকেশ আমি কৃষ্ণ পরাৎপরতত্ত্ব।
দেখ তুমি ভাল করি আমার মহত্ত্ব ।।

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমার এই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা এক্ষণে দর্শন কর।

তাৎপর্য

এক জায়গায় বসে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত বৈজ্ঞানিকেরাও এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে কোথায় কি হচ্ছে তা দেখতে পারেন না। কিন্তু অর্জুনের মতো ভক্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও অংশে যা কিছু বিদ্যমান সবই দেখতে পান। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু যাতে দেখতে পারেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শক্তি প্রদান করেছেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে অর্জুন সব কিছু দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

ন-না; তু-কিন্তু; মাম্-আমাকে; শক্যসে-সক্ষম হবে; দ্রষ্টুম্-দেখতে; অনেন-এই; এব-অবশ্যই; স্বচক্ষুষা-তোমার নিজের চক্ষুর দ্বারা; দিব্যম্ দিব্য; দদামি-প্রদান করছি; তে-তোমাকে; চক্ষুঃচক্ষু, পশ্য-দেখ; মে-আমার; যোগমৈশ্বরম্ অচিন্ত্য যোগশক্তি।

গীতার গান

তুমি শুদ্ধ ভক্ত মোর নহে প্রাকৃত দর্শন।
অতএব দিব্যচক্ষু করি তোমারে অর্পণ ॥
দিব্যচক্ষু সোপাধিক কিন্তু স্থূল নহে।
অপরোক্ষ অনুভূতি সকলে সে কহে ॥

অনুবাদ

কিন্তু তুমি তোমার বর্তমান চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না। তাই, আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। তুমি আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন কর!

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ ছাড়া আর অন্য কোন রূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত দর্শন করতে চান না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে হয় এবং ভক্ত তাঁর মনের দ্বারা দর্শন করেন না, করেন দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য অর্জুনকে তাঁর মনোবৃত্তি পরিবর্তন করার কথা বলা হয়নি, তাঁর দৃষ্টির পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে। তবুও অর্জুন যেহেতু তা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান তাঁর সেই রূপ দর্শনের জন্য যে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন, তা তাঁকে দান করেছিলেন।

যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে ভগবানের প্রেমময় মাধুর্য দ্বারা আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সখা, বান্ধবী, পিতা-মাতা, তাঁরা কেউই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে বলেন না। তাঁরা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে এতই মগ্ন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাও তাঁরা জানেন না। মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমের বিনিময়ের ফলে তাঁরা ভুলে যান যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে সমস্ত বালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেন, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত পুণ্যবান আত্মা এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই সমস্ত বালকেরা জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের খেলার সাথী এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করেন। তাই, শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটি বর্ণনা করেছেন-

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

"ইনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ, যাঁকে মহান মুনি-ঋষিরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে জানেন, ভগবানের ভক্তেরা ভগবানরূপে জানেন এবং সাধারণ মানুষেরা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি বলেই মনে করেন। এখন এই বালকেরা তাঁদের পূর্বজন্মে বহু পুণ্যকর্মের ফলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে খেলা করছেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১২/১১)
আসল কথা হচ্ছে যে, ভক্ত কখনও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু অর্জুন ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন যাতে আগামী দিনের মানুষেরা বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তত্ত্ব কথার মাধ্যমে তাঁর পরম ভগবত্তা প্রতিপন্ন করেননি, তিনি অর্জুনকে তাঁর সেই রূপও দেখিয়েছিলেন, যাতে কারও মনে আর কোন সংশয় না থাকে। অর্জুনকে এই সত্য প্রতিপন্ন করতেই হবে, কারণ তিনি এখন পরম্পরার সূচনা করছেন। যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং সেই জন্য যাঁরা অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, তাঁদের জানা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তত্ত্বগতভাবে তাঁর পরমেশ্বরত্ব প্রমাণ করেননি, তিনি যে পরমেশ্বর তা তিনি বাস্তবিকই দেখিয়েছেন। ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার শক্তি অর্জুনকে দান করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, অর্জুন তাঁর সেই বিশ্বরূপ দর্শনে তেমন আগ্রহী ছিলেন না-সেই কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; এবম্-এভাবে; উক্ত্বা-বলে; ততঃ-তারপর; রাজন্-হে রাজন; মহাযোগেশ্বরঃ-মহান যোগেশ্বর; হরিঃ-পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দর্শয়ামাস-দেখালেন; পার্থায় অর্জুনকে; পরমম্-পরম; রূপম্ ঐশ্বরম্-বিশ্বরূপ।

গীতার গান
সঞ্জয় কহিলেন:
অতঃপর শুন রাজা যোগেশ্বর হরি।
পার্থকে ঐশ্বর্যরূপ দেখাল শ্রীহরি ॥
অনুবাদ
সঞ্জয় বললেন-হে রাজন। এভাবেই বলে, মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন।

শ্লোক ১০-১১

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
অনেক বহু; বক্ত্র-মুখ; নয়নম্-চক্ষু; অনেক বহু; অদ্ভুত-অদ্ভুত, দর্শনম্-দর্শনীয় বস্তু; অনেক বহু; দিব্য-দিব্য; আভরণম্-অলঙ্কার; দিব্য-দিব্য; অনেক-অনেক; উদ্যত-উদ্যত; আয়ুধম্-অস্ত্র; দিব্য-দিব্য; মাল্য-মালা; অম্বরধরম্-বস্ত্র শোভিত; দিব্য-দিব্য; গন্ধ-গন্ধ; অনুলেপনম্-অনুলিপ্ত; সর্ব-সমস্ত; আশ্চর্যময়ম্-আশ্চর্যজনক; দেবম্-দ্যুতিময়; অনন্তম্-অন্তহীন; বিশ্বতোমুখম্-সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।
গীতার গান
অনেক নয়ন বক্ত্র অদ্ভুত দর্শন।
অনেক সে অস্ত্র আর দিব্য আবরণ ॥
দিব্য মালা গন্ধ আর চন্দন লেপন।
সবই আশ্চর্য রূপ বিশ্বের সৃজন ॥
অনুবাদ
অর্জুন সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র ও অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু দেখলেন। সেই রূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল এবং তাঁর শরীর দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী।
তাৎপর্য
এই শ্লোক দুটিতে অনেক শব্দটির বহুবার ব্যবহারের দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের যে সব হস্ত, পদ, মুখ এবং অন্যান্য রূপের অভিপ্রকাশ অর্জুন দেখছিলেন, সেগুলির সংখ্যার কোন সীমা ছিল না। ভগবানের এই প্রকাশগুলি সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অর্জুন এক জায়গায় বসে তা দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল।

শ্লোক ১২

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদযুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

দিবি-আকাশে; সূর্য-সূর্যের; সহস্রস্য-সহস্র; ভবেৎ হয়; যুগপৎ একসঙ্গে; উত্থিতা-সমুদিত; যদি-যদি; ভাঃ-প্রভা; সদৃশী-তুল্য; সা-তা; স্যাৎ হতে পারে; ভাসঃ-প্রভা; তস্য-সেই; মহাত্মনঃ-মহাত্মা বিশ্বরূপের।

গীতার গান

যদি সূর্য দিনে উঠে সহস্র সহস্র।
একত্রে কিরণ বুঝ অনন্ত অজস্র ॥
তাহা হলে কিছু তার অংশ অনুমান।
অন্যথা সে দিব্য তেজ নহেত প্রমাণ ॥

অনুবাদ

যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তা হলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।

তাৎপর্য

অর্জুন যা দর্শন করেছিলেন তা ছিল অবর্ণনীয়, তবুও সঞ্জয় সেই মহান অভিপ্রকাশের মানসিক চিন্তাপ্রসূত ভাবচিত্রটি ধৃতরাষ্ট্রকে দেবার চেষ্টা করছেন। সঞ্জয় বা ধৃতরাষ্ট্র কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ব্যাসদেবের কৃপার প্রভাবে সঞ্জয় দেখতে পাচ্ছিলেন সেখানে কি হচ্ছিল। ভগবানের এই রূপ দর্শন করার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের বোধগম্য করাবার জন্য সঞ্জয় তা একটি কাল্পনিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন (যেমন, সহস্র সহস্র সূর্য)।

শ্লোক ১৩

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

তত্র-সেখানে; একস্থম্-এক স্থানে অবস্থিত; জগৎ-বিশ্ব; কৃৎস্নম্-সমগ্র; প্রবিভক্তম্-বিভক্ত; অনেকধা-বহু প্রকার; অপশ্যৎ-দেখলেন; দেবদেবস্য-পরমেশ্বর ভগবানের; শরীরে-বিশ্বরূপে; পাণ্ডবঃ-অর্জুন; তদা-তখন।

গীতার গান

অর্জুন দেখিল তবে কৃষ্ণের শরীরে।
একত্রে সে অবস্থান অনন্ত বিশ্বের ॥
এক এক সে বিভক্ত যথা যথা স্থান ।
সেই তেজ জ্যোতি মধ্যে বিধির বিধান ॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখলেন।

তাৎপর্য

তত্র ('সেখানে') কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সেই

যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য আর কেউ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ দর্শন করতে পারেননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনকেই দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অর্জুন হাজার হাজার গ্রহলোক দর্শন করলেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। তাদের মধ্যে কোনটি মাটি দিয়ে তৈরি, কোনটি সোনা দিয়ে তৈরি, কোনটি মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরি, কোনটি বিশাল, কোনটি আবার তত বিশাল নয়। রথে বসে অর্জুন সমস্ত কিছুই দর্শন করলেন। কিন্তু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি।

শ্লোক ১৪

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

ততঃ-তারপর; সঃ-তিনি; বিস্ময়াবিষ্টঃ-বিস্ময়ান্বিত; হৃষ্টরোমা-রোমাঞ্চিত হয়ে; ধনঞ্জয়ঃ-অর্জুন; প্রণম্য-প্রণাম করে; শিরসা-মস্তক দ্বারা; দেবম্-পরমেশ্বর ভগবানকে, কৃতাঞ্জলিঃ করজোড়ে; অভাষত বললেন।

গীতার গান

ধনঞ্জয় হৃষ্টরাম দেখিয়া বিস্মিত।
শিরসা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥
কহিতে লাগিল সেই সম্ভ্রমসহিত ।
দেবতার কাছে যথা যাচে নিজ হিত ॥

অনুবাদ

তারপর সেই অর্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই দিব্য দর্শনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের আকস্মিক পরিবর্তন হয়। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্ক সখ্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন, বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন গভীর শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তব করছেন। তিনি বিশ্বরূপের প্রশংসা করছেন। এভাবেই ভগবানের প্রতি অর্জুনের সম্পর্ক সখ্যের পরিবর্তে অদ্ভুতে পরিণত হয়। মহাভাগবতেরা শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সম্পর্কের আধাররূপে দর্শন করেন। শাস্ত্রাদিতে বারোটি বিভিন্ন রসের কথা বলা হয়েছে এবং সব কয়টি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বর্তমান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জীবের মধ্যে, দেবতাদের মধ্যে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের মধ্যে যে রসের আদান প্রদান হয়, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই সমস্ত রসের সমুদ্র-স্বরূপ।

এখানে অর্জুন অদ্ভুত রসের সম্পর্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বভাবতই অর্জুন যদিও ছিলেন খুব ধীর, স্থির ও শান্ত, তবুও এই অদ্ভুত রসের প্রভাবে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি বারবার ভগবানকে প্রণাম করতে থাকেন। অবশ্য তিনি ভীত হননি। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সখ্যভাব বিস্ময়ের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং তাই তিনি এই রকম আচরণ করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১৫

অর্জুন উবাচ
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; পশ্যামি দেখছি; দেবান্-সমস্ত দেবতাদেরকে; তব-তোমার; দেব-হে দেব; দেহে-দেহে; সর্বান্-সমস্ত; তথা-ও; ভূত-প্রাণীদেরকে; বিশেষসদ্বান্-বিশেষভাবে সমবেত; ব্রহ্মাণম্-ব্রহ্মাকে; ঈশম্-শিবকে; কমলাসনস্থম্-কমলাসনে স্থিত; ঋষীন্-মহর্ষিদেরকে; চ-ও; সর্বান্-সমস্ত; উরগান্-সর্পদেরকে; চ-ও; দিব্যান্-দিব্য।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
হে দেব শরীরে তব, দেখিতেছি যে বৈভব,
নহে বাক্য মনের গোচর ।
সকল ভূতের সঙ্ঘ, সে এক বিশাল রঙ্গ,
একত্রিত সব চরাচর ॥
ব্রহ্ম যে কমলাসন, সকল উরগগণ,
অন্তর্যামী ভগবান ঈশ।
যত ঋষিগণ হয়, কেহ সেথা বাকী নয়,
দিবি দেব যত জগদীশ ।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে দেব! তোমার দেহে দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব, ঋষিদের ও দিব্য সর্পদেরকে দেখছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অর্জুন দর্শন করলেন। তাই তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন, যিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। তিনি দিব্য সর্পকে দর্শন করলেন, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নদেশে যার উপর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু শয়ন করেন। এই সর্পশয্যাকে বলা হয় বাসুকী। বাসুকী নামক অন্য সর্পও আছে। এভাবেই অর্জুন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে শুরু করে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন। অর্থাৎ, তাঁর রথের উপর বসেই অর্জুন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছুই দর্শন করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

অনেকবাহূদর বক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।১৬ ॥

অনেক-অনেক; বাহু-বাহু; উদর-উদর; বক্ত্র-মুখ; নেত্রম্-চক্ষু, পশ্যামি-দেখছি; ত্বাম্-তোমাকে; সর্বতঃ-সর্বত্র; অনন্তরূপম্-অনন্ত রূপ; ন অন্তম্ অন্তহীন; ন মধ্যম্-মধ্যহীন; ন-না: পুনঃপুনরায়; তব-তোমার; আদিম্-আদি; পশ্যামি দেখছি; বিশ্বেশ্বর-হে জগদীশ্বর; বিশ্বরূপ-হে বিশ্বরূপ।

গীতার গান

অনেক বাহু উদর, অনেক নয়ন বক্ত্র,
দেখিতেছি অনন্ত সেরূপ।
আদি অন্ত নাহি তার, বিশ্বেশ্বর যে অপার
অদ্ভুত যে দেখি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ। তোমার দেহে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং সর্বত্র অনন্ত রূপ দেখছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন অসীম অনন্ত। তাই, তাঁর মধ্যে সব কিছুই দর্শন করা যায়।

শ্লোক ১৭

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ
দীপ্তানলার্ক দ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

কিরীটিনম্-কিরীটযুক্ত; গদিনম্-গদাধারী; চক্রিণম্-চক্রধারী; চ-এবং; তেজোরাশিম্-তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ; সর্বতঃ-সর্বত্র; দীপ্তিমন্তম্-দীপ্তিমান; পশ্যামি-দেখছি, ত্বাম্-তোমাকে; দুর্নিরীক্ষাম্-দুর্নিরীক্ষ্য; সমন্তাৎ-সবদিকে; দীপ্তানল-প্রদীপ্ত অগ্নি; অর্ক-সূর্যের; দ্যুতিম্ দ্যুতি; অপ্রমেয়ম্-অপ্রমেয়।

গীতার গান

কিরীট যে চক্র গদা, রাশি রাশি তেজপ্রদ,
দীপ্তমান দেখিতেছি সব।
দেখিতে দুরূহ সেই, প্রদীপ্ত উজ্জ্বল যেই,
দীপ্ত অগ্নি সূর্য দ্যুতি সম ॥

অনুবাদ

কিরীট শোভিত, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে আমি সর্বত্রই দেখছি।

শ্লোক ১৮

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ৷ ১৮ ॥

ত্বম্-তুমি; অক্ষরম্-ব্রহ্ম; পরমম্-পরম; বেদিতব্যম্-জ্ঞাতব্য; ত্বম্-তুমি; অস্য-এই; বিশ্বস্য-বিশ্বের; পরম্-পরম; নিধানম্-আশ্রয়; ত্বম্-তুমি; অব্যয়ঃ-অব্যয়; শাশ্বতধর্মগোপ্তা-সনাতন ধর্মের রক্ষক; সনাতনঃ-নিত্য; ত্বম্-তুমি; পুরুষঃ-পরম পুরুষ; মতঃ মে-আমার মতে।

গীতার গান

তুমি যে অক্ষর তত্ত্ব, বুঝিবার যোগ্য তথ্য,
এ বিশ্বের পরম আশ্রয়।
সনাতন ধর্মরক্ষক, সনাতন পুরুষাখ্যা,
তুমি হও অনন্ত অব্যয় ॥

অনুবাদ

তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ। এই আমার অভিমত।

শ্লোক ১৯

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

অনাদিমধ্যান্তম্-আদি, মধ্য ও অন্তহীন; অনন্ত-অন্তহীন; বীর্যম্ বীর্যশালী; অনন্ত-অন্তহীন; বাহুম্-বাহু, শশি-চন্দ্র; সূর্য-সূর্য; নেত্রম্-চক্ষুদ্বয়; পশ্যামি-দেখছি; ত্বাম্-তোমাকে; দীপ্ত-প্রজ্বলিত; হুতাশবক্রম্-অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট; স্বতেজসা-স্বীয় তেজ দ্বারা; বিশ্বম্-জগৎ, ইদম্-এই; তপস্তম্-সন্তাপকারী।

গীতার গান

তব আদি অন্ত নাই, মধ্যের কি কথা তাই,
তুমি হও সে অনন্ত বীর্য ।
তোমার বাহু মহান, চন্দ্র-সূর্য নেত্রবান,
তোমার হুতাশ দীপ্ত বজ্র ॥
নিজ তেজ রাশি দ্বারা, তপ্ত কর বিশ্ব সারা,
ব্যাপ্ত তোমার সর্বত্র তেজ।

অনুবাদ

আমি দেখছি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তুমি অনন্ত বীর্যশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষুদ্বয়। তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি এবং তুমি

স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছ।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের কোন সীমা নেই। এখানে এবং বহু স্থানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তির পুনরাবৃত্তি করলে, তা সাহিত্যগত দুর্বলতা হয় না। কথিত আছে যে, মোহাচ্ছন্ন বা আশ্চর্যান্বিত হলে অথবা পুলকিত হলে মানুষ একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তি করে। সেটি দূষণীয় নয়।

শ্লোক ২০

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

দৌী-দ্যুলোক; আপৃথিব্যোঃ- পৃথিবীর; ইদম্-এই; অন্তরম্-মধ্যস্থল; হি-অবশ্যই; ব্যাপ্তম্-ব্যাপ্ত; ত্বয়া-তোমার দ্বারা; একেন-একমাত্র; দিশঃ-দিক; চ-এবং; সর্বাঃ-সমস্ত; দৃষ্টা-দেখে; অদ্ভুতম্-অদ্ভুত; রূপম্-রূপ; উগ্রম্-ভয়ংকর; তব-তোমার; ইদম্-এই; লোকত্রয়ম্-ত্রিলোক; প্রব্যথিতম্-ব্যথিত হচ্ছে; মহাত্মন্ হে মহাত্মন্।

গীতার গান

পৃথিবী বা অন্তরীক্ষে, বাহিরে ভিতরে মধ্যে,
যত দিগ্-দিগন্তের দেশ ।
দেখিয়া তোমার রূপ, মহান যে বিশ্বরূপ,
যাহা হয় অদ্ভুত দর্শন।
হয়েছে দেখিয়া ভীত, ত্রিভুবনে যে ব্যথিত,
সব লোক শুন মহাত্মন ॥

অনুবাদ

তুমি একাই স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ ও দশদিক পরিব্যাপ্ত করে আছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত ও ভয়ংকর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের মধ্যবর্তী স্থান) ও লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবন) কথা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল অর্জুনই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেননি, অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরাও তাঁর সেই রূপ দর্শন করেছিলেন। অর্জুনের এই বিশ্বরূপ দর্শন স্বপ্ন নয়। ভগবান যাঁদেরকে দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি

কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঘাঃ
স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অমী-ঐ সমস্ত; হি-অবশ্যই; ত্বাম্-তোমাকে; সুরসঙ্ঘাঃ-দেবতারা; বিশন্তি-প্রবেশ করছেন; কেচিৎ-কেউ কেউ; ভীতাঃ-ভীত হয়ে; প্রাঞ্জলয়ঃ-করজোড়ে; গৃণন্তি-গুণ বর্ণনা করছেন; স্বস্তি-শান্তিবাক্য; ইতি-এভাবে; উক্ত্বা-বলে; মহর্ষি-মহর্ষিগণ; সিদ্ধস্যাঃ-সিদ্ধগণ; স্তবন্তি-স্তব করছেন; ত্বাম্-তোমাকে; স্তুতিভিঃ-স্তুতির দ্বারা; পুষ্কলাভিঃ-বৈদিক মন্ত্র।

গীতার গান

ঐ যে যত দেবগণ, লইতেছে যে শরণ,
কেহ বা হয়েছে ভীত মনে।
স্তব করে জোড় হাতে, মহর্ষির সে সন্ততি,
স্বস্তিবাদ সকলে বাখানে ॥

অনুবাদ

সমস্ত দেবতারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে তোমার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধেরা 'জগতের কল্যাণ হোক' বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশ্বরূপের এই ভয়ংকর প্রকাশ এবং তার প্রচণ্ড জ্যোতি দর্শন করে সমস্ত গ্রহলোকের দেব-দেবীরা ভীত হয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন।

শ্লোক ২২

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধস্যা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ৷ ২২ ॥

রুদ্র-রুদ্র; আদিত্যাঃ-আদিত্যগণ; বসবঃ-বসুগণ; যে-যে সমস্ত; চ-এবং; সাধ্যাঃ-সাধ্যগণ, বিশ্বে-বিশ্বদেবগণ; অশ্বিনৌ-অশ্বিনীকুমারদ্বয়; মরুতঃ-মরুতগণ; চ-এবং; উষ্মপাঃ-পিতৃগণ; চ-এবং; গন্ধর্ব-গন্ধর্বগণ; যক্ষ-যক্ষগণ; অসুরসিদ্ধস্যাঃ-অসুরগণ ও সিদ্ধগণ; বীক্ষন্তে-দর্শন করছেন; ত্বাম্-তোমাকে; বিস্মিতাঃ-বিস্ময়যুক্ত হয়ে; চ-ও; এব-অবশ্যই; সর্বে-সকলে।

গীতার গান

রুদ্র আর যে আদিত্য, বসু আর যত সাধ্য,
অশ্বিনীকুমার বিশ্বদেব।
মরুত বা পিতৃলোক, গন্ধর্ব বা সিদ্ধলোক,
দেখিতে আসিয়াছে সে সব ॥

অনুবাদ

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সাধ্য নামক দেবতারা, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুতগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মৃত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে।

শ্লোক ২৩

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

রূপম্-রূপ; মহৎ-মহৎ; তে-তোমার; বহু বহু; বক্ত্র-মুখ; নেত্রম্ : মহাবাহো-হে মহাবীর; বহু-অনেক; বাহু-বাহু; উরু উরু, পাদম-পদ: বহুদরম্-বহু উদর; বহুদংষ্ট্রা-বহু দন্ত; করালম্-ভয়ংকর; দৃষ্টা-দেখে; লোকাঃ -সমস্ত লোক: প্রব্যথিতাঃ-ব্যথিত; তথা-তেমনই; অহম্-আমি।

গীতার গান

তোমার মহান রূপ, বহু নেত্র বহু মুখ,
বহু পাদ উরু মহাবাহো।
বহু উদর দন্ত, করাল নাহিক অন্ত,
দেখিয়া মনেতে ভয়াবহ ।

অনুবাদ

হে মহাবাহু। বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর ও অসংখ্য করাল দন্তবিশিষ্ট তোমার বিরাটরূপ দর্শন করে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি।

শ্লোক ২৪

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

নভঃস্পৃশম্-আকাশস্পর্শী; দীপ্তম্-জ্বলন্ত; অনেক বহু; বর্ণম্ বর্ণ; ব্যাত্ত-বিস্ফারিত: আননম্-মুখ; দীপ্ত-উজ্জ্বল, বিশাল-আয়ত; নেত্রম্-চক্ষু, দৃষ্টা-দর্শন করে; হি অবশ্যই; ত্বাম্-তোমাকে; প্রব্যথিত-ব্যথিত; অন্তরাত্মা-অন্তরাত্মা; ধৃতিম্ ধৈর্য; ন-না; বিন্দামি পাচ্ছি: শমম্-শান্তি; চ-ও; বিষ্ণো-হে বিষ্ণু।

গীতার গান

আকাশে ঠেকেছে মাথা, ঝুলে যেন অগ্নিমাখা,
বহু বর্ণ হয়েছে বিস্তার।
ব্যাপ্তানন দীপ্ত নেত্র, ঝলসিয়া সে সর্বত্র,
ধৈর্যচ্যুতি করেছে আমার ॥

অনুবাদ

হে বিষ্ণু! তোমার আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল

আয়ত চক্ষুবিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শম অবলম্বন করতে পারছি না।

শ্লোক ২৫

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

দংষ্ট্রা-দন্তযুক্ত; করালানি ভীষণ; চ-ও; তে-তোমার; মুখানি-মুখসমূহ; দৃষ্টা-দেখে; এব-এভাবে; কালানল প্রলয়াগ্নি; সন্নিভানি-সদৃশ; দিশঃ-দিকসমূহ; ন জানে-জানি না; ন লভে পাচ্ছি না; চ-ও; শর্ম-সুখ; প্রসীদ-প্রসন্ন হও; দেবেশ-হে দেবেশ; জগন্নিবাস-হে জগদাশ্রয়।

গীতার গান
করাল দাঁতের পাটি, মুখে তব আটিসাটি,
কালানল জ্বেলেছে যেমন।
দিকভ্রম সব কর্ম, বুঝি না আমার শর্ম,
রক্ষা কর ওহে ভগবান ॥

অনুবাদ

হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ভয়ংকর দন্তযুক্ত ও প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখসকল দেখে আমার দিকভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শ্লোক ২৬-৩০

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঘৈঃ ।
ভীষ্মো, দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ৷ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোহ ঘুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ৷ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

অমী-এই সমস্ত; চ-ও; ত্বাম্-তোমার; ধৃতরাষ্ট্রস্য-ধৃতরাষ্ট্রের; পুত্রাঃ-পুত্রগণ; সর্বে-সমস্ত; সহ-সহ; এব-বাস্তবিকপক্ষে; অবনিপাল-নৃপতিগণ; সঘৈঃ-দলবদ্ধভাবে; ভীষ্মঃ-ভীষ্মদেব; দ্রোণঃ- দ্রোণাচার্য; সূতপুত্রঃ-কর্ণ, তথা-ও; অসৌ-সেই; সহ-সহ; অস্মদীয়ৈঃ-আমাদের; অপি-ও; যোধমুখ্যৈঃ-প্রধান যোদ্ধাগণ; বক্ত্রাণি-মুখসমূহের মধ্যে; তে-তোমার; ত্বরমাণাঃ-দ্রুতবেগে; বিশন্তি-প্রবেশ করছে; দংষ্ট্রা-দন্তবিশিষ্ট; করালানি-করাল; ভয়ানকানি-অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; কেচিৎ-কেউ কেউ, বিলগ্নাঃ-বিলগ্ন হয়ে; দশনান্তরেষু-দন্ত মধ্যে; সংদৃশ্যন্তে-দেখা যাচ্ছে; চূর্ণিতৈঃ-চূর্ণিত; উত্তমাঙ্গৈঃ-মস্তক দ্বারা; যথা-যেমন; নদীনাম্-নদীসমূহের; বহবঃ-বহু, অম্বুবেগাঃ-জলপ্রবাহ; সমুদ্রম্-সমুদ্র; এব-অবশ্যই; অভিমুখাঃ-অভিমুখী হয়ে; দ্রবন্তি-প্রবেশ করে; তথা-তেমনই; তব-তোমার; অমী-এই সকল; নরলোকবীরাঃ নরলোকের বীরগণ; বিশন্তি-প্রবেশ করছে; বক্ত্রাণি-মুখসমূহে; অভিবিজ্বলন্তি-জ্বলন্ত; যথা-যেমন; প্রদীপ্তম্-প্রজ্বলিত; জ্বলনম্-অগ্নি; পতঙ্গাঃ-পতঙ্গগণ; বিশন্তি-প্রবেশ করে; নাশায়-মরণের জন্য; সমৃদ্ধৰেগাঃ-প্রবল বেগে; তথা এব-তেমনই; নাশায়-মরণের জন্য; বিশন্তি-প্রবেশ করছে; লোকাঃ-সমস্ত মানুষ; তব-তোমার; অপি-ও; বক্ত্রাণি-মুখসমূহের মধ্যে; সমৃদ্ধবেগাঃ-অতি বেগে; লেলিহাসে-লেহন করছ; গ্রসমানঃ-গ্রাস করছ; সমস্তাৎ-চারি দিকে; লোকান্-লোকসমূহকে; সমগ্রান্-সমগ্র; বদনৈঃ-মুখসমূহের দ্বারা; জ্বলদ্ভিঃ-প্রদীপ্ত, তেজোভিঃ-তেজোরাশির দ্বারা; আপূর্য-আবৃত করে; জগৎ-জগৎ; সমগ্রম্-সমগ্র; ভাসঃ-দীপ্তিসমূহ; তব-তোমার; উগ্রাঃ-ভয়ংকর; প্রতপন্তি-সন্তপ্ত করছ; বিষ্ণো-হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান।

গীতার গান

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যত, তারা সব অবিরত,
সঙ্গে লয়ে যত দিপাল।
ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ, আমাদের যত সৈন্য,
পিষ্ট তব দন্তেতে করাল ॥
সবাই প্রবেশ করে, ভয়ানক দন্ত স্তরে,
চূর্ণ হয়ে থাকে সে লাগিয়া।
ভাবি সে দেখিয়া মনে, নদীস্রোত ধাবমানে,
গেল বুঝি সমুদ্রে মিশিয়া ॥
যত নর লোকবীর, জ্বলে গেল হল স্থির,
তোমার মুখের যে গহ্বরে।
যেমন পতঙ্গ জ্বলে, অগ্নিতে প্রবেশ কালে,
ধ্বংস হয় নিজের বেগেতে ॥
তুমি ত করিছ গ্রাস, যত লোক ইতিহাস,
জ্বলিত তোমার এই মুখে।
সে তেজেতে ভাসমান, জগতের নাহি ত্রাণ,
হে বিষ্ণু সবাই মরে দুঃখে ।।

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, তাদের মিত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের সমস্ত সৈন্যেরা তোমার করাল দন্তবিশিষ্ট মুখের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্তমধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণিত হচ্ছে। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছে। পতঙ্গগণ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই লোকেরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণু। তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং তোমার তেজোরাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত করে সন্তপ্ত করছ।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি অর্জুনকে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক কিছু দেখাবেন। এখন অর্জুন দেখছেন যে, তাঁর বিপক্ষ দলের সমস্ত নেতারা (ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা) এবং তাদের সৈন্যেরা এবং অর্জুনের নিজের সৈন্যেরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হতে চলেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত প্রায় সকলেরই মৃত্যুর পর অর্জুনের জয় অবশ্যম্ভাবী। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপরাজেয় ভীষ্মও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। তেমনই কর্ণও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। ভীষ্ম আদি বিপক্ষের মহারথীরাই কেবল বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, অর্জুনের স্বপক্ষের অনেক রথী-মহারথীরাও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩১

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

আখ্যাহি-দয়া করে বল; মে-আমাকে; কঃ-কে; ভবান্-তুমি; উগ্ররূপঃ-উগ্রমূর্তি; নমঃ অস্ত্র-নমস্কার করি; তে-তোমাকে; দেববর-হে দেবশ্রেষ্ঠ; প্রসীদ-প্রসন্ন হও; বিজ্ঞাতুম্-বিশেষভাবে জানতে; ইচ্ছামি-ইচ্ছা করি; ভবন্তম্ তোমাকে; আদ্যম্-আদিপুরুষ; ন-না; হি অবশ্যই; প্রজানামি-জানতে পারছি; তব-তোমার; প্রবৃত্তিম্-প্রচেষ্টা।

গীতার গান

কৃপা করি বল মোরে, কেবা তুমি উগ্রঘোরে,
প্রণমি প্রসাদ তুমি প্রভু।
কি কারণ এ অদ্ভুত, ধরিয়াছ বিশ্বরূপ,
দেখি নাই বুঝি নাই কভু ॥
কিবা সে প্রবৃত্তি তব, জিজ্ঞাসি তোমারে সব,
'ইচ্ছা হয় জানিবার তরে।
যদি কৃপা তব হয়, বিবরণ সে নিশ্চয়,
কৃপা করি কহ প্রভু মোরে ॥

অনুবাদ

উগ্রমূর্তি তুমি কে, কৃপা করে আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি হচ্ছ আদিপুরুষ। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; কালঃ-কাল; অস্মি-হই; লোক-লোক; ক্ষয়কৃৎ- ধ্বংসকারী; প্রবৃদ্ধঃ-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; লোকান্-লোকসমূহকে; সমাহর্তুম্ সংহার করতে; ইহ-এক্ষণে; প্রবৃত্তঃ-প্রবৃত্ত হয়েছি; ঋতে-ব্যতীত; অপি-ও; ত্বাম্-তোমাকে; ন-না; ভবিষ্যন্তি-থাকবে; সর্বে সকলে; যে-যে; অবস্থিতাঃ-অবস্থিত আছে; প্রত্যনীকেষু-বিপক্ষ দলে; যোধাঃ-যোদ্ধাগণ।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
মহাকাল আমি সেই, প্রবৃদ্ধ ইচ্ছায় হই,
যত লোক গ্রাস করিবারে।
আমি সেই অন্তর্যামী, প্রবৃত্ত হয়েছি আমি,
লোকক্ষয় অন্তরে অন্তরে ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন-আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এই সমস্ত লোক সংহার করতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা (পাণ্ডবেরা) ছাড়া উভয়-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধারাই নিহত হবে।

তাৎপর্য

অর্জুন যদিও জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর বন্ধু এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, কিন্তু তবুও তাঁর বিবিধ রূপ দর্শনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাই তিনি জানতে চাইলেন, এই ভয়ংকর ধ্বংস সাধনকারী শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ভগবান সব কিছুই বিনাশ করেন, এমন কি ব্রাহ্মক্ষ্মণদেরও। কঠ উপনিষদে (১/২/২৫) বলা হয়েছে-

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥

কালক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্য সকলকেই পরমেশ্বর ভগবান গ্রাস করবেন। পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ সর্বগ্রাসী দানবের মতো এবং এখানে তিনি সর্বগ্রাসী কালরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন পাণ্ডব ব্যতীত এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সকলকেই ভগবান গ্রাস করবেন।

অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধ না করাই ভাল হবে। তা হলে কোন রকম নৈরাশ্য বা বিষাদের সূচনা হবে না। তার উত্তরে ভগবান বললেন যে,

তিনি যদি যুদ্ধ নাও করেন, তবুও সকলেরই বিনাশ হবে। কারণ সেটিই হচ্ছে তাঁর পরিকল্পনা। অর্জুন যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হন, তা হলে অন্য কোনভাবে তাদের মৃত্যু হবে। মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। এমন কি অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন, তবুও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সময় সর্বগ্রাসী, সংহারক। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৩৩

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ-অতএব; ত্বম্-তুমি; উত্তিষ্ঠ-উঠ; যশঃ-যশ; লভস্ব-লাভ কর; জিত্বা-জয় করে; শত্রুন্ শত্রুদের: ভুঙ্ক্ষ্ব-ভোগ কর; রাজ্যম্-রাজ্য; সমৃদ্ধম্-সমৃদ্ধশালী; ময়া-আমার দ্বারা; এব-অবশ্যই: এতে-এই সমস্ত; নিহতাঃ-নিহত হয়েছে; পূর্বমেব-পূর্বেই; নিমিত্তমাত্রম্-নিমিত্ত মাত্র; ভব-হও; সব্যসাচিন্-হে সব্যসাচী।

গীতার গান

অতএব যারা হেথা, যুদ্ধ লাগি সমবেতা,
তুমি বিনা সকলে মরিবে।
যত যোদ্ধা আসিয়াছে, সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে,
কেহ নাহি জীবিত সে রবে ॥
অতএব কর যুদ্ধ, যশলাভ হবে শুদ্ধ,
শত্রু জিনি সুখে রাজ্য কর।
আমি সেই প্রথমেতে, মারিয়া রেখেছি এতে
নিমিত্তমাত্র সে তুমি যুদ্ধ কর ।

অনুবাদ

অতএব, তুমি যুদ্ধ করার জন্য উত্থিত হও, যশ লাভ কর এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী। তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

তাৎপর্য

সব্যসাচিন্ তাঁকেই বলা হয়, যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর ছুঁড়তে পারেন। এভাবেই অর্জুনকে সুদক্ষ যোদ্ধারূপে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি তীর ছুঁড়ে শত্রু সংহার করতে সমর্থ। 'নিমিত্ত মাত্র হও'- নিমিত্তমাত্রম্। এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই জগতে সব কিছুই সাধিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছানুসারে। যারা মূর্খ, যাদের জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, কোনও পরিকল্পনার দ্বারা চালিত না হয়েই প্রকৃতিতে সব কিছু ঘটে চলেছে এবং এই প্রকৃতিতে সব কিছুই যেন আকস্মিক ঘটনাচক্রে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক যুগে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, হয়ত এটি এই রকম ছিল অথবা এই রকম হলেও হতে পারে, কিন্তু আসলে 'হয়ত' বা 'হতে পারে'-এই রকম কোন প্রশ্নই উঠে না। এই জড় জগতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কাজ করছে। এই পরিকল্পনাটি কি? জড়

জগতে বদ্ধ জীবাত্মারা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাম্ভিক মনোভাব থাকে, যার প্রভাবে তারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, ততক্ষণ তারা বদ্ধ। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে পারেন এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ বুদ্ধিমান। এই জগতের সৃষ্টিকার্য ও বিনাশকার্য সাধিত হয় ভগবানের নিখুঁত পরিচালনায়। এভাবেই ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর যুদ্ধ করা উচিত। তা হলেই তিনি সুখী হবেন। কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় তাঁর জীবনকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেন, তিনিই সার্থকতা লাভ করেন।

শ্লোক ৩৪

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্তুং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণম্ চ-দ্রোণাচার্যও; ভীষ্মম্ চ-ভীষ্মদেবও; জয়দ্রথম্ চ-জয়দ্রথও, কর্ণম্ কর্ণ, তথা-এবং; অন্যান্-অন্যান্য; অপি-অবশ্যই; যৌধবীরান্-যুদ্ধবীরগণ, ময়া-আমার দ্বারা; হতান্-নিহত হয়েছে; ত্বম্-তুমি; জহি বধ কর; মা-না; ব্যথিষ্ঠাঃ-বিচলিত হয়ো; যুধ্যস্ব-যুদ্ধ কর; জেতাসি-জয় করবে; রণে-যুদ্ধেঃ সপত্নান্-শত্রুদের।

গীতার গান

দ্রোণ আর ভীষ্ম কর্ণ, জয়দ্রথ তথা অন্য,
যত যোদ্ধা বীর আসিয়াছে।
মরিয়াছে জান তারা, আমার ইচ্ছার দ্বারা,
কিবা দুঃখ করিবার আছে ॥

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধ বীরগণ পূর্বেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং, তুমি তাদেরই বধ কর এবং বিচলিত হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই সমস্ত পরিকল্পনা সাধিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি এতই করুণাময় যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর ভক্তেরা যখন তাঁর পরিকল্পনার রূপদান করেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর ভক্তদেরই দিতে চান। অতএব জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যে, প্রতিটি মানুষই যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন এবং সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিকল্পনাগুলি তাঁর কৃপার দ্বারাই কেবল বুঝতে পারা যায়। ভগবানের পরিকল্পনা ও ভগবদ্ভক্তের পরিকল্পনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং এই পরিকল্পনা অনুসরণ করলেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী

হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৫

সঞ্জয় উবাচ
এতচ্ছুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; এতৎ-এই; শ্রুত্বা শুনে; বচনম্-বাণী; কেশবস্য-কেশবের; কৃতাঞ্জলিঃ-হাত জোড় করে; বেপমানঃ-কম্পিত কলেবরে; কিরীটী-অর্জুন; নমস্কৃত্বা নমস্কার করে; ভূয়ঃ-পুনরায়; এব-ও; আহ-বললেন; কৃষ্ণম্-শ্রীকৃষ্ণকে; সগদ্গদম্-গদ্গদভাবে; ভীতভীতঃ-ভীতচিত্তে, প্রণম্য-প্রণাম করে।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন:
অর্জুন শুনিয়া তাহা, কৃতাঞ্জলিপুটে ইহা,
কম্পিত শরীর পুনঃ পুনঃ ।
নমস্কার করে ভূমে, ভয়ভীত সসম্ভ্রমে,
যে কহিল বলি তাহা শুন ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন-হে রাজন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করে গদ্‌গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

তাৎপর্য

আমরা আগেই বিশ্লেষণ করেছি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপের প্রভাবে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে অর্জুন বিস্ময়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তাই, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বারবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে থাকেন এবং গদ্‌গদ স্বরে তাঁর স্তব করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এই ব্যবহার সখ্য-রসের অভিব্যক্তি নয়, তা হচ্ছে ভক্তের অদ্ভুত রসের ব্যবহার।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; স্থানে-যুক্তিযুক্ত; হৃষীকেশ-হে হৃষীকেশ; তব-তোমার; প্রকীর্ত্যা-মহিমা কীর্তন দ্বারা; জগৎ-সমগ্র বিশ্ব; প্রহৃষ্যতি হৃষ্ট হচ্ছে; অনুরজ্যতে-অনুরক্ত হচ্ছে; চ-এবং; রক্ষাংসি-রাক্ষসেরা; ভীতানি-ভীত হয়ে; দিশঃ-দিকসমূহে; দ্রবন্তি-পলায়ন করছে; সর্বে-সমস্ত; নমস্যন্তি-নমস্কার করছে; চ-ও; সিদ্ধস্যাঃ-সিদ্ধগণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:

তব কীর্তি হৃষীকেশ, শুনিয়াছে যে অশেষ,
জগতের যেবা যেথা আছে।
আনন্দিত হয়ে তারা, অনুগত হয় যারা,
পাগল হইয়া ধায় পাছে ॥
রাক্ষসাদি ভয়ে ভীত, যদি চাহে নিজ হিত,
পলায় সে দিগ্-দিগন্তরে।
যারা হয় সিদ্ধ জন, সদা প্রণমিত মন,
যুক্ত হয় সে কার্য তাদেরে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমা কীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট হয়ে তোমার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। রাক্ষসেরা ভীত হয়ে নানা দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধরা তোমাকে নমস্কার করছে। এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে অর্জুন ভগবানের অনন্য ভক্তে পরিণত হলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্ত ও সখারূপে তিনি স্বীকার করলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। অর্জুন প্রতিপন্ন করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা, তিনি হচ্ছেন তাঁর ভক্তদের আরাধ্য ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন অবাঞ্ছিতদের বিনাশকর্তা। তিনি যাই করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন। অর্জুন এখানে বুঝতে পারছেন যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় আকাশ-মার্গের উচ্চতর গ্রহলোকের অনেক দেব-দেবী, সিদ্ধ ও মহাত্মারা সেই যুদ্ধ দর্শন করতে এসেছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, তখন দেব-দেবীরা প্রীতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু অনোরা, যারা ছিলেন আসুরিক ভাবাপন্ন রাক্ষস ও ভগবৎ-বিদ্বেষী দৈত্য-দানব, তারা ভগবানের সেই মহিমা সহ্য করতে পারল না। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্বংস সাধনকারী ভয়ঙ্কর এই রূপ দর্শন করে, তারা তাদের স্বাভাবিক ভয়ের বশবর্তী হয়ে পলায়ন করতে শুরু করেছিল। ভগবান তাঁর ভক্ত ও অভক্তের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করেন, অর্জুন তার প্রশংসা করছেন। সর্ব অবস্থাতেই ভক্ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। কারণ তিনি জানেন যে, ভগবান যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন।

শ্লোক ৩৭

কস্মাচ্চ তেন নমেরন্মহাত্মন্

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

কস্মাৎ-কেন; চ-ও; তে-তোমাকে; ন-না; নমেরন্ নমস্কার করিবেন; মহাত্মন্-হে মহাত্মা; গরীয়সে গরীয়ান; ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্মা অপেক্ষা; অপি-যদিও; আদিকর্মে-আদিকর্তা; অনন্ত-হে অনন্ত; দেবেশ-হে দেবেশ: জগন্নিবাস-হে জগদাশ্রয়; ত্বম্-তুমি; অক্ষরম্ব্রহ্মা; সদসৎ-কারণ ও কার্য; তৎ পরম্-উভয়ের অতীত; যৎ-যে।

গীতার গান

কেন না হে মহাত্মন, নাহি লবে সে শরণ,
তুমি হও সর্ব গরীয়সী ।
ব্রহ্মার আদি কর্তা, তুমি হও তার ভর্তা,
তব কীর্তি অতি মহীয়সী ॥
হে অনন্ত দেব ঈশ, তুমি হও জগদীশ,
সদসদ পরে যে অক্ষর।
তুমি হও সেই তত্ত্ব, কে বুঝিবে সে মহত্ত্ব,
নহ তুমি ভৌতিক বা জড় ॥

অনুবাদ

হে মহাত্মন্। তুমি এমন কি ব্রহ্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা। সকলে তোমাকে কেন নমস্কার করবেন না? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম।

তাৎপর্য

এভাবেই প্রণাম করার মাধ্যমে অর্জুন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের পূজনীয়। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি সকল আত্মার পরম আত্মা। অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করছেন, যার অর্থ হচ্ছে তিনি সবচেয়ে মহৎ এবং তিনি অসীম। অনন্ত বলতে বোঝাচ্ছে যে, এমন কিছুই নেই যা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির ও প্রভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। দেবেশ কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা এবং তাদের সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বচরাচরের আশ্রয়। অর্জুন এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী দেব-দেবীরা যে ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। অর্জুন বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার চেয়েও বড়। কারণ ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট। ব্রহ্মার জন্ম হয় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উদ্ধৃত কমলের মধ্যে এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-প্রকাশ। তাই ব্রহ্মা ও শিব, যিনি ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন এবং সমগ্র দেব-দেবীরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানকে অবশ্যই প্রণাম জানাবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীদের পূজনীয়। এখানে অক্ষরম্ কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই জড় জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভগবান এই জড়া সৃষ্টির অতীত। তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। তাই, তিনি এই জগতের সমস্ত বদ্ধ জীব, এমন কি এই জড় সৃষ্টির থেকেও গরীয়ান। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩৮

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্-তুমি; আদিদেবঃ-আদি পরমেশ্বর ভগবান; পুরুষঃ-পুরুষ; পুরাণঃ-পুরাতন; ত্বম্-তুমি; অস্য-এই; বিশ্বস্য-বিশ্বের; পরম্-পরম; নিধানম্-আশ্রয়; বেত্তা-জ্ঞাতা; অসি-হও; বেদ্যম্ চ-এবং জ্ঞেয়; পরং চ ধাম এবং পরম ধাম; ত্বয়া-তোমার দ্বারা; ততম্-ব্যাপ্ত; বিশ্বম্-জগৎ; অনন্তরূপ-হে অনন্ত-রূপ।

গীতার গান

তুমি আদি দেব হও সকলের সাধ্য নও
পুরাণ পুরুষ সবা হতে।
জগতের যাহা কিছু সম্ভব হয়েছে পিছু
স্থির এই জগৎ তোমাতে ॥
তুমি জান সব প্রভু সনাতন তুমি বিভু
তুমি হও পরম নিধান ।
এ বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েছে সারা
অনন্ত সে তোমার বিধান ॥

অনুবাদ

তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই গুণাতীত পরম ধামস্বরূপ। হে অনন্তরূপ! এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

তাৎপর্য

সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আশ্রয় করে বর্তমান। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম আশ্রয়। নিধানম্ মানে হচ্ছে-সব কিছু, এমন কি ব্রহ্মজ্যোতিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। এই জগতে যা ঘটছে সব কিছুরই জ্ঞাতা হচ্ছেন তিনি এবং জ্ঞানের যদি কোন অন্ত থাকে, তবে তিনিই সমস্ত জ্ঞানের অন্ত। তাই, তিনি হচ্ছেন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। সমস্ত জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছেন তিনি, কারণ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি চিৎ-জগতেরও পরম কারণ, তাই তিনি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত জগতেও তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ।

শ্লোক ৩৯

বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ।। ৩৯ ।।

বায়ুঃ-বায়ু; যমঃ-যম; অগ্নিঃ-অগ্নি; বরুণঃ-বরুণ, শশাঙ্কঃ-চন্দ্র; প্রজাপতিঃ-ব্রহ্মা; ত্বম্-তুমি; প্রপিতামহঃ-প্রপিতামহ; চ-ও; নমঃ নমস্কার; নমস্তে-তোমাকে নমস্কার করি; অস্ত্র-হোক; সহস্রকৃত্বঃ-সহস্রবার; পুনঃ চ-এবং পুনরায়; ভূয়ঃ-বারবার; অপি-ও; নমঃ নমস্কার; নমস্তে-

তোমাকে নমস্কার করি।

গীতার গান

বায়ু যম বহ্নি চন্দ্র সকলের তুমি কেন্দ্র
বরুণ যে তুমি হও সব ।
তুমি হও প্রজাপতি প্রপিতামহ সে অতি
যাহা হয় তোমার বৈভব ।
সহস্র সে নমস্কার করি প্রভু বার বার
তোমার চরণে আমি ধরি।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ভূয় ভূয় বার বার
কৃপা দৃষ্টি কর হে শ্রীহরি ।

অনুবাদ

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রপিতামহ। অতএব, তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় নমস্কার করি এবং বারবার নমস্কার করি।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে বায়ুরূপে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ বায়ু হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত, তাই তা দেব-দেবীদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলে সম্বোধন করছেন, কারণ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার পিতা।

শ্লোক ৪০

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তুং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

নমঃ নমস্কার; পুরস্তাৎ-সম্মুখে; অথ-ও; পৃষ্ঠতঃ-পশ্চাতে; তে-তোমাকে; নমঃ অস্ত্র-নমস্কার করি; তে-তোমাকে; সর্বতঃ-সব দিক থেকে; এব-বস্তুত; সর্ব-হে সর্বাত্মা; অনন্তবীর্য-অন্তহীন শক্তি; অমিতবিক্রমঃ-অসীম বিক্রমশালী; ত্বম্-তুমি; সর্বম্-সমগ্র জগতে; সমাপ্নোষি-পরিব্যাপ্ত আছ, ততঃ-সেই হেতু; অসি-তুমি হও; সর্বঃ-সব কিছু।

গীতার গান

সম্মুখে পশ্চাতে তব সর্বতো প্রণামে রব
নমস্কার তব পাদপদ্মে।
অন্তর্যামী উরুক্রম তুমি বিনা সব ভ্রম
প্রকাশিত তুমি নিজ ছদ্মে ॥

অনুবাদ

হে সর্বাত্মা! তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে ও সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করছি। হে অনন্তবীর্য! তুমি অসীম বিক্রমশালী। তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব-স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে অর্জুন তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সব দিক থেকে প্রণাম নিবেদন করছেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত শক্তির প্রভু, তিনি অনন্ত

বীর্য, তিনি উরুক্রম। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত রথী-মহারথীদের শক্তির থেকে তাঁর শক্তি অনেক অনেক গুণ বেশি। বিষ্ণু পুরাণে (১/৯/৬৯) বলা হয়েছে-

যোহয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ।
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্বগতো ভবান্ ॥

"হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান! যে-ই তোমার সামনে আসুক, তা সে দেবতাই হোক, সে তোমারই সৃষ্ট।"

শ্লোক ৪১-৪২

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সখা-সখা; ইতি-এভাবে; মত্বা-মনে করে; প্রসভম্-প্রগল্ভভাবে; যৎ-যা কিছু; উক্তম্-বলা হয়েছে, হে কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ; হে যাদব-হে যাদব; হে সখে-হে সখা; ইতি-এভাবেই; অজানতা-না জেনে; মহিমানম্-মহিমা; তব-তোমার; ইদম্-এই; ময়া-আমার দ্বারা; প্রমাদাৎ-অজ্ঞতাবশত, প্রণয়েন-প্রণয়বশত; বা অপি-অথবা; যৎ-যা কিছু; চ-ও; অবহাসার্থম্-পরিহাস ছলে; অসৎকৃতঃ-অসম্মান; অসি-করা হয়েছে, বিহার-বিহার; শয্যা-শয়ন; আসন-উপবেশন; ভোজনেষু-অথবা একত্রে আহার করার সময়; একঃ-একাকী; অথবা অথবা; অপি-ও; অচ্যুত-হে অচ্যুত; তৎসমক্ষম্-তাদের সামনে; তৎ-সেই সব; ক্ষাময়ে-ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ত্বাম্-তোমার কাছে; অহম্-আমি; অপ্রমেয়ম্-অপরিমেয়।

গীতার গান

মানিয়া তোমাকে সখা প্রগল্ভ করেছি বৃথা
হে কৃষ্ণ হে যাদব কত বলেছি।
না জানি এই মহিমা আশ্চর্য সে নাহি সীমা
সামান্যত তোমাকে ভেবেছি ।
পরিহাস করি সখা অসৎকার যথাতথা
সে প্রমাদ যা কিছু বলেছি।
বিহার শয্যা আসনে পরোক্ষ বা সামনে
ক্ষম অপরাধ যা করেছি ॥

অনুবাদ

তোমার মহিমা না জেনে, সখা মনে করে তোমাকে আমি প্রগল্ভভাবে "হে কৃষ্ণ", "হে যাদব," "হে সখা," বলে সম্বোধন করেছি। প্রমাদবশত অথবা প্রণয়বশত আমি যা কিছু করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা কর। বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের সময় কখন একাকী এবং কখন বন্ধুদের সমক্ষে আমি যে তোমাকে অসম্মান করেছি, হে অচ্যুত!

আমার সে সমস্ত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের সামনে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা অর্জুনের মনে পড়ে যায় এবং বন্ধুত্বের বশবর্তী হয়ে তিনি যে ভগবানকে রীতিবিরুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে কত যে অসম্মান করেছেন, সেই জন্য তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন। তিনি স্বীকার করছেন যে, তিনি পূর্বে জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করতে সমর্থ, যদিও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তিনি সেই কথা পূর্বেই তাঁকে বলেছেন। অর্জুন মনে করতে পারছেন না, কতবার তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বৈভবের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে "হে কৃষ্ণ", "হে বন্ধু", "হে যাদব" আদি সম্বোধন করে তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই করুণাময় যে, এই প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুর মতো খেলা করেছেন। এমনভাবেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমের বিনিময় হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক তা নিত্য, শাশ্বত। তা কখনই বিস্মৃত হওয়া যায় না, যেমন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের ব্যবহারের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি। ভগবানের বিশ্বরূপের বৈভব দর্শন করা সত্ত্বেও অর্জুন ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা ভুলে যাননি।

শ্লোক ৪৩

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো
লোকত্রয়েহ প্যপ্রতিমপ্রভাব ৷ ৪৩ ॥

পিতা-পিতা; অসি-হও; লোকস্য-জগতের; চরাচরস্য-স্থাবর ও জঙ্গমের; ত্বম্-তুমি; অস্য-এই; পূজ্যঃ-পূজনীয়; চ-ও; গুরুঃ-গুরু; গরীয়ান্-গুরুশ্রেষ্ঠ; ন-না; ত্বৎসমঃ- তোমার সমকক্ষ; অস্তি-আছে; অভ্যধিকঃ-মহত্তর; কুতঃ-কিভাবে সম্ভব; অন্যঃ-অন্য; লোকত্রয়ে ত্রিলোকে; অপি-ও; অপ্রতিম-অপ্রমেয়; প্রভাব-প্রভাব।

গীতার গান

যত লোক চরাচর তুমি পিতা সে সবার
তুমি পূজ্য গুরু সে প্রধান।
সমান অধিক তব অন্য কেহ অসম্ভব
অপ্রতিম তোমার প্রভাব ।

অনুবাদ

হে অমিত প্রভাব। তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই, অতএব তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে?

তাৎপর্য

পুত্রের কাছে পিতা যেমন পূজনীয়, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলেরই পূজনীয়। তিনি সকলের গুরু, কারণ তিনি সর্বপ্রথম ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেন এবং এখানে তিনি অর্জুনকে ভগবদগীতার তত্ত্বজ্ঞান দান করছেন। তাই তিনি হচ্ছেন আদিগুরু। সদ্গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত পরম্পরায়

অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে, কেউই অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান দানকারী গুরুপদবাচ্য হতে পারেন না।
ভগবানকে সর্বতোভাবে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। ভগবানের মহত্ত্ব অপরিমেয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। কারণ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতে এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের চেয়ে শ্রেয়। সবাই ভগবানের অধস্তন। কেউই ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। এই কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/৮) বলা হয়েছে-

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ দৃশ্যতে ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় ও দেহ একজন সাধারণ মানুষেরই মতো, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়, দেহ, মন এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়নি, তারা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, হৃদয়, মন ও সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি পরম শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদিও তাঁর ইন্দ্রিয় আমাদের মতো নয়, তবুও তাঁর প্রতিটি অঙ্গই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে। তাই, তাঁর ইন্দ্রিয় অপূর্ণ অথবা সীমিত নয়। কেউই তাঁর থেকে মহত্তর হতে পারে না। কেউই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তাই, সকলেই তাঁর থেকে নিম্নতর স্তরে অবস্থিত।
পরম পুরুষোত্তমের জ্ঞান, শক্তি ও ক্রিয়াকলাপ সবই অপ্রাকৃত। ভগবদ্গীতায় (৪/৯) বলা হয়েছে-

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

যাঁরা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময় এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ দিব্য, তাঁরা মৃত্যুর পর ভগবৎ-ধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান এবং তাঁদের আর এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই আমাদের জানতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ অন্য সকলের কার্যকলাপের থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এভাবেই জীবন যাপন করার ফলে আমরা আমাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি। শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, এমন কেউ নেই যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভু। সকলেই তাঁর ভৃত্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য-শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ভগবান এবং আর সকলেই তাঁর ভৃত্য। সকলেই তাঁর আদেশ পালন করে চলেছে। এমন কেউ নেই যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অমান্য করতে পারে। তাঁর অধ্যক্ষতায়, তাঁরই পরিচালনায় সকলে পরিচালিত হচ্ছে। ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে-তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৪৪

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ-অতএব; প্রণম্য-প্রণাম করে; প্রণিধায়-দণ্ডবৎ পতিত হয়ে; কায়ম্ দেহ; প্রসাদয়ে-কৃপাভিক্ষা করছি; ত্বাম্-তোমার কাছে; অহম্-আমি; ঈশম্-পরমেশ্বর ভগবান; ঈড্যম্-পরমপূজ্য; পিতা ইব-পিতা যেমন; পুত্রস্য-পুত্রের; সখা ইব-সখা যেমন; সখ্যুঃ-সখার; প্রিয়ঃ-প্রেমিক; প্রিয়ায়াঃ-প্রিয়ার; অর্হসি-সমর্থ; দেব-হে দেব; সোঢুম্-ক্ষমা করতে।

গীতার গান

দণ্ডবৎ নমস্কার   করি আমি বার বার
হে ঈশ, হে পূজ্য জগতে সবার।
কৃপা তব ভিক্ষা চাই   অন্যথা সে গতি নাই
পিতা পুত্রে যথা ব্যবহার ॥
অথবা সখার সাথে   প্রিয় আর সে প্রিয়াতে
দোষ ক্ষমা হয় সে সর্বদা।

অনুবাদ

তুমি সমস্ত জীবের পরমপূজ্য পরমেশ্বর ভগবান। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তোমার কৃপাভিক্ষা করছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রেমিক যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও সেভাবেই আমার অপরাধ ক্ষমা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানা রকম সম্বন্ধের দ্বারা সম্পর্কিত। কেউ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেন, কেউ তাঁকে তাঁর পতি বলে মনে করেন। কেউ আবার তাঁকে সখা অথবা প্রভু বলে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বন্ধুত্বের দ্বারা সম্পর্কিত। পিতা যেমন সহ্য করেন এবং পতি অথবা প্রভু যেমন সহ্য করেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও সহ্য করেন।

শ্লোক ৪৫

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অদৃষ্টপূর্বম্-অদৃষ্টপূর্ব, হৃষিতঃ-আনন্দিত; অস্মি হয়েছি; দৃষ্টা দেখে, ভয়েন-ভয়ে; চ-ও; প্রব্যথিতম্-ব্যথিত হয়েছে; মনঃ-মন; মে-আমার। তৎ-সেই: এব-অবশ্যই; মে- আমাকে; দর্শয়-দেখাও; দেব-হে দেব; রূপম্রূপ: প্রসীদ-প্রসন্ন হও; দেবেশ-হে দেবেশ; জগন্নিবাস-হে জগন্নিবাস।

গীতার গান

হে দেবেশ জগন্নাথ   সে সমৃদ্ধ মোর সাথ
তুষ্ট হও তথা হে ভূরীদা ॥

অনুবাদ

তোমার এই বিশ্বরূপ, যা পূর্বে কখনও দেখিনি, তা দর্শন করে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। তাই, হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই রূপই আমাকে দেখাও।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বস্ত, কারণ তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়সখা। প্রিয় সখা যেমন তার সখার বৈভব দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, অর্জুনও তেমন আনন্দিত হন, যখন তিনি দেখলেন তাঁর প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাঁর অমন বিস্ময়কর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু তখন আবার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর মনে ভয় হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের ফলে না জানি কত অপরাধ তিনি করেছেন। এভাবেই ভীত হয়ে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠে, যদিও ভয় পাবার তাঁর কোন কারণ ছিল না। অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখাবার জন্য। কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ এই জগতের মতো জড় ও অনিত্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর যে দিব্য রূপ তা হচ্ছে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ। চিদাকাশে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে এবং সেই প্রতিটি গ্রহে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ-প্রকাশ রূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিরাজ করেন। তাই, অর্জুন বৈকুণ্ঠে যে সমস্ত রূপ প্রকাশিত তাঁর একটি রূপ দেখতে চাইলেন। যদিও প্রত্যেকটি বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নারায়ণ রূপ চতুর্ভুজ, তবে তাঁর সেই চার হাতে বিভিন্নভাবে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম প্রতীক চিহ্নগুলি ধারণ করেন। কিভাবে তিনি ধারণ করে আছেন, সেই অনুসারে হন। এই সমস্ত রূপগুলি শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করছেন। এই চারটি প্রতীক কোন্ হাতে নারায়ণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত তাই, অর্জুন তাঁর সেই চতুর্ভুজ

শ্লোক ৪৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ৪৬ ॥

কিরীটিনম্-কিরীটধারী; গদিনম্-গদাধারী; চক্রহস্তম্-চক্রধারী; ইচ্ছামি-ইচ্ছা করি; ত্বাম্-তোমাকে; দ্রষ্টুম্-দর্শন করতে; অহম্-আমি; তথা এব-পূর্বের মতো; তেন এব-সেই; রূপেণ-রূপে; চতুর্ভুজেন-চতুর্ভুজ; সহস্রবাহো-হে সহস্রবাহো; ভব-হও; বিশ্বমূর্তে-হে বিশ্বমূর্তি।

গীতার গান

চতুর্ভুজ যে স্বরূপ দেখিবারে যে ইচ্ছুক
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ।
যে বিষ্ণু স্বরূপ হতে বিশ্বরূপ এ বিশ্বেতে
হও সে সহস্র বাহুধারী ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বমূর্তি! হে সহস্রবাহো! আমি তোমাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারীরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৯) বলা হয়েছে যে, রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন-ভগবান শত-

সহস্র রূপে নিত্যকাল বিরাজমান এবং তাঁদের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ আদি রূপগুলিই হচ্ছে প্রধান। ভগবানের অসংখ্য রূপ আছে। কিন্তু অর্জুন জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান, যিনি ক্ষণিকের জন্য তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। এখন তিনি তাঁর চিন্ময় নারায়ণ রূপ দেখতে চাইছেন। এই শ্লোকটিতে নিঃসন্দেহে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অংশ ও কলা অবতারেরা তাঁর থেকে উদ্ভুত হয়েছে। ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ থেকে অভিন্ন এবং সমস্ত অগণিত রূপেই তিনি ভগবান। এই সমস্ত রূপেই তিনি নবযৌবন-সম্পন্ন। সেটিই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়া-আমার দ্বারা, প্রসয়েন-প্রসন্ন হয়ে; তব-তোমাকে; অর্জুন-হে অর্জুন; ইদম্-এই; রূপম্-রূপ, পরম্-পরম; দর্শিতম্-দর্শিত হল; আত্মযোগাৎ-আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা, তেজোময়ম্ তেজোময়; বিশ্বম্-সমগ্র জগৎরূপী; অনন্তম্-অন্তহীন; আদ্যম্ আদি; যৎ-যাঃ মে-আমার; ত্বৎ অন্যেন-তুমি ছাড়া; ন দৃষ্টপূর্বম্-পূর্বে কেউ দেখেনি।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
তোমার প্রসন্ন লাগি হে অর্জুন আমি যোগী
এই জড় বিশ্বরূপ দেখ।
আমার যোগ প্রভাবে তাহা সেই সসম্ভবে
অসম্ভব নাহি যার লেখ ॥
সেই তেজোময় বপু না দেখিল কেহ কভু
তোমার সেই প্রথম দর্শন।

অনুবাদ
শ্রীভগবান বললেন-হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা জড় জগতের অন্তর্গত এই শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেউই এই অনন্ত, আদি ও তেজোময় রূপ দেখেনি।

তাৎপর্য
অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত অর্জুনের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাঁকে তাঁর জ্যোতির্ময় ও ঐশ্বর্যময় বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই রূপ ছিল সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁর অসংখ্য মুখমণ্ডল ক্ষিপ্র গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার

জন্যই তাঁকে তাঁর এই রূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা চিৎ-শক্তির প্রভাবে এই রূপ প্রকাশ করেছিলেন, যা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। অর্জুনের আগে কেউই ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন করেননি। কিন্তু অর্জুনকে দেখানোর ফলে অন্তরীক্ষে স্বর্গলোক ও অন্যান্য গ্রহলোকের ভক্তেরাও তাঁর এই রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর আগে কখনই তাঁরা এই রূপ দেখেননি, কিন্তু অর্জুনের জন্যই তাঁরা এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে অর্জুনকে তাঁর যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত অন্যান্য গ্রহলোকের ভক্তেরাও তাঁর সেই রূপ দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকেও এই রূপ দেখিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, দুর্যোধন সেই শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, কিন্তু সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কতকটা তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই রূপ অর্জুনকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন তার থেকে ভিন্ন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই রূপ এর আগে কখনও কেউ দেখেনি।

শ্লোক ৪৮

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

ন-না; বেদ-বৈদিক জ্ঞান; যজ্ঞ-যজ্ঞ; অধ্যয়নৈঃ-অধ্যয়নের দ্বারা; ন-না; দানৈঃ-দানের দ্বারা; ন-না; চ-ও; ক্রিয়াভিঃ-পুণ্যকর্মের দ্বারা; ন-না; তপোভিঃ -তপস্যার দ্বারা; উগ্রৈঃ-কঠোর; এবংরূপঃ- এই রূপে; শক্যঃ- যোগ্য; অহম্ আমি; নৃলোকে-এই জড় জগতে; দ্রষ্টুম্-দর্শন করতে; ত্বৎ-তুমি ছাড়া; অন্যেন-অন্য কারও দ্বারা; কুরুপ্রবীর-হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

বেদ যজ্ঞ কিংবা দান অতি পটু অধ্যয়ন
অসমর্থ সে সব বর্ণন ॥
কিংবা উগ্র তপোবল ক্রিয়াকাণ্ড যে সকল
সাধ্য নাই এরূপ দর্শনে ।
হে কুরুপ্রবীর শুন না দেখিবে তুমি ভিন্ন
আমার সে রূপ ত্রিভুবনে ॥

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা এই জড় জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার এই বিশ্ব রূপ দর্শন করতে সমর্থ নয়।

তাৎপর্য

যে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই দিব্য দৃষ্টি কি, তা আমাদের যথাযথভাবে বুঝতে হবে। কে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন? 'দিব্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে দেবতুল্য। যতক্ষণ না আমরা দেবতাদের মতো দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারি না। এখন কথা হচ্ছে দেবতা কারা? বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত, তাঁরাই হচ্ছেন দেবতা

(বিষ্ণুভক্তাঃ মৃতা দেবাঃ)। যারা ভগবৎ-বিদ্বেষী অর্থাৎ যারা শ্রীবিষ্ণুকে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপকেই পরমতত্ত্ব বলে মনে করে, তাদের পক্ষে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা এবং সেই সঙ্গে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। দৈব গুণাবলীতে বিভূষিত না হলে কখনই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, যাঁরা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরাও অর্জুনের মতো দর্শন করতে পারেন।

ভগবদগীতায় ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও অর্জুনের পূর্বে এই বিবরণ সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল, এখন এই ঘটনার পরে ভগবানের বিশ্বরূপ সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। যাঁরা যথার্থ দৈবগুণ-সম্পন্ন, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত না হলে কেউই দিব্য পদবাচ্য হতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা যথার্থ দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত এবং যাঁদের দিব্যদৃষ্টি আছে, তাঁরা কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য উৎসুক নন। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তিনি প্রকৃতপক্ষে ভীত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যা বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন এবং যজ্ঞবিধির বিষয়বস্তুকে উল্লেখ করে। বেদ বলতে সব রকমের বৈদিক শাস্ত্রকে বোঝায়, যেমন-চতুর্বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব), অষ্টাদশ পুরাণ, উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র। এই সমস্ত শাস্ত্র গৃহে অথবা অন্য কোথাও পাঠ করা যায়। তেমনই, বৈদিক যজ্ঞবিধির অনুশীলন করবার জন্য কল্পসূত্র ও মীমাংসাসূত্র রয়েছে। দানৈঃ শব্দে যোগ্য পাত্রে দান করার কথা বলা হয়েছে, যেমন ভক্তিভরে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দান করা। তেমনই, 'পুণ্যকর্ম' বলতে অগ্নিহোত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে উল্লেখ করে। আর ইচ্ছাকৃত দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করাকে বলা হয় তপস্যা। সুতরাং, সকলেই এই সমস্ত আচরণ করতে পারেন-দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করতে পারেন, দান করতে পারেন, বেদ পাঠ করতে পারেন-কিন্তু যতক্ষণ না তিনি অর্জুনের মতো ভগবস্তুক্তে পরিণত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। যাঁরা নির্বিশেষবাদী, তাঁরাও কল্পনা করছেন যে, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। কিন্তু ভগবদগীতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবদ্ভক্ত নয়। তাই, তাদের পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

অনেক মানুষ আছে যারা অবতার তৈরি করে। তারা ভ্রান্তভাবে কোন সাধারণ মানুষকে ভগবানের অবতার বলে অপপ্রচার করে। কিন্তু এগুলি হচ্ছে নিতান্তই মূর্খতা। আমাদের ভগবদগীতার তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না। যদিও ভগবদগীতাকে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বলে মনে করা হয়, তবুও এটি এতই নিখুঁত যে, তাঁর মাধ্যমে আমরা কোন্টা কি সেই বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি। কোন নকল অবতারের চেলাও বলতে পারে যে, তারাও ভগবানের দিব্য অবতার বা বিশ্বরূপ দর্শন করেছে, কিন্তু তাঁদের সেই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হলে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বপ্রথমে তাঁকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হতে হবে; তার পরে তিনি দাবি করতে পারেন যে, বিশ্বরূপ বা অন্য যে রূপ তিনি দর্শন করেছেন, তা তিনি অন্যদের দেখাতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত কখনই মেকি অবতার ও তাদের চেলাদের মেনে নিতে পারেন না।

শ্লোক ৪৯

মাতে ব্যথা মাচ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃড় মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

মা-না হোক; তে-তোমার; ব্যথা কষ্ট; মা-না হোক; চ-ও; বিমূঢ়ভাবঃ-মোহাচ্ছন্নতা; দৃষ্টা-দেখে; রূপম্-রূপ; ঘোরম্-ভয়ংকর; ঈদুক্-এই প্রকার; মম-আমার; ইদম্-এই; ব্যপেতভীঃ-সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে। প্রীতমনাঃ -প্রসন্নচিত্তে; পুনঃ-পুনরায়; ত্বম্-তুমি; তৎ-তা; এব-এভাবে; মে-আমার, রূপম্-রূপ; ইদম্-এই; প্রপশ্য-দর্শন কর।

গীতার গান

দিব না তোমাকে ব্যথা বিভ্রম হয়েছে যথা
দেখি মোর এই ঘোর রূপ।
ছাড় ভয় প্রীত হও পুনঃ শান্তি প্রাপ্ত হও
দেখ মোর যে নিত্য স্বরূপ ॥

অনুবাদ

আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যথিত ও মোহাচ্ছন্ন হয়ো না। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন কর।

তাৎপর্য

ভগবদগীতার প্রারম্ভে অর্জুন তাঁর পরম পূজ্য পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, তাঁর পিতামহকে হত্যা করার ব্যাপারে তাঁর আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। কৌরবদের রাজসভায় যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল, তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নীরব ছিলেন। ধর্ম আচরণে এই অবহেলার জন্য তাঁদের হত্যা করাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, কেবল তাঁকে এটি বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, তাঁদের অনৈতিক আচরণের ফলে তাঁরা ইতিমধ্যেই হত হয়েছেন। অর্জুনকে এই দৃশ্য দেখানো হয়েছিল কারণ ভক্তেরা সর্বদাই শান্তিপ্রিয় এবং তাঁরা এই ধরনের বীভৎস কাজ করতে পারেন না। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছিল। এখন অর্জুন ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাও দেখালেন। ভক্ত ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তেমন আগ্রহী নন, কেন না এই রূপের সঙ্গে প্রেমানুভূতির আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভক্ত সর্বদাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে চান। তাই, তিনি দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করতে চান, যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রেমভক্তি বিনিময় করতে পারেন।

শ্লোক ৫০

সঞ্জয় উবাচ
ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; ইতি-এভাবে; অর্জুনম্-অর্জুনকে; বাসুদেবঃ-কৃষ্ণ; তথা-সেভাবে; উক্ত্বা-বলে; স্বকম্-তাঁর নিজের; রূপম্-রূপ; দর্শয়ামাস-দেখালেন; ভূয়ঃ-পুনরায়; আশ্বাসয়ামাস-আশ্বস্ত করলেন; চ-ও; ভীতম্-ভীত; এনম্-তাঁকে; ভূত্বা-হয়ে; পুনঃ-পুনর্বার; সৌম্যবপূঃ-প্রসন্নমূর্তি; মহাত্মা-মহাত্মা।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন':
সে কথা বলিয়া হরি অর্জুনকে লক্ষ্য করি
বাসুদেব ভগবান পুনঃ।
নিজ চতুর্ভুজ রূপ দেখাইছ অপরূপ
পূর্ণ ব্রহ্ম অপ্রাকৃত গুণ ॥
তারপর নিত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেই রূপ
দ্বিভুজ মূরতি আবির্ভাব।
পুনর্বার হল সৌম স্বরূপের যে মাহাত্ম্য
আশ্বাসনে ফিরিল স্বভাব ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন-মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এভাবেই বলে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সর্বপ্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা যখন তাঁকে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে আগ্রহী নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে আবার সেই রূপ দেখালেন এবং তার পরে তাঁর দ্বিভুজ রূপ দেখালেন। এখানে সৌম্যবপুঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সৌম্যবপুঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর রূপ। ভগবানের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন সকলেই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হতেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনের সমস্ত ভয় বিদূরিত করলেন এবং তাঁকে আবার তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দেখালেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন-প্রেমাঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি নয়নেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৫১

অর্জুন উবাচ
দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; দৃষ্টা-দেখে; ইদম্-এই; মানুষম্-মানুষ; রূপম্-রূপ; তব-তোমার; সৌম্যম্-সৌম্য; জনার্দন-হে জনার্দন; ইদানীম্-এখন; অস্মি-হই; সংবৃত্তঃ-স্থির হল; সচেতাঃ-চিত্ত; প্রকৃতিম্-প্রকৃতিস্থ; গতঃ -হলাম।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:

দেখিয়া তোমার এই মনুষ্য-স্বরূপ।
হে জনার্দন পেয়েছি ফিরি মোর রূপ ॥
সংবৃত্ত হয়েছি আমি সচেতা প্রকৃতি ।
ইদানীং সে চিত্ত স্থির স্বাভাবিক গতি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে জনার্দন। তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম।

তাৎপর্য

এখানে মানুষং রূপম্ কথাটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদি স্বরূপ হচ্ছে দ্বিভুজ। যারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে, এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তারা তাঁর দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে তাঁর পক্ষে বিশ্বরূপ এবং তারপর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখানো কি করে 'সম্ভব হত? ভগবদ্গীতাতে তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে যারা নির্বোধের মতো প্রচার করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলছেন, তারা অত্যন্ত অন্যায় করছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্বরূপ ও তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছেন। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে একজন সাধারণ মানুষ হতে পারেন? ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারা শুদ্ধ ভক্তেরা কখনই বিভ্রান্ত হন না, কারণ তাঁরা জানেন কোন্ট্রি কি। ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকগুলি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাই, তা দর্শন করবার জন্য মূর্খ ভাষ্যকারদের ভাষ্যরূপ মশালের আলোর প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৫২

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; সুদুর্দর্শম্-অতি দুর্লভ দর্শন: ইদম্ এই; রূপম্-রূপ; দৃষ্টবান্ অসি-দেখলে; যৎ-যে; মম-আমার; দেবাঃ-দেবতারা; অপি-ও; অস্য-এই; রূপস্য-রূপের; নিত্যম্ সর্বদা, দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ -দর্শনাকাঙক্ষী।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:

আমার দ্বিভুজ রূপ দুর্লভ দর্শন।
তুমি যা হেরিছ আজ হয়ে একমন ॥
ব্রহ্মা শিব আদি দেব সে আকাঙক্ষা করে।

শুদ্ধ ভক্ত হয় যারা বুঝিবারে পারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভদর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের অষ্টচত্বারিংশতি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করে উপসংহারে অর্জুনকে বললেন যে, তাঁর সেই রূপ বহু পুণ্যকর্ম, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ কিংবা দানের মাধ্যমে দর্শন করা সম্ভব নয়। এখানে সুদুর্দর্শম্ কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপটি আরও গোপনীয়। বেদ অধ্যয়ন, জ্ঞান, তপশ্চর্যা আদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একটু ভক্তিযোগ মিশিয়ে দিলে শ্রীকৃষেফর বিশ্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে। তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু ভক্তির সংযোগ না থাকলে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। সেই কথা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বরূপের ঊর্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণের যে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ তা দর্শন করা ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ। তাঁরাও তাঁকে দর্শন করতে চান এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি যখন তাঁর মাতা দেবকীর গর্ভে অবস্থান-লীলা করছিলেন, তখন তাঁর বিস্ময়কর লীলা দর্শন করবার জন্য স্বর্গের সমস্ত দেব-দেবীরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোরম স্তবস্তুতি নিবেদন করছিলেন, যদিও তিনি তখনও তাঁদের সম্মুখে দৃশ্যমান হননি। এমন কি তাঁর দর্শন লাভ করার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করেছিলেন। মূর্খ লোকেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে তাঁর অন্তরস্থিত নির্বিশেষ কোনও কিছু কাল্পনিক সত্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে, কিন্তু সেই সবই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে আছেন।

ভগবদ্গীতাতে (৯/১১) এই কথাও প্রতিপন্ন হয়েছে, অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্-যারা তাঁকে অবজ্ঞা করে, সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির কাছে তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, আনন্দময় ও নিত্য এবং সেই কথা ব্রহ্মসংহিতাতে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁর দেহ কখনই জড় দেহের মতো নয়। কিন্তু যারা ভগবদ্গীতা অথবা অনুরূপ বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে বুদ্ধির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তারা যখন জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেষ্টা করে, তখন তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ এবং মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিতরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন। তবুও কিছু মানুষ মনে করে যে, যদিও তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তবুও তাঁকে জড় দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। পরিণামে তারা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ, নিরাকার। তাই তারা মনে করে যে, সেই নিরাকার রূপ থেকে এই জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সবিশেষ রূপ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এটি একটি জড়-জাগতিক বিচার-বিবেচনা। আর একটি বিচার-বিবেচনা হচ্ছে কল্পনাপ্রসূত। যারা জ্ঞানের অন্বেষণ করছে, তারাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করে এবং তারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বরূপের থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এভাবেই অনেকে মনে করে, অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তা তাঁর স্বরূপ থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে, পরমেশ্বরের সাকার রূপ কল্পনা মাত্র। তারা বিশ্বাস করে যে, চরম স্তরে পরমতত্ত্ব কোন পুরুষ নন। কিন্তু ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অপ্রাকৃত তত্ত্ব লাভের পন্থা

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করাকেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈদিক পন্থা এবং যাঁরা যথাযথভাবে সেই বৈদিক ধারার অনুসরণ করেছেন, তাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন এবং বারবার তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাঁদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি জন্মায়। আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া শক্তির দ্বারা আবৃত থাকেন। তিনি যার-তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। যাঁর কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে দেখতে পান। বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যিনি নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে সমর্পণ করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় মগ্ন থেকে এবং ভক্তিযোগে কৃষ্ণসেবা করার ফলে সাধকের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। এই ধরনের দিব্য দর্শন স্বর্গের দেব-দেবীদের পক্ষেও সচরাচর সম্ভব হয় না। তাই, কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করা এমন কি দেব-দেবীদের পক্ষেও দুষ্কর এবং উন্নত স্তরের দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপ দর্শন করবার জন্য সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকেন। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা খুবই দুস্কর এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা তাঁর থেকে অনেক অনেক বেশি দুষ্কর।

শ্লোক ৫৩

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ন-না; অহম্-আমি; বেদৈঃ-বেদ অধ্যয়নের দ্বারা; ন-না; তপসা-তপস্যার দ্বারা; ন-না; দানেন-দানের দ্বারা; ন-না; চ-৩; ইজ্যয়া-পূজার দ্বারা; শক্যঃ -সমর্থ হয়; এবংবিধঃ-এই প্রকার; দ্রষ্টুম্-দর্শন করতে; দৃষ্টবান্ দেখছ; অসি-তুমি; মাম্-আমার; যথা-যেরূপ।

গীতার গান

বেদ নিষ্ঠা জপ তপ কিংবা দান পুণ্য।
পূজাপাঠ যত কিছু ধর্মপথ অন্য ॥
কোনটাই নহে যোগ্য এ রূপ দেখিতে।
যদ্যপি সে অবতীর্ণ আমি পৃথিবীতে ॥

অনুবাদ

তুমি তোমার দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার যেরূপ দর্শন করছ, সেই প্রকার আমাকে বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও পূজার দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের সামনে চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন এবং তার পরে তিনি তাঁর দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হন। যারা ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিক অথবা ভক্তিবিহীন, তাদের পক্ষে এই রহস্যের মর্ম উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুষ্কর। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের জ্ঞানের দ্বারা অথবা পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে জানা অত্যন্ত দুষ্কর। এমন কি যাঁরা কেবল নামে মাত্র মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করেন, তাঁদের পক্ষেও ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাঁরা কেবল মন্দিরেই, যান, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে জানতে পারেন না। কেবল মাত্র

ভক্তিযোগের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৫৪

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা-ভক্তির দ্বারা; তু-কিন্তু; অনন্যয়া-কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত; শক্যঃ-সমর্থ; অহম্-আমি; এবংবিধঃ-এই প্রকার; অর্জুন-হে অর্জুন; জ্ঞাতুম্-জানতে; দ্রষ্টুম্-দেখতে; চ-ও; তত্ত্বেন-তত্ত্বত; প্রবেষ্টুম্-প্রবেশ করতে; চ-ও; পরন্তপ-হে পরন্তপ।

গীতার গান

অনন্য ভক্তি যে হয় একমাত্র কাম।
হে অর্জুন দেখিবারে যোগ্য মোর ধাম ।
সেই সে বুঝিতে পারে তত্ত্বে দেখিবারে।
নিত্য লীলাতে মোর সে প্রবেশ করে ।

অনুবাদ

হে অর্জুন! হে পরন্তপ! অনন্য ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এই প্রকার আমাকে তত্ত্বত জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

তাৎপর্য

অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। এই শ্লোকে ভগবান নিজেই স্পষ্টভাবে সেই কথার বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে তত্ত্বজ্ঞান-বর্জিত ভাষ্যকারেরা, যাঁরা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করেন, তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তাঁরা কেবল তাঁদের সময়েরই অপচয় করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কে, তা কেউই জানতে পারে না। কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে তাঁর জনক-জননীর সামনে আবির্ভূত হলেন এবং তার পরেই তাঁর দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হলেন। বেদ অধ্যয়ন করে কিংবা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা করে এই সব ব্যাপার বুঝতে পারা খুবই কঠিন। এখানে তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউই তাঁকে দেখতে পায় না কিংবা এই সব তত্ত্ব-উপলব্ধিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা বৈদিক শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ছাত্র, তাঁরাই কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে নানাভাবে তাঁকে জানতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চায়, তা হলে তাকে শাস্ত্রের এই সমস্ত নির্দেশগুলি মানতে হবে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কৃচ্ছ্রসাধন করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করতে হলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জন্মাষ্টমীতে এবং প্রতি মাসে দুটি একাদশীতে উপবাস-ব্রত পালন করতে পারি। দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দান তাঁদেরকেই করতে হবে, যাঁরা সারা বিশ্ব জুড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে রত। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে মানব-সমাজের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ মহাবদান্য অবতার বলে সম্ভাষণ করেছেন, কারণ ব্রহ্মার দুর্লভ যে কৃষ্ণপ্রেম তা তিনি অকাতরে সকলকে বিতরণ করেছেন। সুতরাং, কেউ যদি তাঁর রোজগারের কিছু অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারে রত ভক্তদের দান করেন এবং সেই দান

যদি কৃষ্ণভাবনামৃত বিস্তারের জন্য নিয়োজিত হয়, তবে সেটি হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর কেউ যদি মন্দিরের বিধিবিধান অনুযায়ী আরাধনা করেন (ভারতবর্ষের মন্দিরগুলিতে সাধারণত শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বিরাজ করেন), তা হলে পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা ও সম্মান নিবেদন করার দ্বারা উন্নতি সাধনের এটি একটি বিরাট সুযোগ। কনিষ্ঠ অধিকারী অর্থাৎ ভক্তিমার্গে যারা নবীন, তাদের পক্ষে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা অর্চন করা আবশ্যক। বৈদিক শাস্ত্রে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে-

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

ভগবানের প্রতি যিনি অপ্রতিহতা ভক্তিসম্পন্ন এবং ভগবানের প্রতি যেই রকম গুরুদেবের প্রতিও সেই রকম ভক্তিসম্পন্ন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। কেবল মাত্র মানসিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝা যায় না। যে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা লাভ করেনি, তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা অসম্ভব। এখানে তু শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্য কোনও পন্থা ব্যবহার করা যাবে না, অনুমোদন করতে পারা যাবে না, কিংবা সফল হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ রূপ অর্জুনকে প্রদর্শিত বিশ্বরূপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। চতুর্ভুজধারী নারায়ণ রূপ এবং দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ হচ্ছেন নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছিল তা হচ্ছে অনিত্য। সুদুদর্শম্ শব্দটির অর্থ 'দর্শন করা অত্যন্ত দুষ্কর'। অর্থাৎ তাঁর সেই বিশ্বরূপ কেউই দর্শন করেননি। ভগবান এখানে এটিও বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর ভক্তকে তাঁর সেই রূপ দেখাবার কোন প্রয়োজনও হয় না। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ দেখিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ যদি ভগবানের অবতার বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চান, তা হলে তিনি সত্যি সত্যি ভগবানের অবতার কি না তা জানবার জন্য মানুষ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখানোর কথা বলতে পারে।

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ন শব্দটি বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে পুঁথিগত শিক্ষা লাভের প্রশংসা অর্জনের প্রতি বেশি গর্বিত হওয়া কারও পক্ষে উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি অনুশীলনেই নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। কেবল মাত্র তবেই ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনায় প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে রূপান্তরিত হলেন এবং তার পরে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরে রূপান্তরিত হলেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর যে চতুর্ভুজ এবং অন্যান্য রূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা তো দূরে থাক, তাঁর এই সমস্ত রূপ থেকেও শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁর অভিন্ন চতুর্ভুজ প্রকাশ (যাঁকে মহাবিষ্ণু নামে সম্বোধন করা হয়, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করে আছেন এবং যাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হচ্ছে এবং লয় হচ্ছে), তিনিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। তাই ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) বলা হয়েছে-

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"মহাবিষ্ণু, যাঁর মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করছে এবং কেবল মাত্র যাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলি আবার তাঁর মধ্য থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনিও হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ।" তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সবিশেষ রূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম আরাধ্য এবং তিনি হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তিনিই হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত রূপের উৎস, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের রূপের উৎস এবং তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ। সেই তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।
বৈদিক শাস্ত্রে (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১) উল্লেখ আছে-

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥

"আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, কারণ তাঁকে জানার অর্থ সমগ্র বেদকে জানা এবং সেই কারণেই তিনি হচ্ছেন পরম গুরু।" তার পরে বলা হয়েছে, কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্-"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" (গোপালতাপনী ১/৩) একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ -"সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনিই আরাধ্য।" একোহপি সন্ বহুধা যোহবভাতি- "শ্রীকৃষ্ণ এক, কিন্তু তিনি অনন্ত রূপ ও অবতারের মাধ্যমে প্রকাশিত হন।" (গোপালতাপনী ১/২১)
ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বলা হয়েছে-

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় একটি শরীর আছে। তাঁর কোনও আদি নেই, কেন না তিনি সব কিছুরই উৎস। তিনি হচ্ছেন সকল কারণের কারণ।"
অন্যত্র বলা হয়েছে, যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি"সেই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কখনও কখনও এই জগতে অবতরণ করেন।" তেমনই, শ্রীমদ্ভাগবতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমস্ত অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের নামও আছে। কিন্তু তারপর সেখানে বলা হয়েছে যে, এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান (এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্)।
তেমনই, ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ-"আমার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই।" ভগবদ্গীতায় তিনি আরও বলেছেন, অহমাদিহি দেবানাম্"সমস্ত দেবতাদের আদি উৎস হচ্ছি আমি।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হওয়ার ফলে অর্জুনও, সেই সম্বন্ধে বলছেন, পরং ব্রহ্মা পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান- "এখন আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি যে, তুমি হচ্ছ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমতত্ত্ব এবং তুমি হচ্ছ সকলের পরম আশ্রয়।" তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তা ভগবানের আদি স্বরূপ নয়। তাঁর আদি স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সহস্র সহস্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট তাঁর যে বিশ্বরূপ, তা কেবল তাদেরকেই আকৃষ্ট করবার জন্য যাদের ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি নেই। এটি ভগবানের আদি স্বরূপ নয়।
যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যাঁরা ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত রসে প্রেমভক্তিতে যুক্ত, বিশ্বরূপ তাঁদের আকৃষ্ট করে না। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় করেন। তাই অর্জুন, যিনি সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে এই বিশ্বরূপের প্রকাশ মোটেই আনন্দদায়ক ছিল না। বরং, তা

ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। অর্জুন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সহচর, অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাই, তিনি বিশ্বরূপের দ্বারা আকৃষ্ট হননি। যারা সকাম কর্মের দ্বারা নিজেদের উন্নীত করতে চান, তাদের কাছে এই রূপ অতি আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় রত, তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপই হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয়।

শ্লোক ৫৫

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

মৎকর্মকৃৎ-আমার কর্মে যুক্ত; মৎপরমঃ-মৎপরায়ণ; মদ্ভক্তঃ-আমাতে ভক্তিযুক্ত; সঙ্গবর্জিতঃ-জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত; নির্বৈরঃ শত্রুভাব রহিত; সর্বভূতেষু-সর্ব জীবের প্রতি; যঃ-যিনি; সঃ-তিনি; মাম্-আমাকে; এতি-লাভ করেন; পাণ্ডব-হে পাণ্ডুপুত্র।

গীতার গান

আমার সন্তোষ লাগি কর সব কর্ম ।
নিত্য যুক্ত মোর ভক্ত সে পরম ধর্ম ॥
তার কোন শত্রু নাই সর্বভূত মাঝে।
সেই মোর শুদ্ধ ভক্ত থাকে মোর কাছে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি চিৎ-জগতের কৃষ্ণলোকে সমস্ত ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে এই বিধি অনুশীলন করতেই হবে, যা পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলে দিয়েছেন। তাই, এই শ্লোকটিকে ভগবদ্গীতার নির্যাস বলে মনে করা হয়। ভগবদ্গীতা এমনই একটি শাস্ত্রগ্রন্থ, যা বদ্ধ জীবদের সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই সমস্ত বদ্ধ জীব পারমার্থিক জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব করবার উদ্দেশ্যে জড় জগতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। এখানে এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার দ্বারা আমরা পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ-ভক্তিযোগে সাফল্য লাভ করতে পারি।

আমাদের সমস্ত শক্তি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে রূপান্তরিত করা উচিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ২/২৫৫) বলা হয়েছে-

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথাহমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধযুক্ত ছাড়া অন্য কোন রকম কাজ করাই উচিত নয়। এই ধরনের কাজকে

বলা হয় কৃষ্ণকর্ম। আমরা নানা রকমের কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারি, কিন্তু সেই কর্মফল ভোগ করার প্রতি আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের সমস্ত কর্মের ফল তাঁকেই অর্পণ করা উচিত। যেমন, কেউ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর সেই কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনামৃতে রূপান্তরিত করতে হলে, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবসা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই ব্যবসায়ের মালিক হন, তা হলে সেই ব্যবসায়ের সমস্ত লাভের ভোক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কোন ব্যবসায়ীর যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে এবং তিনি যদি তা শ্রীকৃষ্ণকে দান করতে চান, তা হলে তিনি তা করতে পারেন। এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈরি না করে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করতে পারেন। তিনি সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজার আয়োজন করতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তি সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থাবলীতে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া আছে। এই সমস্তই হচ্ছে কৃষ্ণকর্ম। কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সেই ফল অর্পণ করা উচিত। খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করে দেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন, তা হলে সেখানে বসবাস করতেও কোন বাধা নেই, তবে মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণই বাড়িটির মালিক। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জন করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। সেটিও কৃষ্ণকর্ম। আমরা একটি বাগান করতে পারি। যারই এক ফালি জমি আছে ভারতবর্ষে সকলেরই, এমন কি নিতান্ত গরিব লোকেরও কিছু না কিছু জমি আছে, সেই জমিতে বাগান করে তার ফুল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারি। আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি, কারণ তুলসীর পাতা, তুলসীর মঞ্জরী ভগবানের সেবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তা অনুমোদন করেছেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্। তিনি বলেছেন যে, কেউ যদি পত্র, পুষ্প, ফল অথবা একটু জল ভক্তি সহকারে তাঁকে অর্পণ করেন, তা হলে তিনি প্রীত হন। এই 'পত্র' বলতে তুলসী পত্রকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি এবং তাতে জল দিতে পারি। এভাবেই অত্যন্ত দরিদ্র যে মানুষ, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।
মৎপরমঃ কথাটি তাঁকেই উল্লেখ করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে তাঁর সঙ্গ লাভ করাটাই জীবনের পরম ধর্ম বলে মনে করেন। এই ধরনের মানুষ চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, স্বর্গলোক অথবা এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই সবের প্রতি তাঁর কোনই আকর্ষণ নেই। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে প্রবিষ্ট হওয়া। আর এমন কি সেই অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে দেদীপ্যমান ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতেও তিনি চান না। কারণ তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক শ্রীকৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করা। সেই গ্রহলোক সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাই তিনি আর অন্য কিছুর জন্য আগ্রহী নন। মদ্ভক্তঃ কথাটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন, বিশেষ করে নববিধা ভক্তি-শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। যে কেউই ভক্তিযোগের এই নয়টি পন্থা অথবা আটটি অথবা সাতটি অথবা যে কোন একটির সেবায় যুক্ত হতে পারেন, এবং তাঁর ফলে অবশ্যই তিনি সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।
সঙ্গবর্জিতঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণবিমুখ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকেরাই কেবল কৃষ্ণবিমুখ নয়, যারা ফলাশ্রিত কর্ম ও জল্পনা-

কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত, তারাও কৃষ্ণবিমুখ। সুতরাং, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব ১/১১) শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

এই শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করতে চান, তাঁকে সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁকে অবশ্যই সকাম কর্ম ও মানসিক জল্পনা-কল্পনার প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। যখন কেউ এই প্রকার অবাঞ্ছিত সঙ্গ ও জড়-জাগতিক বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিজ্ঞান অনুশীলন করেন। তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্ (হরিভক্তিবিলাস ১১/৬৭৬)। শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে, কৃষ্ণসেবার যা অনুকূল তা সংকল্প করতে হবে এবং কৃষ্ণসেবার যা প্রতিকূল তা বর্জন করতে হবে। কংস ছিল শ্রীকৃষ্ণের শত্রু। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় থেকেই কংস কতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করত। কিন্তু যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারত না, তাই সে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করত। এভাবেই খেতে, বসতে, শুতে সব সময় সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকত। কিন্তু তার সেই কৃষ্ণভাবনা অনুকূল ছিল না এবং তাই যদিও সে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, তা সত্ত্বেও তাকে অসুর বলে গণ্য করা হত এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সেটি কাম্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত মুক্তি চান না, এমন কি তিনি সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবনেও যেতে চান না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, তিনি যেন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে যেতে পারেন।

কৃষ্ণভক্ত সকলেরই বন্ধু ভাবাপন্ন হন। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন শত্রু নেই (নির্বৈরঃ)। এটি কেমনভাবে হয়? কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত জানেন যে, কৃষ্ণভক্তিই কেবল মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাই তিনি মানব-সমাজে কৃষ্ণভাবনার এই পন্থা প্রচলন করতে চান। নিজের জীবন বিপন্ন করে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যিশুখ্রিস্ট। ভগবৎ-বিদ্বেষীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভগবানের বাণী প্রচার করেছিলেন। আমাদের অবশ্য কখনই মনে করা উচিত নয় যে, যিশুখ্রিস্টকে হত্যা করা হয়েছিল। ভগবানের ভক্তের কখনই বিনাশ হয় না। ভারতবর্ষেও তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন ঠাকুর হরিদাস ও প্রহ্লাদ মহারাজ। এঁরা কেন এভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছিলেন? কারণ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করতে চেয়েছিলেন এবং তা ছিল কষ্টসাধ্য। কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ এই জগতে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। সুতরাং, মানব-সমাজে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে প্রতিবেশী মানুষকে সব রকম জড়-জাগতিক সমস্যাগুলির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। এভাবেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা করে চলেন। এখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে ভগবানের সেবা করে চলেন; তাঁদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতই না কৃপাময়। তাই এটি নিশ্চিত যে, এই প্রকার ব্যক্তিরা দেহ ত্যাগ করার পরে ভগবানের পরম ধামে ফিরে যান।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ, যা হচ্ছে একটি অস্থায়ী প্রকাশ এবং কালরূপে যা সব কিছুই গ্রাস করে এবং এমন কি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ সবই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত প্রকাশের আদি

উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এমন নয় যে, আদি বিশ্বরূপ অথবা শ্রীবিষ্ণুর থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত রূপের আদি উৎস। শত সহস্র বিষ্ণু আছেন, কিন্তু ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর আদিরূপ ছাড়া আর কোন রূপেরই গুরুত্ব নেই। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, প্রেম ও ভক্তি সহকারে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপের প্রতি ঐকান্তিকভাবে আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁকে হৃদয়ে অবলোকন করেন এবং এ ছাড়া তাঁরা আর কিছুই দেখতে পান না। তাই, আমাদের বুঝা উচিত, এই একাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপই হচ্ছে পরম ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-'বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায় - ভক্তিযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাত্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উৰাচ-অর্জুন বললেন; এবম্-এভাবেই; সতত-সর্বদা; যুক্তাঃ-নিযুক্ত: যে-যে সমস্ত; ভক্তাঃ-ভক্তেরা; ত্বাম্-তোমার; পর্যুপাসতে যথাযথভাবে আরাধনা করেন; যে যাঁরা; চ-ও; অপি-পুনরায়; অক্ষরম্-ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্তম্-অব্যক্ত; তেযাম্-তাঁদের মধ্যে; কে-কারা; যোগবিত্তমাঃ-যোগীশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন :
যে শুদ্ধ ভক্ত সে কৃষ্ণ তোমাতে সতত।
অনন্য ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে যুক্ত ॥
আর যে অব্যক্তবাদী অব্যক্ত অক্ষরে।
নিষ্কাম করম করি সদা চিন্তা করে ॥
তার মধ্যে কেবা উত্তম যোগবিৎ হয়।
জানিবার ইচ্ছা মোর করহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ-তত্ত্ব, নির্বিশেষ-তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত ও যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত, পরমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাঁরা হচ্ছেন নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। সবিশেষবাদী ভক্তেরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না। তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অব্যক্ত তার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেন।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার মধ্যে ভক্তিযোগই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন, তা হলে তাঁকে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে।

ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় সবিশেষবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞেস করছেন, এদের মধ্যে কোন্টি শ্রেয়? পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভক্তিযোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও প্রত্যক্ষ পন্থা।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আমাদের বুঝিয়েছেন যে, জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎস্ফুলিঙ্গ। আর পরমতত্ত্ব হচ্ছেন বিভুচৈতন্য। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই বিভুচৈতন্য ভগবানের প্রতি তার চেতনাকে নিবদ্ধ করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন। আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তাঁর অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হয়েছে যে, সবিশেষ কৃষ্ণরূপের প্রতি সকলের আসক্ত হওয়া উচিত, কেন না সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি।

তবুও কিছু লোক আছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত নয়। তারা এই বিষয়ে এমনই প্রচণ্ডভাবে আগ্রহহীন যে, ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা কালেও তারা পাঠকমহলকে কৃষ্ণবিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দিকে তাদের সমস্ত ভক্তি পরিচালিত করে থাকে। যে পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত, সেই নির্বিশেষ রূপের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্দ করে।

বাস্তবিকপক্ষে, পরমার্থবাদীরা দুই রকমের হয়ে থাকেন। এখন অর্জুন জানতে চাইছেন, এই দুই রকমের পরমার্থবাদীদের মধ্যে কোন্ পন্থাটি সহজতর এবং কোন্টি শ্রেয়তম। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্তযুক্ত। নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট নন। তিনি জানতে চাইছেন যে, তাঁর অবস্থা নিরাপদ কি না। এই জড় জগতেই হোক বা চিৎ-জগতেই হোক, ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের পক্ষে একটি সমস্যাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, কেউই পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে না। তাই অর্জুন বলতে চাইছেন, "এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ?" একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম, কারণ তা হলে অনায়াসে তাঁর অন্য সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং তাতে কৃষ্ণপ্রেমে কোন বিঘ্ন ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়ি-আমাতে; আবেশ্য-নিবিষ্ট করে; মনঃ-মন; যে-যাঁরা; মাম্-আমাকে; নিত্য-সর্বদা; যুক্তাঃ-নিযুক্ত হয়ে; উপাসতে-উপাসনা করেন; শ্রদ্ধয়া-শ্রদ্ধা সহকারে; পরয়া-অপ্রাকৃত; উপেতাঃ -যুক্ত হয়ে; তে-তাঁরা; মে-আমার; যুক্ততমাঃ-সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী; মতাঃ-মতে।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
আমার স্বরূপ এই যার মন সদা।
আবিষ্ট হইয়া থাকে উপাসনা হৃদা ॥
শ্রদ্ধার সহিত করে প্রাণ ভক্তিময়।
উত্তম যোগীর শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন-যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যাঁর মন তাঁর সবিশেষ রূপে আবিষ্ট এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এভাবেই যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তিনি আর কখনও জাগতিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্যই সব কিছু তখন করা হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। কখনও তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করেন, কখনও তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন, কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রন্ধন করেন, কখনও বা তিনি বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোন কিছু খরিদ করেন, কখনও তিনি মন্দির অথবা বাসন পরিষ্কার করেন-অর্থাৎ, কৃষ্ণসেবায় কর্ম না করে তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট করেন না। এই ধরনের কর্মই হচ্ছে পূর্ণ সমাধি।

শ্লোক ৩-৪

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।

সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ৷৷ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্লুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যে-যাঁরা; তু-কিন্তু; অক্ষরম্-ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যা; অনির্দেশ্যম্-অনির্বচনীয়; অব্যক্তম্-অব্যক্ত; পর্যুপাসতে-উপাসনা করেন; সর্বত্রগম্-সর্বব্যাপী; অচিন্ত্যম্-অচিন্ত্য; চ-ও; কূটস্থম্-অপরিবর্তনীয়; অচলম্-অচল; ধ্রুবম্ শাশ্বত; সংনিয়ম্য-সংযত করে; ইন্দ্রিয়গ্রামম্-সমস্ত ইন্দ্রিয়; সর্বত্র সর্বত্র; সমবুদ্ধয়ঃ-সমভাবাপন্ন; তে-তাঁরা; প্রাপ্লুবন্তি-প্রাপ্ত হন; মাম্-আমাকে, এব-অবশ্যই; সর্বভূতহিতে-সমস্ত জীবের কল্যাণে; রতাঃ-রত হয়ে।

গীতার গান

অক্ষর অব্যক্তসক্ত নির্দিষ্টভাব।
ইন্দ্রিয় সংযম করি হিতৈষী স্বভাব ॥
সর্বব্যাপী অচিন্ত্য যে কূটস্থ অচল।
ধ্রুব নির্বিশেষ সত্ত্বে থাকিয়া অটল ॥
সমবুদ্ধি হয়ে সব করে উপাসনা।
সে আমাকে প্রাপ্ত হয় করিয়া সাধনা ॥

অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁরা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না, কিন্তু পরোক্ষ পন্থায় সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন, তাঁরাও পরিণামে সেই পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। সেই বিষয়ে বলা হয়েছে, "বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানী যখন জানতে পারে যে, বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছুর পরম কারণ, তখন সে আমার চরণে প্রপত্তি করে।" বহু জন্মের পরে কোন মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন। এই শ্লোকগুলিতে যে পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে কেউ যদি ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাঁকে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে, সকলের প্রতি সেবাপরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে হবে, তা না হলে কখনই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক কৃচ্ছসাধন করার পরই কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি আসে। স্বতন্ত্র আত্মার অন্তস্তলে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন আদি সব রকমের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়। তখন উপলব্ধি করা যায় যে, পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। এই উপলব্ধির ফলে আর কারও প্রতি হিংসাভাব থাকে না। তখন আর মানুষে ও পশুতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। কারণ, তখন কেবল আত্মারই দর্শন হয়, বাইরের আবরণটিকে তখন আর দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নির্বিশেষ উপলব্ধি অত্যন্ত দুষ্কর।

শ্লোক ৫

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥৫॥

ক্লেশঃ-ক্লেশ; অধিকতরঃ-অধিকতর; তেষাম্-তাদের; অব্যক্ত-অব্যক্ত; আসক্ত-আসক্ত; চেতসাম্-যাদের মন; অব্যক্তা-অব্যক্ত; হি-অবশ্যই; গতিঃ-গতি; দুঃখম্-দুঃখময়; দেহবপ্তিঃ-দেহাভিমানী জীব দ্বারা; অবাপ্যতে-লাভ হয়।

গীতার গান

কিন্তু এইমাত্র ভেদ জান উভয়ের মধ্যে।
ভক্ত পায় অতি শীঘ্র আর কষ্টে সিদ্ধে ॥
অব্যক্ত আসক্ত সেই বহু ক্লেশ তার।
অব্যক্ত যে গতি দুঃখ দেহীর অপার ॥

অনুবাদ

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার প্রয়াসী, তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী এবং যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। এখন, এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানযোগের পন্থা যদিও পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয়, তবুও তা অত্যন্ত ক্লেশসাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা, সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার যে পন্থা, তা অত্যন্ত সহজ এবং তা হচ্ছে দেহধারী জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অনাদিকাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। সে যে তার দেহ নয়, সেই ধারণা করাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই, ভক্তিযোগী শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করেন, কারণ তাতে একটি সবিশেষ রূপের ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের যে পূজা, তা মূর্তিপূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের যে উপাসনা তা সগুণ উপাসনা, কেন না জড় গুণাবলীর দ্বারা ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড় গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে' তা জড় নয়। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব।

সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়। যেমন, রাস্তার পাশে আমরা ডাকবাক্স দেখতে পাই এবং সেই বাক্সে আমরা যদি চিঠিপত্র ফেলি, তা হলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যে কোন একটি পুরানো বাক্সে অথবা ডাকবাক্সের অনুকরণে তৈরি কোন বাক্স, যা পোস্ট অফিসের অনুমোদিত নয়, তাতে চিঠি ফেললে কোন কাজ হবে না। তেমনই, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি হচ্ছেন ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি, যাঁকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ। এই অর্চাবিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। ভগবান সেই রূপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপ অবতারের মাধ্যমে তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের সুবিধার জন্য তিনি এই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

সুতরাং, ভক্তের পক্ষে সরাসরিভাবে অনতিবিলম্বে ভগবানের সান্নিধ্য লাভকরতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষবাদের পন্থা অবলম্বন করেন,

তাঁদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। তাঁদের উপনিষদ আদি বৈদিক গ্রন্থের মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে হয়, তাঁদের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং এই সবগুলিই সম্যভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পন্থা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত যে মানুষ সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তিনি কেবলমাত্র ভক্তিভরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে অনায়াসে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে পরিণামে যে তাঁদের পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি না-ও হতে পারে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবিশেষবাদীরা কোন রকম বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে, কোন রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধরনের একটি শ্লোক আছে, তাতে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করাই যদি পরম উদ্দেশ্য হয় (এই আত্মনিবেদনের পন্থাকে বলা হয় ভক্তি), তা হলে তা না করে কোন্টি ব্রহ্ম আর কোন্টি ব্রহ্ম নয়, এই তত্ত্ব জানবার জন্য সারাটি জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক হয়। তাই, অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না করতে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার পরিণতি অনিশ্চিত।

জীব হচ্ছে নিত্য, স্বতন্ত্র আত্মা এবং সে যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, তা হলে সে তার স্বরূপের সৎ ও চিৎ প্রবৃত্তির উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু আনন্দময় প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানযোগের পথে বিশেষভাবে অগ্রণী এই প্রকার অধ্যাত্মবিৎ কোন ভক্তের কৃপায় ভক্তিযোগের পথে আসতে পারেন। সেই সময়, নির্বিশেষবাদের দীর্ঘ সাধনা তাঁর ভক্তিযোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি তখন তাঁর পূর্বার্জিত ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। তাই, দেহধারী জীবের পক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক, তার অনুশীলন ক্লেশদায়ক এবং তার উপলব্ধিও ক্লেশদায়ক। প্রতিটি জীবেরই আংশিক স্বাতন্ত্র্য আছে এবং আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি আমাদের চিন্ময় সত্তার আনন্দময় প্রবৃত্তির বিরোধী। এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় পন্থা, যার ফলে সে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, সেটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভগবদ্ভক্তিকে যদি কেউ অবহেলা করে, তা হলে তার ভগবৎ-বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে যে, তত্ত্বের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রতি, বিশেষ করে এই কলিযুগে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা করতে নিষেধ করছেন।

শ্লোক ৬-৭

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যে-যাঁরা; তু-কিন্তু; সর্বাণি-সমস্ত; কর্মাণি-কর্ম; ময়ি আমাতে, সংন্যাস্য-ত্যাগ করে; মৎপরাঃ-মৎপরায়ণ হয়ে; অনন্যেন-অবিচলিতভাবে, এব-অবশ্যই; যোগেন-ভক্তিযোগ দ্বারা; মাম্-আমাকে; ধ্যায়ন্তঃ-ধ্যান করে; উপাসতে-উপাসনা করেন; তেষাম্-তাঁদের; অহম্-আমি; সমুদ্ধর্তা-উদ্ধারকারী, মৃত্যু-মৃত্যুর; সংসার-সংসার; সাগরাৎ-সাগর থেকে; ভবামি-হই। ন চিরাৎ-অচিরেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ময়ি-আমাতে; আবেশিত-আবিষ্ট; চেতসাম্-চিত্ত।

গীতার গান

যে আমার সম্বন্ধেতে সব কর্ম করে।
আমার স্বরূপ এই নিত্য ধ্যান করে ।
জীবন যে মোরে সঁপি আমাতে আসক্ত।
অনন্য যে ভাব ভক্তি তাহে অনুরক্ত ॥
সে ভক্তকে মৃত্যুরূপ এ সংসার হতে।
উদ্ধার করিব শীঘ্র জান ভাল মতে ॥

অনুবাদ

যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেন না ভগবানের কৃপায় তাঁরা অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভগবান হচ্ছেন মহান এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মাই হচ্ছে তাঁর অধীন। প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, কিন্তু সে যদি তা না করে, তা হলে তাকে মায়ার দাসত্ব করতে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই, আমাদের পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম করতে হবে। যে কাজকর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সেই কাজ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করা উচিত। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের মানদণ্ড। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা ছাড়া ভক্ত আর কিছুই কামনা করেন না। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা এবং সেই জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন-যেমনটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। আমরা আমাদের বৃত্তিগত কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভক্তকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, যে শুদ্ধ ভক্ত এভাবেই তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে তিনি অচিরেই ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করবেন। যাঁরা যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের ঈপ্সিত লোকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাভাবে এই সমস্ত পন্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তাঁর ভক্তকে তিনি নিজেই তাঁর কাছে নিয়ে যান। অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে নানা রকম সিদ্ধি লাভের অপেক্ষা করতে হয় না।

বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে-

নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদিগতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥

অর্থাৎ, অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে নিজেই অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যান। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। শিশুকে যেমন তার বাবা-মা সর্বতোভাবে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনই ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনও রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহান কৃপাবলে তাঁর বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। মাঝ সমুদ্রে পতিত হয়েছে যে মানুষ, সে যতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন, শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলে সে অনায়াসেই রক্ষা পেতে পারে। তেমনই, ভগবানও তাঁর ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। নারায়ণীয়তে এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে-

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, সকাম কর্মের বিভিন্ন পন্থায় ব্রতী না হয়ে অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মাচরণ-দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপশ্চর্যা, যোগ আদির সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের বিশেষত্ব।

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সমন্বিত মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, যা অন্য কোন ধর্ম আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরম উপদেশ দান করে ভগবান বলেছেন-

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তখন অতীত জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং, আর অন্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভের ব্যর্থ প্রয়াস করার কোন প্রয়োজন নেই। পরম সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৮

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ময়ি-আমাতে; এব-অবশ্যই; মনঃ-মন; আধৎস্ব-স্থির কর; ময়ি-আমাতে; বুদ্ধিম্-বুদ্ধি; নিবেশয়-অর্পণ কর; নিবসিষ্যসি-বাস করবে; ময়ি-আমার নিকটে; এব-অবশ্যই, অতঃ ঊর্ধ্বম্-তার ফলে; ন-নেই; সংশয়ঃ-সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব তুমি এই দ্বিভুজ স্বরূপে।
এ মন বুদ্ধি স্থির কর ভগবৎ স্বরূপে ॥
আমার এ নিত্যরূপে নিত্যযুক্ত হলে।
অবশ্য পাইবে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলে ॥
ঊর্ধ্বগতি সেই জান না কর সংশয়।
সর্বোচ্চ ফল তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় রত, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করেন। তিনি যে প্রথম থেকেই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভক্ত জড়-জাগতিক স্তরে জীবন যাপন করেন না-তাঁর জীবন কৃষ্ণভাবনাময়। ভগবানের নাম স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই, ভক্ত যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ভক্তের জিহ্বায় নর্তন করেন। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভোগ সরাসরিভাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেয়ে ভক্ত কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠেন। ভগবানের সেবায় ব্রতী না হলে সেটি যে কি করে সম্ভব হয়, তা বুঝতে পারা যায় না, যদিও ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এই পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অথ-আর যদি; চিত্তম্-মন; সমাধাতুম্ স্থাপন করতে; ন-না; শক্নোষি-সক্ষম হও; ময়ি-আমাতে; স্থিরম্-স্থিরভাবে; অভ্যাস-অভ্যাস; যোগেন-যোগের দ্বারা; ততঃ-তা হলে; মাম্-আমাকে, ইচ্ছা-ইচ্ছা কর; আপ্তুম্-প্রাপ্ত হতে; ধনঞ্জয়-হে অর্জুন।

গীতার গান

যদি সে সহজভাবে হও অসমর্থ।
অভ্যাস যোগেতে কর লাভ পরমাত্র ।।
বিধিমার্গে রাগমার্গে যেবা মোরে চায়।
অচিরাৎ সে অভ্যাসে লোক মোরে পায় ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্তিযোগের দুটি ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে। তার প্রথমটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। আর অপরটি হচ্ছে যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের জন্য নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুশীলন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভক্তিযোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার পন্থা। ভবসংসারে বর্তমান সময়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিরত থাকার ফলে মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা কলুষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হতে থাকে এবং অবশেষে তা যখন পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন তারা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসে। মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীবনে আমি কোন না কোন মালিকের চাকরি করতে পারি, কিন্তু সেই দাসত্ব ভালবাসার নয়। আমি কেবল মাত্র কিছু টাকা পাওয়ার জন্য সেই চাকরি করি এবং সেই মালিকও আমাকে ভালবাসে না; আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে আমাকে মাহিনা দেয়। সুতরাং, সেখানে ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক জীবনের চরম পরিণতি হচ্ছে সেই নির্মল দিব্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই সেই প্রেমভক্তির স্তর লাভ করা যায়।

সকলের হৃদয়ে এই ভগবৎ-প্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ভগবৎ-প্রেম বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক সঙ্গের প্রভাবে তা কলুষিত। এখন জড় বিষয়ের প্রভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে এবং তা হলে যে কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তা পুনরুজ্জীবিত হবে। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পূর্ণ পন্থা।

ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিধিবিধান পালন করা কর্তব্য-খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, তারপর ফুল তুলে ভগবানের শ্রীচরণে তা নিবেদন করা, ভোগ রান্না করে তা ভগবানকে নিবেদন করা, প্রসাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নানা রকমের বিধিনিয়ম আছে যেগুলি অনুশীলন করতে হয়। আর নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা শ্রবণ করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে যে কেউ প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারা যায়। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে অবশ্যই ভগবৎ-প্রেম লাভকরা যায়।

শ্লোক ১০

অভ্যাসেহ প্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাল্যসি ॥ ১০ ॥

অভ্যাসে-অভ্যাস করতে; অপি-এমন কি যদি; অসমর্থঃ-অসমর্থ; অসি-হও; মৎকর্ম-

আমার কর্ম; পরমঃ-পরায়ণ; ভব-হও; মদর্থম্-আমার জন্য; অপি-ও; কর্মাণি-কর্ম; কুর্বন-করে; সিদ্ধিম্-সিদ্ধি; অবাল্যসি-লাভ করবে।

গীতার গান

অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও।
আমার লাগিয়া কর্মে সদাযুক্ত রও ॥
আমার সন্তোষ জন্য যেবা কার্য হয়।
জানিও সেসব মোরে প্রাপ্তির উপায় ।

অনুবাদ

যদি তুমি এমন কি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তা হলে আমার প্রতি কর্ম পরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

তাৎপর্য

যিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বৈধীভক্তি অনুশীলন করতে সমর্থ নন, তিনি কেবল মাত্র ভগবানের জন্য কর্ম করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই কর্ম কিভাবে সাধন করা যায়, তা ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সকলকেই সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। বহু ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁরা নানা রকম সাহায্যের আবশ্যকতা বোধ করে থাকেন। সুতরাং, কেউ যদি সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি পালন না করতে পারেন, তিনি অন্তত ভগবানের বাণী প্রচারে সহায়তা করতে পারেন। প্রতিটি প্রচেষ্টাতেই জায়গা-জমি, অর্থ, সংগঠন ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন ব্যবসা করবার জন্য জায়গার দরকার হয়, মূলধনের প্রয়োজন হয়, শ্রমের প্রয়োজন হয় এবং তা প্রসারের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেও এগুলির প্রয়োজন আছে। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বৈষয়িক কর্মগুলি সাধিত হয় কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, কিন্তু সেই একই কর্ম যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা পারমার্থিক কর্মে পরিণত হয়। যদি কারও যথেষ্ট টাকা থাকে, তা হলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য মন্দির অথবা অফিস তৈরি করতে সাহায্য করতে পারেন। কিংবা তিনি গ্রন্থাদি প্রকাশনায় সাহায্য করতে পারেন। ভগবানের সেবার জন্য নানা রকম কাজ করবার সুযোগ রয়েছে, তবে সেই কাজগুলি করতে উৎসাহী হতে হবে। কেউ যদি তার কর্মের ফল সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি অন্তত তার কিছু অংশ ভগবানের বাণী প্রচারের কাজে দান করতে পারেন। ভগবানের বাণী বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেবা করার ফলে ক্রমান্বয়ে ভগবৎ-প্রেমের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ১১

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

অথ-আর যদি; এতৎ-এই; অপি-ও; অশক্তঃ-অক্ষম; অসি-হও; কর্তুম্-করতে; মৎ-আমাতে; যোগম্-সর্বকর্ম অর্পণরূপ যোগ; আশ্রিতঃ-আশ্রয় করে; সর্বকর্ম-সমস্ত কর্মের; ফল-ফল; ত্যাগম্-ত্যাগ; ততঃ-তবে; কুরু-কর; যতাত্মবান্-সংযতচিত্তে।

গীতার গান

তাহাতেও যদি তব শক্তির অভাব।
ভক্তিযোগ আশ্রয়েতে বিরুদ্ধ স্বভাব ॥
তবে সে বৈদিক কর্ম ত্যজি কর্মফল।
অবশ্য সাধিবে তুমি যত্নেতে প্রবল ॥

অনুবাদ

আর যদি তাও করতে অক্ষম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে সংযতচিত্তে কর্মের ফল ত্যাগ কর।

তাৎপর্য

এমনও হতে পারে যে, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকের ফলে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে সহায়তা করতে অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে, সরাসরিভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে যুক্ত হন, তা হলে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে নানা রকম ওজর আপত্তি আসতে পারে অথবা নানা রকমের বাধাবিপত্তিও দেখা দিতে পারে। কারও যদিও এই রকমের সমস্যা থাকে, তাঁর প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর কর্মের সঞ্চিত ফল কোন সৎ উদ্দেশ্যে তিনি অর্পণ করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নানা রকম যজ্ঞবিধির বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেখানে বিশেষ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পূর্বকৃত কর্মের ফল অর্পণ করা যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিরুৎসাহী লোকেরা হাসপাতাল অথবা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে থাকেন। এভাবেই তাঁরা বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ দান করার মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ফল দান করে থাকেন। এই পন্থাকেও এখানে অনুমোদন করা হয়েছে, কারণ এভাবেই কর্মফল দান করার মাধ্যমে চিত্ত ক্রমশ নির্মল হতে থাকে এবং চিত্ত নির্মল হলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত অবশ্য অন্য কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতই চিত্তকে নির্মল করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের পথে যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়, তা হলে কর্মফল ত্যাগ করার পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সূত্রে সমাজসেবা, সম্প্রদায়-সেবা, জাতির সেবা, দেশের জন্য ত্যাগধর্ম আদি গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার পরিণামে কোন এক সময়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যেতে পারে। ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৬) বলা হয়েছে, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্-কেউ যদি সর্ব কারণের পরম কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ তা উপলব্ধি না করে, পরম কারণের উদ্দেশ্যে কোন কিছু অর্পণ করতে মনস্থ করে থাকেন, তা হলে সেই কর্ম অর্পণের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এক সময় জানতে পারবেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১২

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ৷

শ্রেয়ঃ-শ্রেষ্ঠ; হি-অবশ্যই; জ্ঞানম্-জ্ঞান; অভ্যাসাৎ-অভ্যাস অপেক্ষা; জ্ঞানাৎ-জ্ঞান

অপেক্ষা; ধ্যানম্ ধ্যান; বিশিষ্যতে-শ্রেষ্ঠ; ধ্যানাৎ-ধ্যান থেকে; কর্মফলত্যাগঃ-কর্মফল ত্যাগ; ত্যাগাৎ-এই প্রকার ত্যাগ থেকে; শান্তিঃ-শান্তি; অনন্তরম্-তারপর।

গীতার গান

ভক্তিযোগে অসমর্থ যেবা অভ্যাসই ভাল।
তাহাতে যে অসমর্থ জ্ঞানেতে সুফল ॥
তাহাতেও অসমর্থ আত্মচিন্তা শ্রেয় ।
তাহাতেও অসমর্থ কর্মযোগ শ্রেয় ।
কাম্য কর্মে সুখ নাই ত্যাগই উত্তম।
ত্যাগই শান্তির মূল তাতে নাহি ভ্রম ॥

অনুবাদ

তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও, তা হলে জ্ঞানের অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেন না এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি দুই রকমের-বৈধীভক্তির পন্থা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্তি-জনিত প্রেমভক্তির পন্থা। যাঁরা ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি আচরণ করতে অসমর্থ, তাঁদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের প্রভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং ধ্যানের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। কতকগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ নিরাকার বলে মনে হয় এবং সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা প্রয়োজন হয় তখনই, যখন কেউ ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে অসমর্থ হন। যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ, কোন সৎ উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, ভগবানের সমীপবর্তী হবার দুটি পন্থা আছে-তার একটি হচ্ছে ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি হচ্ছে সরাসরি পন্থা। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা এবং অপরটি হচ্ছে কর্মফল ত্যাগের পা। এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার ফলে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার পরে ধ্যানের স্তরে, তার পরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে এবং সব শেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির স্তরে। এখন, কেউ ধাপে ধাপে এগোতে পারেন, অথবা সরাসরি পন্থা গ্রহণ করতে পারে। সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতির পন্থা গ্রহণ করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবান অর্জুনকে পরোক্ষ পন্থাটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যাঁরা প্রেমভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেননি, তাঁদের জন্যই কেবল এভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রহ্ম-উপলব্ধি, পরমাত্মা-উপলব্ধি আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভগবদ্গীতায় প্রত্যক্ষ পন্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেই যেন এই সরাসরি পন্থা অবলম্বন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অদ্বেষ্টা-দ্বেষবর্জিত; সর্বভূতানাম্-সমস্ত জীবের প্রতি; মৈত্রঃ-বন্ধু-ভাবাপন্ন; করুণঃ-কৃপালু; এব-অবশ্যই; চ-ও; নির্মমঃ-মমতাশূন্য; নিরহঙ্কারঃ-অহঙ্কার রহিত; সম-সম-ভাবাপন্ন; দুঃখ-দুঃখে; সুখঃ-সুখে; ক্ষমী-ক্ষমাশীল; সন্তুষ্টঃ -পরিতুষ্ট; সততম্-সর্বদা; যোগী-ভক্তিযোগে যুক্ত; যতাত্মা-সংযত স্বভাব; দৃঢ়নিশ্চয়ঃ-দৃঢ় সংকল্পযুক্ত; ময়ি-আমাতে; অর্পিত-অর্পিত; মনঃ-মন; বুদ্ধিঃ -বুদ্ধি; যঃ-যিনি; মদ্ভক্তঃ-আমার ভক্ত; সঃ-তিনি; মে-আমার; প্রিয়ঃ-প্রিয়।

গীতার গান

আমার যে ভক্ত সর্বগুণের আধার।
সকলের মিত্র হয় হিংসা নাহি তার ॥
ভক্ত নহে হিংসার পাত্র ভক্ত সে করুণ।
জীবের দুর্দশা হেরি সদা দুঃখী মন ॥
দেহে আত্ম বুদ্ধি ভ্রম ভক্তের সে নাই।
নির্মমোনিরহঙ্কার দুঃখের বালাই ॥
সর্বত সন্তুষ্ট যোগী সে দৃঢ় নিশ্চয় ।
যত্নশীল নিজ কার্যে আমাতে বিলয় ॥
তার কার্য মন প্রাণ আমাতে নিযুক্ত ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত সর্বদাই মুক্ত ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধু-ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনার পর, এই শ্লোক দুটিতে ভগবান আবার শুদ্ধ ভক্তের অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এমন কি তিনি তাঁর শত্রুর প্রতিও শত্রুতা করেন না; তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত কর্মের দোষে এই লোকটি আমার প্রতি শত্রুক্রবৎ আচরণ করছে। তাই, কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরবে সেই কষ্ট সহ্য করাই শ্রেয়।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে-তত্তেহ নুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। ভক্ত যখনই কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, এটি তাঁর প্রতি ভগবানেরই কৃপা। তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত অপকর্মের ফলস্বরূপ আমার দুঃখের বোঝা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার ফলে আমার সেই দুঃখের ভার লাঘব হয়ে গেছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় আমি কেবল অল্প একটু কষ্ট পাচ্ছি।" তাই, নানা দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই শান্ত, নীরব ও সহনশীল। ভগবদ্ভক্ত সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও।

নির্মম বলতে বোঝায় যে, ভক্ত দেহ সম্পর্কিত দুঃখ-যন্ত্রণাকে তত গুরুত্ব দেন না, কারণ তিনি ভালভাবে জানেন যে, জড় দেহটি তিনি নন। তিনি তাঁর জড় দেহটিকে তাঁর স্বরূপ বলে মোটেই মনে করেন না। তাই, তিনি সর্বতোভাবে অহঙ্কারমুক্ত এবং দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থাতেই সম-ভাবাপন্ন। তিনি সহিষ্ণু এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অত্যধিক কষ্ট স্বীকার করে কোন কিছু পাওয়ার জন্য তিনি অধিক প্রয়াস করেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎফুল্ল। তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, কারণ তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করতে স্থিরসংকল্প এবং যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাই তিনি দৃঢ়সংকল্প। তিনি কখনই কুতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা থেকে কেউই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি সর্বতোভাবে সচেতন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শাশ্বত চিরন্তন ভগবান। তাই, কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর এই সমস্ত গুণাবলী থাকার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে নিজের সমস্ত মন ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে অর্পণ করতে পারেন। এই প্রকার উন্নতমানের ভগবদ্ভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগের বিধি-নিষেধ পালন করে সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হন। অধিকন্তু, ভগবান বলেছেন যে, এই ধরনের ভক্ত তাঁর অতি প্রিয়, কারণ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ভগবান সর্বদাই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৫

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ-যাঁর থেকে; ন-না; উদ্বিজতে-উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়; লোকঃ-লোক; লোকাৎ-লোক থেকে; ন-না; উদ্বিজতে-উদ্বেগ প্রাপ্ত হন; চ-ও; যঃ-যিনি; হর্ষ-হর্ষ; অমর্ষ-ক্রোধ; ভয়-ভয়; উদ্বেগৈঃ-উদ্বেগ থেকে; মুক্তঃ-মুক্ত; যঃ -যিনি; সঃ-তিনি; চ-ও; মে-আমার; প্রিয়ঃ-অত্যন্ত প্রিয়।

গীতার গান

তার দ্বারা কোন লোক দুঃখ নাহি পায়।
কাহাকেও মনে প্রাণে দুঃখ নাহি দেয় ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ এসবে সে মুক্ত।
অতএব মোর ভক্ত অতি প্রিয়যুক্ত ॥

অনুবাদ   ভিতর চি

যাঁর থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্তের আরও কয়েকটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভক্ত কখনই কারও দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভয় অথবা অসন্তোষের কারণ হন না। যেহেতু ভক্ত সকলের প্রতিই কৃপা পরায়ণ, তাই তিনি কখনই এমন কোন কাজ করেন না, যার ফলে কারও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনই, কেউ যদি ভক্তকে উৎকণ্ঠিত করতে চায়, তাতে তিনি কোন মতেই বিচলিত হন না। ভগবানেরই কৃপার ফলে তিনি এমনভাবে অভ্যস্ত যে, কোন রকম বাহ্যিক

গোলযোগের দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, ভক্ত যেহেতু সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই জড় জগতের কোন অবস্থাই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। বৈষয়িক মানুষ সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ও দেহসুখের সম্ভাবনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, অন্যের কাছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এমন সমস্ত সামগ্রী রয়েছে, তা তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি খুব বিমর্ষ হন এবং পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠেন। যখন তিনি দেখেন তাঁর শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তিনি ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর জীবনে যখন ব্যর্থতা আসে, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত, তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৬

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অনপেক্ষঃ-নিরপেক্ষ; শুচিঃ-শুচি; দক্ষঃ-নিপুণ; উদাসীনঃ-উদাসীন; গতব্যথঃ -উদ্বেগশূন্য; সর্বারম্ভ-সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার; পরিত্যাগী-ফলত্যাগী; যঃ-যিনি; মদ্ভক্তঃ-আমার ভক্ত; সঃ-তিনি; মে-আমার; প্রিয়ঃ-প্রিয়।

গীতার গান

লোক ব্যবহারে ভক্ত সদা নিরপেক্ষ।
উদাসীন গতব্যথ শুচি আর দক্ষ ॥
শুচি হয় মোর ভক্ত ব্রহ্ম সে স্বভাবে।
জাতি বুদ্ধি নাহি কর ভক্ত সে বৈষ্ণবে ॥

অনুবাদ

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তকে টাকা-পয়সা দান করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি কখনও সেগুলি পাবার জন্য সংগ্রাম করেন না। ভগবানের কৃপায় যদি আপনা থেকেই তাঁর কাছে টাকা-পয়সা আসে, তাতে তিনি বিচলিত হন না। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই দিনে দুবার স্নান করেন এবং ভগবানের সেবার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। তাই, তিনি স্বভাবতই অন্তরে ও বাইরে অত্যন্ত নির্মল। ভক্ত সর্বদাই সুদক্ষ, কারণ জীবনের সমস্ত কর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং প্রামাণিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বতোভাবে নিঃসন্দেহ। ভক্ত কখনই কোন বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন না; তাই তিনি সর্বদাই উদাসীন। তিনি সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত, তাই তিনি কখনই ক্লেশ ভোগ করেন না। তিনি জানেন যে, তাঁর দেহটি একটি উপাধিমাত্র। তাই কখনও যদি দেহের কোন রকম যাতনা হয়, তাতে তিনি অবিচলিত থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত এমন কিছুর প্রয়াস করেন না, যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে হলে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু ভক্ত কখনও এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হন না, যদি তা তাঁর ভগবদ্ভক্তির উন্নতির সহায়ক না হয়। তিনি ভগবানের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন এবং সেই জন্য

সমস্ত রকমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বড় বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রয়াসী হন না।

শ্লোক ১৭

যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ-যিনি; ন-না; হৃষ্যতি আনন্দিত হন; ন-না; দ্বেষ্টি-দ্বেষ করেন; ন-না; শোচতি-শোক করেন; ন-না; কাঙ্ক্ষতি-আকাঙ্ক্ষা করেন; শুভ-শুভ, অশুভ-অশুভ; পরিত্যাগী-পরিত্যাগী; ভক্তিমান-ভক্তিযুক্ত; যঃ- যিনি; সঃ-তিনি; মে-আমার; প্রিয়ঃ-প্রিয়।

গীতার গান

জড় কার্যে হর্ষ দুঃখ যে জনের নাই।
ত্যজিয়াছে যে আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যার নাই ॥
শুভাশুভ পরিত্যাগী যেবা ভক্তিমান।
আমার সে প্রিয় ভক্ত তাহাকে সম্মান ॥

অনুবাদ

যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং যিনি ভক্তিযুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত বৈষয়িক লাভ ও ক্ষতিতে উৎফুল্ল অথবা বিমর্ষ হন না। তিনি পুত্র অথবা শিষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তা না পেলে তিনি দুঃখিতও হন না। তাঁর প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে তিনি অনুতাপ করেন না। তেমনই, তাঁর ঈপ্সিত বস্তু না পেলে তিনি বিমর্ষ হন না। তিনি সব রকম শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য আদি জড় কর্মের ঊর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সব রকম বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত। কোন কিছুই তাঁর ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। এই ধরনের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৮-১৯

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

সমঃ-সম-ভাবাপন্ন; শত্রৌ শত্রুর প্রতি; চ-ও; মিত্রে মিত্রের প্রতি; চ-ও; তথা-তেমন; মান-সম্মানে; অপমানয়োঃ-অপমানে; শীত-শীতে; উষ্ণ-গরমে; সুখ-সুখ; দুঃখেষু-দুঃখে; সমঃ-সম-ভাবাপন্ন; সঙ্গবিবর্জিতঃ-কুসঙ্গ-বর্জিত; তুল্য-সমবুদ্ধি; নিন্দা-নিন্দা; স্তুতিঃ-স্তুতিতে;

মৌনী-সংযতবাক্; সন্তুষ্টঃ-পরিতুষ্ট; যেন কেনচিৎ-যৎকিঞ্চিৎ লাভে, অনিকেতঃ-গৃহাসক্তিশূন্য; স্থির-স্থির; মতিঃ-বুদ্ধি; ভক্তিমান্-ভক্তিযুক্ত; মে-আমার; প্রিয়ঃ-প্রিয়; নরঃ -মানুষ।

গীতার গান

শত্রু মিত্র অপমান কিংবা নিজ মান।
জড়মুক্ত মোর ভক্ত মানয়ে সমান ॥
শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এক যেবা মানে।
সঙ্গমুক্ত সেই ভক্ত স্থিত আত্মজ্ঞানে ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর সন্তুষ্ট গম্ভীর।
নিকেতন তার নাই মতি তার স্থির ॥
সেই মোর প্রিয় ভক্ত সেই ভক্তিমান।
ভক্তের লক্ষণ যত করিনু ব্যাখ্যান ॥

অনুবাদ

যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সম-ভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ-বর্জিত, সংযতবাক্, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই রকম ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদাই সব রকম অসৎসঙ্গ থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও কখনও কেউ প্রশংসিত হয় এবং কেউ নিন্দিত হয়; সেটিই হচ্ছে মানব-সমাজের স্বভাব। কিন্তু ভক্ত সর্বদাই কৃত্রিম প্রশংসা ও নিন্দা, সুখ অথবা দুঃখ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথাই বলেন না। তাই তাঁকে বলা হয় মৌন। মৌন শব্দের অর্থ এই নয় যে, কারও কথা বলা উচিত নয়; মৌন শব্দের অর্থ হচ্ছে বাজে কথা না বলা। প্রয়োজনীয় কথাই কেবল মানুষের বলা উচিত এবং ভক্তের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কথা বলা। ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই সুখী। তাঁর ভাগ্যে কখনও অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার জুটতে পারে, কখনও না-ও জুটতে পারে, কিন্তু তিনি সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। তাঁর বাসস্থানের কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি কখনও যত্ন করেন না। তিনি কখনও গাছের নীচে থাকতে পারেন, কখনও আবার বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকাতেও থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট নন। তিনি হচ্ছেন অবিচলিত, কারণ তিনি সত্যসংকল্প ও জ্ঞানী। ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সদ্গুণ ব্যতীত কখনই যে শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না, সেটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই তা করা হয়েছে। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ-যে ভক্ত নয়, তার কোন সদ্গুণ নেই। যিনি ভক্তরূপে পরিচিত হতে চান, তাঁর পক্ষে এই সমস্ত সদ্গুণগুলি অর্জন করা একান্ত কর্তব্য, তবে এর জন্য তাঁকে বাহ্যিক প্রয়াস করতে হয় না। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে, আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলির বিকাশ হয়।

শ্লোক ২০

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যে-যাঁরা; তু-কিন্তু; ধর্ম-ধর্ম; অমৃতম্-অমৃতের; ইদম্-এই; যথা-যেমন; উক্তম্-কথিত; পর্যুপাসতে-পূর্ণরূপে উপাসনা করেন; শ্রদ্দধানাঃ-শ্রদ্ধাবান; মৎপরমাঃ- মৎপরায়ণ; ভক্তাঃ-ভক্তগণ; তে-সেই সকল; অতীব-অত্যন্ত; মে-আমার; প্রিয়াঃ-প্রিয়।

গীতার গান

এই শুদ্ধ ভক্তি যেবা করিবে সাধনা।
অমৃত সে ধর্ম জান জড় বিলক্ষণা ॥
তাহাতে যে শ্রদ্ধাযুক্ত অনুকূল প্রাণ।
অত্যন্ত সে প্রিয় ভক্ত আমার সমান ॥

অনুবাদ

যাঁরা আমার দ্বারা কথিত এই ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ২য় শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত-ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্ (আমাতে মনোনিবেশ করে) থেকে যে তু ধর্মামৃতমিদম্ (এই অমৃতময় ধর্ম) পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমীপবর্তী হবার জন্য অপ্রাকৃত সেবার পন্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এই পন্থাগুলি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি যখন সেগুলির মাধ্যমে নিয়োজিত হন, ভগবান তখন তা গ্রহণ করেন। অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করেছেন যে নির্বিশেষবাদী এবং অনন্য ভক্তি সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেছেন যে ভক্ত, এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেয়।
তার উত্তরে ভগবান তাঁকে স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন যে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করাটাই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই অধ্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গের প্রভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার প্রতি আসক্তি জন্মায় এবং তার ফলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ, কীর্তন করা শুরু হয় এবং তখন দৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও ভক্তি সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন সম্ভব হয়। এভাবেই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হতে হয়। এই অধ্যায়ে এই পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আত্ম-উপলব্ধির জন্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য ভক্তিযোগই যে পরম পন্থা, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ উপলব্ধি করার যে পন্থা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল আত্ম-উপলব্ধি লাভের পথে একান্ত প্রয়োজনীয় আত্ম-সমর্পণের সময় পর্যন্তই অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপের ভক্তিযুক্ত সেবাই হচ্ছে পরম প্রাপ্তি। পরমেশ্বরের নির্বিশেষ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কর্মফল ভোগের আশা পরিত্যাগ করে ধ্যান করতে হয় এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ না করা পর্যন্ত এই পন্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, কেউ যদি সরাসরিভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে আর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পরমার্থ সাধনের পথে এগোতে হয় না। ভগবদ্গীতার মধ্য ভাগের ছয়টি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সহজসাধ্য। এই পন্থায় দেহ ধারণ করার জন্য জড় বস্তু-বিষয়ক দুশ্চিন্তা করতে হয় না, কারণ

ভগবানের কৃপায় সব কিছু আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-'ভক্তিযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায় - প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

শ্লোক ১-২

অর্জুন উবাচ
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ।। ১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ । ২।

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; প্রকৃতিম্-প্রকৃতি; পুরুষম্-পুরুষ; চ-ও; এব-অবশ্যই; ক্ষেত্রম্-ক্ষেত্র; ক্ষেত্রজ্ঞম্-ক্ষেত্রজ্ঞ; এব-অবশ্যই; চ-ও; এতৎ-এই সমস্ত; বেদিতুম্-জানতে; ইচ্ছামি-ইচ্ছা করি; জ্ঞানম্-জ্ঞান; জ্ঞেয়ম্-জ্ঞেয়; চ-ও; কেশব-হে কৃষ্ণ; শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ইদম্-এই; শরীরম্ শরীর; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; ক্ষেত্রম্-ক্ষেত্র; ইতি-এভাবে; অভিধীয়তে-অভিহিত হয়; এতৎ-এই; যঃ-যিনি; বেত্তি-জানেন; তম্-তাঁকে; প্রাহুঃ-বলা হয়; ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্রজ্ঞ; ইতি-এভাবে: তদ্বিদঃ-যিনি জানেন।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
প্রকৃতির আর পুরুষ ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ।
জানিবার ইচ্ছা মোর আমি নহি বিজ্ঞ ।
সেইরূপ জ্ঞান আর বিজ্ঞান কি হয় ।
কেশব আমাকে কহ করিয়া নিশ্চয় ॥
শ্রীভগবান কহিলেন:
হে কৌন্তেয়! এ শরীর ক্ষেত্র নাম তার।
ইহার যে জ্ঞাতা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে কেশব। আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি।
পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে কৌন্তেয়। এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য
অর্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত তাঁকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দেহ হচ্ছে বদ্ধ জীবের কর্মক্ষেত্র। বদ্ধ জীব মাত্রই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করার চেষ্টা করে। আর তাই, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। সেই কর্মক্ষেত্রটি হচ্ছে তার দেহ। এই দেহটি কি? দেহটি ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তৈরি। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায় এবং তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি শরীর বা কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। তাই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র অথবা বদ্ধ জীবের কর্ম করার ক্ষেত্র। এখন, যে ব্যক্তি তার দেহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহ ও দেহের জ্ঞাতা এদের পার্থক্য বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়। যে কেউই বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে, শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার দেহে কত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু তবুও দেহের যে দেহী তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় একই থাকেন। এভাবেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। এভাবেই বদ্ধ জীব বুঝতে পারে যে, সে তার দেহ থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতার প্রথম দিকেই বর্ণনা করা হয়েছে, দেহিনোহস্মিন্ অর্থাৎ দেহের দেহী আছে এবং দেহ কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং যে ব্যক্তি এই দেহের মালিক তিনি জানেন যে, দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। দেহের এই মালিকই হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। কখনও আমরা মনে করে থাকি যে, "আমি সুখী," "আমি একটি পুরুষ", "আমি একটি মহিলা," "আমি একটি কুকুর", "আমি একটি বেড়াল।" এগুলি হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞের দেহগত উপাধি। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ দেহ থেকে ভিন্ন। যদিও আমরা অনেক জিনিস ব্যবহার করে থাকি, যেমন আমাদের কাপড় চোপড় আদি। আমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত ব্যবহৃত জিনিসগুলি থেকে আমরা স্বতন্ত্র। তেমনই, একটু চিন্তা করার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দেহ থেকে আমরা স্বতন্ত্র। দেহের মালিক আমি, তুমি অথবা যে কেউই হচ্ছি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহটিকে বলা হয় ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র।
ভগবদ্গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেহের জ্ঞাতা বা জীব এবং তার স্থিতি, যার দ্বারা সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে, তা বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার মধ্যবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান এবং ভক্তিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পরমপদ এবং তাঁর নিত্য সেবকরূপে জীবের যে স্বাভাবিক স্বরূপ তা এই অধ্যায়গুলিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জীব সর্ব অবস্থাতেই অধীনতত্ত্ব, কিন্তু ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। শুভ কর্ম বা সুকৃতির প্রভাবে যখন তাঁদের চেতনার উন্মেষ হয়, তখন তাঁরা আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরূপে ভগবানের অনুগামী হন। সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে। এখন ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে জীব কিভাবে জড় জগতের সংস্পর্শে আসে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে সে কিভাবে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব যদিও তাঁর জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তবুও সে তার জড় দেহের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সেই কথাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্ঞানং মতং মম ।। ৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞম্-ক্ষেত্রজ্ঞ; চ-ও; অপি-অবশ্যই; মাম্-আমাকে; বিদ্ধি-জানবে; সর্ব-সমস্ত; ক্ষেত্রেষু-ক্ষেত্রে; ভারত-হে ভারত; ক্ষেত্র-ক্ষেত্র (শরীর); ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ-ক্ষেত্রজ্ঞ; জ্ঞানম্-জ্ঞান; যৎ-যে; তৎ-সেই; জ্ঞানম্-জ্ঞান; মতম্-অভিমত; মম-আমার।

গীতার গান

আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝ সকল শরীরে।
হে ভারত, অন্তর্যামী কহে সে আমারে ।
সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের যেবা জ্ঞান ।
আমার বিচারে হয় সেই শুদ্ধ জ্ঞান ॥

অনুবাদ

হে ভারত! আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

আমরা যখন দেহ ও দেহের জ্ঞাতা, আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন আমরা তিনটি আলোচনার বিষয় দেখতে পাই-ভগবান, জীব ও জড় পদার্থ। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বা প্রতিটি দেহে দুটি আত্মা আছে-জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যেহেতু পরমাত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু আমি দেহের অণু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, আমি হচ্ছি পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা রূপে আমি প্রতিটি শরীরেই অবস্থান করি।"

কেউ যদি ভগবদ্গীতার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভগবান বলছেন, "আমি প্রতিটি দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ।" জীবাত্মা তার নিজের দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু অন্য শরীর সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই। পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরমাত্মা রূপে প্রত্যেক শরীরে বর্তমান, তিনি সমস্ত শরীর সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত। তিনি দেবতা, মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত প্রজাতির শরীর সম্বন্ধেই সর্বতোভাবে অবগত। কোন নাগরিক যেমন শুধু তার নিজের জমিটি সম্বন্ধেই অবগত, কিন্তু রাজা কেবল তাঁর রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধেই অবগত নন, তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের সমস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধেও অবগত। তেমনই, কেউ তাঁর নিজের দেহের মালিক হতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মালিক। রাজা হচ্ছেন তাঁর রাজ্যের মুখ্য মালিক এবং নাগরিকেরা হচ্ছেন গৌণ মালিক। শরীরের মুখ্য মালিক। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত
দেহ গঠিত হয় ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে। অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, যার রাজা যেমন রাজ্যের সমস্ত কার্যকলাপের মুখ্য নিয়ন্তা এবং তাঁর প্রজারা হচ্ছে গৌণ নিয়ন্তা, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান নিয়ন্তা। ভগবান বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ"। এর অর্থ হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ; জীবাত্মা কেবল তার নিজের শরীরটির ক্ষেত্রজ্ঞ। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥

এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং এই দেহের মধ্যেই বাস করেন দেহের মালিক। পরমেশ্বর ভগবান এই দেহ ও দেহের মালিক উভয়কেই জানেন। তাই, তাঁকে সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এভাবেই কর্মক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। দেহের স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ ও পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানকে বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞান বলা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মত। জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক কিন্তু তবুও স্বতন্ত্র বলে বুঝতে পারাটাই হচ্ছে জ্ঞান। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত নন, তিনি যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হননি। প্রকৃতি, পুরুষ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের পরম নিয়ন্তা পরম ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। এই তিনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। চিত্রকার, চিত্র ও চিত্র অঙ্কনের ফলক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এই জড় জগৎ, যা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, তা হচ্ছে প্রকৃতি আর এর ভোক্তা হচ্ছে জীব এবং এই উভয়ের ঊর্ধ্বে পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। বৈদিক শাস্ত্রে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ১/১২) বলা হয়েছে-ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা/সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ। ব্রহ্মাকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায়-কর্মক্ষেত্র রূপে প্রকৃতিই হচ্ছে ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্মা এবং সে জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে এবং এই উভয়েরই নিয়ন্তাও হচ্ছেন ব্রহ্মা, কিন্তু তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ন্তা।
এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, এই দুই ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভ্রান্ত এবং অপর জন অভ্রান্ত। একজন ঊর্ধ্বতন, অপর জন অধস্তন। যারা মনে করে যে, এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞই এক এবং অভিন্ন, তারা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে। এখানে তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ", রজ্জুকে যার সর্প ভ্রম হয়, তার যথার্থ জ্ঞান নেই। ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে এবং সেই সমস্ত শরীরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরী বা মালিক আছেন। যেহেতু প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার ব্যক্তিগত ক্ষমতা আছে, তাই তাদের ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে। কিন্তু পরম নিয়ন্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানও সেই সমস্ত শরীরে বর্তমান। চ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না তার মাধ্যমে সমস্ত শরীরকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিমত। প্রতিটি শরীরে আত্মা ছাড়াও পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কর্মক্ষেত্র ও তার সীমিত ভোক্তা উভয়েরই নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা।

শ্লোক ৪

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
সচ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

তৎ-সেই; ক্ষেত্রম্-ক্ষেত্র; যৎ-যা; চ-ও; যাদৃক্-যে রকম; চ-ও; যৎ-যেরূপ; বিকারি-বিকার; যতঃ-যার থেকে; চ-ও; যৎ-যা; সঃ-তিনি; চ-ও; যঃ-যিনি; যৎ- যেরূপ; প্রভাবঃ-প্রভাব; চ-ও; তৎ-সেই; সমাসেন-সংক্ষেপে; মে-আমার থেকে; শৃণু-শ্রবণ কর।

গীতার গান

সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার।
কি তার স্বরূপ কিংবা কি তার বিচার ॥
কি তার প্রভাব কিংবা কোথা হতে হয়।

শুন তুমি কহি আমি করিয়া নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

সেই ক্ষেত্র কি, তার কি প্রকার, তার বিকার কি, তা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি এবং তার প্রভাব কি, সেই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এই শরীর কিভাবে গঠিত হয়েছে, তার গঠনের উপাদানগুলি কি, কার নিয়ন্ত্রণাধীনে এই শরীর কাজ করে চলেছে, কিভাবে তার পরিবর্তন হচ্ছে, কোথা থেকে এই পরিবর্তনগুলি আসছে, তার কারণ কি, তার উদ্দেশ্য কি, প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার পরম লক্ষ্য কি এবং স্বতন্ত্র আত্মার প্রকৃত রূপ কি, সেই সম্বন্ধে জানতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য, তাঁদের বিভিন্ন প্রভাব এবং তাঁদের শক্তি আদি সম্বন্ধে জানতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনা অনুসারে সরাসরিভাবে এই ভগবদ্গীতা উপলব্ধি করতে হবে, তখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে, সকলের দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে জীবাত্মার সঙ্গে এক বলে যেন মনে না করি। এটি অনেকটা শক্তিমান ও শক্তিহীনকে সমান বলে মনে করারই সামিল।

শ্লোক ৫

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

ঋষিভিঃ-ঋষিগণ কর্তৃক; বহুধা-বহু প্রকারে; গীতম্-বর্ণিত হয়েছে; ছন্দোভিঃ -বৈদিক ছন্দের দ্বারা; বিবিধৈঃ-বিবিধ; পৃথক্ পৃথকভাবে; ব্রহ্মসূত্র-বেদান্তের; পদৈঃ- সূত্রের দ্বারা; চ-ও; এব-অবশ্যই; হেতুমপ্তিঃ-যুক্তিযুক্ত; বিনিশ্চিতৈঃ -নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

দার্শনিক ঋষি কত করেছে বিচার।
স্মৃতি ছন্দে কত বলে নাহি তার পার ॥
কিন্তু বেদান্ত বাক্যে যুক্তির সহিত।
যে বিচার করিয়াছে লাগি লোকহিত ॥
সেই সে বিচার জান সুসিদ্ধান্ত মত।
সকলের গ্রহণীয় ছাড়ি অন্য পথ ॥

অনুবাদ

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বেদবাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্তসূত্রে তা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তবুও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, পণ্ডিত ও আচার্যেরা সর্বদাই পূর্বতন আচার্যদের নজির দিয়ে থাকেন। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে অত্যন্ত বিতর্কমূলক দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ বেদান্ত শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি বিভিন্ন ঋষিদের মতের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত ঋষিদের

মধ্যে বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব হচ্ছেন মহর্ষি এবং বেদান্ত-সূত্রে দ্বৈতবাদকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনিও ছিলেন একজন মহর্ষি এবং তাঁর প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে তিনি লিখেছেন, অহং ত্বং চ তথান্যে... "আমরা, আপনি, আমি এবং অন্য সমস্ত জীব-জড় দেহে থাকলেও জড়াতীত। এখন আমরা আমাদের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে জড় জগতের তিনটি গুণের মধ্যে পতিত হয়েছি। তার ফলে, কেউ উচ্চ স্তরে আছে, আবার কেউ নিম্ন স্তরে। অজ্ঞানতার ফলে উচ্চ ও নিম্ন প্রকৃতি বিদ্যমান হয় এবং অগণিত জীবের মধ্যে তা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মা, যিনি অচ্যুত, তিনি কখনই তিন গুণের দ্বারা কলুষিত হন না এবং তিনি হচ্ছেন গুণাতীত।" তেমনই, আদি বেদে, বিশেষ করে কঠ উপনিষদে আত্মা, পরমাত্মা ও দেহের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। বহু মুনি-ঋষি এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরাশর মুনিকে তাঁদের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।
ছন্দোভিঃ শব্দটির দ্বারা বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, যজুর্বেদের একটি শাখা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকৃতি, জীবসত্তা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, ক্ষেত্র বলতে বোঝায় কর্মের ক্ষেত্র এবং দুই ধরনের ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন-স্বতন্ত্র জীবাত্মা ও পরম আত্মা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/৯) বলা হয়েছে-ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। পরমেশ্বর ভগবানের 'অন্নময়' নামে একটি শক্তির প্রকাশ হয়, যার ফলে জীব তার জীবন ধারণের জন্য অন্নের উপর নির্ভর করে। এটি পরমেশ্বর সম্বন্ধে একটি জড় উপলব্ধি। তারপর 'প্রাণময়', অর্থাৎ অন্নের মধ্যে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার পর প্রাণের লক্ষণের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করা। প্রাণময় লক্ষণের অতীত 'জ্ঞানময়' উপলব্ধি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর ব্রহ্ম-উপলব্ধিকে বলা হয় 'বিজ্ঞানময়,' যার ফলে জীবের মন ও প্রাণের লক্ষণগুলি থেকে জীবকে স্বতন্ত্র বলে উপলব্ধি করা যায়। তার পরে পরম স্তর হচ্ছে 'আনন্দময়' অর্থাৎ সর্ব আনন্দময় প্রকৃতির উপলব্ধি। ব্রহ্ম-উপলব্ধির এই পাঁচটি স্তর আছে, যাকে বলা হয় ব্রহ্ম পুচ্ছম্। এর মধ্যে প্রথম তিনটি-অন্নময়, প্রাণময় ও জ্ঞানময় জীবের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে বলা হয় 'আনন্দময়'। বেদান্ত-সূত্রেও পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয়েছে আনন্দময়োহভ্যাসাৎ-পরমেশ্বর ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়। তাঁর সেই দিব্য আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি নিজে বিজ্ঞানময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় ও অন্নময়রূপে প্রকাশিত হন। কর্ম করবার এই ক্ষেত্রে জীবকে ভোক্তা বলে মনে করা হয় এবং আনন্দময় তার থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, জীব যদি আনন্দময়ের সেবায় ব্রতী হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দ লাভের প্রয়াসী হয়, তা হলেই তাঁর অস্তিত্ব সার্থক হয়। পরম ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, জীবের অধস্তন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের এই হচ্ছে প্রকৃত আলেখ্য। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বেদান্তসূত্র কিংবা ব্রহ্মসূত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।
এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মসূত্রের অনুশাসনগুলি কার্য-কারণ অনুসারে অতি সুচারুভাবে সাজানো আছে। কতকগুলি সূত্র হচ্ছে-ন বিয়দ অশ্রুতেঃ (২/৩/২), নাত্মা শ্রুতেঃ (২/৩/১৮) এবং পরাৎ তু তচ্ছুতেঃ (২/৩/৪০)। প্রথম সূত্রটিতে কর্মক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে জীবসত্তার কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয়টিতে বিবিধ সত্তার সকল প্রকার অভিপ্রকাশের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬-৭

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

মহাভূতানি-মহাভূতসমূহ; অহঙ্কারঃ-অহঙ্কার; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; অব্যক্তম্-অব্যক্ত; এব-অবশ্যই, চ-ও; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়সমূহ; দশৈকম্-একাদশ; চ-ও; পঞ্চ-পাঁচ; চ-ও; ইন্দ্রিয়গোচরাঃ-ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইচ্ছা-ইচ্ছা; দ্বেষঃ-দ্বেষ; সুখম্-সুখ, দুঃখম্-দুঃখ; সংঘাতঃ-সমষ্টি; চেতনা-চেতনা; ধৃতিঃ-ধৈর্য; এতৎ-এই সমস্ত; ক্ষেত্রম্-ক্ষেত্র; সমাসেন-সংক্ষেপে; সবিকারম্-বিকারযুক্ত; উদাহৃতম্-বর্ণিত হল।

গীতার গান

সেই দশ বাহ্য-আর মন সে অন্তরে।
একাদশ ইন্দ্রিয় সে শাস্ত্রের বিচারে ॥
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যে বিষয়।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, ব্যোম মহাভূত।
অহঙ্কার, বুদ্ধি আর মন অব্যক্ত সম্ভূত ॥
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যাহা জানি।
পায়ু, পাদ, পেট, লিঙ্গ আর যাহা পাণি ॥
চব্বিশ সে তত্ত্ব বুঝ ক্ষেত্র পরিচয় ॥
ইহাদের যে বিচার করে বিশ্লেষণে।
ক্ষেত্রতত্ত্ব সেই বিজ্ঞ ভালরূপ জানে ॥
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আর যে সঙ্ঘাত।
স্থূল দেহ পরিমাণ পঞ্চ মহাভূত ॥
চেতনা শক্তি যে হয় জীবের আধার।
তার সঙ্গে ধৃতি জান ক্ষেত্রের বিকার ॥
অতএব এই সব একত্রে সে ক্ষেত্র।
স্থূল সূক্ষ্ম জড় বিদ্যা সেই যে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পঞ্চ-মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি-এই সমস্ত বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

তাৎপর্য

মহর্ষিদের প্রামাণ্য বাক্য, বৈদিক ছন্দ ও বেদান্তসূত্র থেকে এই জগতের মৌলিক উপাদানগুলি জানতে পারা যায়। প্রথমে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এদের বলা হয় পঞ্চ-মহাভূত। তা ছাড়া আছে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রধান (অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতির তিনটি গুণ)। তারপর আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। তারপর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। তারপর ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে আছে মন, যাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা যেতে পারে। সুতরাং, মনকে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা হচ্ছে একাদশ। তারপর আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা তন্মাত্র-রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই চব্বিশটি তত্ত্বকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় কর্মক্ষেত্র। কেউ যদি এই চব্বিশটি বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ করেন, তা হলে তিনি কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে খুব ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর আছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ, যা হচ্ছে স্থূল দেহের অন্তর্গত পঞ্চ-মহাভূতের পারস্পরিক ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি। জীবনের লক্ষণ চেতনা ও ধৃতি হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও

অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহের প্রকাশ। এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলিও কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত। পঞ্চ-মহাভূতগুলি হচ্ছে অহঙ্কারের স্থূল অভিব্যক্তি। সেগুলিই আবার অহঙ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে 'তামস-বুদ্ধি' অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী অজ্ঞানতার জড়-জাগতিক অভিব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়। এটি আবার জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অব্যক্ত স্তররূপে অভিব্যক্ত হয়। জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত তিনটি গুণকে বলা হয় 'প্রধান'।

যদি কেউ এই চব্বিশটি তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে চান, তা হলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন করা কর্তব্য। ভগবদ্গীতাতে কেবল তার সারাংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

দেহ হচ্ছে এই সব কয়টি উপাদানের অভিব্যক্তি এবং দেহের পরিবর্তন হয়। দেহের এই পরিবর্তন ছয় রকমের দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, স্থিতি হয়, বংশ বৃদ্ধি হয়, তারপর তার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই ক্ষেত্র হচ্ছে অস্থায়ী জড় বস্তু, তবে ক্ষেত্রের মালিক ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন ভিন্ন।

শ্লোক ৮-১২

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষুঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।। ১০ ।।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১২ ॥

অমানিত্বম্-মানশূন্যতা; অদম্ভিত্বম্ দম্ভহীনতা; অহিংসা-অহিংসা; ক্ষান্তিঃ-সহিষ্ণুতা; আর্জবম্-সরলতা; আচার্যোপাসনম্-সদ্গুরুর সেবা; শৌচম্-শৌচ; স্থৈর্যম্ স্থৈর্য, আত্মবিনিগ্রহঃ-আত্মসংযম: ইন্দ্রিয়ার্থেম্-ইন্দ্রিয়-বিষয়ে; বৈরাগ্যম্-বিরক্তি; অনহঙ্কারঃ-অহঙ্কারশূন্য; এব-অবশ্যই; চ-ও; জন্ম-জন্ম; মৃত্যু-মৃত্যু, জরা-বার্ধক্য; ব্যাধি-ব্যাধি; দুঃখ-দুঃখের; দোষ-দোষ; অনুদর্শনম্-দর্শন; অসক্তিঃ-আসক্তি-রহিত; অনভিষুঙ্গঃ-অভিনিবেশ রহিত; পুত্র-পুত্র; দার-পত্নী; গৃহাদিষু-গৃহ আদিতে; নিত্যম্-সর্বদা; চ-ও; সমচিত্তত্বম্-সম-ভাবাপন্ন; ইষ্ট-বাঞ্চিত; অনিষ্ট-অবাঞ্ছিত; উপপত্তিষু-লাভকরে; ময়ি-আমাতে; চ-ও; অনন্যযোগেন-অনন্য নিষ্ঠা সহকারে; ভক্তিঃ-ভক্তি; অব্যভিচারিণী-অপ্রতিহতা; বিবিক্ত-নির্জন; দেশ-স্থান; সেবিত্বম্-প্রিয়তা; অরতিঃ-অরুচি; জনসংসদি-জনাকীর্ণ স্থানে; অধ্যাত্ম-অধ্যাত্ম; জ্ঞান-জ্ঞানে; নিত্যত্বম্-নিত্যতা; তত্ত্বজ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞানের; অর্থ-প্রয়োজন; দর্শনম্-অনুসন্ধান; এতৎ-এই সমস্ত; জ্ঞানম্-জ্ঞান; ইতি-এভাবে; প্রোক্তম্- কথিত হয়; অজ্ঞানম্-অজ্ঞান; যৎ-যা; অতঃ-এর থেকে, অন্যথা-বিপরীত।

গীতার গান

অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা যে ক্ষান্তি।

সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, ধৈর্য, শান্তি ॥
আত্মার নিগ্রহ যাহা ইন্দ্রিয় বিষয়ে।
বৈরাগ্য নিরহঙ্কার সকল আশয়ে ॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি দুঃখের দর্শন।
অনাসক্তি স্ত্রী পুত্রেতে গৃহের প্রাঙ্গণ ॥
উদাসীন পরিবারে সুখেতে দুঃখেতে।
নিত্য সমচিত্ত ইষ্ট অনিষ্ট মধ্যেতে ॥
আমাতে অনন্যভক্তি অব্যভিচারিণী।
নির্জন স্থানেতে বাস গ্রাম্য নিবারণী ॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানের করে নিত্যত্ব স্বীকার।
তত্ত্বজ্ঞান লাগি করে দর্শন বিচার ॥
সেই সে জ্ঞানের চর্চা বিকারে নাশ।
অজ্ঞানতমের নাম অন্যথা প্রকাশ ।।

অনুবাদ

অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান-এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।

তাৎপর্য

যথার্থ জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময় অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান আহরণের পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই কেবল পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এটি চব্বিশটি মৌলিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া নয়, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে ঐ উপাদানগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। চব্বিশটি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত একটি পিঞ্জরের মতো দেহের মধ্যে দেহধারী আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এখানে বর্ণিত জ্ঞান অর্জনের পন্থাই হচ্ছে এর থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। জ্ঞান লাভের যে সমস্ত পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি একাদশ শ্লোকের প্রথম ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ময়ি চাননাযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী এই জ্ঞান পরিণামে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ না করে, অথবা লাভ করার প্রয়াসী না হয়, তা হলে অন্য উনিশটি গুণের কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই উনিশটি গুণ তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই বিকশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে, যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। যিনি ভগবৎ-সেবার পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের সকল প্রকার সদ্‌গুণই বিকশিত হয়ে ওঠে। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সেবা করার যে নির্দেশ অষ্টম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি যাঁরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের পক্ষেও এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সদগুরুর আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে এখানে বলছেন যে, জ্ঞানের এই পন্থা হচ্ছে যথার্থ পন্থা। এ ছাড়া যদি অন্য আর কোন পন্থা অনুমান করা হয়,

তা হলে তা নিছক বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।
যে জ্ঞানের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, তার বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অমানিত্বের অর্থ হচ্ছে যে, অপরের কাছ থেকে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া। বৈষয়িক জীবনে আমরা অপরের কাছ থেকে মান-সম্মান পাওয়ার জন্য খুব আগ্রহী হই, কিন্তু যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর জড় শরীরটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর কাছে জড় দেহগত সম্মান ও অসম্মান উভয়ই নিরর্থক। জড়-জাগতিক এই মোহের প্রতি লালায়িত হওয়া উচিত নয়। মানুষ তার ধর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং পরিণামে অনেক সময় দেখা যায় যে, ধর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সে কোন দলভুক্ত হয়ে পড়ে এবং যথাযথভাবে ধর্মের নীতিগুলিকে অনুসরণ না করে, সে নিজেকে ধর্মের কর্ণধার বলে প্রচার করতে থাকে। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে কে কতটা উন্নতি সাধন করছে তা এই সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে বিচার করা উচিত।
অহিংসা কথাটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে হত্যা না করা বা দেহ নষ্ট না করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অহিংসার অর্থ হচ্ছে অপরকে ক্লেশ না দেওয়া। অজ্ঞানতার প্রভাবে সাধারণ মানুষ জড়-জাগতিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাই তারা নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করছে। সুতরাং মানুষকে যদি পারমার্থিক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না করা হয়, তা হলে হিংসার আচরণ করা হয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে যথাসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান দান করা, যার ফলে তারা দিব্যজ্ঞান লাভ করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেটিই হচ্ছে অহিংসা।
ক্ষান্তি বা সহনশীলতার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছ থেকে অসম্মান অথবা অপমান সহ্য করার ক্ষমতা। কেউ যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হন, তখন অনেকেই তাঁকে নানাভাবে অপমান বা অসম্মান করে থাকে। সেটিই স্বাভাবিক, কারণ জড় জগতের ধরনটাই এমন। এমন কি প্রহ্লাদের মতো একটি শিশু, যিনি পাঁচ বছর বয়সে পরমার্থ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন তাঁর বাবাই এই ভক্তির পথে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নানাভাবে তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, এমন কি নানাভাবে তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ তার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং, পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে হলে নানা রকম প্রতিবন্ধক আসতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
সরলতার অর্থ হচ্ছে কূটনীতি না করে নিষ্কপট হওয়া, যাতে শত্রুর কাছেও যথার্থ সত্য খুলে বলা যায়। সেই জন্য গুরু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ সদ্গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ না করলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সদ্গুরুর সমীপবর্তী হতে হয় এবং সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করতে হয়, যাতে তাঁর প্রসন্নতা সাধনের মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদ লাভকরা যায়। সদ্গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি যদি তাঁর শিষ্যকে কৃপা করেন, তা হলে তাঁর শিষ্য সমস্ত শাস্ত্রবিধির অনুশীলন না করেই তৎক্ষণাৎ প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারেন। অথবা, যিনি নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেছেন, পারমার্থিক বিধি-নিষেধগুলি তাঁর কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে।
পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য শৌচ অত্যন্ত প্রয়োজন। শৌচ দুই রকমের-বাইরের ও অন্তরের। বাহিরের শুচিতা হচ্ছে স্নান করা। কিন্তু অন্তরের শুচিতার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে- এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়।
স্থৈর্য অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে দৃঢ় সংকল্প হওয়া। এই ধরনের দৃঢ়

সংকল্প ছাড়া যথার্থ উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। আত্মবিনিগ্রহ মানে হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতির পথে যা ক্ষতিকর তা গ্রহণ না করা। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে যা বিরোধী তা বর্জন করে, এগুলি গ্রহণ করার অভ্যাস করা উচিত। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়গুলি এত প্রবল যে, তারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত নিরর্থক দাবিগুলি বরদাস্ত করা উচিত নয়, কারণ সেগুলি অনাবশ্যক।
ইন্দ্রিয়গুলিকে কেবল ততটুকুই সুখ দেওয়া উচিত যার ফলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা যায়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে জিহ্বা। কেউ যদি জিহ্বাকে জয় করতে পারে, তা হলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি জয় করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। জিহ্বার কাজই হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ করা এবং স্পন্দন করা। তাই, তাকে দমন করবার বিধি হচ্ছে সর্বদাই কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুকে জয় করার পন্থা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপ ছাড়া তাকে আর কিছু দেখতে না দেওয়া। তার ফলে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু সংযত হয়। তেমনই, কান দুটিকে সর্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণে এবং নাককে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত রাখতে হবে। এটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা এবং এখানে বুঝতে পারা যায় যে, ভগবদ্গীতা কেবল ভক্তিযোগের বিজ্ঞানকথা ঘোষণা করছে। ভক্তি হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবদ্গীতার কিছু নির্বোধ ভাষ্যকারেরা ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ভাষ্য রচনা করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্গীতায় ভগবদ্ভক্তি ছাড়া আর কোন বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়নি।
অহঙ্কারের অর্থ হচ্ছে জড় শরীরটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর জড় শরীর নন, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে তাঁর আত্মা, সেটিই হচ্ছে যথার্থ অহঙ্কার। অহঙ্কার থাকেই। মিথ্যা অহঙ্কার বর্জনীয়, কিন্তু যথার্থ অহঙ্কার বর্জনীয় নয়। বৈদিক শাস্ত্রে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১/৪/১০) বলা হয়েছে, অহং ব্রহ্মাস্মি- আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা। এই 'আমি' হচ্ছে আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতি আত্ম-উপলব্ধির মুক্ত অবস্থাতেও বর্তমান থাকে। 'আমি' সম্বন্ধে এই অনুভূতিকে বলা হয় অহঙ্কার, কিন্তু এই আত্মানুভূতি যখন বাস্তব বস্তুতে বা আত্মাতে প্রয়োগ হয়, তখন সেটিই হচ্ছে যথার্থ অহঙ্কার। অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন, আমাদের অহঙ্কার বর্জন করা উচিত। কিন্তু আমাদের এই অহঙ্কার আমরা ত্যাগ করতে পারি না, কারণ অহঙ্কার হচ্ছে আমাদের পরিচয়। তবে অবশ্যই জড় দেহ নিয়ে যে পরিচয়, তা পরিত্যাগ করতেই হবে।
জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত যে দুঃখ-দুর্দশা, সেই কথা বুঝতে হবে। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মের পূর্বে মাতৃজঠরে শিশুর অবস্থান যে কত দুঃখময়, তা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম যে কত ক্লেশদায়ক, তা পূর্ণরূপে জানতে হবে। মাতৃজঠরে কি পরিমাণ দুঃখ-দুর্দশা আমরা ভোগ করেছি, তা ভুলে যাওয়ার ফলেই আমরা জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন চেষ্টা করি না। তেমনই, মৃত্যুর সময়ে নানা রকম যন্ত্রণাভোগ করতে হয় এবং প্রামাণ্য শাস্ত্রাদিতে তারও বর্ণনা আছে। সেগুলি আলোচনা করা উচিত। আর জরা ও ব্যাধি যে কত যন্ত্রণাদায়ক, সেই সম্বন্ধে প্রতিটি জীবেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কেউই ব্যাধিগ্রস্ত হতে চায় না এবং কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না। কিন্তু তবুও এগুলির হাত থেকে নিস্তার নেই। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত জড় জীবন যে দুঃখময় তা বুঝতে না পারলে পারমার্থিক উন্নতি সাধনে প্রেরণা পাওয়া যায় না।
স্ত্রী, পুত্র, গৃহের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের প্রতি কোন অনুভূতি থাকবে না। তাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের অনুকূল না হয়, তা হলে তাদের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত

নয়। গৃহকে আনন্দময় করে তোলবার শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন। কেউ যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর গৃহকে অতি মনোরম সুখের আলয়ে পরিণত করতে পারেন। কারণ, কৃষ্ণভক্তির এই পন্থা অতি সরল। কেবলমাত্র প্রয়োজন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করা, কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্র আলোচনা করা এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চনা করা। এই চারটি বিধি অনুশীলন করলে অনায়াসে সুখী হওয়া যায়। পরিবারের প্রতিটি লোককে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবারের সকলের কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় একত্রে বসে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই চারটি নিয়ম পালন করার মাধ্যমে কেউ যদি তাঁর পরিবারকে কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তুলতে পারেন, তা হলে তাঁকে গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হয় না। কিন্তু তা যদি তাঁর পারমার্থিক উন্নতির অনুকূল না হয়, উপযোগী না হয়, তা হলে সেই গৃহ ত্যাগ করা উচিত। কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য অথবা কৃষ্ণসেবার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করা উচিত, ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। অর্জুন তাঁর আত্মীয় পরিজনদের হত্যা করতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সেই আত্মীয় পরিজনেরা তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ শিরোধার্য করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং তাদের হত্যা করলেন। সর্ব অবস্থাতেই মানুষকে সাংসারিক জীবনের সুখ ও দুঃখ থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত। কারণ, এই জগতে কেউই সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না, তেমনই আবার কেউ সম্পূর্ণভাবে দুঃখীও হতে পারে না।
সুখ ও দুঃখ হচ্ছে জড় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে এগুলিকে সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। সুখ ও দুঃখ আসে যায় এবং তাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সুতরাং, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া, তা হলে এই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই প্রতি সম-ভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। সাধারণত, যখন আমরা আমাদের কাম্য বস্তু অর্জন করি, তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং যখন আমরা অবাঞ্ছিত কোন কিছু প্রাপ্ত হই, তখন আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত থাকি, তা হলে এই বিষয়গুলি আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদেরকে ভক্তিযোগে নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে হবে। অবিচলিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার অর্থ হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-এই নববিধা ভক্তির অনুশীলন করা, যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পদ্ধতি মেনে চলা উচিত।
কেউ যখন পারমার্থিক জীবন লাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বৈষয়িক লোকেদের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে চাইবেন না। অসাধুসঙ্গ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অসাধুসঙ্গ বর্জন করে নির্জন বাসের প্রতি কতটা অনুরাগ এসেছে, তার মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। খেলাধুলা, সিনেমা, সামাজিক অনুষ্ঠান আদিতে ভক্তের স্বাভাবিকভাবেই কোন রুচি থাকে না। কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, এগুলি কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। অনেক গবেষক ও দার্শনিক আছেন, যাঁরা যৌন বিজ্ঞান অথবা সেই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত গবেষণা ও দার্শনিক অনুমানগুলির কোন মূল্য নেই। সেগুলি এক রকম নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে, তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত। নিজেকে জানার জন্য গবেষণা করা উচিত। সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে।

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভক্তিযোগের পন্থা বিশেষভাবে বাস্তব-সম্মত। ভক্তিযোগ বলতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক বুঝতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনই এক হতে পারে না-অন্তত ভক্তিমার্গে। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার এই সেবা নিত্য। সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং ভক্তিযোগ নিত্য। এই তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন হওয়া উচিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জানমদ্বয়ম্। "যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান-এই তিনরূপে উপলব্ধ হন।" পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন ভগবান। সুতরাং, সেই চরম স্তরে উন্নীত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত এবং ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা।
অমানিত্ব থেকে শুরু করে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করার স্তর পর্যন্ত এই পন্থাটি একটি সিঁড়ির মতো, যেন একতলা থেকে শুরু হয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন এই সিঁড়িতে বহু লোক আছেন, যাঁরা একতলা, দুতলা অথবা তিনতলা আদিতে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছানো যাচ্ছে, যা হচ্ছে কৃষ্ণ-উপলব্ধি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জ্ঞানের নিম্নপর্যায়েই অবস্থিত। কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পারমার্থিক উন্নতি লাভকরতে চায়, তা হলে তার সে আশা ব্যর্থ হবে। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, অমানিত্ব ব্যতিরেকে উপলব্ধি সত্যিই সম্ভব নয়। নিজেকে ভগবান বলে মনে করা মিথ্যা অহঙ্কারের চরম প্রকাশ। প্রকৃতির কঠোর শাসনে জীব যদিও প্রতিনিয়তই পদদলিত হচ্ছে, তবুও অজ্ঞানতার প্রভাবে সে মনে করছে, "আমি ভগবান।" সেই জন্যই জ্ঞানের সূচনা হচ্ছে অমানিত্ব। সকলেরই উচিত নম্র হওয়া এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা। পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্য স্বীকার না করে বিদ্রোহী হওয়ার ফলেই আমরা জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে পড়েছি। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত।

শ্লোক ১৩

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ৷ ১৩ ॥

জ্ঞেয়ম্-জ্ঞাতব্য বিষয়; যৎ-যা; তৎ-তা; প্রবক্ষ্যামি-আমি এখন বলব; যৎ-যা; জ্ঞাত্বা-জেনে; অমৃতম্-অমৃত; অশ্রুতে-লাভ হয়; অনাদি-আদিহীন; মৎপরম্-আমার আশ্রিত; ব্রহ্ম-ব্রহ্ম; ন-নয়; সৎ-কারণ; তৎ-তা; ন-নয়; অসৎ-কার্য; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

জ্ঞানের জ্ঞাতব্য যাহা তাহা বলি শুন।
জানিতে সে তত্ত্ব হবে অমৃতের পান ॥
সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আমার আশ্রিত।
অনাদি সে সৎ আর অসৎ অতীত ॥

অনুবাদ

আমি এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলব, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার আশ্রিত। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তা কার্য ও কারণের অতীত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞকে জানবার পন্থাও ব্যাখ্যা করেছেন। এখন এখানে তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। আত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জানবার মাধ্যমেই জীবনে অমৃতের আস্বাদন করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব নিত্য। এখানেও সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জীবের জন্ম-তারিখ খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের থেকে কিভাবে জীবাত্মার প্রকাশ হল, তারও কোন ইতিহাস নেই। তাই তা অনাদি। বৈদিক শাস্ত্রে তার সত্যতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে-ন জায়তে প্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ (কঠ উপনিষদ ১/২/১৮)। দেহের জ্ঞাতার কখনও জন্ম হয় না, কখনও মৃত্যুও হয় না এবং সে পূর্ণ জ্ঞানময়।

পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধেও বৈদিক শাস্ত্রে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/১৬) বলা হয়েছে, প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ-প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে-দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। জীব নিত্যকাল ধরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে চলেছে। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর উপদেশাবলীতে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তা জীবাত্মা সম্বন্ধীয়। জীবাত্মাকে যখন ব্রহ্মা বলে উল্লেখ করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে বিজ্ঞান-ব্রহ্ম্য, যার বিপরীত হচ্ছে আনন্দ-ব্রহ্মা। আনন্দ-ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৪

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্বতঃ-সর্বত্র; পাণি-হস্ত; পাদম্-পদ; তৎ-তা; সর্বতঃ-সর্বত্র; অক্ষি-চক্ষু; শিরঃ-মস্তক, মুখম্-মুখ; সর্বতঃ-সর্বত্র; শ্রুতিমৎ-কর্ণবিশিষ্ট; লোকে-জগতে; সর্বম্-সব কিছু; আবৃত্য-পরিব্যাপ্ত করে; তিষ্ঠতি-স্থিত আছেন।

গীতার গান

সর্বস্থানে হস্তপদ নহে নিরাকার।
সর্বস্থানে চক্ষু শির কত মুখ তার ॥
সর্বত্র শ্রবণ সর্ব আবরণ স্থান।
তিনি ছাড়া ত্রিভুবনে নাহি কিছু আন ॥

অনুবাদ

তাঁর হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্বত্রই এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত। জগতে সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান।

তাৎপর্য

সূর্য যেমন অনন্ত কিরণ বিকিরণ করে বিরাজমান, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপে বিরাজমান। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তাঁর সেই সর্বব্যাপী রূপের মধ্যে অসংখ্য মস্তক, পদ, হস্ত, চক্ষু এবং অসংখ্য জীবাত্মা রয়েছে। সবই পরমাত্মার মধ্যে ও উপরে বিরাজ

করছে। তাই পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু জীবাত্মা কখনও বলতে পারে না যে, তার হাত, পা, চোখ আদি সর্বব্যাপ্ত। তা কখনও সম্ভব নয়। যদি সে তা মনে করেও, তার অজ্ঞানতার ফলে সে এখন বুঝতে পারছে না যে, তার হস্ত পদ সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু যখন সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করবে, তখন অনুভব করতে পারবে যে, তার এই চিন্তাধারা পরস্পর-বিরোধী। তার অর্থ হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে জীব পরম সত্তা নয়। পরমেশ্বর জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান সীমা ছাড়িয়ে তাঁর হাত বর্ধিত করতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মা তা পারে না। ভগবদগীতায় ভগবান বলছেন যে, যদি কেউ তাঁকে ফুল, ফল অথবা জল নিবেদন করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন। ভগবান যদি দূরে থাকেন, তা হলে কি করে তিনি তা গ্রহণ করেন? সেটিই হচ্ছে ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা- এমন কি যদিও তিনি এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তাঁর নিজ ধামে রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর হস্ত প্রসারিত করে তাঁর উদ্দেশে।

নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারেন।

এমনই হচ্ছে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) বলা হয়েছে, গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ-যদিও তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করছেন, তবুও তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। জীবাত্মা কখনই দাবি করতে পারে না যে, সে সর্বত্রই বিরাজমান। তাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান জীবাত্মা নন।

শ্লোক ১৫

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ৷ ১৫ ॥

সর্ব-সমস্ত; ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ের; গুণ-গুণের; আভাসম্-প্রকাশক; সর্ব-সমস্ত; ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়; বিবর্জিতম্-রহিত; অসক্তম্-আসক্তি রহিত; সর্বভূৎ-সকলের পালক; চ-ও; এব-অবশ্যই; নির্গুণম্-জড় গুণরহিত; গুণভোক্তৃ-সমস্ত গুণের ঈশ্বর; চ-ও।

গীতার গান

তাঁহা হতে ইন্দ্রিয়াদি হয়েছে প্রকাশ।
জড়েন্দ্রিয় নাহি তাঁর সর্বগুণাভাস ॥
অনাসক্ত সর্বভূৎ তিনি সে নির্গুণ।
সকল গুণের ভোক্তা তিনি চিরন্তন ॥

অনুবাদ

সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার, কিন্তু তা বলে তাদের মতো জড় ইন্দ্রিয় তাঁর নেই। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মারও চিন্ময় ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা জড় গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই, জড়ের মাধ্যমে চেতন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ প্রকাশ হতে দেখা যায়। পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি এই রকম আচ্ছাদিত নয়। তাঁর

ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত এবং তাই তাদের বলা হয় নির্গুণ। গুণ হচ্ছে প্রকৃতির বৃত্তি, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় আবরণ থেকে মুক্ত। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক আমাদের মতো নয়। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়জাত কর্মের উৎস যদিও তিনি, কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি দিব্য ও কলুষমুক্ত। সেই কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা- এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের জড়-জাগতিক কলুষযুক্ত কোন হাত নেই, কিন্তু তবুও তাঁর হাত আছে এবং সেই হাত দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। ভগবানের জড় চক্ষু নেই, কিন্তু তাঁর চক্ষু আছে- তা না হলে তিনি দেখতে পান কি করে? তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-সব কিছু দেখতে পান। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং অতীতে আমরা কি করেছি, এখন আমরা কি করছি এবং আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে, তা সবই তিনি জানেন। ভগবদ্গীতাতেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে-তিনি সব কিছু জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবানের আমাদের মতো পা নেই, কিন্তু তিনি সর্বত্র মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারেন, কারণ তাঁর পা অপ্রাকৃত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান নির্বিশেষ নন, নিরাকার নন, ব্যক্তিত্বহীন নন। তাঁর চোখ আছে, পা আছে, হাত আছে এবং সব কিছুই আছে। যেহেতু আমরা ভগবানের বিভিন্নাংশ, তাই আমরাও এই সমস্ত অঙ্গগুলি অর্জন করেছি। কিন্তু তাঁর হাত, পা, চোখ ও ইন্দ্রিয়গুলি কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয় না।

ভগবদ্গীতায় আরও বলা হয়েছে যে, যখন পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হন না, কারণ তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর। বৈদিক শাস্ত্রে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর সমগ্র সত্তা চিন্ময়। তাঁর রূপ নিত্য-তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্যময়। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সম্পদের মালিক এবং সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। এগুলি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কয়েকটি লক্ষণ। তিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা এবং তাদের সমস্ত কর্মের সাক্ষী। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়াতীত। আমরা যদিও তাঁর মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্ত অথবা পদ দেখতে পাই না, তবুও তাঁর এগুলি আছে এবং আমরা যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হই, তখন আমরা ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারি। জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কলুষিত হয়ে পড়েছে, তাই আমরা তাঁর রূপ দেখতে পাই না। সেই জন্য নির্বিশেষবাদীরা, যারা এখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

বহিঃ-বাইরে; অন্তঃ-অন্তরে; চ-ও; ভূতানাম্-সমস্ত জীবের; অচরম্-স্থাবর; চরম্-জঙ্গম; এব-ও; চ-এবং; সূক্ষ্মত্বাৎ-সূক্ষ্মতা হেতু; তৎ-তা; অবিজ্ঞেয়ম্-অবিজ্ঞেয়; দূরস্থম্-দূরে অবস্থিত; চ-ও; অন্তিকে নিকটে; চ-এবং; তৎ-তা।

গীতার গান
সকল ভূতের তিনি অন্তরে বাহিরে ।
তাঁহা হতে হয় সব চর বা অচর ॥
অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাই অবিজ্ঞেয়।
যুগপৎ বহু দূরে নিকটেতেও হয় ॥
অনুবাদ
সেই পরমতত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাইরে বর্তমান। তাঁর থেকেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। যদিও তিনি বহু দূরে অবস্থিত, কিন্তু তবুও তিনি সকলের অত্যন্ত নিকটে।
তাৎপর্য
বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রতিটি জীবের অন্তরে ও বাইরে বিরাজ করছেন। তিনি চিন্ময় ও জড় উভয় জগতে রয়েছেন। যদিও তিনি অনেক অনেক দূরে, তবুও তিনি আমাদের অতি নিকটেই। এগুলি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ (কঠ উপনিষদ ১/২/২১)। আর যেহেতু তিনি সর্বদাই চিদানন্দময়, তাই আমরা বুঝতে পারি না কিভাবে তিনি তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য উপভোগ করছেন। এই জড় ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ভক্তি সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় নির্মল হয়েছে, তিনি নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতে পারেন। ব্রহ্মসংহিতাতে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যে ভক্ত প্রেমভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তিনি নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতে পারেন। আর ভগবদ্গীতাতে (১১/৫৪) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ।

শ্লোক ১৭

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥
অবিভক্তম্-অবিভক্ত; চ-ও; ভূতেষু-সর্বভূতে; বিভক্তম্-বিভক্ত; ইব-মতো; চ-ও; স্থিতম্-অবস্থিত; ভূতভর্তৃ-সর্বভূতের পালক; চ-ও; তৎ-তা; জ্ঞেয়ম্-জানবে; গ্রসিষ্ণু-গ্রাসকারী; প্রভবিষ্ণু-প্রভুত্বকারী; চ-ও।
গীতার গান
অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত।
অখণ্ড সমষ্টি তিনি ব্যষ্টিরূপে স্থিত ॥
সর্বভূত ভর্তা তিনি সব জন্মদাতা।
তিনিই সবার পুনঃ সংহারের কর্তা ॥
অনুবাদ
পরমাত্মাকে যদিও সমস্ত ভূতে বিভক্তরূপে বোধ হয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। যদিও তিনি সর্বভূতের পালক, তবুও তাঁকে সংহার-কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে।

তাৎপর্য

পরমাত্মা রূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তা হলে তার অর্থ কি তিনি বিভক্ত হয়েছেন? না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে সূর্যের উদাহরণ দেওয়া হয়-মধ্যাহ্নকালীন সূর্য তার কক্ষপথে অবস্থিত থাকে। কিন্তু কেউ যদি পাঁচ হাজার মাইল পরিধি জুড়ে সকলকে জিজ্ঞেস করেন, "সূর্য কোথায়?" তা হলে সকলেই বলবে যে, তার মাথার উপর জ্বল জ্বল করছে। বৈদিক শাস্ত্রে এই উদাহরণটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, যদিও তিনি অবিভক্ত, তবুও মনে হয় যেন তিনি বিভক্তের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এই রকমও বলা হয়েছে যে, এক বিষ্ণু তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই বিরাজমান, ঠিক যেমন সূর্য অনেক জায়গায় অনেকের কাছে প্রতিভাত হয়। আর পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের পালনকর্তা, প্রলয়কালে তিনি সব কিছু গ্রাস করেন। সেই কথা একাদশ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যখন ভগবান বলেছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমবেত সমস্ত যোদ্ধাদের গ্রাস করবার জন্য তিনি এসেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কালরূপেও তিনি গ্রাস করেন। তিনি বিনাশকর্তা-সকলকে তিনি ধ্বংস করেন। সৃষ্টির সময় তিনি সব কিছুই তাদের আদি অবস্থা থেকে বিকাশ সাধন করেন এবং বিনাশের সময় তিনি তাদের গ্রাস করেন। বৈদিক শ্লোকে সেই সত্যকে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত জীবের উৎস এবং আশ্রয়। সৃষ্টির পরে সব কিছুই তাঁর সর্ব শক্তিমত্তাকে আশ্রয় করে স্থিত হয় এবং বিনাশের পরে সব কিছুই আবার তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিতে তাঁর কাছে ফিরে যায়। সেই সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে- যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩/১)।

শ্লোক ১৮

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

জ্যোতিষাম্-সমস্ত জ্যোতিষ্কের; অপি-ও; তৎ-তা; জ্যোতিঃ-জ্যোতি; তমসঃ -অন্ধকারের; পরম্-অতীত; উচ্যতে বলা হয়; জ্ঞানম্-জ্ঞান; জ্ঞেয়ম্-জ্ঞেয়; জ্ঞানগম্যম্-জ্ঞানগম্য; হৃদি-হৃদয়ে; সর্বস্য-সকলের; বিষ্ঠিতম্-অবস্থিত।

গীতার গান

সমস্ত জ্যোতির তিনি পরম আধার।
চিন্ময় তাঁহার জ্যোতি জড় পর আর ॥
জ্ঞানময় রূপ তাঁর জ্ঞানগম্য জ্ঞেয় ।
সকলের হৃদিমাঝে তিনি অধিষ্ঠেয় ॥

অনুবাদ

তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পরম জ্যোতি। তাঁকে সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

তাৎপর্য

পরমাত্মা বা পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি সমস্ত জ্যোতিষ্কের

জ্যোতির উৎস। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, চিৎ-জগৎকে আলোকিত করার জন্য সূর্য অথবা চন্দ্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই জগৎ পরমেশ্বরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জড় প্রকৃতিতে সেই ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা জড় প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই, এই জড় জগৎকে আলোকিত করবার জন্য সূর্য, চন্দ্র ও বৈদ্যুতিক শক্তি আদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু চিৎ-জগতে তাদের কোন প্রয়োজন হয় না। বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর জ্যোতিচ্ছটায় সব কিছুই উদ্ভাসিত। তাই এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি জড় জগতে অবস্থান করেন না। তিনি অবস্থান করেন চিৎ-জগতে, যা এই জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে চিদাকাশে অবস্থিত। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮)। তিনি সূর্যের মতো নিত্য জ্যোতির্ময়, কিন্তু তিনি এই তমসাচ্ছন্ন জড় জগৎ থেকে বহু বহু দূরে রয়েছেন।

তাঁর জ্ঞান দিবা। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ঘনীভূত দিব্যজ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্ম। যিনি চিৎ-জগতে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাঁকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান দিব্যজ্ঞান দান করেন। একটি বৈদিক মন্ত্রে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/১৮) বলা হচ্ছে-তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। কেউ যদি মুক্তির আকাঙক্ষা করে, তা হলে তাকে অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পরম জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে-তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি। "কেবলমাত্র তাঁকে জানার ফলেই মানুষ জন্ম-মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করতে পারে।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮)

পরম নিয়ন্তারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। তাঁর হাত, পা সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু জীবাত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় না। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ দুজন-জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সেই কথা স্বীকার করতেই হবে। জীবাত্মার হাত, পা কোন নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হাত, পা সর্বত্রই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৭) বলা হয়েছে-সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান বা পরমাত্মা হচ্ছেন সর্ব জীবের প্রভু, তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা যে সর্ব অবস্থাতেই ভিন্ন, সেই কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ৷ ১৯ ॥

ইতি-এভাবেই; ক্ষেত্রম্-ক্ষেত্র (দেহ); তথা-৫; জ্ঞানম্-জ্ঞান; জ্ঞেয়ম্-জ্ঞেয়; চ-ও; উক্তম্-বলা হল, সমাসতঃ-সংক্ষেপে; মদ্ভক্তঃ-আমার ভক্ত; এতৎ-এই সমস্ত; বিজ্ঞায়-বিদিত হয়ে; মস্তাবায়-আমার ভাব; উপপদ্যতে-লাভকরেন।

গীতার গান

এই কহিনু তত্ত্ব ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয়।
বিজ্ঞান তাহার নাম পণ্ডিতের প্রিয় ॥
এ বিজ্ঞান বুঝিয়া সে মোর ভক্ত হয়।
তত্ত্ব শুদ্ধি জ্ঞান হয় ভক্তির আশ্রয় ।

অনুবাদ

এভাবেই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-এই তিনটি তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্তই কেবল এই সমস্ত বিদিত হয়ে আমার ভাব লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান ও জ্ঞেয়-এই তিনটি তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন। এই জ্ঞান হচ্ছে তিনটি বিষয়ের জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও জ্ঞান আহরণের পন্থা। যুক্তভাবে এদের বলা হয় বিজ্ঞান। ভগবানের অনন্য ভক্ত সরাসরিভাবে শুদ্ধ জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু অন্যদের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অদ্বৈতবাদীরা বলে থাকেন যে, পরম স্তরে এই তিনটি বিষয় এক হয়ে যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সেই কথা স্বীকার করেন না। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিকাশের অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে নিজেকে উপলব্ধি করা। আমরা জড় চেতনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, কিন্তু আমরা যখনই আমাদের সমস্ত চেতনা কৃষ্ণোন্মুখী করে তুলি এবং শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তখনই আমরা যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে বলা যায়, জ্ঞান হচ্ছে যথার্থভাবে ভগবদ্ভক্তি উপলব্ধি করার প্রারম্ভিক স্তর। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

এখন, আলোচনার সারসংক্ষেপ করতে গেলে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে যে, মহাভূতানি থেকে শুরু করে চেতনা ধৃতিঃ পর্যন্ত ৬ ও ৭ শ্লোকে জড় উপাদানগুলি ও জীবন-লক্ষণের কয়েকটি অভিব্যক্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলির সমন্বয়ে দেহ অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র গঠিত হয়। আর অমানিত্বম্ থেকে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ পর্যন্ত ৮ থেকে ১২ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপী উভয় ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি অর্জনের উপযোগী জ্ঞান আহরণের পন্থা বিবৃত হয়েছে। তার পরে অনাদি মৎপরম্ থেকে আরম্ভ করে হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ পর্যন্ত ১৩ থেকে ১৮ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান অর্থাৎ পরমাত্মার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে-ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান উপলব্ধির পন্থা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরাই এই তিনটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন। সুতরাং, এই সব ভক্তদের কাছে ভগবদ্গীতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁরাই পরম লক্ষ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভাব লাভ করতে পারেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, আর কেউ নয়, কেবলমাত্র ভক্ত-জনেরাই ভগবদ্গীতা বুঝতে পারেন এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২০

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিম্-জড়া প্রকৃতি; পুরুষম্-পুরুষ; চ-ও; এব-অবশ্যই; বিদ্ধি-জানবে; অনাদী-আদিহীন; উভৌ-উভয়; অপি-ও; বিকারান্-বিকার; চ-ও; গুণান্ প্রকৃতির তিনটি গুণ; চ-ও; এব-অবশ্যই; বিদ্ধি-জানবে; প্রকৃতি-জড়া প্রকৃতি; সম্ভবান্-উদ্ভূত।

গীতার গান

প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদি সে সিদ্ধ।

অনাদি কাল হতে উভয় সংবৃদ্ধ ॥
বিকারাদি গুণ যত প্রাকৃত সম্ভব।
প্রাকৃত পুরুষ যেই তার অনুভব ।

অনুবাদ

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলে জানবে। তাদের বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে দেহ (কর্মক্ষেত্র) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা, পরমাত্মা উভয়ই) সম্বন্ধে জানা যায়। দেহ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র এবং তা জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। দেহে আবদ্ধ হয়ে কর্মফল ভোগ করছে যে স্বতন্ত্র আত্মা, সেই হচ্ছে পুরুষ বা জীব। জীবাত্মাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অপর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমাত্মা। আমাদের অবশ্য জানতে হবে যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই পরম পুরুষ ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। জীব হচ্ছে তাঁর শক্তিতত্ত্ব এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর স্বাংশ-প্রকাশ।
জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই নিত্য, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকেই জড়া প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে এবং জীবও তেমনই। কিন্তু জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তিসম্ভূত। সৃষ্টির পূর্বে তারা উভয়েই ছিল। জড়া প্রকৃতি নিহিত ছিল পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুর মধ্যে এবং মহাবিষ্ণুর ইচ্ছার ফলে মহৎ-তত্ত্বের মাধ্যমে আবার তার প্রকাশ হয়। তেমনই, জীবেরাও তাঁর মধ্যে আছে, কিন্তু যেহেতু তারা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, তাই তারা ভগবানের সেবাবিমুখ। তাই, তাদের চিদাকাশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু জড়া প্রকৃতিতে আসার ফলে এই সমস্ত জীবকে আবার জড় জগতে কর্ম করবার সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা চিৎ-জগতে প্রবেশ করবার জন্য নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে। সেটিই হচ্ছে এই জড় সৃষ্টির রহস্য। প্রকৃতপক্ষে জীব হচ্ছে মূলত ভগবানের চিন্ময় বিভিন্ন অংশ। কিন্তু তার বিদ্রোহীসুলভ প্রকৃতির জন্য সে এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তিজাত এই সমস্ত জীব যে কেন এবং কিভাবে এই জড় জগতের সংস্পর্শে এল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য জানেন কেন এবং কিভাবে তা ঘটল। শাস্ত্রে ভগবান বলেছেন যে, যারা জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট, তারা জীবন ধারণের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটছে তা সাই জডা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত। জীবের সমস্ত রূপান্তর ও বৈচিত্র্য সবং দৈহিক। আত্মার পারপ্রেক্ষিতে সমস্ত জীবই এক রকম।

শ্লোক ২১

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥.২১ ॥

কার্য-কার্য; কারণ-কারণ; কর্তৃত্বে-কর্তৃত্ব বিষয়ে; হেতুঃ-হেতু; প্রকৃতিঃ-জড়া প্রকৃতিকে; উচ্যতে বলা হয়; পুরুষঃ-জীবকে; সুখ-সুখ; দুঃখানাম্ দুঃখের; ভোক্তত্বে-ভোগ বিষয়ে; হেতুঃ-হেতু; উচ্যতে বলা হয়।

গীতার গান
কার্য বা কারণ হয় প্রকৃতির দান।
ভোগের কারণ সেই পুরুষেই হন ॥

অনুবাদ

সমস্ত জড়ীয় কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, তেমনিই জড়ীয় সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে জীবকে হেতু বলা হয়।

তাৎপর্য

জীবের ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয় জড়া প্রকৃতির প্রভাবে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির জীব আছে এবং তা প্রকৃতিরই সৃষ্টি। জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন শরীরে তখন সে বিভিন্ন রকমের সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। তার এই সুখ ও দুঃখের কারণ তার জড় দেহ এবং সেই অনুভূতিগুলি তার নিজের নয়। তার স্বরূপে সে যে নিত্য আনন্দময়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই সেটি হচ্ছে তার স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে জীব জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। চিৎ-জগতে এই সমস্ত বন্ধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। চিৎ-জগৎ হচ্ছে চিরপবিত্র, কিন্তু জড় জগতে সকলেই তাদের দেহগত ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এই দেহটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র। তাই দেহ ও যন্ত্রতুল্য ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির দান। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম এবং বাসনা অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। জীবের কামনা ও কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন আবাসনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত আবাসনগুলি অর্জনের জন্য জীব নিজেই দায়ী এবং সেই অনুসারে সে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। কোন বিশেষ জড় শরীর প্রাপ্ত হলেই জীব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, কারণ তার দেহটি জড় পদার্থ বলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাকে পরিচালিত হতে হয়। তখন সেই নিয়ম পরিবর্তন করার কোন শক্তি জীবের থাকে না। যেমন, কোন জীবকে কুকুরের দেহে রাখা হল। যখনই তাকে কুকুরের দেহে রাখা হল, তখন তাকে কুকুরের মতোই আচরণ করতে হবে। অন্য কোন রকম আচরণ সে আর তখন করতে পারে না। অথবা কোন জীবকে যদি শূকরের দেহে রাখা হয়, তখন সে শূকরের মতো বিষ্ঠা খেতে আর সেভাবেই কাজ করতে বাধ্য হয়। তেমনই, কোন জীবকে যদি দেবতা শরীরে রাখা হয়, তখন তাকে তার সেই দেহ অনুসারে আচরণ করতে হয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা জীবাত্মার সঙ্গে রয়েছেন। বেদে (মুণ্ডক উপনিষদ ৩/১/১) তার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে-দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। পরমেশ্বর ভগবান জীবের প্রতি এতই দয়াশীল যে, তিনি সর্বদাই তার পরম বন্ধুর মতো পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদযোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ-জীব; প্রকৃতিস্থঃ-জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে; হি-অবশ্যই; ভুঙ্ক্তে-ভোগ করে;

প্রকৃতিজান্-প্রকৃতিজাত; গুণান্-গুণসমূহ; কারণম্-কারণ; গুণসঙ্গঃ-প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে; অস্য-এই জীবের; সদসদ-ভাল ও মন্দ; যোনি-যোনিতে; জন্মসু-জন্ম হয়।

গীতার গান

প্রাকৃত হইয়া জীব ভুঞ্জে সেই গুণ।
প্রকৃতির গুণ সব প্রকৃতির দান ॥
প্রাকৃত গুণের সঙ্গ উচ্চনীচ যোনি।
সদসদ জন্ম হয় অন্য নাহি গণি ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় তা বোঝার জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পোশাক পরিবর্তন করার মতো জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। জড় অস্তিত্বের প্রতি আসক্তিই হচ্ছে এই পোশাক পরিবর্তনের কারণ। জীব যতক্ষণ এই ভ্রান্ত প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জড় জগতের উপর আধিপত্য করার দুরাশার ফলে সে এই রকম অবাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হয়। জাগতিক কামনা-বাসনার প্রভাবে সে কখনও দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করে, কখনও মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কখনও পশু, পাখি, জলচর প্রাণী, পতঙ্গ, সাধুসন্ত অথবা পোকা-মাকড় অথবা ছাড়পোকা রূপে জন্মগ্রহণ করে। সর্বক্ষণই এই দেহান্তর ঘটে চলেছে আর সর্ব অবস্থাতেই জীব মনে করছে যে, সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিয়ন্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ব অবস্থাতেই সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। কিভাবে জীব বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে তার আসঙ্গ। তাই প্রকৃতির তিনটি গুণের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে গুণাতীত অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তাকেই বলা হয় কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণচেতনায় অধিষ্ঠিত না হলে তার জড় চেতনা তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে বাধ্য করবে, কারণ অনাদি কাল ধরে তার হৃদয়ে জড় কামনা-বাসনাগুলি রয়ে গেছে। তাই তার এই চেতনার পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তন সম্ভব হয় কেবল নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে দেওয়া হয়েছে-অর্জুন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছেন। জীব যদি এই শ্রবণের পন্থা অবলম্বন করে, তা হলে সে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চির-পুরাতন বাসনা ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং জড় জগতের উপর তার আধিপত্য করার বাসনা যত কমতে থাকে, সেই অনুপাতে সে দিব্য আনন্দ অনুভব করে থাবে। একটি বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ লাভে তার স্পন যতই বর্ধিত হয়, ৩৩ই সে নিত্য আনন্দময় জীবন আস্বাদন করা থাকে।

শ্লোক ২৩

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

উপদ্রষ্টা-সাক্ষী; অনুমন্তা-অনুমোদনকারী; চ-ও; ভর্তা-পালক; ভোক্তা-ভোগকর্তা; মহেশ্বরঃ-পরমেশ্বর; পরমাত্মা-পরমাত্মা; ইতি-এভাবে; চ-এবং; অপি-ও; উক্তঃ বলা হয়; দেহে-শরীরে; অস্মিন্ এই; পুরুষঃ-পুরুষ; পরঃ-পরম।

গীতার গান

সে জীবের বদ্ধরূপে পরমাত্মা সঙ্গে।
উপদেষ্টা অনুমন্তা হন তিনি রঙ্গে ॥
মহেশ্বর তিনি ভোক্তা পুরুষে পরম।
জীবের উদ্ধার লাগি তিনি সঙ্গে হন ॥

অনুবাদ

এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

তাৎপর্য

এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমাত্মা যিনি সর্বক্ষণ জীবের সঙ্গে থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ। তিনি একজন সাধারণ জীব নন। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞকে এক বলে মনে করেন, তাই তাঁদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য ভগবান এখানে বলেছেন যে, তিনি পরমাত্মা রূপে প্রতিটি দেহে বিরাজ করেন। জীবাত্মা থেকে তিনি পৃথক, তিনি পর অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত। জীবাত্মা কোন বিশেষ ক্ষেত্রের কার্যকলাপ উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু পরমাত্মা সীমিত ভোক্তা বা দেহের কর্মফলের ভোক্তারূপে থাকেন না, তিনি বিরাজ করেন সাক্ষী, পর্যবেক্ষক, অনুমোদনকারী ও পরম ভোক্তারূপে। তাঁর নাম চ্ছে পরমাত্মা, জীবাত্মা নয়। তিনি প্রপঞ্চাতীত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা ও পরমায়। ভিন্ন। পরমাত্মার হস্ত ও পদ সর্বত্রই আছে, কিন্তু জীবের তা নেই। যেহেতু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে থেকে জীবাত্মার ভোগ বাসনাগুলি মঞ্জুর করেন। পরমাত্মার অনুমোদন ব্যতীত জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না। জীবাত্মা হচ্ছে ভুক্ত বা প্রতিপালিত এবং ভগবান হচ্ছেন ভোক্তা বা প্রতিপালক। অসংখ্য জীব আছে এবং তিনি তাদের পরম সুহৃদরূপে তাদের অন্তরে বিরাজ করেন।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ এবং তারা উভয়েই একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু জীবের মধ্যে ভগবানের অনুমোদন প্রত্যাহার করার প্রবণতা রয়েছে এবং সে স্বাধীনভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা করে। যেহেতু তার এই প্রবণতা রয়েছে, তাই তাকে বলা হয় পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীব ভগবানের জড়া শক্তি নতুবা তাঁর পরা শক্তিতে অবস্থান করতে পারে। যখন সে জড়া শক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে তাঁর পরা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তার পরম বন্ধু পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ভগবান জীবকে পরা প্রকৃতিতে নিয়ে যাবার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু জীব তার যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে প্রতিনিয়ত পরম চিন্ময় জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করছে। তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলেই জীব এই জড়া প্রকৃতিতে সংসার-দুঃখ ভোগ করছে। ভগবান তাই সর্বক্ষণ তার অন্তরে থেকে এবং বাইরে থেকে উপদেশ দিচ্ছেন। বাইরে থেকে তিনি ভগবদ্গীতা রূপে উপদেশ দিচ্ছেন এবং অন্তর থেকে তিনি জীবের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন যে, এই জড় জগতে তার কোন কর্ম আনন্দ দানের পক্ষে উপযোগী নয়। তিনি বলছেন, "এই সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার প্রতি বিশ্বাসভাজন হও, তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে।" এভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি

পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অর্পণ করে সৎ-চিৎ-আনন্দময় জীবনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন।

শ্লোক ২৪

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভুয়োহভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যঃ-যিনি; এবম্-এভাবেই; বেত্তি জানেন; পুরুষম্-পুরুষকে, প্রকৃতিম্-জড়া প্রকৃতিকে; চ-এবং; গুণৈঃ-গুণ; সহ-সহ; সর্বথা-সর্বতোভাবে; বর্তমানঃ-বিদ্যমান হয়ে; অপি-ও; ন-না; সঃ-তিনি; ভূয়ঃ-পুনরায়; অভিজায়তে-জন্মগ্রহণ করেন।

গীতার গান

সেই সে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষ প্রকৃতি।
পুরুষের যে প্রাকৃত গুণের স্বীকৃতি ॥
যে বুঝিল বর্তমান হইয়া সর্বথা।
পুনর্জন্ম নাহি তার নহে সে অন্যথা ॥

অনুবাদ

যিনি এভাবেই পুরুষকে এবং গুণাদি সহ জড়া প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি জড় জগতে বর্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং এই জগতে পুনরাবর্তিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের পরিণতি। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব যে ঘটনাচক্রে এই জড় জগতের বন্ধনে পতিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রভাবে, সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের সঙ্গ করার ফলে মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত ভগবদ্গীতার যথাযথ তাৎপর্য উপলব্ধি করে ভগবৎ-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা। তা হলে তাকে আর জড় জগতের বন্ধনে ফিরে আসতে হয় না। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তখন তিনি সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করবার জন্য চিন্ময় জগতে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ২৫

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

ধ্যানেন-ধ্যানের দ্বারা; আত্মনি-অন্তরে; পশ্যন্তি-দর্শন করেন; কেচিৎ-কেউ কেউ; আত্মানম্-পরমাত্মাকে; আত্মনা-মনের দ্বারা; অন্যে-অন্যেরা; সাংখ্যেন যোগেন-সাংখ্য-যোগের দ্বারা; কর্মযোগেন কর্মযোগের দ্বারা; চ-ও; অপরে-অন্যেরা।

গীতার গান

ভক্তগণ চিদাশ্রয়ে সদা ধ্যানে রত।
প্রেমচক্ষে পরমাত্মাকে দর্শন সতত ॥
সাংখ্যযোগী জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করে।
কর্মযোগী ভগবানে কর্মার্পণ করে ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য-যোগের দ্বারা দর্শন করেন এবং অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, আত্মজ্ঞান লাভের অনুসন্ধানী বদ্ধ জীবাত্মাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা নাস্তিক, অজ্ঞাবাদী এবং সন্দেহবাদী, তারা সর্বতোভাবে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য। কিন্তু যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, তাদের বলা হয় অন্তর্দর্শী ভক্ত, দার্শনিক ও নিষ্কাম কর্মী। যারা সর্বদা অদ্বৈতবাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে, তাঁদেরও নাস্তিক ও অজ্ঞাবাদী বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তেরাই কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। কারণ তাঁরা জানেন যে, এই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চিন্ময় ভগবৎ-ধাম রয়েছে, যেখানে পরম পুরুষ ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং তিনি পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপী ভগবান। অবশ্য অনেক অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরাও বিশ্বাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা জড় জগৎকে চব্বিশটি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁরা জীবাত্মাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মার প্রকৃতি হল জড়াতীত, তখন তাঁরা এটিও বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মার ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই ভগবান হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব। এভাবেই ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে তাঁরাও ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। যাঁরা নিষ্কাম কর্মী বা কর্মযোগী, তাঁরাও ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। কালক্রমে তাঁরাও কৃষ্ণভাবনায় ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হবার সুযোগ পান। এখানে বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ আছেন যাঁদের চিত্তবৃত্তি নির্মল এবং তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা যখন হৃদয়ে পরমাত্মাকে খুঁজে পান, তখন তাঁরা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তেমনই, অনেকে আছেন, যাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। কেউ আবার হঠযোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চান এবং কেউ আবার শিশুসুলভ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন।

শ্লোক ২৬

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ।২৬ ॥

অন্যে-অন্যেরা; তু-কিন্তু; এবম্-এভাবেই; অজানন্তঃ না জেনে; শ্রুত্বা শ্রবণ করে; অন্যেভ্যঃ-অন্যদের কাছ থেকে; উপাসতে-উপাসনা করেন; তে-তাঁরা; অপি-ও; চ-এবং; অতিতরন্তি-অতিক্রম করেন; এব-অবশ্যই; মৃত্যুম্-মৃত্যুময় সংসার; শ্রুতিপরায়ণাঃ-শ্রবণ-

পরায়ণ হয়ে।

গীতার গান

অন্য সাধারণ লোক বুঝে না সে কিছু।
শ্রবণান্তর উপাসনা তারা করে কিছু ॥
তারাও ত্বরিয়া যায় এ সংসার হতে।
যদি শ্রুতিপরায়ণ সাধুর সঙ্গেতে ॥

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ এভাবেই না জেনে অন্যদের কাছ থেকে শ্রবণ করে উপাসনা করেন। তাঁরাও শ্রবণ-পরায়ণ হয়ে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি আধুনিক সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ বর্তমান সমাজে বাস্তবিকপক্ষে পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম শিক্ষাই দেওয়া হয় না। কিছু কিছু লোককে নাস্তিক অথবা অজ্ঞাবাদী অথবা দার্শনিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন রকম দার্শনিক জ্ঞানই নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, কোন মানুষ যদি পুণ্যাত্মা হন, তা হলে শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি পরমার্থ সাধনের পথে একটি সুযোগ পেতে পারেন। এই শ্রবণের পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি বর্তমান জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে গেছেন, তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ যদি কেবল সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারেন, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা যদি অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। তাই বলা হয়েছে যে, সকলেরই উচিত আত্মজ্ঞানী পুরুষের কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করা। তখন তাঁরা আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা শুরু করবেন। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, এই কলিযুগে কাউকেই তার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে না। তবে অনুমানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার সব রকম চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে। যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের সেবক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি অসীম সৌভাগ্যের ফলে কোন শুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় লাভ করেন, তাঁর মুখারবিন্দ থেকে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হবেন। এই শ্লোকে শ্রবণ করার পন্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই শ্রবণের পন্থা খুবই যথাযথ। সাধারণ মানুষ যদিও তথাকথিত দার্শনিকদের মতো দক্ষ নাও হন, তবুও শ্রদ্ধা ভরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ২৭

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ-যা কিছু; সংজায়তে-উৎপন্ন হয়; কিঞ্চিৎ-কোন কিছু; সত্ত্বম্-অস্তিত্ব; স্থাবর-স্থাবর; জঙ্গমম্-জঙ্গম; ক্ষেত্র দেহ; ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞের; সংযোগাৎ-সংযোগ থেকে; তৎ-তা; বিদ্ধি-জানবে; ভরতর্ষভ-হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

স্থাবর জঙ্গম যত জন্মেছে জন্মাবে।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ প্রভাবে ।।

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ। স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু অস্তিত্ব আছে, তা সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল, তাদের সম্বন্ধে এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল জড়া প্রকৃতি ও জীবের সমন্বয় মাত্র। প্রকৃতিতে গাছপালা, পাহাড় ও পর্বতের মতো অনেক কিছু আছে, যা স্থাবর বা গতিশীল নয় এবং অনেক কিছু আছে যা জঙ্গম বা গতিশীল। তারা সকলেই জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি জীবাত্মার সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পরা প্রকৃতি জীবাত্মার সংস্পর্শ ছাড়া কোন কিছুরই বিকাশ হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে পরা প্রকৃতির যে সম্পর্ক তা নিত্যকাল ধরে চলে আসছে এবং তাদের সমন্বয় সম্পাদিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে। তাই, তিনি উৎকৃষ্টা ও অনুৎকৃষ্টা উভয় প্রকৃতিরই নিয়ন্তা। তিনি জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতিকে তিনিই জড়া প্রকৃতিতে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর ফলে এই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং সক্রিয় হয়েছে।

শ্লোক ২৮

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমম্-সমভাবে; সর্বেষু-সমস্ত; ভূতেষু-জীবে; তিষ্ঠন্তম্-অবস্থিত; পরমেশ্বরম্ -পরমাত্মাকে; বিনশ্যৎসু-বিনাশশীলদের মধ্যে; অবিনশ্যন্তম্-অবিনাশী; যঃ-যিনি; পশ্যতি-দর্শন করেন; সঃ-তিনি; পশ্যতি-যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

সে সব ভূতেতে সমস্থিত ভগবান।
দর্শন করিতে পারে কোন ভাগ্যবান ॥
ভগবান অবিনশ্যৎ বস্তু তাহার ভিতরে।
বিনশ্যৎ ধর্ম তিনি স্বীকার না করে ।

অনুবাদ

যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত বিনাশশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

সাধুসঙ্গের প্রভাবে যিনি দেহ, দেহী বা জীবাত্মা ও জীবাত্মার বন্ধু-এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয় দর্শন করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন। যে পারমার্থিক বিষয়ে প্রকৃত

জ্ঞাতার সঙ্গ করে না, সে এই তিনটি জিনিস দেখতে পায় না। যারা তেমন সঙ্গ লাভ করে না, তারা অজ্ঞ হয়েই থাকে। তারা কেবল দেহটিই দর্শন করে এবং দেহটির যখন বিনাশ হয়ে যায়, তখন মনে করে যে, সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি তা নয়। দেহের বিনাশ হলেও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বর্তমান থাকেন এবং তাঁরা অনাদি কাল ধরে অসংখ্য স্থাবর ও জঙ্গম শরীরে ভ্রমণ করতে থাকেন। পরমেশ্বর এই সংস্কৃত শব্দটিকে কখনও কখনও 'জীবাত্মা' বলে অনুবাদ করা হয়, কারণ আত্মা হচ্ছে দেহের প্রভু এবং দেহের বিনাশের পরে সে অন্য একটি রূপ গ্রহণ করে। এভাবেই সে হচ্ছে প্রভু। কিন্তু পরমেশ্বর শব্দটিকে 'পরমাত্মা' বলে অন্যেরা ব্যাখ্যা করে থাকেন। দুটি ক্ষেত্রেই, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই থাকেন। তাঁদের বিনাশ হয় না। এভাবেই যিনি দর্শন করতে পারেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে তা বুঝতে পারেন।

শ্লোক ২৯

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

সমম্-সমভাবে; পশ্যন্-দর্শন করে; হি অবশ্যই; সর্বত্র সর্বত্র; সমবস্থিতম্-সমভাবে অবস্থিত; ঈশ্বরম্-পরমাত্মাকে; ন-করেন না; হিনস্তি-অধঃপতন; আত্ব।-মনের দ্বারা; আত্মানম্-আত্মাকে; ততঃ-সেই হেতু; যাতি-লাভ করেন; পরাম্-পরম; গতিম্-গতি।

গীতার গান

সকলের মধ্যে সম থাকেন ঈশ্বর।
দেখিতে সমর্থ হয় যেই তৎপর ॥
যে আত্মাকে অধঃপাত কভু নাহি করে।
কুপথগামী সে দুষ্ট মন দ্বারে ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কখনও মনের দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত করেন না। এভাবেই তিনি পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জীবাত্মা তার জড়-জাগতিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার চিন্ময় অবস্থা থেকে ভিন্নতর অবস্থান লাভ করে। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মা অংশ-প্রকাশরূপে সর্বত্র বিরাজিত, অর্থাৎ কেউ যখন সর্বভূতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, তখন আর তিনি বিনাশী মনোভাব নিয়ে নিজেকে অধঃপতিত করেন না এবং তাই তিনি তখন ধীরে ধীরে চিন্ময় জগতের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মন সাধারণত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক ক্রিয়াকলাপে আসক্ত থাকে, কিন্তু সেই মন যখন ভগবন্মুখী হয়, তখন পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩০

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রকৃত্যা-জড়া প্রকৃতির দ্বারা; এব-অবশ্যই; চ-ও; কর্মাণি-কর্মসমূহ; ক্রিয়মাণানি-ক্রিয়মাণ; সর্বশঃ-সর্বতোভাবে; যঃ-যিনি; পশ্যতি-দর্শন করেন; তথা-এবং; আত্মানম্-আত্মাকে; অকর্তারম্-অকর্তা; সঃ-তিনি; পশ্যতি-যথাযথভাবে দর্শন করেন।

গীতার গান

প্রকৃতি প্রদত্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা।
প্রকৃতিই সাধে কর্ম জীবের সে সারা ॥
কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীব কিছু নাহি করে।
যাঁহার দর্শন সেই সে দেখিতে পারে ।

অনুবাদ

যিনি দর্শন করেন যে, দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আত্মা হচ্ছে অকর্তা, তিনিই যথাযথভাবে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

এই দেহটি পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং দেহের মাধ্যমে জীব যে সমস্ত কার্যকলাপ করে, সেগুলি সে নিজে করে না। সুখ অথবা দুঃখের জন্য সে যা-ই করুক, প্রকৃতপক্ষে তার দেহের গঠন অনুসারে সেটি করতে সে বাধ্য হয়। আত্মা কিন্তু সর্বদাই এই সমস্ত দৈহিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে। কারও অতীত বাসনা অনুসারে তার দেহটি দেওয়া হয়েছে। কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য জীব তার জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা সে কর্ম করে। বস্তুত বলা যায় যে, দেহটি হচ্ছে একটি যন্ত্র, যা জীবের মনোবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান বানিয়েছেন। বাসনার ফলে দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করবার জন্য জীব নানা রকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু জীবের এই দিব্যদৃষ্টি যখন বিকশিত হয়, তখন সে তার দেহের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে পৃথকরূপে দর্শন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর আছে, তিনি হচ্ছেন আসল দ্রষ্টা।

শ্লোক ৩১

যদা ভূতপৃথভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।। ৩১ ॥

যদা-যখন; ভূত-জীবগণের; পৃথভাবম্ পৃথক অস্তিত্ব; একস্থম্-একই প্রকৃতিতে অবস্থিত; অনুপশ্যতি-দর্শন করেন; ততঃ এব-তা থেকে; চ-ও; বিস্তারম্-বিস্তার; ব্রহ্মাহ্ম-ব্রহ্মভাব; সম্পদ্যতে-লাভ করেন; তদা-তখন।

গীতার গান

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে যেবা একত্ব দর্শনে।
সর্বভূতের পৃথক ভাব সমর্থ সে মনে ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিস্তার সেই যেবা জানে।
সমর্থ সে জন দৃষ্টি ব্রহ্ম সম্পাদনে ॥

অনুবাদ

যখন বিবেকী পুরুষ জীবগণের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে একই প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং

একই প্রকৃতি থেকেই তাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

কেউ যখন দর্শন করতে পারেন যে, জীব তার কামনা বাসনার ফলে নানা রকম জড় দেহ প্রাপ্ত হয় এবং আত্মার থেকে জড় দেহ পৃথক, তখনই তিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন। জড়-জাগতিক জীবনে আমরা দেখি যে, কেউ দেবতা, কেউ মানুষ, কেউ কুকুর, কেউ বেড়াল ইত্যাদি। কিন্তু এটি হচ্ছে জড় দর্শন-যথার্থ দর্শন নয়। জীবন সম্বন্ধে জড় ধারণার ফলেই এই জড় বিভেদ প্রতিভাত হয়। জড় দেহের বিনাশ হয়ে যাবার পর, আত্মা একই থাকে। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা নানা প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ যখন তা দর্শন করতে পারেন, তখন তিনি দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হন। এভাবেই মানুষ, পশু, বড়, ছোট আদি পার্থক্য থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চেতনা তখন পরিশুদ্ধ হয় এবং তিনি তখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। তখন তিনি কিভাবে সব কিছু দর্শন করেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩২

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ।। ৩২ ॥

অনাদিত্বাৎ-অনাদিত্ব হেতু; নির্গুণত্বাৎ-নির্গুণত্ব হেতু; পরম-জড়া প্রকৃতির অতীত; আত্মা-আত্মা; অয়ম্-এই; অব্যয়ঃ-অবায়; শরীরস্থঃ অপি-শরীরে থেকেও; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; ন করোতি-কিছুই করে না; ন লিপ্যতে-লিপ্ত হয় না।

গীতার গান

ব্রহ্মজ্ঞানী জীব নিত্য পরম অব্যয়।
নির্গুণ অনাদি তত্ত্ব নির্লিপ্ত সে রয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব অবস্থায় জীব তখন দর্শন করেন যে, অব্যয় এই আত্মা অনাদি, নির্গুণ ও জড়া প্রকৃতির অতীত। হে কৌন্তেয়! জড় দেহে অবস্থান করলেও আত্মা কোন কিছু করে না এবং কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

জড় দেহের জন্ম হওয়ার ফলে মনে হয় যেন জীবের জন্ম হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব শাশ্বত, সনাতন, তার জন্ম হয় না এবং জড় দেহে স্থিত হলেও সে গুণাতীত ও শাশ্বত। তাই, তার কখনও বিনাশও হয় না। স্বভাবত সে হচ্ছে আনন্দময়। সে নিজে কোন রকম জড় কার্যে নিযুক্ত হয় না; তাই জড় শরীরের সংস্পর্শে আসার ফলে যে সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়, তা তাকে আবদ্ধ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৩

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যথা-যেমন; সর্বগতম্ সর্বব্যাপ্ত; সৌক্ষ্ম্যাৎ-সূক্ষ্মতা হেতু; আকাশম্-আকাশ; ন-না; উপলিপ্যতে-লিপ্ত হয়; সর্বত্র সর্বত্র; অবস্থিতঃ-অবস্থিত; দেহে-শরীরে; তথা-তেমন; আত্মা-আত্মা; ন-না; উপলিপ্যতে লিপ্ত হয়।

গীতার গান

যেমন সর্বগত ব্যোম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুপম,
সর্বত্র সম্ভব বিচরণ।
তথাপি সে লিপ্ত নহে, নিজের স্বতন্ত্র রহে,
সেইরূপ আত্ম বিচরণ ॥
সর্বত্র ব্যাপিয়া দেহে, কূটস্থ পৃথক রহে,
মহাভূতে নহে সে মিলন।
তথা ব্রহ্মভূত জীব, আত্মতত্ত্বে হয়ে শিব,
দেহধর্মে লিপ্ত নাহি হন ॥

অনুবাদ

আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তেমনই ব্রহ্ম দর্শন-সম্পন্ন জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহধর্মে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

জল, কাদা, বিষ্ঠা আদি সব কিছুতেই বায়ু প্রবেশ করে, কিন্তু তা হলেও কোন কিছুর সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয় না। তেমনই, জীবাত্মা যদিও নানা রকম শরীরে অবস্থান করে, তবুও তার সূক্ষ্ম প্রকৃতির প্রভাবে সে সব কিছু থেকে পৃথক থাকে। তাই, জীবাত্মা যে কিভাবে এই শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই শরীরের বিনাশের পর সে যে কিভাবে এই শরীর থেকে চলে যায়, তা জড় চক্ষু দিয়ে দর্শন করা সম্ভব নয়। জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে কেউই তা বিশ্লেষণ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ।। ৩৪ ॥

যথা-যেমন; প্রকাশয়তি-প্রকাশ করে; একঃ-এক; কৃৎস্নম্-সমগ্র; লোকম্ জগৎকে; ইমম্-এই; রবিঃ-সূর্য; ক্ষেত্রম্-এই দেহকে; ক্ষেত্রী-আত্মা; তথা-সেই রকম; কৃৎস্নম্-সমগ্র; প্রকাশয়তি-প্রকাশ করে; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান

সূর্য যথা প্রকাশয়ে অখিল জগৎ।
এক দেশে একা থাকি সম্রাট মহৎ ॥
হে ভারত সেইরূপ ক্ষেত্রী প্রকাশয়।
একা একস্থানে থাকি ক্ষেত্র দেহময় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই রকম ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

চেতনা সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ আছে। এখানে ভগবদগীতায় সূর্য ও সূর্যরশ্মির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সূর্য যেমন এক জায়গায় অবস্থিত, কিন্তু তার রশ্মি সারা জগৎকে আলোকিত করছে, তেমনই অণুসদৃশ জীবাত্মা যদিও শরীরের হৃদয়ে অবস্থিত, তবুও চেতনার দ্বারা সে সমস্ত শরীরকে আলোকিত করছে। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, সূর্যরশ্মি বা আলোক যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনই চেতনা হচ্ছে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। দেহে যখন আত্মা থাকে, তখন সারা শরীর জুড়ে চেতনা থাকে, কিন্তু দেহ থেকে আত্মা যখনই চলে যায়, তখন আর চেতনা থাকে না। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সুতরাং, জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে চেতনার উদ্ভব হয় না। চেতনা হচ্ছে জীবাত্মার লক্ষণ। জীবের চেতনা যদিও পরম চেতনার সঙ্গে গুণগতভাবে এক, তবুও তা পরম নয়। কারণ একটি দেহের চেতনা অন্য দেহের চেতনার অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু জীবের বন্ধুরূপে যে পরমাত্মা প্রতিটি জীবের দেহে বিরাজ করছেন, তিনি সমস্ত শবীর সম্বন্ধে সচেতন। সেটিই হচ্ছে বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্যের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরে বমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ক্ষেত্র-দেহ; ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ-ক্ষেত্রজ্ঞের; এবম্-এভাবে; অন্তরম্-ভেদ; জ্ঞানচক্ষুষা-জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা; ভূত-জীবের; প্রকৃতি-জড়া প্রকৃতি থেকে; মোক্ষম্-মুক্তি; চ-ও; যে-যাঁরা; বিদুঃ-জানেন; যান্তি-প্রাপ্ত হন; তে-তাঁরা; পরম্-পরম পদ।

গীতার গান

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞান চক্ষে।
দেখিবার শক্তি হয় সে যাহার পক্ষে ॥
এক ক্ষেত্রজ্ঞ সে জীব অন্য পরমাত্মা।
উভয়ের ক্ষেত্রে বাস ক্ষেত্র বিশেষাত্মা ॥
তার মোক্ষ জড়নিষ্ঠ প্রবৃত্তি হইতে ।
সুখে বাস পরব্যোমে জড় দেহ অন্তে ॥

অনুবাদ

যাঁরা এভাবেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবগণের মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন, তাঁরা পরম গতি লাভকরেন।

তাৎপর্য

এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মূল কথা হচ্ছে যে, ক্ষেত্র (শরীর), ক্ষেত্রজ্ঞ (শরীরের মালিক) ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মুক্তি লাভের পন্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তবেই পরম গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

যে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে, তাঁকে সর্ব প্রথমে সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করবেন। যদি কেউ সদ্গুরুর

চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হন এবং সেটিই হচ্ছে তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রমোন্নতির উপায়। সদ্গুরু তাঁর শিষ্যকে নানা রকম সদুপদেশ দান করে জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করেন। যেমন, ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন।
এই দেহ যে জড় পদার্থ তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়; চব্বিশটি বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে তার বিশ্লেষণ করা যায়। দেহ হচ্ছে তার স্থূল প্রকাশ। তার সূক্ষ্ম প্রকাশ হচ্ছে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া। এই সমস্ত তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। কিন্তু এদের ঊর্ধ্বে রয়েছে আত্মা ও পরমাত্মা। আত্মা ও পরমাত্মা হচ্ছেন দুজন। জড় জগতের সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে আত্মা ও চব্বিশটি তত্ত্বের সংযোগের ফলে। যিনি আত্মা ও জড় উপাদানের সমন্বয়কে জড় জগতের কারণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং পরমাত্মার অবস্থান দর্শন করতে পারেন, তিনি চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এগুলি গভীরভাবে মনোনিবেশ ও উপলব্ধি করবার বিষয় এবং সকলেরই উচিত সদ্গুরুর কৃপার প্রভাবে এই অধ্যায়কে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায় - গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; পরম্-অপ্রাকৃত; ভূয়ঃ-পুনরায়; প্রবক্ষ্যামি-আমি বলব; জ্ঞানানাম্-সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে; জ্ঞানম্-জ্ঞান; উত্তমম্ শ্রেষ্ঠ; যৎ-যা; জ্ঞাত্বা-জেনে; মুনয়ঃ-মুনিগণ; সর্বে-সমস্ত; পরাম্-পরম; সিদ্ধিম্-সিদ্ধি; ইতঃ-এই জগৎ থেকে; গতাঃ-লাভ করেছিলেন।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
আবার পরম জ্ঞান বলিব তোমারে।
জ্ঞানচর্চা যত আছে উত্তম সবারে ॥
যে জ্ঞানেতে মুনি জ্ঞানী হইয়া সর্বত।

পূর্ব ইতিহাস ছিল সিদ্ধি পারঙ্গত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-পুনরায় আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান সম্বন্ধে বলব, যা জেনে মুনিগণ এই জড় জগৎ থেকে পরম সিদ্ধি লাভকরেছিলেন।

তাৎপর্য

সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পরমতত্ত্ব বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে ভগবান স্বয়ং অর্জুনকে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও জ্ঞান দান করছেন। দার্শনিক অনুমানের মাধ্যমে কেউ যদি এই অধ্যায়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিনীতভাবে জ্ঞান আহরণ করার মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণের সাথে সঙ্গ করার ফলে জীবাত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এখন এই অধ্যায়ে ভগবান বর্ণনা করছেন, প্রকৃতির সেই গুণগুলি কি, তারা কিভাবে ক্রিয়া করে, তারা কিভাবে জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং কিভাবে তারা মুক্তি দান করে। এই অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞানকে পূর্ববর্তী সমস্ত অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞান থেকে শ্রেয় বলে পরমেশ্বর ভগবান ঘোষণা করছেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে বহু মহর্ষি সিদ্ধি লাভ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করেছেন। ভগবান এখন সেই জ্ঞানই আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। অন্যান্য যে সমস্ত জ্ঞানের পন্থা তিনি এ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে এই জ্ঞান অনেক অনেক গুণে শ্রেয় এবং এই জ্ঞান লাভ করে অনেকেই সিদ্ধি লাভ করেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারবে।

শ্লোক ২

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধ্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ৷ ২৷

ইদম্-এই; জ্ঞানম্-জ্ঞান; উপাশ্রিত্য-আশ্রয় গ্রহণ করে; মম-আমার; সাধ্যম্-একই প্রকৃতি; আগতাঃ-লাভ করে; সর্গে অপি-সৃষ্টিকালেও; ন-না; উপজায়ন্তে-জন্মগ্রহণ করে; প্রলয়ে প্রলয় কালে; ন-না; ব্যথন্তি-ব্যথিত হয়; চ-ও।

গীতার গান

এই জ্ঞান লাভ করি নির্গুণ জ্ঞানেতে।
অবস্থিত হয় লোক নির্গুণ আমাতে ॥
তাহার না হয় জন্ম পুনঃ সৃষ্টির সময়।
কিংবা দুঃখ নাই তার যখন প্রলয় ॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান আশ্রয় করলে জীব আমার পরা প্রকৃতি লাভ করে। তখন আর সে সৃষ্টির সময়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হয় না।

তাৎপর্য

পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে গুণগতভাবে

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা যায়। কিন্তু তাই বলে জীবাত্মা তখন তার ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলে না। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, মুক্ত জীবাত্মারা যাঁরা চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গেছেন, তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হয়ে তাঁর শ্রীচরণ-কমল দর্শন করেন। সুতরাং, মুক্তির পরেও ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলেন না।
সাধারণত, এই জড় জগতে আমরা যে জ্ঞান আহরণ করি, তা জড় জগতের তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত। কিন্তু যে জ্ঞান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, তাকে বলা হয় দিব্যজ্ঞান। কেউ যখন সেই দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হন, তিনি তখন পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত হন। চিদাকাশ সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, জড় রূপের দ্বারা সম্পাদিত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পরে চিন্ময় সত্তা সব রকম বৈচিত্র্যহীন নিরাকার হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগৎও জড় জগতের মতো বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। যারা এই সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারাই মনে করে যে, চিন্ময় অস্তিত্ব জড় বৈচিত্র্যের ঠিক বিপরীত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করলে জীব তার চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়। সেখানে তার সমস্ত কার্যকলাপ হয়ে ওঠে চিন্ময়। এই চিন্ময় অবস্থাকে বলা হয় ভক্তজীবন। চিৎ-জগতের পরিবেশ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তা সমস্ত কলুষমুক্ত এবং সেখানে সকলেই গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত। এই প্রকার জ্ঞান আহরণ করতে হলে অবশ্যই দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত হতে হবে। এভাবেই যিনি তাঁর দিব্য গুণাবলীর বিকাশ সাধন করেন, তিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি অথবা বিনাশ কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ৩

মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ৷৷ ৩ ॥

মম-আমার; যোনিঃ-গর্ভাধানের স্থান; মহৎ-সমগ্র জড় প্রকাশ; ব্রহ্ম-ব্রহ্মা; তস্মিন্ তাতে; গর্ভম্-সৃষ্টির বীজ; দধামি-অর্পণ করি; অহম্-আমি; সম্ভবঃ-উৎপত্তি; সর্বভূতানাম্-সমস্ত জীবের; ততঃ-তা থেকে; ভবতি-হয়; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান

জগতের মাতৃযোনি জড়া মহৎ-তত্ত্ব।
সেই ব্রহ্মে গর্ভাধান করি সে মহত্ত্ব ॥
হে ভারত তাই জন্মে সর্বভূত যত।
জগতের ভূত সৃষ্টি হয় সেই মত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! প্রকৃতি সংজ্ঞক ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভাধান করি, যার ফলে সমস্ত জীবের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে-ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ের ফলেই সব কিছু ঘটছে। জড়া প্রকৃতি ও জীবাত্মার সমন্বয় ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই সাধিত হয়। মহৎ-তত্ত্বই হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, এবং যেহেতু জড়

প্রকাশের মূল উপাদানে রয়েছে প্রকৃতির তিনটি গুণ, তাই তাকে কখনও কখনও ব্রহ্মা বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান মহৎ-তত্ত্বকে গর্ভবর্তী করেন এবং তার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। বৈদিক শাস্ত্রে (মুণ্ডক উপনিষদ ১/১/৯) এই মহৎ-তত্ত্বকে ব্রহ্মাহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে-তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে। পরম পুরুষ সেই ব্রহ্মের গর্ভে জীবাত্মাসমূহকে সঞ্চারিত করেন। মাটি, জল, অগ্নি, হচ্ছে মহদ ব্রহ্মা নামক জড়া প্রকৃতি। বায়ু আদি চব্বিশটি উপাদানের সব কয়টি সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে পরা প্রকৃতি বা জীবভূত। পরম পুরুষ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে জড়া প্রকৃতিতে পরা প্রকৃতি মিশ্রিত হয়েছে এবং তাই এই জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে।
কাঁকড়াবিছে চালের গাদায় ডিম পাড়ে, তাই অনেক সময় বলা হয় যে, চাল থেকে কাঁকড়াবিছের জন্ম হয়। কিন্তু চাল থেকে কখনই কাঁকড়াবিছের জন্ম হয় না। প্রকৃতপক্ষে মা বিছা সেই ডিমগুলি পেড়েছিল। তেমনই, জড়া প্রকৃতি জীবের জন্মের কারণ নয়। পরম পুরুষ ভগবান বীজ প্রদান করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন জড়া প্রকৃতি থেকে সমস্ত জীব উদ্ভূত হল। এভাবেই প্রতিটি জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, যাতে তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সেই জীব সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে পারে। এই জড় জগতে সমস্ত জীবের প্রকাশের কারণ হচ্ছেন ভগবান।

শ্লোক ৪

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সর্বযোনিষু-সকল যোনিতে; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; মূর্তয়ঃ-মূর্তিসমূহ; সম্ভবন্তি-উৎপন্ন হয়; যাঃ-যে সমস্ত; তাসাম্-তাদের সকলের; ব্রহ্ম-ব্রহ্মা; মহৎ যোনিঃ-মহৎ-তত্ত্বরূপী যোনি; অহম্-আমি; বীজপ্রদঃ-বীজ প্রদানকারী; পিতা-পিতা।

গীতার গান

অতএব সর্বযোনি যত মূর্তি ধরে।
হে কৌন্তেয় জান তাহা আমার আধারে ॥
ব্রহ্ম মহত্তত্ত্ব হয় সবার জননী।
আমি বীজপ্রদ পিতা জগৎ সরণী ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা। জীব হচ্ছে জড়া প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির সমন্বয়। এই ধরনের জীব কেবল এই গ্রহেই দৃষ্ট হয় না, অন্যান্য গ্রহে, এমন কি সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকেও জীব আছে। জীবাত্মা সর্বত্রই রয়েছে। মাটির নীচেও জীব রয়েছে, এমন কি জলে এবং আগুনেও জীব রয়েছে। এই সমস্ত প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে যে, মাতৃরূপী

জড়া প্রকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ বীজ প্রদান করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জীবাত্মাকে জড় জগতের গর্ভে সঞ্চারিত করা হয় এবং সৃষ্টির সময়ে তারা বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

সত্ত্বম্-সত্ত্ব, রজঃ-রজ; তমঃ-তম; ইতি-এই; গুণাঃ-গুণসমূহ; প্রকৃতি-জড়া প্রকৃতি; সম্ভবাঃ-জাত; নিবধ্নন্তি-আবদ্ধ করে; মহাবাহো-হে মহাবীর; দেহে-এই শরীরে; দেহিনম্-জীবকে; অব্যয়ম্-নিত্য।

গীতার গান

সত্ত্ব, রজো, তম, গুণ প্রকৃতিসম্ভব।
ত্রিগুণেতে বদ্ধ জীব হয়ে যায় সব ।।
এই দেহ সে বন্ধন নিগূঢ় আকার ।
জীব অব্যয় সে বদ্ধ যে প্রকার ।

অনুবাদ

হে মহাবাহো। জড়া প্রকৃতি থেকে জাত সত্ত্ব, রজ ও তম-এই তিনটি গুণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত অব্যয় জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

জীবাত্মা যেহেতু চিন্ময়, তাই জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তবুও জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কবলিত হয়ে কর্ম করছে। জীব যেহেতু তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, তাই তাদের সেই প্রকৃতি অনুসারে তারা সেই কর্ম করতে বাধ্য হয়। নানা রকম সুখ ও দুঃখের সেটিই হচ্ছে কারণ।

শ্লোক ৬

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বন্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

তত্র-সেই গুণসমূহের মধ্যে; সত্ত্বম্-সত্ত্বগুণ; নির্মলত্বাৎ-জড় জগতে সবচেয়ে নির্মল হওয়ার ফলে; প্রকাশকম্-প্রকাশকারী; অনাময়ম্ পাপশূন্য; সুখ-সুখ; সঙ্গেন-সঙ্গের দ্বারা; বন্নাতি-আবদ্ধ করে; জ্ঞান-জ্ঞান; সঙ্গেন-সঙ্গের দ্বারা; চ-ও; অনঘ-হে নিষ্পাপ।

গীতার গান

তার মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল আধার।
পাপশূন্য প্রকাশক তত্ত্ব সে আত্মার ॥
জ্ঞানচর্চা করি সত্ত্বে বন্ধন তাহার।

সেই শুদ্ধ সঙ্গ মানে শ্রেষ্ঠ চমৎকার ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ার ফলে প্রকাশকারী ও পাপশূন্য এবং সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গের দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব নানা রকমের। আবার খুব কর্মচঞ্চল এবং কেউ আবার অসহায়। তার মধ্যে কেউ সুখী, কেউ প্রকৃতিতে জীবদের বন্ধনদশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মানসিক অভিপ্রকাশ। তারা যে কিভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে আবদ্ধ হয়, তা ভগবদ্গীতার এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই হচ্ছে সত্ত্বগুণ। জড় জগতে সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধনের পরিণতি হচ্ছে যে, তিনি অন্য গুণের দ্বারা প্রভাবিত জীবদের থেকে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হন। যে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তিনি জড় জগতের দুঃখকষ্ট দ্বারা ততটা প্রভাবিত হন না এবং তিনি জড়-জাগতিক জ্ঞান আহরণ করতে উৎসুক। এই ধরনের মানুষ হচ্ছেন 'ব্রাহ্মণ', যাঁর সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই স্তরের আনন্দানুভূতির কারণ হচ্ছে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত জীব সাধারণত পাপকর্ম থেকে অনেকটা মুক্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সত্ত্বগুণের অর্থ হচ্ছে উন্নত জ্ঞান এবং অধিকতর সুখানুভূতি।

এখানে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, জীব যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করেন যে, তিনি খুব জ্ঞানী এবং অন্যদের থেকে শ্রেয়। এভাবেই তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সেই সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানের গর্বে মত্ত এবং যেহেতু তাঁরা সাধারণত তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলেন, তাই তাঁরা এক ধরনের জড় সুখ অনুভব করেন। বদ্ধ জীবনের এই উন্নত সুখানুভূতি তাঁদের জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। সেই হেতু, তাঁরা সত্ত্বগুণে কর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই কর্ম করার দিকে তাঁদের আকর্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাঁদের প্রকৃতির গুণজাত কোন একটি জড় দেহ ধারণ করতেই হয়। তাই, মুক্তি লাভ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করবার কোন সম্ভাবনাই তাঁদের নেই। তাঁরা হয়ত দার্শনিক, বিজ্ঞানী বা কবি হয়ে বারবার জন্মাতে পারেন, তবু জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশদায়ক বন্ধনে তাঁদের বারবার আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, সেই ধরনের জীবনযাত্রা সুখদায়ক।

শ্লোক ৭

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

রজঃ-রজোগুণ; রাগাত্মকম্-বাসনা অথবা অনুরাগাত্মক; বিদ্ধি-জানবে; তৃষ্ণা-আকাঙ্ক্ষা; সঙ্গ-আসক্তি-জনিত; সমুদ্ভবম্-উৎপন্ন; তৎ-তা; নিবধ্নাতি-আবদ্ধ করে; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; কর্মসঙ্গেন-সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা; দেহিনম্-জীবকে।

গীতার গান

রজোগুণ তৃষ্ণাময় শুধু ভোগ চায়।
আজীবন কর্ম করি করে হায় হায় ॥

কর্ম করে যত পারে বদ্ধ তাতে হয়।
অসম্ভব কর্ম চেষ্টা সুখে দুঃখে রয় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং তা তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে এবং সেই রজোগুণই জীবকে সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

রজোগুণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। পুরুষের প্রতি স্ত্রী আকৃষ্ট হয় এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয়। তাকে বলা হয় রজোগুণ। মানুষের মধ্যে যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়, তখন তার জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। সে তখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য রজোগুণে অধিষ্ঠিত মানুষ সমাজে অথবা জাতিতে প্রতিষ্ঠা কামনা করে এবং স্ত্রী-পুত্র-গৃহ সমন্বিত একটি সুখী পরিবার কামনা করে। এগুলি হচ্ছে রজোগুণের প্রভাব। মানুষ যখন এই সব আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এই ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার স্ত্রী, পুত্র ও সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তার সম্মান বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সুতরাং, সমস্ত জড় জগৎটিই প্রায় রজোগুণে অধিষ্ঠিত। আধুনিক সভ্যতাকে রজোগুণের পরিপ্রেক্ষিতেই উন্নত বলে গণ্য করা হয়। পুরাকালে সত্ত্বগুণের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতির মান নির্ণয় করা হত। যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরাই যদি মুক্তি লাভ করতে না পারেন, তা হলে যারা রজোগুণের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের কি অবস্থা?

শ্লোক ৮

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবন্নাতি ভারত ॥ ৮৷

তমঃ-তমোগুণ; তু-কিন্তু; অজ্ঞানজম্-অজ্ঞানজাত; বিদ্ধি-জানবে; মোহনম্-মোহনকারী; সর্বদেহিনাম্-সমস্ত জীবের; প্রমাদ-প্রমাদ; আলস্য-আলস্য; নিদ্রাভিঃ-নিদ্রার দ্বারা; তৎ-তা; নিবন্নাতি-আবদ্ধ করে; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান

তমো সে অজ্ঞানরূপ নিগূঢ় বন্ধন ।
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা তাহার মোহন ॥

অনুবাদ

হে ভারত। অজ্ঞানজাত তমোগুণকে সমস্ত জীবের মোহনকারী বলে জানবে। সেই তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংস্কৃত তু শব্দটির প্রয়োগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে যে, তমোগুণ দেহধারী আত্মার অতি অদ্ভুত একটি গুণ। এই তমোগুণ হচ্ছে সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্ত্বগুণে জ্ঞান অনুশীলনের ফলে জানতে পারা যায় কোন্টি কি, কিন্তু তমোগুণ হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন সকলেই উন্মাদ এবং যে উন্মাদ সে

বুঝতে পারে না কোল্টিন্ট কি। উন্নতি সাধন করার পরিবর্তে সে অধঃপতিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে তমোগুণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, বস্তুযথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং বিপর্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ-তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারা যায় না। যেমন সকলেই জানে যে, তার পিতামহ মারা গেছেন এবং তাই সেও একদিন মারা যাবে, কারণ মানুষ মরণশীল। তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিরাও একদিন মারা যাবে। সুতরাং সকলেরই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তবুও মানুষ তার সনাতন আত্মাকে উপেক্ষা করে উন্মাদের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে চলেছে। এটিই হচ্ছে উন্মত্ততা। তাদের এই উন্মত্ততার ফলে তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রতি অত্যন্ত নিস্পৃহ। এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত অলস। পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য যখন তাদের সাধুসঙ্গ করতে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তাতে খুব একটা উৎসাহী হয় না। তারা এমন কি রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত মানুষদের মতোও ততটা সক্রিয় নয়। এভাবেই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষদের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, তারা যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি ঘুমায়। ছয় ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট, কিন্তু তমোগুণে আচ্ছন্ন যে মানুষ, সে কম করে দশ থেকে বারো ঘণ্টা ঘুমায়।
এই ধরনের মানুষ সর্বদাই বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং তারা মাদকদ্রব্য ও নিদ্রার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এগুলি হচ্ছে তমোগুণের দ্বারা আবদ্ধ মানুষের লক্ষণ।

শ্লোক ৯

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ৷ ৯ ॥

সত্ত্বম্-সত্ত্বগুণ; সুখে-সুখে; সঞ্জয়তি-আবদ্ধ করে; রজঃ-রজোগুণ; কর্মণি-সকাম কর্মে; ভারত-হে ভারত; জ্ঞানম্-জ্ঞান; আবৃত্য-আবৃত করে; তু-কিন্তু; তমঃ-তমোগুণ; প্রমাদে-প্রমাদে; সঞ্জয়তি-আবদ্ধ করে; উত-বলা হয়।

গীতার গান

সত্ত্বগুণ সুখে বাঁধে রজোগুণ কাজে।
তমোগুণ প্রমাদেতে বন্ধনে বিরাজে ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ জীবকে সকাম কর্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

যে মানুষ সাত্ত্বিক, তিনি দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক আদিরূপে কর্ম বা জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় নিযুক্ত থেকে, তাঁর বুদ্ধিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করেন। রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত সকাম কর্মে লিপ্ত মানুষ যতটা সম্ভব সম্পদ আহরণ করেন এবং সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি কখনও কখনও হাসপাতাল খোলবার চেষ্টা করেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান আদিতে দান করেন। এগুলি হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। আর তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তমোগুণে যাই করা হোক না কেন, তাতে মানুষের নিজের মঙ্গল হয় না এবং অন্যদেরও মঙ্গল হয় না।

শ্লোক ১০

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

রজঃ-রজোগুণ; তমঃ-তমোগুণকে; চ-ও; অভিভূয়-পরাভূত করে; সত্ত্বম্-সত্ত্বগুণ; ভবতি-প্রবল হয়; ভারত-হে ভারত; রজঃ-রজোগুণ; সত্ত্বম্-সত্ত্বগুণ; তমঃ-তমোগুণকে; চ-ও; এব-এভাবেই; তমঃ-তমোগুণ; সত্ত্বম্-সত্ত্বগুণ; রজঃ-রজোগুণকে; তথা-সেভাবেই।

গীতার গান

রজোগুণ পরাজয়ে সত্ত্বের প্রাধান্য।
সত্ত্বতম পরাজয়ে রজ হয় গণ্য ॥
রজো সত্ত্ব পরাজয়ে তমের প্রাধান্য।
সেই সে পর্যায় হয় গুণের সামান্য ॥

অনুবাদ

হে ভারত। রজ ও তমোগুণকে পরাভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে রজোগুণ প্রবল হয় এবং সেভাবেই সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়।

তাৎপর্য

যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ পরাভূত হয়। সত্ত্বগুণের যখন প্রাধান্য হয়, তখন তম ও রজোগুণ পরাভূত হয়। আর যখন তমোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন রজ ও সত্ত্বগুণ পরাভূত হয়। এই প্রতিযোগিতা সব সময়ে চলছে। তাই, যিনি কৃষ্ণভাবনার পথে উন্নতি সাধন করতে সংকল্পবদ্ধ, তাঁকে এই তিনটি গুণই অতিক্রম করতে হবে। মানুষের আচরণে, তার কার্যকলাপে, আহার-বিহার আদিতে কোন না কোন গুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে তিনি অনুশীলনের মাধ্যমে সত্ত্বগুণকে বিকশিত করে রজ ও তমোগুণকে পরাভূত করতে পারেন। তেমনই, আবার রজোগুণ বিকশিত করে সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করা যায় অথবা তমোগুণকে বিকশিত করে সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করা যায়। যদিও প্রকৃতিতে এই তিনটি গুণ রয়েছে, তবুও কেউ যদি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, তা হলে তিনি সত্ত্বগুণের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হতে পারেন এবং সেই সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যাকে বলা হয় বাসুদেব স্থিতি, অর্থাৎ যে অবস্থায় ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ বিশেষ আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় কোন্ মানুষ কোন্ গুণে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ১১

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ৷ ১১ ॥

সর্বদ্বারেষু-সব কয়টি দ্বারে; দেহে অস্মিন্-এই দেহে; প্রকাশঃ-প্রকাশ; উপজায়তে-উৎপন্ন হয়; জ্ঞানম্-জ্ঞান; যদা-যখন; তদা-তখন; বিদ্যাৎ-জানবে; বিবৃদ্ধম্ বর্ধিত হয়েছে; সত্ত্বম্-

সত্ত্বগুণ; ইতি-এভাবে; উত-বলা হয়।

গীতার গান

জ্ঞানের প্রভাবে যদা শরীরে প্রকাশ।
সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে সত্ত্বগুণের বিকাশ ।।

অনুবাদ

যখন এই দেহের সব কয়টি দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে বলে জানবে।

তাৎপর্য

দেহে নয়টি দ্বার রয়েছে-দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। যখন প্রতিটি দ্বারে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলে যথাযথভাবে দর্শন করা যায়, যথাযথভাবে শ্রবণ করা যায় এবং যথাযথভাবে স্বাদ গ্রহণ করা যায়। মানুষ তখন অন্তরে ও বাইরে নির্মল হন। প্রতিটি দ্বারেই তখন সুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং সেটিই হচ্ছে সাত্ত্বিক অবস্থা।

শ্লোক ১২

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২॥

লোভঃ-লোভ; প্রবৃত্তিঃ-প্রবৃত্তি; আরম্ভঃ-উদ্যম; কর্মণাম্ কর্মসমূহে। অশমঃ-দুর্দমনীয়; স্পৃহা-বাসনা; রজসি-রজোগুণ; এতানি-এই সমস্ত: জায়ন্তে-উৎপন্ন হয়; বিবৃদ্ধে-বর্ধিত হলে; ভরতর্ষভ-হে ভরত-বংশশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

লোকপূজা প্রতিষ্ঠাদি কর্মের আকাঙ্ক্ষা।
রজোগুণে বৃদ্ধি হয় নাহি অন্যাপেক্ষা ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বর্ধিত হলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম ও দুর্দমনীয় স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

তাৎপর্য

রজোগুণ-সম্পন্ন মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি কখনই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর অবস্থার উন্নতি সাধন করবার আকাঙ্ক্ষা করেন। যখন তিনি কোন গৃহ নির্মাণ করেন, তখন তিনি একটি প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করার চেষ্টা করেন, যেন তিনি চিরকাল সেই বাড়িতেই থাকতে পারবেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি জাগে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন শেষ নেই। তিনি সর্বদাই তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকতে, তাঁর বাড়িতে বাস করতে এবং চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চান। তাঁর এই কামনা-বাসনার কখনই নিবৃত্তি হয় না। এই সমস্ত লক্ষণগুলি রজোগুণের বৈশিষ্ট্য বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১৩

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অপ্রকাশঃ-অজ্ঞান-অন্ধকার; অপ্রবৃত্তিঃ-নিষ্ক্রিয়তা; চ-এবং; প্রমাদঃ-উন্মত্ততা; মোহঃ-মোহ; এব-অবশ্যই; চ-ও; তমসি-তমোগুণ; এতানি-এই সমস্ত; জায়ন্তে-উৎপন্ন হয়; বিবৃদ্ধে বর্ধিত হলে; কুরুনন্দন-হে কুরুনন্দন।

গীতার গান

অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি মোহ তমোর লক্ষণ।
বিবিধ গুণের কার্য হে কুরুনন্দন ॥

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বর্ধিত হলে অজ্ঞান-অন্ধকার, নিষ্ক্রিয়তা, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে আলোকোন্মেষ না হলে জ্ঞানের অনুপস্থিতি ঘটে। তামসিক মানুষ বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কখনই কর্ম করে না; সে নিজের খেয়াল-খুশি মতো উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে আচরণ করে। ক্ষমতা আছে, তবুও সে কোন রকম প্রচেষ্টা করে না। যদিও তার চেতনা আছে, তবুও তার জীবন নিষ্ক্রিয়। সম্পন্ন মানুষের লক্ষণ। যদিও তার কাজ করার তাকে বলা হয় মোহ। এগুলি হচ্ছে তমোগুণ-

শ্লোক ১৪

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

যদা-যখন; সত্ত্বে-সত্ত্বগুণ; প্রবৃদ্ধে বর্ধিত হলে; তু-কিন্তু; প্রলয়ম্ প্রলয়; যাতি-প্রাপ্ত হয়; দেহভূৎ-দেহধারী জীব; তদা-তখন; উত্তমবিদাম্-মহর্ষিদের; লোকান্-লোকসমূহ; অমলান্-নির্মল; প্রতিপদ্যতে লাভ করেন।

গীতার গান

প্রবৃদ্ধ যে সত্ত্বগুণে দেহের প্রলয়।
নিষ্পাপ উত্তম লোক তাঁর প্রাপ্তি হয় ॥

অনুবাদ

যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালে দেহধারী জীব দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি মহর্ষিদের নির্মল উচ্চতর লোকসমূহ লাভ করেন।

তাৎপর্য

সাত্ত্বিক লোকেরা ব্রহ্মলোক বা জনলোক আদি উচ্চতর গ্রহলোকে গমন করেন এবং সেখানে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এখানে অমলান কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে 'রজ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত'। জড় জগৎ পাপময়, কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে জড় জগতের সবচেয়ে নিষ্পাপ অবস্থা। নানা রকম জীবের জন্য নানা রকম গ্রহলোক আছে।

সত্ত্বগুণে যাঁদের মৃত্যু হয়, তাঁরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, যেখানে মহাঋষি ও মহান ভক্তেরা বাস করেন।

শ্লোক ১৫

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

রজসি-রজোগুণে; প্রলয়ম্-মৃত্যু; গত্বা-প্রাপ্ত হলে; কর্মসঙ্গিষু-কর্মাসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে; জায়তে জন্ম হয়; তথা-তেমনই; প্রলীনঃ-মৃত্যু হলে; তমসি-তমোগুণে; মূঢ়যোনিষু-পশুযোনিতে; জায়তে-জন্ম হয়।

গীতার গান

প্রবৃদ্ধ সে রজোগুণে দেহের নির্বাণ।
কর্মীর সঙ্গেতে হয় তার অনুষ্ঠান ॥
প্রবৃদ্ধ যে তমোগুণে শরীর ছাড়য়।
মূঢ় পশুযোনি মধ্যে তার জন্ম হয় ॥

অনুবাদ

রজোগুণে মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়, তেমনই তমোগুণে মৃত্যু হলে পশুযোনিতে জন্ম হয়।

তাৎপর্য

কিছু লোক মনে করে যে, মনুষ্য-জীবন লাভ করলে আর অধঃপতন হয় না। এই ধারণা ভ্রান্ত। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীবন যাপন করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তার আত্মা অধঃপতিত হয়ে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থা থেকে তাঁকে আবার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এক শরীর থেকে আর এক শরীর প্রাপ্ত হতে হতে অবশেষে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হতে হবে। তাই, মনুষ্য-শরীরের গুরুত্ব যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁদের উচিত সাত্ত্বিক আচরণ করা এবং সাধুসঙ্গে এই গুণগুলি অতিক্রম করে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। তা না হলে মানুষ যে আবার মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই।

শ্লোক ১৬

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

কর্মণঃ-কর্মের; সুকৃতস্য-সুকৃতি-সম্পন্ন; আহুঃ-বলা হয়; সাত্ত্বিকম্-সাত্ত্বিক; নির্মলম্-নির্মল; ফলম্-ফলকে; রজসঃ-রাজসিক কর্মের; তু-কিন্তু; ফলম্-ফলকে; দুঃখম্-দুঃখ; অজ্ঞানম্-অজ্ঞান; তমসঃ-তামসিক কর্মের; ফলম্-ফলকে।

গীতার গান

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম ফল সে নির্মল।
রাজসিক কর্মে হয় দুঃখই প্রবল ॥
তামসিক কর্ম যত হয় অচেতন ।
অজ্ঞানতা ফল সেই পশুতে গণন ॥

অনুবাদ

সুকৃতি-সম্পন্ন সাত্ত্বিক কর্মের ফলকে নির্মল, রাজসিক কর্মের ফলকে দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফলকে অজ্ঞান বা অচেতন বলা হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে পুণ্যকর্ম করার ফলে মন পবিত্র হয়। তাই, সব রকমের মোহ থেকে মুক্ত মুনি-ঋষিরা সর্বদাই আনন্দময়। কিন্তু রাজসিক কর্ম কেবল ক্লেশদায়ক। জড় সুখের জন্য যে প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, তা পরিণামে ব্যর্থ হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করতে চায়, তা হলে সেটি তৈরি করবার জন্য বহু মানুষকে বহু রকম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। বাড়িটি যে তৈরি করছে তাকে কত কষ্ট করে প্রচুর অর্থ যোগাড় করতে হয়। যাদের দিয়ে সে বাড়ি তৈরির কাজ করছে, তাদের কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। এই জড় জগতে সমস্ত কর্মের পিছনেই রয়েছে ক্লেশ। এভাবেই ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, রজোগুণের প্রভাবে যে কার্যই করা হোক না কেন, তাতে সুনিশ্চিতভাবে বিপুল দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে। তাতে হয়ত তথাকথিত একটুখানি মানসিক সুখ থাকতে পারে-"এই বাড়িটি আমার অথবা এই ধনসম্পদ আমার"-কিন্তু এটি যথার্থ সুখ নয়।

তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে কর্ম করে, সে অজ্ঞান এবং তার সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ সে বর্তমানে দুঃখভোগ করে এবং ভবিষ্যতে পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়। পশুজীবন সর্বদাই দুঃখময়, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকার ফলে পশুরা সেটি অবশ্য বুঝতে পারে না। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকার ফলেই মানুষ নিরীহ পশুদের হত্যা করে। পশুঘাতক জানে না যে, ভবিষ্যতে সেই পশুগুলি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়ে তাদের হত্যা করবে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। মানব-সমাজে কেউ যদি কোন মানুষকে হত্যা করে, তা হলে তার ফাঁসি হয়। সেটিই হচ্ছে রাষ্ট্রের নিয়ম। অজ্ঞতার ফলে মানুষ বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পূর্ণ রাজ্য আছে। প্রতিটি প্রাণীই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তান এবং একটি পিঁপড়ে হত্যা করা হলেও তিনি সেটি বরদাস্ত করেন না। সেই জন্য আমাদের মাশুল দিতে হবে। তাই, রসনা তৃপ্তির জন্য পশুহত্যা করা নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা। মানুষের পক্ষে পশুহত্যা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ মানুষের জন্য ভগবান কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি পশুমাংস আহারে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে কর্ম করছে এবং তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। সব রকম পশুহত্যার মধ্যে গোহত্যা হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম কার্য, কারণ দুধ দান করে গরু আমাদের সব রকমের আনন্দ দান করে। গোহত্যা হচ্ছে সব রকমের পাপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ। বৈদিক শাস্ত্রে (ঋক্ বেদ ৯/৪/৬৪) গোভিঃ প্রীণিতমৎসরম্ কথাটি ইঙ্গিত করে যে, গরুর দুধের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রীতি লাভ করবার পরেও যে মানুষ গোহত্যা করতে চায়, সে অত্যন্ত গভীরভাবে তমসাচ্ছন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে-

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

"হে ভগবান! তুমি গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তুমি সমগ্র মানব-সমাজ ও সমগ্র জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী।" (বিষ্ণু পুরাণ ১/১৯/৬৫) এই প্রার্থনায় গাভী ও ব্রাহ্মক্ষণদের রক্ষা

করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতীক এবং গাভী হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান খাদ্যের প্রতীক। গাভী ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার প্রাণীদের সব রকম প্রতিরক্ষা বিধান করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। আধুনিক মানব-সমাজে পারমার্থিক জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং গোহত্যার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে যে, মানব-সমাজ বিপথগামী হচ্ছে এবং তার নিজের উৎসন্নের পথটি ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হচ্ছে। যে সভ্যতা মানুষকে পরবর্তী জীবনে পশুতে পরিণত হওয়ার পথে পরিচালিত করে, সেটি অবশ্যই মানব-সভ্যতা নয়। বর্তমান মানব-সভ্যতা অবশ্যই রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্রুত গতিতে বিপথগামী হচ্ছে। এটি অত্যন্ত ভয়ংকর যুগ এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, মানব-সমাজকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বং সের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের অতি সাবলীল পন্থা প্রচলন করতে যত্নশীল হওয়া।

শ্লোক ১৭

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ৷ ১৭ ॥

সত্ত্বাৎ-সত্ত্বগুণ থেকে; সংজায়তে-উৎপন্ন হয়; জ্ঞানম্-জ্ঞান; রজসঃ-রজোগুণ থেকে; লোভঃ-লোভ; এব-অবশ্যই; চ-ও; প্রমাদ প্রমাদ; মোহৌ-মোহ; তমসঃ-তমোগুণ থেকে; ভবতঃ-উৎপন্ন হয়; অজ্ঞানম্-অজ্ঞান; এব-অবশ্যই; চ-ও।

গীতার গান

সত্ত্বগুণে জ্ঞানলাভ রজোগুণে লোভ।
তমোগুণে মোহলাভ প্রমাদ বিক্ষোভ ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

বর্তমান সভ্যতা যেহেতু জীবের পক্ষে খুব একটা উপযোগী নয়, তাই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজে সত্ত্বগুণের বিকাশ হবে। যখন সত্ত্বগুণ বিকশিত হয়, তখন মানুষ বস্তুকে যথাযথভাবে দর্শন করতে সক্ষম হবে। তামসিক পর্যায়ে মানুষ হয়ে যায় পশুর মতো এবং বস্তুকে স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারে না। যেমন, তামসিক মানুষ বুঝতে পারে না যে, পশুহত্যা করার মাধ্যমে তারাও পরবর্তী জীবনে সেই পশুর দ্বারাই নিহত হবার দুর্ভাগ্য অর্জন করছে। কারণ মানুষেরা প্রকৃত জ্ঞান অনুশীলনের শিক্ষা পায় না, তাই তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বন্ধ করার জন্য মানুষদের সত্ত্বগুণের বিকাশ করার শিক্ষা অতি আবশ্যক। তারা যখন যথাযথভাবে সত্ত্বগুণের শিক্ষা লাভ করবে, তখন তারা পূর্ণ জ্ঞান লাভকরে শান্ত হবে। মানুষ তখন সুখী ও সমৃদ্ধশালী হবে। এমন কি অধিকাংশ মানুষ যদি সুখী ও সমৃদ্ধশালী না হয়, যদি সমাজের কিছুসংখ্যক লোকও কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়, তা হলেও সারা জগৎ জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। তা না করে সমগ্র জগৎ যদি রজ ও তমোগুণের দাসত্ব বরণ করে নেয়, তা হলে শান্তি ও

সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। রজোগুণে মানুষ লোভী হয় এবং তাদের ইন্দ্রিয়সুখ বাসনার কোন সীমা থাকে না। সেটি যে কেউ উপলব্ধি করতে পারে যে, এমন কি প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের নানা রকম বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষের আজ না আছে সুখ, না আছে মনের শান্তি। সেটি থাকা সম্ভব নয়, কারণ তারা রজোগুণে অধিষ্ঠিত। কেউ যদি যথার্থ সুখ পেতে চায়, সেই ব্যাপারে টাকা তাকে সাহায্য করতে পারবে না; কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে তাকে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে হবে। কেউ যখন রাজসিক কর্মে নিয়োজিত থাকে, তখন সে যে কেবল মানসিক অশান্তিই ভোগ করে তাই নয়, তার পেশা এবং বৃত্তিও অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তার পদমর্যাদা বজায় রাখবার জন্য তাকে কত রকমের পরিকল্পনা ও উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এই সমস্তই ক্লেশদায়ক। তমোগুণে মানুষ উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিদারুণ দুঃখভোগ করে তারা মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এভাবেই তারা অজ্ঞতার আরও গভীরতম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শ্লোক ১৮

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

ঊর্ধ্বম্ ঊর্ধ্বে; গচ্ছন্তি-গমন করে; সত্ত্বস্থাঃ-সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; মধ্যে-মধ্যে; তিষ্ঠন্তি-অবস্থান করে; রাজসাঃ-রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; জঘন্য-ঘৃণ্য; গুণ-গুণ; বৃত্তিস্থাঃ-বৃত্তিসম্পন্ন; অধঃ-নিম্নে; গচ্ছন্তি-গমন করে; তামসাঃ-তামসিক ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

সত্যলোকাবধি লোক যায় সত্ত্বগুণে।
রজোগুণ দ্বারা নরলোকে অবস্থান ॥
তমোগুণে অধঃপাত নরকে গমন।
বিবিধ গুণের সেই ফল নিরূপণ ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্ধ্বে উচ্চতর লোকে গমন করে, রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে নরলোকে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রকৃতির তিনটি গুণে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলগুলি আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জগতের ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক আছে, যেখানে সকলেই অত্যন্ত উন্নত। সত্ত্বগুণের মাত্রা অনুসারে জীব এই উচ্চতর লোকসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লোকে উন্নীত হয়। সর্বোচ্চলোক হচ্ছে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক, যেখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা বাস করেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ব্রহ্মলোকের অতি আশ্চর্যজনক জীবনযাত্রার কোন হিসেব-নিকেশ আমরা করতে পারি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবস্থা সত্ত্বগুণ আমাদের সেই স্তরে উন্নীত করতে পারে।

রজোগুণ হচ্ছে মিশ্রিত। এটি সত্ত্ব ও তমোগুণের অন্তর্বর্তী। মানুষ কখনও সর্বতোভাবে

নির্মল হতে পারে না। কিন্তু সে যদি সম্পূর্ণভাবে রজোগুণে থাকে, তা হলে সে কেবল একজন রাজা অথবা একজন ধনী ব্যক্তিরূপে এই পৃথিবীতে অবস্থান করবে। কিন্তু মিশ্রিত হওয়ার ফলে মানুষ নিম্নগামী হতে পারে। এই জগতে রাজসিক বা তামসিক মানুষেরা যন্ত্রের সাহায্যে জোর করে উচ্চতর লোকে যেতে পারে না। রজোগুণের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে উন্মাদ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট তমোগুণকে এখানে জঘন্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফল অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুণ। মনুষ্য-জন্মের নীচে পক্ষী, পশু, সরীসৃপ, বৃক্ষ আদি আশি লক্ষ প্রজাতি রয়েছে এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়। এখানে তামসাঃ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে উচ্চতর গুণে উন্নীত না হয়ে যারা সর্বদাই তমোগুণে অধিষ্ঠিত থাকে। তাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।-

রাজসিক ও তামসিক মানুষেরা যাতে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে পারে, তার একটি সুযোগও আছে। সেই প্রক্রিয়া হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন। কিন্তু যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, সে অবশ্যই নিকৃষ্ট গুণে আচ্ছন্ন হয়েই থাকবে।

শ্লোক ১৯

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

ন-না; অন্যম্-অন্য; গুণেভ্যঃ-গুণসমূহ থেকে, কর্তারম্-কর্তাকে; যদা-যখন; দ্রষ্টা-দ্রষ্টা; অনুপশ্যতি-দেখেন; গুণেভ্যঃ-জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে; চ-এবং; পরম্-গুণাতীত; বেত্তি-জানেন; মদ্ভাবম্-আমার পরা প্রকৃতি; সঃ-তিনি; অধিগচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

গুণ ভিন্ন অন্য কর্তা নাহি ত্রিভুবনে।
সূক্ষ্ম দর্শন যার গুণ নিরূপণে ॥
গুণাতীত মোর ভক্তি আমার সে ভাব।
স্বরূপেতে শুদ্ধ জীব প্রাপ্ত সে স্বভাব ॥

অনুবাদ

জীব যখন দর্শন করেন যে, প্রকৃতির গুণসমূহ ব্যতীত কর্মে অন্য কোন কর্তা নেই এবং জানতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত গুণের অতীত, তখন তিনি আমার পরা প্রকৃতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি সম্বন্ধে যথার্থভাবে অবগত হওয়ার ফলে গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃত গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং এই দিব্যজ্ঞান তিনি অর্জুনকে দান করেছেন। তেমনই, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তাঁদের কাছ থেকেই প্রকৃতির গুণের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করা উচিত। তা না হলে জীবন বিপথগামী হবে। সদগুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে জীব তার চিন্ময় স্বরূপ, জড় দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বদ্ধ অবস্থা ও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। এই সমস্ত গুণের দ্বারা

আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সে অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যখন তার যথার্থ স্বরূপ দর্শন করতে পারে, তখন সে পারমার্থিক জীবন লাভ করার সুযোগ পেয়ে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারে।
প্রকৃতপক্ষে, জীব তার বিভিন্ন কর্মের কর্তা নয়। জড়া প্রকৃতির কোন বিশেষ গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন বিশেষ শরীরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সদ্গুরুর কৃপা লাভ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে কোন মতেই অবগত হতে পারে না। সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করার ফলে সে তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং তার ফলে সে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। কৃষ্ণভক্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হন না। সপ্তম অধ্যায়ে ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই যিনি যথাযথভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারেন, তিনি ধীরে ধীরে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২০

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

গুণান্-গুণকে, এতান্-এই; অতীত্য-অতিক্রম করে; ত্রীন্-তিন; দেহী-জীব: দেহ-দেহে; সমুদ্ভবান্-উৎপন্ন; জন্ম-জন্ম; মৃত্যু-মৃত্যু; জরা-জরা; দুঃখৈঃ -দুঃখ থেকে, বিমুক্তঃ-মুক্ত হয়ে; অমৃতম্-অমৃত; অশ্নুতে-ভোগ করেন।

গীতার গান

গুণাতীত হতে দেহী গুণদেহ ছাড়ে।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ বাঁধে না তাঁহারে ॥

অনুবাদ

দেহধারী জীব এই তিন গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে অমৃত ভোগ করেন।

তাৎপর্য

এই জড় শরীরে থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে কিভাবে গুণাতীত অবস্থায় থাকতে পারা যায় তা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত দেহী শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দেহধারী'। এই জড় দেহ থাকলেও দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে মানুষ প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এমন কি এই দেহের মধ্যে তিনি দিব্য জীবনের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, কারণ এই দেহ ত্যাগ করার পর তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে ফিরে যাবেন। কিন্তু এমন কি এই দেহের মধ্যে তিনি দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভক্তিযোগে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়াই হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই কথা ব্যাখ্যা করা হবে। কোন মানুষ যখন জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

শ্লোক ২১

অর্জুন উবাচ
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ৷ ২১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; কৈঃ-কি কি; লিঙ্গৈঃ-লক্ষণ দ্বারা; ত্রীন্-তিন; গুণান্-গুণ; এতান্-এই; অতীতঃ-অতীত; ভবতি-হন; প্রভো-হে প্রভু; কিম্-কি রকম; আচারঃ-আচরণ; কথম্-কিভাবে; চ-ও; এতান্-এই; ত্রীন্-তিন; গুণান্-গুণ; অতিবর্ততে-অতিক্রম করেন।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
কি লক্ষণ কহ প্রভো গুণাতীত হলে।
আচরণ কিবা হয় ত্রিগুণ জিতিলে ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে প্রভু! যিনি এই তিন গুণের অতীত, তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হন? তাঁর আচরণ কি রকম? এবং তিনি কিভাবে এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নগুলি খুবই যুক্তিসঙ্গত। তিনি জানতে চাইছেন, যে মানুষ ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণগুলি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর লক্ষণ কি? প্রথমে তিনি এই ধরনের দিব্য পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন। কিভাবে জানতে পারা যাবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন? দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি কি রকম জীবন যাপন করেন এবং তাঁর কাজকর্ম কি রকম। সেগুলি কি নিয়ন্ত্রিত না অনিয়ন্ত্রিত? তারপর অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, কি উপায়ে দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সরাসরি উপায় সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না অবগত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই লক্ষণগুলি প্রদর্শন করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, অর্জুনের এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভগবান নিজেই সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছেন।

শ্লোক ২২-২৫

শ্রীভগবানুবাচ
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ৷ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরগুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োগুল্যগুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; প্রকাশম্-প্রকাশ; চ-ও; প্রবৃত্তিম্-প্রবৃত্তি; চ-ও; মোহম্-মোহ; এব চ-ও; পাণ্ডব-হে পাণ্ডুপুত্র; ন দ্বেষ্টি-দ্বেষ করেন না; সংপ্রবৃত্তানি-আবির্ভূত হলে; ন-না; নিবৃত্তানি-নিবৃত্ত হলে; কাঙ্ক্ষতি-আকাঙ্ক্ষা করেন; উদাসীনবৎ-উদাসীনের মতো; আসীনঃ-অবস্থিত; গুণৈঃ-গুণসমূহের দ্বারা; যঃ-যিনি; ন-না; বিচাল্যতে বিচলিত হন; গুণাঃ-গুণসমূহ; বর্তন্তে-স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হন; ইতি এবম্-এভাবেই জেনে; যঃ-যিনি; অবতিষ্ঠতি-অবস্থান করেন; ন-না; ইঙ্গতে-চঞ্চল হন; সম-সম-ভাবাপন্ন; দুঃখ-দুঃখ; সুখঃ-সুখ; স্বস্থঃ-আত্মস্বরূপে অবস্থিত; সম-সম-ভাবাপন্ন; লোষ্ট্র-মাটির ঢেলা; অশ্ম-পাথর; কাঞ্চনঃ-স্বর্ণ; তুল্য-সম-ভাবাপন্ন; প্রিয়-প্রিয়; অপ্রিয়ঃ-অপ্রিয়; ধীরঃ-ধৈর্যশীল; তুল্য-তুল্যজ্ঞান; নিন্দা-নিন্দা; আত্মসংস্তুতিঃ-নিজের প্রশংসা; মান-সম্মান; অপমানয়োঃ-অসম্মান; তুল্যঃ-সম-ভাবাপন্ন; তুল্যঃ-সমজ্ঞান-সম্পন্ন; মিত্র-বন্ধু; অরি-শত্রু; পক্ষয়োঃ-দলে; সর্ব-সমস্ত; আরম্ভ-প্রচেষ্টা; পরিত্যাগী-পরিত্যাগী; গুণাতীতঃ-জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; সঃ-তিনি; উচ্যতে- কথিত হন।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:

প্রকাশ প্রবৃত্তি আর মোহন যে তিন।
গুণের প্রভাব সেই হয় ভিন্ন ভিন্ ॥
তাহাতে যে দ্বেষাকাঙ্ক্ষা ছাড়িল জীবনে।
গুণাতীত হয় সেই বুঝ ত্রিভুবনে ।
গুণকার্যে উদাসীন মতো যে আসীন ।
বিচলিত নহে তাহে প্রবৃদ্ধ প্রবীণ ॥
অনাসক্ত গুণকার্যে যেবা হয় ধীর।
সম দুঃখ সুখ স্বস্থঃ লোষ্ট্র স্বর্ণ স্থির ॥
তুল্য প্রিয়াপ্রিয় তার তুল্য নিন্দাস্তুতি।
তুল্য মান অপমান শত্রু মিত্র অতি ॥
ভোগ ত্যাগাদিতে নহে সে আসক্ত।
গুণাতীত হয় সেই নির্গুণেতে যুক্ত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন- হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হলে দ্বেষ করেন না এবং সেগুলি নিবৃত্ত হলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনের মতো অবস্থিত থেকে গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, কিন্তু গুণসমূহ স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এভাবেই জেনে অবস্থান করেন এবং তার দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না; যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং সুখ ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন; যিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও স্বর্ণে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন; যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সম-ভাবাপন্ন; যিনি ধৈর্যশীল এবং নিন্দা, স্তুতি, মান ও অপমানে সম-ভাবাপন্ন; যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাব-সম্পন্ন এবং যিনি সমস্ত কর্মোদ্যম পরিত্যাগী-তিনিই গুণাতীত বলে কথিত হন।

তাৎপর্য

অর্জুন তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং ভগবান একে একে সেগুলির উত্তর দিচ্ছেন। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি কারও প্রতি দ্বেষযুক্ত নন এবং তিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। জীব যখন জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে এই জড় জগতে অবস্থান করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কোনও একটির নিয়ন্ত্রণাধীন। সে যখন দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না

সে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছে, ততক্ষণ তাকে গুণের প্রভাবের প্রতি উদাসীন থাকতে হবে। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় তাকে নিযুক্ত হতে হবে, যাতে জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয়ের কথা সে আপনা থেকেই ভুলে যেতে পারে। কেউ যখন তার জড় দেহের চেতনায় যুক্ত থাকে, তখন সে কেবল তার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কর্ম করে। কিন্তু সেই চেতনা যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়তর্পণ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এই জড় দেহের কোন প্রয়োজন নেই এবং এই জড় দেহের আদেশ পালন করারও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দেহে অবস্থিত প্রকৃতির গুণগুলি কর্ম করে যাবে, কিন্তু চিন্ময় সত্তারূপে আত্মা এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে পৃথক। তিনি পৃথক হন কিভাবে? তিনি জড় দেহটিকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা এই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এভাবেই গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই মুক্ত হন। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে কোন রকম চেষ্টা করতে হয় না।
পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ দেহ সম্বন্ধীয় তথাকথিত সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই ধরনের মিথ্যা সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কৃষ্ণভাবনায় বিভোর হয়ে তিনি তাঁর কর্ম করে যান এবং মানুষ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করল না অসম্মান করল, তার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবার পক্ষে যা অনুকূল, তা তিনি গ্রহণ করেন। তা ছাড়া পাথর হোক বা সোনাই হোক, তার কোন জড় বস্তুর দরকার হয় না। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁদের সকলকেই তিনি প্রিয় বন্ধু বলে মনে করেন এবং তাঁর তথাকথিত শত্রুকেও তিনি ঘৃণা করেন না। তিনি সকলের প্রতি সম-ভাবাপন্ন এবং সব কিছুই তিনি সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। কারণ, তিনি ভাল মতেই জানেন যে, জড়-জাগতিক জীবনে তাঁর কিছুই করবার নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি তাকে প্রভাবিত করে না। কারণ, তিনি সামাজিক উত্থান ও গোলযোগের অনিত্যতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। তাঁর নিজের জন্য তিনি কোন প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিজের জন্য তিনি কোন কিছু করেন না। এই রকম আচরণের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারা যায়।

শ্লোক ২৬

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ৷ ২৬ ॥

মাম্-আমাকে; চ-ও; যঃ-যিনি; অব্যভিচারেণ-ঐকান্তিক; ভক্তিযোগেন-ভক্তিযোগ দ্বারা; সেবতে-সেবা করেন; সঃ-তিনি; গুণান্-প্রকৃতির গুণকে; সমতীত্য-অতিক্রম করে; এতান্-এই সমস্ত; ব্রহ্মভূয়ায়-ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত; কল্পতে-হন।

গীতার গান
ত্রিগুণের অতিক্রমে যে কার্য করয়।
সেই সে আমার ভক্তি জানহ নিশ্চয় ॥
যে অব্যভিচারী ভক্তি আমাতে করয় ।

জড় গুণ অতিক্রমে ব্রহ্মভূত হয় ।

অনুবাদ

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি হচ্ছে অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন-নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায় কি তার উত্তর। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। তাই, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর চেতনাকে এই সমস্ত কার্যকলাপে মনোনিবেশ না করে শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কার্যে নিযুক্ত করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কাজকে বলা হয় ভক্তিযোগ-শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্বদাই কর্ম করা। কৃষ্ণভক্তি বলতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাই বোঝায় না, রাম, নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বাংশ-প্রকাশের সেবাও বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য স্বাংশ-প্রকাশ আছে। যিনি তাঁদের যে কোন একটি রূপের সেবা করেন, তিনি নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এটিও জেনে রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণের সব কয়টি রূপই সম্পূর্ণরূপে গুণাতীত এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ভগবানের এই সমস্ত প্রকাশ সর্ব শক্তিসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ এবং তাঁরা সব রকম দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত। সুতরাং, কেউ যখন দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁর স্বাংশ-প্রকাশের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব, তবুও তিনি অনায়াসে তাদের অতিক্রম করতে পারেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেই কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন। কৃষ্ণভাবনায় বা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মতো হওয়া। ভগবান বলছেন যে, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এবং জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ, ঠিক যেমন সোনার কণা সোনার খনির অংশ। এভাবেই জীবের চিন্ময় স্বরূপ গুণগতভাবে সোনার মতো, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণসম্পন্ন। জীব ও ভগবানের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। তা না হলে ভক্তিযোগের কোন প্রশ্নই হতে পারে না। ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান আছেন, ভগবানের ভক্ত আছেন এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম বিনিময়ের ক্রিয়াকলাপও আছে। তাই, পরম পুরুষোত্তম ভগবান ও জীব এই দুজন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যই বর্তমান। তা না হলে ভক্তিযোগের কোন অর্থই হয় না। যে অপ্রাকৃত স্তরে ভগবান রয়েছেন, সেই স্তরে যদি উন্নীত না হওয়া যায়, তা হলে ভগবানের সেবা করা সম্ভব নয়। রাজার সচিব হতে হলে তাঁকে উপযুক্ত গুণ অর্জন করতে হয়। এভাবেই সেই গুণ হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ব্রহ্মো পর্যবসিত হওয়ার মাধ্যমে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ, গুণগতভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হতে হবে। ব্রহ্মস্তর প্রাপ্ত হলে, একজন স্বতন্ত্র আত্মারূপে জীব তার শাশ্বত ব্রহ্ম পরিচয় হারিয়ে ফেলে না।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মণঃ-নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির; হি-অবশ্যই; প্রতিষ্ঠা-আশ্রয়; অহম্-আমি: অমৃতস্য-অমৃতের; অব্যয়স্য-অব্যয়; চ-ও; শাশ্বতস্য-নিত্য; চ-এবং; ধর্মস্য-ধর্মের; সুখস্য-সুখের; ঐকান্তিকস্য-ঐকান্তিক; চ-ও।

গীতার গান

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি অমৃত শাশ্বত ।
আনন্দ যে সনাতন আমাতে নিহিত ॥
আমার আশ্রয়ে সেই সকল সুলভ।
অতএব মোর ভক্তি হয় সুদুর্লভ ॥

অনুবাদ

আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অব্যয় অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই আশ্রয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মের স্বরূপ হচ্ছে অমরত্ব, অবিনশ্বরত্ব, নিত্যত্ব ও আনন্দ। পরমার্থ উপলব্ধির প্রথম স্তর হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি, দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পরমাত্মার উপলব্ধি এবং পরম-তত্ত্বের চরম স্তরের উপলব্ধি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি। তাই, পরমাত্মা ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম এই উভয় তত্ত্বই হচ্ছে পরম পুরুষ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তির প্রকাশ। ভগবান তাঁর পরা শক্তির কণিকাসমূহের দ্বারা অনুৎকৃষ্টা জড়া প্রকৃতিকে সক্রিয় করেন এবং সেটিই হচ্ছে জড়া প্রকৃতিতে চেতনের প্রকাশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব যখন পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন শুরু করেন, তখন তিনি জড় অস্তিত্ব থেকে ধীরে ধীরে পরম-তত্ত্বের ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হন। জীবের এই ব্রহ্মভূত অবস্থা হচ্ছে আত্মজ্ঞানের প্রথম স্তর। এই স্তরে ব্রহ্মাজ্ঞ পুরুষ জড় অবস্থার অতীত, কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি যদি চান, তা হলে তিনি এই ব্রহ্মভূত অবস্থাতেই থাকতে পারেন এবং তারপর ধীরে ধীরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং তারপর পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে তার অনেক নিদর্শন আছে। চতুঃসন বা চার কুমারেরা প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। যিনি ব্রহ্মের নিরাকার নির্বিশেষ উপলব্ধির ঊর্ধ্বে উন্নীত হতে পারেননি, তাঁর সর্বদাই অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উপনীত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি আর অগ্রসর না হন, পরম পুরুষ ভগবানের তথ্য তিনি যদি না জানেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে নির্মল হয়নি। সুতরাং, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়ার পরেও পতনের সম্ভাবনা থাকে। বৈদিক শাস্ত্রে এটিও বলা হয়েছে, রসো বৈ সঃ রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি- "কেউ যখন পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত রসের আধার বলে জানতে পারেন, তখন তিনি দিব্য আনন্দময় হতে পারেন।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭/১) পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং ভক্ত যখন তাঁর সমীপবর্তী হন, তখন এই ষড়ৈশ্বর্যের বিনিময় হয়। রাজার সেবক রাজার সঙ্গে প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলে শাশ্বত আনন্দ, অক্ষয় সুখ ও নিত্য জীবন লাভ করা যায়। তাই, ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা নিত্যত্ব অথবা অবিনশ্বরত্ব ভক্তিযুক্ত ভগবানের সেবার অন্তর্বর্তী। ভক্তিযোগে যিনি ভগবানার সেবা করছেন, তিনি এই সব কয়টি গুণেরই অধিকারী।

জীব যদিও প্রকৃতিগতভাবে ব্রহ্ম, তবুও জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করবার বাসনা তার

রয়েছে এবং তার ফলে সে অধঃপতিত হয়। তার স্বরূপে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। কিন্তু জড়া প্রকৃতির সংস্রবে আসার ফলে সে সত্ত্ব, রজ ও তম-প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই তিনটি গুণের সংসর্গের ফলে জড় জগতের উপর আধিপত্য করবার বাসনার উদয় হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হবার ফলে সে তৎক্ষণাৎ গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয় এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বিধি-বহির্ভূত বাসনা দূর হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তির পন্থা, যা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদির মাধ্যমে শুরু হয়, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি উপলব্ধির জন্য অনুমোদিত নবধা ভক্তির অঙ্গ ভক্তসঙ্গে অনুশীলন করা উচিত। এই প্রকার সঙ্গ করার ফলে, সদ্গুরুর প্রভাবে ধীরে ধীরে আধিপত্য করার জড় বাসনাগুলি দূর হয়। তখন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে নিযুক্ত হওয়া যায়। এই অধ্যায়ের বাইশ থেকে শুরু করে শেষ শ্লোক পর্যন্ত সব কয়টি শ্লোকে এই পন্থার অনুশীলন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করা অত্যন্ত সরল। এতে কেবল সর্বদা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে হয়, শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়, ভগবানের চরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে হয়, ভগবান যে সমস্ত স্থানে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করেছেন, সেই স্থানগুলি দর্শন করতে হয়, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন লীলাসমূহ পাঠ করতে হয়, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে প্রীতিমূলক ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়, সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-জপ-কীর্তন করতে হয় এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিগুলিতে উপবাস পালন করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে জড় কার্যকলাপের বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়। এভাবেই যিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, তিনি গুণগতভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ বৈশিষ্ট্য বিষয়ক 'গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায় - পুরুষোত্তম-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ঊর্ধ্বমূলম্ ঊর্ধ্বমূল; অধঃ-নিম্নমুখী; শাখম্-শাখাবিশিষ্ট; অশ্বত্থম্-অশ্বত্থ বৃক্ষ; প্রাহুঃ-বলা হয়েছে; অব্যয়ম্ নিত্য; ছন্দাংসি-বৈদিক

মন্ত্রসমূহ; যস্য-যার; পর্ণানি-পত্রসমূহ; যঃ-যিনি; ত্বম্ সেই; বেদ-জানেন; সঃ-তিনি; বেদবিৎ-বেদজ্ঞ।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:

বেদবাণী কর্মকাণ্ডী সংসার আশ্রয়।
নানা যোনি প্রাপ্ত হয় কভু মুক্ত নয় ॥
সংসার যে বৃক্ষ সেই অশ্বত্থ অব্যয়।
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখা নাহি তার ক্ষয় ॥
পুষ্পিত বেদের ছন্দ সে ব্রহ্মের পত্র।
মোহিত সে বেদবাক্য জগৎ সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখা-বিশিষ্ট একটি অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের গুরুত্ব আলোচনা করার পর কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা হলে বেদের অর্থ কি? এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। সুতরাং যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, যিনি ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই বেদের পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করেছেন।

জড় জগতের বন্ধনকে এখানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে সকাম কর্মে রত, তার কাছে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির কোন শেষ নেই। সে এক ডাল থেকে আর এক ডালে, সেখান থেকে অন্য এক ডালে, আবার আর এক ডালে, এভাবেই সে ঘুরে বেড়ায়। এই জড় জগৎরূপী বৃক্ষটির কোন অন্ত নেই এবং যে এই বৃক্ষটির প্রতি আসক্ত, তার পক্ষে মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। মানুষকে ঊর্ধ্বমুখী করবার জন্য যে বৈদিক ছন্দ, তাকে এই বৃক্ষের পাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষের মূলটি ঊর্ধ্বমুখী, কারণ তার শুরু হয়েছে যেখানে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত সেখান থেকে, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে। কেউ যখন মায়াময় এই অব্যয় বৃক্ষটির সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, তখন তিনি তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

মুক্ত হওয়ার এই পন্থাটিকে ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নানা রকম পন্থা বর্ণিত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখন, ভক্তিযোগের মূল তত্ত্ব হচ্ছে জড়-জাগতিক কর্মে অনাসক্তি এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি আসক্তি। এই অধ্যায়ের শুরুতে জড় জগতের প্রতি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় অস্তিত্বের মূল ঊর্ধ্বমুখী। তার অর্থ হচ্ছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোকে মহৎ-তত্ত্বের জড়-জাগতিক অস্তিত্ব থেকে তার শুরু হয়। সেখান থেকে গ্রহমণ্ডলরূপী বিভিন্ন শাখা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফল হচ্ছে জীবের কর্মফল, যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

এখন এই জগতে এমন কোন গাছের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, যার শাখা নিম্নমুখী আর মূল ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু সেটি আছে। সেই গাছ দেখতে পাওয়া যায় একটি জলাশয়ের ধারে। আমরা দেখতে পাই যে, জলাশয়ের তীরের বৃক্ষগুলির শাখা নিম্নমুখী ও মূল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জলে প্রতিবিম্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জড় জগতের বৃক্ষটি হচ্ছে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিদ। জলে যেমন বৃক্ষের ছায়া পড়ে, তেমনই চিৎ-জগতের ছায়া পড়ে

আমাদের কামনার উপর। প্রতিবিম্বিত জড় আকাশে বস্তুর অবস্থিতির কারণ হচ্ছে কামনা-বাসনা। এই জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে হবে। তা হলে তার বন্ধন সে ছিন্ন করতে পারে।

এই বৃক্ষটি বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে, তার অবিকল প্রতিরূপ। চিৎ-জগতে সব কিছুই আছে। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, জড় জগৎরূপী বৃক্ষের মূল হচ্ছে ব্রহ্ম এবং সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, সেই মূল থেকে প্রকৃতি ও পুরুষ, তারপর প্রকৃতির তিনটি গুণ, তারপর পঞ্চ-মহাভূত, তারপর দশেন্দ্রিয়, মন আদির প্রকাশ হয়। এভাবেই তারা সমস্ত জড় জগৎকে চব্বিশটি উপাদানে বিভক্ত করে। ব্রহ্ম যদি সমস্ত প্রকাশের কেন্দ্র হন, তা হলে এই জড় জগতের প্রকাশ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ১৮০ ডিগ্রী বা একটি অর্ধবৃত্ত এবং অপর ১৮০ ডিগ্রী বা অপর অর্ধাংশ হচ্ছে চিৎ-জগৎ। জড় জগৎ যদি বিকৃত প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে চিৎ-জগতে অবশ্যই সেই একই ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু তা রয়েছে বাস্তবভাবে। 'প্রকৃতি' হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং 'পুরুষ' হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। সেই কথা ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রকাশ যেহেতু জড়, তাই তা অনিত্য, অস্থায়ী। প্রতিবিম্ব অস্থায়ী, কেন না কখনও কখনও তাকে দেখা যায়, আবার কখনও কখনও তাকে দেখা যায় না। কিন্তু তার উৎস, যেখান থেকে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তা নিত্য। জড় আকাশে সেই বৃক্ষের জড় প্রতিবিম্বটি কেটে বাদ দিতে হবে। যখন বলা হয় যে, কেউ বেদ সম্বন্ধে জানেন, তখন অনুমান করা হয় যে, এই জড় জগতের আসক্তি কিভাবে ছিন্ন করা যায়, তা তিনি জানেন। এই পন্থা যিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন যথার্থ বেদজ্ঞ। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি যে আকৃষ্ট, বুঝতে হবে সে বৃক্ষটির সবুজ পত্রের প্রতি আকৃষ্ট। বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে অবগত নয়। বেদের উদ্দেশ্য পরম পুরুষ নিজেই বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে প্রতিবিম্ব বৃক্ষটি কেটে বাদ দিয়ে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষটি লাভ করা।

শ্লোক ২

অধশোধ্বং প্রসূতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ৷ ২॥

অধঃ-নিম্নমুখী; চ-এবং; ঊর্ধ্বম্ ঊর্ধ্বমুখী, প্রসূতাঃ-বিস্তৃত; তস্য-তার; শাখাঃ-শাখাসমূহ; গুণ-জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা; প্রবৃদ্ধাঃ-পরিবর্ধিত; বিষয়-ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; প্রবালাঃ-পল্লব; অধঃ-অধোমুখী; চ-এবং; মূলানি-মূলসমূহ: অনুসন্ততানি-প্রসারিত; কর্ম-কর্মের প্রতি; অনুবন্ধীনি-আবদ্ধ; মনুষ্যলোকে নরলোকে।

গীতার গান

বৃক্ষের সে শাখাগুলি ঊর্ধ্ব অধঃগতি।
গুণের বশেতে যার যথা বিধিমতি ॥
সে বৃক্ষের শাখা যত বিষয়ের ভোগ।
নিজ কর্ম অনুসারে যত ভবরোগ ॥
বদ্ধজীব ঘুরে সেই বৃক্ষ ডালে ডালে।
মনুষ্যলোক সে ভুঞ্জে নিজ কর্মফলে ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের শাখাসমূহ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহই এই শাখাগণের পল্লব। এই বৃক্ষের মূলগুলি অধোদেশে প্রসারিত এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ।

তাৎপর্য

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটির বর্ণনা সম্বন্ধে এখানে পুনরায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তার ডালপালাগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তার নিম্নাংশে মানুষ, পশু, গরু, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল আদি বৈচিত্র্যময় জীবের বিভিন্ন প্রকাশ হয়েছে। এরা অধোমুখী শাখাগুলিতে অবস্থিত এবং ঊর্ধ্বমুখী শাখাগুলিতে রয়েছে দেবতা, গন্ধর্ব আদি উচ্চ প্রজাতির জীবসমূহ। বৃক্ষ যেমন জলের দ্বারা পুষ্ট হয়, তেমনই এই বৃক্ষটি পুষ্ট হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা। কখনও কখনও আমরা দেখি যে, জলের অভাবে কোন কোন জমি অনুর্বর, আবার কোন কোন জমি খুব উর্বর, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রজাতির প্রকাশ হয়।

সেই বৃক্ষের পল্লবগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিকাশের ফলে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা নানা রকম ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে ডালপালার ডগা, যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি উপভোগের প্রতি আসক্ত। তার পল্লবগুলি হচ্ছে শব্দ, রূপ, স্পর্শ আদি ইন্দ্রিয়-বিষয় বা তন্মাত্র। তার শাখামূলগুলি হচ্ছে নানা রকম সুখ ও দুঃখজাত আসক্তি ও বিরক্তি। সর্বদিকে বিস্তৃত গৌণ মূলগুলি থেকে ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্যকর্ম করার প্রবণতা উদয় হয়। মুখ্য মূলটি আসছে ব্রহ্মলোক থেকে এবং অন্যান্য মূলগুলি রয়েছে মনুষ্য গ্রহলোকগুলিতে। উচ্চতর লোকে গিয়ে পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করার পর সে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং পুনরায় ফলাশ্রয়ী কর্মের মাধ্যমে উন্নীত হতে চায়। এই মনুষ্যলোক হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র।

শ্লোক ৩-৪

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

ন-না; রূপম্-রূপ; অস্য-এই বৃক্ষের; ইহ-এই জগতে; তথা-ও; উপলভ্যতে-উপলব্ধ হয়; ন-না; অন্তঃ-শেষ; ননা; চ-ও; আদিঃ শুরু; ন-না; চ-ও; সংপ্রতিষ্ঠা-সমাক স্থিতি; অশ্বথম্-অশ্বত্থ বৃক্ষ; এনম্-এই; সুবিরূঢ়-সুদৃঢ়; মূলম্-মূল; অসঙ্গশস্ত্রেণ-বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা; দৃঢ়েন-তীব্র; ছিত্ত্বা-ছেদন করে; ততঃ-তারপর; পদম্-পদ; তৎ-সেই; পরিমার্গিতব্যম্-অন্বেষণ করা কর্তব্য; যস্মিন্ যেখানে; গতাঃ-গমন করলে; ন-না; নিবর্তন্তি-ফিরে আসতে

হয়; ভূয়ঃ-পুনরায়; ত্বম্ তাঁকে; এব-অবশ্যই; চ-ও; আদ্যম্-আদি; পুরুষম্-পুরুষের প্রতি; প্রপদ্যে-শরণ গ্রহণ কর; যতঃ-যাঁর থেকে; প্রবৃত্তিঃ-প্রবর্তন; প্রসূতা-বিস্তৃত হয়েছে; পুরাণী-স্মরণাতিত কাল থেকে।

গীতার গান

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য সে সীমা নাহি পায়।
অনন্ত আকাশে তার আদি অন্ত নয় ।
কিবা রূপ সে বৃক্ষের তাহা নাহি বুঝে।
অনন্তকালের মধ্যে জীব যুদ্ধ যুঝে ।
সে অশ্বত্থ বৃক্ষ হয় সুদৃঢ় যে মূল।
সে মূল কাটিতে হয় শত শত ভুল ॥
অনাসক্তি এক অস্ত্র সে মূল কাটিতে।
সেই সে যে দৃঢ় অস্ত্র সংসার জিনিতে ॥
কাটিয়া সে বৃক্ষমূল সত্যের সন্ধান।
ভাগ্যক্রমে যার হয় তাতে অবস্থান ॥
সে যায় বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে নাহি আসে।
এ বৃক্ষের মূল যথা সে পুরুষ পাশে ।।
সে আদি পুরুষে অদ্য কর যে প্রপত্তি।
জন্মাদি সে যাহা হতে প্রকৃতি প্রবৃত্তি ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের স্বরূপ এই জগতে উপলব্ধ হয় না। এর আদি, অন্ত স্থিতি যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ়মূল এই বৃক্ষকে ছেদন করে সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য, যেখানে গমন করলে, পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। স্মরণাতীত কাল হতে যাঁর থেকে সমস্ত কিছু প্রবর্তন ও বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদি পুরুষের প্রতি শরণাগত হও।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রকৃত রূপ এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারা যায় না। যেহেতু তার মূল ঊর্ধ্বমুখী, তাই প্রকৃত বৃক্ষটির বিস্তার হচ্ছে অপর দিকে। সে বৃক্ষটি যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তা কেউ দেখতে পায় না এবং বৃক্ষটির শুরু যে কোথায় তাও কেউ দেখতে পায় না। তবুও তার কারণ খুঁজে বার করতে হবে। "আমি আমার পিতার পুত্র, আমার পিতা অমুক ব্যক্তির পুত্র ইত্যাদি।" এভাবেই অনুসন্ধান করতে করতে মানুষ ব্রহ্মাতে এসে পৌঁছায়। ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে। এভাবেই অবশেষে যখন কেউ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌঁছায়, তখনই তার এই গবেষণার শেষ হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাধুদের সঙ্গের মাধ্যমে এই বৃক্ষটির উৎস পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অনুসন্ধান করতে হবে। তার ফলে যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে ধীরে ধীরে এই জড় জগতের বিকৃত প্রতিফলন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এভাবেই জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের সংযোগ ছিন্ন করে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে অসঙ্গ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই, প্রামাণ্য শাস্ত্রের ভিত্তিতে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞান আলোচনা করার মাধ্যমে এবং যথার্থ জ্ঞানী বাক্তির কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভক্তসঙ্গে এই ধরনের আলোচনা করার ফলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের

সমীপবর্তী হওয়া যায়। তারপর সর্বপ্রথমে যা অবশ্য করণীয়, তা হচ্ছে তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করা। সেই পরম ধামের বর্ণনায় এখানে বলা হয়েছে যে, একবার সেখানে গেলে এই প্রতিবিম্বরূপী বৃক্ষে আর ফিরে আসতে হয় না। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি মূল, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণই হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন আদি নববিধা ভক্তি অনুশীলনের চরম পরিণতি। এই জড় জগতের বিস্তারের কারণ হচ্ছেন ভগবান। ভগবান নিজেই ইতিমধ্যে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, অহং সর্বস্য প্রভবঃ-"আমি সব কিছুরই উৎস"। সুতরাং, জড়-জাগতিক জীবনরূপ অত্যন্ত কঠিন এই অশ্বত্থ বৃক্ষের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করলে অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

নিঃ-শূন্য; মান-অভিমান; মোহাঃ-মোহ; জিত-বিজিত; সঙ্গ-সঙ্গের; দোষাঃ-দোষ; অধ্যাত্ম-পারমার্থিক জ্ঞানে; নিত্যাঃ-নিত্যত্ব; বিনিবৃত্ত বর্জিত; কামাঃ-কামনা-বাসনা; দ্বন্দ্বৈঃ-দ্বন্দ্বসমূহ থেকে; বিমুক্তাঃ-মুক্ত; সুখদুঃখ-সুখ ও দুঃখ; সংজ্ঞৈঃ-নামক; গচ্ছন্তি লাভ করেন; অমূঢ়াঃ-মোহমুক্ত ব্যক্তিগণ; পদম্-পদ; অব্যয়ম্ নিত্য; তৎ-সেই।

গীতার গান

নিরভিমান নির্মোহ সঙ্গদোষে মুক্ত।
নিত্যানিত্য বুদ্ধি যার কামনা নিবৃত্ত ॥
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মুক্ত জড় মূঢ় নয়।
বিধিজ্ঞ পুরুষ পায় সে পদ অব্যয় ॥

অনুবাদ

যাঁরা অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য-অনিত্য বিচার-পরায়ণ, কামনা-বাসনা বর্জিত, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, তাঁরাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শরণাগতির পন্থা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে গর্বের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন না হওয়া। কারণ, বদ্ধ জীব নিজেকে জড়া প্রকৃতির অধিপতি বলে মনে করে গর্বস্ফীত। তাই, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা তার পক্ষে খুব কঠিন। যথার্থ জ্ঞান অনুশীলন করার মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, সে জড়া প্রকৃতির অধিপতি নয়। অধিপতি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অহঙ্কার-জনিত মোহ থেকে কেউ যখন মুক্ত হয়, তখন সে আত্মসমর্পণের পন্থা শুরু করতে পারে। যে সর্বদাই এই জড় জগতে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করে, তার পক্ষে পরমেশ্বর

ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয়। মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই অহঙ্কারের উদয় হয়; কারণ জীব যদিও অল্প দিনের জন্য এখানে আসে এবং তারপর বিদায় নিয়ে চলে যায়, তবুও মূর্খের মতো সে মনে করে যে, সে এই জগতের অধীশ্বর। এভাবেই সে সব কিছু জটিল করে তোলে এবং তার ফলে সে সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সমস্ত জগৎ চালিত হচ্ছে। মানুষ মনে করছে যে, সারা পৃথিবীটাই মানব-সমাজের সম্পত্তি এবং মিথ্যা মালিকানার ভ্রান্তবোধে তারা পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছে। মনুষ্য-সমাজ যে এই জগতের মালিক, সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হলে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়তা বোধের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত মিথ্যা বন্ধনগুলি মানুষকে জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখে। এই স্তর অতিক্রম করার পর দিব্যজ্ঞান অনুশীলন করতে হবে। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে জানতে হবে কোন জিনিসগুলি তার এবং কোনগুলি তার নয়। সব কিছু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হলে মানুষ সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার দ্বন্দুভাব থেকে মুক্ত হয়। সে যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, তখনই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৬

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

ন-না; তৎ-তা; ভাসয়তে-আলোকিত করতে পারে; সূর্যঃ-সূর্য; ন-না; শশাঙ্কঃ-চন্দ্র; ন-না; পাৰকঃ-অগ্নি, বিদ্যুৎ, যৎ-যেখানে; গত্বা-গেলে; ন-না; নিবর্তন্তে-ফিরে আসে; তৎ ধাম-সেই ধাম; পরমম্-পরম; মম-আমার।

গীতার গান

সে আকাশে জ্যোতির্ময়ে সূর্য বা শশাঙ্ক।
আবশ্যক নাহি তথা কিংবা সে পাবক ॥
সেখানে প্রবেশ হলে ফিরে নাহি আসে।
নিত্যকাল মোর ধামে সে জন নিবাসে ॥

অনুবাদ

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

চিন্ময় জগৎ বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম-কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চিদাকাশে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ সেখানে সব কয়টি গ্রহই জ্যোতির্ময়। এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি গ্রহ সূর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। কিন্তু চিদাকাশে সব কয়টি গ্রহই জ্যোতির্ময়। বৈকুণ্ঠলোক নামক এই সমস্ত গ্রহে উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি নামক চিদাকাশ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় শ্রীকৃষ্ণের আলয় গোলোক বৃন্দাবন থেকে। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির কিয়দংশ মহৎ-তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত। সেটিই হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগৎ ছাড়া সেই জ্যোতির্ময় আকাশের অধিকাংশ

স্থানই চিন্ময় গ্রহলোকসমূহে পরিপূর্ণ, যাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠ এবং তাদের সর্বোচ্চ শিখরে গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত।
জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতে থাকে, সে বদ্ধ জীবন যাপন করে। কিন্তু যখনই সে জড় জগতের মিথ্যা, বিকৃত বৃক্ষটি কেটে ফেলে চিৎ-জগতে প্রবেশ করে, তখনই সে মুক্ত হয়। তখন আর তাকে এখানে ফিরে আসতে হয় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব নিজেকে জড় জগতের অধীশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সে যখন ভগবানের রাজত্বে প্রবেশ করে, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করে এবং সেখানে সে সৎ-চিৎ-আনন্দময় জীবন উপভোগ করে।
এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সকলেরই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাস্তবের ভ্রান্ত প্রতিবিম্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই নিত্য পরম ধামে ফিরে যাবার জন্য সকলেরই বাসনা করা উচিত। যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে সেই আসক্তি ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তারা যদি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তা হলে সেই আসক্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করা। যে সমাজ ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত, সেই রকম সমাজ খুঁজে বার করতে হবে এবং তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই মানুষ জড় জগতের প্রতি আসক্তি ছেদন করতে পারে। গেরুয়া কাপড় পরলেই কেবল জড় জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার প্রতি তাকে আসক্ত হতেই হবে। সুতরাং, প্রকৃত বৃক্ষের বিকৃত প্রতিফলনের থেকে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা ভক্তিযোগ, যা দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। চতুর্দশ অধ্যায়ে জড়-জাগতিক সব কয়টি পন্থার দোষ প্রদর্শন করা হয়েছে। কেবলমাত্র ভক্তিযোগকে শুদ্ধ গুণাতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
এই শ্লোকটিতে পরমং মম কথাটির ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে পরমম্, অর্থাৎ যড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। কঠ উপনিষদে (২/২/১৫) বলা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ ও তারকা-মণ্ডলীর কোন প্রয়োজন নেই (ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্)। কারণ, সমগ্র চিদাকাশ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় কেবল ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ে তা সম্ভব হয় না।

শ্লোক ৭

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

মম-আমার; এব-অবশ্যই; অংশঃ-বিভিন্নাংশ; জীবলোকে-জড় জগতে; জীবভূতঃ-বদ্ধ জীব; সনাতনঃ-নিত্য; মনঃ-মন সহ; যষ্ঠানি-ছয়; ইন্দ্রিয়াণি-ইন্দ্রিয়গুলিকে; প্রকৃতি-জড়া প্রকৃতিতে; স্থানি-স্থিত; কর্ষতি কঠোর সংগ্রাম করছে।

গীতার গান

যত জীব মোর অংশ নহে সে অপর।
সনাতন তার সত্তা জীবলোকে ঘোর ॥

এখানে সে মন আর ইন্দ্রিয়বন্ধনে।
কর্ষণ করয়ে কত প্রকৃতির স্থানে ॥

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে জীবের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে। সনাতনভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশ। এমন নয় যে, বদ্ধ অবস্থায় জীব স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং মুক্ত অবস্থায় সে ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। সনাতনভাবেই জীবসত্তা ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ। সনাতনঃ কথাটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক বর্ণনা অনুসারে ভগবান নিজেকে অনন্তরূপে প্রকাশ করেন, যার মুখ্য প্রকাশকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং গৌণ প্রকাশকে বলা হয় জীবসত্তা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বিষ্ণুস্তত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ এবং জীবসত্তা হচ্ছে বিভিন্নাংশ-প্রকাশ। তাঁর স্বাংশ-প্রকাশে তিনি রামচন্দ্র, নৃসিংহদেব, বিষ্ণুমূর্তি এবং বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকের অধীশ্বর আদি নানারূপে প্রকাশিত হন। বিভিন্নাংশ প্রকাশ জীবসমূহ ভগবানের নিত্যদাস। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশসমূহের স্বতন্ত্র স্বরূপগুলি নিত্য বর্তমান। তেমনই, বিভিন্নাংশ জীবদেরও স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হবার ফলে, ভগবানের গুণাবলীর অণুসদৃশ অংশ জীবদের মধ্যেও রয়েছে, যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে একটি। স্বতন্ত্র আত্মারূপে প্রতিটি জীবেরই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষুদ্র স্বাধীনতা রয়েছে। সেই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে জীবাত্মা বদ্ধ হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার যথাযথ সদ্ব্যবহার করলে সে সর্বদা মুক্ত থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই সে পরমেশ্বর ভগবানের মতো গুণগতভাবে নিত্য। মুক্ত অবস্থায় সে জড় জগতের পরিবেশ থেকে মুক্ত এবং সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত। বদ্ধ অবস্থায় সে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবার কথা সে ভুলে যায়। তার ফলে, এই জড় জগতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।
কেবল কুকুর, বেড়াল, মানুষই নয়, এমন কি জড় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী-ব্রহ্মা, শিব এমন কি বিষ্ণু পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ। তাঁরা সকলেই নিত্য, তাঁদের প্রকাশ সাময়িক নয়। এখানে কর্ষতি ('সংগ্রাম করা' অথবা 'জোর করে আঁকড়ে ধরা') কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বদ্ধ জীব যেন লৌহ শৃঙ্খলের মতো অহঙ্কারের দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং তার মন হচ্ছে তার মুখ্য প্রতিনিধি, যে তাকে জড় অস্তিত্বের দিকে ধাবিত করছে। মন যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন তার কার্যকলাপ শুদ্ধ হয়। মন যখন রজোগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন তার কার্যকলাপ পীড়াদায়ক হয় এবং মন যখন তমোগুণে থাকে, তখন সে নিম্নতর প্রজাতিরূপে বিচরণ করে। এই শ্লোকে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বদ্ধ জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত জড় দেহের দ্বারা আবৃত এবং সে যখন মুক্ত হয় তখন এই জড় আবরণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার স্বরূপ সমন্বিত চিন্ময় দেহ নিজস্ব সামর্থ্যে প্রকাশিত হয়। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে এই তথ্যগুলি প্রদান করা হয়েছে-স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্বমনুভবতি। এখানে বলা হয়েছে যে, যখন জীবাত্মা তাঁর জড় আবরণ পরিত্যাগ করে চেতন জগতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চিন্ময় শরীর পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তাঁর চিন্ময় শরীরে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে পারেন, তাঁর কথা শুনতে পারেন এবং যথাযথভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। স্মৃতি শাস্ত্রেও জানতে পারা যায় যে,

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ-বৈকুণ্ঠলোকে সকলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মতো রূপ নিয়ে বিরাজ করেন। সেখানে বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশ এবং তাঁর বিভিন্নাংশ জীবাত্মাদের দেহের গঠনে কোন পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব মুক্ত হলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় দিব্য শরীর প্রাপ্ত হন।
এখানে মমৈবাংশঃ ('পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ') কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ কোন জড় পদার্থের ভাঙা অংশের মতো নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে, আত্মাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায় না। এই অণুসদৃশ অংশকে জড় বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এটি জড় পদার্থের মতো নয়, যা কেটে টুকরো টুকরো করা যায়, তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। সেই ধারণা এখানে প্রযোজ্য নয়, কারণ এখানে সংস্কৃত সনাতন ('নিত্য') কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের অণুসদৃশ অংশগুলিও নিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমদিকে এটিও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি দেহে ভগবানের অণুসদৃশ অংশ আত্মা বর্তমান থাকে (দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে)। সেই অণুসদৃশ অংশ যখন জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন চিদাকাশে চিন্ময় গ্রহলোকে তার আদি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করার আনন্দ উপভোগ করে। এখানে অবশ্য এটি বোঝা যাচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ হওয়ার ফলে জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, যেমন সোনার একটি কণাও সোনা।

শ্লোক ৮

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শরীরম্-দেহ; যৎ-যেমন; অবাপ্নোতি-প্রাপ্ত হয়; যৎ-যা; চ অপি-ও; উৎক্রামতি-নিষ্ক্রান্ত হয়; ঈশ্বরঃ-দেহের ঈশ্বর; গৃহীত্বা-গ্রহণ করে; এতানি-এই সমস্ত; সংযাতি-গমন করে; বায়ুঃ-বায়ু; গন্ধান্-গন্ধ; ইব-মতন; আশয়াৎ-ফুল থেকে।

গীতার গান

বার বার কত দেহ সে যে প্রাপ্ত হয়।
এক দেহ ছাড়ে আর অন্যে প্রবেশয় ॥
বায়ু গন্ধ যথা যায় স্থান স্থানান্তরে।
কর্মফল সূক্ষ্ম সেই দেহ দেহান্তরে ॥

অনুবাদ

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে জীবকে ঈশ্বর বা তার দেহের নিয়ন্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি ইচ্ছা করে, তা হলে সে তার দেহকে উচ্চতর শ্রেণীতে পরিবর্তন করতে পারে এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে নিম্নতর শ্রেণীতে অধঃপতিত হতে পারে। তার অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য এই ক্ষেত্রে আছে। তার শরীরের সমস্ত পরিবর্তন নির্ভর করে তার সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর। তার চেতনাকে সে যেভাবে গড়ে তুলেছে, মৃত্যুর পর তা তাকে পরবর্তী শরীরে নিয়ে যাবে।

তার চেতনাকে যদি সে একটি কুকুর বা একটি বেড়ালের চেতনার মতো করে গড়ে তোলে, তা হলে সে অবশ্যই কুকুর অথবা বেড়ালের শরীর প্রাপ্ত হবে। কেউ যদি তার চেতনাকে দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত করে, তা হলে সে দেবতাদের মতো শরীর প্রাপ্ত হবে এবং সে যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে সে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করবে। দেহের নাশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দেহের সব কিছুরই নাশ হয়ে যায়, সেই ধারণা ভ্রান্ত। জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত ইচ্ছে এবং তার বর্তমান শরীর ও বর্তমান কার্যকলাপ তার পরবর্তী শরীরের পটভূমি। কর্ম অনুসারে জীব একটি ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং যথা সময়ে তাকে সেই শরীর ত্যাগ করতে হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম শরীর, যা পরবর্তী শরীরের ধারণা বহন করে, তা পরবর্তী জীবনে অন্য একটি শরীরে বিকশিত হয়। এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হবার এই পন্থা এবং দেহের সংগ্রামকে বলা হয় কর্ষতি বা জীবন-সংগ্রাম।

শ্লোক ৯

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ৷ ৯ ॥

শ্রোত্রম্-কর্ণ; চক্ষুঃ-চক্ষু; স্পর্শনম্-ত্বক: চ-ও: রসনম্-জিহ্বা: ঘ্রাণম্-ঘ্রাণশক্তি; এব-ও; চ-এবং; অধিষ্ঠায়-আশ্রয় করে; মনঃ-মন; চ-ও; অয়ম্-এই জীব; বিষয়ান্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, উপসেবতে-উপভোগ করে।

গীতার গান

শরীরের অনুসার শ্রবণ দর্শন।
স্পর্শন, রসন আর ঘ্রাণ বা মনন ॥
সে শরীরে জীব করে বিষয় সেবন।
বদ্ধজীব করে সেই সংসার ভ্রমণ ॥

অনুবাদ

এই জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব যদি তার চেতনাকে কুকুর-বেড়ালের প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করে তোলে, তা হলে পরবর্তী জীবনে সে কুকুর বা বেড়ালের মতো শরীর প্রাপ্ত হয়ে তাদের মতো দেহসুখ ভোগ করবে। চেতনা মূলত জলের মতো নির্মল। কিন্তু জলের সঙ্গে যদি কোন রং মেশান হয়, তা হলে জল রঙিন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, চেতনা নির্মল, কেন না আত্মা পবিত্র। কিন্তু জড় প্রকৃতির গুণের সংস্রবে আসার ফলে চেতনা কলুষিত হয়ে পড়ে। প্রকৃত চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা। তাই কেউ যখন কৃষ্ণচেতনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি তাঁর নির্মল জীবনে অবস্থান করেন। কিন্তু নানা রকম জাগতিক মনোবৃত্তির দ্বারা চেতনা যদি কলুষিত হয়ে পড়ে, তা হলে পরবর্তী জীবনে তিনি তদনুরূপ দেহ প্রাপ্ত হন। তিনি যে পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি কুকুর, বেড়াল, শূকর, দেবতা অথবা অন্য বহু শরীরের মধ্যে একটি শরীর প্রাপ্ত হতে পারেন। এই রকম চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির শরীর রয়েছে।

শ্লোক ১০

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

উৎক্রামন্তম্-দেহ ত্যাগ করে; স্থিতম্-দেহে স্থিত; বা অপি-দুটির মধ্যে কোন একটি; ভুঞ্জানম্-উপভোগ করে; বা-অথবা; গুণান্বিতম্ প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন; বিমূঢ়াঃ-মূঢ় লোকেরা; ন-না; অনুপশ্যন্তি-দেখতে পায়; পশ্যন্তি-দেখতে পান; জ্ঞানচক্ষুষঃ-জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

মূঢ়লোক না বিচারে কি ভাবে কি হয়।
উৎক্রান্তি স্থিতি ভোগ কার বা কোথায় ॥
যার জ্ঞানচক্ষু আছে গুরুর কৃপায়।
ভাগ্যবান সেই জন দেখিবারে পায় ॥

অনুবাদ

মূঢ় লোকেরা দেখতে পায় না কিভাবে জীব দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী শরীর সে উপভোগ করে। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমস্ত বিষয় দেখতে পান।

তাৎপর্য

জ্ঞানচক্ষুষঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞান বিনা কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে জীব তার বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করে এবং পরবর্তী জীবনে সে কি রকম শরীর ধারণ করে। এমন কি এটিও বুঝতে পারে না, কেন সে একটি বিশেষ ধরনের শরীরে অবস্থান করছে। এই তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করবার জন্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন, যা সদ্গুরুর মুখারবিন্দ থেকে ভগবদ্গীতা ও তদনুরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার শিক্ষা যিনি লাভকরেছেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। প্রতিটি জীবই কোন বিশেষ অবস্থায় তার শরীর ত্যাগ করছে। কোন বিশেষ অবস্থায় সে জীবন ধারণ করছে এবং জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সে বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করছে এবং পরিণামে সে নানা রকমের সুখ ও দুঃখ ভোগ করছে। যারা অনন্তকাল ধরে কাম ও বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে আছে, তারা কেন এক বিশেষ দেহে অবস্থান করছে এবং কেনই বা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। সেটি তাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু যাঁর হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়েছে, তিনি দর্শন করতে পারেন যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং সর্বদাই তাঁর দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং চিন্ময় স্বরূপে তাঁর আত্মা নিত্য আনন্দ অনুভব করছে। এই জান যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই বুঝতে পারেন, কিভাবে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে দুর্দশা ভোগ করছে। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের ফলে যাদের চেতনা খুব উন্নত হয়েছে, তাঁরা জনসাধারণকে এই জ্ঞান দান করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কারণ বদ্ধ জীবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে তাঁরা মর্মাহত হন। বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে এই বদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করে কৃষ্ণচেতনা লাভ করা এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্তন করা।

শ্লোক ১১

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যতন্তঃ-যত্নশীল; যোগিনঃ-যোগিগণ; চ-ও; এনম্-এই; পশ্যন্তি-দর্শন করতে পারেন; আত্মনি-আত্মায়; অবস্থিতম্-অবস্থিত; যতন্তঃ-যত্নপরায়ণ হয়ে; অপি-ও; অকৃতাত্মানঃ-আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত; ন-না; এনম্-এই; পশ্যন্তি-দেখতে পায়; অচেতসঃ-অবিবেকীগণ।

গীতার গান

কত যোগী বৈজ্ঞানিক চেষ্টা বহু করে।
আত্মজ্ঞান অভাবেতে বৃথা ঘুরি মরে ॥
কিন্তু মেরা আত্মজ্ঞানী আত্মাবস্থিত।
দেখিতে সমর্থ হয় শুদ্ধ অবহিত ॥

অনুবাদ

আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগিগণ, এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। কিন্তু আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হয়েও এই তত্ত্ব অবগত হয় না।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী বহু সাধক আছেন। কিন্তু যে আত্মজ্ঞান লাভ করেনি, সে জীবদেহে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে তা দেখতে পায় না। এই সূত্রে যোগিনঃ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত অনেক যোগী আছে এবং তথাকথিত বহু যোগাশ্রম আছে। কিন্তু আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই অন্ধ। তারা কেবল এক ধরনের শরীরচর্চা প্রণালী সংক্রান্ত ব্যায়ামে অভ্যস্ত এবং দেহ যদি সুস্থ-সুন্দর থাকে, তা হলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোন তথ্য তাদের জানা নেই। তাদের বলা হয় যতন্তোঽপাকৃতাত্মানঃ। যদিও তারা তথাকথিত যোগ পন্থায় প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু তারা তত্ত্বজ্ঞানী নয়। এই ধরনের লোকেরা আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যাঁরা যথার্থ যোগপন্থা অনুসরণ করছেন, তাঁরাই কেবল আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত ভক্তিযোগীই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে সব কিছু ঘটছে।

শ্লোক ১২

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

যৎ-যে; আদিত্যগতম্-সূর্যস্থিত: তেজঃ-জ্যোতি; জগৎ-বিশ্বকে; ভাসয়তে-প্রকাশিত করে; অখিলম্-সমগ্র; সৎ-যে; চন্দ্রমসি-চন্দ্রে; যৎ-যে; চ-ও; অগ্নৌ-অগ্নিতে; তৎ-সেই; তেজঃ-তেজ; বিদ্ধি-জানবে; মামকম্-আমার।

গীতার গান

এই যে সূর্যের তেজ অখিল জগতে।
চন্দ্রের কিরণ কিংবা আছে ভালমতে ॥

আমার প্রভাব সেই আভাস সে হয়।
আমি যাকে আলো দিই সে আলো পায় ॥

অনুবাদ

সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে, তা আমারই তেজ বলে জানবে।

তাৎপর্য

যারা নির্বোধ, তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সব কিছু ঘটছে। ভগবান এখানে যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞানের সূচনা হয়। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক শক্তি সকলেই দেখতে পায়। মানুষকে কেবল এটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, বৈদ্যুতিক আলোক ও অগ্নির দীপ্তি সবই আসছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। জীবনের এই ভাবধারায়, কৃষ্ণভাবনার সূচনা এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের প্রগতি অনেক অংশে নির্ভর করে। জীব অপরিহার্যরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ এবং এখানে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিভাবে তারা তাদের আপন আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।
এই শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সূর্য সমস্ত সৌরমণ্ডলকে আলোকিত করছে। অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং সৌরমণ্ডল আছে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য রয়েছে, চন্দ্র রয়েছে এবং গ্রহ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সূর্যই আছে। ভগবদ্গীতায় (১০/২১) বলা হয়েছে যে, চন্দ্র হচ্ছে নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম (নক্ষত্রাণামহং শশী)। সূর্যরশ্মির প্রকাশ হয় চিদাকাশে ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপ বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্না করে, আগুন জ্বালিয়ে তারা কারখানা চালায় ইত্যাদি। আগুনের সাহায্যে কত কিছু করা ৩য়, তাই সূর্যোদয়, অগ্নি ও চন্দ্রকিরণ জীবদের কাছে এত মনোরম। তাদের সাহায্য ব্যতীত জীব বেঁচে থাকতে পারে না। তাই কেউ যখন বুঝতে পারে যে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোক ও জ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার কৃষ্ণচেতনা শুরু হয়। চন্দ্র-কিরণের দ্বারা সমস্ত বনস্পতির পুষ্টিসাধন হয়। চন্দ্রকিরণ এতই মনোরম যে, মানুষ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই জীবন ধারণ করছে। তাঁর কৃপা ব্যতীত সূর্যের উদয় হতে পারে না, তাঁর কৃপা ব্যতীত চন্দ্রের প্রকাশ হতে পারে না, তাঁর কৃপা ব্যতীত অগ্নির প্রকাশ হতে পারে না এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির সহায়তা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না। এই চিন্তাগুলি বদ্ধ জীবের কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তোলে।

শ্লোক ১৩

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

গাম্-পৃথিবীতে; আবিশ্য-প্রবিষ্ট হয়ে; চ-ও; ভূতানি-জীবসমূহকে; ধারয়ামি-ধারণ করি; অহম্-আমি; ওজসা-আমার শক্তির দ্বারা, পুষ্ণামি-পুষ্ট করছি; চ-এবং; ঔষধীঃ-ধান, যব আদি ওষধি; সর্বাঃ-সমস্ত; সোমঃ-চন্দ্র; ভূত্বা-হয়ে; রসাত্মকঃ রসময়।

গীতার গান

এই যে পৃথিবী যথা বায়ুমধ্যে ভাসে।
আমার সে শক্তি ধরে সবেতে প্রবেশে ॥
আমি সে ঔষধি যত পোষণ করিতে।
চন্দ্ররূপে রশ্মিদান করি সে তাহাতে ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ধান, যব আদি ওষধি পুষ্ট করছি।

তাৎপর্য

ভগবানের শক্তির প্রভাবেই যে সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভগবান প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি গ্রহে এবং প্রতিটি জীবে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মসংহিতাতে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশরূপে পরমাত্মা গ্রহগুলিতে, ব্রহ্মাণ্ডে, জীবে, এমন কি অণুতে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং, তিনি প্রবিষ্ট হন বলেই সব কিছু যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। দেহে যখন আত্মা থাকে, তখন মানুষ জলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহটির যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহটি ডুবে যায়। অবশ্যই সেটি যখন পরে পচে ফেঁপে-ফুলে ওঠে, তখন তা শুকনো খড়কুটা বা পাতার মতো ভাসতে থাকে, কিন্তু যেইমাত্র মানুষটির মৃত্যু হয়, সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবে যায়। তেমনই এই সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম শক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়েছে বলে। তাঁর শক্তি সমস্ত গ্রহগুলিকে এক মুঠো ধূলিকণার মতো ধারণ করে আছে। কেউ যদি এক মুঠো ধূলিকণা ধরে রাখে, তা হলে সেই ধূলিকণাগুলি পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি সেগুলিকে বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে, তা হলে তা পড়ে যাবে। তেমনই, এই সমস্ত গ্রহগুলি যা মহাশূন্যে ভাসছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মুষ্টিতে ধৃত। তাঁর বীর্য ও শক্তির প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুই তাদের যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্যই সূর্য আলোক দান করছে এবং গ্রহগুলি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলেছে। তিনি না হলে ধূলিকণার মতো সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত এবং বিনাশ প্রাপ্ত হত। তেমনই, চন্দ্র যে সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন করছে, তাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই জন্য। চন্দ্রের প্রভাবের ফলেই বনস্পতিরা সুস্বাদু হয়। চন্দ্রকিরণ ব্যতীত বনস্পতিরা না পারে বর্ধিত হতে, না পারে রসাল স্বাদযুক্ত হতে। মানব-সমাজ কর্ম করছে, আরাম উপভোগ করছে এবং আহার্যের স্বাদ উপভোগ করছে, পরমেশ্বর ভগবান সেগুলি সরবরাহ করছেন বলেই। তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারত না। রসাত্মকঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি চন্দ্রের প্রভাবে সব কিছু সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৪

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অহম্-আমি; বৈশ্বানরঃ-জঠরাগ্নি; ভূত্বা-হয়ে; প্রাণিনাম্-প্রাণীগণের; দেহম্ দেহ; আশ্রিতঃ-

আশ্রয় করে; প্রাণ-প্রাণবায়; অপান-অপান বায়ু; সমাযুক্তঃ-সংযোগে; পচামি-পরিপাক করি; অন্নম্-খাদ্য; চতুর্বিধম্-চার প্রকার।

গীতার গান

আমি বৈশ্বানর হই দেহমাত্রে বসি।
প্রাণাপান বায়ুযোগে ভক্ষ্য দ্রব্য কষি ॥

অনুবাদ

আমি জঠরাগ্নি রূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, জঠরে এক রকমের অগ্নি আছে যা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে হজম করতে সাহায্য করে। সেই অগ্নি যখন প্রজ্বলিত না থাকে, তখন ক্ষুধা থাকে না এবং সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো জ্বলতে থাকে, তখন আমরা ক্ষুধার্ত হই। মাঝে মাঝে সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো না জ্বলে, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, এই অগ্নি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। বৈদিক মন্ত্রেও (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫/৯/১) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম অগ্নিরূপে উদরে অবস্থিত হয়ে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করছেন (অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃপুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে)। সুতরাং, যেহেতু তিনি সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করছেন, তাই আহারের ব্যাপারেও জীব স্বাধীন নয়। পরমেশ্বর ভগবান যদি পরিপাকের ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করেন, তা হলে তার পক্ষে আহার করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এভাবেই তিনি খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং পরিপাক করেন এবং তাঁর কৃপার প্রভাবে আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করতে পারি। বেদান্তসূত্রেও (১/২/২৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, শব্দাদিভ্যোহন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ-ভগবান শব্দের মধ্যে ও শরীরের মধ্যে, বায়ুতে এমন কি উদরে পরিপাক শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। খাদ্যদ্রব্য চার প্রকারের-চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এবং এই সব রকমের খাদ্যেরই পরিপাক করার শক্তি হচ্ছেন তিনি।

শ্লোক ১৫

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ৷৷

সর্বস্য-সমস্ত জীবের; চ-এবং; অহম্-আমি; হৃদি-হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ-অবস্থিত; মত্তঃ-আমার থেকে; স্মৃতিঃ-স্মৃতি; জ্ঞানম্-জ্ঞান; অপোহনম্-বিলোপ; চ-এবং; বেদৈঃ-বেদসমূহের দ্বারা; চ-ও; সর্বৈঃ-সমস্ত; অহম্-আমি; এব-অবশ্যই; বেদ্যঃ-জ্ঞাতব্য; বেদান্তকৃৎ-বেদান্তকর্তা; বেদবিৎ-বেদজ্ঞ; এব-অবশ্যই; চ-এবং; অহম্-আমি।

গীতার গান

সবার হৃদয়ে আমি, সন্নিবিষ্ট অন্তর্যামী,
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান মন।

আমি সে জাগাই কারে, আমি সে ভুলাই তারে,
আমা হতে হয় অপোহন ॥
যত বেদ পৃথিবীতে, সব আমার সে তল্লাসেতে,
আমি হই বেদবেদ্য।
আমি সে বেদান্তবিৎ, আমি সে বেদান্তকৃৎ,
বেদান্তের কথা শুন অদ্য ॥

অনুবাদ

আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

তাৎপর্য

ভগবান পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তাঁর থেকে সমস্ত কর্মের সূচনা হয়। জীব তার পূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু তাকে সমস্ত কর্মের সাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যেতে হয়। সুতরাং, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সে কর্ম করতে শুরু করে। সেই জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন ভগবান তাকে তা দান করেন। তিনি তাকে স্মৃতি দান করেন এবং তার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃতিও দান করেন। এভাবেই, ভগবান কেবল সর্বব্যাপ্তই নন, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরেও বিরাজমান। তিনি নানা রকম কর্মফল দান করেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে বা হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা রূপেই কেবল আরাধ্য নন, বেদের অবতাররূপেও তিনি আরাধ্য। বেদ মানুষকে সঠিক নির্দেশ প্রদান করে, যাতে তারা যথাযথভাবে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে। বেদ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করেন। ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে বেদান্তসূত্রের যথার্থ তত্ত্ব-উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান এতই পূর্ণ যে, বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি হচ্ছেন তার খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহকারী, পাচনকারী, তার কর্মের সাক্ষী, বেদরূপে তার জ্ঞান প্রদাতা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবদগীতার শিক্ষক। তিনি বদ্ধ জীবাত্মার আরাধ্য। এভাবেই ভগবান সর্ব মঙ্গলময় এবং তিনি পরম দয়াময়।
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্। দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে জীব সব কিছু ভুলে যায়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার তার কর্ম শুরু করে। যদিও সে তার পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায়, তবুও যেখানে সে তার কর্ম শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করবার জন্য ভগবান তাকে বুদ্ধি দান করেন। সুতরাং, হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীব যে কেবল জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে তা নয়, তার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করার সুযোগও সে পায়। কেউ যদি বৈদিক জ্ঞান লাভে গভীরভাবে প্রয়াসী হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে উপযুক্ত বুদ্ধিও দান করেন। আমাদের উপলব্ধির জন্য কেন তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন? কারণ, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা জীবের প্রয়োজন। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে-যোহসৌ সর্বৈবেদৈর্গীয়তে। চতুর্বেদ থেকে শুরু করে বেদান্তসূত্র, উপনিষদ, পুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যশ কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন করার ফলে, বৈদিক দর্শন আলোচনা করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাঁকে লাভ করা যায়। সুতরাং, বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। বেদ আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার নির্দেশ দেয় এবং পথ প্রদর্শন করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরম লক্ষ্য। সেই কথা প্রতিপন্ন করে

বেদান্তসূত্র (১/১/৪) বলছে-তৎ তু সমন্বয়াৎ। তিনটি পর্যায়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায়। বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে জীবনের পরম লক্ষ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হওয়া যায়। এই শ্লোকে বেদের উদ্দেশ্য, বেদের উপলব্ধি এবং বেদের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

দ্বৌ-দুই; ইমৌ-এই; পুরুষৌ-জীব; লোকে-জগতে; ক্ষরঃ-বিনাশী; চ-এবং; অক্ষরঃ-অবিনাশী; এব-অবশ্যই; চ-এবং; ক্ষরঃ- বিনাশী; সর্বাণি-সমস্ত; ভূতানি-জীব; কূটস্থঃ-একভাবে স্থিত; অক্ষরঃ-অবিনাশী; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

বদ্ধ মুক্ত পুরুষ সে হয় দ্বি-প্রকার।
দুই নামে পরিচিত সে ক্ষর অক্ষর ॥
বদ্ধ জীব যত হয় তার ক্ষর নাম।
অক্ষর কূটস্থ জীব নিত্য মুক্তধাম ॥

অনুবাদ

ক্ষর ও অক্ষর দুই প্রকার জীব রয়েছে। এই জড় জগতের সমস্ত জীবকে ক্ষর এবং চিৎ-জগতের সমস্ত জীবকে অক্ষর বলা হয়।

তাৎপর্য

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যাসদেব রূপে অবতরণ করে ভগবান বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করেন। এখানে ভগবান সংক্ষেপে বেদান্তসূত্রের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন যে, জীব যা সংখ্যায় অনন্ত, তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-ক্ষর ও অক্ষর। জীব হচ্ছে ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ। তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে থাকে, তখন তাদের বলা হয় জীবভূত এবং সংস্কৃত ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কথাটির অর্থ হচ্ছে তারা ক্ষর। কিন্তু যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত, তাঁদের বলা হয় অক্ষর। একাত্মভাবে যুক্ত কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাঁদের কোন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁরা ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন নন। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে তাঁরা সকলেই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য, চিৎ-জগতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই, তবে বেদান্তসূত্রের বর্ণনা অনুসারে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তাই সেই ধারণাই এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে দুই রকমের জীব আছে। বেদেও তার প্রমাণ আছে। সুতরাং, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। যে সমস্ত জীব এই জগতে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে সংগ্রাম করছে, তাদের জড় দেহ আছে, যা তাদের বদ্ধ অবস্থায় প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব যতক্ষণ বদ্ধ থাকে, জড়ের সংস্পর্শে আসার ফলে তার দেহের পরিবর্তন হয়। জড় দেহের পরিবর্তন হয়, তাই মনে হয় যেন জীবের পরিবর্তন

হচ্ছে। কিন্তু চিৎ-জগতে জড় পদার্থ দিয়ে শরীর তৈরি হয় না। তাই সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। জড় জগতে জীবের ছয়টি পরিবর্তন হয়-জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। এগুলি জড় শরীরের পরিবর্তন। কিন্তু চিৎ-জগতে দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। সেখানে জরা নেই, জন্ম নেই এবং মৃত্যু নেই। সেখানে সব কিছুই একত্বভাবে অবস্থান করে। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি-পিতামহ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ছোট পিঁপড়ে পর্যন্ত যে এই জড় জগতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা সকলেই দেহ পরিবর্তন করছে। তাই তারা সকলেই ক্ষর। চিৎ-জগতে সকলেই একত্বভাবে সর্বদা অক্ষর বা মুক্ত।

শ্লোক ১৭

উত্তমঃ পুরুষত্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

উত্তমঃ-উত্তম; পুরুষঃ-পুরুষ; তু-কিন্তু; অন্যঃ-অন্য; পরম-পরম; আত্মা-আত্মা; ইতি-এভাবে; উদাহৃতঃ-বলা হয়; যঃ-যিনি; লোক-ভুবনে; ত্রয়ম্ তিন; আবিশ্য প্রবিষ্ট হয়ে; বিভর্তি-পালন করছেন; অব্যয়ঃ-অব্যয়; ঈশ্বরঃ-ঈশ্বর।

গীতার গান

তাহা হতে যে উত্তম পুরুষ প্রধান।
ঈশ্বর সে পরমাত্মা থাকে সর্বস্থান ॥

অনুবাদ

এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর ও অব্যয় এবং ত্রিজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পালন করছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির ধারণা কঠ উপনিষদ (২/২/১৩) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/১৩) খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বদ্ধ ও মুক্ত অনন্ত কোটি জীবের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরম পুরুষ, যিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। উপনিষদের' শ্লোকটি হচ্ছে-নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের মধ্যেই একজন পরম প্রাণময় পুরুষ রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাদের প্রতিপালন করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে আনন্দ উপভোগ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান করেন। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। যে জ্ঞানী পুরুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই কেবল যথার্থ শান্তি লাভের যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

শ্লোক ১৮

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ-যেহেতু; ক্ষরম্-ক্ষরের; অতীতঃ-অতীত; অহম্-আমি; অক্ষরাৎ-অক্ষর থেকে; অপি-

ও; চ-এবং; উত্তমঃ-উত্তম; অতঃ-অতএব; অস্মি-হই; লোকে-জগতে; বেদে-বৈদিক শাস্ত্রে; চ-এবং; প্রথিতঃ-বিখ্যাত; পুরুষোত্তমঃ -পুরুষোত্তম নামে।'

গীতার গান

ক্ষর বা অক্ষর হতে আমি সে উত্তম।
অতএব ঘোষিত নাম পুরুষোত্তম ॥

অনুবাদ

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না-বদ্ধ জীবেও না, মুক্ত জীবেও না। অতএব, তিনি হচ্ছেন পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম পুরুষ। এখন স্পষ্টভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, জীব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান উভয়েই স্বতন্ত্র। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বদ্ধ অবস্থাতেই হোক অথবা মুক্ত অবস্থাতেই হোক, জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিসমূহকে কোন পরিমাণেই অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবকে সমপর্যায়ভুক্ত বা সর্বতোভাবে সমান বলে মনে করা ভুল। তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় সর্বদাই ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের প্রশ্ন থেকে যায়। উত্তম শব্দটি এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। লোকে কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে 'পৌরুষ আগমে' (স্মৃতিশাস্ত্র)। নিরুক্তি অভিধানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, লোক্যতে বেদার্থোহনেন-"বেদের উদ্দেশ্য স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপী প্রাদেশিক প্রকাশরূপে বেদেও বর্ণিত হয়েছেন। বেদে (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮/১২/৩) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে-তাবদেষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ। "দেহ থেকে বেরিয়ে এসে পরমাত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরম ঈশ্বরকে বলা হয় পরম পুরুষ।" অর্থাৎ, পরম পুরুষ তাঁর চিন্ময় জ্যোতি প্রদর্শন ও বিকিরণ করেন, যা হচ্ছে পরম জ্যোতি। সেই পরম পুরুষোত্তমই পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সত্যবতী ও পরাশরের সন্তান ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন।

শ্লোক ১৯

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত । ১৯ ॥

যঃ-যিনি; মাম্-আমাকে; এবম্-এভাবে; অসংমূঢ়ঃ-নিঃসন্দেহে; জানাতি-জানেন; পুরুষোত্তমম্-পরমেশ্বর ভগবান; সঃ-তিনি; সর্ববিৎ-সর্বজ্ঞ; ভজতি-ভজনা করেন; মাম্-আমাকে; সর্বভাবেন-সর্বতোভাবে; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান

যে মোরে বুঝিল শ্রেষ্ঠ সে পুরুষোত্তম।
সকল সন্দেহ ছাড়ি হইল উত্তম ।
সে জানিল সর্ব বেদ নির্মল হৃদয়।

হে ভারত! সর্বভাবে সে মোরে ভজয় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ। যে অনভিজ্ঞ, সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তাঁর অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে নিযুক্ত করেন। সমগ্র ভগবদ্গীতায় সর্বত্রই এই তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবুও ভগবদ্গীতার বহু উদ্ধত হঠকারী ভাষ্যকারেরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ও জীব এক ও অভিন্ন।

বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষা। প্রামাণিক সূত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির কাছ থেকেই কেবল বৈদিক জ্ঞান লাভ করা উচিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দরভাবে সব কিছুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্র থেকে সকলেরই শ্রবণ করা উচিত। নির্বোধের মতো কেবল শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে তা উপলব্ধি করতে হবে। এমন নয় যে, কেবল কেতাবি বিদ্যার উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে ভগবদ্গীতা থেকে শ্রবণ করতে হবে যে, জীব সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন, তা ছাড়া আর কেউই বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

ভজতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পর্কে অনেক জায়গায় ভজতি শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পরম্পরায় বলা হয় যে, কেউ যখন ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাঁকে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে হয় না। তিনি ইতিমধ্যেই সেই স্তরে উপনীত হয়েছেন, কারণ তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর পক্ষে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির সব কয়টি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শত সহস্র জীবন ধরে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত না হয় এবং তার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তা হলে বহু বর্ষ ধরে তার যে এত সমস্ত অনুমান, তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

শ্লোক ২০

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ৷ ২০ ॥

ইতি-এভাবেই; গুহ্যতমম্ সবচেয়ে গোপনীয়; শাস্ত্রম্ শাস্ত্র; ইদম্-এই; উক্তম্-কথিত হল;

ময়া-আমার দ্বারা; অনঘ-হে নিষ্পাপ; এতৎ-এই; বুদ্ধা-অবগত হয়ে; বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমান; স্যাৎ হন; কৃতকৃত্যঃ-কৃতার্থ; চ-এবং; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান

এই সে শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম কথা শুন।
তুমি সে নিষ্পাপ হও শুদ্ধ তব মন ॥
ইহা যে বুঝিল ভাগ্যে হল বুদ্ধিমান।
হে ভারত! কৃতকৃত্য সে হল মহান ।।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ অর্জুন। হে ভারত! এভাবেই সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এটিই হচ্ছে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রের সারমর্ম এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেভাবে তা দান করেছেন, ঠিক সেভাবেই তা উপলব্ধি করা উচিত। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হবে এবং সে পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই ভগবৎ-দর্শন উপলব্ধি করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তিযোগ হচ্ছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। যেখানেই ভক্তিযোগ সাধিত হয়, সেখানে জড় জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা এবং ভগবান এক ও অভিন্ন, কারণ তাঁরা চিন্ময়। ভগবানের সেবা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে। ভগবানকে বলা হয় সূর্যের মতো এবং অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। যেখানে সূর্যালোকের প্রকাশ হয়, সেখানে অন্ধকারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই, সদ্গুরুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে যখন ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয়, তখন অজ্ঞানতার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। সকলেরই উচিত এই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে ব্রতী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও নির্মলতা প্রাপ্তির জন্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে যথার্থ বুদ্ধিমান নয়।

এই শ্লোকে অর্জুনকে যে অনঘ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা সম্ভব নয়। মানুষকে সব রকমের পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে। তখনই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শুদ্ধ ও শক্তিশালী যে, কেউ যখন একবার ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন সে আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা হয়, তখন কতকগুলি প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। প্রথম অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। এভাবেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি পরিত্যাগ করে। হৃদয়ের দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা। এই প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সে জড়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং সে জড়ের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই হৃদয়ের দুর্বলতাগুলিই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের কারণ। এই অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে হৃদয়ের এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের বাকি অংশে ষষ্ঠ

শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম-যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-পরম পুরুষের যোগতত্ত্ব বিষয়ক 'পুরুষোত্তম-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায় - দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ

শ্লোক ১-৩

শ্রীভগবানুবাচ
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষুলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অভয়ম্ ভয়শূন্যতা; সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ -সত্তার পবিত্রতা; জ্ঞান-জ্ঞান; যোগ-যোগে; ব্যবস্থিতিঃ-অবস্থিতি; দানম্-দান; দমঃ-মনঃসংযোগ; চ-এবং; যজ্ঞঃ-যজ্ঞ; চ-এবং; স্বাধ্যায়ঃ-বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন; তপঃ-তপশ্চর্যা; আর্জবম্-সরলতা; অহিংসা-অহিংসা; সত্যম্ সত্যবাদিতা; অক্রোধঃ-ক্রোধশূন্যতা; ত্যাগঃ- বৈরাগ্য; শান্তিঃ-প্রশান্তি; অপৈশুনম্-অন্যের দোষ না দেখা; দয়া-দয়া; ভূতেষু-সমস্ত জীবের প্রতি; অলোলুপ্তম্-লোভহীনতা; মাদবম্-মৃদুতা; হ্রীঃ-লজ্জা; অচাপলম্-অচপলতা; তেজঃ-তেজ; ক্ষমা-ক্ষমা; ধৃতিঃ-ধৈর্য, শৌচম্-শুচিতা; অদ্রোহঃ-মাৎসর্যহীনতা; ন-না; অতিমানিতা-অভিমানশূন্যতা; ভবন্তি-হয়; সম্পদম্-সম্পদ; দৈবীম্-দিব্য; অভিজাতস্য-জাত ব্যক্তির; ভারত-হে ভারত।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
অভয় সত্ত্ব সংসিদ্ধি জ্ঞানে অবস্থান।
দান দম যজ্ঞ আর স্বাধ্যায় তপান ॥
সরলতা সত্য আর অহিংসা অক্রোধ ।
ত্যাগ শান্তি দয়া আর পরনিন্দা রোধ ॥
অলোলুপতা মৃদুতা তেজ অচপল ।
ক্ষমা ধৃতি শৌচ বা স্ত্রী অদ্রোহ সকল ॥
অভিমান শূন্যতা সে ছাব্বিশ যে গুণ।

সম্পদ সে হয় তার যার দৈবীতে জনম ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে ভারত! ভয়শূন্যতা, সত্তার পবিত্রতা, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপশ্চর্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূন্যতা, বৈরাগ্য, শান্তি, অন্যের দোষ দর্শন না করা, সমস্ত জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, মাৎসর্য শূন্যতা, অভিমান শূন্যতা-এই সমস্ত গুণগুলি দিব্যভাব সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের শুরুতেই অশ্বত্থ বৃক্ষবৎ এই জড় জগতের বর্ণনা করা হয়েছে। তার শাখামূলগুলিকে জীবের মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে দেব ও অসুরদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বৈদিক রীতি অনুসারে সাত্ত্বিক কর্মকে মুক্তিপ্রদ, মঙ্গলজনক কর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার কার্যকলাপকে দৈবী প্রকৃতি বলে অভিহিত করা হয়। যারা দৈবী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, তারা মুক্তির পথে অগ্রসর হন। পক্ষান্তরে, যারা রাজসিক ও তামসিক কর্ম করছে, তাদের পক্ষে মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। তারা হয় এই জড় জগতে মনুষ্যরূপে অবস্থান করবে, নয়তো অধোগামী হয়ে পশুজীবন বা আরও নিম্নতর জীবন লাভ করবে। এই ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান দৈবী প্রকৃতি, তার গুণাবলী এবং আসুরিক প্রবৃত্তি ও তার গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত গুণের সুবিধা ও অসুবিধার কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অভিজাতস্য শব্দটি যার এখানে অনুবাদ হচ্ছে দিব্যগুণে যার জন্ম হয়েছে, তার উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিব্য পরিবেশে সন্তান উৎপাদনের পন্থা বৈদিক শাস্ত্রে 'গর্ভাধান সংস্কার' নামে পরিচিত। পিতামাতা যদি দিব্যগুণ সমন্বিত সন্তান কামনা করেন, তা হলে তাঁদের মানব-জীবনের জন্য অনুমোদিত দশটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। ভগবদ্গীতাতে আমরা আগেই পড়েছি যে, সুসন্তান লাভের জন্য স্ত্রী-পুরুষের যে যৌন মিলন, তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলন যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে তা নিন্দনীয় নয়। যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময়, তাঁদের অন্তত কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন না করে এমন সন্তান উৎপাদন করা উচিত, জন্মের পরে যারা কৃষ্ণভাবনাময় হবে। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন পিতা-মাতার সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক সমাজ-ব্যবস্থা-যা সমাজকে চারটি বর্ণে ও চারটি আশ্রমে বিভক্ত করেছে-তা জন্ম অনুসারে মানব-সমাজকে বিভক্ত করার জন্য নয়। এই বিভাগ হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণ অনুসারে। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের দিব্যগুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দিব্যজ্ঞান লাভের পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বা সমাজের সকল শ্রেণীর গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-সমাজের এই তিনটি বর্ণের গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসী, যিনি এই সমাজের সর্বোচ্চ শীর্ষে অধিষ্ঠিত, তিনি ব্রাহ্মণদেরও গুরু। সন্ন্যাসীর প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে ভয়শূন্যতা। কারণ সন্ন্যাসীকে সব রকম সহায় সম্বলহীন হয়ে কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে তাঁকে একলা থাকতে হয়। সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করার পরেও যদি তিনি মনে করেন, "সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে, কে আমায় রক্ষা করবে?" তা হলে তাঁর পক্ষে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ বা পরম

পুরুষ ভগবান পরমাত্মারূপে সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে রয়েছেন। তিনি সর্বদাই সব কিছু দর্শন করছেন এবং তিনি হৃদয়ের সমস্ত বাসনাগুলির কথা জানেন। এভাবেই তাঁকে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন হতে হয় যে, পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাগত জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর অনুভব করা উচিত, "আমি কখনই নিঃসঙ্গ নই। আমি যদি অরণ্যের গভীরতম প্রদেশেও থাকি, শ্রীকৃষ্ণ তখনও আমার সঙ্গে থাকবেন এবং তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।" এই দৃঢ় বিশ্বাসকে বলা অভয়ম্ বা ভয়শূন্যতা। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ধরনের মনোভাব থাকা আবশ্যক।

তারপর তাঁকে তাঁর অস্তিত্ব পবিত্র করতে হয়। সন্ন্যাস-জীবনে পালনীয় বহু নিয়মকানুন আছে। সেগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কোন স্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকা কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কোন নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলাও তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। তিনি যখন পুরীতে ছিলেন, তখন মহিলা ভক্তেরা তাঁকে প্রণাম করার জন্য তাঁর কাছেও আসতে পারত না, তাদের দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানাতে বলা হত। এটি স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ নয়, এটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রতি স্ত্রীসঙ্গ না করার যে কঠোর নির্দেশ আছে, তারই দৃষ্টান্ত। জীবন পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী এবং তাঁর জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি সবচেয়ে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করেছেন এবং সেই জন্য যদিও তাঁকে ভগবানের সবচেয়ে করুণাময় বা মহাবদান্য অবতার বলে গণ্য করা হয়, তবুও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছেন। ছোট হরিদাস ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে একজন। কিন্তু কোন কারণবশত এই ছোট হরিদাস একবার এক মহিলার প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত কঠোর ছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদমণ্ডলী থেকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, "সন্ন্যাসী অথবা যিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় প্রকৃতি ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পার্থিব সম্পদ ভোগ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। তাদের উপভোগ না করলেও যদি কেবল সেই প্রবৃত্তি নিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তা এতই নিন্দনীয় যে, এই অবৈধ বাসনাকে মনে স্থান দেওয়ার আগে আত্মহত্যা করা উচিত।" সুতরাং, এগুলিই হচ্ছে পবিত্র হওয়ার পন্থা।

পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি-জ্ঞানের অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া। সন্ন্যাস-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ ও অন্যেরা, যারা তাদের পারমার্থিক জীবনের কথা ভুলে গেছে, তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করা। সন্ন্যাসীকে জীবন ধারণের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে ভিখারী। দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষের একটি গুণ হচ্ছে দৈন্য এবং সেই দীনতার বশবর্তী হয়েই সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে গমন করেন, ঠিক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, গৃহস্থদের কাছে গিয়ে তাদের কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য। সেটিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। তিনি যদি যথার্থই উন্নত হন এবং তাঁর গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হন, তা হলে যুক্তি ও উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা উচিত এবং তিনি যদি তত উন্নত না হন, তা হলে তাঁর পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে জ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁর উচিত সদ্গুরুর কাছ থেকে সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা। সন্ন্যাসীর উচিত অভয় হয়ে সত্ত্বসংশুদ্ধি (পবিত্রতা) লাভ করে জ্ঞানযোগে অধিষ্ঠিত হওয়া।

তার পরের বিষয়টি হচ্ছে দান। দান করা গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সদুপায়ে অর্থোপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা এবং আয়ের অর্ধাংশ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য দান করা। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সেই ধরনের সংস্থাকে দান করা, যারা এই ধরনের কাজে নিযুক্ত আছে। দান যথাযোগ্য পাত্রে অর্পণ করা উচিত। দান নানা রকমের আছে, তা পরে ব্যাখ্যা করা হবে, যেমন সত্ত্বগুণে দান, রজোগুণে দান ও তমোগুণে দান। শাস্ত্রে সত্ত্বগুণে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রজ ও তমোগুণে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, কারণ সেই ধরনের দানের ফলে কেবল অর্থেরই অপচয় হয়। পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার উদ্দেশ্যেই কেবল দান করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সত্ত্বগুণে দান।

দম বা আত্মসংযম ধার্মিক সমাজের অন্য আশ্রমভুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই কেবল নির্দিষ্ট হয়নি, গৃহস্থদের জন্য তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। গৃহস্থ আশ্রমে মানুষ যদিও স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তবু অনর্থক যৌন জীবন যাপনে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করা গৃহস্থের উচিত নয়। গৃহস্থের যৌন জীবনও বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গে যৌনসুখ ভোগ করা উচিত নয়। আধুনিক সমাজ সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব এড়াবার জন্য গর্ভনিরোধক প্রণালী এবং আরও সমস্ত অতি জঘন্য উপায়ে যৌন জীবন করছে। এই ধরনের কার্যকলাপ দিব্যগুণের পর্যায়ভুক্ত নয়। এগুলি আসুরিক কার্যকলাপ। কেউ যদি গৃহস্থও হন এবং পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে চান, তবে তাঁকে অবশ্যই সংযত হতে হবে এবং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ব্যতীত সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত হতে হবে। তিনি যদি এমন সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, যারা কৃষ্ণচেতনাময় হবে, তা হলে তিনি শত শত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। কিন্তু সেই সামর্থ্য না থাকলে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সেই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

যজ্ঞ হচ্ছে আর একটি বিষয়, যা গৃহস্থদের অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ যজ্ঞ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। জীবনের অন্য আশ্রমগুলিতে, যেমন ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে মানুষের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ থাকে না। তাঁরা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। সুতরাং, বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদের কর্ম। তাদের উচিত অগ্নিহোত্র আদি যে সমস্ত যজ্ঞ করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, তার অনুষ্ঠান করা। কিন্তু আজকালকার যুগে এই ধরনের যজ্ঞ করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং কোন গৃহস্থের পক্ষে তা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এই যুগের জন্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ, অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-কীর্তন করাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কম খরচের যজ্ঞ। যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং তার সুফল লাভ করতে পারেন। সুতরাং দান, দম ও যজ্ঞ-এই তিনটি অনুষ্ঠান গৃহস্থের জন্য।

তারপর স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ 'ব্রহ্মহ্মচর্য' বা ছাত্র-জীবনের জন্য। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্রহ্মচারীদের কোন রকম সংস্রব থাকা উচিত নয়; কৌমার্য অবলম্বন করে দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের জীবন যাপন করা উচিত। তাকে বলা হয় স্বাধ্যায়।

তপঃ বা তপশ্চর্যা বিশেষ করে বানপ্রস্থ আশ্রমের জন্য। সারা জীবন গৃহস্থ-জীবনে থাকা উচিত নয়। মানুষের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, মানব-জীবনে চারটি আশ্রম আছে-ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে অবসর গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি একশ বছর বেঁচে থাকে, তা হলে তার উচিত পঁচিশ বছর ব্রহ্মাচারী-জীবনে, পঁচিশ বছর গৃহস্থ-জীবনে, পঁচিশ বছর বানপ্রস্থ-জীবনে এবং পঁচিশ বছর সন্ন্যাস

আশ্রমে অতিবাহিত করা। এগুলি হচ্ছে বৈদিক ধর্ম আচরণের নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ। বানপ্রস্থ আশ্রমে অবশ্যই দেহ, মন ও জিহ্বার তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে তপস্যা। সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্মপরায়ণ সমাজ তপস্যা করার জন্য। তপস্যা ছাড়া কোন মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তপস্যা করার কোন প্রয়োজন নেই, নিজের ইচ্ছামতো এক-একটি পথ বার করলেই সিদ্ধি লাভ করা যাবে-এই মতবাদ বৈদিক শাস্ত্রে কিংবা ভগবদ্গীতায় কোথাও অনুমোদন করা হয়নি। এই ধরনের মতবাদগুলি আবিষ্কার করেছে কতকগুলি ভণ্ড অধ্যাত্মবাদী, যারা কেবল লোক ঠকিয়ে দল ভারি করার ব্যাপারে ব্যস্ত। যদি বিধি-নিষেধ থাকে, নিয়মকানুন থাকে, তা হলে মানুষ আকৃষ্ট হবে না। তাই, ধর্মের নামে যারা শিষ্য বাড়াতে চায় কেবল লোক দেখানোর জন্য, তারা তাদের শিষ্যদের সংযত জীবন যাপন করার উপদেশ দেয় না এবং নিজেরাও সংযত জীবন যাপন করে না। কিন্তু বেদে সেই পন্থার অনুমোদন করা হয়নি।
ব্রাহ্মণের গুণ 'সরলতা' জীবনের কোন বিশেষ আশ্রমে মানুষদের অনুশীলনের জন্যই কেবল নয়, সকলেরই জন্য, তা সে ব্রহ্মচারী হোক, গৃহস্থ হোক, বানপ্রস্থী হোক অথবা সন্ন্যাসীই হোক না কেন। সকলেরই উচিত সরল জীবন যাপন করা।
অহিংসা অর্থ হচ্ছে কোন জীবের জীবনের ক্রমোন্নতি রোধ না করা। কারও এটি মনে করা উচিত নয় যে, দেহকে হত্যা করলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পশুহত্যা করলেও কোন ক্ষতি নেই। যথেষ্ট পরিমাণে শস্য, ফল এবং দুধ থাকা সত্ত্বেও এখনকার মানুষেরা পশুমাংস আহারে আসক্ত। পশুহত্যা করার কোনই প্রয়োজন নেই। এই নির্দেশ সকলেরই জন্য। যখন আর কোন বিকল্প উপায় থাকে না, তখন মানুষ পশুহত্যা করতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই পশুকে যজ্ঞের বলি হিসাবে নিবেদন করতে হয়। সে যাই হোক, মানুষের জন্য যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে, যারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে পশুহত্যা করা উচিত নয়। যথার্থ অহিংসা হচ্ছে কারওই জীবনের প্রগতি রোধ না করা। বিবর্তনের মাধ্যমে পশুরাও এক পশুদেহ থেকে অন্য পশুদেহে দেহান্তরিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। যদি কোনও এক বিশেষ পশুকে হত্যা করা হয়, তবে তার প্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। কোন পশুর যখন কোন নির্দিষ্ট শরীরে কোন নির্দিষ্ট কাল অবস্থানের মেয়াদ থাকে, তখন যদি তাকে অপরিণত অবস্থায় হত্যা করা হয়, তা হলে তাকে বাকি সময়টি পূর্ণ করে উন্নততর প্রজাতিতে উন্নীত হওয়ার জন্য আবার সেই শরীর প্রাপ্ত হতে হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তির জন্য ওদের প্রগতি রোধ করা উচিত নয়। একেই বলা হয় অহিংসা।
সত্যম্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্যের বিকৃত করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রে কতকগুলি অতি কঠিন অধ্যায় আছে। কিন্তু তার অর্থ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হবে সদ্গুরুর কাছ থেকে। বেদ উপলব্ধি করবার এটিই হচ্ছে পন্থা। শ্রুতির অর্থ হচ্ছে যে, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার কতকগুলি আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। মূল বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করেছে। ভগবদ্গীতার বহু ব্যাখ্যা আছে, যা ভগবদ্গীতার গীতার বাণীর যথার্থ অর্থ প্রকাশ করতে হবে এবং তা শিখতে হবে সদ্গুরুর কাছ থেকে।
অক্রোধ কথাটির অর্থ হচ্ছে ক্রোধ দমন করা। ক্রোধের উদ্রেক হলেও সহিষ্ণু হয়ে তা দমন করতে হবে, কারণ একবার ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর কলুষিত হয়ে যায়। ক্রোধ হচ্ছে রজোগুণ ও কামের পরিণতি। সুতরাং যিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষে ক্রোধ দমন করা অবশ্য কর্তব্য। অপৈশুনম্ অর্থ হচ্ছে অনর্থক অপরের দোষ দর্শন না করা অথবা তাদের সংশোধন করা থেকে বিরত থাকা। অবশ্য একটি চোরকে চোর বলা পরনিন্দা নয়, কিন্তু একজন সাধুকে চোর বলা মস্ত বড় অপরাধ, বিশেষ করে যিনি

পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁর পক্ষে। হ্রী অর্থ বিনয়ী হওয়া এবং কোন অবস্থাতেই কোন জঘন্য কর্ম না করা। অচাপলম্ কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন প্রচেষ্টাতেই উত্তেজিত বা নিরাশ না হওয়া। কোন কোন প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু সেই জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। ধৈর্য ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।
এখানে তেজ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষত্রিয়দের জন্য। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে দুর্বলকে রক্ষা করা। তাদের তথাকথিত অহিংসার নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। যদি হিংসার প্রয়োজন হয়, তা হলে তাদের তা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু শত্রুকে দমন করতে পারলে কোন কোন ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন করাও চলতে পারে। সামান্য দোষত্রুটি ক্ষমা করা যেতে পারে।
শৌচম্ অর্থ শুচিতা কেবল দেহ বা মনেরই নয়, আচরণেও মানুষকে শুচি হতে হবে। এটি বিশেষ করে বৈশ্যদের জন্য। তাদের কালোবাজারী করে অর্থ উপার্জন করা উচিত নয়।
নাতিমানিতা অর্থাৎ অভিমান শূন্যতা বা সম্মানের আকাঙ্ক্ষা না করা শূদ্রদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্বর্ণের সর্বনিম্ন। অনর্থক দম্ভ বা অভিমানে তাদের মত্ত হওয়া উচিত নয়, তাদের উচিত তাদের নিজস্ব স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। শূদ্রের কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য উচ্চতর বর্ণগুলিকে সম্মান প্রদর্শন করা।
যে ছাব্বিশটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সব কয়টিই হচ্ছে দিব্য গুণাবলী। বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে তাদের অনুশীলন করা উচিত। এর তাৎপর্য হচ্ছে, যদিও জড় জগতের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ, তবুও সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকদের যদি অনুশীলনের মাধ্যমে এই গুণগুলি অর্জন করার শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে সমস্ত সমাজ ধীরে ধীরে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৪

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ su

দম্ভঃ-দম্ভ; দর্পঃ-দর্প; অভিমান নিজেকে পূজ্যত্ব বুদ্ধি; চ-এবং; ক্রোধঃ -ক্রোধ; পারুষ্যম্-রূঢ়তা; এব-অবশ্যই; চ-এবং; অজ্ঞানম্-অজ্ঞান; চ-এবং: অভিজাতস্য-যার জন্ম হয়েছে তার; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; সম্পদম্-সম্পদ; আসুরীম্-আসুরী।

গীতার গান

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা।
সম্পদ আসুরী হয় যথা অজ্ঞানতা ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, রূঢ়তা ও অবিবেক-এই সমস্ত সম্পদ আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নরকে যাওয়ার প্রশস্ত রাজপথটির বর্ণনা করা হয়েছে। অসুরেরা মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি প্রদর্শন করতে চায়, যদিও তারা নিজেরা সেই সমস্ত নীতিগুলি অনুশীলন করে না। তারা সর্বদাই কোন বিশেষ ধরনের

শিক্ষা অথবা অত্যধিক সম্পদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তারা চায় যে, সকলেই তাদের পূজা করবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা সব সময় সকলের কাছ থেকে সম্মান দাবি করে, যদিও সম্মান পাবার কোন যোগ্যতাই তাদের নেই। খুব তুচ্ছ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং কঠোর স্বরে কথা বলে। তাদের মধ্যে কোন রকম নম্রতা নেই। তারা জানে না তাদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। তারা সকলেই তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে খামখেয়ালীর বশে কাজকর্ম করে এবং তারা কারও কর্তৃত্ব মানে না। এই সমস্ত আসুরিক গুণগুলি তারা মাতৃগর্ভে তাদের শরীর গঠনের সময়েই গ্রহণ করে থাকে এবং তারা যতই বড় হয়, এই সমস্ত অশুভ গুণগুলি ততই তাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে।

শ্লোক ৫

দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈবী-দিব্য; সম্পৎ-সম্পদ; বিমোক্ষায়-মুক্তির নিমিত্ত; নিবন্ধায়-বন্ধনের কারণ; আসুরী-আসুরিক সম্পদ; মতা-বিবেচিত হয়; মা করো না; শুচঃ-শোক; সম্পদম্-সম্পদ; দৈবীম্-দৈবী; অভিজাতঃ-জাত; অসি-হয়েছ; পাণ্ডব-হে পাণ্ডুপুত্র।

গীতার গান

দৈবী সম্পদ যে তার মুক্তির কারণ।
আসুরী সম্পদ হয় সংসার বন্ধন ॥
তোমার চিন্তার কথা নাহি হে পাণ্ডব।
দৈবী সম্পদে তোমার হয়েছে জনম ॥

অনুবাদ

দৈবী সম্পদ মুক্তির অনুকূল, আর আসুরিক সম্পদ বন্ধনের কারণ বলে বিবেচিত হয়। হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি শোক করো না, কেন না তুমি দৈবী সম্পদ সহ জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

আসুরিক গুণে যে অর্জুনের জন্ম হয়নি, সেই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এখানে উৎসাহিত করছেন। সেই যুদ্ধে তাঁর জড়িয়ে পড়ার কারণ আসুরিক ছিল না। কারণ, তিনি স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তিগুলির বিবেচনা করে দেখছিলেন। তিনি বিবেচনা করছিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো সম্মানীয় পুরুষদের হত্যা করা ঠিক হবে কি না। সুতরাং তিনি ক্রোধ, দম্ভ অথবা নিষ্ঠুরতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছিলেন না। তাই, তিনি আসুরিক গুণসম্পন্ন ছিলেন না। শত্রুর উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং তার এই কর্ম থেকে নিরস্ত হওয়াকে আসুরিক বলে মনে করা হবে। সুতরাং, অর্জুনের শোক করার কোনই কারণ ছিল না। যিনি জীবনের বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচরণ করেন, তিনি দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৬

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

দ্বৌ-দুই প্রকার; ভূতসর্গৌ-সৃষ্ট জীব; লোকে-সংসারে; অস্মিন্ এই; দৈবঃ -দৈব; আসুরঃ-আসুরিক; এব-অবশ্যই; চ-ও; দৈবঃ দৈব; বিস্তরশঃ-বিস্তারিতভাবে; প্রোক্তঃ-বলা হয়েছে; আসুরম্-আসুরিক; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; মে-আমার থেকে; শৃণু-শ্রবণ কর।

গীতার গান

হে ভারত, এ জগতে দুই ভূত সৃষ্টি।
এক দৈবী দ্বিতীয় সে আসুরী বা দৃষ্টি ॥
দৈবী যারা তার কথা অনেক হয়েছে।
শুন এবে কথা যারা অসুর জন্মেছে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুরিক এই দুই প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে। দৈব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এখন আমার থেকে অসুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অর্জুন যে দিব্যগুণে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসুরিক পন্থার বর্ণনা করছেন। এই জগতের বদ্ধ জীবদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাঁরা দিব্যগুণে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন, অর্থাৎ তাঁরা শাস্ত্র এবং সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের নির্দেশ মেনে চলেন। প্রামাণ্য শাস্ত্রের আলোকে কর্তব্য অনুষ্ঠান করা উচিত। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় দিব্য। যারা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুসরণ না করে তাদের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে, তাদের বলা হয় আসুরিক। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের প্রতি অনুগত হওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতা ও অসুর উভয়েরই জন্ম হয় প্রজাপতি থেকে। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, দেবতারা বৈদিক নির্দেশ মেনে চলেন এবং অসুরেরা তা মানে না।

শ্লোক ৭

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রবৃত্তি-ধর্মে প্রবৃত্তি; চ-ও; নিবৃত্তিম্-অধর্ম থেকে নিবৃত্তি; চ-এবং; জনাঃ -ব্যক্তিরা; ন-না; বিদুঃ-জানে; আসুরাঃ-অসুর স্বভাব-বিশিষ্ট; ন-নেই; শৌচম্-শৌচ; ন-নেই; অপি-ও; চ-এবং; আচারঃ-সদাচার; ন-নেই; সত্যম্-সত্যতা; তেষু তাদের মধ্যে; বিদ্যতে বিদ্যমান।

গীতার গান

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যাহা অসুর না জানে ।
শৌচাচার সত্য মিথ্যা নাহি তারা মানে ॥

অনুবাদ

অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার ও সত্যতা বিদ্যমান নেই।

তাৎপর্য

প্রতিটি সভ্য মানব-সমাজে কতকগুলি শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন আছে, যেগুলি প্রথম থেকেই মেনে চলা হয়। বিশেষ করে আর্যদের, যারা বৈদিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে এবং যারা সভ্য মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে যারা শাস্ত্রের নির্দেশ মানে না, তাদের অসুর বলে গণ্য করা হয়। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে, অসুরেরা শাস্ত্রের বিধান জানে না এবং তাদের মধ্যে কেউ যদি তা জেনেও থাকে, সেগুলি অনুসরণ করবার কোন প্রবৃত্তি তাদের নেই। ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই, আর বেদের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করবার কোন ইচ্ছাও তাদের নেই। অসুরেরা অন্তরে ও বাইরে শুদ্ধ নয়। স্নান করে, দাঁত মেজে, কাপড় পরিবর্তন করে ইত্যাদি শৌচ পন্থায় দেহকে পরিষ্কার রাখার জন্য সর্বদাই যত্নশীল হওয়া উচিত। অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্বদাই ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করা উচিত এবং হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। হরে রাম বাইরের ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার এই সমস্ত নিয়মগুলি অনুসরণ করার কোন প্রবৃত্তি অসুরদের নেই।
মানুষের আচরণ যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য অনেক নিয়ম ও বিধান আছে, যেমন মনুসংহিতা হচ্ছে মনুষ্য-জাতির আইন শাস্ত্র। এমন কি আজও পর্যন্ত হিন্দুরা মনুসংহিতা অনুসরণ করে। উত্তরাধিকারের আইন ও অন্য অনেক আইন এই গ্রন্থ থেকে নিরূপণ করা হয়েছে। মনুসংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের ক্রীতদাসীর মতো রাখতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে তারা শিশুর মতো। শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের ক্রীতদাসের মতো রাখা হয়। অসুরেরা এই সমস্ত নির্দেশগুলি এখন অবহেলা করছে এবং তারা মনে করছে যে, পুরুষদের মতো নারীদেরও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সে যাই হোক, নারীদের এই স্বাধীনতা পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। শৈশবে তাদের পিতা-মাতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত সন্তানদের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। মনুসংহিতার নির্দেশ অনুসারে এটিই হচ্ছে যথার্থ সামাজিক আচরণ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কৃত্রিমভাবে নারী জীবনের ধারণাকে গর্বস্ফীত করবার উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই আজকের মানব-সমাজে বিবাহ-ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আধুনিক যুগের নারীদের নৈতিক চরিত্রও অত্যন্ত অধঃপতিত হয়েছে। সুতরাং, অসুরেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত নির্দেশ তা গ্রহণ করে না এবং যেহেতু তারা মহর্ষিদের অভিজ্ঞতা এবং মুনি-ঋষিদের প্রদত্ত আইন-কানুনগুলি মেনে চলে না, তাই আসুরিক-ভাবাপন্ন মানুষদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

শ্লোক ৮

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮॥

অসত্যম্-মিথ্যা; অপ্রতিষ্ঠম্-অবলম্বনশূন্য; তে-তারা; জগৎ-জগৎ; আহুঃ-বলে; অনীশ্বরম্ ঈশ্বরশূন্য, অপরস্পর পরস্পরের কাম থেকে; সম্ভূতম্-উৎপন্ন; কিমন্যৎ-অন্য কোন কারণ নেই; কামহৈতুকম্-কেবল কামের জন্য।

গীতার গান

অসুর যে লোক তারা না মানে ঈশ্বর।
জগতের বিধাতা যিনি অস্বীকার তার ॥
সৃষ্টির কারণ সেই অনীশ্বরবাদী।
জড় কার্যকারণ সে কামুক বিবাদী !!

অনুবাদ

আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে যে, এই জগৎ মিথ্যা, অবলম্বনহীন ও ঈশ্বরশূন্য। কামবশত এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং কাম ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে যে, এই জগৎটি অলীক, এর পিছনে কোনও কার্য-কারণ নেই, এর কোন নিয়ন্তা নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই-সব কিছুই মিথ্যা। তারা বলে যে, ঘটনাচক্রে জড় পদার্থের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তারা তা মনে করে না। তাদের নিজেদের মনগড়া কতকগুলি মতবাদ আছে-এই জগৎ আপনা হতেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এর পেছনে যে ভগবান রয়েছেন, সেটি বিশ্বাস করার কোন কারণই নেই। তাদের কাছে চেতন ও জড়ের কোন পার্থক্য নেই এবং তারা পরম চেতনকে স্বীকার করে না। তাদের কাছে সবই কেবল জড় এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে একটি অজ্ঞানতার পিণ্ড। তাদের মত অনুসারে সব কিছুই শূন্য এবং যা কিছুরই অস্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায়, তা কেবল আমাদের উপলব্ধির ভ্রম। তারা স্থির নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে যে, বৈচিত্র্যময় সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে অজ্ঞানতা জনিত ভ্রম, ঠিক যেমন স্বপ্নে আমরা অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারি, প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন অস্তিত্ব নেই। তারপর যখন আমরা জেগে উঠব, তখন আমরা দেখতে পাব যে, সব কিছুই কেবল একটি স্বপ্নমাত্র। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, অসুরেরা যদিও বলে যে, জীবন একটি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু স্বপ্নটি উপভোগ করার ব্যাপারে তারা খুব দক্ষ। তাই, জ্ঞান আহরণ করার পরিবর্তে তারা এই স্বপ্নরাজ্যে আরও বেশি জড়িয়ে পড়ে। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের ফলে যেমন একটি শিশুর জন্ম হয়, এই পৃথিবীরও কোন আত্মা ছাড়াই জন্ম হয়েছে। তাদের মতে, কেবলমাত্র জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলেই জীবসকলের উদ্ভব হয়েছে এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যেমন, দেহের ঘাম থেকে এবং মৃতদেহ থেকে কোন কারণ ছাড়াই অনেক প্রাণী বেরিয়ে আসে, তেমনই সমস্ত জগৎ এসেছে মহাজাগতিক প্রকাশের জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে। তাই জড়া প্রকৃতিই এই প্রকাশের কারণ এবং এ ছাড়া অন্য আর কোন কারণ নেই। তারা ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। "আমার অধ্যক্ষতায় সমস্ত জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।" পক্ষান্তরে বলা যায়, অসুরদের জড় জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নেই। তাদের সকলেরই নিজের নিজের' একটি মতবাদ আছে। তাদের মতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাদের মনগড়া মতবাদের মতোই একটি মতবাদ মাত্র। শাস্ত্রের নির্দেশ যে প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত, তারা তা বিশ্বাস করে না।

শ্লোক ৯

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবব্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥৯ ॥

এতাম্-এই প্রকার; দৃষ্টিম্-সিদ্ধান্ত; অবষ্টভ্য-অবলম্বন করে; নষ্টাত্মানঃ-আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন; অল্পবুদ্ধয়ঃ-অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন; প্রভবন্তি-প্রভাব বিস্তার করে; উগ্রকর্মাণঃ-উগ্রকর্মা; ক্ষয়ায় ধ্বংসের জন্য; জগতঃ-জগতের; অহিতাঃ-অনিষ্টকারী অসুরেরা।

গীতার গান

এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি লয়ে অসুরের গণ।
আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন অল্পবুদ্ধি হন ॥
উগ্র কর্মে উৎসাহ তার জগৎ অহিত।
ক্ষয়কার্যে পটু তারা হয় প্রভাবিত ॥

অনুবাদ

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন, অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, উগ্রকর্মা ও অনিষ্টকারী অসুরেরা জগৎ ধ্বংসকারী কার্যে প্রভাব বিস্তার করে।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা যে ধরনের কাজকর্মে নিযুক্ত, তা পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। ভগবান এখানে বলেছেন যে, তারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন। জড়বাদীরা, যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই, তারা মনে করে যে, তারা উন্নত। কিন্তু ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে তারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সব রকমের কাণ্ডজ্ঞানহীন। তারা চরমভাবে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চেষ্টা করে। তাই, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সর্বদাই কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। এই ধরনের জড় আবিষ্কারগুলিকে মানব-সভ্যতার উন্নতি বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে মানুষেরা আরও বেশি নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে উঠছে, পশুর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে এবং অন্য মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। পরস্পরের মধ্যে কি রকম আচরণ করা উচিত, তার কোন ধারণাই তাদের নেই। আসুরিক মানুষদের মধ্যে পশুহত্যার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। এই ধরনের মানুষকে পৃথিবীর শত্রু বলে গণ্য করা হয়, কারণ অবশেষে একদিন তারা এমন একটা কিছু তৈরি করবে বা আবিষ্কার করবে, যা সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করবে। পরোক্ষভাবে, এই শ্লোকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের আভাস দেওয়া হচ্ছে, যে সম্বন্ধে আজ সারা জগৎ গর্বিত। যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে এবং তখন এই সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রগুলি ব্যাপক ধ্বংস সাধন করবে। এই প্রকার জিনিস সৃষ্টি হয়েছে কেবলমাত্র জগৎকে ধ্বংস করবার জন্য এবং এখানে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নাস্তিকতার প্রভাবে মানব-সমাজে যে ধরনের অস্ত্রগুলি আবিষ্কার করা হচ্ছে, সেগুলি জগতের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নয়।

শ্লোক ১০

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেংশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

কামম্-কামকে; আশ্রিত্য-আশ্রয় করে; দুষ্পূরম্-দুস্পূরণীয়; দম্ভ-দণ্ড; মান-মান; মদান্বিতাঃ-মদমত্ত হয়ে; মোহাৎ- মোহবশত; গৃহীত্বা-গ্রহণ করে; অসৎ-অনিত্য; গ্রাহান্- বিষয়ে; প্রবর্তন্তে-প্রবৃত্ত হয়; অশুচি-অশুচি কার্যে; ব্রতাঃ-ব্রতী হয়।

গীতার গান

দুপূর আশ্রয় কাম দম্ভ মদান্বিত।
মোহগ্রস্ত অসদগ্রাহ অশুচিব্রত ॥

অনুবাদ

সেই আসুরিক ব্যক্তিগণ দুষ্করণীয় কামকে আশ্রয় করে দম্ভ, মান ও মদমত্ত হয়ে অশুচি কার্যে ব্রতী হয় এবং মোহবশত অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে আসুরিক মনোবৃত্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অসুরদের কাম কখনও তৃপ্ত হয় না। তাদের জাগতিক সুখভোগের তৃপ্তিহীন বাসনা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে। যদিও অনিত্য বস্তু গ্রহণ করার ফলে তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, তবুও মোহের বশে তারা এই ধরনের কাজকর্মে প্রতিনিয়তই নিযুক্ত থাকে। তাদের কোন রকম জ্ঞান নেই এবং তারা বুঝতে পারে না যে, তারা ভুল পথে এগিয়ে চলেছে। অনিত্য বস্তুকে গ্রহণ করার ফলে এই ধরনের আসুরিক মানুষেরা তাদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে, তাদের মনগড়া মন্ত্র তৈরি করে এবং তা কীর্তন করে। তার ফলে তারা জড় জগতের দুটি বস্তুর প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট হতে থাকে-যৌন সুখভোগ এবং জড় সম্পদ সঞ্চয়। অশুচিব্রতাঃ কথাটি এই সূত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরনের আসুরিক মানুষেরা কেবল মদ, স্ত্রীলোক, মাংসাহার ও জুয়াখেলার প্রতি আসক্ত। সেগুলি হচ্ছে তাদের অভ্যাস। দম্ভ ও ভ্রান্ত সম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা কতকগুলি ধর্মনীতি তৈরি করে, যা বৈদিক অনুশাসনের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। যদিও এই ধরনের আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্য শ্রেণীর জীব, তবুও কৃত্রিম উপায়ে এই জগৎ তাদের জন্য মিথ্যা সম্মান তৈরি করেছে। যদিও তারা নরকের দিকে এগিয়ে চলেছে, তবুও তারা নিজেদের খুব উন্নত বলে মনে করে।

শ্লোক ১১-১২

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

চিন্তাম্-দুশ্চিন্তা; অপরিমেয়াম্-অপরিমেয়; চ-এবং; প্রলয়ান্তাম্-মৃত্যুকাল পর্যন্ত; উপাশ্রিতাঃ-আশ্রয় করে; কামোপভোগ-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে; পরমাঃ-জীবনের পরম উদ্দেশ্য; এতাবৎ ইতি-এভাবে; নিশ্চিতাঃ-নিশ্চয় করে; আশাপাশ-আশারূপ রজ্জুর দ্বারা; শতৈঃ-শত শত; বদ্ধাঃ-আবদ্ধ হয়ে; কাম-কাম; ক্রোধ-ক্রোধ; পরায়ণাঃ-পরায়ণ হয়ে; ঈহন্তে-চেষ্টা করে; কাম-কাম; ভোগ-উপভোগের; অর্থম্-উদ্দেশ্যে; অন্যায়েন-অসৎ উপায়ে, অর্থ-ধন-সম্পদ; সঞ্চয়ান্-সঞ্চয়ের।

গীতার গান

অপরেয় চিন্তা তার যতদিন বাঁচে।
কামমাত্র উপভোগ হৃদয়েতে আছে ॥
শত শত আশা পাশ শুধু কাম ক্রোধ।

কামভোগ লাগি অর্থ অন্য সে বিরোধ ॥
অন্যায় সে করে নিত্য সঞ্চয়েতে।
চিত্ত তার নিত্য বিদ্ধ অসৎ কার্যেতে ॥

অনুবাদ

অপরিমেয় দুশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই তারা তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এভাবেই শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হয়ে এবং কাম ও ক্রোধ-পরায়ণ হয়ে তারা কাম উপভোগের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

অসুরেরা মনে করে যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করাই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারা এই ভাবধারা পোষণ করে চলে। তারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না এবং কর্ম অনুসারে জীব যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের শরীর প্রাপ্ত হয়, তাও তারা বিশ্বাস করে না। জীবন সম্বন্ধে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা কখনও শেষ হয় না। তারা একটির পর একটি পরিকল্পনা করে চলে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণ হয় না। এই রকম একজন মানুষের সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, যিনি মৃত্যুর সময়ে ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর আয়ু আরও চার বছর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ তাঁর পরিকল্পনাগুলি তখনও পূর্ণ হয়নি। এই ধরনের মূর্খ লোকেরা জানে না যে, ডাক্তার এমন কি এক মুহূর্তের জন্যও কারও আয়ু বর্ধিত করতে পারে না। মৃত্যুর পরোয়ানা যখন আসে, তখন মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনও বিবেচনাই করা হয় না। প্রকৃতির আইন দৈব-নির্ধারিত সময়ের বেশি আর এক মুহূর্ত সময়ও মঞ্জুর করে না।

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা, যাদের ভগবান বা অন্তর্যামী পরমাত্মার উপর কোন বিশ্বাস নেই, তারা কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সব রকমের পাপকর্ম করে চলে। তারা জানে না যে, তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সাক্ষীরূপে একজন বসে আছেন। জীবাত্মার সমস্ত কাজকর্ম পরমাত্মা নিরীক্ষণ করছেন। উপনিষদে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে-একটি গাছে দুটি পাখি বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন সেই গাছের ফলগুলি ভোগ করে এবং অন্যজন তার সমস্ত কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে চলে। কিন্তু যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তাদের বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই এবং সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস নেই। তাই তারা পরিণামের বিবেচনা না করে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে কোনও কাজ করতে প্রস্তুত থাকে।

শ্লোক ১৩-১৬

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্ত্রীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেংশুচৌ ॥ ১৬ ॥

ইদম্-এই; অদ্য-আজ; ময়া-আমার দ্বারা; লব্ধম্ লাভ হয়েছে; ইমম্-এই; প্রাপ্স্যে-লাভ করব; মনোরথম্-আমার মনোভীষ্ট অনুসারে; ইদম্-এই; অস্তি-আছে; ইদম্-এই; অপি-ও; মে-আমার; ভবিষ্যতি হবে; পুনঃ-পুনরায়; ধনম্-সম্পদ; অসৌ-ঐ; ময়া-আমার দ্বারা; হতঃ-নিহত হয়েছে; শত্রুঃ-শত্রু; হনিষ্যে-আমি হত্যা করব; চ-ও; অপরান্-অন্যদের; অপি-অবশ্যই; ঈশ্বরঃ-প্রভু; অহম্-আমি; অহম্-আমি; ভোগী-ভোক্তা; সিদ্ধঃ-সিদ্ধ; অহম্-আমি; বলবান্ শক্তিশালী; সুখী-সুখী; আঢ্যঃ-ধনবান; অভিজনবান্ অভিজাত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত; অস্মি-হই; কঃ-কে; অন্যঃ-অন্য; অস্তি-আছে; সদৃশঃ-মতো; ময়া-আমার; যক্ষ্যে-যজ্ঞ করব; দাস্যামি-দান করব। মোদিষ্যে-আনন্দ করব; ইতি-এভাবে; অজ্ঞান-অজ্ঞান দ্বারা; বিমোহিতাঃ-বিমোহিত হয়; অনেক বহু প্রকার; চিত্তবিভ্রান্তাঃ-দুশ্চিন্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, মোহ-মোহ; জাল-জালের দ্বারা; সমাবৃতাঃ-বিজড়িত হয়ে; প্রসক্তাঃ-আসক্ত চিত্ত সেই ব্যক্তিরা; কাম-কাম; ভোগেষু-ভোগে; পতন্তি-পতিত হয়, নরকে-নরকে; অশুচৌ-অশুচি।

গীতার গান

অদ্য এই অর্থলাভ মনোরথ সিদ্ধি।
পুনর্বার ভবিষ্যতে হবে অর্থ বৃদ্ধি ॥
সে শত্রু মরিল অন্য নিশ্চয় মারিব।
আমি সে ঈশ্বর ধনী সে কার্য সাধিব ॥
আমি ভোগী সিদ্ধ আর বলবান সুখী ।
মম সম কেহ নহে আর সব দুঃখী ॥
আমি অভিজনবান আমি ধনআঢ্য।
আমার সমান হবে কার কিবা সাধ্য ॥
আমি সে করিব যজ্ঞ আমি দান দিব।
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া আমি আনন্দ পাইব ॥
অজ্ঞান মোহিত হয়ে কত কথা বলে।
মোহজাল সমাবৃত কালের কবলে ॥
আসলেতে কামাসক্ত নরকের যাত্রী।
অশুচি নরকে বাস নরক বিধাতৃ ॥

অনুবাদ

অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা মনে করে- "আজ আমার দ্বারা এত লাভ হয়েছে এবং আমার পরিকল্পনা অনুসারে আরও লাভ হবে। এখন আমার এত ধন আছে এবং ভবিষ্যতে আরও ধন লাভ হবে। ঐ শত্রু আমার দ্বারা নিহত হয়েছে এবং অন্যান্য শত্রুদেরও আমি হত্যা করব। আমিই ঈশ্বর, আমি ভোক্তা। আমিই সিদ্ধ, বলবান ও সুখী। আমি সবচেয়ে ধনবান এবং অভিজাত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত। আমার মতো আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব, দান করব এবং আনন্দ করব।" এভাবেই অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হয়। নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং মোহজালে বিজড়িত হয়ে কামভোগে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিরা অশুচি নরকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের ধন-সম্পদ আহরণ করার বাসনার কোন অন্ত নেই। তা অসীম। তারা কেবল চিন্তা করে কি পরিমাণ অর্থ তার এখন আছে এবং সেই অর্থকে আরও বাড়াবার জন্য নানা রকম বিনিয়োগের পরিকল্পনা করে। সেই উদ্দেশ্যে যে কোন রকম পাপকর্ম করতে তারা দ্বিধা করে না এবং তাই তারা কালোবাজারী আদি অবৈধ কাজকর্মে লিপ্ত হয়। তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ, গৃহ, জায়গা-জমি, পরিবার আদি সমস্ত

সম্পদের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে থাকে এবং তারা সর্বদাই পরিকল্পনা করে কিভাবে সেগুলির আরও উন্নতি সাধন করা যায়। তারা তাদের নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের উপরে আস্থাবান এবং তারা জানে না যে, যা কিছু তারা লাভ করছে, তা সবই তাদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল মাত্র। এই ধরনের সমস্ত ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ তারা পায়। কিন্তু তার কারণ যে তাদের পূর্বকৃত কর্ম, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা মনে করে যে, তাদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য তারা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর আস্থাবান। তারা কর্মফলে বিশ্বাস করে না। মানুষ তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে অথবা ধনবান হয়, অথবা উচ্চ শিক্ষিত হয় কিংবা রূপবান হয়। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ মনে করে যে, সমস্তই ঘটনাচক্রে এবং তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে ঘটে চলেছে। বিভিন্ন রকমের মানুষের রূপ, গুণ, শিক্ষা আদির পেছনে যে এক অতি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা রয়েছে, তা তারা অনুভব করতে পারে না। কেউ যদি এই সমস্ত আসুরিক মানুষদের প্রতিযোগী হয়, তা হলে তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ অসংখ্য এবং তারা সকলেই একে অপরের শত্রু। এই শত্রুতা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে-প্রথমে ব্যক্তিগত, তারপর পরিবারে পরিবারে, তারপর সমাজে, অবশেষে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের। তাই, জগৎ জুড়ে সর্বদাই বিবাদ, যুদ্ধ ও শত্রুতা লেগেই রয়েছে। প্রতিটি আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষই মনে করে যে, অন্য সকলকে বলি দিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে। সাধারণত আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা নিজেদের পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে এবং আসুরিক প্রচারকেরা তাদের অনুগামীদের বলে-"তোমরা ভগবানকে খুঁজছ কেন? তোমরা সকলেই ভগবান! তোমাদের যা ইচ্ছা, তাই তোমরা করতে পার। ভগবানকে বিশ্বাস করো না। ভগবানকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। ভগবান মরে গেছে।" এগুলি হচ্ছে আসুরিক প্রচার।
আসুরিক মানুষ যদিও দেখতে পায় যে, অন্যেরা তারই মতো বা তার থেকে অধিক বিত্তবান বা ক্ষমতাবান, তবুও সে মনে করে যে, কেউই তার থেকে অধিক ধনবান বা ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। উচ্চতর গ্রহলোকে যাবার জন্য যজ্ঞ করার যে প্রয়োজন, তা তারা বিশ্বাস করে না। অসুরেরা মনে করে যে, তারা তাদের নিজেদের মনগড়া যজ্ঞবিধি তৈরি করবে এবং কোন রকম যন্ত্র আবিষ্কার করবে, যার দ্বারা তারা যে কোন উচ্চতর গ্রহলোকে যেতে পারবে। এই ধরনের অসুরদের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাবণ। সে তার অনুগত জনদের বুঝিয়ে ছিল যে, স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাদের সে একটি সিঁড়ি তৈরি করে দেবে-যাতে কোন রকম বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান না করেই যে কেউ তাতে চড়ে স্বর্গলোকে যেতে পারবে। তেমনই, আধুনিক যুগের আসুরিক মানুষেরা যান্ত্রিক উপায়ে উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এগুলি হচ্ছে ভ্রান্তির নিদর্শন। তার ফলে তারা তাদের অজান্তেই নরকের দিকে অধঃপতিত হচ্ছে। এখানে মোহজাল কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জালে যেমন মাছ ধরা হয়, এই মোহরূপ জালে জীবেরা তেমন আবদ্ধ হয়ে আছে এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১৭

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ- আত্মাভিমানী; স্তব্ধাঃ- অনম্র; ধনমান-ধন ও মানে; মদান্বিতাঃ - মদমত্ত; যজন্তে-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে; নাম- নামমাত্র; যজ্ঞৈঃ-যজ্ঞের দ্বারা; তে-তারা; দম্ভেন-দম্ভ সহকারে; অবিধিপূর্বকম্-শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে।

গীতার গান

আত্ম-সম্ভাবিত মান ধনেতে অনম্র।
মদান্বিত অসুর সে সর্বদা বিনম্র ॥
নামমাত্র যজ্ঞ করে শাস্ত্রে বিধি নাই।
দম্ভমাত্র আছে সার কেবল বড়াই ॥

অনুবাদ

সেই আত্মাভিমানী, অনম্র এবং ধন ও মানে মদান্বিত ব্যক্তিরা অবিধিপূর্বক দম্ভসহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

তাৎপর্য

নিজেদের সর্বেসর্বা বলে মনে করে এবং কোন রকম অধ্যক্ষতা অথবা প্রামাণ্য শাস্ত্রের পরোয়া না করে অসুরেরা তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠান বা যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠান করে থাকে। যেহেতু তারা নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক সূত্র বিশ্বাস করে না, তাই তারা অত্যন্ত উদ্ধত। তার কারণ হচ্ছে সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা মোহাচ্ছন্ন। কখনও কখনও এই ধরনের অসুরেরা ধর্মপ্রচারক সেজে জনসাধারণকে বিপথগামী করে এবং ধর্ম সংস্কারক বা ভগবানের অবতার রূপে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করে। তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ভান করে, অথবা দেব-দেবীর পূজা করে, অথবা নিজেদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে। সাধারণ লোক তাদের ভগবান বলে মনে করে তাদের পূজা করে। মূর্খ লোকেরা তাদের ধর্মজ্ঞ বা দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন বলে মনে করে। তারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে সব রকম অপকর্মে লিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাদের প্রতি নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ রয়েছে। অসুরেরা কিন্তু এই সমস্ত বিধি-নিষেধের ধার ধারে না। তাদের মতে কোন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করার দরকার নেই। যার যার নিজের মত অনুযায়ী এক-একটি পথ বার করে নিলে চলে। অবিধিপূর্বকম্ অর্থাৎ কোন বিধি-নিষেধের পরোয়া না করা কথাটির উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞতা ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই এগুলি হয়।

শ্লোক ১৮

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কারম্-অহঙ্কার; বলম্-বল; দর্পম্-দর্প; কামম্ কাম; ক্রোধম্ ক্রোধকে; চ-ও; সংশ্রিতাঃ- আশ্রয় করে; মাম্-আমাকে; আত্ম-স্বীয়; পর-অন্যের; দেহেবু- দেহে অবস্থিত; প্রদ্বিযন্তঃ- বিদ্বেষ করে; অভ্যসূয়কাঃ- সাধুদের গুণেতে দোষারোপ করে।

গীতার গান

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধাশ্রয়।
আমার সম্পর্কে দেহে দ্বেষ সে করয় ॥

অসূয়ার বশে চিন্তা স্বপর অপরে।
সাধুর গুণেতে দোষ কিংবা নিন্দা করে ॥

অনুবাদ

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করে অসুরেরা স্বীয় দেহে ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদের গুণেতে দোষারোপ করে।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সর্বদাই ভগবানের মহত্ত্বের বিরোধিতা করে এবং তাই তারা শাস্ত্রের নির্দেশ বিশ্বাস করতে চায় না। তারা শাস্ত্র ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান, উভয়েরই প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের তথাকথিত জড় প্রতিষ্ঠা, তাদের সঞ্চিত সম্পদ, তাদের শক্তিসামর্থ্য, এগুলিই হচ্ছে তাদের এই মনোভাবের কারণ। তারা জানে না যে, তাদের এই জীবনটি হচ্ছে তাদের পরবর্তী জীবনকে গড়ে তোলার একটি মহান সুযোগ। সেটি না জেনে তারা অন্য সকলের প্রতি এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেরও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সে অপরের শরীরের প্রতি হিংস্র আচরণ করে এবং তাদের নিজের শরীরেও হিংস্র আচরণ করে। তারা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের পরোয়া করে না, কারণ তাদের কোন জ্ঞানই নেই। শাস্ত্র বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্য নানা রকম কপট প্রমাণের অবতারণা করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ খণ্ডন করার চেষ্টা করে। তারা মনে করে যে, সব রকম কর্ম করার শক্তি ও স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তারা মনে করে যে, যেহেতু শক্তি, সামর্থ্য অথবা বিত্তে কেউই তাদের সমকক্ষ নয়, তাই তারা যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে, কেউই তাকে বাধা দিতে পারবে না। তাদের কোন শত্রু যদি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কার্যকলাপে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তখন তারা তাকে সমূলে বিনাশ করার পরিকল্পনা করে।

শ্লোক ১৯

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

তান্-তাদের; অহম্-আমি; দ্বিষতঃ-বিদ্বেষী; ক্রুরান্-ক্রুর; সংসারেষু-ভবসমুদ্রে; নরাধমান্ নরাধমদের; ক্ষিপামি- নিক্ষেপ করি; অজস্রম্-অনবরত; অশুভান্-অশুভ; আসুরীযু- আসুরী; এব- অবশ্যই; যোনিযু-যোনিতে।

গীতার গান

সেই সে বিদ্বেষী ক্রুর নরাধমগণে।
নিত্য সে ক্ষেপণ করি সংসার গহনে ॥

অনুবাদ

সেই বিদ্বেষী, ক্রুর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রভাবেই জীবাত্মা কোন বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। আসুরিক মানুষেরা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার করে যথেচ্ছাচার করতে পারে। কিন্তু তাদের পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হবে পরম পুরুষোত্তম

ভগবানেরই ইচ্ছা অনুসারে-তাদের নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কোন বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উচ্চতর শক্তির তত্ত্বাবধানে মাতৃজঠরে স্থাপিত হয়। তাই জড় জগতে আমরা পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ আদি নানা রকমের প্রজাতির প্রকাশ দেখতে পাই। এদের প্রকাশ হয়েছে উচ্চতর শক্তির প্রভাবে। ঘটনাচক্রে এদের উদ্ভব হয়নি। অসুরদের সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, তারা বারবার অসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই তারা চিরকাল ঈর্ষাপরায়ণ নরাধমরূপে থাকে। এই ধরনের আসুরিক জীবন সর্বদাই কামার্ত, সর্বদাই অত্যাচারী ও কুৎসিত এবং সর্বদাই অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারা ঠিক জঙ্গলের শিকারীদের মতো আসুরিক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ২০

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

আসুরীম্-আসুরী; যোনিম্ যোনি; আপন্নাঃ-লাভ করে; মূঢ়াঃ- সেই মূঢ়গণ; জন্মনি জন্মনি-জন্মে জন্মে; মাম্-আমাকে; অপ্রাপ্য না পেয়ে; এব-অবশ্যই; কৌন্তেয়- হে কুন্তীপুত্র; ততঃ-তার থেকে; যান্তি-প্রাপ্ত হয়; অধমাম্-অধম, গতিম্-গতি।

গীতার গান

অসুর যোনিতে হয় জনম মরণ।
অজস্র অশুভ তার জীবন যাপন।
অসুরের ঘরে মূঢ় জনমে জনমে।
আমাকে ভুলিয়া দুঃখী মরমে মরমে ।
ক্রমে ক্রমে পায় সেই অধমা যে গতি।
অক্ষম আমাকে পেতে যেহেতু কুমতি ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সকলেই জানে যে, ভগবান হচ্ছেন পরম করুণাময়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভগবান অসুরদের প্রতি কখনই করুণাময় নন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা জন্ম-জন্মান্তরে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হতে হতে অবশেষে কুকুর, বেড়াল ও শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের অসুরদের পরবর্তী কোন জীবনেই ভগবানের কৃপা লাভ করার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বেদেও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মানুষেরা ক্রমান্বয়ে নিমজ্জিত হতে হতে অবশেষে কুকুর ও শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়। এখন এই সম্বন্ধে বিতর্কের উত্থাপন করে কেউ বলতে পারে যে, ভগবান 'যদি এই সমস্ত অসুরদের প্রতি কৃপা-পরায়ণ না হন, তা হলে তাঁকে কৃপাময় বলে জাহির করা উচিত নয়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বেদান্তসূত্রে উল্লেখ আছে, পরমেশ্বর ভগবান কাউকেই ঘৃণা করেন না। অসুরদের যে

সবচেয়ে অধঃপতিত জীবন দান করেন, তাও তাঁর কৃপারই এক রকম প্রকাশ। কখন কখন অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়, কিন্তু এভাবেই ভগবানের হাতে নিহত হওয়াও তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ, বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের হাতে মৃত্যু হলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয়। ইতিহাসে রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু আদি বহু অসুরের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে-তাদের হত্যা করবার জন্য ভগবান নানারূপে অবতরণ করেছেন। সুতরাং, ভগবানের কৃপা অসুরদের উপরেও বর্ষিত হয় যদি তারা ভগবানের হাতে নিহত হবার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

শ্লোক ২১

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

ত্রিবিধম্- তিনটি; নরকস্য- নরকের; ইদম্-এই; দ্বারম্ দ্বার; নাশনম্-নাশকারী; আত্মনঃ- আত্মার; কামঃ- কাম; ক্রোধঃ- ক্রোধ; তথা-ও; লোভঃ - লোভ; তস্মাৎ- অতএব; এতৎ- এই; ত্রয়ম্-তিনটি; ত্যজেৎ- পরিত্যাগ করবে।

গীতার গান

সেই কাম, ক্রোধ, লোভ, নরকের দ্বার।
ত্যজ তাহা নয় তিন সাধু ব্যবহার ॥

অনুবাদ

কাম, ক্রোধ ও লোভ-এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব ঐ তিনটি পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

এখানে আসুরিক জীবনের কিভাবে শুরু হয়, তার বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ কাম উপভোগ করবার চেষ্টা করে এবং তার অতৃপ্তিতে তার চিত্তে ক্রোধ ও লোভের উদয় হয়। সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন যে মানুষ আসুরিক জীবনে অধঃপতিত হতে না চায়, তাকে অবশ্যই এই তিনটি শত্রুর সঙ্গ বর্জন করতে হবে। এই তিনটি শত্রু আত্মাকে এমনভাবে হত্যা করে, যার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

শ্লোক ২২

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

এতৈঃ-এই; বিমুক্তঃ- মুক্ত হয়ে; কৌন্তেয়- হে কুন্তীপুত্র; তমোদ্বারৈঃ-তমোময় দ্বার থেকে, ত্রিভিঃ-তিন প্রকার; নরঃ- মানুষ; আচরিত- আচরণ করেন; আত্মনঃ- আত্মার; শ্রেয়ঃ- মঙ্গল; ততঃ- অনন্তর; যাতি লাভ করেন; পরাম্-পরম; গতিম্-গতি।

গীতার গান

এই তিনে মুক্ত যারা শুন হে কৌন্তেয়।
তমোগুণের দ্বার সেই অতিশয় হেয় ।

তবে সে আচরি ধর্ম নিজ শ্রেয়স্কর।
পরাগত লাভ করে মম ভক্তি পর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! এই তিন প্রকার তমোদ্বার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ আত্মার শ্রেয় আচরণ করেন এবং তার ফলে পরাগতি লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

মানব জীবনের তিনটি শত্রু কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মানুষ যতই মুক্ত হয়, তার জীবন ততই নির্মল হয়। তখন সে বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে সক্ষম হয়। মানব-জীবনের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই প্রকার অনুশীলনের ফলে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, তা হলে তার সাফল্য অনিবার্য। বৈদিক শাস্ত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমন্বিত যথাযথ কর্ম আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষকে নির্মল জীবনের স্তরে উন্নীত করবার জন্য। সেই সমগ্র পন্থাটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করার উপর। এই পন্থায় জ্ঞান অনুশীলন করার ফলে আত্ম-উপলব্ধির চরম স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে এই আত্ম-উপলব্ধির পূর্ণতা লাভ হয়। এই ভক্তিযোগে বদ্ধ জীবের মুক্তি অনিবার্য। তাই, বৈদিক প্রথায় চারটি বর্ণ ও জীবনের চারটি আশ্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হয় দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম। সমাজে বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান নির্দিষ্ট হয়েছে এবং কেউ যদি যথাযথভাবে সেগুলি আচরণ করে, তা হলে আপনা থেকেই সে অধ্যাত্ম উপলব্ধির চরম স্তরে উন্নীত হতে পারবে। তখন সে নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৩

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
নস সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

যঃ- যে; শাস্ত্রবিধিম্-শাস্ত্রবিধি; উৎসৃজ্য-পরিত্যাগ করে; বর্ততে- বর্তমান থাকে; কামকারতঃ-কামাচারে; ন-না; সঃ-সে; সিদ্ধিম্ সিদ্ধি; অবাপ্নোতি-প্রাপ্ত হয়; ন-না; সুখম্-সুখ; ন-না; পরাম্-পরম; গতিম্-গতি।

গীতার গান

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে কাম আচরণ।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি নহে তাহে সুখ গতিপর ॥

অনুবাদ

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানব-সমাজে বিভিন্ন বর্ণের ও আশ্রমের জন্য শাস্ত্রবিধি বা শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বিধিগুলি অনুশীলন করা। কেউ যদি সেই নির্দেশগুলি অনুশীলন না করে কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে নিজের

খেয়ালখুশি মতো জীবন যাপন করতে থাকে, তা হলে সে কখনই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, কোন মানুষ সিদ্ধান্তগতভাবে এই সমস্ত শাস্ত্রনির্দেশ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি তার নিজের জীবনে সেগুলিকে আচরণ না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে একটি নরাধম। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত জীবের কাছে এটিই প্রত্যাশা করা হয় যে, সে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য শাস্ত্র-নির্দেশগুলি অনুশীলন করবে। সে যদি তা না করে, তা হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।.. কিন্তু সমস্ত বিধি-নিষেধ ও নৈতিক আচার-অনুষ্ঠান করেও সে যদি ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত জ্ঞানই ব্যর্থ হয়েছে। আর এমন কি ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও যদি সে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত না করে, তবে বুঝতে হবে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তাই, ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে। তখনই কেবল সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তা সম্ভব নয়।
কামকারতঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞাতসারে মানুষ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে কাম আচরণ করে। সেই আচরণগুলি নিষিদ্ধ জেনেও যদি তা আচরণ করা হয়, তাকে বলা হয় খেয়ালখুশি মতো আচরণ করা। সে জানে যে, সেগুলি অনুশীলন করা উচিত, কিন্তু তবুও সে তা করে না, তাই তাকে বলা হয় খামখেয়ালী। এই সমস্ত মানুষদের পরিণতি হচ্ছে যে, তারা ভগবানের দ্বারা দণ্ডিত হয়। মানব-জীবনের যে চরম সিদ্ধি, তা তারা কখনই লাভ করতে পারে না। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে পবিত্র করা এবং যারা শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে না, আচরণ করে না, তারা কখনই পবিত্র হতে পারে না এবং তারা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ২৪

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ- অতএব; শাস্ত্রম্-শাস্ত্র; প্রমাণম্-প্রমাণ; তে-তোমার; কার্য-কর্তব্য; অকার্য-অকর্তব্য; ব্যবস্থিতৌ-নির্ধারণে; জ্ঞাত্বা-জেনে; শাস্ত্র-শাস্ত্রের; বিধান-বিধান; উক্তম্-কথিত হয়েছে; কর্ম-কর্ম, কর্তৃম্- করতে, ইহ-এই; অর্হসি-যোগ্য হও।

গীতার গান

অতএব শাস্ত্রবিধি কার্যের প্রমাণ।
জানি শাস্ত্রবিধি কর কার্য সমাধান ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধানে কথিত হয়েছে যে কর্ম, তা জেনে তুমি সেই কর্ম করতে যোগ্য হও।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সমস্ত বৈদিক বিধি ও নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। কেউ যদি ভগবদগীতার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরে কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তিনি বৈদিক শাস্ত্র প্রদত্ত জ্ঞানের চরম সিদ্ধির স্তরে উপনীত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থাকে অত্যন্ত সরল করে

দিয়ে গেছেন। তিনি মানুষকে কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে, ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হতে এবং ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যিনি এভাবেই ভক্তিমূলক কর্মধারায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রাদি অনুশীলন করেছেন বলেই বুঝতে হবে। তিনি সঠিকভাবে বৈদিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অবশ্যই, যারা কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেনি, তাদের পক্ষে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করে কর্ম করা উচিত। কোন রকম কুতর্ক না করে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যাওয়া উচিত। তাকেই বলা হয় শাস্ত্রবিধির আচরণ করা। শাস্ত্র হচ্ছে চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং বদ্ধ জীবের যে চারটি ত্রুটি আছে, সেগুলি হচ্ছে-ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব (ভুল করার প্রবণতা, মোহগ্রস্ত হওয়া, প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা ও অপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি)। এই চারটি প্রধান ত্রুটি থাকার জন্য বদ্ধ জীব বিধিনিয়ম রচনার অযোগ্য। সেই কারণেই শাস্ত্রোক্ত বিধিনিয়মগুলি এই চারটি ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলে সমস্ত মহামুনি, ঋষি, আচার্য ও মহাত্মাগণ শাস্ত্রের নির্দেশগুলিকে কোনও রকম পরিবর্তন না করে গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষে অনেক আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলি সাধারণত দুভাগে বিভক্ত- নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। তাঁরা উভয়েই অবশ্য বৈদিক নির্দেশ অনুসারেই জীবন যাপন করেন। শাস্ত্রনির্দেশ অনুশীলন না করে কখনই সিদ্ধি লাভকরা যায় না। তাই, যিনি যথার্থভাবে শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনিই ভাগ্যবান।
পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করার পন্থা অবলম্বন না করার ফলেই মানব-সমাজে অধঃপতন দেখা দেয়। মানব-জীবনে সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। তাই, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া সর্বদাই আমাদের ত্রিতাপ দুঃখ দিয়ে চলেছে। এই বহিরঙ্গা শক্তি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত। পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে অন্তত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে না পারলে মানুষ রজ ও তমোগুণের স্তরে থেকে যায়, যা আসুরিক জীবনের কারণ। যারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তারা শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে, সাধুদের অবজ্ঞা করে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতেও অবজ্ঞা করে। তারা সদ্গুরুকে অমান্য করে এবং তারা শাস্ত্র-নির্দেশের কোন রকম পরোয়া করে না। ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এভাবেই তারা নিজেদের মনগড়া উন্নতির পন্থা আবিষ্কার করে। এগুলি মানব-সমাজের কতকগুলি ত্রুটি, যা মানুষকে আসুরিক জীবনের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সে যদি সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে যথার্থ মঙ্গলের পথ অবলম্বন করে যথার্থ উন্নতির স্তরে উন্নীত হতে পারে, তা হলেই তার জীবন সার্থক হয়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-দৈব ও আসুরিক প্রকৃতিগুলির পরিচয় বিষয়ক 'দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায় - শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; যে-যারা; শাস্ত্রবিধিম্-শাস্ত্রের বিধান; উৎসৃজ্য-পরিত্যাগ করে; যজন্তে-পূজা করে; শ্রদ্ধয়া-শ্রদ্ধা সহকারে; অন্বিতাঃ-যুক্ত হয়ে; তেষাম্-তাদের; নিষ্ঠা-নিষ্ঠা; তু-কিন্তু; কা-কি রকম; কৃষ্ণ-হে কৃষ্ণ; সত্ত্বম্-সত্ত্বগুণে; আহো-অথবা; রজঃ রজোগুণে; তমঃ-তমোগুণে।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
শাস্ত্রবিধি নাহি জানে কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত।
যজন করয়ে যারা কিবা তার হিত ॥
কিবা নিষ্ঠা তার কৃষ্ণ সত্ত্ব, রজ, তম।
বিস্তার কহ'ত সেই শুনি ইচ্ছা মম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

তাৎপর্য

চতুর্থ অধ্যায়ের উনচত্বারিংশত্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কোনও বিশেষ ধরনের আরাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলে কালক্রমে জ্ঞান লাভ হয় এবং পরা শান্তি ও সমৃদ্ধির পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। ষোড়শ অধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধির অনুশীলন করে না, তাদের বলা হয় অসুর এবং যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রের অনুশাসনাদি মেনে চলেন, তাঁদের বলা হয় সুর বা দেব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে কোন নীতির অনুশীলন করে যার উল্লেখ শাস্ত্রে নেই, তার কি অবস্থা? অর্জুনের মনের এই সংশয় শ্রীকৃষ্ণকে দূর করতে হবে। যারা একটি মানুষকে বেছে নিয়ে তার উপর বিশ্বাস অর্পণ করে এক ধরনের ভগবান তৈরি করে নেয়, তারা কি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, কিংবা তমোগুণের বশবর্তী হয়ে আরাধনা করতে থাকে? ঐ ধরনের লোকেরা কি জীবনে সিদ্ধি লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়? তাদের পক্ষে কি যথার্থ জ্ঞান লাভ করে পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? যারা শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবীর ও মানুষের পূজা করে, তারা কি তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে? অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ শ্রীভগবান বললেন; ত্রিবিধা-তিন প্রকার; ভবতি-হয়; শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা; দেহিনাম্-দেহীদের; সা-তা; স্বভাবজা-স্বভাব-জনিত; সাত্ত্বিকী-সাত্ত্বিকী; রাজসী-রাজসী; চ-ও; এব-অবশ্যই; তামসী-তামসী; চ-এবং; ইতি-এভাবে; তাম্-তা; শৃণু-শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন:

স্বভাবজ তিন নিষ্ঠা শ্রদ্ধা সে দেহীর।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী গভীর ॥
বিবরণ কহি তার শুন দিয়া মন।
যার যেবা শ্রদ্ধা হয় গুণের কারণ ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন-দেহীদের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার-সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এখন সেই সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আলস্য বা বৈমুখ্যবশত এই সমস্ত বিধির অনুশীলন করে না, তারা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের পূর্বকৃত সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণাশ্রিত কর্ম অনুসারে তারা বিশেষ ধরনের প্রকৃতি অর্জন করে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলীর সঙ্গে জীবের আসঙ্গ চিরকাল ধরেই চলে আসছে, যেহেতু জীবসত্তা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, সেই জন্য জড় গুণের সঙ্গে তার আসঙ্গ অনুসারে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু যদি সে কোনও সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করে এবং তার নির্দেশিত অনুশাসনাদি ও শাস্ত্রাদি মেনে চলে, তা হলে তার প্রকৃতি বদলাতে পারা যায়। ক্রমশ, সেভাবেই মানুষ তম থেকে রজ, কিংবা রজ থেকে সত্ত্বে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। এই থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রকৃতির কোনও এক বিশেষ গুণের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফলে মানুষ পূর্ণ সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। সব কিছুই সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে, সদগুরুর সান্নিধ্যে বিবেচনা করতে হয়। এভাবেই মানুষ প্রকৃতির উচ্চতর গুণগত পর্যায়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

শ্লোক ৩

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

সত্ত্বানুরূপা-অন্তঃকরণের অনুরূপ; সর্বস্য-সকলের; শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা; ভবতি-হয়; ভারত-হে ভারত; শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা; ময়ঃ-পূর্ণ; অয়ম্ এই; পুরুষঃ-জীব; যঃ-যে; যৎ-যেই রকম; শ্রদ্ধঃ-শ্রদ্ধা; সঃ-সেই প্রকার; এব-অবশ্যই; সঃ-সে।

গীতার গান

নিজ সত্ত্ব অনুরূপা শ্রদ্ধা সে ভারত।
শ্রদ্ধাময় পুরুষ যে শ্রদ্ধা যে তেমত ॥

অনুবাদ

হে ভারত। সকলের শ্রদ্ধা নিজ-নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। যে যেই রকম গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেই রকম শ্রদ্ধাবান।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই, সে যেই হোক না কেন, কোন বিশেষ ধরনের শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু তার স্বভাব অনুসারে সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়। এভাবেই তার বিশেষ শ্রদ্ধা অনুসারে সে এক-এক ধরনের মানুষের সঙ্গ করে। এখন প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবই মূলত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ-বিশেষ। তাই, মূলত প্রতিটি জীবই জড় প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত। কিন্তু কেউ যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং বদ্ধ জীবনে জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন সে বৈচিত্র্যময় জড় প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে নিজের অবস্থান গড়ে তোলে। তার ফলে তার যে কৃত্রিম বিশ্বাস ও উপাধি তা জড়-জাগতিক। কেউ যদিও কতকগুলি সংস্কার বা ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে নির্গুণ বা গুণাতীত। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে তার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। সেটিই হচ্ছে নির্ভয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পন্থা-কৃষ্ণভাবনামৃত। কৃষ্ণভাবনামৃত যিনি লাভ করেছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে সিদ্ধ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু কেউ যদি আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা অবলম্বন না করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হবেন।

এই শ্লোকে শ্রদ্ধা অর্থাৎ 'বিশ্বাস' কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাসের প্রথম উদয় হয় সত্ত্বগুণের মাধ্যমে। কারও শ্রদ্ধা দেব-দেবীর প্রতি অথবা মনগড়া কোন ভগবান কিংবা কোন রকম অলীক কল্পনার প্রতি থাকতে পারে। এই যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, তা জড় জগতের সত্ত্বগুণের কর্ম থেকে উদ্ভূত। কিন্তু জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনে কোন কাজই পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ নয়। সেগুলি হয় মিশ্র প্রকৃতির। সেগুলি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব হচ্ছে অপ্রাকৃত; সেই শুদ্ধ সত্ত্বে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারা যায়। কারও শ্রদ্ধা যতক্ষণ পর্যন্ত না শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জড় প্রকৃতির যে কোন গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারে। জড় প্রকৃতির কলুষিত গুণগুলি হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে। অতএব জড় প্রকৃতির বিশেষ কোন গুণের সংস্পর্শে হৃদয়ের স্থিতি অনুসারে জীবের শ্রদ্ধার প্রকাশ হয়। বুঝতে হবে যে, কারও হৃদয় যদি সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে সাত্ত্বিক। তার হৃদয় যদি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে রাজসিক এবং তার হৃদয় যদি তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে বা মোহাচ্ছন্ন থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধাও হবে সেই রকমই কলুষিত। এভাবেই এই জগতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দেখতে পাই এবং ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের থেকে নানা রকম ধর্মের উদয় হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের যথার্থ তত্ত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত, কিন্তু হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের উদয় হয়। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস অনুসারে নানা রকম উপাসনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

শ্লোক ৪

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

যজন্তে-পূজা করে; সাত্ত্বিকাঃ-সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা; দেবান্-দেবতাদের; যক্ষরক্ষাংসি-যক্ষ ও রাক্ষসদের; রাজসাঃ-রাজসিক ব্যক্তিরা; প্রেতান্-প্রেতাত্মাদের; ভূতগণান্-ভূতদের; চ-এবং; অন্যে-অন্যেরা; যজন্তে-পূজা করে; তামসাঃ-তামসিক; জনাঃ-ব্যক্তিরা।

গীতার গান

সাত্ত্বিকী যে শ্রদ্ধা সেই পূজে দেবতারে।
রাজসী যে শ্রদ্ধা পূজে যক্ষ রাক্ষসেরে ॥
তামসী যে শ্রদ্ধা তাহে ভূতপ্রেত পূজে।
যার যেই শ্রদ্ধা হয় সেই তথা ভজে ॥

অনুবাদ

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিভিন্ন ধরনের উপাসকদের বহিরঙ্গা কর্মধারা অনুসারে তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য, কিন্তু যারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয় অথবা শ্রদ্ধাবান নয়, তারা তাদের জড়া প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপাসনা করে থাকে। যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সাধারণত দেব-দেবীদের পূজা করে। এই সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি। এই রকম অনেক দেব-দেবী আছেন। যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে। তেমনই, যারা রজোগুণে অধিষ্ঠিত তারা যক্ষ, রাক্ষস আদির পূজা করে। আমাদের মনে আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় কোন এক ব্যক্তি হিটলারের পূজা করতে শুরু করে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে সে কালোবাজারী করে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিল। তেমনই যারা রজ বা তমোগুণে আচ্ছন্ন, তারা সাধারণত কোন শক্তিশালী মানুষকে ভগবান বলে নির্ধারণ করে। তারা মনে করে, যে-কোন জনকেই ভগবান বলে পূজা করা যায় এবং তাতে একই রকম ফল লাভ করা যায়।

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা রাজসিক তারা এই ধরনের ভগবান তৈরি করে তাদের পূজা করে এবং যারা তামসিক, তারা ভূত-প্রেত আদির পূজা করে। কিছু লোককে কোন মৃতলোকের সমাধিতে গিয়ে পূজা করতে দেখা যায়। যৌন আচারগুলিকেও তামসিক আচার বলে গণ্য করা হয়। তেমনই, ভারতের অজ পাড়াগাঁয়ে ভূত-প্রেতের পূজার প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে, নিম্ন স্তরের লোকেরা যদি জানতে পারে যে, জঙ্গলে কোন গাছে ভূত আছে, তা হলে তারা নানা রকম নৈবেদ্য অর্পণ করে সেই গাছের পূজা করে।

এই রকম যে সমস্ত পূজা তা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের আরাধনা নয়। ভগবৎ উপাসনা হচ্ছে তাঁদের জন্য, যাঁরা গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩/২৩) বলা হয়েছে, সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্-"কোন মানুষ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন, তিনি তখন বাসুদেবের আরাধনা করেন।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, যারা জড় জগতের সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তারাই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন।

নির্বিশেষবাদীরাও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় এবং তারা পাঁচ রকমের দেব-দেবীর উপাসনা করে। তারা জড় জগতে নির্বিশেষ বিষ্ণুরূপ বা মনোধর্ম-প্রসূত বিষ্ণুতত্ত্বের

উপাসনা করে। বিষ্ণু হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বিশ্বাস করে না, তাই তারা কল্পনা করে যে, বিষ্ণুরূপও নির্বিশেষ ব্রহ্মের একটি রূপ মাত্র। তেমনই, তারা মনে করে যে, ব্রহ্মাও হচ্ছেন রজোগুণের নির্বিশেষ প্রকাশ মাত্র। এভাবেই তারা পাঁচ জন উপাস্য দেব-দেবীর কথা বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই পরিণামে তারা সব উপাস্য বস্তুকে পরিত্যাগ করে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বৈশিষ্ট্যগুলি গুণাতীত ব্যক্তির সান্নিধ্যের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হতে পারে।

শ্লোক ৫-৬

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

অশাস্ত্রবিহিতম্-শাস্ত্রবিরুদ্ধ; ঘোরম্-অপরের পক্ষে ক্ষতিকর; তপ্যন্তে-তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করে; যে-যারা; তপঃ-তপস্যা; জনাঃ-ব্যক্তিগণ; দন্ত-দন্ত; অহঙ্কার-অহঙ্কার; সংযুক্তাঃ-যুক্ত; কাম-কাম; রাগ-আসক্তি; বল-বল; অন্বিতাঃ-বিশিষ্ট; কর্ষয়ন্তঃ-ক্লেশ প্রদান করে; শরীরস্থম্-শরীরস্থ, ভূতগ্রামম্-ভূতসমূহকে; অচেতসঃ-অবিবেকী; মাম্-আমাকে; চ-ও; এব-অবশ্যই; অন্তঃ-অন্তরে; শরীরস্থম্-দেহস্থিত; তান্-তাদের; বিদ্ধি-জানবে; আসুর-আসুরিক; নিশ্চয়ান্-নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করি যে তপস্যা করে।
দম্ভ দর্প কাম রাগ যুক্ত অহঙ্কারে ॥
বৃথা উপবাস করে ক্লেশ সহিবারে।
'শরীরেতে ভূতগণে মূর্খ কর্শিবারে ॥
আমাকেও অন্তর্যামী শরীর ভিতরে।
আসুরিক জান সেই তার ব্যবহারে ॥-

অনুবাদ

দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তির প্রভাবে বলান্বিত হয়ে যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি তাদের দেহস্থ ভূতসমূহকে এবং অন্তরস্থ পরমাত্মাকে ক্লেশ প্রদান করে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাদেরকে নিশ্চিতভাবে আসুরিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

কিছু মানুষ আছে যারা নানা রকম তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন উদ্ভাবন করে, যা শাস্ত্রবিধানে উল্লেখ নেই। যেমন, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনশন করা। এই ধরনের অনশন করার কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে কেবলমাত্র পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই অনশন করা উচিত। কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা করা উচিত নয়। এই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা তপশ্চর্যা করে, ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, তারা অবশ্যই আসুরিক ভাবাপন্ন। তাদের কার্যকলাপ

শাস্ত্রবিধির বিরোধী এবং তার ফলে জনসাধারণের কোন মঙ্গল হয় না। প্রকৃতপক্ষে, তারা গর্ব, অহঙ্কার, কাম ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে ঐ সমস্ত কর্ম করে। এই ধরনের কাজকর্মের ফলে যে সমস্ত জড় উপাদান দিয়ে দেহ তৈরি হয়েছে তা-ই যে কেবল বিক্ষুব্ধ হয় তা নয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যিনি এই শরীরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তিনিও ক্ষুব্ধ হন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের অবিধিপূর্বক অনশন বা তপস্যা অপরের কাছেও একটি উৎপাত-স্বরূপ। এই রকম তপশ্চর্যার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা মনে করতে পারে যে, এই উপায় অবলম্বন করে তারা তাদের শত্রুকে অথবা অন্য দলকে তাদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য করাতে পারে, কিন্তু এই ধরনের অনশনের ফলে অনেক সময় তাদের মৃত্যু ঘটে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই ধরনের কাজ অনুমোদন করেননি এবং তিনি বলেছেন যে, যারা এই ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হয়, তারা অসুর। এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিও অসম্মানসূচক, কারণ বৈদিক শাস্ত্রের অনুশাসন আদি অমান্য করে তা করা হয়। অচেতসঃ কথাটি এই সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুস্থ স্বাভাবিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা অবশ্যই শাস্ত্রের অনুশাসনগুলি পালন করে চলেন। যারা তেমন মনোভাবাপন্ন নয়, তারা শাস্ত্রের নির্দেশ অবহেলা করে তাদের নিজেদের মনগড়া তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা উদ্ভাবন করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষের যে পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব সময় মনে রাখা উচিত। ভগবান তাদের আসুরিক যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তার ফলে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে না পেরে, জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক জীবন যাপন করতে থাকবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের মানুষেরা যদি সদ্গুরুর কৃপা লাভ করতে পারে, যিনি তাদের বৈদিক জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করেন, তা হলেই তারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

শ্লোক ৭

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

আহারঃ-আহার; তু-অবশ্যই; অপি-ও; সর্বস্য সকলের; ত্রিবিধঃ-তিন প্রকার; ভবতি-হয়; প্রিয়ঃ-প্রীতিকর; যজ্ঞঃ-যজ্ঞ; তপঃ-তপস্যা; তথা-তেমনই; দানম্-দান; তেষাম্-তাদের; ভেদম্-প্রভেদ; ইমম্-এই; শৃণু-শ্রবণ কর।

গীতার গান

আহারও ত্রিবিধ সে যথাযথ প্রিয়।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী যে হেয় ॥
যজ্ঞ, জপ, তপ, দান সেও সে ত্রিবিধ।
যার যেবা ভেদ গুণ ভিন্ন বহুবিধ ॥

অনুবাদ

সকল মানুষের আহারও তিন প্রকার প্রীতিকর হয়ে থাকে। তেমনই যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। এখন তাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে আহার, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দান বিভিন্নভাবে সাধিত হয়। এই সমস্ত একই পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হয় না। যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে, জড় জগতের কোন্ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন্ কর্ম সাধিত হয়েছে, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। যারা মনে করে, সব রকমের যজ্ঞ, খাদ্য অথবা দান সমপর্যায়ভুক্ত, তাদের পার্থক্য নিরূপণ করবার ক্ষমতা নেই, তারা মূর্খ। কিছু ধর্ম-প্রচারক এখন প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে এবং এই ধরনের যথেচ্ছাচার করার ফলেই তাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু এই ধরনের মূর্খ প্রচারকেরা বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণ করছে না। পন্থা তৈরি করে জনসাধারণকে বিপথগামী করছে। তারা নিজেদের মনগড়া

শ্লোক ৮

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুঃ-আয়ু; সত্ত্ব-অস্তিত্ব; বল-বল; আরোগ্য-আরোগ্য; সুখ-সুখ; প্রীতি-প্রীতি; বিবর্ধনাঃ-বর্ধনকারী; রস্যাঃ-রসযুক্ত, স্নিগ্ধাঃ-স্নিগ্ধ, স্থিরাঃ- স্থায়ী; হৃদ্যাঃ-মনোরম; আহারাঃ-আহার্য; সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিক লোকদের; প্রিয়াঃ-প্রিয়।

গীতার গান

আয়ু সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বাড়ে।
রস্য স্নিগ্ধ স্থির হৃদ্য সাত্ত্বিক আহারে ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোরম, সেগুলি সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।

শ্লোক ৯

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯।

কটু-তিক্ত; অম্ল-টক; লবণ-লবণাক্ত; অত্যুষ্ণ-অতি উষ্ণ; তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ; রুক্ষ-শুষ্ক; বিদাহিনঃ-প্রদাহকর; আহারাঃ-আহার; রাজসস্য-রাজসিক ব্যক্তিদের; ইষ্টাঃ-প্রিয়; দুঃখ-দুঃখ; শোক-শোক; আময়প্রদাঃ-রোগপ্রদ।

গীতার গান

কটু অম্ল লবণাক্ত অতি উষ্ণ যেই।
জ্বালা পোড়া আময়ী রাজসিক সেই ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

শ্লোক ১০

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাতযামম্-আহারের তিন ঘণ্টা আগে রান্না করা খাদ্য; গতরসম্-রসহীন; পূতি-দুর্গন্ধযুক্ত; পর্যুষিতম্-বাসী; চ-ও; যৎ-যা; উচ্ছিষ্টম্-অন্যের উচ্ছিষ্ট; অপি-ও; চ-এবং; অমেধ্যম্-অমেধ্য দ্রব্য; ভোজনম্-আহার; তামস-তামসিক লোকদের; প্রিয়ম্-প্রিয়।

গীতার গান

বাসী শৈত্য গতরস পচা বা দুর্গন্ধ।
উচ্ছিষ্ট অমেধ্য যেই খাদ্য তমসান্ধ ॥

অনুবাদ

আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না করা খাদ্য, যা নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধ্য দ্রব্য, সেই সমস্ত তামসিক লোকদের প্রিয়।

তাৎপর্য

খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ু বর্ধন করা, মনকে পবিত্র করা এবং শরীরের শক্তি দান করা। সেটিই হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা বলদায়ক, আয়ুবর্ধক সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করে গেছেন, যেমন দুগ্ধজাত খাদ্য, শর্করা, অন্ন, গম, ফল ও শাক-সবজি। যারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, তাদের কাছে এই ধরনের খাদ্য অত্যন্ত প্রিয়। অন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য, যেমন ভুট্টার খই ও গুড় খুব একটা সুস্বাদু নয়, কিন্তু দুধ বা অন্য কোন খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে সেগুলি খুব সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তখন সেগুলি সাত্ত্বিক আহারে পরিণত হয়। এই সমস্ত খাদ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মদ্য, মাংস আদি অস্পৃশ্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অষ্টম শ্লোকে যে স্নিগ্ধ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে হত্যা করা পশুর চর্বির কোন সম্পর্ক নেই। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে খাদ্য দুধ, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে। দুধ, মাখন, ছানা এবং এই জাতীয় পদার্থে যে পরিমাণ স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে আর নিরীহ পশু হত্যা করার কোন প্রয়োজন থাকে না। শুধুমাত্র পাশবিক মনোবৃত্তির ফলেই এই সমস্ত পশু হত্যা হয়ে চলেছে। সভ্য উপায়ে স্নেহ পদার্থ পাওয়ার পন্থা হচ্ছে দুধ। নরপশুরাই কেবল পশু হত্যা করে থাকে। ছোলা, মটর, গম আদিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন বা অন্নসার পাওয়া যায়।

রাজসিক খাদ্য হচ্ছে সেই সমস্ত খাদ্য, যা তিক্ত, অত্যন্ত লবণাক্ত বা অতি উষ্ণ অথবা অতিরিক্ত শুকনো লঙ্কা মিশ্রিত, যার ফলে উদরে কফ উৎপন্ন হয়ে শ্লেষ্মা প্রদান করে এবং অবশেষে রোগ দেখা দেয়। আর তামসিক আহার হচ্ছে সেগুলি, যা টাটকা নয়। যে খাদ্য আহার করার কম করে তিন ঘণ্টা আগে রান্না করা হয়েছে (ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত) তা তামসিক আহার বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু তা পচতে শুরু করেছে, তাই এই সমস্ত খাদ্য দুর্গন্ধযুক্ত। সেগুলি তমোগুণ-সম্পন্ন মানুষকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তা সহ্য করতে পারে না।

উচ্ছিষ্ট খাদ্য তখনই গ্রহণ করা উচিত যদি তা পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত হয় অথবা তা যদি সাধু মহাত্মার, বিশেষ করে গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট হয়। তা না হলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য তামসিক বলে গণ্য করা হয় এবং তার ফলে রোগ সংক্রামিত হয়। এই ধরনের খাদ্য তামসিক

লোকদের কাছে যদিও খুব সুস্বাদু বলে মনে হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরা এই ধরনের খাদ্য পছন্দ করেন না, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য, যা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, শাক-সবজি, ময়দা, দুগ্ধ আদি থেকে প্রস্তুত আহার্য যখন ভক্তি সহকারে তাঁকে নিবেদন করা হয়, তিনি তখন তা গ্রহণ করেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্। অবশ্য, ভক্তি ও প্রেম হচ্ছে মুখ্য বস্তু, যা পরম পুরুষোত্তম ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু এটিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু দিয়ে বিশেষভাবে প্রসাদ তৈরি করতে হয়। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ বহু বহু দিন পূর্বে প্রস্তুত হলেও তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য চিন্ময়। তাই সব মানুষের জন্য খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত, আহার্য ও সুস্বাদু করে তুলতে হলে, সেগুলি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১১

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ-ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক; যজ্ঞঃ-যজ্ঞ; বিধিদিষ্টঃ - শাস্ত্রের বিধি অনুসারে; যঃ-যে; ইজ্যতে-অনুষ্ঠিত হয়; যষ্টব্যম্-অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; এব-অবশ্যই; ইতি-এভাবেই; মনঃ-মনকে; সমাধায় একাগ্র করে; সঃ-তা; সাত্ত্বিকঃ-সাত্ত্বিক।

গীতার গান

অফলাকাঙ্ক্ষী যে যজ্ঞ বিধিমত হয় ।
কর্তব্য যে মনে করে সাত্ত্বিকী সে কয় ॥

অনুবাদ

ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এভাবেই মনকে একাগ্র করে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, কোনও রকম ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্তব্যবোধে আমাদের যজ্ঞ করা উচিত। মন্দির ও গির্জাগুলিতে যেভাবে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান করা হয়, তা সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন নয়। কর্তব্যবোধে মানুষের মন্দিরে বা গির্জায় যাওয়া উচিত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা ও নৈবেদ্য নিবেদন করা উচিত। সকলেই মনে করে যে, কেবল ভগবানের আরতি করার জন্য মন্দিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু অর্থ লাভের জন্য ভগবানের উপাসনার কথা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্যই সেখানে যাওয়া উচিত। তার ফলে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভ্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

শ্লোক ১২

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

অভিসন্ধায়-কামনা করে; তু-কিন্তু; ফলম্-ফল; দম্ভ-দম্ভ; অর্থম্-প্রকাশের জন্য; অপি-ও; চ-এবং; এব-অবশ্যই: যৎ-যে যজ্ঞ; ইজ্যতে-অনুষ্ঠিত হয়; ভরতশ্রেষ্ঠ-হে ভরতশ্রেষ্ঠ; তম্-তাকে; যজ্ঞম্-যজ্ঞ; বিদ্ধি-জানবে; রাজসম্-রাজসিক।

গীতার গান

মূলে অভিসন্ধি যার আকাঙ্ক্ষা ফলেতে।
রাজসিক যজ্ঞ হয় দম্ভের সহিতে ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ফল কামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য অথবা কোন জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যজ্ঞ ও বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করা হয়। এই ধরনের যজ্ঞ বা আচার অনুষ্ঠান রাজসিক বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ১৩

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ৷ ১৩ ॥

বিধিহীনম্-শাস্ত্রবিধি বর্জিত; অসৃষ্টান্নম্-প্রসাদান্ন বিতরণবিহীন; মন্ত্রহীনম্-বৈদিক মন্ত্রহীন; অদক্ষিণ-দক্ষিণা রহিত; শ্রদ্ধাবিরহিতম্-শ্রদ্ধাহীন; যজ্ঞম্-যজ্ঞকে; তামসম্-তামসিক; পরিচক্ষতে বলা হয়।

গীতার গান

বিধি অন্নহীন নাই মন্ত্র বা দক্ষিণা।
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ সেই তমসা আচ্ছন্না ॥

অনুবাদ

শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদান্ন বিতরণহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

তমোগুণে শ্রদ্ধা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অশ্রদ্ধা। কখনও কখনও মানুষ টাকা-পয়সা লাভের আশায় কোন কোন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে এবং তারপর শাস্ত্র-নির্দেশের সম্পূর্ণ অবহেলা করে নানা রকম আমোদ-প্রমোদে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে। এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ লোকদেখানো ধর্ম অনুষ্ঠানকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়। এই সমস্তই হচ্ছে তামসিক। তার ফলে আসুরিক মনোভাবের উদয় হয় এবং মানব-সমাজের তাতে কোন মঙ্গল সাধিত হয় না।

শ্লোক ১৪

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব-পরমেশ্বর ভগবান; দ্বিজ ব্রাহ্মণ; গুরু-গুরু, প্রাজ্ঞ-পূজনীয় ব্যক্তিগণের; পূজনম্ পূজা; শৌচম্-শৌচ; আর্জবম্-সরলতা; ব্রহ্মচর্যম্-ব্রহ্মচর্য; অহিংসা-অহিংসা; চ-ও; শারীরম্-কায়িক; তপঃ-তপস্যা; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ যে সব পূজন।
শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্যের পালন ॥
সেই সব সিদ্ধ হয় শরীর তপস্যা।
অনুদ্বেগকর বাক্য কিংবা প্রিয় পোষ্য ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা-এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এখানে বিভিন্ন ধরনের তপশ্চর্যা ও কৃষ্ণসাধনের ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে তিনি কায়িক তল্পশ্চর্যা ও কৃষ্ণসাধনের কথা বলেছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে, দেব-দেবীকে, সিদ্ধ পুরুষকে, সদ্রাহ্মণকে, সদ্গুরুকে এবং পিতা-মাতা আদি গুরুজনদেরকে অথবা যাঁরা বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত অথবা তাদের শ্রদ্ধা করার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এদের সকলকে যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। বাইরে ও অন্তরে নিজেকে পরিষ্কার রাখার অনুশীলন করা উচিত এবং আচার ব্যবহারে সহজ সরল হতে শেখা উচিত। শাস্ত্রে যা অনুমোদন করা হয়নি, তা কখনই করা উচিত নয়। কখনই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। কেবলমাত্র বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন মতেই নয়। একে বলা হয় ব্রহ্মাচর্য। এগুলি হচ্ছে দেহের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছসাধন।

শ্লোক ১৫

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে । ১৫ ॥

অনুদ্বেগকরম্-অনুদ্বেগকর; বাক্যম্ বাক্য; সত্যম্ সত্য; প্রিয় প্রিয়; হিতম্-হিতকর; চ-ও; যৎ-যা; স্বাধ্যায়-বেদ পাঠের; অভ্যসনম্-অভ্যাস; চ-ও; এব-অবশ্যই; বাঙ্ময়ম্ বাচিক; তপঃ-তপস্যা; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

স্বাধ্যায় অভ্যাস যত বেদ উচ্চারণ।
বাঙ্ময় তপস্যা সে শাস্ত্রের বচন ।

অনুবাদ

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

এমনভাবে কোন কথা বলা উচিত নয়, যার ফলে অন্যদের মন উত্তেজিত হতে পারে। তবে, শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দান করবার জন্য সত্য কথা বলতে পারেন, কিন্তু তা যদি অন্যদের, যারা তাঁর শিষ্য নয়, তাদের উত্তেজিত করে তোলে, তা হলে সেখানে তাঁর কথা বলা উচিত নয়। এটিই হচ্ছে বাচোবেগ দমন করার তপশ্চর্যা। এ ছাড়া অর্থহীন প্রজল্প করা উচিত নয়। ভক্তমণ্ডলীতে যখন কথা বলা হয়, তখন তা যেন শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা বলা হয় তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য তৎক্ষণাৎ শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করা উচিত। সেই সঙ্গে, ঐ ধরনের আলোচনা অন্যের কাছে শ্রুতিমধুর হওয়া উচিত। তবেই এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে পরম মঙ্গল লাভ হতে পারে এবং মানব-সমাজের উন্নতি সাধিত হতে পারে। বৈদিক সাহিত্যের অনন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেগুলি পাঠ করা উচিত। একেই বলা হয় বাচোবেগের তপশ্চর্যা।

শ্লোক ১৬

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

মনঃপ্রসাদঃ-চিত্তের প্রসন্নতা; সৌম্যত্বম্-সরলতা; মৌনম্-মৌন; আত্মবিনিগ্রহঃ -মনঃসংযম; ভাবসংশুদ্ধিঃ-ব্যবহারে নিষ্কপটতা; ইতি এতৎ-এগুলিকে; তপঃ -তপস্যা; মানসম্-মানসিক; উচ্যতে বলা হয়।

গীতার গান

চিত্তের প্রসন্নতা যে আর সরলতা।
আত্মনিগ্রহাদি মৌন ভাব প্রবণতা ॥
সেই সব মানসিক তপ নামে খ্যাত।
উপরোক্ত সব তপ ত্রিগুণ প্রখ্যাত ॥

অনুবাদ

চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ব্যবহারে নিষ্কপটতা-এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

মানসিক তপশ্চর্যা হচ্ছে সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা থেকে মনকে মুক্ত করা। মনকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সর্বক্ষণ মানুষের কি করে মঙ্গল হবে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে। মনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে চিন্তায় গাম্ভীর্য। কৃষ্ণভক্তি থেকে কখনই বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় এবং সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিত্যাগ করা উচিত। স্বভাবকে নির্মল করে গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া। মনের সন্তোষ তখনই লাভ করা যায়, যখন মনকে সমস্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। আমরা যতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তা করি, মন ততই অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নানা রকম পন্থায় মনকে অনর্থক নিযুক্ত করছি এবং তাই

মানসিক শান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মানসিক শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে মহাভারত ও পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে মনকে নিবদ্ধ করা, যা নানা রকম মনোমুগ্ধকর আনন্দদায়ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এই জ্ঞানের সহায়তা লাভ করে মানুষ পবিত্র হতে পারে। মন যেন সব রকমের কপটতা থেকে মুক্ত থাকে এবং আমাদের উচিত সকলের মঙ্গল কামনা করা। মৌনতা মানে হচ্ছে সর্বক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকা। এই অর্থে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত হচ্ছেন যথার্থ মৌন। আত্মনিগ্রহের অর্থ হচ্ছে মনকে সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থেকে মুক্ত রাখা। আমাদের অকপট ব্যবহার করা উচিত, তার ফলে আমাদের অস্তিত্ব শুদ্ধ হয়। এই সমস্ত গুণাবলী হচ্ছে মানসিক তপশ্চর্যা।

শ্লোক ১৭

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ।। ১৭ ॥

শ্রদ্ধয়া-শ্রদ্ধা সহকারে; পরয়া-পরম; তপ্তম্-অনুষ্ঠিত; তপঃ-তপস্যা; তৎ-তা; ত্রিবিধম্ ত্রিবিধ; নরৈঃ-মানুষের দ্বারা; অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ-ফলাকাঙক্ষা রহিত; যুক্তৈঃ-যুক্ত; সাত্ত্বিকম্-সাত্ত্বিক; পরিচক্ষতে-বলা হয়।

গীতার গান

ত্রিবিধ তপস্যা যদি পরাশ্রদ্ধাযুক্ত ।
ফলাকাঙক্ষা যদি নহে সাত্ত্বিকী সে উক্ত ॥

অনুবাদ

ফলাকাঙক্ষা রহিত মানুষের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

শ্লোক ১৮

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সৎকার-শ্রদ্ধা; মান-সম্মান; পূজার্থম্-পূজা লাভের আশায়; তপঃ-তপস্যা; দম্ভেন-দম্ভ সহকারে; চ-ও; এব-অবশ্যই; যৎ-যে; ক্রিয়তে-অনুষ্ঠিত হয়; তৎ-তাকে; ইহ-এই জগতে; প্রোক্রম্-বলা হয়; রাজসম্-রাজসিক; চলম্-অনিত্য; অধ্রুবম্-অনিশ্চিত।

গীতার গান

লাভ পূজা সম্মানের জন্য দম্ভের সহিত।
যে তপস্যা সাধে লোক তাহা রাজসিক ॥
সে তপস্যার যে ফল তাহা অনিশ্চিত।
অন্তবৎ তার ফল হয় শাস্ত্রেতে বিদিত ॥

অনুবাদ

শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা লাভের আশায় দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয়, তাকেই এই

জগতে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

অনেক সময় তপশ্চর্যার আচরণ করা হয় মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য এবং অন্যের কাছ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা লাভের জন্য। রাজসিক মানুষেরা তাদের অধস্তনদের কাছ থেকে পূজা আদায়ের বন্দোবস্ত করে, তাদের দিয়ে পা ধোয়ায় এবং সম্পদ দান করতে বাধ্য করায়। তপশ্চর্যার আচরণের দ্বারা এই ধরনের কৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলির ব্যবস্থা রাজসিক এবং তার ফল ক্ষণস্থায়ী। তা কিছু দিনের জন্য কেবল থাকে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

শ্লোক ১৯

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

মূঢ়-মূঢ়; গ্রাহেণ-আগ্রহের দ্বারা; আত্মনঃ-নিজের; যৎ-যে; পীড়য়া-পীড়ার দ্বারা; ক্রিয়তে-অনুষ্ঠিত হয়; তপঃ-তপস্যা; পরস্য- অপরের; উৎসাদনার্থম্-বিনাশের জন্য; বা-অথবা; তৎ-তাকে, তামসম্-তামসিক; উদাহৃতম্ বলা হয়।

গীতার গান

মূঢ়বুদ্ধি যারা তপে আত্মপীড়া দেয়।
অপরের বিনাশার্থ যে তপস্যা করয় ॥
তামসী সে সব যত তপস্যা বহুল।
অলীক তাহার নাম নহে শাস্ত্র অনুকূল ॥

অনুবাদ

মূঢ়োচিত আগ্রহের দ্বারা নিজেকে পীড়া দিয়ে অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

নির্বোধ তপশ্চর্যার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হিরণ্যকশিপু, যে অমরত্ব লাভকরে দেবতাদের হত্যা করবার জন্য তপস্যা করেছিল। সে ব্রহ্মার কাছে এই সব প্রার্থনা করে, কিন্তু পরিণামে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের হাতে সে নিহত হয়। অসম্ভব কোন কিছু লাভের আশায় যে তপস্যা করা হয়, তা অবশ্যই তামসিক।

শ্লোক ২০

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

দাতব্যম্-দান করা কর্তব্য; ইতি-এভাবে; যৎ-যে; দানম্দ্রান; দীয়তে-দেওয়া হয়; অনুপকারিণে-প্রত্যুপকারের আশা না করে; দেশে-উপযুক্ত স্থানে; কালে-উপযুক্ত কালে; চ-ও; পাত্রে-উপযুক্ত পাত্রে; চ-এবং; তৎ-তাকে; দানম্-দান; সাত্ত্বিকম্-সাত্ত্বিক; স্মৃতম্ বলা হয়।

গীতার গান

কর্তব্য জানিয়া যেই দানক্রিয়া হয়।
দেশ কাল পাত্র বুঝি দাতব্য করয়।
অনুপকারীকে দান সে সাত্ত্বিক হয় ।

অনুবাদ

দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

তাৎপর্য

পারমার্থিক কর্মে নিযুক্ত যে মানুষ, তাকেই দান করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। নির্বিচারে দান করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পারমার্থিক উন্নতিই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। তাই তীর্থস্থানে, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময়, মাসের শেষে অথবা সদ্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে অথবা মন্দিরে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে দান করা উচিত। কখনও কখনও অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে গরিবদের দান করা হয়, কিন্তু সেই গরিব লোকটি যদি দানের যোগ্য না হয়, তা হলে সেই দানের ফলে কোন পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নির্বিচারে দান করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি।

শ্লোক ২১-২২

যত্ত্ব প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ-যা; তু-কিন্তু; প্রত্যুপকারার্থম্-প্রত্যুপকারের আশায়; ফলম্-ফল উদ্দিশ্য-কামনা করে; বা-অথবা; পুনঃ-পুনরায়; দীয়তে দেওয়া হয়; চ-ও; পরিক্লিষ্টম্-অনুতাপ সহকারে; তৎ-সেই; দানম্-দানকে; রাজসম্-রাজসিক; স্মৃতম্ বলা হয়; অদেশ-অশুচি স্থানে; কালে-অশুভ সময়ে; যৎ-যে; দানম্-দান; অপাত্রেভ্যঃ-অনুপযুক্ত পাত্রে; চ-ও; দীয়তে-দেওয়া হয়; অসৎকৃতম্-অনাদরে; অবজ্ঞাতম্-অবজ্ঞা সহকারে; তৎ-তাকে; তামসম্-তামসিক; উদাহৃতম্ বলা হয়।

গীতার গান

প্রত্যুপকারের জন্য ফলানুসন্ধান।
কিংবা দান করি হয় অনুতাপবান ॥
রাজসিক দান সেই শাস্ত্রের বিচার।
তামসিক দান যাহা শুন এই বার ॥
অদেশকালে যে দান অপাত্রেতে হয়।
অসৎকার অবজ্ঞা যেই তামসিক কয় ॥

অনুবাদ

যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে অথবা ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং অনুতাপ সহকারে করা হয়, সেই দানকে রাজসিক বলা হয়।

অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে, অযোগ্য পাত্রে, অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলা হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য দান করা হয়, কখনও আবার গভীর বিরক্তির সঙ্গে দান করা হয় এবং কখনও দান করার পরে অনুশোচনা হয় যে, "কেন আমি এভাবে এতগুলি টাকা নষ্ট করলাম।" কখনও আবার গুরুজনের অনুরোধে বাধ্য হয়ে দান করতে হয়। এই ধরনের দানগুলিকে রাজসিক বলে গণ্য করা হয়।
অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানদের উপহার সামগ্রী দান করে থাকে। এই ধরনের দানকে বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়নি। কেবল মাত্র সাত্ত্বিকভাবে দানের নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।
নেশা করা বা জুয়াখেলার জন্য দান করতে এখানে উৎসাহিত করা হয়নি। এই ধরনের সমস্ত দান তামসিক। এই ধরনের দানের ফলে কোন লাভ হয় না। উপরন্তু পাপকর্মে লিপ্ত সমস্ত মানুষগুলি প্রশ্রয় পায়। তেমনই, কেউ যদি আবার অশ্রদ্ধার সঙ্গে এবং অবহেলা করে যোগ্য পাত্রেও দান করে, তা হলেও সেই দানকে তামসিক বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ২৩

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ওঁ-ব্রহ্মের নির্দেশকারী প্রণব; তৎ-সেই; সৎ-নিত্য; ইতি-এই; নির্দেশঃ-নির্দেশক নাম; ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্মের; ত্রিবিধঃ-তিন প্রকার; স্মৃতঃ-কথিত আছে; ব্রাহ্মণাঃ-ব্রাহ্মণগণ; তেন তার দ্বারা; বেদাঃ-বেদসমূহ; চ-ও; যজ্ঞাঃ-যজ্ঞসমূহ; চ-ও; বিহিতাঃ-বিহিত হয়েছে, পুরা-পুরাকালে।

গীতার গান

যজ্ঞ দান তপস্যাদি যাহা শাস্ত্রের নির্ণয়।
ওঁ তৎসৎ সে উদ্দেশ্যে অন্য কিছু নয় ॥
সে উদ্দেশ্যে পূর্বকালে ব্রাহ্মণাদিগণ।
যজ্ঞ দান তপ আদি করিল পালন ॥

অনুবাদ

ওঁ তৎ সৎ-এই তিন প্রকার ব্রহ্ম-নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার তিনভাগে বিভক্ত-সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কিন্তু উত্তমই হোক, মধ্যমই হোক বা কনিষ্ঠই হোক, সে সবই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত। যখন সেগুলি পরব্রহ্ম-ওঁ তৎ সৎ বা শাশ্বত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন সেগুলি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উপায়-স্বরূপ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রের নির্দেশসমূহে সেই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। ওঁ তৎ সৎ-এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্টভাবে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সূচিত করে। বৈদিক মন্ত্রে সর্বদাই ও' শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

যে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করে না, সে কখনই পরম-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। তার পক্ষে কোন সাময়িক ফল লাভ হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের পরম অর্থ সাধিত হবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, দান, যজ্ঞ ও তপস্যা অবশ্যই সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। রাজসিক বা তামসিকভাবে সেগুলি অনুষ্ঠিত হলে তা অবশ্যই নিকৃষ্ট। ওঁ তৎ সৎ- এই তিনটি শব্দ পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়, যেমন ওঁ তদ বিষ্ণোঃ। যখনই কোন বৈদিক মন্ত্র বা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নামের উচ্চারণ করা হয়, তার সঙ্গে ও শব্দটি যুক্ত হয়। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই তিনটি শব্দ বৈদিক মন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ও ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম (ঋক্ বেদ) প্রথম লক্ষ্যকে সূচিত করে। তারপর তত্ত্বমসি (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/৮/৭) দ্বিতীয় লক্ষ্য সূচনা করে এবং সদেব সৌম্য (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১) তৃতীয় লক্ষ্যকে সূচিত করে। একত্রে তারা ওঁ তৎ সৎ। পুরাকালে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি এই তিনটি শব্দের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নির্দেশ করেছিলেন। অতএব গুরু-পরম্পরাতেও এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং, এই মন্ত্রটির বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। তাই ভগবদগীতায় অনুমোদিত হয়েছে যে, যে-কোন কর্মই করা হোক না কেন, তা যেন ওঁ তৎ সৎ অথবা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য করা হয়। কেউ যখন এই তিনটি শব্দ সহকারে তপস্যা, দান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করছেন। কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান সমন্বিত অপ্রাকৃত কর্ম, যা অনুশীলন করার ফলে আমরা আমাদের নিত্য আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। এই রকম অপ্রাকৃত কর্মে কোন রকম শক্তি ক্ষয় হয় না।

শ্লোক ২৪

তস্মাদ ওঁ ইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ-সেই হেতু; ওঁ-ও-কার; ইতি-এই শব্দ; উদাহৃত্য-উচ্চারণ করে; যজ্ঞ-যজ্ঞ; দান-দান; তপঃ-তপস্যা; ক্রিয়াঃ-ক্রিয়াসমূহ; প্রবর্তন্তে-অনুষ্ঠিত হয়; বিধানোক্তাঃ-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে; সততম্ সর্বদাই; ব্রহ্মবাদিনাম্-ব্রহ্মবাদীদের।

গীতার গান

সেজন্য ব্রাহ্মণগণ 'ওম্' উচ্চারণে।
যজ্ঞাদি বিধান করে ব্রহ্ম আচরণে ॥

অনুবাদ

সেই হেতু ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়াসমূহ সর্বদাই ও এই শব্দ উচ্চারণ করে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (ঋক্ বেদ ১/২২/২০)। শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল হচ্ছে পরা ভক্তির পরম আশ্রয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম হচ্ছে সমস্ত কর্মের সার্থকতা।

শ্লোক ২৫

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ৷ ২৫ ৷৷

তৎ ইতি-'তৎ' এই শব্দ; অনভিসন্ধায়-আকাঙ্ক্ষা-না করে; ফলম্-ফলের; যজ্ঞ-যজ্ঞ; তপঃ-তপস্যা; ক্রিয়াঃ-ক্রিয়া; দান-দান; ক্রিয়াঃ-ক্রিয়া; চ-ও; বিবিধাঃ-নানাবিধ; ক্রিয়ন্তে-অনুষ্ঠিত হয়; মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ-মুক্তিকামীদের দ্বারা।

গীতার গান

অতএব যজ্ঞ দান তপস্যার ফল।
অন্যাভিলাষ নহে ভক্তির কারণ ॥
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সেজন্য যজ্ঞ দান করে।
সেই সে যজ্ঞাদি ফল বিদিত সংসারে ॥

অনুবাদ

মুক্তিকামীরা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ-পূর্বক নানা প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, দান আদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাৎপর্য

চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হলে জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কর্ম করা উচিত নয়। চিন্ময় জগৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার পরম উদ্দেশ্য নিয়ে সমস্ত কর্ম করা উচিত।

শ্লোক ২৬-২৭

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

সদ্ভাবে-ব্রহ্মের ভাব অবলম্বন করে; সাধুভাবে-ভক্তের ভাব অবলম্বন করে; চ-ও; সৎ-সৎ শব্দ; ইতি-এভাবে; এতৎ-এই; প্রযুজ্যতে-প্রযুক্ত হয়; প্রশস্তে-শুভ; কর্মণি-কর্মসমূহে; তথা-তেমনই; সচ্ছব্দঃ-'সৎ' শব্দ; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; যুজ্যতে-ব্যবহৃত হয়; যজ্ঞে-যজ্ঞে; তপসি-তপস্যায়; দানে-দানে; চ-ও; স্থিতিঃ-অবস্থিতি; সৎ-সৎ; ইতি-এভাবে; চ-এবং; উচ্যতে-উচ্চারিত হয়; কর্ম-কর্ম; চ-ও; এব-অবশ্যই; তৎ-সেই; অর্থীয়ম্-অর্থে; সৎ-সৎ; ইতি-এই; এব-অবশ্যই; অভিধীয়তে-অভিহিত হয়।

গীতার গান

সৎ সে শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মপর।
সে উদ্দেশ্যে যত কর্ম সব ব্রহ্মপর ॥
যজ্ঞ দান তপ কার্য সে উদ্দেশ্যে করে।
লৌকিক বৈদিক কর্ম ব্রহ্ম নাম ধরে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সৎভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। তেমনই শুভকর্মসমূহে 'সৎ'

শব্দ ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে 'সৎ' শব্দ উচ্চারিত হয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম ব্রহ্মোদ্দেশক হলেই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

প্রশস্তে কর্মণি কথাগুলির অর্থ এই যে, বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম পবিত্রকারক কাজকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে, যা শৈশবে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত পালন করা উচিত। জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পবিত্রকারক কর্তব্যগুলি অনুষ্ঠান করা হয়। এই সমস্ত কাজকর্মে ও তৎ সৎ মন্ত্র উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সদ্ভাবে ও সাধুভাবে শব্দগুলি দিব্য অবস্থাদি নির্দেশ করে। কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্মকে বলা হয় সত্ত্ব এবং যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁকে বলা হয় 'সাধু'। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২৫) বলা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গ করার ফলে অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে যে কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে সতাং প্রসঙ্গাৎ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যখন দীক্ষা বা উপবীত দান করা হয়, তখন ওঁ তৎ সৎ শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয়। তেমনই, সব রকম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ওঁ তৎ সৎ। তদর্থীয়ম্ শব্দটি আরও বোঝাচ্ছে, পরম-তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে এমন যে কোন কিছুর প্রতি সেবা নিবেদন, যেমন রান্না করা ও মন্দিরে সহায়তা করা অথবা ভগবানের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন রকম কাজকর্ম। সমস্ত কর্মকে পবিত্র করে তোলার উদ্দেশ্যে ওঁ তৎ সৎ শব্দগুলি বহুভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সব কিছুকে সম্যভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে।

শ্লোক ২৮

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

অশ্রদ্ধয়া-অশ্রদ্ধা সহকারে; হুতম্-হোম; দত্তম্-দান; তপঃ-তপস্যা; তপ্তম্-অনুষ্ঠিত; কৃতম্ করা হয়; চ-ও; যৎ-যা; অসৎ-সৎ নয়; ইতি-এভাবে; উচ্যতে বলা হয়; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ন-না;-ও; তৎ-সে সমস্ত ক্রিয়া; প্রেত্য-পরলোকে; নো-না; ইহ-ইহলোকে।

গীতার গান

সে শ্রদ্ধা বিনা যাহা কর্ম কৃত হয়।
অসৎ কর্ম তার নাম শাস্ত্রেতে নির্ণয় ॥
অসৎ কর্ম শুদ্ধ নহে ইহ পরকালে।
শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে সেই ফল ফলে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান বা তপস্যা যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় 'অসৎ'। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহলোকে ও পরলোকে ফলদায়ক হয় না।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উদ্দেশ্য রহিত যা কিছুই করা হয়, তা যজ্ঞ হোক, দান হোক বা তপস্যাই হোক, তা সবই নিরর্থক। তাই এই শ্লোকটিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেই সমস্ত কর্ম জঘন্য। সব কিছুই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরব্রহ্মের জন্য করা উচিত। এই বিশ্বাস না থাকলে

এবং যথার্থ পথপ্রদর্শক না থাকলে কখনই কোন ফল লাভ হবে না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরম-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস-পরায়ণ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশাদি অনুসরণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এই নীতি অনুসরণ না করলে কেউই সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম থেকেই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের অনুশীলন করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। সব কিছু সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার এটিই হচ্ছে পন্থা।
বদ্ধ অবস্থায় মানুষ দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, অথবা কুবের আদি যক্ষদের পূজা করার প্রতি আসক্ত থাকে। রজ ও তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণ শ্রেয়। কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করেছেন, তিনি এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণেরই অতীত। যদিও ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করার পন্থা রয়েছে, তবুও যদি কেউ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করতে পারেন, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা এবং এই অধ্যায়ে সেটিই অনুমোদিত হয়েছে। এভাবেই জীবন সার্থক করতে হলে, সর্ব প্রথমে সদ্গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তখন পরম-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হবে। কালক্রমে সেই বিশ্বাস যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ভগবৎ-প্রেম। এই প্রেমই হচ্ছে জীবসমূহের পরম লক্ষ্য। তাই, সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সপ্তদশ অধ্যায়ের বক্তব্য।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায় - মোক্ষযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; সন্ন্যাসস্য-সন্ন্যাসের; মহাবাহো-হে মহাবাহো; তত্ত্বম্-তত্ত্ব; ইচ্ছামি-ইচ্ছা করি; বেদিতুম্-জানতে; ত্যাগস্য-ত্যাগের; চ-ও; হৃষীকেশ-হে হৃষীকেশ; পৃথক্ পৃথকভাবে; কেশিনিসূদন-হে কেশিহন্তা।

গীতার গান
অর্জুন কহিলেন:
সন্ন্যাসের তত্ত্ব কিবা ইচ্ছা সে শুনিতে।
হৃষীকেশ কহ তাই মোরে বুঝাইতে ।

কেশিনিসূদন কহ ত্যাগের মহিমা।
শুনিতে আনন্দ হয় নাহি পরিসীমা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ। হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্গীতা সতেরটি অধ্যায়েই সমাপ্ত। অষ্টাদশ অধ্যায়টি হচ্ছে পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরিপূরক সারাংশ। ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই একই বিষয়বস্তু জ্ঞানের গুহ্যতম পন্থারূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ভক্তিযোগের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে-যোগিনামপি সর্বেষাম্..... "সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরে আমাকে চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ।" পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তি, তার প্রকৃতি এবং তার অনুশীলনের বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ ছয়টি অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ, অপ্রাকৃত প্রকৃতি ও ভগবৎ-সেবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, যিনি ওঁ তৎ সৎ শব্দগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছেন, যা পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুকেই নির্দেশ করে। ভগবদ্গীতার তৃতীয় পর্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। পূর্বতন আচার্যগণের দ্বারা এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্রের উদ্ধৃতি সহকারে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। কোন কোন নির্বিশেষবাদীরা মনে করেন যে, বেদান্তসূত্র জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার কেবল তাঁদেরই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত-সূত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করা। কারণ, ভগবান নিজেই হচ্ছেন বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা এবং তিনিই হচ্ছেন বেদান্তবেত্তা। সেই কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি শাস্ত্রের, প্রতিটি বেদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ভগবদ্গীতায় সেই কথা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই অষ্টাদশ অধ্যায়েও সমস্ত উপদেশের সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। বৈরাগ্য ও জড়া প্রকৃতির তিনগুণের ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার দুটি পৃথক বিষয়বস্তু-ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে অর্জুন স্পষ্টভাবে জানতে চাইছেন। এভাবেই তিনি এই দুটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন।
ভগবানকে সম্বোধন করে এখানে যে দুটি শব্দ 'হৃষীকেশ' ও 'কেশিনিসূদন' ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। হহৃষীকেশ হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমাদের মানসিক শান্তি লাভের জন্য সব সময় সাহায্য করেন। অর্জুন তাঁকে অনুরোধ করছেন, সব কিছুর সারমর্ম এমনভাবে বর্ণনা করতে যাতে তিনি তাঁর মনের সাম্যভাব বজায় রেখে অবিচলিত চিত্ত হতে পারেন। তবুও তাঁর মনে সন্দেহ রয়েছে এবং সন্দেহকে সব সময় অসুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'কেশিনিসূদন' বলে সম্বোধন করছেন। কেশী ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অসুর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করেছিলেন। এখন অর্জুন প্রত্যাশা করছেন যে, তাঁর মনের সন্দেহরূপী অসুরটিকেও শ্রীকৃষ্ণ নাশ করবেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ-পরমেশ্বর ভগবান বললেন; কাম্যানাম্-কাম্য; কর্মনাম্-কর্মসমূহের; ন্যাসম্-ত্যাগকে; সন্ন্যাসম্-সন্ন্যাস; কবয়ঃ-পণ্ডিতগণ; বিদুঃ-জানেন; সর্ব-সমস্ত; কর্ম-কর্ম; ফল-ফল; ত্যাগম্-ত্যাগকে; প্রাহুঃ-বলেন; ত্যাগম্-ত্যাগ; বিচক্ষণাঃ-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

গীতার গান
শ্রীভগবান কহিলেন:
কাম্যকর্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাস সে হয়।
সর্বকর্ম ফলত্যাগ ত্যাগ পরিচয় ॥
বিচক্ষণ করি যত করিল নির্ণয় ।
সেই সে সন্ন্যাস আর ত্যাগ নাম হয় ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন-পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন।

তাৎপর্য

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে কর্ম, তা ত্যাগ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার নির্দেশ। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য যে কর্ম, তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদনের বিভিন্ন বিধি-বিধান বৈদিক শাস্ত্রে আছে। পুত্র লাভের জন্য অথবা স্বর্গ লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়, কিন্তু কামনার বশবর্তী হয়ে যজ্ঞ করা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তা বলে, নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা পারমার্থিক বিজ্ঞানে উন্নতি লাভের জন্য যে সমস্ত যজ্ঞ, তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

ত্যাজ্যম্ ত্যাজ্য; দোষবৎ-দোষযুক্ত; ইতি-সেই হেতু; একে-এক শ্রেণীর; কর্ম-কর্ম; প্রাহুঃ-বলেন; মনীষিণঃ-মনীষীগণ; যজ্ঞ যজ্ঞ; দান-দান; তপঃ -তপস্যা; কর্ম-কর্ম, ন-নয়; ত্যাজ্যম্-ত্যাজ্য; ইতি-এভাবে; চ-এবং; অপরে-অন্যেরা।

গীতার গান
মনীষীগণ সর্ব কর্ম ত্যাগ করে।
যজ্ঞ দান তপক্রিয়া নহে, কহয়ে অপরে ॥

অনুবাদ

এক শ্রেণীর মনীষীগণ বলেন যে, কর্ম দোষযুক্ত, সেই হেতু তা পরিত্যজ্য। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে অত্যাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে এমন অনেক কার্যকলাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। আবার সেই সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে যে, পশুহত্যা করা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম। যদিও যজ্ঞে পশুবলির নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পশু হত্যা করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যজ্ঞে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুটিকে নবজীবন দান করা। কখনও কখনও যজ্ঞে বলি দেওয়ার মাধ্যমে পশুটিকে নতুন পশুর জীবন দেওয়া হত এবং কখনও কখনও পশুটিকে তৎক্ষণাৎ মনুষ্য-জীবনে উন্নীত করা হত। কিন্তু এই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন যে, পশুহত্যা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত, আবার কেউ বলেন যে, কোন বিশেষ যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া মঙ্গলজনক। যজ্ঞ সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দেহের নিরসন ভগবান নিজেই এখন করছেন।

শ্লোক ৪

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥৪॥

নিশ্চয়ম্-নিশ্চয় সিদ্ধান্ত; শৃণু-শ্রবণ কর; মে-আমার; তত্র-সেই; ত্যাগে-ত্যাগ সম্বন্ধে; ভরতসত্তম-হে ভারতশ্রেষ্ঠ; ত্যাগঃ-ত্যাগ; হি-অবশ্যই; পুরুষব্যাঘ্র-হে পুরুষব্যাঘ্র; ত্রিবিধঃ-তিন প্রকার; সংপ্রকীর্তিতঃ-কীর্তিত হয়েছে।

গীতার গান

তার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত কহি তাহা শুন।
ত্রিবিধ সে ত্যাগ হয় ভরতসত্তম ॥

অনুবাদ

হে ভরতসত্তম! ত্যাগ সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! শাস্ত্রে ত্যাগও তিন প্রকার বলে কীর্তিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ত্যাগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও, এখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রায় দিচ্ছেন, যা চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা উচিত। যে যাই বলুন, বেদ হচ্ছে ভগবান প্রদত্ত নীতিবিশেষ। এখানে ভগবান নিজেই উপস্থিত থেকে যা বলছেন, তাঁর নির্দেশকে চরম বলে গ্রহণ করা উচিত। ভগবান বলেছেন যে, প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম ত্যাগ করা হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিবেচনা করা উচিত।

শ্লোক ৫

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ-যজ্ঞ; দান-দান; তপঃ-তপস্যা; কর্ম-কর্ম; ন-নয়; ত্যাজ্যম্-ত্যাজ্য; কার্যম্-করা কর্তব্য; এব-অবশ্যই; তৎ-তা; যজ্ঞঃ-যজ্ঞ; দানম্-দান; তপঃ -তপস্যা; চ-ও; এব-অবশ্যই: পাবনানি-পবিত্র করে; মনীষীণাম্-মনীষীদের পর্যন্ত।

গীতার গান

স্বরূপত যজ্ঞদান কভু ত্যাজ্য নয়।
সকল সময়ে তাহা কার্য যোগ্য হয় ।
বদ্ধজীব আছে যত তাদের কর্তব্য।
মনীষী পাবন সেই যজ্ঞ দান কার্য ।

অনুবাদ

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নয়, তা অবশ্যই করা কর্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করে।

তাৎপর্য

যোগীদের উচিত মানব-সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম সম্পাদন করা। মানুষকে পরমার্থের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী অনেক শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিবাহ অনুষ্ঠানকেও এই রকম একটি পবিত্র কর্ম বলে গণ্য করা হয়। তাকে বলা হয় 'বিবাহ-যজ্ঞ'। একজন সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি বিবাহ অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করা উচিত? ভগবান এখানে বলেছেন যে, মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। বিবাহ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে সংযত করে শান্ত করা, যাতে সে পরমার্থ সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই 'বিবাহ-যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করা উচিত এবং তাদের এভাবেই অনুপ্রাণিত করা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কর্তব্য। সন্ন্যাসীর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যারা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছে, যারা যুবক, তারা বিবাহ করে সহধর্মিণী গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত থাকবে। শাস্ত্রে নির্দেশিত সব কয়টি যজ্ঞই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করার জন্যই সাধিত হয়। তাই, নিম্নতর স্তরে সেগুলি বর্জন করা উচিত নয়। করা হয়। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী, পারমার্থিক উন্নতির সহায়ক। তেমনই, হৃদয়কে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে দান যোগ্য পাত্রে যদি দান করা হয়, তা হলে তা

শ্লোক ৬

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬॥

এতানি-এই সমস্ত; অপি-অবশ্যই; তু-কিন্তু; কর্মাণি-কর্ম; সঙ্গম্-আসক্তি; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; ফলানি-ফলসমূহ; চ-ও; কর্তব্যানি-কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত; ইতি-ইহাই; মে-আমার; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; নিশ্চিতম্-নিশ্চিত; মতম্-অভিমত; উত্তমম্-উত্তম।

গীতার গান

যে কার্যের অনুষ্ঠান ফলসঙ্গ ত্যাগ ।
কর্তব্যের অনুরোধে শুধু তাহে রাগ ॥

অনুবাদ

হে পার্থ। এই সমস্ত কর্ম আসক্তি ও ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত।

তাৎপর্য

যদিও সব কয়টি যজ্ঞই পবিত্র, তবুও তা অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে কোন রকম ফলের আশা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত যজ্ঞ, তা বর্জন করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত যজ্ঞ মানুষের অস্তিত্বকে পবিত্র করে এবং তাদের পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করে, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়ক সব কিছুকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে, যে সমস্ত কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়ক তা গ্রহণ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে ধর্মের সর্বোচ্চ নীতি। ভগবদ্ভক্তি সাধনের সহায়ক যে কোন রকমের কার্য, যজ্ঞ বা দান ভগবদ্ভক্তের গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৭

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তস্য-নিত্য; তু-কিন্তু; সন্ন্যাসঃ-ত্যাগ; কর্মণঃ-কর্মের; ন-নয়; উপপদ্যতে-উপযুক্ত; মোহাৎ- মোহবশত; তস্য-তার; পরিত্যাগঃ-পরিত্যাগ; তামসঃ-তামসিক; পরিকীর্তিতঃ বলা হয়।

গীতার গান

নির্দিষ্ট কর্মের ত্যাগ নহে সে বিধান।
মোহেতে সে ত্যাগ হয় তামসিক জ্ঞান ॥

অনুবাদ

কিন্তু নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশত তার ত্যাগ হলে, তাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়।

তাৎপর্য

জড় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কর্ম তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম মানুষকে পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপে উন্নীত করে, যেমন ভগবানের জন্য রান্না করা, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা এবং ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সন্ন্যাসীর নিজের জন্য রান্না করা উচিত নয়। নিজের জন্য রান্না করা নিষিদ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের জন্য রান্না করতে কোন বাধা নেই। তেমনই, শিষ্যকে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য সন্ন্যাসী বিবাহ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই সমুক্ত কর্মগুলিকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তমোগুণে কর্ম করছে।

শ্লোক ৮

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

দুঃখম্-দুঃখজনক; ইতি-এভাবে; এব-অবশ্যই; যৎ-যে; কর্ম-কর্ম, কায়-দৈহিক; ক্লেশ-ক্লেশের; ভয়াৎ-ভয়ে; ত্যজেৎ-ত্যাগ করেন; সঃ-তিনি; কৃত্বা-করে: রাজসম্-রাজসিক; ত্যাগম্-ত্যাগ; ন-না; এব-অবশ্যই; ত্যাগ-ত্যাগের; ফলম্-ফল; লভেৎ-লাভ করেন।

গীতার গান

দুঃখ হয় তার জন্য কর্মত্যাগ করে।
কিংবা কর্মত্যাগ করে কায়ক্লেশ ডরে ॥
রাজসিক ত্যাগ সেই ফল নাহি পায়।
সেই যে কহিনু যত শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

অনুবাদ

যিনি নিত্যকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই সেই রাজসিক ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না।

তাৎপর্য

অর্থ উপার্জন করাকে ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম বলে মনে করে কৃষ্ণভক্তের অর্থ উপার্জন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা হয়, অথবা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা যদি পারমার্থিক কৃষ্ণভক্তির সহায়ক হয়, তা হলে সেই সমস্ত কর্মগুলি কষ্টদায়ক বলে তার ভয়ে সেগুলির অনুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এই ধরনের ত্যাগ রাজসিক মনোভাবাপন্ন। রাজসিক কর্মের ফল সব সময় ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে। সেই মনোভাব নিয়ে কেউ যদি কর্ম পরিত্যাগ করেন, তা হলে তিনি ত্যাগের যথার্থ সুফল কখনই অর্জন করেন না।

শ্লোক ৯

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্তা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ৷ ৯ ॥

কার্যম্-কর্তব্য; ইতি এব-এই মনে করে; যৎ-যে; কর্ম-কর্ম; নিয়তম্-নিত্য; ক্রিয়তে-অনুষ্ঠান করা হয়; অর্জুন-হে অর্জুন; সঙ্গম্-আসক্তি; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; ফলম্-ফল; চ-ও; এব-অবশ্যই; সঃ-সেই; ত্যাগঃ-ত্যাগ; সাত্ত্বিকঃ-সাত্ত্বিক; মতঃ-আমার মতে।

গীতার গান

কর্তব্য জানিয়া যেবা সর্ব কর্ম করে।
ফলত্যাগ করিবারে সাত্ত্বিক নাম ধরে ।

অনুবাদ

হে অর্জুন! আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক।

তাৎপর্য

এমন মনোভাব নিয়ে সর্বদাই নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত যেন ফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা হয়। এমন কি, কাজের ধরনের প্রতিও অনাসক্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণভাবনাময় কোন ভক্ত যদি কখনও কোন কারখানাতেও কাজ করেন, তখন তিনি

কারখানার কাজের প্রতি আসক্ত হন না এবং কারখানার শ্রমিকদের প্রতিও আসক্ত হন না। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাজ করেন এবং যখন তিনি কর্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তখন তাঁর সেই কর্ম অপ্রাকৃত স্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্লোক ১০

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

ন-না; দ্বেষ্টি-বিদ্বেষ করেন; অকুশলম্-অশুভ; কর্ম-কর্মে; কুশলে-শুভকর্মে; ন-না; অনুযজ্জতে-আসক্ত হন; ত্যাগী-ত্যাগী; সত্ত্ব-সত্ত্বগুণে; সমাবিষ্টঃ -আবিষ্ট; মেধাবী-বুদ্ধিমান; ছিন্ন-ছিন্ন; সংশয়ঃ-সমস্ত সংশয়।

গীতার গান

কর্তব্যের অনুরোধে অকুশলও করে।
আসক্তি নাহি সে কুশল কর্মের তরে ।
মেধাবী যে ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্ট হয়।
ছিন্ন তার হয়ে যায় সকল সংশয় ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণে আবিষ্ট, মেধাবী ও সমস্ত সংশয়-ছিন্ন ত্যাগী অশুভ কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

যে মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় বা সত্ত্বগুণময়, তিনি কাউকে বা শরীরের পক্ষে ক্লেশদায়ক কোন কিছুকেই ঘৃণা করেন না। তিনি শারীরিক দুঃখ-কষ্টের পরোয়া না করে যথাস্থানে ও যথাসময়ে তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেন। ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত এই সমস্ত মানুষদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং তাঁদের কার্যকলাপ সর্ব প্রকারেই সন্দেহাতীত বলে জানতে হবে।

শ্লোক ১১

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যজুং কর্মাণ্যশেষতঃ ।
যস্ত্র কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

ন-নয়; হি-অবশ্যই; দেহভৃতা-দেহধারী জীবের; শক্যম্-সম্ভব; ত্যজুম্ পরিত্যাগ করা; কর্মাণি-কর্মসমূহ; অশেষতঃ-সম্পূর্ণরূপে; যঃ-যিনি; তু-কিন্তু; কর্ম-কর্ম, ফল-ফল; ত্যাগী-পরিত্যাগী; সঃ-তিনি; ত্যাগী-ত্যাগী; ইতি-এরূপ; অভিধীয়তে-অভিহিত হন।

গীতার গান

দেহধারী জীব কর্মত্যাগ নাহি করে ।
কর্মফল ত্যাগ করি ত্যাগী নাম ধরে ।

অনুবাদ

অবশ্যই দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যিনি সমস্ত

কর্মফল পরিত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কেউ কখনও কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। তাই, কর্মফল ভোগের আশা না করে যিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন, যিনি সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ত্যাগী। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বহু সভ্য আছেন, যাঁরা অফিসে, কলকারখানায় অথবা অন্য জায়গায় খুব কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং তাঁরা যা রোজগার করছেন, তা সবই সংঘকে দান করছেন। এই সমস্ত মহাত্মারাই যথার্থ সন্ন্যাসী। এঁরাই যথার্থ ত্যাগের জীবন যাপন করছেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিভাবে কর্মফল ত্যাগ করতে হয় এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেই কর্মফল ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১২

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অনিষ্টম্-নরক প্রাপ্তিরূপ; ইষ্টম্-স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ; মিশ্রম্-মিশ্র; চ-এবং; ত্রিবিধম্-তিন প্রকার; কর্মণঃ-কর্মের; ফলম্-ফল; ভবতি হয়; অত্যাগিনাম্-ত্যাগরহিত ব্যক্তিদের; প্রেত্য-পরলোকে; ন-না; তু-কিন্তু; সন্ন্যাসিনাম্-সন্ন্যাসীদের; ক্বচিৎ-কখনও।

গীতার গান

অনিষ্ট ইষ্ট বা মিশ্র কর্মফল হয়।
কিন্তু সন্ন্যাসীর সেই কিছু ভোগ নয় ॥

অনুবাদ

যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেননি, তাঁদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র-এই তিন প্রকার কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কখনও ফলভোগ করতে হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে যে মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করছেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত। তাই তাঁকে মৃত্যুর পরে তাঁর কর্মফল-স্বরূপ সুখ বা দুঃখ কিছুই ভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ১৩

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চ-পাঁচটি; এতানি-এই; মহাবাহো-হে মহাবাহো; কারণানি-কারণ; নিবোধ-অবগত হও; মে-আমার থেকে; সাংখ্যে-বেদান্ত শাস্ত্রে; কৃতান্তে-সিদ্ধান্তে; প্রোক্তানি-কথিত: সিদ্ধয়ে-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে; সর্ব-সমস্ত: কর্মণাম্-কর্মের।

গীতার গান

পঞ্চ সে কারণ হয় সকল কার্যের।
মহাবাহো শুন সেই কহি সে তোমারে ॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত সেই শাস্ত্রের নির্ণয়।
ভালমন্দ যাহা কিছু সেই সে পর্যায় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, আমার থেকে তা অবগত হও।

তাৎপর্য

প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই যখন একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা হলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষকে তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কোনটিই ভোগ করতে হয় না? ভগবান বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করছেন কি করে তা সম্ভব। তিনি বলেছেন যে, সমস্ত কার্যের পিছনে পাঁচটি কারণ আছে এবং সমস্ত কার্যের সাফল্যের পিছনেও এই পাঁচটি কারণ আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। সাংখ্য কথাটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের বৃত্ত এবং বেদান্তকে সমস্ত আচার্যেরা জ্ঞানের চরম বৃত্ত বলে গ্রহণ করেছেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেদান্ত-সূত্রকে এভাবেই স্বীকার করেছেন। তাই, এই সমস্ত শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা যথাযথভাবে আলোচনা করা উচিত।
সব কিছুর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পত্তি হচ্ছে পরমাত্মার ইচ্ছা। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। তিনি সকলকে তার পূর্বের কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নানা রকম কাজে নিযুক্ত করছেন। অন্তর্যামীরূপে তিনি যে নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করলে, এই জন্মে বা পরজন্মে কোন কর্মফল উৎপাদন করে না।

শ্লোক ১৪

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠানম্-স্থান; তথা-ও; কর্তা-কর্তা; করণম্ করণ; চ-এবং; পৃথগ্‌বিধম্ নানা প্রকার; বিবিধাঃ-বিবিধ; চ-এবং; পৃথক্ পৃথক, চেষ্টাঃ-প্রচেষ্টা; দৈবম্-দৈব; চ-ও; এব-অবশ্যই; অত্র-এখানে; পঞ্চমম্-পাঁচটি।

গীতার গান

অধিষ্ঠান কর্তা আর করণ পৃথক।
বিবিধ সে চেষ্টা দৈব এ পঞ্চশীর্ষক ॥

অনুবাদ

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্তা, নানা প্রকার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, বিবিধ প্রচেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ পরমাত্মা-এই পাঁচটি হচ্ছে কারণ।

তাৎপর্য

অধিষ্ঠানম্ শব্দটির দ্বারা শরীরকে বোঝানো হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ আত্মা কর্মের ফলাদি সৃষ্টি করছেন এবং সেই কারণে তাঁকে বলা হয় কর্তা। আত্মাই যে জ্ঞাতা ও কর্তা, সেই কথা শ্রুতি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা (প্রশ্ন উপনিষদ ৪/৯)। বেদান্ত-

সূত্রের জ্ঞোহত এব (২/৩/১৮) এবং কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (২/৩/৩৩) শ্লোকেও তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কাজ করার যন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় আত্মা নানাভাবে কাজ করে। প্রতিটি কাজের জন্য নানা রকম প্রয়াস করতে হয়। কিন্তু সকলের সমস্ত কার্যকলাপ নির্ভর করে পরমাত্মার ইচ্ছার উপরে, যিনি সকলের হৃদয়ে বন্ধুরূপে বিরাজ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম কারণ। এই অবস্থায়, যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবা করে চলেছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই কোন কর্মের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হন না। যাঁরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, তাঁদের কোন কর্মের জন্যই তাঁরা নিজেরা শেষ পর্যন্ত দায়ী হন না। সব কিছুই নির্ভর করে পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার উপর।

শ্লোক ১৫

শরীরবাত্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

শরীর-দেহ; বাক্-বাক্য; মনোভিঃ-মনের দ্বারা; যৎ-যে; কর্ম-কর্ম; প্রারভতে-আরম্ভ করে; নরঃ-মানুষ; নায্যম্ ন্যায়যুক্ত; বা-অথবা; বিপরীতম্ বিপরীত; বা-অথবা; পঞ্চ-পাঁচটি; এতে-এই; তস্য-তার; হেতবঃ-কারণ।

গীতার গান

শরীর বচন মন কর্ম তৎ দ্বারা।
ন্যায্য বা অন্যায্য যত কর্ম সারা ॥
সবার কারণ হয় সেই পঞ্চবিধ ।
সকল কার্যের হয় সেই সে হেতব ॥

অনুবাদ

শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ যে কর্ম আরম্ভ করে, তা ন্যায্যই হোক অথবা অন্যায্যই হোক, এই পাঁচটি তার কারণ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লিখিত 'ন্যায্য' এবং তার বিপরীত 'অন্যায্য' শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ন্যায্য কর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অন্যায্য কর্ম শাস্ত্রবিধির অবহেলা করে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে কাজই হোক না কেন, তার সম্যক্ অনুষ্ঠানের জন্য এই পঞ্চবিধ কারণ প্রয়োজন।

শ্লোক ১৬

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র-সেখানে; এবম্-এভাবে; সতি-হলেও; কর্তারম্-কর্তারূপে; আত্মানম্-নিজেকে; কেবলম্-কেবল; তু-কিন্তু; যঃ-যে; পশ্যতি-দর্শন করে; অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ-বুদ্ধির অভাববশত;

ন-না; সঃ-সেই; পশ্যতি-দর্শন করতে পারে; দুর্মতিঃ-দুর্মতি।

গীতার গান

মূর্খ যারা কর্তা সাজে নিজ মনগড়া।
না বুঝিয়া কারণ সে শুধু কর্তা ছাড়া ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্মের পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা না করে যে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, বুদ্ধির অভাববশত সেই দুর্মতি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

কোন মূর্খ লোক বুঝতে পারে না যে, পরম বন্ধুরূপে পরমাত্মা তার হৃদয়ে বসে আছেন এবং তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন। যদিও কর্মক্ষেত্র, কর্মকর্তা, প্রচেষ্টা ও ইন্দ্রিয়সমূহ-এই চারটি হচ্ছে জড় কারণ, কিন্তু পরম কারণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সুতরাং, চারটি জড় কারণকেই কেবল দেখা উচিত নয়, পরম নিমিত্ত যে কারণ, তাকেও দেখা উচিত। যে পরমেশ্বরকে দেখতে পায় না, সে নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে।

শ্লোক ১৭

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যস্য-যাঁর; ন-নেই; অহংকৃতঃ-অহংকারের; ভাবঃ-ভাব; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; যস্য-যাঁর; ন-না; লিপ্যতে-লিপ্ত হয়; হত্বা অপি-হত্যা করেও; সঃ-তিনি; ইমান্-এই সমস্ত; লোকান্-প্রাণীকে; ন-না; হন্তি-হত্যা করেন; ন-না; নিবধ্যতে-আবদ্ধ হন।

গীতার গান

অতএব যে না হয় অহঙ্কারে মত্ত।
বুদ্ধি যার অহংভাবে নাহি হয় লিপ্ত ॥
কর্তব্যের অনুরোধে যদি বিশ্ব মারে।
কাহাকেও মারে না সে কিংবা কর্ম করে ।

অনুবাদ

যাঁর অহঙ্কারের ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, যুদ্ধ না করার যে বাসনা তা উদয় হচ্ছে অহঙ্কার থেকে। অর্জুন নিজেকেই কর্তা বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু তিনি অন্তরে ও বাইরে পরম অনুমোদনের কথা বিবেচনা করেননি। কেউ যদি পরম অনুমোদন সম্বন্ধে অবগত হতে না পারে, তা হলে তিনি কেন কর্ম করবেন? কিন্তু যিনি কর্মের করণ, নিজেকে কর্তা এবং পরমেশ্বর ভগবানকে পরম অনুমোদনকারী বলে জানেন, তিনি সব কিছু সুচারুভাবে করতে পারেন। এই ধরনের মানুষ কখনই মোহাচ্ছন্ন হন না। ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং তার দায়িত্বের উদয় হয় অহঙ্কার, নাস্তিকতা অথবা কৃষ্ণভাবনার অভাব থেকে। যিনি পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচালনায় কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করে চলেছেন,

তিনি যদি হত্যাও করেন, তা হলেও তা হত্যা নয় এবং তিনি কখনই এই ধরনের হত্যা করার জন্য তার ফল ভোগ করেন না। কোন সৈনিক যখন তার সেনাপতির আদেশ অনুসারে শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে, তখন তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। কিন্তু কোন সৈনিক যদি তার নিজের ইচ্ছায় কাউকে হত্যা করে, তা হলে অবশ্যই বিচারালয়ে তার বিচার হবে।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্-জ্ঞান; জ্ঞেয়ম্-জ্ঞেয়; পরিজ্ঞাতা-জ্ঞাতা; ত্রিবিধা-তিন প্রকার; কর্ম-কর্মের; চোদনা-প্রেরণা; করণম্-ইন্দ্রিয়গুলি; কর্ম-কর্ম; কর্তা-কর্তা; ইতি-এই: ত্রিবিধঃ-তিন প্রকার; কর্ম-কর্মের; সংগ্রহঃ-আশ্রয়।

গীতার গান

কর্মের প্রেরণা হয় জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা।
কর্মের সংগ্রহ সে করণ কর্মকর্তা ॥

অনুবাদ

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা-এই তিনটি কর্মের প্রেরণা; করণ, কর্ম ও কর্তা-এই তিনটি কর্মের আশ্রয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা-এই তিনের অনুপ্রেরণায় আমাদের সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম সাধিত হয়। কাজের সহায়ক উপকরণাদি, আসল কাজটি এবং তার কর্মকর্তা-এদের বলা হয় কাজের উপাদান। মানুষের যে কোন কাজকর্মে এই উপাদানগুলি-থাকে। কাজ করার আগে খানিকটা উদ্দীপনা থাকে, যাকে বলা হয় অনুপ্রেরণা। কাজটি ঘটবার আগে যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তা হচ্ছে সূক্ষ্ম ধরনেরই কাজ। তারপর কাজটি ক্রিয়ার রূপ নেয়। প্রথমে আমাদের চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা-এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং তাকে বলা হয় উদ্দীপনা। কর্ম করার অনুপ্রেরণা যদি শাস্ত্র বা গুরুদেবের নির্দেশ থেকে আসে, তা হলে তা অভিন্ন। যখন অনুপ্রেরণা রয়েছে এবং কর্তা রয়েছে, তখন মনসহ ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে প্রকৃত কার্য সাধিত হয়। মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। যে কোন কার্যের সমস্ত উপাদানগুলিকে বলা হয় কর্মসংগ্রহ।

শ্লোক ১৯

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানম্-জ্ঞান; কর্ম-কর্ম; চ-ও; কর্তাকর্তা; চ-ও; ত্রিধা ত্রিবিধ; এব-অবশ্যই; গুণভেদতঃ-গুণভেদ হেতু; প্রোচ্যতে কথিত হয়; গুণসংখ্যানে বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে; যথাবৎ-যথাযথ

রূপে; শৃণু-শ্রবণ কর; তানি-সেই সমস্ত; অপি-ও।

গীতার গান

জ্ঞান আর কর্তা হয় ত্রিবিধ গুণ ভেদে।
কহিব সে ত্রিবিধ ভেদ তোমাকে সংক্ষেপে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকার বলে কথিত হয়েছে। সেই সমস্তও যথাযথ রূপে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

চতুর্দশ অধ্যায়ে জড়া প্রকৃতির গুণের তিনটি বিভাগ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সেই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সত্ত্বগুণ হচ্ছে জ্ঞানোদ্ভাসিত, রজোগুণ হচ্ছে জড়-জাগতিক ও বৈষয়িক এবং তমোগুণ হচ্ছে আলস্য ও কর্ম বিমুখতার সহায়ক। জড়া প্রকৃতির সব কয়টি গুণই হচ্ছে বন্ধন। তাদের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায় না। এমন কি, সত্ত্বগুণের মধ্যেও মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সপ্তদশ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন গুণে অধিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পূজা-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২০

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

সর্বভূতেষু-সমস্ত প্রাণীতে; যেন যার দ্বারা; একম্-এক; ভাবম্-ভাব; অব্যয়ম্ অব্যয়; ঈক্ষতে-দর্শন হয়; অবিভক্তম্-অবিভক্ত; বিভক্তেষু-পরস্পর ভিন্ন; তৎ-সেই; জ্ঞানম্-জ্ঞানকে; বিদ্ধি-জানবে; সাত্ত্বিকম্-সাত্ত্বিক।

গীতার গান

এক জীব আত্মা নানা কর্মফল ভেদে।
মনুষ্যাদি সর্বদেহে সে বর্তমান ক্ষেদে ॥
অব্যয় সে জীব হয় একতত্ত্ব জ্ঞান।
বিভিন্নতে এক দেখে সেই সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥

অনুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে এক অবিভক্ত চিন্ময় ভাব দর্শন হয়, অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্তায় তারা এক, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

যিনি দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, জলজ বা উদ্ভিজ্জ সমস্ত জীবের মধ্যেই এক চিন্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী। প্রতিটি জীবের মধ্যে একটি চিন্নায় আখা রয়েছে, যদিও জীবগুলি তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দেহ অর্জন করেছে। সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্ট শক্তি থেকেই প্রত্যেক জীবের দেহে জীবনী-শক্তির প্রকাশ ঘটে। এভাবেই প্রতিটি জীবদেহে জীবনীশক্তি-স্বরূপ এক উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতিকে দর্শন করাই হচ্ছে সাত্ত্বিক

দর্শন। দেহের বিনাশ হলেও সেই জীবনী-শক্তিটি অবিনশ্বর। জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। যেহেতু বদ্ধ জীবনে জড় অস্তিত্বের নানা রকম রূপ আছে, তাই জীবনীশক্তিকে ঐভাবে বহুধা বিভক্ত বলে মনে হয়। এই ধরনের নির্বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধিরই একটি অঙ্গ।

শ্লোক ২১

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

পৃথক্ত্বেন-পৃথকরূপে; তু-কিন্তু; যৎ-যে; জ্ঞানম্-জ্ঞান; নানাভাবান্-ভিন্ন ভিন্ন ভাব; পৃথগ্বিধান্নানাবিধ; বেত্তি-জানে; সর্বেষু-সমস্ত; ভূতেষু-প্রাণীতে; তৎ-সেই; জ্ঞানম্-জ্ঞানকে; বিদ্ধি-জানবে; রাজসম্-রাজসিক।

গীতার গান

বিভিন্ন জীবের যেই পৃথকত্ব দেখে।
রাজসিক তার জ্ঞান নানাভাবে থাকে ।

অনুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আত্মা অবস্থিত বলে পৃথকরূপে দর্শন হয়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

জড় দেহটি হচ্ছে জীব এবং দেহটি নষ্ট হয়ে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও নষ্ট হয়ে যায় বলে যে ধারণা, তাকে বলা হয় রাজসিক জ্ঞান। সেই জ্ঞান অনুসারে দেহের বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেতনার প্রকাশ। এ ছাড়া পৃথক কোন আত্মা নেই, যার থেকে চেতনার প্রকাশ হয়। দেহটি হচ্ছে যেন সেই আত্মা এবং এই দেহের ঊর্ধ্বে পৃথক কোন আত্মা নেই। এই ধরনের জ্ঞান অনুসারে চেতনা হচ্ছে সাময়িক, অথবা স্বতন্ত্র কোন আত্মা নেই। কিন্তু সর্বব্যাপক এক আত্মা রয়েছে, যা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং এই দেহটি হচ্ছে সাময়িক অজ্ঞানতার প্রকাশ, অথবা এই দেহের অতীত কোনও বিশেষ জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা নেই। এই ধরনের সমস্ত ধারণাগুলিকেই রজোগুণ-জাত বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ২২

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ-যে; তু-কিন্তু; কৃৎস্নবৎ-পরিপূর্ণের ন্যায়; একস্মিন্-কোন একটি; কার্যে-কার্যে; সক্তম্-আসক্ত; অহৈতুকম্-কারণ রহিত; অতত্ত্বার্থবৎ-প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে; অল্পম্-তুচ্ছ, চ-এবং; তৎ-সেই; তামসম্-তামসিক; উদাহৃতম্-কথিত হয়।

গীতার গান

দেহকে সর্বস্ব বুঝি যে জ্ঞান উদ্ভব।

অতত্ত্বজ্ঞ অল্পবুদ্ধি তামসিক সব ॥

অনুবাদ

আর যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে, কোন একটি বিশেষ কার্যে পরিপূর্ণের ন্যায় আসক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের 'জ্ঞান' সর্বদাই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, কারণ বদ্ধ জীবনে প্রত্যেক জীব তমোগুণে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যে মানুষ শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতে কিংবা শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রামাণ্য সূত্রে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করেনি, দেহ-সম্পর্কিত তার সেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতো কর্ম সাধনের কোন চিন্তাভাবনাই সে করে না। তার কাছে অর্থ-সম্পদই হচ্ছে ভগবান এবং জ্ঞান হচ্ছে দেহগত চাহিদার তৃপ্তিসাধন। পরম তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে এই ধরনের জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এটি অনেকটা সাধারণ একটি পশুর জ্ঞানেরই মতো-শুধুমাত্র আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা ও মৈথুন সংক্রান্ত জ্ঞান। এই ধরনের জ্ঞানকে এখানে তমোগুণ-প্রসূত বলে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে যে, এই দেহের ঊর্ধ্বে চিন্ময় আত্মা সংক্রান্ত যে জ্ঞান, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক জ্ঞান। মনোধর্ম ও জাগতিক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে যে সমস্ত মতবাদ ও ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান, তা হচ্ছে রজোগুণাশ্রিত এবং কেবলমাত্র দেহসুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যে জ্ঞান, তা হচ্ছে তমোগুণাশ্রিত।

শ্লোক ২৩

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে ।২৩।।

নিয়তম্-নিত্য; সঙ্গরহিতম্-আসক্তি রহিত হয়ে; অরাগদ্বেষতঃ-রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক; কৃতম্ অনুষ্ঠিত হয়; অফলপ্রেপ্সুনা-ফলের কামনাশূন্য; কর্ম-কর্ম, যৎ-যে; তৎ-তাকে; সাত্ত্বিকম্-সাত্ত্বিক; উচ্যতে বলা হয়।

গীতার গান

রাগ দ্বেষ সঙ্গ বিনা যে নিয়ত কর্ম।
সে জানিবে সব সাত্ত্বিকের ধর্ম ॥

অনুবাদ

ফলের কামনাশূন্য ও আসক্তি রহিত হয়ে রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রম-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ বৃত্তিমূলক কর্তব্যকর্মাদি অনাসক্তভাবে কর্তৃত্ববোধ বর্জন করে সম্পাদিত হলে এবং সেই কারণেই অনুরাগ অথবা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি কিংবা আত্ম-উপভোগ রহিত হয়ে সম্পাদিত হলে, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

শ্লোক ২৪

যতু কামেলুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

যৎ-যে; তু-কিন্তু; কামেপ্সুনা-ফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত; কর্ম-কর্ম; সাহঙ্কারেণ-অহঙ্কার যুক্ত হয়ে; বা-অথবা; পুনঃ-পুনরায়; ক্রিয়তে অনুষ্ঠিত হয়; বহুলায়াসম্-বহু কষ্টসাধ্য; তৎ-সেই; রাজসম্-রাজসিক; উদাহৃতম্-অভিহিত হয়।

গীতার গান

ফলের কামনা কর্ম অহঙ্কার সহ ।
কষ্টসাধ্য যত রাজস সমূহ ॥

অনুবাদ

কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ও অহঙ্কারযুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য করে যে কর্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই কর্ম রাজসিক বলে অভিহিত হয়।

শ্লোক ২৫

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ৷

অনুবন্ধম্-ভাবী বন্ধন; ক্ষয়ম্ ক্ষয়; হিংসাম্-হিংসা; অনপেক্ষ্য- পরিণতির কথা বিবেচনা না করে; চ-ও; পৌরুষম্-নিজ সামর্থ্যের; মোহাৎ-মোহবশত; আরভ্যতে-আরম্ভ হয়; কর্ম-কর্ম, যৎ-যে; তৎ-তাকে; তামসম্-তামসিক; উচ্যতে বলা হয়।

গীতার গান

না বুঝিয়া মোহবশে অনুবন্ধ কর্ম।
হিংসা পরতাপ আদি তামসিক ধর্ম ॥

অনুবাদ

ভাবী বন্ধন, ধর্ম জ্ঞানাদির ক্ষয়, হিংসা এবং নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের কাছে বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি যমদূতদের কাছে আমাদের সমস্ত কর্মের কৈফিয়ত দিতে হয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম হয়ে থাকে ধ্বংসাত্মক, কারণ তা শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্মের অনুশাসনাদি ধ্বংস করে। অনেক ক্ষেত্রেই তা হিংসাভিত্তিক হয় এবং অন্য জীবকে কষ্ট দেয়। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। একে বলা হয় মোহ এবং এই ধরনের সমস্ত মোহযুক্ত কাজই হচ্ছে তমোগুণ-জাত।

শ্লোক ২৬

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ।২৬ ॥

মুক্তসঙ্গঃ-সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; অনহংবাদী-অহঙ্কারশূন্য; ধৃতি-ধৃতি; উৎসাহ-উদ্যম; সমন্বিতঃ-সমন্বিত; সিদ্ধি-সিদ্ধি; অসিদ্ধ্যোঃ-অসিদ্ধিতে; নির্বিকারঃ-নির্বিকার; কর্তা-কর্তা; সাত্ত্বিকঃ-সাত্ত্বিক; উচ্যতে-বলা হয়।

গীতার গান

মুক্তসঙ্গ অনহঙ্কার ধৃতি উৎসাহপূর্ণ।
নির্বিকার সিদ্ধাসিদ্ধি সাত্ত্বিক সে ধন্য ॥

অনুবাদ

সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার-এরূপ কর্তাকেই সাত্ত্বিক বলা হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই প্রকৃতির জড় গুণগুলির অতীত। তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছে যে সমস্ত কর্ম, সেগুলির ফলের আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন না। কারণ, তিনি গর্ব ও অহঙ্কারের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তবুও সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি সর্বদাই উৎসাহ নিয়ে কাজ করে চলেন। যে দুঃখ-দুর্দশা, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়, তার জন্য তিনি দুশ্চিন্তা করেন না। তিনি সর্বদাই উৎসাহী। তিনি সফলতা বা বিফলতা কোনটিরই পরোয়া করেন না। তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতিই সমভাবাপন্ন। এই ধরনের কর্তা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৭

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

রাগী-কর্মাসক্ত; কর্মফল-কর্মফলে; প্রেপ্সুঃ-আকাঙ্ক্ষী; লুব্ধঃ-লোভী; হিংসাত্মকঃ-হিংসা-পরায়ণ; অশুচিঃ-অশুচি; হর্ষশোকান্বিতঃ-হর্ষ ও শোকযুক্ত; কর্তা-কর্তা; রাজসঃ-রাজসিক; পরিকীর্তিতঃ কথিত হয়।

গীতার গান

কর্মাসক্ত ফলে লোভ হিংসুক অশুচি।
রাজসিক কর্তা সেই হর্ষশোকে রুচি ॥

অনুবাদ

কর্মাসক্ত, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত যে কর্তা, সে রাজসিক কর্তা বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

বিশেষ কোন কর্মের প্রতি বা তার ফলের প্রতি কোন মানুষের গভীর আসক্ত হয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে জড়-জাগতিক বিষয়াদি, ঘরবাড়ি ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাঁর অত্যধিক আসক্তি। এই ধরনের মানুষের উচ্চতর জীবনে উন্নীত হওয়ার কোন অভিলাষ নেই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পৃথিবীটিকে যতদূর সম্ভব জড়-জাগতিক পদ্ধতিতে আরামদায়ক করে তোলা। সে স্বভাবতই অত্যন্ত লোভী এবং সে মনে করে যে, যা কিছু সে লাভ করেছে তা

সবই নিত্য এবং তা কখনই হারিয়ে যাবে না। এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত পরশ্রীকাতর এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে কোন জঘন্য কাজ করতে প্রস্তুত। তাই, এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত অশুচি এবং তার উপার্জন পবিত্র না অপবিত্র, সেই সম্বন্ধে সে পরোয়া করে না। তার কাজ যদি সফল হয়, তখন সে খুব খুশি হয় এবং তাঁর কাজ যদি বিফল হয়, তা হলে তার দুঃখের অন্ত থাকে না। এই ধরনের কর্তা রজোগুণে আচ্ছন্ন।

শ্লোক ২৮

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ-অনুচিত কার্যপ্রিয়; প্রাকৃতঃ-জড় চেষ্টাযুক্ত; স্তব্ধঃ-অনম্র; শঠঃ-বঞ্চক; নৈষ্কৃতিকঃ-অন্যের অবমাননাকারী; অলসঃ-অলস; বিষাদী-বিষাদযুক্ত; দীর্ঘসূত্রী-দীর্ঘসূত্রী; চ-ও; কর্তা-কর্তা; তামসঃ-তামসিক; উচ্যতে বলা হয়।

গীতার গান

অযুক্ত প্রাকৃত স্তব্ধ নৈষ্কৃতি অলস।
দীর্ঘসূত্রী বিষাদী বা কর্তা সে তামস ॥

অনুবাদ

অনুচিত কার্যপ্রিয়, জড় চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শঠ, অন্যের অবমাননাকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী যে কর্তা, তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে আমরা জানতে পারি কি ধরনের কর্ম করা উচিত এবং কি ধরনের কর্ম করা উচিত নয়। যারা এই সমস্ত অনুশাসন মানে না, তারা অনুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত বিষয়ী হয়। তারা প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্ম করে, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে কাজ করে না। এই ধরনের কর্মীরা সাধারণত খুব একটা ভদ্র হয় না। সাধারণত তারা অত্যন্ত ধূর্ত এবং অপরকে অপদস্থ করতে খুব পটু। তারা অত্যন্ত অলস, তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হলেও ঠিকমতো করে না এবং পরে করব বলে তা সরিয়ে রাখে।

তাই তাদের বিষণ্ণ বলে মনে হয়। তারা যে-কোন কার্য সম্পাদনে বিলম্ব করে; যে কাজটি এক ঘণ্টার মধ্যে করা সম্ভব, তা তারা বছরের পর বছর ফেলে রাখে। এই ধরনের কর্মীরা তমোগুণে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ২৯

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় । ২৯ ॥

বুদ্ধেঃ-বুদ্ধির; ভেদম্-ভেদ; ধৃতেঃ-ধৃতির; চ-ও; এব-অবশ্যই; গুণতঃ-জড়া প্রকৃতির গুণ দ্বারা; ত্রিবিধম্-তিন প্রকার; শৃণু-শ্রবণ কর; প্রোচ্যমানম্-যেভাবে আমি বলছি; অশেষেণ-

বিস্তারিতভাবে; পৃথক্তেন-পৃথকভাবে; ধনঞ্জয়-হে ধনঞ্জয়।

গীতার গান

বুদ্ধির যে তিন ভেদ ধৃতি আর গুণ।
ধনঞ্জয় অশেষ বিচার তার শুন ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ অনুসারে বুদ্ধির ও ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ আছে, তা আমি বিস্তারিতভাবে ও পৃথকভাবে বলছি, তুমি শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সম্বন্ধে বর্ণনা করে, ভগবান এখন একইভাবে কর্তার বুদ্ধি ও ধৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করছেন।

শ্লোক ৩০

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

প্রবৃত্তিম্-প্রবৃত্তি; চ-ও; নিবৃত্তিম্-নিবৃত্তি; চ-ও; কার্য কার্য; অকার্যে-অকার্য; ভয়-ভয়; অভয়ে-অভয়; বন্ধম্-বন্ধন; মোক্ষম্-মুক্তি; চ-ও; যা-যে; বেত্তি-জানতে পারা যায়; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; সা-সেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; সাত্ত্বিকী-সাত্ত্বিকী।

গীতার গান

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্য অকার্য বিচার।
ভয়াভয় বন্ধ মুক্তি সত্ত্ববুদ্ধি তার ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি- এই সকলের পার্থক্য জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।

তাৎপর্য

কর্ম যখন শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রবৃত্তি বা করণীয় কর্ম এবং যে কর্ম করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি, তা করা উচিত নয়। যে মানুষ শাস্ত্রের নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়, সে কর্ম এবং তার প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বুদ্ধির দ্বারা পার্থক্য নিরূপণের যে উপলব্ধির বিকাশ হয়, তা হচ্ছে সত্ত্বগুণাশ্রিত।

শ্লোক ৩১

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

যয়া-যার দ্বারা; ধর্মম্ ধর্ম; অধর্মম্-অধর্ম; চ-ও; কার্যম্ কার্য; চ-ও; অকার্যম্-অকার্য; এব- অবশ্যই; চ-ও; অযথাবৎ-অসম্যক রূপে; প্রজানাতি-জানতে পারা যায়; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; সা- সেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; রাজসী-রাজসিকী।

গীতার গান

ধর্মাধর্ম কার্যাকার্য অযথাবৎ জানে।
রাজসিক সেই বুদ্ধি শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

অনুবাদ

যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য আদির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি রাজসিকী।

শ্লোক ৩২

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

অধর্মম্-অধর্মকে; ধর্মম্ ধর্ম; ইতি-এভাবেই; যা-যে; মন্যতে মনে করে; তমসা-মোহের দ্বারা; আবৃতা-আবৃত; সর্বার্থান্-সমস্ত বস্তুকে; বিপরীতান্-বিপরীত; চ-ও; বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি; সা-সেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; তামসী-তামসিকী।

গীতার গান

ধর্মকে অধর্ম মানে অধর্মকে ধর্ম।
বিপরীত সে তামস বুদ্ধি আর কর্ম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত বস্তুকে বিপরীত বলে মনে করে, তমসাবৃত সেই বুদ্ধিই তামসিকী।

তাৎপর্য

তমোগুণাশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তি সব সময়ে যেভাবে কাজ করা উচিত, তার বিপরীতটাই করে। যেগুলি আসলে ধর্ম নয়, সেগুলিকেই তারা ধর্ম বলে মেনে নেয়, আর প্রকৃত ধর্মকে বর্জন করে। তামসিক লোকেরা মহাত্মাকে মনে করে সাধারণ মানুষ, আর সাধারণ মানুষকে মহাত্মা বলে মেনে নেয়। সকল কাজেই তারা কেবল ভুল পথটি গ্রহণ করে। তাই, তাদের বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন।

শ্লোক ৩৩

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ।। ৩৩ ॥

ধৃত্যা-ধৃতির দ্বারা; যয়া-যে; ধারয়তে ধারণ করে; মনঃ-মন; প্রাণ-প্রাণ; ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ের; ক্রিয়াঃ-ক্রিয়াসকলকে; যোগেন-যোগ অভ্যাস দ্বারা; অব্যভিচারিণ্যা-অব্যভিচারিণী; ধৃতিঃ-ধৃতি; সা-সেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; সাত্ত্বিকী-সাত্ত্বিকী।

গীতার গান

যে ধৃতির দ্বারা ধরে প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া।
অব্যভিচারিণী ভক্তি সাত্ত্বিকী সে ধিয়া ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।

তাৎপর্য

যোগ হচ্ছে পরমাত্মাকে জানার একটি উপায়। ধৃতি বা দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে যিনি পরম আত্মাতে একাগ্র হয়েছেন এবং মন, প্রাণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমেশ্বরে একাগ্র করেছেন, তিনি ভক্তিযোগে কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের ধৃতি সত্ত্বগুণাশ্রিত। এখানে অব্যভিচারিণ্যা কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির দ্বারা সেই সমস্ত মানুষদের কথা বলা হচ্ছে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আর অন্য কোন কার্যকলাপের দ্বারা কখনই পথভ্রষ্ট হন না।

শ্লোক ৩৪

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া-যে; তু-কিন্তু, ধর্মকামার্থান্ ধর্ম, অর্থ ও কামকে; ধৃত্যা-ধৃতির দ্বারা; ধারয়তে ধারণ করে; অর্জুন-হে অর্জুন; প্রসঙ্গেন-সঙ্গবশত; ফলাকাঙ্ক্ষী-ফলের আকাঙ্ক্ষী; ধৃতিঃ-ধৃতি; সা-সেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; রাজসী-রাজসিকী।

গীতার গান

যে ধৃতির দ্বারা ধরে ধর্ম, অর্থ, কাম ।
ফলাকাঙ্ক্ষী রাজসিক হয় তার নাম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! হে পার্থ। যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, সেই ধৃতি রাজসী।

তাৎপর্য

যে মানুষ সব রকম ধর্ম অনুষ্ঠান বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই ফলের আকাঙ্ক্ষা করে, যার একমাত্র বাসনা হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা এবং যার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি এভাবেই নিযুক্ত হয়েছে, সে রজোগুণাশ্রিত।

শ্লোক ৩৫

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

ঘয়া-যার দ্বারা; স্বপ্নম্-স্বপ্ন; ভয়ম্ ভয়; শোকম্-শোক; বিষাদম্-বিষাদ; মদম্-মদ; এব-অবশ্যই; চ-ও; ন-না; বিমুঞ্চতি-ত্যাগ করে; দুর্মেধা-বুদ্ধিহীনা; ধৃতিঃ-ধৃতি; সা-সেই; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; তামসী-তামসী।

গীতার গান

যে ধৃতি দ্বারা নহে স্বপ্ন ভয় ত্যাগ।
তামসী সে ধৃতি দুর্মেধা আর মদ ।

অনুবাদ

হে পার্থ! যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ আদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতিই তামসী।

তাৎপর্য

এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, সাত্ত্বিক মানুষেরা স্বপ্ন দেখে না। এখানে 'স্বপ্ন' বলতে বোঝাচ্ছে অত্যধিক নিদ্রা। সত্ত্ব, রজ বা তম যে গুণই হোক না কেন, স্বপ্ন সর্বদাই থাকে। স্বপ্ন দেখাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা বেশি না ঘুমিয়ে পারে না, যারা জড় জগৎকে ভোগ করার গর্বে গর্বিত না হয়ে পারে না, যারা জড় জগতে কর্তৃত্ব করার স্বপ্ন দেখছে এবং যাদের প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় আদি সেভাবেই নিযুক্ত, তারা তমোগুণের ধৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৬

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

সুখম্-সুখ; তু-কিন্তু; ইদানীম্-এখন; ত্রিবিধম্-তিন প্রকার; শৃণু-শ্রবণ কর; মে-আমার কাছে; ভরতর্ষভ-হে ভরতশ্রেষ্ঠ; অভ্যাসাৎ-অভ্যাসের দ্বারা; রমতে-রমণ করে; যত্র-যেখানে; দুঃখ-দুঃখের; অন্তম্-অন্ত; চ-ও; নিগচ্ছতি লাভ করে।

গীতার গান

ত্রিবিধ সে সুখ শুন ভারত ঋষভ।
জড় সুখে মজে জীব কিন্তু দুঃখ সব ॥
সে সুখ সে উপরতি দুঃখ অন্ত হয়।
সংসারের মায়াসুখ তবে হয় ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে ভরতর্ষভ। এখন তুমি আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সুখে রমণ করে এবং যার দ্বারা সমস্ত দুঃখের অন্তলাভ করে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব বারবার জড় সুখ উপভোগ করতে চেষ্টা করে। এভাবেই সে চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। কিন্তু কখন কখন এই ধরনের সুখ উপভোগ করতে করতে কোন মহাত্মার সঙ্গ লাভ করার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, বদ্ধ জীব সর্বদাই কোন না কোন রকমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় রত থাকে। কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে সে যখন বুঝতে পারে যে, তা কেবল একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি, তখন সে তার যথার্থ কৃষ্ণভাবনায় জাগরিত হয়ে ওঠে। তখন সে এভাবেই আবর্তনশীল তথাকথিত সুখের কবল থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩৭

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যৎ-যে; তৎ-তা; অগ্রে-প্রথমে; বিষম্ ইব-বিষের মতো; পরিণামে-অবশেষে; অমৃত-অমৃত; উপমম্-তুল্য; তৎ-সেই; সুখম্-সুখ; সাত্ত্বিকম্-সাত্ত্বিক; প্রোক্তম্-কথিত হয়; আত্ম-আত্ম সম্বন্ধীয়; বুদ্ধি-বুদ্ধির; প্রসাদজম্-নির্মলতা থেকে জাত।

গীতার গান

অগ্রেতে বিষের সম পশ্চাতে অমৃত ।
যে সুখের পরিচয় সে হয় সাত্ত্বিক ॥
সে সুখের লাভ হয় আত্মপ্রমাদেতে।
আত্মবুদ্ধি ভাগ্যবান যোগ্য যে তাহাতে ॥

অনুবাদ

যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য এবং আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকে জাত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান লাভের পথে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে ভগবানের প্রতি মনকে একাগ্র করবার জন্য নানা রকমের বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে হয়। এই সমস্ত বিধিগুলি অত্যন্ত কঠিন, বিষের মতো তিক্ত। কিন্তু কেউ যদি এই সমস্ত বিধিগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি প্রকৃত অমৃত পান করতে শুরু করেন এবং জীবনকে যথার্থভাবে উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৮

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয়-ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ের; সংযোগাৎ-সংযোগের ফলে; যৎ-যা; তৎ-তা; অগ্রে-প্রথমে; অমৃতোপমম্-অমৃতের মতো; পরিণামে অবশেষে; বিষম্ ইব-বিষের মতো; তৎ-সেই; সুখম্-সুখ; রাজসম্-রাজস; স্মৃতম্-কথিত হয়।

গীতার গান

'ইন্দ্রিয়ের সংযোগেতে বিষয়ের ভোগ।
অমৃতের মত অন্তে কিন্তু ভবরোগ ।।
পরিণামে বিষয়ের বিষ হয় লাভ।
রাজসিক সেই সুখ জীবের স্বভাব ॥

অনুবাদ

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো অনুভূত হয়, সেই সুখকে রাজসিক বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

একজন যুবক যখন একজন যুবতীর সান্নিধ্যে আসে, তখন যুবকটির ইন্দ্রিয়গুলি যুবতীটিকে দেখবার জন্য, তাকে স্পর্শ করবার জন্য এবং যৌন সম্ভোগ করবার জন্য তাকে প্ররোচিত করতে থাকে। এই ধরনের ইন্দ্রিয়সুখ প্রথমে অত্যন্ত সুখদায়ক হতে পারে, কিন্তু পরিণামে অথবা কিছু কাল পরে, তা বিষবৎ হয়ে ওঠে। তারা একে অপরকে ছেড়ে চলে যায় অথবা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। তখন শোক, দুঃখ আদির উদয় হয়। এই ধরনের সুখ সর্বদাই রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মিলনের ফলে উদ্ভুত যে সুখ, তা সর্বদাই দুঃখদায়ক এবং তা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত।

শ্লোক ৩৯

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ-যে; অগ্রে-প্রথমে; চ-ও; অনুবন্ধে শেষে; চ-ও; সুখম্-সুখ; মোহনম্-মোহজনক; আত্মনঃ-আত্মার; নিদ্রা-নিদ্রা; আলস্য-আলস্য; প্রমাদ-প্রমাদ; উত্থম্-উৎপন্ন হয়; তৎ-তা; তামসম্-তামসিক; উদাহৃতম্ কথিত হয়।

গীতার গান

যাহা অগ্রে অনুবন্ধে সুখের মোহন।
নিদ্রালস প্রমাদোত্থ তামসিক জন ॥

অনুবাদ

যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মার মোহজনক এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

আলস্য ও নিদ্রার যে সুখ তা অবশ্যই তামসিক এবং যে জানে না কিভাবে কর্ম করা উচিত এবং কিভাবে কর্ম করা উচিত নয়, তাও তামসিক। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষদের কাছে সবই মোহজনক। তার শুরুতেও সুখ নেই এবং পরিণতিতেও সুখ নেই। রজোগুণে আচ্ছন্ন মানুষদের বেলায় শুরুতে এক ধরনের ক্ষণিক সুখ থাকতে পারে এবং পরিণামে তা হয় দুঃখদায়ক, কিন্তু তামসিক মানুষদের বেলায় শুরু ও শেষ সর্ব অবস্থাতেই কেবল দুঃখ।

শ্লোক ৪০

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

ন-নেই; তৎ-সেই; অস্তি-আছে; পৃথিব্যাম্-পৃথিবীতে; বা-অথবা; দিবি-স্বর্গে; দেবেষু-দেবতাদের মধ্যে; বা-অথবা; পুনঃ-পুনরায়; সত্ত্বম্-অস্তিত্ব; প্রকৃতিজৈঃ-প্রকৃতিজাত; মুক্তম্-মুক্ত; যৎ-যে; এভিঃ-এই; স্যাৎ হয়; ত্রিভিঃ -তিন; গুণৈঃ-গুণ থেকে।

গীতার গান

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত নর দেবলোকে।
কেহ নহে মুক্ত সেই ত্রিগুণ ত্রিলোকে ॥
অনুবাদ
এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, যে প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত।
তাৎপর্য
ভগবান এখানে সারা জগৎ জুড়ে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের যে সমষ্টিগত প্রভাব, তার সারমর্ম বিশ্লেষণ করছেন।

শ্লোক ৪১

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।৪১ ॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়; বিশাম্-বৈশ্য; শূদ্রাণাম্ শূদ্রদের; চ-এবং; পরন্তপ-হে পরন্তপ; কর্মাণি-কর্মসমূহ; প্রবিভক্তানি-বিভাগ হয়েছে; স্বভাব-স্বভাব; প্রভবৈঃ-জাত; গুণৈঃ-গুণসমূহের দ্বারা।
গীতার গান
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পরন্তপ ।
স্বভাব প্রভাবে গুণ হয় কর্ম সব ॥
অনুবাদ
হে পরন্তপ! স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ।।
শমঃ-অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম; দমঃ-বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম; তপঃ-তপস্যা; শৌচম্-শৌচ; ক্ষান্তিঃ-সহিষ্ণুতা; আর্জবম্-সরলতা; এব-অবশ্যই; চ-এবং; জ্ঞানম্ শাস্ত্রীয় জ্ঞান; বিজ্ঞানম্-তত্ত্ব-উপলব্ধি; আস্তিক্যম্ ধর্মপরায়ণতা; ব্রহ্মা-ব্রাহ্মণের; কর্ম-কর্ম; স্বভাবজম্-স্বভাবজাত।
গীতার গান
শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি সে আর্জব।
জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য ব্রহ্মকর্ম ভাব ।
অনুবাদ
শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য-এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।

শ্লোক ৪৩

শৌর্যং তেজো ধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্যম্-পরাক্রম; তেজঃ-তেজ, ধৃতিঃ-ধৈর্য; দাক্ষ্যম্ কর্মে কুশলতা; যুদ্ধে-যুদ্ধে; চ-এবং; অপি-ও; অপলায়নম্-পলায়ন না করা; দানম্-দান; ঈশ্বর-প্রভুত্ব; ভাবঃ-ভাব; চ-এবং; ক্ষাত্রম্-ক্ষত্রিয়ের; কর্ম-কর্ম, স্বভাবজম্-স্বভাবজাত।

গীতার গান

শৌর্য তেজ ধৃতি দাক্ষ্য যুদ্ধে না পালায় ।
দান ঈশ ভাব যত ক্ষত্রিয়ে ঘুয়ায় ॥

অনুবাদ

শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসন ক্ষমতা-এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

শ্লোক ৪৪

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষি-কৃষি; গোরক্ষ্য-গোরক্ষা; বাণিজ্যম্-বাণিজ্য; বৈশ্য-বৈশ্যের; কর্ম-কর্ম; স্বভাবজম্-স্বভাবজাত; পরিচর্যা-পরিচর্যা; আত্মকম্-আত্মক; কর্ম-কর্ম; শূদ্রস্য-শূদ্রের; অপি-ও, স্বভাবজম্-স্বভাবজাত।

গীতার গান

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম হয় ।
শূদ্র যে স্বভাব তার পরিচর্যা করায় ॥

অনুবাদ

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত

শ্লোক ৪৫

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

স্বে স্বে-নিজ নিজ; কর্মণি-কর্মে, অভিরতঃ-নিরত; সংসিদ্ধিম্-সিদ্ধি; লভতে-লাভ করে; নরঃ-মানুষ; স্বকর্ম-স্বীয় কর্মে; নিরতঃ-যুক্ত; সিদ্ধিম্-সিদ্ধি; যথা-যেভাবে; বিন্দতি-লাভ করে; তৎ-তা; শৃণু-শ্রবণ কর।

গীতার গান

উচ্চ নীচ যত কর্ম সবে সিদ্ধি হয়।
স্বকর্ম করিয়া গুণ সংসার তরয় ॥
অনুবাদ
নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে। স্বীয় কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৪৬

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
যতঃ-যাঁর থেকে; প্রবৃত্তিঃ-প্রবৃত্তি; ভূতানাম্-সমস্ত জীবের; যেন যাঁর দ্বারা; সর্বম্-সমস্ত; ইদম্-এই; ততম্-ব্যাপ্ত; স্বকর্মণা-তার নিজের কর্মের দ্বারা; তম্-তাঁকে; অভ্যচ্য-অর্চন করে; সিদ্ধিম্-সিদ্ধি; বিন্দতি-লাভ করে; মানবঃ -মানুষ।
গীতার গান
যিনি ব্যষ্টি সমষ্টি বা জগৎ কারণ।
যাঁহা হতে ভূতগণের বাসনা জীবন ।।
স্বকর্ম করিয়া যদি সেই প্রভু ভজে।
সিদ্ধিলাভ হয় তার সংসারে না মজে ॥
অনুবাদ
যাঁর থেকে সমস্ত জীবের পূর্ব বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকে মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা অর্চন করে সিদ্ধি লাভ করে।
তাৎপর্য
পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের আদি উৎস। বেদান্তসূত্রে তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে-জন্মাদ্যস্য যতঃ। সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকটি জীবের প্রাণের উৎস। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুটি শক্তি-অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সর্বব্যাপ্ত। তাই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শক্তিসহ আরাধনা করা। সাধারণত বৈষ্ণব ভক্তেরা ভগবানকে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ উপাসনা করেন। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শভিক বিকৃত প্রতিবিম্ব। বহিরঙ্গা শক্তিটি হচ্ছে পটভূমি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সমস্ত দেব-দেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু-সকলেরই পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাই সকলেরই এটি জানা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। সকলেরই উচিত সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের দ্বারা তারা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধরনের কর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং সেই সকল কর্মের ফলের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য। কেউ যদি সর্বদাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে এভাবেই চিন্তা করেন, তা হলে ভগবানের কৃপার ফলে তিনি অচিরেই

পূর্ণজ্ঞান লাভ করবেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্গীতায় (১২/৭) ভগবান বলেছেন- তেষামহং সমুদ্ধর্তা। এই প্রকার ভক্তকে উদ্ধার করার ভার পরমেশ্বর ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। যে কোন রকম কর্মেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রেয়ান্-শ্রেয়; স্বধর্মঃ-স্বধর্ম; বিগুণঃ-অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত; পরধর্মাৎ-পরধর্ম অপেক্ষা; স্বনুষ্ঠিতাৎ-উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত; স্বভাবনিয়তম্-স্বভাব-বিহিত; কর্ম-কর্ম; কুর্বন করে; ন-না; আপ্নোতি-প্রাপ্ত হয়; কিল্বিষম্-পাপ।

গীতার গান

অসম্যক অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম শ্রেয়।
সুষ্ঠু আচরণ করে পরধর্মে ভয় ॥
নিজ স্বভাব নিয়ত যেই কর্ম অনুষ্ঠান ।
নিষ্পাপ হইবে তাহে শাস্ত্রের বিধান ॥

অনুবাদ

উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্মই শ্রেয়। মানুষ স্বভাব-বিহিত কর্ম করে কোন পাপ প্রাপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

মানুষের স্বধর্ম ভগবদ্গীতায় নির্দিষ্ট হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত হয়েছে। অপরের ধর্মকর্ম অনুকরণ করা কারও পক্ষে উচিত নয়। যে মানুষ, স্বাভাবিকভাবে শূদ্রের কাজকর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট, তার পক্ষে কৃত্রিমভাবে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করা উচিত নয়। তার জন্ম যদি ব্রাহ্মণ পরিবারেও হয়ে থাকে, তা হলেও নয়। এভাবেই স্বভাব অনুসারে তার কর্ম করা উচিত। কোন কাজই ঘৃণ্য নয়, যদি তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণের বৃত্তিমূলক কর্তব্য অবশ্যই সাত্ত্বিক। কিন্তু কেউ যদি স্বভাবগতভাবে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন না হয়, তা হলে তার ব্রাহ্মণের বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় বা শাসককে কত রকমের ভয়ানক কাজ করতে হয়। তাকে হিংসার আশ্রয় নিয়ে শত্রু হত্যা করতে হয় এবং কূটনীতির খাতিরে কখনও কখনও তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। এই ধরনের হিংসা ও ছলনা রাজনীতির মধ্যে থাকেই। কিন্তু তা বলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ধর্ম আচরণ করা উচিত নয়।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য কর্ম করা উচিত। যেমন, অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনি তাঁর বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধ যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে অধঃপতনের ভয় থাকে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লাভ করবার জন্য ব্যবসায়ীকে কত মিথ্যা কথা বলতে হয়। সে যদি

তা না করেন, তা হলে ব্যবসায়ে তার কোন লাভ হবে না। ব্যবসায়ী কখনও বলে, "ও বাবু! আপনার জন্য আমি কোন লাভ করছি না," কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, লাভ না করে ব্যবসায়ী বাঁচতে পারে না। সুতরাং ব্যাপারী যখন বলে যে, সে লাভ করছে না, তখন সেটিকে এক নিছক মিথ্যা কথা বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু তা বলে ব্যাপারীর মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু সে এমন একটি বৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে, যেখানে মিথ্যা কথা বলতে হয়, তাই সেই বৃত্তি সে ছেড়ে দেবে আর ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করবে। সেই রকম নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি। কেউ ক্ষত্রিয় হন, বৈশ্য হন বা শূদ্রই হন না কেন, যদি তিনি তাঁর বৃত্তি অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেন, তা হলে কিছুই আসে যায় না। এমন কি ব্রাহ্মাণদেরও নানা রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে কখন কখন পশুহত্যা করতে হয়, কারণ যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তেমনই, ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্মে নিরত হয়ে শত্রুকে হত্যা করে, তাতে কোন পাপ হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে এই সমস্ত বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে ও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষের কাজ করা উচিত। আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য যা কিছু করা হয়, তা হচ্ছে বন্ধনের কারণ। সিদ্ধান্ত-স্বরূপ এখানে বলা যায় যে, প্রত্যেকের উচিত তার স্বাভাবিক গুণ অনুসারে নিয়োজিত থাকা এবং সমস্ত কাজকর্মের পরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা।

শ্লোক ৪৮

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

সহজম্‌-সহজাত; কর্ম-কর্ম; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; সদোষম্‌-দোষযুক্ত; অপি-হলেও; ন-নয়; ত্যজেৎ-ত্যাগ করা উচিত; সর্বারম্ভা-সমস্ত কর্ম; হি-যেহেতু; দোষেণ-দোষের দ্বারা; ধূমেন-ধূমের দ্বারা; অগ্নিঃ-অগ্নি; ইব-যেমন; আবৃতাঃ-আবৃত।

গীতার গান

সদোষ সহজ কর্ম কভু নহে আজ।
তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হৃদি সদা ভজ ॥
জগতের সব কাজ দোষ বিনা নয়।
অগ্রেতে যথা কদা ধূম দেখা যায় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। যেহেতু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

মায়াবদ্ধ জীবনে সব কাজই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত। এমন কি কেউ যদি ব্রাহ্মাণও হন, তা হলেও তাঁকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় যাতে পশু বলি দিতে হয়। তেমনই, ক্ষত্রিয় যতই পুণ্যবান হোন না কেন, তাঁকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি তা পরিহার করতে পারেন না। তেমনই, একজন বৈশ্য, তা তিনি যতই পুণ্যবান হোন না কেন, ব্যবসায়ে টিকে থাকতে হলে তাঁর লাভের অঙ্কটি তাঁকে কখনও লুকিয়ে রাখতে হয় অথবা কখনও তাঁকে কালোবাজারি করতে হয়। এগুলি অবশ্যম্ভাবী। এগুলিকে পরিহার করা

যায় না। তেমনই, কোন শূদ্রকে যখন কোন অসৎ মনিবের দাসত্ব করতে হয়, তখন তাকে তার মনিবের আজ্ঞা পালন করতেই হয়, যদিও তা করা উচিত নয়। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, মানুষকে তার স্বধর্ম করে যেতে হয়, কেন না সেগুলি তার নিজেরই স্বভাবজাত। এখানে একটি খুব সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আগুন যদিও পবিত্র, তবুও তাতে ধোঁয়া থাকে। কিন্তু সেই ধোঁয়া আগুনকে অপবিত্র করে না। আগুনে যদিও ধোঁয়া আছে, তবুও আগুনকে সবচেয়ে পবিত্র বস্তু বলে গণ্য করা হয়। কেউ যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তা হলে তার পক্ষে কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে কোন অপ্রিয় কর্তব্য থাকবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এই জড় জগতে কেউই জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আগুন ও ধোঁয়ার দৃষ্টান্তটি খুবই সঙ্গত। শীতের সময় কেউ যখন আগুন পোহায়, কখনও কখনও ধোঁয়া তার চোখ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে বিব্রত করে, কিন্তু এই সব বিরক্তিকর অবস্থা সত্ত্বেও তাকে আগুনের সদ্ব্যবহার করতেই হয়। তেমনই, কয়েকটি বিরক্তিকর ব্যাপার আছে বলেই স্বভাবজাত বৃত্তি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বরং, নিজের বৃত্তিমূলক কর্ম অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের আলোচ্য বিষয়। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কোন বিশেষ বৃত্তিমূলক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই বিশেষ কর্মের সমস্ত ত্রুটিগুলি পবিত্র হয়ে যায়। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে কর্মফল যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন মানুষ অন্তরে আত্মাকে দর্শন করে এবং সেটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ৪৯

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ-আসক্তিশূন্য বুদ্ধি; সর্বত্র-সর্বত্র; জিতাত্মা-সংযতচিত্ত; বিগতস্পৃহঃ -স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি; নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্ নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি; পরমাম্-পরম; সন্ন্যাসেন-স্বরূপত কর্মত্যাগ দ্বারা; অধিগচ্ছতি-লাভ করেন।

গীতার গান

দোষাংশ ত্যাগেলে যথা গুণাংশ গ্রহণ।
নিজ সত্তা শুদ্ধ করি স্বধর্ম সাধন ॥
অনাসক্ত বুদ্ধি জিত আত্মা স্পৃহাহীন।
নৈষ্কর্ম সিদ্ধি সে হয় সন্ন্যাস প্রবীণ ॥

অনুবাদ

জড় বিষয়ে আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, সংষতচিত্ত ও ভোগস্পৃহাশূন্য ব্যক্তি স্বরূপত কর্ম ত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্মরূপ পরম সিদ্ধি লাত বরেন।

তাৎপর্য

যথার্থ ত্যাগের অর্থ হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা। তাই মনে করা উচিত যে, কর্মফল ভোগ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ, তাই আমাদের সমস্ত কর্মের

প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন ভগবান। সেটিই যথার্থ কৃষ্ণভাবনা। কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত মানুষই হচ্ছেন যথার্থ সন্ন্যাসী। এই মনোভাব অবলম্বন করার ফলে মানুষ যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারেন। কারণ, তিনি তখন যথার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কাজ করেন। এভাবেই তিনি আর কোন রকম বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না। তিনি তখন ভগবৎ সেবালব্ধ দিব্য আনন্দ ব্যতীত আর কোন রকম সুখভোগের প্রতি অনুরক্ত হন না। বলা হয় যে, সন্ন্যাসী তাঁর পুর্বকৃত সমস্ত কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ না করেই, আপনা থেকেই এই মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। চিত্তবৃত্তির এই অবস্থাকে বলা হয় যোগারূঢ় বা যোগের সিদ্ধ অবস্থা। এই সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে, যত্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ-যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, তাঁর কর্মফল ভোগের আর কোন ভয় থাকে না।

শ্লোক ৫০

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধিম্-সিদ্ধি; প্রাপ্তঃ-লাভ করে; যথা-যেভাবে; ব্রহ্ম-ব্রহ্মকে; তথা-তা; আপ্নোতি-লাভ করেন; নিবোধ-শ্রবণ কর; মে-আমার কাছে, সমাসেন-সংক্ষেপে; এব-অবশ্যই; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; নিষ্ঠা স্তর; জ্ঞানস্য-জ্ঞানের; যা-যা; পরা-অপ্রাকৃত।

গীতার গান

সিদ্ধিলাভ করি যথা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।
সংক্ষেপেতে কহি শুন তার পরিচয় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। নৈষ্কর্ম সিদ্ধি লাভ করে জীব যেভাবে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তা আমার কাছে সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনের কাছে বর্ণনা করেছেন কিভাবে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য সমস্ত কাজ করার মাধ্যমে কেবল তার বৃত্তিমূলক কর্মে যুক্ত থেকে অনায়াসে পরম সিদ্ধির স্তর লাভ করতে পারে। শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধনের জন্য কর্মফল ত্যাগ করার মাধ্যমে অনায়াসে ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরম স্তর লাভ করা যায়। সেটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা। জ্ঞানের যথার্থ সিদ্ধি হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা লাভ করা, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১-৫৩

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

বুদ্ধ্যা-বুদ্ধির দ্বারা; বিশুদ্ধয়া-বিশুদ্ধ; যুক্তঃ-যুক্ত হয়ে; ধৃত্যা-ধৃতির দ্বারা; আত্মানম্-মনকে; নিয়ম্য-নিয়ন্ত্রিত করে; চ-ও; শব্দাদীন-শব্দ আদি; বিষয়ান্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; ত্যক্ত্বা-পরিত্যাগ করে; রাগ-আসক্তি; দ্বেষৌ-দ্বেষ; ব্যুদস্য-বর্জন করে; চ-ও; বিবিক্তসেবী-নির্জন স্থানে বাস করে; লঘাশী-অল্প আহার করে; যতবাক্ বাক্ সংযত করে; কায়-দেহ; মানসঃ-মন; ধ্যানযোগপরঃ-ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে; নিত্যম্-সর্বদা; বৈরাগ্যম্ বৈরাগ্য; সমুপাশ্রিতঃ-আশ্রয় গ্রহণ করে; অহঙ্কারম্-অহঙ্কার; বলম্বল; দর্পম্-দর্প; কামম্-কাম; ক্রোধম্-ক্রোধ; পরিগ্রহম্-জড় বিষয় গ্রহণ; বিমুচ্য-মুক্ত হয়ে; নির্মমঃ-মমতাশূন্য; শান্তঃ শান্ত; ব্রহ্মভূয়ায়-ব্রহ্ম-অনুভবে; কল্পতে-সমর্থ হন।

গীতার গান

বিশুদ্ধ সে বুদ্ধিযুক্ত ধৃতি নিয়মিত।
শব্দাদি বিষয় ত্যাগ রাগ দ্বেষজিত ॥
বিবিক্ত যে লঘুভোজী যত বাক্ মন।
ধ্যানযোগ পরা নিত্য বৈরাগ্য সাধন ॥
অহঙ্কার বল দর্প কাম পরিগ্রহ।
ক্রোধ আর যত আছে অসৎ আগ্রহ ॥
নির্মম যে শান্ত যেই ব্রহ্ম অনুভবে।
নিশ্চিত সমর্থ হয় তাহাতে সম্ভবে ॥

অনুবাদ

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনকে ধৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, শব্দ আদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, রাগ ও দ্বেষ বর্জন করে, নির্জন স্থানে বাস করে, অল্প আহার করে, দেহ, মন ও বাক্ সংযত করে, সর্বদা ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় করে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, মমত্ব বোধশূন্য শান্ত পুরুষ ব্রহ্ম-অনুভবে সমর্থ হন।

তাৎপর্য

বুদ্ধির সাহায্যে নির্মল হলে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন। এভাবেই মানুষ চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সদা সর্বদাই সমাধিস্থ থাকেন। তখন আর তিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না এবং তখন তিনি তাঁর কাজকর্মে রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হন। এই ধরনের নিরাসক্ত মানুষ স্বভাবতই নিরিবিলি জায়গায় থাকতে ভালবাসেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করেন না এবং তিনি তাঁর দেহ ও মনের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন। তখন আর তাঁর মিথ্যা অহঙ্কার থাকে না, কারণ তিনি তখন তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না। নানা রকম জড় পদার্থ আহরণ করে তাঁর দেহটিকে স্থূল ও শক্তিশালী করে তোলার কোন বাসনাও তখন আর থাকে না। যেহেতু তখন আর তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না, তাই মিথ্যা দর্পও থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় মানুষ তখন যা পায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অভাব হলে ক্রুদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণ করার কোনও রকম প্রচেষ্টা তিনি তখন করেন না। এভাবেই মানুষ যখন সর্বতোভাবে অহঙ্কারমুক্ত হন, তখন তিনি সমস্ত জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হন এবং সেটিই হচ্ছে ব্রহ্মা-অনুভবের স্তর। সেই স্তরকে বলা হয় ব্রহ্মভূত স্তর। মানুষ যখন জড় জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি শান্ত হন এবং কোন কিছুতেই আর ক্ষুব্ধ হন না। ভগবদ্গীতায় (২/৭০) সেই কথা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে-

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে।
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

"বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি লাভ করে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহও তেমন কোন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও তাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।"

শ্লোক ৫৪

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মভূতঃ-ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; প্রসন্নাত্মা-প্রসন্নচিত্ত; ন-না; শোচতি-শোক করেন; ন-না; কাঙ্ক্ষতি-আকাঙ্ক্ষা করেন; সমঃ-সমদর্শী; সর্বেষু-সমস্ত; ভূতেষু-প্রাণীর প্রতি; মদ্ভক্তিম্-আমার ভক্তি; লভতে-লাভ করেন; পরাম্পরা।

গীতার গান

ব্রহ্ম অনুভব হলে প্রসন্নাত্মা হয়।
শোক আর আকাঙ্ক্ষা সে নির্মল নিশ্চয় ॥
সর্বভূত সমবুদ্ধি তার পরিচয়।
নির্গুণ আমার ভক্তি তবে লাভ হয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীর কাছে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে শেষ কথা। কিন্তু সবিশেষবাদী বা শুদ্ধ ভক্তদের শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হবার জন্য আরও অগ্রসর হতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তিযোগে যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত না হলে তাঁর সেবা করা যায় না। ব্রহ্ম-অনুভূতিতে সেব্য ও সেবকের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তবুও উচ্চতর চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মধ্যে ভেদ রয়েছে।

জড় জীবনের ধারণা নিয়ে কেউ যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কর্ম করেন, তাতে দুর্ভোগ থাকে। কিন্তু চিৎ-জগতে যখন কেউ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, সেই সেবায় কোন দুর্ভোগ নেই। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না। যেহেতু ভগবান পূর্ণ, তাই জীব যখন ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তিনিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। তিনি তখন সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত নির্মল নদীর মতো। কৃষ্ণভক্ত যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন কিছুরই চিন্তা করেন না, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই উৎফুল্ল। ভগবানের সেবায় সম্যভাবে নিযুক্ত থাকার ফলে তিনি জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতির জন্য কখনই অনুশোচনা করেন না। জড় সুখভোগের প্রতি

তাঁর আর কোন আসক্তি থাকে না। কারণ তিনি জানেন যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ এবং তাই তারা তাঁর নিত্য দাস। তিনি জড় জগতে কাউকেই উচ্চ অথবা নীচ বলে গণ্য করেন না। উচ্চ-নীচবোধ ক্ষণস্থায়ী এবং এই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য জগতের সঙ্গে ভক্তের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁর কাছে পাথর আর সোনার একই দাম। এটিই হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তর এবং শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে এই স্তরে উন্নীত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তির এই পরম পবিত্র স্তরে পৌঁছলে, পরব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া বা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাশ করার ধারণা অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হয় এবং স্বর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে আকাশকুসুম বলে মনে হয়। তখন ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতোই প্রতিভাত হয়। বিষদাঁত ভাঙা সাপের কাছ থেকে যেমন কোন রকম ভয় থাকে না, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলি থেকে আর কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, যখন তারা আপনা থেকেই সংযত হয়। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যারা ভবরোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখময়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে সমগ্র জগৎটি বৈকুণ্ঠ বা চিৎ-জগতের মতো। এই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষও ভক্তের কাছে একটি পিপীলিকার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি এই যুগে শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করেছেন, তাঁর কৃপায় ভগবদ্ভক্তির এই পরম নির্মল স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫৫

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
তততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

ভক্ত্যা-শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; মাম্-আমাকে; অভিজানাতি-জানতে পারেন; যাবান্-যে রকম; যঃ চ অস্মি-স্বরূপত আমি হই; তত্ত্বতঃ-যথার্থরূপে; ততঃ -তারপর; মাম্-আমাকে; তত্ত্বতঃ যথার্থরূপে; জ্ঞাত্বা-জেনে; বিশতে প্রবেশ করতে পারেন; তদনন্তরম্ তার পরে।

গীতার গান

নির্গুণ ভক্তিতে জানে আমার স্বরূপ।
সবিশেষ নির্বিশেষ তত্ত্বত যে রূপ ॥
সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবেশে আমাতে।
আমি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ যাতে ॥

অনুবাদ

ভক্তির দ্বারা কেবল স্বরূপত আমি যে রকম হই, সেরূপে আমাকে কেউ তত্ত্বত জানতে পারেন। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে, তার পরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

তাৎপর্য

অভক্তেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই জানতে পারে না। মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারাও তাঁকে জানতে পারা যায় না। কেউ যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে চায়, তা হলে তাকে শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধ ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান তার কাছে সর্বদাই আচ্ছাদিত থেকে যাবে। ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) আগেই বলা হয়েছে, নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা অথবা মনোধর্ম-

প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ ভগবানকে জানতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগে যিনি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন। এই জ্ঞান লাভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোন সাহায্য করতে পারে না।

কৃষ্ণতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের আলয় চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হন। ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়া নয়। সেই স্তরেও ভগবৎ-সেবা রয়েছে এবং যেখানে ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা রয়েছে, সেখানে অবশ্যই ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিযোগের পন্থা রয়েছে। এই প্রকার জ্ঞানের কখনও বিনাশ হয় না, এমন কি মুক্তির পরেও বিনাশ হয় না। মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। চিন্ময় জীবনেও সেই একই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, একই ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, তবে সেই স্বাতন্ত্র্য, সেই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময়। এখানে বিশতে 'আমাতে প্রবেশ করেন', কথাটির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়, যা অদ্বৈতবাদীরা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে এক হয়ে যায়। না। বিশতে কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, জীব তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করে এবং ভগবানের সঙ্গ লাভ করে তাঁর সেবা করতে পারে। যেমন, একটি সবুজ পাখি একটি সবুজ গাছে প্রবেশ করে সেই গাছটির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য নয়, সেই গাছটির ফল উপভোগ করবার জন্য। নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত সমুদ্রে নদীর মিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। সেটি নির্বিশেষবাদীদের আনন্দের উৎস হতে পারে, কিন্তু সবিশেষবাদীরা সমুদ্রস্থিত জলচর প্রাণীর মতো তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। সমুদ্রের গভীরে গেলে দেখা যায় সেখানে কত অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। কেবল সমুদ্রের উপরটি দেখে সমুদ্র সম্বন্ধে জানা যায় না। সমুদ্রের গভীরে যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে।

শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার প্রভাবে ভক্ত তত্ত্বগতভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। একাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কেবলমাত্র ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই ভগবানকে জানা যায়। এখানেও সেই কথা সত্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায় এবং তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়।

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে ভগবানের কথা শোনার মাধ্যমে ভক্তিযোগ শুরু হয়। কেউ যখন ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তখন আপনা থেকেই ব্রহ্মভূত অবস্থার বিকাশ হয় এবং জড় কলুষ-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কাম ও লোভ বিদূরিত হয়। ভক্তের হৃদয় থেকে কাম ও বাসনা যতই বিদূরিত হয়, ততই তিনি ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবার প্রতি আসক্ত হন এবং সেই আসক্তির ফলে তিনি তখন জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হন। জীবনের সেই অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই কথা বলা হয়েছে। মুক্তির পরেও ভক্তির অনুশীলন বা দিব্য ভগবৎ সেবা বর্তমান থাকে। সেই সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রে (৪/১/১২) বলা হয়েছে-আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্। অর্থাৎ মুক্তির পরেও ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা বর্তমান থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযুক্ত যথার্থ মুক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, জীবের যথার্থ স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নামই হচ্ছে মুক্তি। জীবের স্বরূপের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে- প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অণুসদৃশ অংশ। তাই জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মুক্তির পরে এই সেবা কখনও বন্ধ হয়ে যায় না। যথার্থ মুক্তি হচ্ছে জীবনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৫৬

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব-সমস্ত; কর্মাণি-কর্ম; অপি-ও; সদা-সর্বদা; কুর্বাণঃ-অনুষ্ঠান করে; মৎ-আমার; ব্যপাশ্রয়ঃ-আশ্রয়ে; মৎ-আমার; প্রসাদাৎ-প্রসাদে; অবাপ্নোতি-লাভকরেন; শাশ্বতম্ নিত্য; পদম্ ধাম; অব্যয়ম্-অব্যয়।

গীতার গান

ভক্তিতে প্রাপ্তি সে হয় ভগবদ্ স্বরূপ।
প্রেমাপুমার্থ মহান নাম যার রূপ ॥
সেই প্রেমাশ্রয়ে যেই সর্ব কর্ম করে।
আমার প্রসাদে পরব্যোম লাভ করে ।

অনুবাদ

আমার শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয় ধাম লাভকরেন।

তাৎপর্য

মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে। জড় কলুষমুক্ত হবার জন্য শুদ্ধ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন। শুদ্ধ ভক্তের ভগবৎ সেবার কোন সময়-সীমা নেই। তিনি সর্বদাই চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণরূপে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। যে ভক্ত এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয়। সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পরিণামে তিনি ভগবৎ-ধামে বা কৃষ্ণলোকে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সেই পরম ধামে কোন পরিবর্তন নেই। সেখানে সব কিছুই নিত্য, অবিনশ্বর ও পূর্ণ জ্ঞানময়।

শ্লোক ৫৭

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

চেতসা-বুদ্ধির দ্বারা; সর্বকর্মাণি-সমস্ত কর্ম; ময়ি-আমাতে; সংন্যস্য-অর্পণ করে; মৎপরঃ-মৎপরায়ণ হয়ে; বুদ্ধিযোগম্-ভগবদ্ভক্তি; উপাশ্রিত্য-আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক; মচ্চিত্তঃ-মদ্গতচিত্ত; সততম্-সর্বদাই; ভব-হও।

গীতার গান

সেই প্রেমাশ্রয়ে হও মচ্চিত্ত সতত।
আমার লাগিয়া সর্ব কার্যে হও রত ॥
সেই বুদ্ধিযোগ নাম আমার আশ্রয়।
যাহার প্রভাবে কার্য সর্বসিদ্ধি হয় ॥

অনুবাদ

তুমি বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, বুদ্ধিযোগের আশ্রয়

গ্রহণপূর্বক সর্বদাই মদ্‌গতচিত্ত হও।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কেউ যখন কর্ম করেন, তখন তিনি নিজেকে সমস্ত জগতের প্রভু বলে মনে করে কাজ করেন না। তিনি কাজ করেন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা পরিচালিত, তাঁর একান্ত অনুগত দাসরূপে। দাসের কোনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না। তিনি কাজ করেন কেবল তাঁর প্রভুর আদেশ অনুসারে। পরম প্রভুর দাসরূপে যিনি কর্ম করছেন, তাঁর লাভ অথবা ক্ষতির প্রতি কোন রকম আসক্তি থাকে না। তিনি কেবল তাঁর প্রভুর আদেশ অনুসারে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো তাঁর কর্তব্য করে চলেন। এখন, কেউ তর্ক করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অর্জুন কর্ম করছিলেন, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে নেই, তখন কিভাবে কর্ম করা উচিত? কেউ যদি এই গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, তা হলে তার ফল একই। এই শ্লোকে মৎপরঃ সংস্কৃত শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই এবং এভাবেই কর্ম করার সময় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা উচিত-"এই বিশেষ কাজটি করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিযুক্ত করেছেন।" এভাবেই কাজ করলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হবে। এটিই হচ্ছে যথার্থ কৃষ্ণভাবনা। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, খামখেয়ালীর বশে যা ইচ্ছা তাই করে ফলটি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত নয়। সেই ধরনের কাজকর্ম কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা নয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা উচিত। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের সেই নির্দেশ গুরু-পারম্পর্যে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই গুরুর আদেশ পালন করাটাই জীবনের মুখ্য কর্তব্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে চলেন, তা হলে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তজীবনে তাঁর সিদ্ধি অনিবার্য।

শ্লোক ৫৮

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

মচ্চিত্তঃ-মদ্গতচিত্ত হয়ে; সর্ব-সমস্ত; দুর্গাণি-প্রতিবন্ধক; মৎ-আমার; প্রসাদাৎ-প্রসাদে; তরিষ্যসি-উত্তীর্ণ হবে; অথ-কিন্তু; চেৎ-যদি; ত্বম্-তুমি; অহঙ্কারাৎ-অহঙ্কার-বশত; ন-না; শ্রোষ্যসি-শোন; বিনঙ্ক্ষ্যসি-বিনষ্ট হবে।

গীতার গান

মচ্চিত্ত যেই সে তরে আমার প্রসাদে।
সর্বদুঃখ সংসারে দুঃখ বা বিষাদে ॥
আমার সে উপদেশ যেবা নাহি মানে।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বিনাশে আপনে ॥

অনুবাদ

এভাবেই মদ্‌গতচিত্ত হলে তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তুমি যদি অহঙ্কার-বশত আমার কথা না শোন, তা হলে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্ত তাঁর জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তা সম্পন্ন করবার জন্য অনর্থক উদ্বিগ্ন হন না। সব রকমের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে এই মহা মুক্তির কথা মূর্খ লোকেরা বুঝতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যিনি কর্ম করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। তাঁর যে বন্ধু তাঁর সন্তুষ্টি, বিধানের জন্য ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ তাঁর সেবা করে চলেছেন, তাঁর সমস্ত সুখ-সুবিধার দিকে তিনি তখন দৃষ্টি রাখেন এবং নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন। তাই, কারও পক্ষেই দেহাত্ম বুদ্ধিজাত অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিপথগামী হওয়া উচিত নয়। কখনই নিজেকে জড়া প্রকৃতির নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়, অথবা আমাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কাজকর্ম করবার স্বাধীনতা আমাদের আছে বলে মনে করা উচিত নয়। প্রত্যেকেই জড় জগতের কঠোর আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু যখনই তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্ম করতে শুরু করেন, তখনই তিনি জড় জগতের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হন। খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবানের সেবা যে করছে না, সে এই জড় জগতের ঘূর্ণিপাকে, জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছে। কোন বদ্ধ জীবই জানে না কি করা তাঁর উচিত এবং কি করা তাঁর উচিত নয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত, তিনি কোন কিছুর পরোয়া না করে তাঁর কাজকর্ম করে চলেন। কারণ তাঁর অন্তর থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রতিটি কাজকর্মে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁর গুরুদেব তা অনুমোদন করেন।

শ্লোক ৫৯

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

যৎ-যদি; অহঙ্কারম্-অহঙ্কারকে; আশ্রিত্য-আশ্রয় করে; ন যোৎস্যে-যুদ্ধ করব না; ইতি-এরূপ, মন্যসে-মনে কর; মিথ্যা এষঃ-মিথ্যা হবে; ব্যবসায়ঃ-সংকল্প; তে-তোমার; প্রকৃতিঃ-প্রকৃতি; ত্বাম্-তোমাকে; নিযোক্ষ্যতি নিযুক্ত করবে।

গীতার গান

অহঙ্কার করি বল যুদ্ধ না করিবে।
মিথ্যা সে প্রতিজ্ঞা তুমি করিবে স্বভাবে ॥

অনুবাদ

যদি অহঙ্কারকে আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না' এরূপ মনে কর, তা হলে তোমার সংকল্প মিথ্যাহ হবে। কারণ, তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন যুদ্ধবিশারদ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই যুদ্ধ করাটাই ছিল তাঁর কর্তব্য। কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর গুরু, পিতামহ ও বন্ধুদের হত্যা করলে তাঁর পাপ হবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেকে তাঁর সমস্ত কর্মের কর্তা বলে মনে করেছিলেন, যেন এই সমস্ত কর্মের শুভ ও অশুভ ফলগুলি তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান যে সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সেটি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে

বদ্ধ জীবের বিস্মৃতি। কোন্টি ভাল, কোন্টিন্ট মন্দ-সেই অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান নির্দেশ দেন এবং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য ভক্তিযোগে ভগবানের সেই নির্দেশগুলি পালন করা। ভগবান যেভাবে মানুষের ভবিতব্য নিরূপণ করতে পারেন, সেই রকম আর কেউই পারে না। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ বা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কোন রকম ইতস্তত না করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদেশ পালন করা উচিত। তা হলে সর্ব অবস্থাতেই নিরাপদে থাকা যায়।

শ্লোক ৬০

স্বভারজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তৃং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥

স্বভাবজেন-স্বভাবজাত; কৌন্তেয়-হে কুন্তীপুত্র; নিবন্ধঃ- বশবর্তী হয়ে; স্কেন-তোমার নিজের; কর্মণা-কর্মের দ্বারা; কর্তৃম্ করতে; ন-না; ইচ্ছসি-ইচ্ছা করছ; যৎ-যা; মোহাৎ-মোহবশত; করিষ্যসি-করবে; অবশঃ-অবশভাবে; অপি-যদিও; তৎ-তা।

গীতার গান

স্বভাবজ কর্ম তব অবশ্য সাধিবে।
কৌন্তেয় নির্বন্ধ সব নিজ কর্মভাবে ॥
অতএব মোহবশে ইচ্ছা নাহি কর।
অবশে করিবে সেই তুমি অতঃপর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। মোহবশত তুমি এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছ না, কিন্তু তোমার নিজের স্বভাবজাত কর্মের দ্বারা বশবর্তী হয়ে অবশভাবে তুমি তা করতে প্রবৃত্ত হবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কেউ যদি কর্ম করতে রাজি না হয়, তা হলে সে প্রকৃতির যে গুণে অবস্থিত, সেই গুণ অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকেই প্রকৃতির গুণের বিশেষ সংমিশ্রণের দ্বারা প্রভাবিত এবং সেভাবেই কাজ করছে। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে নিজেকে নিযুক্ত করে, সে মহিমান্বিত হয়।

শ্লোক ৬১

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ৷ ৬১ ॥

ঈশ্বরঃ-পরমেশ্বর ভগবান; সর্বভূতানাম্-সমস্ত জীবের; হৃদ্দেশে-হৃদয়ে; অর্জুন-হে অর্জুন; তিষ্ঠতি-অবস্থান করছেন; ভ্রাময়ন্-ভ্রমণ করান; সর্বভূতানি-সমস্ত জীবকে; যন্ত্র-যন্ত্রে; আরূঢ়ানি-আরোহণ করিয়ে; মায়য়া-মায়ার দ্বারা।

গীতার গান
ঈশ্বর আছে সে সর্বভূতের হৃদয়ে।
কর্ম কর্মফল সব নিয়ন্ত্রণ করয়ে ॥
মায়ার যন্ত্রেতে তিনি সবারে ঘুরায়।
ভুক্তি বাঞ্ছা করে জীব যেই যথা চায় ॥
অনুবাদ
হে অর্জুন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।
তাৎপর্য
অর্জুন পরম জ্ঞাতা ছিলেন না এবং যুদ্ধ করা বা না করা সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনা তাঁর সীমিত বিচার শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জীবাত্মাই সর্বেসর্বা নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের পরিচালনা করেন। দেহত্যাগ করার পর জীব তার অতীতের কথা ভুলে যায়। কিন্তু পরমাত্মা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতারূপে তার সমস্ত কর্মের সাক্ষী থাকেন। তাই, জীবের সমস্ত কর্মগুলি পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবের যা প্রাপ্য তা সে প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতিজাত এক-একটি দেহে আরূঢ় হয়ে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। জীব যখনই একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাকে সেই শরীরের ধর্ম অনুসারে কর্ম করতে হয়। যেমন, কোন মানুষ যখন একটি দ্রুতগামী গাড়িতে বসে থাকেন, তখন তিনি মন্থরগামী গাড়ির আরোহী থেকে দ্রুতগতিতে গমন করেন, যদিও জীব বা গাড়ির চালক একই মানুষ হতে পারেন। তেমনই, পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি কোন নির্দিষ্ট জীবের জন্য কোন বিশেষ রকমের দেহ তৈরি করেন যাতে সে তার অতীতের বাসনা অনুসারে কর্ম করতে পারে। জীব স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। নিজেকে কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান থেকে স্বাধীন বলে মনে করা উচিত নয়। জীব সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই তার কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা এবং সেটিই হচ্ছে পরবর্তী শ্লোকের নির্দেশ।

শ্লোক ৬২

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ৷ ৬২ ৷৷
তম্-তাঁর; এব-অবশ্যই; শরণম্ শরণ; গচ্ছ-গ্রহণ কর; সর্বভাবেন-সর্বতোভাবে; ভারত-হে ভারত; তৎপ্রসাদাৎ-তাঁর প্রসাদে; পরাম্পরা; শান্তিম্-শান্তি; স্থানম্-ধাম; প্রাল্যসি-প্রাপ্ত হবে; শাশ্বতম্ নিত্য।
গীতার গান
তাঁহার চরণে লও সর্বতো শরণ।
প্রসাদে হইবে সর্ব বাঞ্ছিত পূরণ ॥
পরা শান্তি পাবে আর শাশ্বত যে স্থান।
সর্বলাভ সে প্রসাদে দুঃখ নিবারণ ॥
অনুবাদ

হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও।
তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্য ধাম প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

তাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য, সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাঁর শরণাগত হওয়া এবং তার ফলে জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই আত্ম-সমর্পণের ফলে জীব যে কেবল এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়, তাই নয়, পরিণামে সে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করে। চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে বর্ণনা করে বৈদিক শাস্ত্রে (ঋক্ বেদ ১/২২/২০) বলা হয়েছে-তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিই ভগবানের রাজ্য, তাই জাগতিক সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে চিন্ময়, কিন্তু পরমং পদম্ বলতে বিশেষ করে ভগবানের নিত্য ধামকে বোঝানো হচ্ছে, যাকে বলা হয় চিৎ-জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক।
ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ-ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই, হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজমান পরমাত্মার কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করা। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর বলে মেনে নিয়েছেন। দশম অধ্যায়ে তাঁকে পরং ব্রহ্ম পরং ধাম রূপে স্বীকার করা হয়েছে। অর্জুন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং সমস্ত জীবের পরম ধাম বলে গ্রহণ করেছেন, তাই নয়, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি সমস্ত মহাত্মারাও যে শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন, তিনি সেই কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৬৩

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

ইতি-এভাবেই: তে-তোমাকে; জ্ঞানম্-জ্ঞান; আখ্যাতম্ বর্ণিত হল; গুহ্যাৎ-গুহ্য থেকে; গুহাতরম্ গুহ্যতর; ময়া-আমার দ্বারা; বিমৃশ্য-বিবেচনা করে; এতৎ-এটি; অশেষেণ-সম্পূর্ণরূপে; যথা-যা; ইচ্ছসি-ইচ্ছা কর; তথা-তা; কুরু-কর।

গীতার গান

গুহ্য গুহ্যতর জ্ঞান কহিলাম আমি।
ভালমন্দ বিচার যে সে করিবে তুমি ॥
বিচার করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা কর।
উপদেশ আমার সে নিত্য তুমি স্মর ॥

অনুবাদ

এভাবেই আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান বর্ণনা করলাম। তুমি তা সম্পূর্ণরূপে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তাই কর।

তাৎপর্য

ভগবান ইতিমধ্যেই অর্জুনের কাছে ব্রহ্মভূত সম্বন্ধে জ্ঞানের বিশ্লেষণ করেছেন। যিনি ব্রহ্মাহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি প্রসন্ন; তিনি কখনও অনুশোচনা করেন না, বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। গৃহ্য তত্ত্ব লাভ করার ফলে তা সম্ভব হয়। পরমাত্মা

সম্বন্ধে জ্ঞানের রহস্যও শ্রীকৃষ্ণ উন্মোচিত করেছেন। এটিও ব্রহ্মজ্ঞান, কিন্তু এটি উচ্চতর। এখানে যথেচ্ছসি তথা কুরু কথাটির অর্থ হচ্ছে-"যা ইচ্ছা হয় তাই কর"-ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভগবান জীবের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ভগবদ্গীতায় ভগবান সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে জীবনের মান উন্নত করা যায়। অর্জুনকে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে, হৃদি-অন্তঃস্থ পরমাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করা। যথার্থ বিবেচনার মাধ্যমে পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে সম্মত হওয়া উচিত। তা মানব-জীবনের পরম সিদ্ধির স্তর কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। যুদ্ধ করবার জন্য অর্জুন সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা সমস্ত জীবের পরম স্বার্থ। এটি পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থ নয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে বুদ্ধি দিয়ে এই সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিচার করার স্বাধীনতা সকলেরই রয়েছে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করার সেটিই হচ্ছে উত্তম পন্থা। এই নির্দেশ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৬৪

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

সর্বগুহ্যতমম্ সবচেয়ে গোপনীয়; ভূয়ঃ-পুনরায়; শৃণু-শ্রবণ কর; মে-আমার থেকে; পরমম্-পরম; বচঃ-উপদেশ; ইষ্টঃ-প্রিয়; অসি-হও; মে-আমার; দৃঢ়ম্-অতিশয়; ইতি-এভাবে; ততঃ-সেই হেতু; বক্ষ্যামি বলছি; তে-তোমার; হিতম্-হিতের জন্য।

গীতার গান

তদপেক্ষা গুহ্যতম আর তুমি শুন ।
অত্যন্ত সে প্রিয় তুমি তাই সে বচন ॥

অনুবাদ

তুমি আমার কাছ থেকে সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, সেই হেতু তোমার হিতের জন্যই আমি বলছি।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা হচ্ছে গুহ্য (ব্রহ্মজ্ঞান) এবং গুহ্যতর (সকলের হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজমান পরমাত্মার জ্ঞান) আর এখন তিনি দান করছেন গুহ্যতম জ্ঞান-পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর। নবম অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছেন, মন্মনাঃ- 'সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর।' ভগবদ্গীতার মূল শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে এখানে সেই নির্দেশেরই পুনরুক্তি করা হয়েছে। ভগবদ্গীতার সারাংশরূপ এই যে পরম শিক্ষা, তা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন, তা হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের সারাতিসার এবং তা কেবল অর্জুনের কাছেই গ্রহণীয় নয়, সমস্ত জীবের পক্ষেই তা গ্রহণীয়।

শ্লোক ৬৫

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

মন্মনাঃ-মদ্গতচিত্ত; ভব-হও; মদ্ভক্তঃ-আমার ভক্ত; মদ্যাজী-আমার পূজক; মাম্-আমাকে; নমস্কুরু নমস্কার কর; মাম্-আমাকে; এব-অবশ্যই; এষ্যসি-প্রাপ্ত হবে; সত্যম্-সত্যই; তে-তোমার কাছে; প্রতিজানে-প্রতিজ্ঞা করছি; প্রিয়ঃ -প্রিয়; অসি-তুমি হও; মে-আমার।

গীতার গান

মন্মনা মদ্ভক্ত হও মোরে নমস্কার।
আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥

অনুবাদ

তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই জন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

তত্ত্বজ্ঞানের গুহ্যতম অংশ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া এবং সর্বদাই তাঁর চিন্তা করে তাঁর জন্য কর্ম সাধন করা। পেশাধারী ধ্যানী হওয়া উচিত নয়। জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা যায়। সর্বক্ষণ এমনভাবে কাজকর্ম করা উচিত, যাতে সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপগুলি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুষ্ঠান করা যায়। জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত যাতে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তারই উদয় না হয়। ভগবান এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, যিনি এভাবেই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা লাভ করেছেন, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যাবেন, যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখোমুখি হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতে পারবেন। তত্ত্বজ্ঞানের এই গূঢ়তম অংশটি অর্জুনকে বলা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বন্ধু। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারেন এবং অর্জুনের মতো সার্থকতা অর্জন করতে পারেন।
এই কথাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপে মনকে একাগ্র করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যে রূপে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর গোপবালক, যাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত এবং মাথায় যাঁর ময়ূরের পালক। ব্রহ্মসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভগবানের আদিরূপ শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিবদ্ধ করা উচিত। ভগবানের অন্যান্য রূপেও অভিনিবেশ করা উচিত নয়। বিষ্ণু, নারায়ণ, রাম, বরাহ আদি ভগবানের অনন্ত রূপ রয়েছে। কিন্তু অর্জুনের সম্মুখে যে রূপ নিয়ে ভগবান প্রকট হয়েছিলেন, ভক্তের উচিত সেই রূপেই মনকে একাগ্র করা। শ্রীকৃষ্ণের রূপে মনকে একাগ্র করাই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের গুহ্যতম অংশ এবং অর্জুনের কাছে ভগবান তা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ অর্জুন হচ্ছেন ভগবানের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

শ্লোক ৬৬

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্বধর্মান্-সর্ব প্রকার ধর্ম; পরিত্যজ্য-পরিত্যাগ করে; মাম্-আমাকে; একম্-কেবল; শরণম্ শরণাগত; ব্রজ-হও; অহম্-আমি; ত্বাম্-তোমাকে; সর্ব-সমস্ত; পাপেভ্যঃ-পাপ থেকে; মোক্ষয়িষ্যামি-মুক্ত করব; মা করো না; শুচঃ -শোক।

গীতার গান

সর্ব ধর্ম ত্যাগি লও আমার শরণ।
রক্ষিব তোমাকে আমি সদা সর্বক্ষণ ॥
কোন চিন্তা না করিবে পাপ নাহি হবে।
আমার শরণে তুমি পরা শান্তি পাবে ॥

অনুবাদ

সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

তাৎপর্য

ভগবান নানা রকম জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন, ব্রহ্মাজ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, পরমাত্মা জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, সমাজ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের বর্ণনা করেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান, বৈরাগ্যের জ্ঞান, মন ও ইন্দ্রিয়-দমন, ধ্যান আদি সব কিছুরই বর্ণনা করেছেন। তিনি বিবিধ উপায়ে নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন। এখন, ভগবদ্গীতার সারাংশ বিশ্লেষণ করে ভগবান বলেছেন যে, অর্জুনের উচিত যে সমস্ত ধর্মের কথা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সবই পরিত্যাগ করা; তাঁর উচিত কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। সেই শরণাগতি তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে, কেন না ভগবান নিজেই তাঁকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনিই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। এভাবেই কেউ মনে করতে পারে যে, যদি না সে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, সে ভগবানের শরণাগতির পন্থা গ্রহণ করতে পারে না। সেই সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত না হয়েও থাকে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তিনি আপনা হতেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অন্য কোন কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের পরম পরিত্রাতা বলে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের উচিত তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়া।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১/৬৭৬) গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥

ভক্তিযোগের পন্থায় কেবল এই সমস্ত ধর্মের আচরণ করা উচিত, যা পরিণামে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি প্রদান করবে। কেউ বর্ণ অনুসারে তাঁর স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার ফলে তিনি যদি কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভ না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত কর্মই অর্থহীন। যা কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করে না, তা পরিত্যজ্য। মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। দেহ ও আত্মা একত্রে কিভাবে রক্ষা হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা

করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীকৃষ্ণ সেটি দেখবেন। নিজেকে সর্বদা অসহায় বলে মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র জীবনের প্রগতির ভিত্তি বলে বিবেচনা করা উচিত। যে মাত্র কেউ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিজেকে ঐকান্তিকভাবে নিযুক্ত করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। জ্ঞানের অনুশীলন ও যোগসাধনায় ধ্যান আদি অনুশীলনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় পদ্ধতি ও শোধনকারী পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁকে এই সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয় না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তাঁকে অনর্থক সময় নষ্ট করতে হয় না। এভাবেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত রকম উন্নতিসাধন করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তাঁর নাম 'শ্রীকৃষ্ণ' কারণ তিনি সর্বাকর্ষক। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর, সর্বশক্তিমান, সর্বাকর্ষক রূপে আকৃষ্ট হন, তিনি মহাভাগ্যবান। নানা রকম পরমার্থবাদী রয়েছে-তাঁদের মধ্যে কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি আসক্ত, কেউ পরমাত্মা রূপের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট এবং সর্বোপরি যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট, তিনি সমস্ত পরমার্থবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে বলা যায়, পূর্ণ চেতনায় কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে গুহ্যতম জ্ঞান এবং সেটিই হচ্ছে সমস্ত ভগবদ্গীতার সারমর্ম। কর্মযোগী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এদের সকলকেই বলা হয় পরমার্থবাদী, কিন্তু যিনি শুদ্ধ ভক্ত তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যে বিশেষ শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে, মা শুচঃ 'ভয় করো না, দ্বিধা করো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না', তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ মনে করতে পারেন, সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কি করে সম্ভব, কিন্তু ঐ ধরনের দুশ্চিন্তা নিরর্থক।

শ্লোক ৬৭

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রুষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

ইদম্-এই; তে-তোমা কর্তৃক; ন-নয়; অতপস্কায়-সংযমহীন ব্যক্তিকে; ন-নয়; অভক্তায়-অভক্তকে; কদাচন-কখনও; ন-নয়; চ-ও; অশুশ্রুষবে-পরিচর্যাহীনকে; বাচ্যম্বলা উচিত; ন-নয়; চ-ও; মাম্-আমার প্রতি; যঃ -যে; অভ্যসূয়তি-বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।

গীতার গান

অভক্ত বা অতপস্ক পরিচর্যাহীন।
আমার স্বরূপে এই যার শ্রদ্ধা ক্ষীণ ॥
উপদেশ না করিবে গীতার বচন।
উপরোক্ত লোক সব অধিকারী নন ॥

অনুবাদ

যারা সংযমহীন, অভক্ত, পরিচর্যাহীন এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাদেরকে কখনও এই গোপনীয় জ্ঞান বলা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যে মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তপশ্চর্যা করেনি, যে কখনও ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের সেবা

করার প্রচেষ্টা করেনি, যে কখনও শুদ্ধ ভক্তের পরিচর্যা করেনি এবং বিশেষ করে যারা শ্রীকৃষ্ণকে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র বলে মনে করে অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাদেরকে কখনও এই গুহ্যতম জ্ঞানের কথা শোনানো উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরাও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং ভগবদ্গীতা পাঠ করার পেশা গ্রহণ করে ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত বিশ্লেষণ করছে অর্থ উপার্জনের জন্য। কিন্তু যিনি যথার্থই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই ভগবদ্গীতার এই সমস্ত ভাষ্যগুলি বর্জন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, ভগবদ্গীতার যথার্থ উদ্দেশ্য তাদের বোধগম্য হয় না। এমন কি যে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশিত সংযত জীবন যাপন করছে, যদি সে কৃষ্ণভক্ত না হয়, তা হলে সেও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি যে কৃষ্ণভক্তির অভিনয় করে, কিন্তু ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণসেবায় যুক্ত নয়, সেও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। বহু মানুষ আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কারণ তিনি ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তাঁর ঊর্ধ্বে বা তাঁর সমান আর কেউ নেই। বহু মানুষ আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এই ধরনের মানুষদের কাছে ভগবদ্গীতা শোনানো উচিত নয়, কেন না তারা তা বুঝতে পারবে না। অবিশ্বাসী লোকদের পক্ষে ভগবদ্গীতা ও শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬৮

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যঃ-যিনি; ইদম্-এই; পরমম্-পরম; গুহ্যম্-গোপনীয়; মৎ-আমার; ভক্তেষু-ভক্তদের মধ্যে; অভিধাস্যতি-উপদেশ করেন; ভক্তিম্-ভক্তি; ময়ি-আমার প্রতি; পরাম্পরা; কৃত্বা-করে; মাম্-আমার কাছে; এব-অবশ্যই; এষ্যতি-আসবেন; অসংশয়ঃ-নিঃসংশয়ে।

গীতার গান

আমার ভক্তকে যেবা উপদেশ করে।
পরা ভক্তি লাভ করি পাইবে আমারে ॥

অনুবাদ

যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতাবাক্য উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করে নিঃসংশয়ে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

সাধারণত ভক্তসঙ্গে ভগবদ্গীতা আলোচনা করার উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ অভক্তেরা না পারে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে, না পারে ভগবদ্গীতার মর্ম উপলব্ধি করতে। যারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করতে চায় না এবং ভগবদ্গীতাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে চায় না, তাদের কখনই নিজের ইচ্ছামতো ভগবদ্গীতার বিশ্লেষণ করে অপরাধী হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্গীতার অর্থ তাঁদেরই বিশ্লেষণ করা উচিত, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এটি কেবল ভক্তদের বিষয়বস্তু, দার্শনিক জল্পনা-

কল্পনাকারীদের জন্য নয়। যিনি ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্গীতাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, তিনি ভক্তিযোগে উন্নতি সাধন করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করবেন। এই শুদ্ধ ভক্তির ফলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ৬৯

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

ন-নেই: চ-এবং; তস্মাৎ-তাঁর থেকে; মনুষ্যেষ-মানুষদের মধ্যে; কশ্চিৎ-কেউ; মে-আমার; প্রিয়কৃত্তমঃ-অধিক প্রিয়কারী; ভবিতা-হবে; ন-না; চ-এবং; মে-আমার; তস্মাৎ-তাঁর থেকে; অন্যঃ-অন্য; প্রিয়তরঃ-প্রিয়তর; ভুবি-এই পৃথিবীতে।

গীতার গান

তদপেক্ষা নরলোকে প্রিয় নাহি মোর।
হয় নাই হবে নাই আনন্দে বিভোর ॥

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই এবং তাঁর থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না।

শ্লোক ৭০

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অধ্যেষ্যতে-অধ্যয়ন করবেন; চ-ও; যঃ-যিনি; ইমম্-এই; ধর্ম্যম্-পবিত্র; সংবাদম্-কথোপকথন; আবয়োঃ-আমাদের উভয়ের; জ্ঞান-জ্ঞান; যজ্ঞেন-যজ্ঞের দ্বারা; তেন-তাঁর; অহম্-আমি; ইষ্টঃ-পূজিত; স্যাম্-হব; ইতি-এই; মে-আমার; মতিঃ-অভিমত।

গীতার গান

আমার এ উপদেশ যেবা বিচার করিবে।
তার জ্ঞানযজ্ঞে মোর উপাসনা হবে ॥

অনুবাদ

আর যিনি আমাদের উভয়ের এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। এই আমার অভিমত।

শ্লোক ৭১

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রদ্ধাবান্-শ্রদ্ধাবান; অনসূয়ঃ চ-ও অসূয়া-রহিত; শৃণুয়াৎ-শ্রবণ করেন; অপি-অবশ্যই; যঃ-যে; নরঃ-মানুষ; সঃ অপি-তিনিও; মুক্তঃ-মুক্ত হয়ে; শুভান-শুভ; লোকান্-লোকসমূহ; প্রাপুয়াৎ-লাভ করেন; পুণ্যকর্মণাম্-পুণ্য কর্মকারীদের।

গীতার গান

শ্রদ্ধাবান হয়ে যারা শ্রবণ করিবে।
পুণ্যবান তার শুভ লোকপ্রাপ্তি হবে ।

অনুবাদ

শ্রদ্ধাবান ও অসূয়া-রহিত যে মানুষ গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে পুণ্য কর্মকারীদের শুভ লোকসমূহ লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের সপ্তষষ্টিতম শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে ভগবৎ-বিদ্বেষী মানুষদের কাছে গীতার বাণী শোনাতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্গীতা কেবল ভক্তদের জন্য। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত জনসাধারণের কাছে গীতা পাঠ করছেন, যেখানে সব কয়টি শ্রোতাই ভক্ত নন। তাঁরা কেন প্রকাশ্যভাবে পাঠ করেন? সেই কথার ব্যাখ্যা করে এখানে বলা হয়েছে যে, যদিও সকলেই ভক্ত নয়, তবুও অনেকে আছেন যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এই ধরনের মানুষেরা সাধু-বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং তারপর যেখানে সমস্ত সাধু-মহাত্মারা অবস্থান করেন, সেই লোক প্রাপ্ত হন। সুতরাং, কেবল ভগবদ্গীতা শ্রবণ করার ফলে, এমন কি যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভের প্রয়াসী নন, তিনিও পুণ্যকর্মের ফল লাভ করেন। এভাবেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সকলকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এবং ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সুযোগ দান করেন।

সাধারণত যাঁরা পাপমুক্ত, যাঁরা পুণ্যবান, তাঁরা সহজেই কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন। এখানে পুণ্যকর্মণাম্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন যাঁরা ভক্তিযোগ সাধন করে পুণ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু শুদ্ধ নন, তাঁরা যেখানে ধ্রুব মহারাজ তত্ত্বাবধান করছেন, সেই ধ্রুবলোক লাভ করেন। ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, তিনি যে গ্রহে বাস করেন, তাকে বলা হয় ধ্রুবলোক বা ধ্রুবতারা।

শ্লোক ৭২

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

কচ্চিৎ-হয়েছে কি; এতৎ-এই; শ্রুতম্-শ্রুত; পার্থ-হে পৃথাপুত্র; ত্বয়া-তোমার দ্বারা; একাগ্রেণ-একাগ্র; চেতসা-চিত্তে; কচ্চিৎ-হয়েছে কি; অজ্ঞান-অজ্ঞান-জনিত; সম্মোহঃ-মোহ; প্রণষ্টঃ-বিদূরিত; তে-তোমার; ধনঞ্জয়-হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)।

গীতার গান

ধনঞ্জয়, কহ এবে কিবা শঙ্কা হল দূর।
একাগ্রেতে উপদেশ শুনিয়া প্রচুর ॥
হে পার্থ, কিবা তব অজ্ঞান অন্ধকার।
প্রনষ্ট হইয়া গেল তব দুঃখ ভার ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! হে ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করেছ কি? তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ বিদূরিত হয়েছে কি?

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনের গুরুর মতো আচরণ করছিলেন। তাই, সমগ্র ভগবদ্গীতার যথাযথ অর্থ অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি না তা জিজ্ঞেস করা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। অর্জুন যদি তাঁর অর্থ ঠিক মতো না বুঝতেন, তা হলে ভগবান কোন বিশেষ বিষয় বা সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতা প্রয়োজন হলে আবার ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর প্রতিনিধি সদগুরুর কাছ থেকে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করেন, তাঁর সমস্ত অজ্ঞানতা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। ভগবদ্গীতা কোন কবি বা সাহিত্যিকের লেখা সাধারণ কোন গ্রন্থ নয়। তা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির কাছ থেকে এই বাণী শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত পুরুষরূপে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৭৩

অর্জুন উবাচ
নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ৷ ৭৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ-অর্জুন বললেন; নষ্টঃ-দূর হয়েছে; মোহঃ-মোহ; স্মৃতিঃ-স্মৃতি; লব্ধা-লাভ করেছি; তৎপ্রসাদাৎ-তোমার কৃপায়; ময়া-আমার দ্বারা; অচ্যুত-হে অচ্যুত; স্থিতঃ-যথাজ্ঞানে অবস্থিত; অস্মি হয়েছি; গত-দূর হয়েছে; সন্দেহঃ-সমস্ত সংশয়; করিষ্যে-আমি পালন করব; বচনম্-আদেশ; তব-তোমার।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন:
নষ্ট মোহ স্মৃতি লাভ তোমার প্রসাদে।
অচ্যুত, সন্দেহ গেল নাহি সে বিষাদে ॥
স্থিত আমি নিজ কার্যে তোমার বচন ।
নিশ্চয়ই করিব আমি ঘুচিল বন্ধন ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন-হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব।

তাৎপর্য

অর্জুনের আদর্শস্বরূপ সমস্ত জীবেরই স্বরূপগত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ

অনুসারে কর্ম করা উচিত। আত্মসংযম করা তাদের ধর্ম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। সেই কথা ভুলে জীব জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা করার ফলে সে মুক্ত ভগবৎ দাসে পরিণত হয়। দাসত্ব করাটাই হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। হয় সে মায়ার দাসত্ব করে, নয় পরমেশ্বর ভগবানের দাসত্ব করে। সে যখন পরমেশ্বরের দাসত্ব করে, তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু সে যখন বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দাসত্ব বরণ করে, তখন সে অবশ্যই বন্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব জড় জগতের দাসত্ব করে। সে তখন কামনা-বাসনার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবু সে নিজেকে সমস্ত জগতের মালিক বলে মনে করে। একেই বলা হয় মায়া। মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন তার মোহ কেটে যায় এবং সে স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে। চরম মোহ অর্থাৎ জীবকে ধরে রাখবার জন্য মায়ার চরম ফাঁদ হচ্ছে নিজেকে ভগবান বলে মনে করা। জীব মনে করে যে, সে আর বদ্ধ আত্মা নয়, সে ভগবান। সে এতই মূঢ় যে, সে ভেবে দেখে না যে, যদি সে ভগবান হত, তা হলে তার মনে এই সংশয় কেন? সেই কথা সে ভেবে দেখে না। তাই সেটিই হচ্ছে মায়ার চরম ফাঁদ। প্রকৃতপক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং তাঁর আদেশ অনুসারে কর্ম করতে সম্মত হওয়া।
এই শ্লোকে মোহ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যা জ্ঞানের বিরোধী, তাকে বলা হয় মোহ। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে প্রতিটি জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের দাস বলে জানতে পারা। কিন্তু নিজেকে সেই রকম চিন্তা করার পরিবর্তে জীব মনে করে যে, সে একজন দাস নয়, সে হচ্ছে এই জড় জগতের মালিক, কেন না সে জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। সেটিই হচ্ছে তার মোহ। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপার দ্বারা এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জীব যখনই এই মোহ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করতে সম্মত হয়।
কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে বদ্ধ জীবাত্মা জানতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের প্রভু, যিনি পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সব কিছুর অধীশ্বর। তিনি তাঁর ভক্তকে যা ইচ্ছা তাই দান করতে পারেন; তিনি সকলেরই বন্ধু এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তিনি এই জড়া প্রকৃতির ও সমস্ত জীবের নিয়ন্তা। তিনি অনন্ত কালেরও নিয়ন্তা এবং তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য ও সমগ্র শক্তিতে পরিপূর্ণ। পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারেন। যে তাঁকে জানে না, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন; সে ভক্ত হতে পারে না-সে মায়ার দাস। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছ থেকে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করার পর অর্জুন সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর বন্ধুই নন, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। বাস্তবিকপক্ষে তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারলেন। সুতরাং, ভগবদ্গীতা পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারা। মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন যখন বুঝতে পারলেন যে, অনাবশ্যক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হলেন। তিনি আবার তাঁর অস্ত্র ধনুর্বাণ তুলে নিলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করবার জন্য।

শ্লোক ৭৪

সঞ্জয় উবাচ
ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ-সঞ্জয় বললেন; ইতি-এভাবেই; অহম্-আমি; বাসুদেবস্য-শ্রীকৃষ্ণের; পার্থস্য-অর্জুনের; চ-ও; মহাত্মনঃ-দুই মহাত্মার; সংবাদম্-সংবাদ; ইমম্-এই; অশ্রৌষম্-শ্রবণ করেছিলাম; অদ্ভুতম্-অদ্ভুত; রোমহর্ষণম্-রোমাঞ্চকর।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল:
সেই যে শুনেছি আমি কৃষ্ণার্জুন কথা।
অদ্ভুত সংবাদ রোমহর্ষণ সর্বথা ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন-এভাবেই আমি কৃষ্ণ ও অর্জুন দুই মহাত্মার এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শ্রবণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার শুরুতে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সচিব সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কি হল?” তাঁর গুরুদেব ব্যাসদেবের কৃপার ফলে সঞ্জয়ের হৃদয়ে সমস্ত ঘটনাগুলি প্রকাশিত হল। এভাবেই তিনি রণাঙ্গনের মূল ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করলেন। এই বাক্যালাপ অপূর্ব, কারণ পূর্বে দুজন অতি মহান পুরুষের মধ্যে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কখনই হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এটি অপূর্ব, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর স্বরূপ ও তাঁর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর অতি মহান ভক্ত অর্জুনের মতো জীবের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে আমাদের জীবন সুখদায়ক ও সার্থক হবে। সঞ্জয় তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যেমনভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেভাবেই তিনি সেই কথোপকথন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করেন। এখন এখানে স্থির সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত অর্জুন বর্তমান, সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ৭৫

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ-ব্যাসদেবের কৃপায়; শ্রুতবান্-শ্রবণ করেছি, এতৎ-এই: গুহ্যম্-গোপনীয়; অহম্-আমি; পরম্-পরম; যোগম্-যোগ; যোগেশ্বরাৎ-যোগেশ্বর; কৃষ্ণাৎ-শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে; সাক্ষাৎ-সাক্ষাৎ; কথয়তঃ-বর্ণনাকারী; স্বয়ম্ স্বয়ং।

গীতার গান

ব্যাসের প্রসাদে আমি শুনিলাম সেই।
পরম সে গুহ্যতম তুলনা যে নেই ॥

এই যোগ যোগেশ্বর কৃষ্ণ সে কহিল।
সাক্ষাৎ তাঁহার মুখে আমি সে শুনিল ॥

অনুবাদ

ব্যাসদেবের কৃপায়, আমি এই পরম গোপনীয় যোগ সাক্ষাৎ বর্ণনাকারী স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব ছিলেন সঞ্জয়ের গুরুদেব এবং সঞ্জয় এখানে স্বীকার করছেন যে, ব্যাসদেবের কৃপার ফলে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন। অর্থাৎ, সরাসরিভাবে নিজের চেষ্টার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। তাঁকে জানতে হয় গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে। ভগবৎ-তত্ত্ব দর্শনের উপলব্ধি যদিও সরাসরি, কিন্তু গুরুদেব হচ্ছেন তার স্বচ্ছ মাধ্যম। সেটিই হচ্ছে গুরু-পরম্পরার রহস্য। সদগুরুর কাছে সরাসরিভাবে ভগবদগীতা শ্রবণ করা যায়, যেমন অর্জুন শ্রবণ করেছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অতীন্দ্রিয়বাদী ও যোগী রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হও। যিনি তা করেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে-যোগিনামপি সর্বেষাম্।

নারদ মুনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য এবং ব্যাসদেবের গুরুদেব। তাই ব্যাসদেবও হচ্ছেন অর্জুনের মতো সৎ শিষ্য, কারণ তিনি গুরু-পরম্পরায় রয়েছেন আর সঞ্জয় হচ্ছেন ব্যাসদেবের শিষ্য। তাই, ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয়ের ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয়েছে এবং তিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁর কথা শ্রবণ করতে পেরেছেন। যিনি সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করতে পারেন, তিনি এই রহস্যাবৃত জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যদি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হন, তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন না। তাই তাঁর জ্ঞান সর্বদাই অসম্পূর্ণ, অন্তত ভগবদগীতা সম্বন্ধে।

ভগবদগীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-সমস্ত যোগের পন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই সমস্ত যোগের ঈশ্বর। আমাদের বুঝতে হবে যে, অর্জুন তাঁর অসীম সৌভাগ্যের ফলে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছিলেন, তেমনই ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয়ও শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরিভাবে শ্রবণ করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরিভাবে শ্রবণ করা এবং ব্যাসদেবের মতো সদ্গুরুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ব্যাসদেবেরও প্রতিনিধি। তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে তাঁর শিষ্যরা ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করেন।

শ্লোক ৭৬

রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

রাজন্-হে রাজন; সংস্মৃত্য-স্মরণ করে; সংস্মৃত্য-স্মরণ করে; সংবাদম্-সংবাদ; ইমম্-এই; অদ্ভুতম্-অদ্ভুত; কেশব-শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনয়োঃ এবং অর্জুনের; পুণ্যম্-পুণ্যজনক; হৃষ্যামি-

হরষিত হচ্ছি; চ-ও; মুহুর্মুহুঃ বারংবার।

গীতার গান

স্মরণ করিয়া রাজা পুনঃ পুনঃ সেই।
অদ্ভুত সংবাদ স্মরি হৃষ্ট আমি হই ॥
কেশব আর অর্জুন কথা পুণ্য গীতা।
মুহুর্মুহু শুনে নিত্য সর্বহিতে রতা ॥

অনুবাদ

হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করতে করতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার উপলব্ধি এতই দিব্য যে, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সম্বন্ধে অবগত হন, তখনই তিনি পবিত্র হন এবং তাঁদের কথা আর তিনি ভুলতে পারেন না। এটিই হচ্ছে ভক্ত-জীবনের চিন্ময় অবস্থা। পক্ষান্তরে বলা যায়, কেউ যখন নির্ভুল উৎস সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গীতা শ্রবণ করেন, তখনই তিনি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রাপ্ত হন।
কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে উত্তরোত্তর দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হতে থাকে এবং পুলকিত চিত্তে জীবন উপভোগ করা যায়। তা কেবল ক্ষণিকের জন্য নয়, প্রতি মুহূর্তে সেই দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়।

শ্লোক ৭৭

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

তৎ-তা; চ-ও; সংস্মৃত্য-স্মরণ করে; সংস্মৃত্য-স্মরণ করে; রূপম্-রূপ; অতি-অত্যন্ত; অদ্ভুতম্-অদ্ভুত; হরেঃ- শ্রীকৃষের; বিস্ময়ঃ-বিস্ময়, মে-আমার; মহান্ অতিশয়; রাজন্-হে রাজন; হৃষ্যামি-হরষিত হচ্ছি; চ-ও; পুনঃ পুনঃ -বারংবার।

গীতার গান

স্মরণ করিয়া সেই অদ্ভুত স্বরূপ।
পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট মন হয় অপরূপ ॥

অনুবাদ

হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপ স্মরণ করতে করতে আমি অতিশয় বিস্ময়াভিভূত হচ্ছি এবং বারংবার হরষিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয়ও সেই রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। এই কথা অবশ্য বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে কখনও এই রূপ দেখাননি। তা কেবল অর্জুনকেই দেখানো হয়েছিল, তবুও শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তখন কতিপয় মহান ভক্তও তা দেখতে পেরেছিলেন এবং ব্যাসদেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার বলে গণ্য করা হয়। যে অদ্ভুত রূপ অর্জুনকে দেখানো হয়েছিল, ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য সঞ্জয়ের কাছে সেই

রূপ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই রূপ স্মরণ করে সঞ্জয় পুনঃ পুনঃ বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৮

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

যত্র-যেখানে; যোগেশ্বরঃ- যোগেশ্বর; কৃষ্ণঃ-শ্রীকৃষ্ণ; যত্র-যেখানে; পার্থঃ-পৃথাপুত্র; ধনুর্ধরঃ-ধনুর্ধর; তত্র-সেখানে; শ্রীঃ-ঐশ্বর্য; বিজয়ঃ-বিজয়; ভূতিঃ -অসাধারণ শক্তি; ধ্রুবা-নিশ্চিতভাবে; নীতিঃ-নীতি; মতিঃ মম-আমার অভিমত।

গীতার গান

যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্ধর।
তথা শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুব নিরন্তর ।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ নাহি সে অন্তর।
শুদ্ধ নাম যার হয় সেই ধুরন্ধর ॥

অনুবাদ

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মাধ্যমে ভগবদ্গীতা শুরু হয়। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি মহারথীদের সাহায্য প্রাপ্ত তাঁর সন্তানদের বিজয় আশা করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী তাঁর পক্ষে থাকবেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা করার পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বললেন, "আপনি বিজয়ের কথা ভাবছেন, কিন্তু আমি মনে করি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রয়েছেন, সেখানে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও থাকবেন।" তিনি সরাসরিভাবে প্রতিপন্ন করলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পক্ষের বিজয় আশা করতে পারেন না। অর্জুনের পক্ষে বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের রথের সারথির পদ বরণ করা আর একটি ঐশ্বর্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং বৈরাগ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি। এই প্রকার বৈরাগ্যের বহু নিদর্শন রয়েছে, কেন না শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৈরাগ্যেরও ঈশ্বর।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হচ্ছিল দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। অর্জুন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরের বিজয় অনিবার্য ছিল। কে পৃথিবী শাসন করবে তা স্থির করার জন্য যুদ্ধ হচ্ছিল এবং সঞ্জয় ভবিষ্যৎ বাণী করলেন যে, যুধিষ্ঠিরের দিকে শক্তি স্থানান্তরিত হবে। ভবিষ্যৎ বাণী করে আরও বলা হল যে, যুদ্ধজয়ের পরে যুধিষ্ঠির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবেন। কারণ তিনি কেবল ধার্মিক ও পুণ্যবানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর নীতিবাদীও। তাঁর সারা জীবনে তিনি একটিও মিথ্যা কথা বলেননি।

অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অনেক মানুষ ভগবদ্গীতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বন্ধুর কথোপকথন বলে মনে করে। কিন্তু সেই ধরনের কোন গ্রন্থ শাস্ত্র বলে গণ্য হতে পারে না।

কেউ প্রতিবাদ করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করেছিলেন, যা

নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে প্রকৃত অবস্থাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্গীতা হচ্ছে নীতি সম্বন্ধে চরম উপদেশ। নবম অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশত্তম শ্লোকে চরম নৈতিক উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে- মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ। মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে হবে এবং সমস্ত ধর্মের সারমর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করা (সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ)। ভগবদ্গীতার নির্দেশ নীতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠ পন্থাকে স্থাপিত করছে। অন্যান্য সমস্ত পন্থা মানুষকে পবিত্র করতে পারে এবং এই পথে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ হচ্ছে সমস্ত ধর্ম ও নীতির শেষ কথা-শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা। সেটিই হচ্ছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত।

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দার্শনিক মতবাদ ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করা হচ্ছে একটি পন্থা, কিন্তু সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করাটা হচ্ছে সর্বোত্তম সিদ্ধি। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার শিক্ষার সারমর্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে বিধি-নিষেধের পন্থা জ্ঞানের গুহ্য পথ হতে পারে। যদিও ধর্মের আচার-আচরণ গুহ্য, কিন্তু ধ্যান ও জ্ঞানের অনুশীলন গুহ্যতর। আর কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করাটা হচ্ছে গুহ্যতম নির্দেশ। সেটিই হচ্ছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারমর্ম।

ভগবদ্গীতার আর একটি দিক হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব তিনভাবে উপলব্ধ হন-নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরমতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তা হলে জ্ঞানের সমস্ত বিভাগই হচ্ছে সেই উপলব্ধির অংশ-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত, কারণ তিনি সর্বদাই তাঁর নিত্য অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। জীবসমূহ তাঁর শক্তির প্রকাশ এবং তারা দুভাবে বিভক্ত-নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। এই সমস্ত জীব অনন্ত এবং তারা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-বিশেষ। জড়া প্রকৃতি চব্বিশটি তত্ত্বে প্রকাশিত। সৃষ্টি অনন্ত কালের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার সৃষ্টি হয় এবং তার লয় হয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকাশ পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়।

ভগবদ্গীতায় পাঁচটি মুখ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে-পরমেশ্বর ভগবান, জড়া প্রকৃতি, জীব, নিত্যকাল ও সর্বপ্রকার কর্ম। এই সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত ধারণা-নির্বিশেষ ব্রহ্ম, একস্থানে স্থিত পরমাত্মা এবং অন্য যে কোনরূপ চিন্ময় ধারণা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করারই অন্তর্ভুক্ত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, জীব, জড়া প্রকৃতি ও কাল ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন হচ্ছে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব'। এই দর্শন পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত।

জীব তার স্বরূপে চিন্ময় শুদ্ধ আত্মা। সে পরমাত্মার অণুসদৃশ অংশ-বিশেষ। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে এবং জীব সমূহকে সূর্য-কিরণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেহেতু বদ্ধ জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাই তাদের অপরা প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকার প্রবণতা রয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব ভগবানের দুই শক্তির মধ্যে অবস্থিত এবং যেহেতু জীব ভগবানের পরা প্রকৃতিজাত, তাই তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে সে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনাধীন হতে পারে। এভাবেই সে হ্লাদিনী শক্তিতে তার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করতে পারে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি-ত্যাগ সাধনার সার্থক উপলব্ধি বিষয়ক 'মোক্ষযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্কৃত মূল শ্লোক
[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায় ও দ্বিতীয়টি শ্লোক সংখ্যা**]**

(অ)

(ত)

(ধ)

(ন)

বর্তমান সংস্করণ সম্পর্কে টীকা

ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণের সাথে যে সমস্ত পাঠক-পাঠিকা পরিচিত আছেন, তাঁদের সুবিধার্থে বর্তমান সংস্করণটি সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বতন সংস্করণের এবং বর্তমান সংস্করণের বিষয়বস্তু অভিন্ন, তবু উল্লেখযোগ্য এই যে, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের সম্পাদকমণ্ডলী শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মূল রচনার প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত হওয়ার অভিলাষে তাঁদের মহাফেজখানা থেকে অতি পুরানো পাণ্ডুলিপিগুলি অনুসন্ধান করে বর্তমান সংস্করণটির আদ্যোপান্ত সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর ভারত থেকে আমেরিকায় যাওয়ার দুই বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থের মূল ইংরেজী সংস্করণ ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ্ সম্পূর্ণ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানি ঐ গীতার একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং প্রথম অসংক্ষেপিত সম্পূর্ণ সংস্করণটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমেরিকা থেকে গীতার এই ইংরেজী প্রথম সংস্করণটি প্রকাশের আগে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নতুন আমেরিকান সুযোগ্য শিষ্যবর্গ পাণ্ডুলিপি ও প্রেসকপি প্রস্তুতির দুরূহ কাজে বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে সাহায্য করেছিলেন। টেপরেকর্ডে বাণীবদ্ধ তাঁর ভাষ্য থেকে যাঁরা অনুলিখন করেছিলেন, তাঁরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর সুদৃঢ় বাচনভঙ্গির ইংরেজী উচ্চারণ অনুধাবনে অসুবিধা বোধ করতেন এবং তাঁর সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলিও তাঁদের কানে অপরিচিত মনে হত। আমেরিকান ভক্তদের মধ্যে সংস্কৃত সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত সকলেই ঐ ভাষায় নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই, ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদকদের যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই পাণ্ডুলিপি ও প্রেসকপি প্রস্তুতির সময়ে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য জায়গাগুলিতে বিচ্যুতি স্বীকার করেই যেতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্যরচনা প্রকাশনার কাজে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল এবং ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ্ সমগ্র পৃথিবীতে বিদগ্ধ মহলে ও ভক্তসমাজে প্রামাণ্য সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

এই বর্তমান সংস্করণটির জন্য অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ তাঁর যাবতীয় গ্রন্থাবলী নিয়ে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন। ইংরেজী ভাষার সম্পাদকেরা তাঁর দর্শনতত্ত্ব ও ভাষাশৈলীর আরও ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষার সম্পাদকেরাও ইতিমধ্যে সুযোগ্য ভাষাতত্ত্ববিদ হয়ে উঠেছেন। আর তাই ইংরেজি ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদ যখন ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ্ লিখেছিলেন, তখন যে সমস্ত সংস্কৃত ভাষ্য তিনি পর্যালোচনা করেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে পাণ্ডুলিপির মধ্যে দুর্বোধ্যতা সম্পাদকদের কাছে এখন সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তার ফলে এমন এক গ্রন্থাকৃতি পরিণতি লাভ করেছে, যা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত ও প্রামাণ্য। সংস্কৃত তথা ইংরেজী প্রতিশব্দগুলি এখন শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য গ্রন্থসম্ভারের প্রামাণিকতা অনেক বেশি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে চলেছে এবং তাই হয়ে উঠেছে অনেক সুস্পষ্ট আর যথাযথ। কোনও কোনও জায়গায় অনুবাদকর্ম যদিও ইতিপূর্বে শুদ্ধভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, তবু মূল সংস্কৃত ও শ্রীল প্রভুপাদের মূল অনুবাদশৈলীর নিবিড় ভাবানুগ করে তোলার উদ্দেশ্যে তা সযত্নে সংশোধিত হয়েছে। আদি সংস্করণে ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য থেকে অনেক অনুচ্ছেদ বাদ পড়ে গিয়েছিল, সেগুলি বর্তমান সংস্করণে যথাযথ স্থানে পুনরুদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে। আর যে সমস্ত সংস্কৃত উদ্ধৃতির উৎস বিবরণ প্রথম সংস্করণে অনুল্লিখিত ছিল, সেগুলি যথাযথভাবে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার পূর্ণ সূত্র উল্লেখসহ এখন উপস্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান বাংলা সংস্করণের অন্যতম অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালী পাঠকসমাজের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি মূল সংস্কৃত শ্লোক বাংলা অক্ষরে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা ছাড়াও, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত বহুল প্রচারিত গীতার গান নামক অনবদ্য গ্রন্থখানি থেকে প্রতিটি শ্লোকের বাংলা পদ্যে ভাবানুবাদও শ্লোকগুলির নীচে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দৃশ্যপটের অবতারণা

ব্যাপকভাবে প্রকাশিত এবং একক গ্রন্থরূপে পঠিত ভগবদ্গীতা প্রাচীন জগতের মহাকাব্যরূপ সংস্কৃত ইতিহাস মহাভারত গ্রন্থের একটি দৃশ্যাংশ-স্বরূপ আদিতে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান কলিযুগের ঘটনাবলী অবধি মহাভারতে কথিত হয়েছে। এই যুগেরই প্রারম্ভে, আনুমানিক পঞ্চাশত্তম শতাব্দীর পূর্বে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা ও ভক্ত অর্জুনকে ভগবদ্গীতা শুনিয়েছিলেন।

তাঁদের পারস্পরিক আলোচনা-যা মানুষের কাছে পরিজ্ঞাত মহত্তম দার্শনিক ও ধর্মীয় সংলাপগুলি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও তাঁদের বিপক্ষে পাণ্ডুপুত্রগণ তথা তাঁদের পাণ্ডব জ্ঞাতিভ্রাতাগণের মধ্যে এক বিশাল ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষরূপ যুদ্ধের প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভূমণ্ডলের পূর্বতন অধিপতি যে ভরত রাজার নাম থেকে মহাভারত নামটি উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর বংশানুক্রমে কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তাই যে-সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য ছিল, তা কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুকে প্রদান করা হয়েছিল।

অল্পবয়সে পাণ্ডু মারা গেলে, তাঁর পঞ্চপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তৎকালীন কার্যকরী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হন। এভাবেই ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর পুত্রগণ একই রাজপরিবারে প্রতিপালিত হন। তাঁরা সকলেই সুদক্ষ দ্রোণের কাছে সমরকৌশলে প্রশিক্ষিত হন এবং শ্রদ্ধাভাজন পিতামহ ভীষ্মের কাছে উপদেশাবলী লাভ করেন।

তা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, বিশেষত জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের ঘৃণা ও ঈর্ষা করত। আর অন্ধ ও দুষ্টমনা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বাদ দিয়ে নিজ পুত্রদেরই রাজ্যের অধিকার দিতে চাইতেন।

তাই ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে, দুর্যোধন পাণ্ডুর তরুণ পুত্রদের বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং কেবলমাত্র তাঁদের পিতৃব্য বিদুর ও তাঁদের ভ্রাতৃপ্রতিম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সযত্ন সুরক্ষার মাধ্যমে পাণ্ডবেরা তাঁদের প্রাণান্তকর বহু ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

এখন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন এবং সমসাময়িক এক রাজবংশে রাজপুত্রের ভূমিকায় লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। এই ভূমিকায় তিনি পাণ্ডবদের জননী পাণ্ডুপত্নী কুন্তী, অর্থাৎ পৃথার ভ্রাতুষ্পুত্রও হয়েছিলেন। সুতরাং আত্মীয়রূপে এবং ধর্মের নিত্য রক্ষকরূপেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুর ন্যায়ধর্মী পুত্রদের প্রতি কৃপা করেছিলেন এবং তাঁদের সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন।

অবশেষে, ধূর্ত দুর্যোধন অবশ্য এক জুয়াখেলায় পাণ্ডবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানায়। সেই দুর্ভাগ্যজনক ক্রীড়ার মাধ্যমে, দুর্যোধন ও তার ভ্রাতৃবর্গ পাণ্ডবদের সাধ্বী ও একান্ত অনুগতা পত্নী দ্রৌপদীকে অধিকার করে, আর সমবেত সমগ্র রাজপুত্রগণ ও রাজন্যবর্গের সমাবেশের সামনেই তাঁকে বিবস্ত্রা করার মাধ্যমে অপমাণিত করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য হস্তক্ষেপের ফলে তিনি তা থেকে রক্ষা পান, কিন্তু সেই দ্যূতক্রীড়া জালিয়াতিপূর্ণ ও কপটতাপূর্ণ হয়েছিল বলেই পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত হন এবং তাঁদের তের বছরের বনবাস গমনে বাধ্য করা হয়।

বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, পাণ্ডবেরা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দুর্যোধনের কাছ থেকে

তাঁদের রাজ্য ফিরে পেতে অনুরোধ জানালে সে স্পষ্টতই তা প্রদান করতে অসম্মত হয়। যেহেতু রাজপুত্রগণ জনসেবা ব্রতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন, তাই পঞ্চপাণ্ডবেরা শুধুমাত্র পাঁচটি গ্রাম ফিরে পাবার অনুরোধে ক্ষান্ত হন। কিন্তু দুর্যোধন উদ্ধতভাবে উত্তর দেয় যে, সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও সে তাঁদের ছেড়ে দেবে না।

এ যাবৎ, পাণ্ডবেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সহিষ্ণু ও সংযত হয়ে ছিলেন। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে যুদ্ধ অনিবার্য।

তা সত্ত্বেও, ভূমণ্ডলের রাজন্যবর্গ বিভক্ত হয়ে গেলে, কিছু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষ নিলেন, অন্যেরা পাণ্ডবদের দলে এলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডুপুত্রদের পক্ষে বার্তাবহ দূতের ভূমিকা গ্রহণ করে শান্তির প্রস্তাব আলোচনার উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় যান। তাঁর শান্তির প্রস্তাব আদি প্রত্যাখ্যাত হলে, এবার যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

মহত্তম আদর্শ নীতির বাহক পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে স্বীকার করলেও, ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মভ্রষ্ট পুত্রেরা তা করেনি। তবু শ্রীকৃষ্ণ দুই বিবাদী পক্ষেরই অভিলাষ অনুসারে যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করবেন না বললেন, তবে যে-পক্ষ চায়, তাঁরা ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণের সেনাবাহিনীর সুযোগ নিতে পারতেন-এবং অপর পক্ষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশদাতা ও সহায়করূপে পেতে পারেন। রাজনৈতিক ধুরন্ধর দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সেনাবাহিনী কুক্ষিগত করেন, আর পাণ্ডবেরা ঠিক তেমনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পেতেই আকুল হয়ে ওঠেন।

এভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন অর্জুনের সারথি, প্রবাদপ্রসিদ্ধ ধনুর্ধরের সারথি হয়ে তাঁর রথের চালক। এই পর্যন্ত এসে আমরা ভগবদ্গীতার সূচনাক্ষণে উপনীত হই, যেখানে দুই সেনাবাহিনী সারিবদ্ধভাবে সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখি প্রস্তুত এবং ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর সচিব সঞ্জয়ের কাছে জানতে চাইছেন, "তারপর তারা কি করল?"

দৃশ্যপট প্রস্তুত, এখন কেবল এই অনুবাদকর্ম ও ভাষ্য সম্পর্কে সামান্য টীকা প্রদান প্রয়োজন।

ভগবদ্গীতা ভাষান্তরিত করবার কাজে সাধারণ শ্রেণীর অনুবাদকেরা যে ধারা অনুসরণ করে এসেছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষসত্তা একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁদের নিজেদেরই ভাবধারা ও দর্শনতত্ত্বের জায়গা করে নিয়েছেন। মহাভারতের ইতিবৃত্তকে চমকপ্রদ পুরাকাহিনীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন কোনও অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা আদি উপস্থাপনার কাব্যসুলভ এক কাল্পনিক চেহারা মাত্র, কিংবা তিনি বড় জোর এক অতি নগণ্য ঐতিহাসিক পুরুষমাত্র।

কিন্তু পুরুষসত্তা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবদ্গীতার লক্ষ্য ও সারমর্ম উভয়ই, অন্তত গীতায় যা উক্ত হয়েছে, তা থেকে এটিই বোঝায়।

ভাষ্যসহ এই অনুবাদকর্মটি তাই পাঠককে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত করতে সাহায্য করে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে নয়। এই যুক্তিবলে, ভগবদ্গীতা যথাযথ অতুলনীয়। আরও অতুলনীয় এই জন্য যে, ভগবদ্গীতা পরিপূর্ণভাবে সুসমঞ্জস ভাবদ্যোতক এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রবক্তা এবং এই গীতার চরম লক্ষ্যও বটে, তাই একমাত্র এই অনুবাদকর্মটি যথার্থই এই মহান শাস্ত্র-সম্পদটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছে।

-প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে ভারতের অন্তহীন বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে নিয়ে আসার জন্য বহু মনীষী বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রীল প্রভুপাদের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

* * *

"শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব-সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।"

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"পাশ্চাত্যের অত্যন্ত সক্রিয় ও স্থূল জড়বাদ-প্রসূত, সমস্যা-জর্জরিত, ধ্বংসোন্মুখ, পারমার্থিক চেতনাবিহীন ও অন্তঃসারশূন্য সমাজের কাছে স্বামী ভক্তিবেদান্ত এক মহান বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। সেই গভীরতা ব্যতীত আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদগুলি কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

টমাস মেরটন
ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্

"ভারতের যোগীদের প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ পন্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দশম অধস্তন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সব চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি ও দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাক্যামৃত সংঘ সংগঠন করে যেভাবে হাজার হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে জুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি বড় বড় শহরে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগের ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অবিশ্বাস্য।

প্রফেসর মহেশ মেহতা
প্রফেসর অভ্ এশিয়ান স্টাডিস,
ইউনিভার্সিটি অভ উইন্ডসর,
অন্টারিও, কানাডা

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু আচার্য এবং এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"

জোসেফ জিন লানজো ডেলভাস্টো
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক

"শ্রীল প্রভুপাদের বিশাল সাহিত্য-সম্ভারের পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীল প্রভৃপাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষেরা অবশ্যই এক সুন্দরতর পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাবে। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সমস্ত মানব-সমাজের ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রতীক। ভারতবর্ষের বাইরের জগৎ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের ভারতের কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করেছেন।"

শ্রীবিশ্বনাথ শুক্লা, পি-এইচ. ডি
প্রফেসর অভ্ হিন্দি,
এম, ইউ, আলিগড়,
উত্তরপ্রদেশ

"পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভণ্ড গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। পাশ্চাত্যে, যেমন যে কোন সাধারণ মানুষ তার জন্ম থেকেই খ্রিস্টান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, ভারতবর্ষেও একজন সাধারণ মানুষ তেমনই তার জন্ম থেকেই ধ্যান ও যোগসাধনের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বহু অসৎ লোক ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে যোগ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রদর্শন করে মন্ত্র দেওয়ার নামে লোক ঠকাচ্ছে এবং নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। এই ধরনের অনেক প্রবঞ্চক তাদের তান্ধ অনুগামীদের এমনভাবে প্রবঞ্চনা করছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদেরই একটু জ্ঞান আছে, তাঁরাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সেই কারণে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি 'গুরু' ও 'যোগী' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত যে ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে এবং সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।"

ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী
ডাইরেক্টর অভ্ ইণ্ডিয়ান স্টাডিস
সেন্টার ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস
দি ইউনিভার্সিটি অভ্ মেক্সিকো

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এক সাংস্কৃতিক পন্থা খুঁজছে।"

ডঃ সি. এল. স্প্রেডবারি
প্রফেসর অভ্ সোসিওলজি,
স্টিফেন এফ অস্টিন স্টেট ইউনিভার্সিটি

"ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। এই গ্রন্থগুলি শিক্ষায়তন ও পাঠাগারগুলির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার জন্য। মহান পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী হচ্ছেন এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের এক মহান পথপ্রদর্শক। বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি একশটিরও অধিক পারমার্থিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সব কয়টি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা যে আজ ভাগবতের বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে, সেই জন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

ডঃ আর কালিয়া
প্রেসিডেন্ট
ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন্

"বৈদিক শাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে স্বামী ভক্তিবেদান্ত ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্যে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই তত্ত্বদর্শনের বিশ্বজনীন প্রয়োগ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে এক আশীর্বাণী বহন করে এনে এই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে। বাস্তবিকই এটি এক মহান অনুপ্রেরণা-প্রসূত রচনা, যা প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু মানুষের জীবন সম্বন্ধে 'কেন', 'কবে' ও 'কোথায়' প্রভৃতির অনুসন্ধানের সন্ধান দেবে।"

ডঃ জুডিথ এম টাইবার্গ
ফাউণ্ডার এণ্ড ডিরেক্টর
ইস্ট-ওয়েস্ট কালচারাল সেন্টার
লস্ এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

"...শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তরাধিকারী রূপে, ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররূপে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যথার্থভাবেই 'কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি' (His Divine Grace) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বামী প্রভুপাদ সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল অর্জন করেছেন। আমাদের কাছে তাঁর ভগবদ্গীতা-ভাষ্য মহান অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছে, কারণ তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক স্বীকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের প্রামাণিক বিশ্লেষণ। খ্রিস্টান দার্শনিক ও ভারত-তত্ত্ববিদ রূপে আমার এই প্রশস্তি ঐকান্তিক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি।"

অলিভিয়ার ল্যাকোম্ব
প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি দ্যা প্যারিস, সর্বোন
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অভ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন, প্যারিস

"আমি গভীর উৎসাহ, মনোযোগ ও সাবধানতার সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর গ্রন্থগুলি পাঠ করেছি এবং দেখেছি যে, ভারতের পারমার্থিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে উৎসাহী যে-কোন মানুষের কাছে সেগুলির মূল্য অবর্ণনীয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি অত্যন্ত জটিল ভাবধারাগুলি বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তিনি অবশ্যই সেই পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, যা অতি অল্প কয়েকজন মহাপুরুষই লাভ করেছেন।"

ডঃ এইচ. বি. কুলকার্নী
প্রফেসর অভ্ ইংলিশ এ্যান্ড ফিলসফি
উটা স্টেট ইউনিভার্সিটি, লোগান, উটা

"আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অবদান।"

ডঃ সুদা এল ডাট
প্রফেসর অভ্ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস
বোস্টন ইউনিভার্সিটি, বোস্টন, ম্যাসাচুসেটটস

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত অনুবাদগুলি ভারত-তত্ত্ববিদ্ ও ভারতের পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ, উভয়ের কাছেই এক মহা আনন্দের বিষয়।

"...গভীর মনোযোগ সহকারে যে-ই তাঁর ভাষ্যগুলি পাঠ করবে, সে-ই বুঝতে পারবে যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, চিন্তা, আবেগ ও বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়।"

"...অত্যন্ত মনোরমভাবে সংকলিত এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আসক্ত মানুষের পাঠাগারগুলি অলংকৃত করবে-তা তিনি পণ্ডিতই হোন, ভক্তই হোন অথবা সাধারণ পাঠকই হোন।"

ডঃ জে. ব্রুস লঙ্গ
ডিপার্টমেন্ট অভ্ এশিয়ান স্টাডিস,
কর্ণেল ইউনিভার্সিটি

গীতা-মাহাত্ম্য

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।

ভগবদ্গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় স্বরূপ অর্জন করা যায়। (গীতা-মাহাত্ম্য ১)

গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়মপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥

"কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভগবদ্গীতা পাঠ করে, তা হলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে প্রভাবিত করে না।" (গীতা-মাহাত্ম্য ২)

মলিনে মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ গীতামৃতস্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥

"প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্গীতার গঙ্গাজলে একটি বারও স্নান করে, তা হলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৩)

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ বিনিঃসৃতা ॥

যেহেতু ভগবদ্গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা শ্রবণ ও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষেরা নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ ভগবদ্গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ ভগবদ্গীতা হচ্ছে বেদের সার এবং এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। (গীতা-মাহাত্ম্য ৪)

ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণুবাদ বিনিঃসৃতম্।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"গঙ্গাজল পান করলে অবধারিতভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, আর যিনি ভগবদ্গীতার পুণ্য পীযূষ পান করেছেন, তাঁর কথা আর কি বলবার আছে? ভগবদ্গীতা হচ্ছে মহাভারতের অমৃতরস, যা আদি বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গেছেন।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৫) ভগবদ্গীতা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, আর গঙ্গা ভগবানের চরণপদ্ম থেকে উদ্ভুত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবানের মুখ ও পায়ের মধ্যে অবশ্য কোন পার্থক্য নেই। তবে আমাদের এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভগবদ্গীতার গুরুত্ব গঙ্গার চেয়েও বেশি।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ

"এই গীতোপনিষদ্ ভগবদ্গীতা সমস্ত উপনিষদের সারাতিসার এবং তা ঠিক একটি গাভীর মতো এবং রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবদ্গীতার সেই

অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৬)

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

(গীতা-মাহাত্ম্য ৭)

বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটি শাস্ত্রের, একক ভগবানের, একটি ধর্মের এবং একটি বৃত্তির। তাই, একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্-সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোক ভগবদ্গীতা। একো দেবো দেবকীপুত্র এব-সমগ্র বিশ্বচরাচরের একক ভগবান হোন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। একো মন্ত্রস্তস্য নামানি একক মন্ত্র, একক প্রার্থনা, একক স্তোত্র হোক তাঁর নাম কীর্তন-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

এবং কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা-সমস্ত মানুষের একটিই বৃত্তি হোক-পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

***

উদ্ধৃতি-সূত্র

ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থের তাৎপর্য অংশগুলিতে সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রামাণ্য বৈদিক সূত্র অনুযায়ী সমর্থিত। সেখানে নিম্নলিখিত প্রামাণিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

অথর্ব বেদ
অমৃতবিন্দু উপনিষদ
ঈশোপনিষদ
উপদেশামৃত
ঋক্ বেদ
কঠোপনিষদ
কুর্ম পুরাণ
কৌষীতকী উপনিষদ
গর্গ উপনিষদ
গীতামাহাত্ম্য
গোপালতাপনী উপনিষদ
চৈতন্য-চরিতামৃত
ছান্দোগ্য উপনিষদ
তৈত্তিরীয় উপনিষদ
নারদপঞ্চরাত্র
নারায়ণ উপনিষদ
নারায়ণীয়

নিরুক্তি (অভিধান)
নৃসিংহ পুরাণ
পদ্মপুরাণ
পরাশরস্মৃতি
পুরুষবোধিনী উপনিষদ
প্রশ্ন উপনিষদ
বরাহ পুরাণ
বিষ্ণু পুরাণ
বৃহদারণ্যক উপনিষদ
বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতি
বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বেদান্তসূত্র
ব্রহ্মসংহিতা
ব্রহ্মসূত্র
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
মহা উপনিষদ
মহাভারত
মাণ্ডুক্য উপনিষদ
মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি
মুণ্ডক উপনিষদ
মোক্ষধর্ম
যোগসূত্র
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
সাত্বত-তন্ত্র
সুবল উপনিষদ
স্তোত্ররত্ন
হরিভক্তিবিলাস

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শন করুন

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্কনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ এই শ্রীমায়াপুরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এক বৈদিক নগরী, যেখানে সনাতন ধর্মের মূর্ত রূপ প্রদান করার এক বিশেষ প্রয়াস করা হয়েছে। আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সহ এখানে এসে এখানকার এই দিব্য পরিবেশে আপনার সুপ্ত ভগবদ্ভক্তিকে জাগরিত করুন। এখানে সুরম্য অতিথিশালায় থাকার সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পথ-নির্দেশ

গাড়ীতে 'ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৪' ধরে বহরমপুর যাবার পথে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার যাবার পর পথের বাঁ দিকে শ্রীমায়াপুর রোডে মোড় ফিরুন। এই পথে আপনি সোজা শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে এসে পৌঁছবেন।

ট্রেনে-শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর জংশন। সেখান থেকে বাস, স্কুটার-রিক্সা বা ট্যাক্সি পাবেন 'নবদ্বীপ ঘাট' পর্যন্ত। সেখান থেকে জলঙ্গী নদীর অপর পারে শ্রীধাম মায়াপুর। সেখান থেকে রিক্সায় করে ১ কিলোমিটার দূরে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে

যাওয়া যাবে।
হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে রিক্সা করে নবদ্বীপ খেয়া ঘাটে এসে গঙ্গা পার হলেই শ্রীধাম মায়াপুর ঘাট। সেখান থেকে ১ কিলোমিটার দূরে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির।